বিজ্ঞান যখন ভাবায়

বিজ্ঞান যখন ভাবায়

সম্পাদনা

অরূপরতন ভট্টাচার্য

সম্পাদনা সহযোগিতা

অনীশ দেব

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

যে সব বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন

জ্যোতির্বিজ্ঞান	রমাতোষ সরকার
মহাকাশ বিজ্ঞান	রমাতোষ সরকার
পদার্থ বিজ্ঞান	হরমোহন মুখোপাধ্যায়
ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎ	অনীশ দেব
কমপিউটার	দেবব্রত ঘোষ দস্তিদার
রসায়ন বিজ্ঞান	পার্থসারথি চক্রবর্তী
ভূ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌসুম বিজ্ঞান	প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য
পরিবেশ বিজ্ঞান	স্বপনকুমার দাস
উদ্ভিদ বিজ্ঞান	ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল
বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ	রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী
প্রাণিবিজ্ঞান	ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল
বিচিত্র পক্ষিজগৎ	অজয় হোম
বন ও বন্যপ্রাণী	স্বপনকুমার দাস
শারীরবিজ্ঞান	তরুণকুমার দাশ
আর্গোনমিক্স	মৈত্রেয়ী গুহ
মনোবিজ্ঞান	অমিত চক্রবর্তী
বিচিত্র প্রশ্নমালা	অরূপরতন ভট্টাচার্য

ভূমিকা



যে যুগে এখন আমরা বাস করছি, কোনো সন্দেহ নেই, তা বিজ্ঞানের যুগ। যে কোনো যুগই যেমন সেই যুগের মানুষের কাছে আধুনিক, তেমনি যে কোনো যুগকেই বিজ্ঞানের যুগ বলায় বাধা নেই। বিজ্ঞান বরাবর এগিয়ে চলেছে। হতে পারে, কখনো সে এগিয়ে চলেছে দ্রুত, খুবই দ্রুত, আবার কখনো তার এগিয়ে চলার গতি ধীর, মন্থর।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে আজ বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি আমাদের নজরে আসে, তা অকল্পনীয়। ষাটের দশকে মহাকাশে মানুষ যেদিন প্রথম পা রাখলো, সেদিন থেকেই, স্বীকার করতে হয়, বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কিন্তু শুধু মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেই আজ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নজর আসে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু ক'রে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান হয়ে মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত —কোথায় নয়? কিন্তু আগ্রহ যার আছে বিষয় জানায় তার বাধা কোথায়?

আশার কথা, সম্প্রতি বাংলায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের গ্রন্থ প্রণীত হচ্ছে। উদ্দেশ্য, একদিকে পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্ত করা, অন্যদিকে জানবার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা।

উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু বাজার চলতি বিভিন্ন বই সে উদ্দেশ্য কতটা পূরণ করতে পারে? বিজ্ঞান-মানসিকতা গঠনেই বা তাদের ভূমিকা কতখানি?

যে বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, দিবালোক থেকে নিশাকাল পর্যন্ত অন্দরে যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, বাইরেও যার প্রতি মুহূর্তের উপস্থিতি, সেই বিজ্ঞান সম্পর্কেই আমাদের স্বাভাবিক প্রশ্ন, সচেতন কৌতূহল। বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এই ধরনের প্রশ্ন এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উপজীব্য। দুঃখের কথা, অনেকগুলি বিষয় একত্রে সংকলিত ক'রে এই ধরনের একটি আকর গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, যদিও এ-ধরনের গ্রন্থের বিশেষ উপযোগিতা আছে। সেইজন্যেই এমন একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা। কৌতূহলী প্রশ্ন এবং তার উত্তরের ভেতর দিয়েই এখানে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন এবং সেতুবন্ধন।

কিন্তু এই পরিচয় স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরকে মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করার কারণ কী? একটি বিষয়কে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা ক'রে অধ্যায়টি সম্পূর্ণ করলে সেই বিষয়টি কিশোর-কিশোরীদের আরো বেশি মূল্যবান মনে হতে পারতো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাতে আলোচনার চেহারাটা পরিষ্কার হ'ত। কিন্তু এই রকম এক পটভূমিতে কিশোর-কিশোরীদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন জীবন থেকে সংগ্রহ করা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হ'ত না। এবং কিশোর-কিশোরীদের তা কতটা আকর্ষণ করতো সে নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা চলে।

বর্তমান বইটিতে এক একটি অধ্যায়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এত বিচিত্র ধরনের প্রশ্ন সংগ্রহ করা হয়েছে যে, তাতে সমগ্র বিষয়টির সঙ্গেই সাধারণভাবে একটা পরিচয় হয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রতিটি প্রশ্নের আলোচনাই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে। তবে পুনরুক্তি যাতে না ঘটে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই সব প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগুলির উল্লেখ ও আলোচনাও প্রয়োজনে এসেছে, তাকে উপেক্ষা করা বা অনুল্লেখ্য রাখা হয়নি।

সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানের অনেকগুলি বৃহদায়তন এনসাইক্লোপিডিয়া এবং বুক অফ নলেজ প্রকাশিত হয়েছে। 'বিজ্ঞান যখন ভাবায়' আকারেও বৃহৎ এবং ওই ধরনের একটি বই বলেও কারো কারো মনে হতে পারে। কিন্তু প্রচলিত 'বুক অফ নলেজ' বা এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে এটি চরিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে বিষয়বস্তু অবিমিশ্র বিজ্ঞান, যোগাযোগ প্রত্যক্ষ এবং সরাসরি। বর্তমান কিশোর-কিশোরীদের বিজ্ঞান মানসিকতার উন্মেষের ক্ষেত্রে এই ধরনের গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে, মনে করি।

বর্তমান গ্রন্থটি চোদ্দটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ছটি অজৈব বিজ্ঞান সংক্রান্ত, পরবর্তী সাতটি জীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং সর্বশেষটি 'বিচিত্র প্রশ্নমালা' নামে নির্দিষ্ট।

প্রথম পর্বের প্রথম অধ্যায়টি জ্যোতির্বিজ্ঞান। দেখা যায়, জীবন ধারণের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই বিষয়টির সঙ্গেই মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। তারপর এসেছে পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎ, রসায়ন বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান; পর্বের পরিসমাপ্তি মৌসুম বিজ্ঞানে।

এখানে একটি প্রশ্ন অনেকের মনেই আসতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানকে যেখানে একটি সম্পূর্ণ বিষয় হিসেবে নেওয়া হয়েছে, সেখানে বিদ্যুৎকে বিচ্ছিন্ন ক'রে 'ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎ' নামে একটি অধ্যায় রাখা হল কেন?

ইলেকট্রনিক্স এবং বিদ্যুৎ—এই দু'টি বিষয়েরই মূল কথা, ইলেকট্রনের প্রবাহ। প্রধানত পদার্থ বিজ্ঞানের অন্তর্গত হলেও ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎ দৈনন্দিন জীবনে আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। এই সব কারণেই শাখা দু'টিকে পদার্থ বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হল।

প্রথম পর্বে আরো দু'টি বিষয়কে এ-রকম একত্রে এনে আর একটি বিভাগের পরিকল্পনা করা হল। বিষয় দু'টি 'ভূ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান'।

সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান সমুদ্র বিজ্ঞানের (Oceanography) অন্তর্গত হলেও ভূ-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক উপেক্ষা করার মত নয়। বিষয়টির গুরুত্বের কথা মনে রেখে সেটিকে ভূ-বিজ্ঞানের সঙ্গে একত্রে এনেও স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

পরবর্তী পর্বটি জীব সম্পর্কিত বিজ্ঞানের বিষয় নির্ভর। এই পর্ব মোট যে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত তার প্রথমটি 'উদ্ভিদ বিজ্ঞান'। এর পরে আছে 'বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ'। উদ্ভিদের পরে প্রাণী-সংক্রান্ত আলোচনার সূচনা। সেইজন্যে 'প্রাণিবিজ্ঞান' পরের অধ্যায়। প্রাণিবিজ্ঞানের পরে যে অধ্যায়টি আছে, সেটি বিচিত্র উদ্ভিদজগতের মতই এক অধ্যায়, নাম 'বিচিত্র পক্ষিজগৎ'। পর্বের পরবর্তী তিনটি অধ্যায় যথাক্রমে শারীরবিজ্ঞান, আর্গোনমিক্স এবং মনোবিজ্ঞান। প্রথম পর্বের জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, মৌসুম বিজ্ঞান যেমন, এই পর্বের উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানও সে-রকম। এরা বহু পরিচিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের এক একটি বিভাগ, নামেই এদের বিষয়ের নির্দেশ, এদের সম্পর্কে নতুন ক'রে বলার কিছু নেই। কিন্তু তিনটি অধ্যায় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

'বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ'-এর বিষয়বস্তু কি? উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

আমাদের চারপাশে এমন অনেক গাছ আছে, যাওয়া-আসার পথে যা নিত্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এই সব গাছের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বা যতটুকু পরিচয়, তা তেমন ভাবে উল্লেখ করার মত নয়। অথচ এ-ধরনের গাছের ফুল, ফল, পাতা ঠাকুরঘরে পর্যন্ত প্রবেশাধিকার পেয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যে বিষয়বস্তু বিচিত্র উদ্ভিদজগতের বিষয়বস্তু তা থেকে ভিন্ন। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে তার ঐতিহাসিক দিকটি।

একই ভাবে 'বিচিত্র পক্ষিজগৎ'-এর বিষয়বস্তু প্রাণিবিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র। এই অধ্যায়ে পক্ষিজগতের বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে পক্ষিবিদের চোখে যার সঙ্গে প্রাণিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মিল নেই।

এই পর্বে বাকি যে বিষয়টি সম্পর্কে দু'-একটি কথা বলা দরকার, সেটি হল আর্গোনমিক্স। বিষয়টি আধুনিক। শারীরবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে বিষয়টিকে ধরা হলেও এই বিষয়ের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় না থাকাটা স্বাভাবিক। এখানে মূল কথা, শরীরের সঙ্গে যন্ত্রের সম্পর্ক। সে-সম্পর্ক কৌতূহল উদ্রেক করে, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যোগ আছে, এ-রকম বহু প্রশ্নের উত্তর দেয়। আর্গোনমিক্সের বাংলা পরিভাষা নেই, সংকলনে সে পরিভাষা তৈরির চেষ্টাও করা হয়নি।

শেষ পর্ব 'বিচিত্র প্রশ্নমালা' একটি মাত্র অধ্যায় যুক্ত। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের সাধারণ কৌতূহলকর প্রশ্ন ছাড়াও আরো বহু বিচিত্র প্রশ্ন আমাদের জীবনে নিত্য উঁকি মারে। সে সব প্রশ্ন আমাদের দিবানিশির সঙ্গী, সব বয়সের মানুষের সমান আগ্রহ সেখানে। এমন কিছু প্রশ্ন নিয়েই এই বিভাগের পরিকল্পনা।

বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় এই রকম একটি সংকলন গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই কোথাও কোথাও অসুবিধে দেখা দেয়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নসূচী কী ভাবে বিন্যস্ত হবে—বিষয়ের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে না বিষয়ের কৌতূহলকর দিককে প্রাধান্য দিয়ে? বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মৌসুম বিজ্ঞানের মধ্যে এই ধারাবাহিকতার চেহারাটা স্পষ্ট। কিন্তু অন্যান্য অধ্যায়ের ক্ষেত্রে বিষয়ের কৌতূহলকর দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যদিও সম্পূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই একটা চেহারা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পাওয়া সম্ভব।

গ্রন্থে প্রশ্নের সংখ্যা কম-বেশি ৬০০। প্রথম উদ্যোগ হিসেবে প্রশ্ন-সংখ্যা সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় এবং শাখা-প্রশাখার শেষ নেই। ফলে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিষয় সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ক'রে প্রশ্নের সংখ্যা অনেক বাড়ানো যেতে পারে। এ-ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনার সময়ে আরো কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে প্রাসঙ্গিক ভাবে। উত্তর সংক্ষিপ্ত কিন্তু বর্তমান সংকলনের পটভূমিতে সে-সব প্রশ্নও চিত্তাকর্ষক। এ-রকম প্রশ্নের সংখ্যাও ৪০০-এর কাছাকাছি।

সংকলনে যে-সব প্রশ্ন নেওয়া হয়েছে তাদের চেহারা যতই সরল দেখাক, উত্তর যতই স্বাভাবিক মনে হোক, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সব সময়ে সহজ নয়। গ্রন্থটিতে প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পূর্ণ উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে বিভিন্ন অধ্যায়ের পূর্বাভাষে বিশেষ একটি চিত্রের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। ইতালিয় পদ্ধতিতে গুণন-প্রক্রিয়ার চিত্র এটি। ষোড়শ শতাব্দীর এই চিত্রটি Taglientes-এর 'Opera' থেকে গৃহীত। এখানে বজ্র-গুণন পদ্ধতিতে গুণফল নির্ণয় করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের জগতে গণিত সম্রাজ্ঞীর আসনে অধিষ্ঠিত। তার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে গুণন-প্রক্রিয়া একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া হিসেবে নির্দিষ্ট, প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত যার মূল্যের তেমন ইতর-বিশেষ হয়নি। গণিতের জগতে গুণন-প্রক্রিয়ার যে স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা এবং চিরন্তন স্বভাব নজরে আসে, বর্তমান গ্রন্থের ক্ষেত্রেও তা বজায় থাকবে আশা করা যায়। সেই কথা স্মরণ ক'রেই ঐতিহাসিক চিত্রটির ব্যবহার।

সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে দু'জনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। এঁদের একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী। বন্ধুবর ডঃ চক্রবর্তী গ্রন্থটির মানোন্নয়নের জন্যে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আমাকে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যজন আমার স্নেহাস্পদ এবং বিশেষ প্রীতিভাজন শ্রীঅনীশ দেব। এই গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সম্পাদকের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

এই রকম একটি গ্রন্থ দীর্ঘকালের পরিকল্পনার ফল। অনেকের সাহায্য এবং সহযোগিতা ব্যতীত এ-রকম একটি পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন কখনোই সম্ভব নয়। সেখানে প্রকাশক, লেখক, শিল্পী তো আছেনই, সেই সঙ্গে রয়েছেন ঘরে-বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ। এঁদের সকলের কথাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা



'বিজ্ঞান যখন ভাবায়' কৌতূহলপ্রবণ, বিজ্ঞানমনস্ক পড়ুয়াদের হাত ধরে আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে জায়গা করে নিয়েছে, এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে। বিজ্ঞান চলমান—কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার গতিশীলতা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ১০ বছর আগে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, আজ সে সেখানে স্থির নেই, আগামী ১০ বছরে তার রূপ ও রকমের প্রত্যাশিত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে সে আরও এগিয়ে যাবে। ফলে সে যেমন পূর্ণতর হবে, তেমনি তার আরও সমৃদ্ধি ঘটবে।

'বিজ্ঞান যখন ভাবায়' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। তারপর তার একাধিক মুদ্রণ ঘটলেও পরিবর্ধিত আকারে আত্মপ্রকাশ এই প্রথম। বর্তমান সংস্করণটিতে কোনো কোনো বিভাগে কিছু কিছু সংযোজন ঘটেছে। তাছাড়া চারটি নতুন অধ্যায় গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই চারটি অধ্যায় হল, মহাকাশ বিজ্ঞান, কমপিউটার, পরিবেশ বিজ্ঞান এবং বন ও বন্যপ্রাণী।

বিজ্ঞানের আধুনিক প্রেক্ষাপটে মহাকাশ বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাকাশে স্পুটনিক উৎক্ষেপনের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ যুগের সূচনা। প্রথম পর্যায়ে রাশিয়া আমেরিকা। আমাদের দেশের তখন ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকা। কিন্তু তারপরে এগিয়ে এল বিশ্বের অন্যান্য দেশ। আমাদের ভারতবর্ষও পিছিয়ে রইলো না। আজ বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে মহাকাশ বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ এবং ব্যাপ্তি, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সে যেভাবে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে তুলেছে, তার তুলনা মেলা ভার। আজ তাই বিজ্ঞানের ইতিহাসে মহাকাশ বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করার কোনো কথাই ওঠে না।

মহাকাশ বিজ্ঞানের মতই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কমপিউটার বিজ্ঞান। আমরা বলি মহাকাশ যুগ বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সমান তালে চলেছে কমপিউটার যুগ। আমরা এখন আর তার দোরগোড়ায় নেই, আমরা আছি তার অন্দরমহলে। আজ লেখাপড়ায় ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশই কমপিউটারমুখী। আধুনিক জনজীবনে কমপিউটার এখন নিত্যসঙ্গী। আফিসে-কাছারিতে, রেলে, ছোটদের ভিডিও গেম্‌সের পার্লারে, এমন কি কলঘরে মায়েদের কাপড় কাচার সময়েও কমপিউটার আজ যে ভূমিকা নিয়েছে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

বিজ্ঞানের যে কোনো বিভাগকেই আজ বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ হিসেবে বাঁধা কঠিন। একটির জ্ঞানের পরিধি তার জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হয়েছে অন্য বিভাগে। অথচ তার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তা বজায় থাকছে।

'বিজ্ঞান যখন ভাবায়' গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কোনো কোনো বিভাগের আলোচনাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় অন্য বিভাগে। বর্তমান গ্রন্থটি সর্বসাধারণের পাঠ্য হলেও মূলত ছাত্র-উপযোগী বলে সম্পাদককে সংযত থেকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়েছে।

নতুন চারটি বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অন্য দুটি বিভাগ পরিবেশ বিজ্ঞান এবং বন ও বন্যপ্রাণী। এই দুটি বিভাগও গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক। কিন্তু বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তি এবং উপযোগিতার সঙ্গে তার অপপ্রয়োগের দিকটিও আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। যান্ত্রিক সভ্যতার মোহ আমাদের কিছুটা আচ্ছন্ন করবেই। কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয়, সে দিকটির দিকেও নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। চিমনির কালো ধোঁয়া আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে, ক্ষেত-খামারে পেসটিসাইড, জলে আর্সেনিক—কি ভাবে পরিবেশ রক্ষা করবো?

চিন্তা শুধু মানুষকে ঘিরে নয়। চিন্তা বন আর বন্যপ্রাণীকে নিয়েও। বন কেটে গড়ে উঠছে বসত। বন্যপ্রাণীও কমে যাচ্ছে সংখ্যায়। কোথাও কোথাও আবার লাল সংকেত। কোনো প্রাণী ইতিমধ্যে দুর্লভ প্রাণী হিসেবে তালিকাভুক্ত। তাদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।

চারদিকে এত স্বাচ্ছন্দ্য, এত সুযোগ, এত কৌতূহল, এত বিস্ময়, এত উপকরণ, তবু কোথায় যেন রয়ে যাচ্ছে একটা শঙ্কা, একটা অজানা বিপদের সূক্ষ্ম ইংগিত।

'বিজ্ঞান যখন ভাবায়' আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। কিন্তু চোখে ঠুলি বেঁধে তার পথ চলা নয়। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানমনস্ক ছেলেমেয়েদের যাতে বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে, সেই লক্ষ্যে তার দ্বিতীয় সংস্করণের নব রূপায়ন।

আশা করি প্রথম সংস্করণের মত বর্তমান সংস্করণটিও পাঠক-পাঠিকা সাদরে গ্রহণ করবে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

জ্যোতির্বিজ্ঞান

সূচীপত্র

মহাকাশ বিজ্ঞান

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পদার্থ বিজ্ঞান

সূচীপত্র

ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কমপিউটার

রসায়ন বিজ্ঞান

সূচীপত্র

ভূ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মৌসুম বিজ্ঞান

সূচীপত্র

পরিবেশ বিজ্ঞান

সূচীপত্র

উদ্ভিদ বিজ্ঞান

সূচীপত্র

বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ

প্রাণিবিজ্ঞান

সূচীপত্র

বিচিত্র পক্ষিজগৎ

সূচীপত্র

বন ও বন্যপ্রাণী

শারীরবিজ্ঞান

সূচীপত্র

আর্গোনমিক্স

সূচীপত্র

মনোবিজ্ঞান

সূচীপত্র

বিচিত্র প্রশ্নমালা

জ্যোতির্বিজ্ঞান



মহাকাশে যা জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্বিজ্ঞান যে শুধু তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা একটি বিষয়, তা নয়। যার দীপ্তি নেই, যে জ্যোতির্বিহীন, মহাকাশের এমন বস্তুও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে আসে। সেখানে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু যেমন আছে, তেমনি আছে কোয়েসার, পালসারের মত সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কারও। সূর্য স্থির, পৃথিবী ভ্রাম্যমাণ, চাঁদের আলো তার নিজস্ব নয়, সূর্যের একদিন মৃত্যু ঘটবে আর সেই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীরও, প্রতিটি বস্তুকণা অপর প্রতিটি বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে, পঞ্জিকার প্রবর্তন বা ত্রুটি—এমন অনেক বিষয় নিয়েই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য। সুপ্রাচীন এই বিজ্ঞান শাখাটির প্রয়োজন আজও নিঃশেষিত নয়।

ইংরেজিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আমরা বলি Astronomy।

জ্যোতির্বিজ্ঞান কি মানুষের ভাগ্য গণনার সঙ্গে সম্পর্কিত এক বিজ্ঞান?

জ্যোতির্বিজ্ঞান এক বিজ্ঞান, কিন্তু মানুষের শুভাশুভের সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞান এ-নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান হচ্ছে পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির মত এক 'প্রকৃতিবিজ্ঞান' বা 'ভৌতবিজ্ঞান'। প্রকৃতির এক বিশেষ অংশ বা দিক সম্পর্কে যতদূর সম্ভব নির্ভুল, খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ ক'রে তার ভিত্তিতে যুক্তিসম্মত, বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা গঠন করাই হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যাঁরা পারদর্শী তাঁদের বলা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী (Astronomer)। যাঁরা ভূত-ভবিষ্যত গণনা করতে পারেন বলে দাবি করেন তাঁদের গণৎকার, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী (Astrologer) প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়। বাংলায় লোকমুখে এঁদের শাস্ত্রকে আজকাল সাধারণত জ্যোতিষ (Astrology) বলে উল্লেখ করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ এক বিষয় তো নয়ই, এমন কি এদের চরিত্রও সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শব্দটিকে এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হত, কিন্তু সেখানেও বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকলে পার্থক্য সূচিত করতে একটিকে বলা হত 'গণিত জ্যোতিষ', অপরটিকে 'ফলিত জ্যোতিষ'।

অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের তফাত কোথায়? এর বিষয়বস্তুই বা কী?

স্বাভাবিকভাবেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য নিহিত আছে তার আলোচনার ক্ষেত্রে বা বিষয়বস্তুতে। মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল জ্যোতিষ্ক (Heavenly body)। জ্যোতিষ্কদের অবস্থান, গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যথাসম্ভব সূক্ষ্ম তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ তত্ত্ব গঠন করাই হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঈপ্সিত সাফল্য। বলা যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞান হচ্ছে জ্যোতিষ্ক বিষয়ক বিজ্ঞান। কিন্তু জ্যোতিষ্কেরা যেহেতু 'আকাশ' (Sky বা Heavens) তথা 'মহাকাশ' (Space)-এ অবস্থিত, তাই পরোক্ষভাবে আকাশ বা মহাকাশও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

জ্যোতিষ্ক কারা—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা প্রভৃতি উজ্জ্বল বস্তুরা?

এক সময়ে জ্যোতিষ্ক বলতে আকাশের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ইত্যাদি উজ্জ্বল বস্তুদেরই শুধু বোঝানো হত। জ্যোতিষ্ক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে সেটাই ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তখন অনুজ্জ্বল অর্থাৎ সম্পূর্ণ দীপ্তিহীন কোনো আকাশীয় বস্তুর কথা জানা ছিল না। পরের যুগে কিন্তু আকাশের উজ্জ্বল বস্তুগুলোর প্রতিবেশীরূপে এমন বেশ কিছু বস্তুরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা মোটেই উজ্জ্বল নয়—যারা কোনো আলো বিকিরণ করে না। দৃষ্টান্ত, 'কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকা' (Dark nebula), 'পালসার' (Pulsar) ইত্যাদি। অর্থের প্রসার ঘটিয়ে এই শেষোক্ত ধরনের বস্তুগুলোকেও এখন জ্যোতিষ্কদের দলভুক্ত ক'রে নেওয়া

পালসার কি জ্যোতির্বিহীন?

হয়েছে। অর্থাৎ জ্যোতির্বিহীন হওয়া সত্ত্বেও এরা এখন পারিভাষিক অর্থে জ্যোতিষ্ক, এরাও অবিসংবাদিতভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

এক কথায় বলা চলে, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় মহাকাশে অবস্থিত যে-কোনো বস্তুই জ্যোতিষ্ক।

যারা আলো বিকিরণ করে না, অদৃশ্য সেই সব জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব বোঝা যায় কি ক'রে?

আলোকবিহীন জ্যোতিষ্করা যে আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোর অভাবের কারণেই তা বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হয়ে পড়ে। আলোর উৎসরূপে নয়, কিন্তু আলোর পথে প্রতিবন্ধকরূপে তারা ধরা দেয়। এর এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের এক কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকা। দূরবিন দিয়ে দেখলে খুব ভালভাবে, এমন-কি অনুকূল ক্ষেত্রে খালি চোখেও আকাশের এক জায়গায় দেখা যায় অসংখ্য তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি জায়গা ব্যতিক্রম—প্রায় চৌকো কিন্তু একটু লম্বাটে আকৃতির—অর্থাৎ অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মত জায়গাটিতে গোটা কয়েকের বেশি তারা দেখা যায় না।

অন্ধকার ওই জায়গাটিতে আসলে আছে একটি কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকা। তারাগুলো প্রায় সবই আছে আরো দূরে।

আলো কি বিকিরণের একমাত্র রূপ?

তাদের মধ্যে যেগুলো নীহারিকাটির ঠিক পিছনে রয়েছে, ঢাকা পড়ে যাওয়ার দরুন তাদের দেখা যায় না, কিন্তু আশ-পাশের তারাগুলোকে দেখা যায়, আর দেখা যায় নীহারিকার সামনে থাকা গোটা কয়েক তারাকে। এই নীহারিকাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অঙ্গারাধার নীহারিকা' (The Coalsack Nebula)। আর এক সুন্দর দৃষ্টান্ত হল 'অশ্বমুণ্ড নীহারিকা' (The Horsehead Nebula)। এটিকেও পরোক্ষ ভাবে দেখা যায়—এক বৃহৎ উজ্জ্বল নীহারিকার পটভূমিতে।

পরোক্ষভাবে দেখা দেওয়া ছাড়া, আলোকবিহীন জ্যোতিষ্করা অন্যভাবেও তাদের অস্তিত্বের পরিচয় রাখতে পারে—অন্য 'বিকিরণ' (Radiation)-এর মাধ্যমে। ব্যাপারটি আসলে এই যে, বিরাট বিরাট জ্যোতিষ্ক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত সব কিছুকে গঠন করে রেখেছে যে-পদার্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে তা তার পরিপার্শ্ব থেকে কোনো-না-কোনো রূপে শক্তি আহরণ করে এবং কোনো-না-কোনো রূপে শক্তি বিতরণও করে। এই বিতীর্ণ শক্তি হচ্ছে তার বিকিরণ। 'আলো' বিকিরণের একটি রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয়। বিকিরণের সম্ভাব্য আরো অনেক রূপ আছে। এদের মধ্যে সুপরিচিত এক উদাহরণ হচ্ছে 'তাপ'। খুব গরম ইস্ত্রিকে না-ছুঁয়ে, তার ধারে-কাছে হাত নিয়ে গিয়েও আমরা তার উত্তাপ টের পাই। তেমনি রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে, দৃষ্টিহীন মানুষও সূর্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এগুলো সম্ভব হয় তাপরূপী বিকিরণের দরুন। অদৃশ্য বিকিরণের আরো অনেক রূপ আছে। তাদের নাম 'রেডিও-তরঙ্গ' (radio wave), 'এক্স-রশ্মি' (X-ray) ইত্যাদি।

দীপ্তিহীন জ্যোতিষ্করা আলো না পাঠালেও সাধারণত অন্য নানা রূপে বিকিরণ পাঠায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওই সব বিকিরণ সুকৌশলে সংগ্রহ ক'রে তার সাহায্যে সেই বিকিরণের উৎস সম্পর্কে, তাদের অস্তিত্ব এবং নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করতে পারেন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে, ধরা যাক একটি জ্যোতিষ্ক কোনো আলো পাঠাচ্ছে না, কিন্তু রেডিও-তরঙ্গ পাঠাচ্ছে। তাহলে সেই জ্যোতিষ্কটি কি চিরকাল অজানা থেকে যাবে? না, তা না-ও হতে পারে। তার রেডিও-তরঙ্গকে শব্দে রূপান্তরিত করা যায়—যেমন আমরা হামেশাই কলকাতা বা অন্য কোনো রেডিও প্রচারকেন্দ্র থেকে প্রেরিত রেডিও-তরঙ্গকে আমাদের ঘরে ঘরে শব্দে রূপান্তরিত ক'রে থাকি। দূর মহাকাশ থেকে আসা রেডিও-তরঙ্গকে শব্দে পরিণত করতে অবশ্য আমাদের ঘরোয়া রেডিও গ্রাহকযন্ত্রের চেয়ে অনেক



অশ্বমুণ্ড নীহারিকা

বড়, অনেক জোরালো যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে। আর রূপান্তরিত হলে তা সংগীত বা ওই জাতীয় উপভোগ্য, বা এমন কি সহজবোধ্য, কোনো শব্দের রূপ নেয় না। সে-শব্দ হয় কড় কড়, সোঁ সোঁ জাতীয় শব্দ—কর্কশ, অবোধ্য। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে শুনে শুনে ওই আপাত অবোধ্য শব্দের অর্থোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন—ওঁরা তা থেকে উৎস সম্পর্কে অনেক কথা

জানতে বা বুঝতে পারেন। অর্থাৎ মহাকাশে এমন অনেক জ্যোতিষ্ক আছে যারা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় বটে কিন্তু শ্রুতিগ্রাহ্য—যাদের দেখা যায় না, যায় শোনা। আজকাল অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শোনার ওপর বিশেষ নির্ভর করেন না—বিকিরণ-সূত্রে পাওয়া শক্তিকে 'শব্দ'-এ পরিণত না-করে বরং 'যান্ত্রিক-শক্তি'-তে পরিণত করেন এবং তার সাহায্যে রেখচিত্র (Graph) অঙ্কিত ক'রে ফেলেন। শব্দে যেমন ওঠা-নামা ইত্যাদি থাকে, এ-ক্ষেত্রে তেমনি ছোট-বড় উঁচু-নীচু প্রভৃতি নানা আকৃতির ঢেউ খেলানো দাগ পাওয়া যায়। সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে, তুলনামূলক বিচার ক'রে ওঁরা বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যান। রেডিও-তরঙ্গ ছাড়া এক্স-রশ্মি জাতীয় অন্য বিকিরণের মাধ্যমে ধরা পড়েছে এমন জ্যোতিষ্কও মহাকাশে আছে।

দৃশ্য না অদৃশ্য, মহাকাশে কোন ধরনের জ্যোতিষ্কের সংখ্যা বেশি?

প্রকৃতি আসলে যে ঠিক কেমন, মানুষ তার মোটামুটি সঠিক পরিচয় বা আন্দাজ পেয়েছে কি-না—এ-সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়তার সঙ্গে দেওয়া যায় না। শুধু বলা যায় মানুষ এ-পর্যন্ত কী জেনেছে আর তার ভিত্তিতে মানুষের কী বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।

দৃশ্যমান বেশ কিছু জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, সেগুলো দৃশ্য আলোর পাশাপাশি কম-বেশি পরিমাণে অদৃশ্য বিকিরণও করছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, কথাটা সব দৃশ্য জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কারণে অদৃশ্য বিকিরণগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছোতে পারে না। যাদের আলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দিয়েছে, আর যাদের অন্য অদৃশ্য বিকিরণ ধরা দিয়েছে তাদের সংখ্যাগত ভাবে তুলনা করে দেখা গেছে প্রথম শ্রেণীর জ্যোতিষ্করাই সংখ্যায় অনেক বেশি।

খালি চোখে আকাশ দেখে সাধারণ মানুষের মনে হয় জ্যোতিষ্করা সবাই এক রকম নয়। এ-সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কী বলেন?

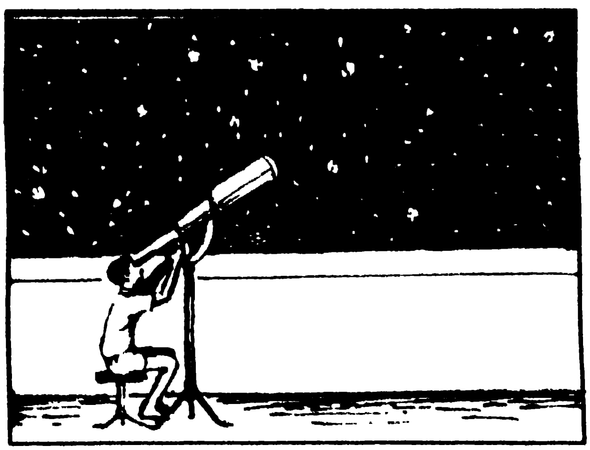
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন জ্যোতিষ্করা নিঃসন্দেহে সবাই এক রকমের নয়—ওদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে রকমফের আছে। প্রকৃতপক্ষে, খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে যে কোনো দু'টি জ্যোতিষ্কের মধ্যে কিছু মিল এবং কিছু অমিল থাকেই। এদের মধ্যে যেগুলো ওঁদের বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থাৎ যেগুলোকে ওঁরা মূলগত বলে মনে করেন, সেগুলোর ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ্কদের পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভাগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষের খালি চোখে দেখা বা স্থূল বিচারকে ওঁরা মাপকাঠি

চাঁদ কি সত্যিই বড়?

করেন না। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে প্রয়োজনীয় আঁকজোখ কষে তবেই ওঁরা জ্যোতিষ্কদের চরিত্র নির্ধারণ করেন এবং শ্রেণীনির্দেশ করে থাকেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে, চাঁদকে রাতের আকাশের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে মনে হয়, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনুসারে চাঁদ প্রকৃতপক্ষে না বড়, না উজ্জ্বল। ওঁরা বলেন, আমাদের খুব কাছে থাকার দরুণ চাঁদকে অমন মনে হয়।

মূল পার্থক্যের ভিত্তিতে দৃশ্য জ্যোতিষ্করা কী কী শ্রেণীতে বিভক্ত?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে দৃশ্য জ্যোতিষ্করা এই এই শ্রেণীর হতে পারে : তারা (Star), গ্রহ (Planet), উপগ্রহ (Satellite), গ্রহাণু (Asteroid), ধূমকেতু (Comet), উল্কা (Meteoroid) এবং নীহারিকা (Nebula)। ষাটের দশকে



আর এক শ্রেণীর দৃশ্য জ্যোতিষ্ক স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। এদের দেখতে তারার মত, কিন্তু এরা তারা নয়। এদের বলা হয় কোয়েসার (Quasar)। এদের সঠিক চরিত্র এখনও অনুদ্‌ঘাটিত।

সাধারণ মানুষের পক্ষে, আবহাওয়ার অনুকুল অবস্থায়, খালি চোখে বা বাইনোকিউলার দিয়ে সব ক'টি শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক দেখতে পাওয়া সম্ভব—শুধু কোয়েসার ছাড়া।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর জ্যোতিষ্কদের দেখতে হলে শক্তিশালী দুরবিন প্রয়োজন।

পৃথিবী কি জ্যোতিষ্ক? যদি তাই হয়, তাহলে পৃথিবী কোন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক?

জ্যোতির্বিজ্ঞানের পারিভাষিক অর্থে পৃথিবীকে অবশ্যই জ্যোতিষ্ক বলা চলে।

অন্যান্য জ্যোতিষ্কেরা আছে দূর আকাশে আর পৃথিবী আছে আমাদের কাছে—খুব কাছে, আমাদের দেহের সংস্পর্শে। কিন্তু এ-ঘটনা অবশ্যই পৃথিবীর চরিত্রকে পাল্টে

পৃথিবী কি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক?

দেয় না। অঙ্গাঙ্গি হয়ে থাকার দরুন পৃথিবী আমাদের চোখে সুবিশাল এবং এমন যে, একসঙ্গে আমরা তার অল্প খানিকটা অংশের বেশি দেখতে পাই না। ওই একই কারণে, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে যখন আলোক-বিকিরণ ঘটে তখন তার খণ্ড খণ্ড অংশ মাত্র পেয়ে আমরা লোকজন, ঘরবাড়ি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতিকে দেখতে পাই—সব জায়গা থেকে একযোগে আলো পেয়ে তাকে জ্যোতিষ্মান রূপে দেখতে পাই না। কিন্তু তবু পৃথিবী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পৃথিবী ছেড়ে দূর মহাকাশে যাঁরা পাড়ি দিয়েছেন, সেই গাগারিন, নীল আর্মস্ট্রং, রাকেশ শর্মা প্রভৃতিরা পৃথিবীকে চাঁদের মত উজ্জ্বল রূপে দেখতে পেয়েছেন—অবশ্য আকারে তা চাঁদের থেকে আরো কিছুটা বড়, আরো ল।

জ্যোতিষ্ক হিসেবে পৃথিবী গ্রহ-শ্রেণীভুক্ত।

সূর্য এবং চাঁদ কোন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক?

সূর্য একটি তারা। হ্যাঁ, যদিও সূর্য দেখতে অন্য রকম এবং রাতের আকাশে অনুপস্থিত—তা সত্ত্বেও সূর্য একটি তারাই। তফাত এই যে, সূর্য অন্যান্য তারাদের তুলনায় আমাদের ভীষণ কাছে আছে; আর সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর এক বিশেষ সম্পর্ক আছে, যে-সম্পর্ক অন্য কোনো তারার সঙ্গে পৃথিবীর নেই।

চাঁদ একটি উপগ্রহ।

দিনের আকাশে সূর্য ছাড়া আর কোনো জ্যোতিষ্ক আছে কি? থাকলে তাদের দেখা যায় না কেন?

দিনের আকাশে সূর্য ছাড়া অন্যান্য জ্যোতিষ্ক আছে—সংখ্যায় তারা রাতের আকাশের চেয়ে কিছু কম নয়। এদের সাধারণত দেখা যায় না দু'টি কারণেঃ সূর্যের আলোর তীব্রতা, আর আমাদের ঘিরে থাকা বায়ুমণ্ডলে—বিশেষত তার নীচের দিকে ঘন স্তরগুলিতে—অসংখ্য ধূলো আর জলের কণার উপস্থিতি। এই কণাগুলোর দরুন চারিদিকে অজস্র ধারায় সূর্যের আলোর বিক্ষেপণ (Scattering) ঘটে, ফলে সরাসরি সূর্যের দিক থেকে ছাড়া অন্যান্য দিক থেকেও দিনের বেলা আমরা প্রচুর আলো পেয়ে থাকি। এই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আলো সূর্যালোকের সঙ্গে তীব্রতায় পাল্লা দিতে পারে না বলেই দিনের বেলা অন্যান্য জ্যোতিষ্করা আমাদের কাছে অদৃশ্য থেকে যায়। বিক্ষেপণের হাত থেকে মুক্ত হতে পারলে, আকাশে দৃশ্যমান সূর্য থাকা সত্ত্বেও—সূর্যের একেবারে আশেপাশে নয়, কিন্তু আকাশের অন্যান্য দিকে—বিভিন্ন জ্যোতিষ্ককে দেখা যায়। মহাকাশচারীদের সে অভিজ্ঞতা হয়েছে।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়েও কখনো কখনো দিনের আকাশে অন্য জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে আকাশ দেখার সুযোগ যাঁর পেয়েছেন, তাঁরা সেই সাক্ষ্যই দেবেন। আর চাঁদকে পূর্ণিমার আগে-পরে কয়েক দিন ধরে বিকেলে পুব আকাশে বা সকালে পশ্চিমাকাশে হামেশাই দেখা যায়। ক্বচিৎ-কদাচিৎ আরো কোনো কোনো জ্যোতিষ্ক ওইভাবে নজরে আসে।

গ্রহ প্রভৃতি অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে তুলনা করলে তারাদের বৈশিষ্ট্য কী?

তারারা বিরাট বিরাট ভরবিশিষ্ট (Massive) বস্তু; সাধারণত এরা সম্পূর্ণভাবে গ্যাসগঠিত, আকারে বিশাল, আর এরা বিপুল শক্তির উৎস। এই শক্তি নিজেদের দেহের অভ্যন্তরে এরা নিজেরাই উৎপন্ন করে। এ-থেকেই তারারা সাধারণত আলো, তাপ এবং অন্যান্য রূপে শক্তি চতুর্দিকে বিকিরণ করে।

তারাদের বর্ণনায় যে 'সাধারণত' শব্দটি বারবার ব্যবহার করতে হল, তার বিশেষ কারণ আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক তারাকে লক্ষ ক'রে তুলনা করে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তারাদের উদ্বর্তন (Evolution) আছে। বলা যায়, তারাদের জন্ম হয়, মৃত্যু হয়—এছাড়া আছে মধ্যবর্তী নানা পর্যায় বা পর্ব। ওদের জীবনের প্রতিটি পর্বে যে উল্লিখিত সব ক'টি বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, তা নয়। মৃত বা মরণাপন্ন তারারা আকারে বিশাল নয়; ওরা তখন তাপ বা আলো বিকিরণ করতে পারে না। তাই ওই 'সাধারণত'।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব অনুসারে, যে-জ্যোতিষ্ক

তারারা কি নিজেদের দেহের অভ্যন্তরে নিজেরাই শক্তি উৎপন্ন করে?

'পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়া' (Atomic fusion process)-এর মাধ্যমে তার দেহের অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদন করছে বা করেছে তা-ই হল তারা—জীবিত বা মুমূর্ষু বা মৃত।

আমাদের সুপরিচিত সূর্য হচ্ছে জীবিত তারার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সব তারা সর্বাংশে এক রকম নয়। তারা হিসেবে সূর্যের স্বরূপ কি?

উদ্বর্তনের পথে তারাদের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা আছেই, তা ছাড়াও যে-কোনো দু'টি তারার মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি প্রভেদ থাকতে পারে।

আমাদের সূর্যের যা দৈহিক গঠন তাতে বলা যায় যে, সূর্যের বয়স হল 500 কোটি বছর। (তাই বলে সূর্যকে বুড়ো থুত্থুড়ে বলা ঠিক হবে না কিন্তু; শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সূর্য এখনও হেসে খেলে 1000 কোটি বছরেরও বেশি বেঁচে থাকবে।) কিন্তু এমন তারাদের কথাও বিজ্ঞানীদের জানা আছে যারা জীবনের পথে আরো অনেকটা এগিয়ে গেছে। আবার নবীন তারাও আছে। খুব সম্প্রতি—1986 সালে—অফিউকাস (Ophiuchus) মণ্ডলের মধ্যে একটি

আর্দ্রা তারার ব্যাস সূর্যের কত গুণ?

তারা আবিষ্কৃত হয়েছে যার বয়স হয়েছে মাত্র 30 হাজার বছরের মত। এটিই আবিষ্কৃত তারাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

সূর্যের ভর কম-বেশি 2×10^{30} কিলোগ্রাম, যেখানে পৃথিবীর ভর 6×10^{24} কিলোগ্রামের একটু কম। তার মানে দাঁড়াচ্ছে 3,33,333 টি পৃথিবীকে এক করলে তবে সূর্যের ভরের প্রায় সমান হয়! আকার বা আয়তনের দিক থেকে তুলনা করলে, সূর্যের স্থান আরো অনেক উপরে। সূর্যের ব্যাস প্রায় 13,92,000 কিলোমিটার (বা 8,64,951 মাইল), আর পৃথিবীর ব্যাস প্রায় 12,765 কিলোমিটার (বা 7932 মাইল); অতএব ব্যাসের দিক থেকে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় 109 গুণ বড়। ফলে সূর্যের মধ্যে পৃথিবীর স্থান হতে পারে 10,00,000 বারেরও বেশি।

উল্লিখিত সংখ্যাগুলো সূর্য সম্পর্কে কিছু পরিচয় বহন করছে। ওগুলো চোখ কপালে তোলার মত সংখ্যা। কিন্তু এমন সব তারার কথাও বিজ্ঞানীদের জানা আছে যাদের কথা শুনলে যাকে বলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়।

সূর্যের চেয়ে দু'চার শো গুণ বড় ব্যাসবিশিষ্ট তারা তো অনেক আছেই, তার চেয়ে অনেক বড় তারাও কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে আর্দ্রা, বিদেশে বেটল্‌জিয়ুজ (Betelgeuse) নামে সুপরিচিত তারাটির ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় 800 গুণ। এর মধ্যে সূর্যের স্থান হবে 50,00,00,000 বারেরও বেশি। আরো অন্তত দু'টি তারা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেগুলো বৃহত্তর।

আয়তনের দিক থেকে তারাদের মধ্যে যে তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে, ভরের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তবু সূর্যের চেয়ে 50 গুণেরও বেশি

ভরযুক্ত অন্তত দু'টি তারা যে আছে, তা জানা গেছে। পরস্পরের খুব কাছাকাছি থেকে এরা একটি 'যুগ্মতারা' (Binary star) গঠন ক'রে আছে। আবিষ্কারকের নামে তারা দু'টিকে এক যোগে নাম দেওয়া হয়েছে 'প্লাস্কেটের তারা' (Plaskett's star)।

কিন্তু সূর্য যে সবার তুলনায় হেরে যাওয়া তারা, তা নয়। সূর্যের চেয়ে ছোট মাপের বা কম ভরের তারার খোঁজ-খবরও পাওয়া গেছে। খুব ছোট মাপের তারাদের একটা পুরোদলই আছে যাদের বলা হয় 'বামন' (Dwarf)। এ-তারাগুলো অবশ্য সবাই মৃত্যুর পথে কম-বেশি পা বাড়িয়ে বসে আছে। অমন তারাদের মধ্যে একটির ব্যাস প্রায় 1700 কিলোমিটার (বা 1056 মাইল)। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এটি এল পি 327-16 (LP 327-16) নামে পরিচিত। বামন কিন্তু এখনও আলো পাঠাতে সক্ষম এমন তারাদের মধ্যে এটিই সম্ভবত ক্ষুদ্রতম।

সুতরাং তারা হিসেবে সূর্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তালিকায়, 'লাস্ট বয়'-ও নয়, 'ফার্স্ট বয়'-ও নয়। সূর্য এক মাঝারি তারা—মোটামুটি ভালভাবে পাশ করা ছেলে।

সূর্যকে আমাদের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বলে মনে হলেও বাস্তবে সূর্য কি সর্বোজ্জ্বল?

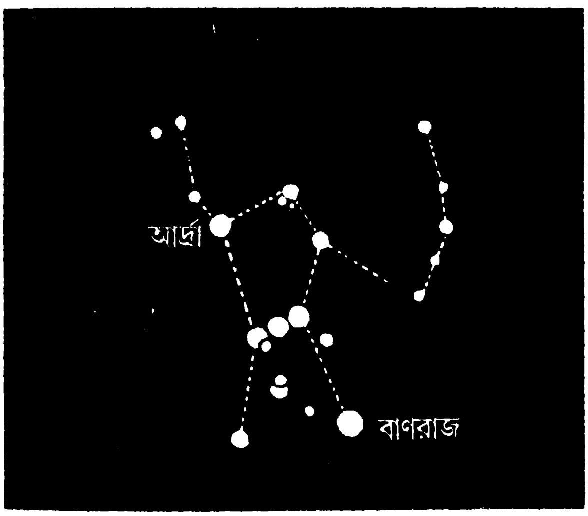
সূর্যকে যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বলে মনে হয়, চক্ষুষ্মান কোনো মানুষেরই তা অস্বীকার করার জো নেই। কিন্তু যা মনে হয়, আর যা আসলে সত্যি—এ দু'য়ের মধ্যে অনেক সময়েই মিল থাকে না। একটি প্রদীপ শিখা চোখের কাছে থাকলে বেশ উজ্জ্বল লাগতে পারে। কিন্তু কয়েক গজ দূর থেকে তাকেই টিমটিম করতে দেখা যায়; আর দূরত্বটা যথেষ্ট বেশি হলে তাকে আর দেখাই যায় না। জ্যোতিষ্কদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনুরূপ। খুব কাছে থাকার সুবিধেটা ভোগ করে বলে—আর ঔজ্জ্বল্যের সম্পদে বাস্তবে খুব দরিদ্র না-হওয়ার কারণেও কিছুটা—সূর্য আমাদের কাছে উজ্জ্বলতম বলে প্রতিভাত হয়। আসলে এমন অনেক তারা রয়েছে যারা সূর্যের চেয়েও বহুগুণ উজ্জ্বলতর। বাণরাজ বা রাইগেল (Rigel) তারাটি বোধহয় অনেকের কাছেই অচেনা নয়। এটি সাধারণ মানুষের আপাত বিচারে রাতের আকাশের এক মোটামুটি উজ্জ্বল তারা বলে পরিগণিত হয়ে



থাকে—এর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল তারা রাতের আকাশে গোটা দশেক পাওয়া যাবে। কিন্তু যে-কথাটা সাধারণ মানুষের প্রায় সবারই অজানা সেটা এই যে, বাণরাজের স্থান প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক উপরে। বাণরাজ আসলে রাতের আকাশে খালি চোখে দেখতে পাওয়া তারাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম এবং দিনের আকাশের সূর্যের চেয়ে কমপক্ষে 50,000 গুণ উজ্জ্বলতর। গভীর দক্ষিণের আকাশে একটি তারা আছে

রাতের আকাশে খালি চোখে দেখা তারাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম কোনটি?

(অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের মাথার উপরের আকাশে), নাম 'এস ডোরাডাস' (S Doradus), সেটির ঔজ্জ্বল্য সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রায় 10,00,000 গুণ। কিন্তু সুবিশাল দূরত্বে থাকার দরুণ সেটিকে খালি চোখে পৃথিবী থেকে উজ্জ্বল রূপে তো দূরের কথা, কোনো রূপেই দেখা যায় না। শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে



কালপুরুষ তারকামণ্ডল

দেখতে হয়, তারপরে হিসেবপত্র ক'রে ওর প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপ করতে হয়—যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা করেছেন। এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জানা সর্বোজ্জ্বল দু' একটি তারার অন্যতম।

কিন্তু এই দু' একটি তারাও আকাশের সর্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে দাবি করতে পারে না। সে-মর্যাদা কোনো তারার নয়—সেটা কোয়েসার নামের জ্যোতিষ্কদের প্রাপ্য।

রাতের আকাশে আপাতদৃষ্টিতে উজ্জ্বলতম তারা কাকে বলা হয়?

দূরত্বের দ্বারা কী-ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে সে-হিসেব না করলে (অর্থাৎ যেমন দেখাচ্ছে তার ভিত্তিতে বিচার করলে), রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম তারা যেটি, ভারতবর্ষে তার নাম হচ্ছে 'লুব্ধক', ইউরোপে 'সিরিয়াস' (Sirius)। এটি পৃথিবীর নিকটতম তারাদের মধ্যে একটি।

আকাশে মোট কত তারা আছে?

অনেক সাধারণ মানুষ মনে করেন, আকাশে অগণ্য তারা আছে, কথাটা এক হিসেবে ঠিক, আবার এক হিসেবে ঠিক নয়ও বটে।

সাধারণ মানুষ যখন খালি চোখে আকাশ দেখেন তখন সত্যিই যে-অসংখ্য তারা দেখতে পান, তা নয়। সীমিত সংখ্যার তারা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে কী-রকম এক দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়—মনে হয় ওরা সংখ্যার অতীত। আসলে কিন্তু একজন স্বাভাবিক সুস্থ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ খালি চোখে দেখতে পান 5000-এর মত তারা—তার বেশি তো নয়ই, বরং কিছু কম। কিছু মানুষ আছেন যাঁদের দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। তাঁদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা কিছু বেশি—কিন্তু তা-ও হাজার ছয়েকের ওপরে নয়। এ-সব অবশ্য সারা বছর ধ'রে আকাশ দেখার হিসেব—অর্থাৎ ঋতুভেদে আকাশে যে ভিন্ন ভিন্ন তারার দল দেখা দেয়, তাদের সবাইকে ধ'রে। নইলে কোনো এক রাতে কোনো এক সময়ে দেখা তারার সংখ্যা হয় আরো অনেক কম— 2500 থেকে 3000-এর মত।

আরো একটা কথা আছে। প্রদত্ত হিসেবটা পৃথিবীর নিরক্ষীয় বা তারই নিকটবর্তী অঞ্চলগুলো সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেউ যদি মেরু অঞ্চল থেকে আকাশ দেখেন, তাহলে সারা বছর ধরে আকাশ দেখেও তাঁর বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। কোনো এক রাতে তিনি ওই 2500 থেকে 3000-এর মত তারা দেখবেন এবং ওখানকার পরবর্তী প্রতি রাতেই তা-ই দেখবেন—হয়তো-বা উনিশ-বিশের মত তফাত হতে পারে, তার বেশি নয়।

এ-সব কিন্তু খালি চোখে আকাশ দেখার কথা। দূরবিন ব্যবহার করলে সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যাবে—দূরবিনের শক্তিবৃদ্ধি অনুসারে, ক্রমশ আরো, আরো। দূরবিন দিয়ে সরাসরি দেখা ছাড়া, বিজ্ঞানীরা একাধিক পরোক্ষ কৌশলও ব্যবহার করেন—যেমন দূরবিনযুক্ত ক্যামেরার সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করা। এতে চোখের পর্দায় সাড়া জাগাতে পারে না এমন অনেক ক্ষীণ তারাও ধরা পড়ে যায়।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সব রকম কৌশল অবলম্বনে প্রাপ্ত তারার সংখ্যা নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। আর কৌশল ক্রমশ যত উন্নততর হচ্ছে ততই আবিষ্কৃত তারার সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে—বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অনাবিষ্কৃত অনেক তারা থাকার সমূহ সম্ভাবনা। অতএব বলা যায়, তারারা অসংখ্য।

সূর্যের পরেই আমাদের নিকটতম তারার নাম কী? সূর্যের তুলনায় তার দূরত্ব কত বেশি?

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পর্যায়ক্রমে অল্প পরিমাণে কমে বাড়ে। গড়ে দূরত্বটা হয় প্রায় 14,95,97,000 কিলোমিটার (9,29,55,497 মাইল)। এমন বিরাট সংখ্যা

পৃথিবীর দ্বিতীয় নিকটতম তারার মর্যাদা কার?

ব্যবহার করা অসুবিধেজনক; তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক কৌশল অবলম্বন করেন। ওঁরা বলেন যে আলো, যার গতিবেগ হচ্ছে এক সেকেণ্ডে প্রায় 3,00,000 কিলোমিটার (1,86,000 মাইল), সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় প্রায় 8 মিনিট। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এতে সংখ্যা সহজবোধ্য এবং কাজকর্মের পক্ষে অনেক সুবিধেজনক হয়ে যায়, কিন্তু দূরত্বের পরিচয়টা সঠিক ভাবেই দেওয়া সম্ভব হয়—শুধু যদি আলোর গতিবেগের মাপটা মনে রাখা যায়।

সূর্যকে বাদ দিলে আমাদের নিকটতম তারা হল 'প্রক্সিমা সেন্টরাই' (Proxima Centauri)। ওখান থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোর সময় লাগে প্রায় 4.28 বছর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় এ হল 4.28 'আলোকবর্ষ' (Light-year) দূরত্ব। আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য এককে এ-দূরত্ব হল প্রায় 4055536,80,00,000 কিলোমিটার (2520000,00,00,000 মাইল)—শব্দে বললে 40 লক্ষ 55 হাজার 5 শো 36 কোটি 80 লক্ষ কিলোমিটার (25 লক্ষ 20 হাজার কোটি মাইল)। আলোর গতিবেগের পরিমাপকে ব্যবহার করলে জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরত্বকে অনুধাবন করা বা প্রকাশ করা যে কত সহজতর হয়ে যায়, এই দৃষ্টান্তটি থেকে তা বোঝা যায়।

প্রক্সিমা সেন্টরাই থেকে অল্প একটু বেশি দূরত্বে অন্য দু'টি তারা আছে। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'আল্‌ফা সেন্টরাই এ' (Alpha Centauri A) ও 'আল্‌ফা সেন্টরাই বি' (Alpha Centauri B)। পরস্পরের খুব কাছাকাছি আছে বলে এই দু'টি তারারই দূরত্ব পৃথিবী থেকে সমান—4.38 আলোকবর্ষ। এদের দু'টিকেই পৃথিবীর (সূর্যকে বাদ দিয়ে) দ্বিতীয় নিকটতম তারার মর্যাদা দেওয়া হয়।

পৃথিবী থেকে শেষোক্ত তারা দু'টির দূরত্ব প্রক্সিমা সেন্টরাইয়ের চেয়ে প্রায় 0.1 আলোকবর্ষ বেশি—অর্থাৎ 96,000 কোটি কিলোমিটারের (60,000 কোটি মাইলের) মত বেশি। তবু কিন্তু প্রক্সিমা সেন্টরাইকে খালি চোখে দেখা যায় না—শক্তিশালী দূরবিন লাগে—অথচ উল্লিখিত অপর দু'টিকে খালি চোখে দেখা তো যায়ই, বরং বেশ উজ্জ্বলরূপেই তা নজরে আসে। অবশ্য এদের একত্রে একটি তারা বলেই মনে হয়।

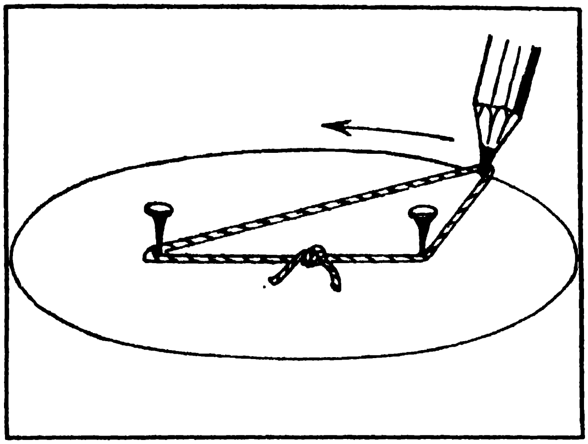
গ্রহ—এই নামটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কাদের সম্পর্কে ব্যবহার করেন?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা অনুসারে গ্রহ এমন এক জ্যোতিষ্ক যা কোনো এক তারার আকর্ষণে তার চারপাশে ঘোরে। এই ঘোরার কতকগুলো নিয়ম-কানুন আছে। আবিষ্কারক এক জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নামানুসারে

[illegible]

সেগুলোকে বলা হয় 'গ্রহগতির কেপলারীয় বিধি' (Kepler's laws of planetary motion)। গ্রহগুলো এই বিধি মেনে চলতে বাধ্য।

উল্লিখিত সংজ্ঞার সঙ্গে গ্রহদের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের



পেন্সিলে ঘোরালেই তৈরি হবে উপবৃত্ত-গ্রহের কক্ষপথ

কথাও উল্লেখ করা অবশ্য প্রয়োজন। নয়তো ধূমকেতু বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ তারাও গ্রহ নামের দাবিদার হয়ে উঠতে পারে। প্রথমত, গ্রহরা বিরাট ভরবিশিষ্ট নয়, ফলে পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়ায় এরা কখনো শক্তি উৎপাদন করতে পারে না। তাই গ্রহরা অবশ্যই তারা নয়। দ্বিতীয়ত, গ্রহরা সম্পূর্ণত বা মূলত কঠিন পদার্থে গঠিত, ফলে এরা অন্তত মোটামুটিভাবে সুদৃঢ় (Rigid)—সহজে এদের আকার-আকৃতির বড় রকমের পরিবর্তন হতে পারে না। অতএব গ্রহরা ধূমকেতুদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ে না।

গ্রহদের নিজস্ব আলো থাকে না। এদের দেখতে বেশ উজ্জ্বল হতে পারে, কিন্তু সে-ঔজ্জ্বল্যের কারণ সংশ্লিষ্ট তারাটি থেকে পাওয়া আলোর এক ধরনের প্রতিফলন।

একটি গ্রহ যে-কোনো একটি তারাকে পরিক্রমণ করতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত যে কয়েকটি গ্রহ সুনিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো সব একটি বিশেষ তারাকেই শুধু পরিক্রমণ করছে। সে-তারাটি সূর্য। অতএব আবিষ্কৃত গ্রহগুলো সব আমাদের সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবী ছাড়া আর কতগুলো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে?

এখন পর্যন্ত সন্দেহাতীত ভাবে আবিষ্কৃত গ্রহের মোট সংখ্যা 9—অতএব পৃথিবীকে বাদ দিলে ৪। এদের নাম (পৃথিবীকে ছেড়ে) ঃ বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune) ও প্লুটো (Pluto)।

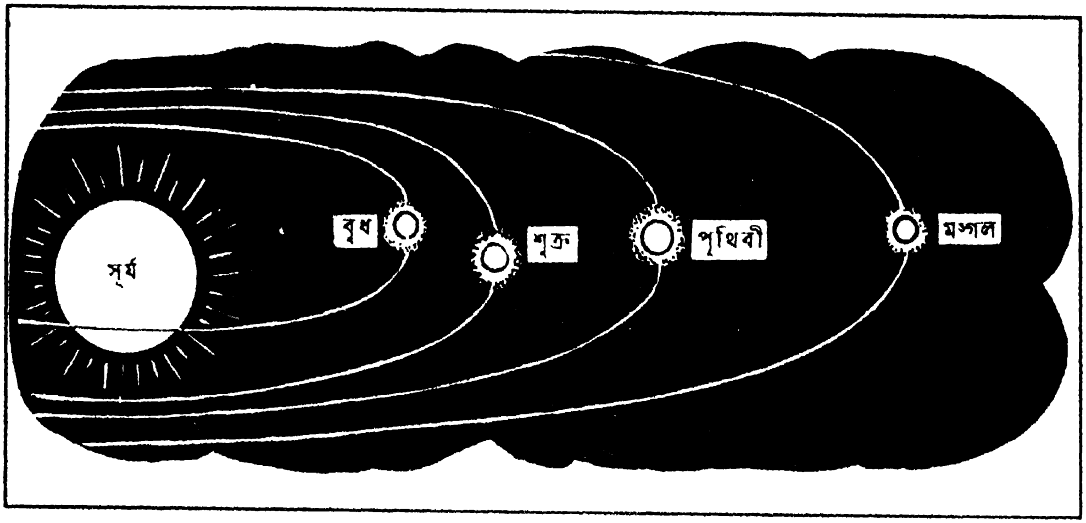
গ্রহগুলো প্রায় একই সমতলে (Plane) ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে আছে। এরা প্রায় বৃত্তাকৃতি পৃথক পৃথক কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এই পথ আসলে উপবৃত্তাকৃতি, কিন্তু বৃত্তের আকৃতি থেকে এদের বিচ্যুতি কোনো ক্ষেত্রেই খুব বেশি নয়।

গ্রহদের পরিক্রমণ পথগুলো নিখুঁতভাবে বৃত্তাকৃতি না-হওয়ায়, সূর্য থেকে যে-কোনো গ্রহের দূরত্ব সব সময়ে সমান থাকে না—পর্যায়ক্রমে অল্প পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সাধারণত সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্ব বলতে তাদের গড় দূরত্বকে বোঝানো হয়। সূর্য থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুসারে সাজালে গ্রহদের (গড়) দূরত্বগুলো হচ্ছে ঃ

গ্রহ	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (প্রায়)	
	কিলোমিটার	মাইল
বুধ	5,79,00,000	3,59,77,481
শুক্র	10,82,00,000	6,72,32,530
পৃথিবী	14,95,97,000	9,29,55,497
মঙ্গল	22,79,40,000	14,16,35,700
বৃহস্পতি	77,83,40,000	48,36,39,250
শনি	142,70,00,000	88,66,98,890
ইউরেনাস	286,96,00,000	178,30,91,200
নেপচুন	449,67,00,000	279,41,26,700
প্লুটো	590,00,00,000	366,60,99,100

গ্রহগুলো কবে, কে আবিষ্কার করেছিলেন?

বুধ থেকে শনি পর্যন্ত 6টি গ্রহ বিস্মৃত কোন অতীত কালেই ভারতবর্ষ, গ্রিস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থানগুলোতে তারা থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কোথায় আগে, কোথায় পরে, স্বাধীন চিন্তার ফলে অথবা পারস্পরিক চিন্তা-বিনিময়ের মাধ্যমে এ-সব প্রশ্নের উত্তরও জানা নেই। অতএব ওদের ক্ষেত্রে কোনো ইতিহাস নেই। পৃথিবী সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে, পোল্যাণ্ডের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কোপারনিকাস ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবী যে-একটি গ্রহ তা প্রতিষ্ঠা করেন।



ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কৃত হয় 1781 সালে। আবিষ্কর্তার নাম উইলিয়ম হার্শেল। ইনি জন্মসূত্রে জার্মান কিন্তু পরবর্তী কালে দীর্ঘ বসবাস এবং কর্মসংস্থানের সূত্রে ইংরেজ বলেই স্বীকৃত।

নেপচুন আবিষ্কৃত হয় 1846 সালে। আবিষ্কারের কৃতিত্বটা বিজ্ঞান-ঐতিহাসিকরা দু'জন তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে যৌথভাবে দিয়ে থাকেন—ফরাসি দেশের ল্যাভেরিয়ে আর ইংল্যাণ্ডের জন অ্যাডামস্। ইউরেনাস গ্রহের পরিলক্ষিত কিছু বিশৃঙ্খলার কারণে এঁরা দু'জনেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, ইউরেনাসের পরে আরো একটি গ্রহ আছে। সেইমত অনেক হিসেব-নিকেশ করে এঁরা স্থির করেন, আকাশে কবে, কোথায় তার দেখা মিলতে পারে। দু'জনেই অতঃপর দু'জন বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে সে-সব কথা জানান, আর অনুরোধ করেন তাঁদের তত্ত্বাবধানে যে-সব বড় বড় দূরবিন আছে তাদের সাহায্যে গ্রহটিকে খোঁজার চেষ্টা করতে। অ্যাডামসের দুর্ভাগ্য, তাঁর অনুরোধ রক্ষায় বড় ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীটি প্রচুর কালক্ষেপ করেন। ল্যাভেরিয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গালে, যাঁর কাছে ল্যাভেরিয়ে তাঁর কাগজপত্র পাঠিয়েছিলেন, সেইদিনই রাত্রে চেষ্টা করেন এবং নেপচুনকে প্রথম চাক্ষুষ করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য।

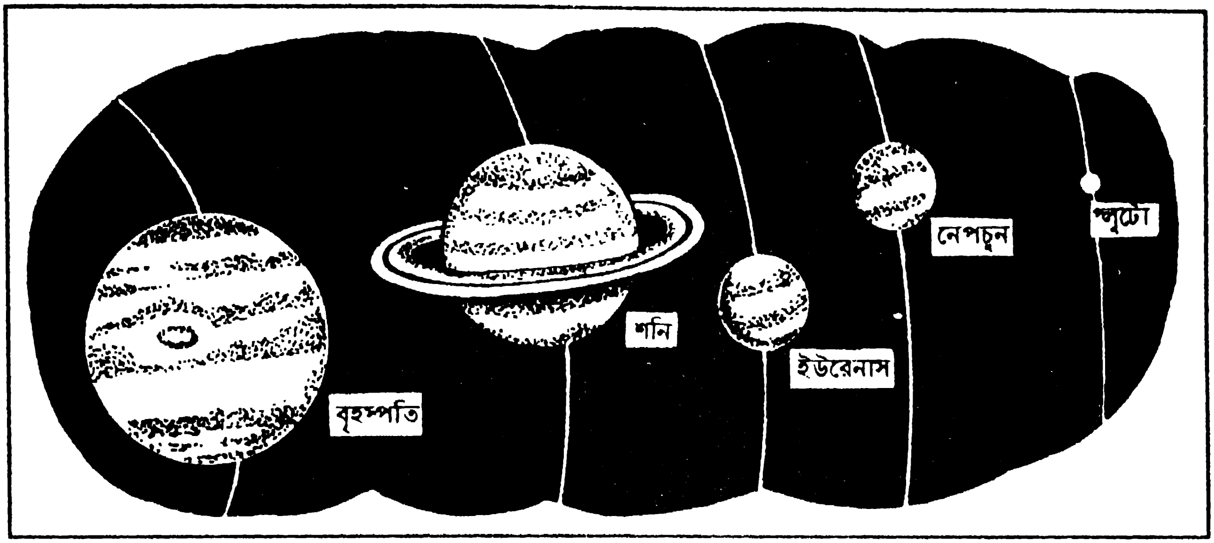
প্লুটো আবিষ্কৃত হয় 1930 সালে। নেপচুনের মত এ-ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণের আগে অঙ্ক কষে এর অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। সে-হিসেবপত্র করেন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল। প্লুটো গ্রহ খুব ছোট আর খুব দূরবর্তী, ফলে খুবই অনুজ্জ্বল। তাকে খুঁজে পাওয়াটা তাই ছিল সবচেয়ে দুরূহ। লোয়েলের গণনার যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে তাই বেশ দেরি হয়। যিনি প্রথম গ্রহটিকে প্রত্যক্ষভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন তিনি ছিলেন এক তরুণ মার্কিন বিজ্ঞানী ক্লাইড টম্‌ব।

প্লুটো কি খুব ছোট গ্রহ?

ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো গ্রহ আবিষ্কার করতে অন্যান্য গ্রহের তুলনায় দেরি হওয়ার কারণ কী?

অন্যান্য গ্রহগুলোকে খালি চোখেই দেখা যায় এবং তারা বেশ চোখে পড়ার মত। ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো গ্রহ সম্পর্কে কিন্তু সে-কথা খাটে না।

নেপচুন ও প্লুটোকে দূরবিন ছাড়া দেখা অসম্ভব। ইউরেনাসের অবস্থাও প্রায় তাই। আকাশের কোথায় আছে আগে থেকে জেনে নিয়ে সেই দিকে ভালভাবে লক্ষ করলে—যদি দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ হয় এবং পরিবেশ দেখার পক্ষে খুবই অনুকূল হয় তবেই—কখনো সখনো অস্পষ্ট আবছা রূপে কেউ কেউ এই গ্রহটিকে খালি চোখে দেখতে পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ-দেখা প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। তাই দূরবিন উদ্‌ভাবিত হওয়ার আগে এই গ্রহ তিনটির



আবিষ্কারেব পথ রুদ্ধ ছিল।

গ্রহদের গ্রহ বলে চেনার কোনো সহজ উপায় আছে কি? সুপ্রাচীন কালে বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহ যে তারা থেকে ভিন্ন তা বোঝা গিয়েছিল কী-ভাবে?

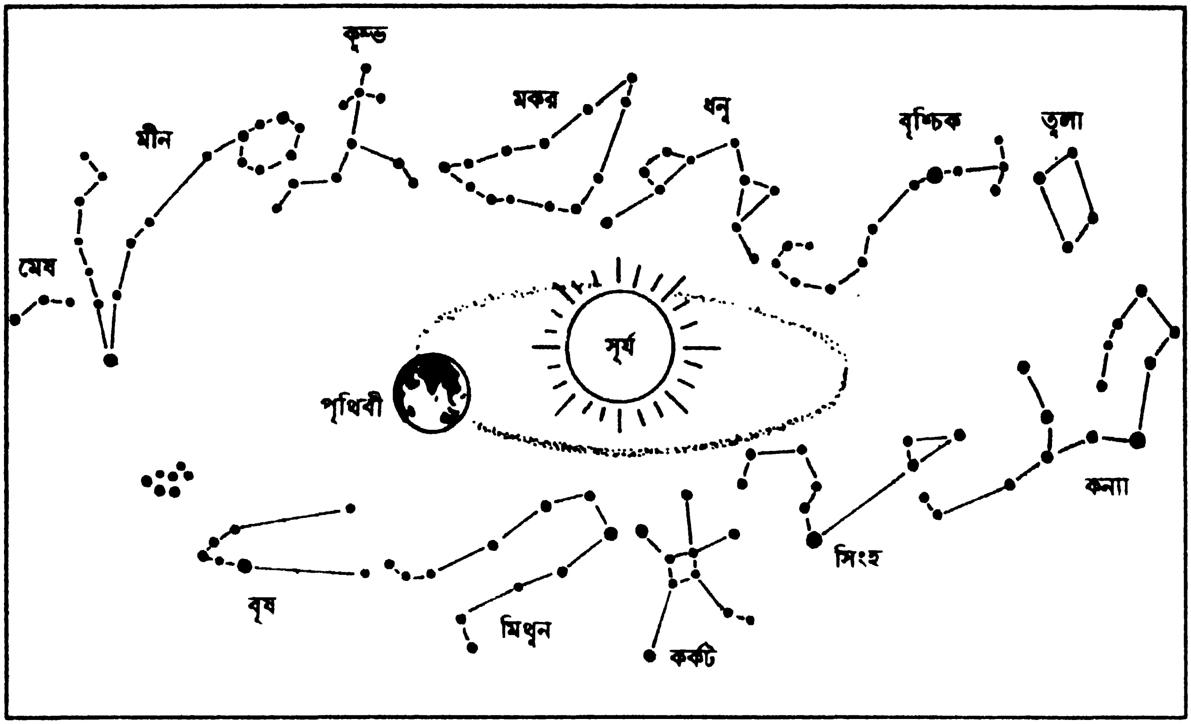
তারারা সাধারণ অবস্থায় সম্পূর্ণত গ্যাস-গঠিত, গ্রহরা তা নয়। তারাদের নিজস্ব আলো থাকে, গ্রহদের আলো তারার কাছ থেকে ধার করা। এই ধরনের পার্থক্য তারা আর গ্রহদের মধ্যে আরো বেশ কয়েকটি আছে। এগুলো অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এগুলো প্রকৃতিগত (Physical) পার্থক্য এবং বুঝতে পারা সহজবোধ্য নয়। মানুষ এগুলোর কথা সম্যকভাবে জেনেছে গত দেড়-শো থেকে দু'শো বছরের মধ্যে। কারণ বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) এবং পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান ছাড়া এই পার্থক্যগুলো বুঝতে পারা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু তারা আর গ্রহদের মধ্যে অন্য ধরনের কতকগুলো পার্থক্য আছে, যাদের বলা যেতে পারে রূপগত (Visual) পার্থক্য। সেই পার্থক্যগুলোর ভিত্তিতে সুদুর অতীতে গ্রহদের প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা গিয়েছিল এবং আজও আগ্রহী কোনো মানুষ চিনে নিতে পারেন।

যদিও কিছু ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সাধারণভাবে তারাদের তুলনায় গ্রহদের দেখতে কিছুটা উজ্জ্বলতর এবং বৃহত্তর লাগে। বেশ উঁচু পাহাড়ী জায়গা থেকে না-দেখলে, তারার আলো মিটমিট করে বা দপদপ করে, কিন্তু গ্রহের আলো তা করে না। অর্থাৎ তারার আলো কম্পমান, গ্রহের আলো স্থির। তারারা আকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—আকাশের এমন কোনো অংশ নেই যাকে নির্দেশ করে বলা যায় ওখানে কোনো তারা থাকতে পারে না। কিন্তু গ্রহদের সম্পর্কে—অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রহদের সম্পর্কে—এমন উক্তি করা সম্ভব। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে হলে, আকাশে মোটামুটিভাবে পশ্চিম থেকে পুবে প্রসারিত এক ফালি জায়গা আছে—জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন 'রাশিচক্র' (Zodiacal belt)—গ্রহদের দেখা শুধু সেই জায়গার মধ্যে মিলতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথাটা এই যে, তারারা আকাশে আপেক্ষিকভাবে (Relatively) স্থির, গ্রহরা ভ্রাম্যমাণ।

গ্রহদের কি আকাশের যে কোনো জায়গায় দেখা যেতে পারে?

শেষোক্ত পার্থক্যটা যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অতএব কথাটা বেশ ভালভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। রাতের আকাশে তারারা ক্রমশ পুব থেকে পশ্চিমে সরে যায় বটে, কিন্তু সে-সরে যাওয়া দিকচক্র (Horizon)-এর সঙ্গে তুলনা ক'রে—ওদের নিজেদের মধ্যে তুলনামূলক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। যদি দেখা যায় সন্ধ্যাকাশে পুব দিকে দুই বা ততোধিক তারা একটি সরলরেখা বা ত্রিভুজ জাতীয় কোনো এক জ্যামিতিক ক্ষেত্র রচনা ক'রে রেখেছে, তাহলে বেশি রাতে দেখা যাবে ওই রেখাটি বা ওই ক্ষেত্রটি পশ্চিম



আকাশে রাশিচক্রের বিভিন্ন রাশির অবস্থান

দিকে অবিকৃতভাবে সরে গেছে—সংশ্লিষ্ট তারাগুলোর মধ্যে বিন্যাস বা দূরত্বের কোনো পরিবর্তন না-ঘটিয়ে। কথাটা কেবল বিশেষ একটি রাত সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়—রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ব্যাপারটা সমানে ওই-ভাবেই ঘটে চলেছে। মনে হয়, তারারা যেন পরস্পরের সঙ্গে এক সুদৃঢ় বন্ধনে যুক্ত—ওরা সরে যায় এক সঙ্গে, দলবদ্ধভাবে। কিন্তু এই ব্যাপারে গ্রহদের আচার-আচরণ অন্য রকম। কোনো এক রাতে যদি একটি গ্রহ দু'টি তারা থেকে সমদূরবর্তী থাকে, তবে কয়েক রাত পরে—সেটা মাত্র দু'চার রাত হতে পারে বা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে—অবশ্যই দেখা যাবে যে, তারাগুলোর সঙ্গে গ্রহটির তুলনামূলক দূরত্বের পরিবর্তন ঘটে গেছে। যদি তিনটি তারা মিলে একটি ত্রিভুজ গঠন ক'রে থাকে আর একটি গ্রহকে কোনো এক রাতে সেই ত্রিভুজের ভেতরে অবস্থান করতে দেখা যায়, তবে কয়েক রাত পরে দেখা যাবে, তারাগুলোর দ্বারা রচিত ত্রিভুজটি ঠিক পূর্বের আকার-আকৃতিতেই আছে কিন্তু গ্রহটির স্থানান্তর ঘটেছে— হয়তো ত্রিভুজের বাইরেই চলে গেছে।

তারাদের আপেক্ষিক নিশ্চলতা সম্পর্কে যা বলা হল, দীর্ঘকাল ধরে তা নিখুঁত সত্য বলে বিবেচিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে, তারাদের ক্ষেত্রেও সামান্য কিছু অবস্থানগত বিচ্যুতি ঘটতে

তারাদের তুলনামূলক অবস্থানের কি কোনো পরিবর্তন হয়?

পারে বা ঘটে—কিন্তু তা এত সামান্য যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝতে পারা তো একেবারেই অসম্ভব, বিজ্ঞানীদের পক্ষেও সহজবোধ্য নয়। অপরপক্ষে গ্রহদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা খুব বেশি এবং অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দ্রুত—এমন যে, সামান্য একটু মনোযোগী হলে, সাধারণ মানুষেরও চোখে না-পড়ে যায় না।

গ্রহদের এই বৈশিষ্ট্যই সুপ্রাচীন কালে গ্রিস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে আকাশ-পর্যবেক্ষকদের বিশেষ ভাবে চোখে পড়েছিল। এটাই যেন ওঁদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ওরা তারা নয়, ওরা অন্য শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক। ওরাই হল গ্রহ।

আজও, বিশেষজ্ঞ না হয়েও যে-কোনো পর্যবেক্ষক কয়েক রাত পর পর একটু মন দিয়ে লক্ষ করলেই এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তারা থেকে গ্রহদের পৃথক করে চিনে নিতে পারেন।

সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা 9, এই সিদ্ধান্তে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কি ভাবে উপনীত হয়েছিলেন?

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ইউরেনাস, নেপচুন বা প্লুটো গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত ছিলেন না। এমন-কি পৃথিবীও ওঁদের কাছে গ্রহ বলে স্বীকৃত ছিল না। এ-কথা গ্রিস প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন সভ্য দেশগুলো সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সে-হিসেবে প্রাচীনকালের গ্রহ-তালিকায় বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি, এই 5টি গ্রহেরই শুধু স্থান হওয়ার কথা। কিন্তু তখন 'গ্রহ' (Planet) শব্দটির সংজ্ঞা ছিল কিছুটা ভিন্ন। গভীর প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুধাবন করতে অক্ষম সে-যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কতকগুলো বাহ্য বা অপ্রধান লক্ষণের সাহায্যে গ্রহ চিহ্নিত করতেন।

জ্যোতিষ্ক-বিচারে সে-যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রধান মানদণ্ড ছিল স্থিরতা বা অস্থিরতা। ওঁদের ধারণা ছিল, তারারা আকাশে আপেক্ষিকভাবে স্থির কিন্তু ওইভাবে গড়ে ওঠা স্থির পটভূমিতে গ্রহরা ভ্রাম্যমাণ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও কথাটা গ্রহদের সম্পর্কে সত্য

রাহু আর কেতু কি দু'টি গ্রহ?

বটে, কিন্তু ভ্রাম্যমাণ হয়েও একটি জ্যোতিষ্ক গ্রহ নাও হতে পারে। এর খুব সহজ দৃষ্টান্ত হল সূর্য, চন্দ্র, ধূমকেতু এবং উল্কা। ধূমকেতু এবং উল্কাদের অবশ্য আর সব কিছুই অন্য রকম। তাই ওদের বাদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সূর্য এবং চন্দ্রকে প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রহ বলে গণ্য করা হত। একই ঘটনা প্রাচীন গ্রিসেও ঘটেছে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনির সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্রকে যুক্ত করলে সংখ্যাটা 7-এ দাঁড়ায়, 9 তো হয় না। আরো দু'টি গ্রহ প্রাচীন ভারতীয়েরা পেলেন কোথা থেকে?

প্রাচীন ভারতের আরো দুই তথাকথিত গ্রহ হল 'রাহু' আর 'কেতু'। রাহু, কেতু আসলে কোনো গ্রহ তো নয়ই এমন কি ওরা বাস্তব অস্তিত্ব-সম্পন্ন কোনো জ্যোতিষ্কই নয়। প্রকৃতপক্ষে রাহু ও কেতু দু'টি জ্যামিতিক বিন্দু—চন্দ্রের গতিপথে বিন্দু দু'টির অবস্থিতি। এদের দেখার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, গণনা করে এদের অবস্থান নির্ণয় করতে হয়। রাহু ও কেতু কিন্তু স্থির নয়। তারাদের সঙ্গে তুলনা করলে এদের অবস্থান ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল। সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ (Eclipse)-সংক্রান্ত নানা গণনায় রাহু ও কেতুর অবস্থান নির্ণয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ওই বিন্দু দ'টিকে গ্রহের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাই ওঁদের তালিকায় গ্রহ হয় 9টি—পাঁচটি প্রকৃত গ্রহ, একটি তারা, একটি উপগ্রহ এবং দুটি কল্পিত গ্রহ।

ভারতীয় নবগ্রহের ধারণা অতএব কোনো রহস্যময় ঘটনা নয়—এক বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গিপ্রসূত সমাপতন (Coincidence)-এর ঘটনা মাত্র।

গ্রহগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড়, আর কোনটি ছোট? এর মধ্যে পৃথিবীর স্থান কোথায়?

গ্রহদের মধ্যে প্রায় সব বিষয়েই বৃহস্পতি হচ্ছে বৃহত্তম বা গরিষ্ঠ।

ব্যাসের কথা ধরা যাক। গ্রহগুলো সবই মোটামুটি গোলাকৃতি, কিন্তু (ঘূর্ণনের ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক) ওদের সবার নিরক্ষীয় ব্যাস, অর্থাৎ পুব-পশ্চিম দিকের ব্যাস, উত্তর-দক্ষিণ দিকের ব্যাসের চেয়ে অল্প একটু বড়। এখন বৃহস্পতির নিরক্ষীয় ব্যাস হচ্ছে প্রায় 1,42,200 কিলোমিটার (বা 88,359 মাইল), যেখানে পৃথিবীর ওই দিক বরাবর ব্যাসের মাপ প্রায় 12,756 কিলোমিটার (বা 7926 মাইল)। তার মানে বৃহস্পতি এমন চওড়া যে পৃথিবীকে পাশাপাশি 11 বার বসালেও ঠিক তার সমান হয় না—একটু কম পড়ে। আবার, শুধু চওড়ায় নয়, সব দিক থেকে, অর্থাৎ মোট আয়তনের দিক থেকে যদি বিচার করি? তাহলে দেখা যাবে বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে প্রায় 1386 গুণ বড়, অর্থাৎ বৃহস্পতির মাপের একটি গোলকের মধ্যে

পৃথিবীকে 1386 বার রাখা যাবে। বারবার পৃথিবীকে ব্যবহার না-ক'রে যদি অন্যান্য গ্রহদেরও ব্যবহার করতে চাই, তাতেও বৃহস্পতির আপত্তি নেই—বাকি ৪টি গ্রহের সবাইকে বৃহস্পতি এক সঙ্গে তার দেহের আয়তনের মধ্যে পুরে ফেলতে পারে।

বৃহস্পতির ভরের হিসেবটা এই রকম। বৃহস্পতির ভর প্রায় 1899×10^{24} কিলোগ্রাম, আর পৃথিবীর প্রায় 6×10^{24} কিলোগ্রাম। অর্থাৎ, পৃথিবীর চেয়ে বৃহস্পতির ভর প্রায় 317 গুণ বেশি। বৃহস্পতির ভর এত বেশি যে, বাকি ৪টি গ্রহের মিলিত ভর বৃহস্পতির অর্ধেকের চেয়েও কম।

এই সব কারণেই বৃহস্পতিকে বলা হয় গ্রহরাজ। বলা যায়, গ্রহ-সমাজে একেবারে নীচের ধাপে আছে প্লুটো। খুব

গ্রহদের নিরক্ষীয় ব্যাস কি উত্তর-দক্ষিণের ব্যাসের চেয়ে সামান্য বড়?

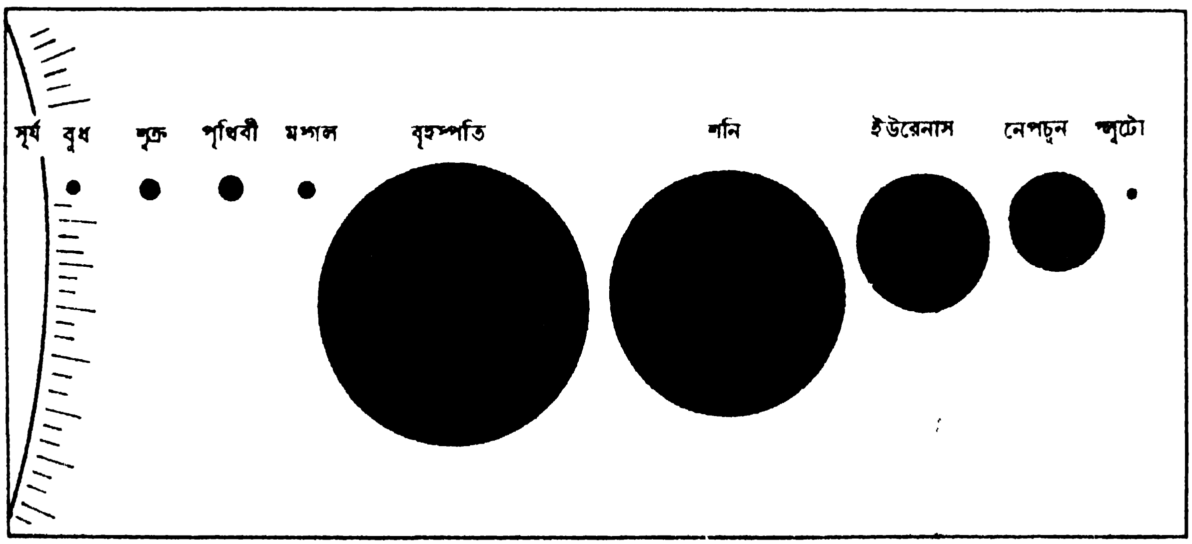
দূরে আছে বলে এবং খুব ছোট বলেও বটে, এর নির্ণীত মাপজোখগুলোয় এখনও অবশ্য একটু-আধটু ভুলচুক থাকলেও থাকতে পারে। ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে কোনো ভুল ধরা পড়লে, পরিস্থিতি হয়তো পাল্টাতে পারে, কিন্তু এখন সাম্প্রতিক হিসেব-পত্রের ভিত্তিতে বলতে হয় যে, প্লুটোর ব্যাস 3000 কিলোমিটারের (বা 1.864 মাইলের) মত—সম্ভবত তার চেয়ে কিছুটা কমই হবে। অর্থাৎ ব্যাসের দিক থেকে প্লুটোর মাপ পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশেরও কম, তা ছাড়া, ভরের দিক থেকে প্লুটোর হাল আরো শোচনীয়—পৃথিবীর ভরের 500 ভাগের মাত্র 1 ভাগ।

গ্রহ হিসেবে, আমাদের পৃথিবী হচ্ছে মাঝারি রকমের।

৯টি গ্রহ ছাড়া সূর্যের কি আর কোনো অনাবিষ্কৃত গ্রহ আছে?

বুধ থেকে প্লুটো পর্যন্ত যে ৯টি গ্রহের কথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে জানেন তার বাইরে কোনো গ্রহ থাকতে পারে না—এমন কথা ওঁরা অবশ্যই বলেন না। বরং কিছুসংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্লুটোর পরে আরো এক বা একাধিক গ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনায় যথেষ্ট বিশ্বাসী। কিন্তু অমন গ্রহ যে আছেই, সে-কথা বলার মত চাক্ষুষ বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও ওঁদের হাতে আসেনি।

ব্যাপারটা এই যে, পরিচিত যে-কোনো গ্রহের ক্ষেত্রে আকাশের কোথায়, কবে, কখন সেটিকে দেখতে পাওয়া যাবে বা পাওয়া উচিত তার হিসেব করা যায়; আবার বাস্তবে তা ঠিক ঠিক ঘটছে কি-না তাও যাচাই করে নেওয়া যায়। যাচাই করতে হলে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। আর হিসেব করতে হলে জানতে হয় সেই গ্রহটির ওপর আশপাশে অবস্থিত অন্যান্য বস্তুদের আকর্ষণ কত। দুই সূত্রে পাওয়া ফলের মধ্যে যদি বৈষম্য ঘটে তাহলে সিদ্ধান্ত করতে



সৌর গ্রহগুলির তুলনামূলক আকার

হয় যে, কোথাও ভুল হয়েছে। বৈষম্য সামান্য হলে খুব একটা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না—কারণ মানুষের বোধ বা বিচার ক্ষমতার একটা মাত্রা বা সীমা আছে। কিন্তু যদি বৈষম্য ওইভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য না হয়, তাহলে চিন্তা-ভাবনা করতেই হয়। সূর্য থেকে দূরবর্তী গ্রহদের ক্ষেত্রে—যেমন নেপচুন বা প্লুটো—কতকটা তা-ই হয়েছে। আবার ওই ধরনের কিছু কিছু অসংগতি লক্ষিত হয়েছে কোনো কোনো ধূমকেতুর ক্ষেত্রেও। কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাই মনে করছেন যে, প্লুটোর যে-পাশে সূর্য আছে তার অন্য পাশে (অর্থাৎ সূর্য থেকে আরো দূরে) আকর্ষক কোনো বস্তু আছে, যার আকর্ষণ হিসেবে নেওয়া হচ্ছে না বলে তত্ত্বের হিসেবে ভুল হয়ে যাচ্ছে—পর্যবেক্ষক-লব্ধ তথ্যের সঙ্গে তা মিলছে না।

অমন একটি গ্রহ থাকলে সে-গ্রহটি মহাকাশের কোথায় আছে, তার ভর কত, কী তার গতিবেগ, সে-সব হিসেব করা হয়েছে। সম্ভাব্য এই গ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে 'প্ল্যানেট এক্স' (Planet X) বা 'এক্স গ্রহ'। মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্র্যাডি কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে 1972 সালে দেখিয়েছেন যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সূর্য থেকে গ্রহটির

প্লুটোর পরে কোনো গ্রহ থাকলে তার গড় দূরত্ব কত হবে?

গড় দূরত্ব হওয়া দরকার প্রায় 800 কোটি কিলোমিটার (বা 500 কোটি মাইল), ভর হওয়া উচিত পৃথিবীর ভরের প্রায় 285 গুণ ইত্যাদি। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, গ্রহটিকে দূরবিনের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়নি এবং হিসেবমত ওর যা ঔজ্জ্বল্য এবং আকাশের যেখানে ওর এখন থাকার কথা তাতে অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবেও না। অতএব গ্রহটি এখনও পুরোপুরি সম্ভাবনার রাজত্বে রয়ে গেছে।

মূল সমস্যার সমাধান কল্পে কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবার একটির পরিবর্তে দু'টি গ্রহের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই ভিত্তিতে হিসাবনিকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানী রাদজিয়েভ্স্কি। উনি খুব সম্প্রতি প্রস্তাবিত গ্রহ দু'টির—যাদের সূচিত করতে উনি 'এক্স- 1' (X-1) এবং 'এক্স- 2' (X-2) প্রতীক দু'টি ব্যবহার করেছেন—ভর প্রভৃতির হিসেবপত্র প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অনিশ্চয়তার ব্যাপারটা এ-ক্ষেত্রেও রয়েছে। পর্যবেক্ষণের কষ্টিপাথরে এখনো ব্যাপারটার যাচাই হয়নি।

যান্ত্রিক এবং প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সম্ভাব্য গ্রহগুলোকে অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাওয়া এক দুরাশা। আশার কথা, মহাকাশযানগুলোর সূত্রে কিছু হদিশ হয়তো বা মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু এখনো তা মেলেনি।

সৌরজগতে প্লুটোর চেয়ে দূরে কোনো গ্রহ থাকা যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি বুধের চেয়ে কাছে কোনো গ্রহও কি সূর্যের থাকতে পারে?

এক সময়ে অমন এক গ্রহ থাকার প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ স্বীকৃত পেয়েছিল। এমন-কী গ্রহটিকে দেখা গেছে বলেও ধারণা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।

ব্যাপারটার সূত্রপাত হয় ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ল্যাভেরিয়ে-র দ্বারা 1860 সালে। ইউরেনাস গ্রহের গতিবিধির কিছু ত্রুটি সংশোধন করতে উনি এর বছর 15 আগে নেপচুন গ্রহের অস্তিত্বের কথা তত্ত্বগতভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং 1846 সালে তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সূর্যের নিকটতম বলে পরিগণিত গ্রহ বুধের ক্ষেত্রেও কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ল্যাভেরিয়ে এ-ক্ষেত্রেও একই কৌশলে সমাধান খুঁজলেন। উনি কল্পনা করলেন যে, বুধ ও সূর্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অজ্ঞাত পরিচয় কোনো এক গ্রহ আছে; ভর তার বেশি নয় তাই অন্য গ্রহগুলোর ওপর তার আকর্ষণের প্রভাব ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না; কিন্তু বুধের অনেক নিকটবর্তী হওয়ার দরুন বুধের ক্ষেত্রে সে-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অমন গ্রহ সত্যিই যদি থাকে তো তাকে সরাসরি দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ—একেবারে অসম্ভবও হতে পারে। কারণ সূর্যের খুব কাছে থাকার দরুন, তার প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্যের আওতার বাইরে গ্রহটি হয়তো কোনো সময়েই না-যেতে পারে। কিন্তু দু'টি পরোক্ষ উপায় আছে, যাতে ওই ধরনের গ্রহকেও দেখতে পাওয়া সম্ভব। এক, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ (Total solar eclipse)ঃ ওই সময়ে ঢাকা-পড়া সূর্যের আশপাশে, অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে, গ্রহটি তার

অবস্থিতি অনুযায়ী দৃশ্যমান হতে পারে। দুই, 'অতিক্রমণ' (Transit) ঃ গ্রহটি কখনো কখনো সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে এসে সাময়িকভাবে একটি সরলরেখা বা প্রায়-সরলরেখা গঠন করতে পারে, আর তখন সূর্যগাত্রের পটভূমিতে একটি কালো সঞ্চরমান বিন্দুর রূপে গ্রহটিকে দেখা যেতে পারে। সূর্য থেকে যাদের দূরত্ব পৃথিবীর চেয়ে কম (যেমন বুধ এবং শুক্র), তাদের ওইভাবে কখনো কখনো দেখা যায়।

ল্যাভেরিয়ে-প্রস্তাবিত গ্রহটিকে উল্লিখিত দুই রূপেই দেখতে পাওয়ার দাবি উঠেছিল। দ্বিতীয় রূপে দেখার দাবি যিনি করেছিলেন তিনি একজন শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পেশায় চিকিৎসক। তিনি ল্যাভেরিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাই তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল পূর্বকল্পিত ধারণামুক্ত। এঁর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই গ্রহটির বাস্তব অস্তিত্ব তখনকার মত স্বীকৃত হল। নাম দেওয়া হল ভালকান (Vulcan)। ল্যাভেরিয়ের হিসেব মত সূর্য থেকে তার গড় দূরত্ব হল প্রায় 2,80,00,000 কিলোমিটার (1,30,00,000 মাইল); ভর প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাশিগুলোও স্থিরীকৃত হল। কিন্তু পরবর্তী কালে ভালকানকে আর কেউ কখনো সূর্য পৃষ্ঠকে অতিক্রমণ করতে দেখেন নি। 1878 সালে দু'জন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্যের আশপাশে কয়েকটি অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিষ্ক লক্ষ করেন। তাদের মধ্যে ভালকান আছে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু এই সম্ভাবনার সপক্ষে পরবর্তী আর কোনো পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সাক্ষ্য মেলেনি।

সুতরাং বুধের চেয়ে নিকটতর কোনো গ্রহের অস্তিত্ব এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানী-মহলে স্বীকৃত নয়। প্রধানত এই কারণে যে, বারবার নানাভাবে চেষ্টা করেও ভালকানের দেখা মেলেনি। গ্রহটির অস্তিত্বের যে তত্ত্বগত প্রয়োজন এক সময়ে দেখা দিয়েছিল, সে-প্রয়োজনও এখন দূরীভূত। বুধের চাল-চলনের আপাত বিশৃঙ্খলার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলেছে অন্যভাবে।

প্লুটো গ্রহটিকে নাকি কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঠিক গ্রহ শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করেন না। এর কারণ কী?

প্লুটো গ্রহের কয়েকটি দিক তাকে একটু অসাধারণ ক'রে তুলেছে এ-কথা মানতেই হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্লুটো মাপে খুবই ছোট। মাপে ছোট অবশ্য বুধগ্রহও, কিন্তু প্লুটোর মত অত ছোট নয়। আবার, নিকটতম প্রতিবেশী গ্রহের সঙ্গে তুলনা করলে (অর্থাৎ বুধকে শুক্রের সঙ্গে এবং প্লুটোকে নেপচুনের সঙ্গে তুলনা করলে) তফাতটা আরো বেশি ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর একই সঙ্গে বিস্ময় জাগে। যেমন নেপচুনের একটি উপগ্রহ আছে—নাম তার ট্রাইটন (Triton)—সেটিও প্লুটোর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। তা ছাড়া সূর্যকে যে পথ ধ'রে প্লুটো পরিক্রমণ করছে সেই পথটিও অন্যান্য গ্রহের পথের তুলনায় একটু ভিন্ন আকৃতির। এই সব খাপছাড়া ব্যাপার-স্যাপার দেখে কোনো কোনো

উপগ্রহের কি কোনো উপগ্রহ থাকে?

জ্যোতির্বিজ্ঞানী এক গবেষণা-সাপেক্ষ তত্ত্ব গঠন করেন। সেটি এই যে, প্লুটো আসলে গ্রহ ছিল না—ছিল নেপচুন গ্রহের এক উপগ্রহ; পরে পারিপার্শ্বিক কোনো কারণে এখন গ্রহের মত চলাফেরা করতে শুরু করেছে।

কিন্তু যে-প্লুটোর কোনো উপগ্রহ আছে বলে দীর্ঘকাল জানা ছিল না, কয়েক বছর আগে হঠাৎ তার এক উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে প্লুটো সম্পর্কে ওই তত্ত্বের মূল ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ উপগ্রহের উপগ্রহ থাকে না, থাকে গ্রহের।

উপগ্রহ কাদের বলা হয়?

উপগ্রহরা অনেকাংশে গ্রহদের মতই। এরাও গ্রহদের মত সম্পূর্ণত বা প্রধানত কঠিন পদার্থে গঠিত, এদেরও নিজস্ব কোনো আলো নেই—যদিও প্রতিফলিত আলোয় দেখতে এরা উজ্জ্বলই। এরাও কেপলারীয় বিধি অনুসরণ করে ঘুরছে। কিন্তু গ্রহরা যেখানে ঘুরছে সূর্যের চারপাশে, উপগ্রহরা সেখানে ঘুরছে কোনো না কোনো গ্রহের চারপাশে।

উপগ্রহরা গ্রহদের তুলনায় সাধারণত আকারে বা ভরে ছোট হয়ে থাকে—যে বিশেষ গ্রহকে পরিক্রমণ করছে, তার চেয়ে তো বটেই।

চাঁদ একটি উপগ্রহের দৃষ্টান্ত। চাঁদ পরিক্রমণ করছে পৃথিবীকে, যা একটি গ্রহ।

সব গ্রহেরই কি উপগ্রহ আছে?

না, সূর্যের নিকটতম দুই গ্রহের—অর্থাৎ বুধ আর শুক্রের—কোনো উপগ্রহ নেই। আবিষ্কৃত গ্রহদের মধ্যে যেটি সূর্য থেকে দূরতম সেই প্লুটো গ্রহেরও 1978 সাল পর্যন্ত কোনো উপগ্রহ নেই বলেই মনে করা হত। ওই বছরে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমস্ ক্রিস্টি প্লুটোর একটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছেন।

কোন গ্রহের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উপগ্রহ আছে?

এই শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত উপগ্রহ আবিষ্কৃত হত পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে দূরবিনের সাহায্যে। তখন আর অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। তখন বেশ কয়েক বছরের—কখনো কখনো বা কয়েক দশকের—ব্যবধানে একটি-দুটি ক'রে উপগ্রহ আবিষ্কৃত হত, হত কোনো এক সুদক্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অতি শক্তিশালী দূরবিনের সাহায্যে সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পুরস্কার হিসেবে। এখন কিন্তু দূরপাল্লার মহাকাশযানগুলোর দৌলতে অবস্থাটার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আবিষ্কৃত উপগ্রহের সংখ্যা ঘন ঘন পাল্টাচ্ছে—প্রায়ই নতুন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। নব-আবিষ্কৃত উপগ্রহগুলো প্রায় সবই অবশ্য আকারে বেশ ছোট। এত দিন পর্যন্ত তাদের অনাবিষ্কৃত থাকার সেটাই বড় কারণ।

ষাটের দশক পর্যন্ত বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে পরিগণিত হত। সংখ্যাটা ছিল শনির উপগ্রহের সংখ্যার চেয়ে 2-3টি বেশি। গত প্রায় দু' দশকে বৃহস্পতির আবিষ্কৃত উপগ্রহের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে কিন্তু শনির বেড়েছে আরো অনেক বেশি।

এখনকার হিসেবে শনির উপগ্রহ-সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সে-সংখ্যাটি হচ্ছে 19, বৃহস্পতির সংখ্যার চেয়ে 3 বেশি।

সৌরজগতে মোট উপগ্রহের সংখ্যা কত? পৃথক পৃথক ভাবে কোন গ্রহের ক'টি উপগ্রহ রয়েছে?

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে সৌরজগতের মোট উপগ্রহের সংখ্যা 46। এদের মধ্যে পৃথিবীর ভাগে আছে 1টি, মঙ্গলের 2টি, বৃহস্পতির 16টি, শনির 19টি, ইউরেনাসের 5টি, নেপচুনের 2টি এবং প্লুটো গ্রহের 1টি।

উপগ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং বড় কে কে?

চাঁদকে বাদ দিলে, উপগ্রহগুলো সব পৃথিবী থেকে বেশ দূরে দূরেই আছে বলতে হয়, আর সেই অনুপাতে আকারে ছোট। ফলে, ওদের আকার-আকৃতি নির্ণয়ে কিছুটা বাড়তি অসুবিধে আছে। মানে, মাপজোখের যে একটু-আধটু ভুলচুক স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে, ওই সব উপগ্রহের ক্ষেত্রে তার পরিমাণটা আপেক্ষিকভাবে একটু বেশিই হয়ে পড়ে। তাই কোন উপগ্রহটি বৃহত্তম বা কোনটি ক্ষুদ্রতম পুরোপুরি নিশ্চয়তার সঙ্গে সে-প্রশ্নের জবাব এখনও পর্যন্ত বোধহয় দেওয়া যায় না।

যেটুকু নিশ্চয় করে বলা যায় তা এই যে, বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমীড (Ganymede), শনির টাইটান (Titan)

আজ পর্যন্ত ক'টি উপগ্রহ সবচেয়ে বড় উপগ্রহের সম্মান পেয়েছে?

আর নেপচুনের ট্রাইটন (Triton) হল আর সব উপগ্রহদের চেয়ে বড়। এদের কোনোটির ব্যাস 5000 কিলোমিটারের (বা 3100 মাইলের) কম নয়—বরং কিছু পরিমাণে বেশি। অর্থাৎ এরা প্রত্যেকে উপগ্রহ হয়েও, প্লুটো এবং বুধ গ্রহের চেয়ে বড়। এদের মধ্যে সামান্য উনিশ-বিশের পার্থক্যে কে যে সবচেয়ে বড়, সেটা নিয়েই সিদ্ধান্ত করা মুশকিল হয়েছে। অতীতে একবার গ্যানিমীড সেই মর্যাদা ভোগ করেছে; পরে টাইটান এবং ট্রাইটন-ও পালাক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। এখন আবার জয়মাল্য গ্যানিমীডের কাছেই ফিরে এসেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত, 5276 কিলোমিটার (বা 3278.4 মাইল) মাপের ব্যাস নিয়ে গ্যানিমীডই সবচেয়ে বড়।

সবচেয়ে ছোট উপগ্রহ কোনটি সে-প্রশ্নটা বাড়তি জটিলতা পেয়েছে অন্য এক কারণে। মাপজোখের ভুলভ্রান্তি

তো সম্ভাব্য মাত্রার মধ্যে ঘটতেই পারে, তা ছাড়া দুটি খুব ছোট উপগ্রহের মধ্যে একটি আবার গোলাকৃতি নয়। উপগ্রহটির নাম ডীমস (Deimos), মঙ্গলের উপগ্রহ এটি। এর স্বীকৃত মাপ হচ্ছে 10×12×16 কিলোমিটার (6.25× 7.5× 10 মাইল)। গড় করলে এটির মাপই ক্ষুদ্রতর হয়, কারণ বৃহস্পতির উপগ্রহ গোলাকৃতি লীডা (Leda)-র ব্যাসের যে-মাপ গৃহীত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে 15 কিলোমিটার (বা 9.32 মাইল)। কিন্তু যেহেতু একদিকের মাপ ডীমসের ক্ষেত্রে একটু বড় হয়ে গেছে, তাই প্রতিযোগীদের মধ্যে ফার্স্ট প্রাইজ বা লাস্ট প্রাইজ যাই বলা হোক, সেটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সাধারণত লীডাকেই দিয়ে থাকেন।

সুতরাং দু'দিক থেকেই বৃহস্পতি গ্রহের জয়-জয়কার।

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের কি কোনো বৈশিষ্ট্য আছে?

হ্যাঁ, চাঁদের একটি অসাধারণ, দুর্বোধ্য বৈশিষ্ট্য আছে। উপগ্রহদের যেমন গ্রহ-নিরপেক্ষভাবে আকারের দিক থেকে মাপা হয়, তেমনি (বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে) যে-উপগ্রহ যে-গ্রহের সঙ্গে জড়িত আছে সেই গ্রহের আকারের সঙ্গে তুলনা ক'রে, তার ভগ্নাংশ বা শতকরা ভাগ হিসেবে উপগ্রহটিকে বিচার করারও রীতি আছে। সে-বিচারে চাঁদ বৃহত্তম বা অন্যতম বৃহত্তম। চাঁদের ব্যাস হচ্ছে 3475.6 কিলোমিটার (2159.643 মাইল) —এ-সংখ্যা পৃথিবীর ব্যাসের মাপের প্রায় 27.25 শতাংশ। বৃহস্পতির বৃহত্তম উপগ্রহের ব্যাস কিন্তু বৃহস্পতির ব্যাসের মাত্র 3.7 শতাংশের মত, শনির ক্ষেত্রে বৃহত্তম উপগ্রহটির ভাগে পড়েছে আরো কম—প্রায় 3.6 শতাংশ। তবে ব্যতিক্রম হয়তো ঘটে থাকতে পারে শুধু প্লুটো এবং তার উপগ্রহের ক্ষেত্রে। প্লুটোর নব-আবিষ্কৃত উপগ্রহ কেয়ারন (Charon) -এর ব্যাস এখনও সুনিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়নি। সম্ভাব্য মান হিসেবে এখন 800 কিলোমিটার (বা 500 মাইল)-কে গ্রহণ [illegible] এই মান সঠিক হলে কেয়ারনের ব্যাস প্লুটোর [illegible]াংশের কম নয়। অর্থাৎ কেয়ারন [illegible]দের এক বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী।

উপগ্রহ আর গ্রহাণুদের মধ্যে তফাত কী?

গ্রহ আর উপগ্রহদের মধ্যে যা তফাত, গ্রহাণু আর উপগ্রহদের মধ্যেও মূলত সেই একই তফাত। কারণ গ্রহাণুরাও গ্রহদের মত সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এদের ঘোরার পথগুলো সাধারণত একটু বেশি লম্বাটে, গ্রহদের মত প্রায় গোলাকৃতি নয়। এরা সংখ্যায় বিপুল এবং গ্রহদের

গ্রহাণুরা কি ঝাঁক বেঁধে আছে?

মত ফাঁক ফাঁক করে ছড়িয়ে না থেকে বরং ঝাঁক বেঁধে আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাই প্রায়শ এদের দল হিসেবেই উল্লেখ করা হয়, বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids বা Minor planets)।

গ্রহাণুরা কিন্তু মাপে খুব ছোট। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে উপগ্রহরা সব গ্রহদের তুলনায় অনেক ছোট। গ্রহাণু আর উপগ্রহদের মধ্যে আকারগত তুলনায় ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। দু-চারটিকে বাদ দিলে, গ্রহাণুরা উপগ্রহদের তুলনায় ছোট—অনেক পরিমাণে ছোট।

গ্রহাণুদের কি খালি চোখে দেখা যায়?

না, গ্রহাণুদের খালি চোখে দেখা যায় না। ব্যতিক্রম হিসেবে শুধু ভেস্টা (Vesta)-র নাম হয়তো করা চলতে পারে।

বৃহত্তম না হয়েও, ভেস্টা হচ্ছে গ্রহাণুদের মধ্যে উজ্জ্বলতম। সব গ্রহাণুর মত ভেস্টারও পৃথিবী থেকে দূরত্ব পর্যায়ক্রমে বাড়ে-কমে। সেই সুবাদে যখন দূরত্ব সবচেয়ে কম হয়, তখন খুব অনুকূল পরিবেশে একে খালি চোখে দেখা যায়। তা-ও কিন্তু সাজ-সরঞ্জামের সাহায্য নিয়ে আগে থেকে জেনে নিতে হয়, আকাশে ওর সঠিক অবস্থানটা কোথায়। গ্রহাণুটি নিজেই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে নেবে, এমন কখনো নয়।

দূরবিন ব্যবহারের সময় থেকেই কি গ্রহাণুরা পর পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিপথে আসতে শুরু করে দেয়?

না, ব্যাপারটা মোটেই সে-ভাবে ঘটে নি। আকাশ-চর্চায় দূরবিনের ব্যবহার শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, আর প্রথম আবিষ্কৃত গ্রহাণু সিরীজ (Ceres) এক ইতালীয়

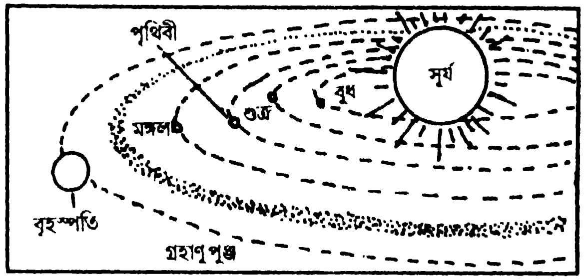
জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দৃষ্টিগোচর হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনে—1801 সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে।

গ্রহাণুগুলো আবিষ্কৃত হল কী ভাবে?

গ্রহাণু-আবিষ্কারের ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক। বুধ থেকে শনি, তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত এই 6টি গ্রহের দূরত্বগুলোকে ক্রমবর্ধমান এক সারিতে সাজিয়ে, এক সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ করছিলেন যে, সূর্য থেকে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির দূরত্বের পার্থক্যটা (অনুপাতের বিচারে) মাত্রাতিরিক্ত রকমের বড়। এই বৈষম্যটা নিয়ে কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনা চলছিল। 1770 সালের দু'চার বছর আগে-পরে দুই জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী দূরত্বগুলোকে একটি গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে সফলও হন। ওঁদের সূত্র বুধ থেকে মঙ্গল পর্যন্ত 4টি গ্রহের দূরত্বের মধ্যে একটি শৃঙ্খলা মোটামুটি সন্তোষজনক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল। এই সূত্র সাধারণত টিটিয়ুস-বোডে বিধি (Titius-Bode law) নামে পরিচিত। কিন্তু বাধা হল বৃহস্পতি এবং শনির ক্ষেত্রে। তখন একটি সম্ভাবনার কথা ভাবা হল—মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে হয়তো অনাবিষ্কৃত একটি গ্রহ বিরাজ করছে। কারণ সেটি থাকলে সূত্র-বর্ণিত শৃঙ্খলা বৃহস্পতি এবং তারও পরে শনি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ওই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে, এমন সময়ে—1781 সালে—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে শনির পরের গ্রহ ইউরেনাস আবিষ্কৃত হল আর দেখা গেল যে ইউরেনাসের দূরত্বও টিটিয়ুস-বোডে প্রস্তাবিত সূত্র মেনে চলে—যদি

বেশির ভাগ গ্রহাণুর অবস্থান কোথায়?

অবশ্য বৃহস্পতি গ্রহ মঙ্গলের ঠিক পরের গ্রহ না হয়ে, তার পরেরটি হয়। এরপর খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিখোঁজ গ্রহটির অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে, তাকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এক দল গঠন করা হল। কিন্তু সেই দল তোড়জোড় ক'রে কাজ শুরু করার আগেই দুম ক'রে দল-বহির্ভূত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে প্রথমে একটি গ্রহাণু ধরা পড়ে গেল। তারপরে দলের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে কয়েক বছরের মধ্যে ধরা দিল আরো তিনটি গ্রহাণু। সে-



সংখ্যা পরে আরো অনেক বেড়ে গেছে। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের অন্বিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রহের বিকল্পে পেয়েছেন একাধিক গ্রহাণুকে। কিন্তু তাতেই তাঁদের কার্যোদ্ধার হয়ে গেছে। টিটিয়ুস-বোডের সূত্র অনুসারে অনাবিষ্কৃত গ্রহটির জন্য এক বিশেষ দূরত্ব নির্দিষ্ট ছিল। দেখা যায় যে, গ্রহাণুদের দূরত্ব সাধারণত সেই নির্দিষ্ট দূরত্বেরই ধারে-কাছে পড়ে। গ্রহাণুগুলোর মধ্যে শতকরা 98টির সূর্যকে পরিক্রমণ করার পথ সর্বাংশে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে থাকে, বাকিগুলো কিছুটা ব্যতিক্রম—যাত্রাপথে তারা কখনো কখনো মঙ্গলের এ-পাশে (মানে যে-পাশে সূর্য আছে) বা বৃহস্পতির ও-পাশে চলে যায়।

গ্রহাণুপুঞ্জে মোট কত গ্রহাণু আছে তা কি নির্ণয় করা গেছে?

না, সঠিক সংখ্যা নির্ণীত হয়নি এবং তা দূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে কি-না, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওরা সংখ্যায় অনেক, পৃথিবী থেকে ওদের দূরত্ব নেহাত কম নয়, আর সেই তুলনায়, অল্প কয়েকটিকে বাদ দিলে, ওরা মাপে খুবই ছোট। দূরবিন, তা সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, ওদের অনেককে ধরার শক্তি রাখে না, দূরবিনযুক্ত ক্যামেরাও নয়। এমন কী মহাকাশযানগুলোর সূত্রে পাওয়া সহায়তাও এ-ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে একটি গ্রহাণু আবিষ্কৃত হবার পর অনেক দিন পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রহাণুর সংখ্যা বাড়তে থাকে খুব ধীরে ধীরে। প্রথম 45 বছরে আবিষ্কৃত হয়েছিল মোট 5টি। আর এখন প্রায় 200 বছর পরে, অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, প্রতি বছরে একাধিক নতুন গ্রহাণুকে আবিষ্কারের তালিকায় স্থান দিতে হচ্ছে। তালিকাভুক্ত গ্রহাণুরা এখন সংখ্যায় প্রায় 2000, কিন্তু ওদের

সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, গ্রহাণুরা সংখ্যায় আরো অনেক অনেক বেশি। খুব রাশ-টানা বিচার-বিবেচনাতেও সংখ্যাটা 40 হাজারকে ছাড়িয়ে যায় এবং কারো কারো মতে ওটা এক লাখেরও ওপরে।

গ্রহাণুদের মধ্যে সর্ববৃহৎ কোনটি ? তার মাপ কী ?

সবচেয়ে বড় গ্রহাণু হল সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত গ্রহাণুটি—সিরীজ। এটি গোলাকৃতি, যে কথা কিন্তু অনেক গ্রহাণু সম্পর্কেই বলা চলে না। এটির ব্যাস 1003 কিলোমিটার (623.24 মাইল)।

গ্রহাণুদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কী-ভাবে দিয়েছেন ?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ওঁদের সন্ধান-ক্ষেত্রে একটি গ্রহ গঠিত হবার শর্তগুলো মোটামুটিভাবে পূরিত হয়েছিল, কিন্তু পুরোপুরিভাবে নয়। তাই গ্রহটি গঠিত হয়ে উঠতে পারেনি, বা হয়েও স্থিতিলাভ করতে পারেনি। সেই সম্ভাব্য বা বিনষ্ট গ্রহটির দেহবস্তুই ছোট ছোট টুকরো হয়ে ওখানে ছড়িয়ে আছে, আর সূর্যের আকর্ষণে তাকে পরিক্রমণ করছে। ওঁরা এ-ও মনে করেন যে, খুব ছোট বলে ওদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য গ্রহের ছোটখাটো আকর্ষণের দ্বারা তাড়িত হয়ে এদিক-সেদিকে ছিটকে যেতে বাধ্য হয়। অন্যান্য গ্রহ বলতে সেই সব গ্রহ ধরতে হবে চলার পথে গ্রহাণুগুলো যাদের কাছাকাছি এসে পড়ে। ফলে ওরা কক্ষচ্যুত হয়ে যায়—গ্রহাণু হিসেবে আর সূর্যকে পরিক্রমণ করতে পারে না। ওরা আর গ্রহাণু পদবাচ্য থাকে না। এই একদা-গ্রহাণুরাই সম্ভবত উল্কার উদ্ভবের অন্যতম প্রধান কারণ।

উল্কা বলতে কাদের বোঝানো হয় ?

মেঘমুক্ত রাতের আকাশে, বিশেষত জোরালো চাঁদের আলো না থাকলে, প্রায়ই চোখে পড়ে উজ্জ্বল আলোর এক রেখা হঠাৎ কালো আকাশের গায়ে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অমন ঘটনাকে সাধু বাংলায় বলা হয় উল্কাপাত, চলতি কথায় তারাখসা (Shooting star)। যে-বস্তুগুলোকে ওইভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়, তাদের বলা হয় উল্কা। উল্কারা মোটেই তারা নয়। বরং বলা চলে, তারাদের সঙ্গে ওদের আকাশ-পাতাল তফাত।

প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভাল যে, প্রকৃতপক্ষে তারা যারা, তাদের আমরা কখনো উল্কার মত দ্রুত ধাবমান রূপে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কারণ তারারা আকাশে আপেক্ষিক ভাবে স্থির।

উল্কারা হঠাৎ জ্বলে উঠে আবার হঠাৎই নিভে যায় কেন ?

উল্কাদের নিজস্ব কোনো আলো থাকে না। ওরা এক ধরনের তাপবিহীন, আলোকবিহীন বস্তুপিণ্ড, মহাকাশে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে—কোথাও দলবদ্ধভাবে, কোথাও বা বিচ্ছিন্নভাবে। ওরা কেউ হয়তো মহাকাশে প্রায় একই অঞ্চলে প্রায় গতিহীন হয়ে দীর্ঘকাল পড়ে আছে।

উল্কাদের কি নিজস্ব আলো আছে ?

কোনোটি-বা নানা কারণে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে বলে বা ওদের নিজেদের গতিশীলতার কারণে মাঝে মাঝে কোনো কোনো উল্কা



উল্কা

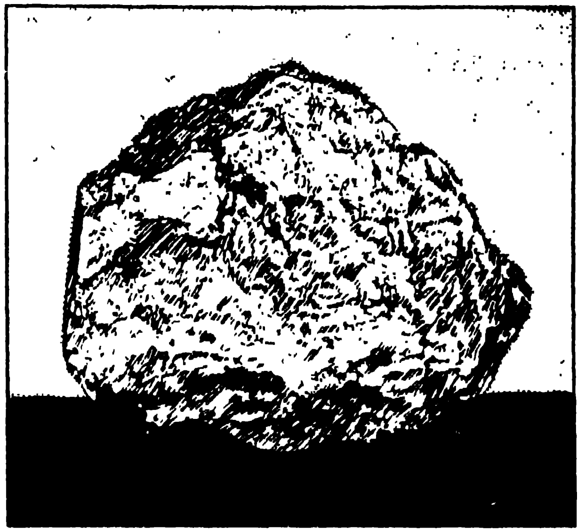
পৃথিবীর ধারে কাছে এসে পড়ে। তখন আর যায় কোথায়—পৃথিবী মহাকর্ষের বলে ওদের প্রচণ্ডভাবে টানতে থাকে, ফলে ওরা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর যত কাছে আসে, বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে ওদের বেগ ততই হয় দ্রুততর। কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠকে ঘিরে প্রায় হাজারখানেক কিলোমিটার (শ-ছ'য়েক মাইল) উচ্চতা পর্যন্ত আছে তার বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলের—বিশেষ ক'রে তার নীচের দিকের ঘন স্তরগুলোর—সঙ্গে ধাবমান উল্কাগুলোর প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। এর ফলে ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উল্কাগুলো জ্বলতে থাকে। এ-ঘটনা শুরু হয় সাধারণত পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার (প্রায় 60 মাইল) উচ্চতায়। তখনই প্রথম উল্কারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যতক্ষণ ওরা জ্বলতে থাকে, ততক্ষণই ওদের আকাশের পটভূমিতে দেখা যায়। জ্বলা বন্ধ হলে স্বাভাবিকভাবেই আর জ্যোতিষ্করূপে ওদের দেখতে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সেটা হতে পারে দু'টি কারণে। প্রথমত, উল্কাটি জ্বলে পুড়ে বাতাসেই নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে পারে। এটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে। দ্বিতীয় কারণটি প্রযোজ্য হয় অতি অল্প সংখ্যক উল্কার ক্ষেত্রে—উল্কাটি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় না, তার ছোট এক দগ্ধাবশেষ পৃথিবীর মাটিতে আছড়ে পড়ে এবং বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণ বন্ধ হবার দরুণ তার ঔজ্জ্বল্য ও তাপ হারায়।

ভূপতিত কোনো উল্কাকে সংগ্রহ করা গেছে কি? বিজ্ঞানীরা তাদের সম্পর্কে বিশেষ কী তথ্য জানতে পেরেছেন?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, যুগ যুগ ধ'রে ভূ-পৃষ্ঠে অনেক উল্কা এসে জমা হয়েছে এবং তাদের একটা খুব বড় অংশ বিজ্ঞানীদের চোখের আড়ালে থেকে গেছে। কিন্তু তবু সংগৃহীত উল্কার পরিমাণ নেহাত তুচ্ছ না। আজকাল বড় বড় অনেক জাদুঘর বা মিউজিয়ামে এ রকম কিছু সংগ্রহ সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম'-এ এ-ধরনের ভাল সংগ্রহ রয়েছে।

প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভাল, যে-উল্কাগুলো বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় না, ভূ-পৃষ্ঠে এসে উপনীত হয়, তাদের বাংলা পরিভাষায় বলা হয় উল্কাপিণ্ড (Meteorite)।

উল্কাপিণ্ডদের পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ ক'রে জানা গেছে যে, উপাদানের দিক থেকে ওরা প্রধানত তিন রকমের হতে পারে—প্রস্তরময় উল্কাপিণ্ড (Stony meteorite), লৌহঘটিত উল্কাপিণ্ড (Iron meteorite) আর প্রস্তর-লৌহ ঘটিত উল্কাপিণ্ড (Stony-iron meteorite)। প্রস্তরময় যেগুলো সেগুলো প্রধানত ম্যাগনেসিয়াম ও লোহার সিলিকেট এবং অক্সাইড দ্বারা গঠিত। লৌহঘটিত উল্কাপিণ্ডে লোহা তো বটেই সেই সঙ্গে থাকে বেশ কিছুটা নিকেল এবং অল্প পরিমাণে কোবাল্ট-ও। আর এই দু' ধরনের উল্কাপিণ্ডের উপাদানই কম-বেশি পরিমাণে মিশে তৃতীয় ধরনের উল্কাপিণ্ড গঠন করে।



উল্কাপিণ্ড

যে সব উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে, তারা কি পৃথিবীর সমবয়সী?

আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ কৌশল প্রয়োগ ক'রে প্রাপ্ত উল্কাপিণ্ডদের বয়সও নির্ণয় করা গেছে—অর্থাৎ বোঝা গেছে, কত কাল আগে ওরা গঠিত হয়েছে। হিসেব অনুসারে ওদের বয়স প্রায় 4.7×10^9 বছর বা 470 কোটি বছরের মত। ওরা পৃথিবীরই সমবয়সী।

উল্কাদের আচার-ব্যবহার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে বিশৃঙ্খল মনে হয় কেন?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, উল্কাদের আপাত-

বিশৃঙ্খল আচার-ব্যবহারের পিছনে আসলে আছে মানুষের অজ্ঞতা। উল্কাদের সম্পর্কে মূলগত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ অজানা। তাই গ্রহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন আগে থেকেই ওঁরা বলে দিতে পারেন কবে, কখন, কোথায় ওদের দেখা মিলবে, উল্কাদের ক্ষেত্রে তেমন প্রায় কোনো কথাই বলা যায় না। ওঁরা মনে করেন, মহাকাশের কোথায় কোথায় ওরা আছে বা না-আছে এবং ওদের উৎপত্তি কী-ভাবে হয়ে থাকতে পারে, সে-সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট তথ্য না-পাওয়া পর্যন্ত ওদের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে না।

ধূমকেতুর সঙ্গে কি উল্কার সম্পর্ক আছে?

অনেক চিন্তা-ভাবনা ক'রে এবং কিছু সফল পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ওঁরা আপাতত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বেশ কিছু উল্কার উৎপত্তি হয়েছে স্থানচ্যুত গ্রহাণু থেকে। আবার ওঁরা এ-ও মনে করেন যে, বেশ কিছু গ্রহাণুর জন্ম হয় ধূমকেতুদের দেহের স্খলিত অংশ থেকে। ধূমকেতুদের সঙ্গে উল্কাদের সম্পর্ক থাকার ব্যাপারটা প্রায় নিশ্চিত। সেই ভিত্তিতে ওঁরা উল্কাদের সম্পর্কে কিছু কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী ক'রে থাকেন এবং তার অনেকটা মিলেও যায়। যেমন, বিশেষ বিশেষ সময়ে যে উল্কাপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বা পেতে পারে, সে-সম্পর্কে ওঁরা সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

ধূমকেতু বলতে কোন ধরনের জ্যোতিষ্কদের বোঝানো হয়—ওদের বৈশিষ্ট্য কী ?

সাধারণ মানুষের মধ্যে কয়েকটি ধারণা সুপ্রচলিত আছে—ধূমকেতুদের লক্ষণ হল ওদের দেহের লেজের মত এক অংশ, ওদের স্বভাব হঠাৎ আকাশে দেখা দেওয়া, ইত্যাদি। এই ধারণাগুলো কী বিজ্ঞান-স্বীকৃত?

লেজ বা আবির্ভাবের আকস্মিকতা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ধূমকেতুদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নয়। অনেক ধূমকেতুর আর্বিভাব ওঁদের কাছে মোটেই আকস্মিক নয়। 1910 সালে দেখা দেওয়া হ্যালির ধূমকেতু (Halley's comet) যে আবার 1985-86 সালে দৃশ্যমান হবে, এটা ওঁদের প্রত্যাশিতই ছিল। এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানেন, লেজের মত এক অঙ্গ ধূমকেতুর সব সময়ে থাকে না—সূর্যের কাছে এলে তার উদ্ভব হয় বা হতে পারে, সূর্য থেকে দূরে থাকলে তার চিহ্নমাত্রও থাকে না। কিন্তু লেজ থাক বা না থাক, ধূমকেতু ধূমকেতুই থাকে।

শ্রেণীগত বিচারে ধূমকেতুদের সঙ্গে গ্রহদের কিছু কিছু মিল আছে। ধূমকেতুদেরও নিজস্ব আলো নেই—সূর্যের শক্তিতে এরা উজ্জ্বল হয়। আরো বড় কথা, দৃষ্ট ধূমকেতুরা সব সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঐতিহাসিক কালের মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত গ্রহ হচ্ছে ইউরেনাস এবং আবিষ্কর্তা উইলিয়ম হার্শেল-এর প্রথমে ধারণা হয়েছিল যে, তিনি একটি নতুন ধূমকেতু আবিষ্কার করেছেন।)

কিন্তু বলা বাহুল্য, গ্রহদের সঙ্গে ধূমকেতুদের বেশ কিছু অমিলও আছে। গ্রহদের সূর্যকে পরিক্রমণের পথগুলো উপবৃত্তাকৃতি বটে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃত্ত থেকে এই উপবৃত্তগুলোর বিচ্যুতি খুব কম; তাই পথগুলো তেমন লম্বাটে নয়, প্রায় বৃত্তাকৃতি বললেও চলে। ধূমকেতুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সাধারণত তা নয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কক্ষ-পথগুলো খুব লম্বা ছাঁদের, অর্থাৎ বৃত্ত থেকে তাদের বিচ্যুতি খুব বেশি। কখনো কখনো এই বিচ্যুতি এত বেশি হয় যে, সে-পথগুলো আর দু'দিকে যুক্ত থাকতে পারে না—এক দিকে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ওই সব ক্ষেত্রে অবশ্য পথগুলো উপবৃত্ত থাকে না, হয়ে পড়ে অধিবৃত্ত (Parabola) বা পরাবৃত্ত (Hyperbola)। এই শেষোক্ত ধরনের পথে ভ্রমণকারী ধূমকেতুরা অবশ্য সূর্যকে ঘিরে একবার চলে গিয়ে আর কখনো ফিরে আসে না। এদের বলা হয় অপৌনঃপুনিক (Non-periodic) ধূমকেতু। আর যারা উপবৃত্তাকৃতি পথে ফিরে ফিরে আসে, তারা হল পৌনঃপুনিক (Periodic)।

ধূমকেতুর কি সব সময়ে লেজ থাকে?

আবার গ্রহরা যেহেতু মুখ্যত কঠিন পদার্থে গঠিত, ওরা তাই সুদৃঢ় (Rigid) —সূর্য থেকে ওদের দূরত্বের পর্যায়ক্রমে সামান্য যেটুকু হেরফের হয়, তার কোনো প্রতিক্রিয়া ওদের আকার-আকৃতির ওপর পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু

ধূমকেতুদের দেহের উপাদানের অনেকটাই এমন যে, যখন ধূমকেতু সূর্যের কাছে আসতে থাকে এবং তার ফলে সূর্যের তাপের ছোঁয়া একটু বেশি মাত্রায় পেতে থাকে, তখন ধূমকেতু-দেহের অনেকটাই গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এই গ্যাসীয় অংশ অতঃপর সূর্য থেকে অজস্র ধারায় নিঃসৃত বিকিরণ ও বস্তুকণার চাপে সূর্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে—ঠিক যেমন ঝড়-বৃষ্টির মুখে পড়লে আমাদের দেহের জামা-কাপড়ের আলগা অংশগুলো যথাসম্ভব আমাদের দেহের পিছনে বা আড়ালে চলে যায়। ধূমকেতুর ক্ষেত্রে সামনে অর্থাৎ সূর্যের দিকে থাকে তার কঠিন পদার্থে গঠিত অংশটুকু। এই অংশকে ধূমকেতুর মস্তক (Head) বলা হয়।

ধূমকেতুর মস্তক কি সূর্যের দিকে থাকে?

আর অপর অংশকে পুচ্ছ বা লেজ (Tail)। ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে পুচ্ছ সুবিশাল হয়ে উঠতে পারে বা অতটা হয়তো না-ও হতে পারে। কিন্তু সূর্যের কাছে এলে ধূমকেতুর আকার-আকৃতির কিছুটা পরিবর্তন অনিবার্য। তার প্রধান কারণ ধূমকেতুর দেহোপকরণের অবস্থান্তর, বা কঠিন থেকে গ্যাসে পরিণত হওয়া। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে গিয়ে তার দেহের বেশ কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটাই ধূমকেতুর প্রধান এবং একান্ত বৈশিষ্ট্য। আর কোনো জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে এ-ঘটনা পরিদৃষ্ট হয় না।

ধূমকেতু সূর্যের কাছ থেকে দূরে সরে গেলে আবার কি সর্বাংশে তার পূর্বাবস্থা ফিরে পায়?

না, কারণ সূর্যের কাছে এলে ধূমকেতুর কিছুটা স্থায়ী ক্ষয়ক্ষতি হয়—যত বেশিবার সে আসবে, তার ক্ষতির পরিমাণ ততই বাড়বে।

ধূমকেতুরা অনেক ক্ষেত্রে বিরাট কলেবর ধারণ করতে পারে। কিন্তু ওদের ভর কোনো ক্ষেত্রেই খুব বেশি হয় না। সৌর তাপের দরুন ওদের দেহের অনেকটা অংশ কঠিন থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। সৌর বিকিরণ ও সৌর কণাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে সেই গ্যাসীয় পদার্থ খুব বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন (কম ভরের কারণে) অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ (Gravity)-এর বলে নিজেকে আবার সময় সুযোগমত সর্বাংশে সংকুচিত ক'রে ফেলার শক্তি আর তার



ধূমকেতু

থাকে না। সূর্য থেকে দূরে চলে যাবার পর ধূমকেতু-দেহের

ধূমকেতুর মস্তক কি অনেক টুকরোর সমষ্টি?

কিছুটা অংশ তাই মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে—সাধারণত তাই হয়। যদি পৌনঃপুনিক ধূমকেতু হয় তাহলে আবার যখন সে সূর্যের কাছে ফিরে আসে তখন সাধারণত দেখা যায় যে, ধূমকেতুটি আর পুরোপুরি আগের মত নেই—তার ভর কিছুটা কমেছে, হয়তো ঔজ্জ্বল্যও হ্রাস



পেয়েছে বা অন্য রকমের পরিবর্তনও হয়ে থাকতে পারে।

ক্ষয়-ক্ষতি যে শুধু পুচ্ছের অংশে হয় তা নয়। মস্তকেও হতে পারে—বারবার সূর্যের কাছে এলে সেটা বোধহয় অনিবার্য। কারণ ধূমকেতুর মস্তকে কঠিন পদার্থ থাকলেও তা অখণ্ড বা দৃঢ়বদ্ধ রূপে থাকে না। থাকে ছোট-বড় আকারের অনেক টুকরোর সমষ্টি রূপে। সূর্যের কাছে এলে আকর্ষণের তারতম্যের দরুন এদের পারস্পরিক বিন্যাসে কিছু কিছু পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে এদের সুস্থিতি বিঘ্নিত হয়। সুতরাং এরাও কিছু কিছু পরিমাণে স্খলিত হয়ে যায়। স্খলিত অংশগুলো অতঃপর উল্কারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এমন কয়েকটি ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হাতে আছে। যেমন, বিয়েলা-র ধূমকেতু (Biela's comet)। 1826 সালে আবিষ্কৃত এই ধূমকেতুটি প্রায় 6.6 বছর অন্তর নিয়মিতভাবে বারবার দেখা দিয়ে 1845-46 সালে দেখা দিল এক বিশেষ রকম পরিবর্তিত রূপে—অনেকটা নাশপাতি বা পেঁয়াজের আকৃতিতে। এরপর দেখতে দেখতে দিন দশেকের মধ্যে ধূমকেতুটি দু'ভাগে ভেঙে গেল। পরের বার, অর্থাৎ 1852 সালে, বেশ কিছুটা দূরত্বের ব্যবধানে কিন্তু প্রায় একই পথ ধরে দু'টি ধূমকেতু এল। সেই শেষ। পরবর্তী নির্ধারিত সময়গুলোতে আর কখনো কোনো ধূমকেতু আসেনি। কিন্তু বছরের নির্দিষ্ট এক সময়ে (নভেম্বরের শেষ দিকে) কখনো কখনো কয়েক রাত ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কাপাত হতে দেখা গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এ-কথা মনে করার কারণ আছে যে, ওই উল্কাগুলো বিয়েলা-র ধূমকেতুর ভগ্নাবশেষ।

ধূমকেতুরা আকারে কত বড় হতে পারে? ওদের ভরের পরিমাণই বা কী?

আকারের দিক থেকে বিচার করলে সৌরজগতের মধ্যে ধূমকেতুদের স্থান শ্রেণীগত ভাবে সবচেয়ে ওপরে—গ্রহ প্রভৃতি তো কোন ছার, সূর্যও অনেক ধূমকেতুর কাছে মাথা হেঁট করে। চওড়ায় বা উচ্চতায় তেমন না হলেও, লম্বায় এক একটি ধূমকেতু তুলনাবিহীন ব্যাপ্তির অধিকারী হতে পারে। ধূমকেতুর মস্তক হয় প্রায় গোলাকৃতি এবং তার ব্যাস কমপক্ষে প্রায় 29,000 কিলোমিটার (18,000 মাইল) থেকে সবচেয়ে বেশি প্রায় 18,40,000 কিলোমিটার (11,50,000 মাইল) পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। আর পুচ্ছের দৈর্ঘ্য? 1843 সালে পরিদৃষ্ট একটি ধূমকেতুর পুচ্ছ ছিল প্রায় 33,00,00,000 কিলোমিটার (20,50,50,000

মাইল) লম্বা। এইটিই অবশ্য দীর্ঘতম পুচ্ছ বলে পরিগণিত।

কিন্তু ভরের দিক থেকে ধূমকেতুরা হয় হাস্যকর রকমের তুচ্ছ। বিরাটকায় একটি ধূমকেতুর ভর স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর ভরের লক্ষ ভাগের চেয়ে কম হতে পারে। এ-থেকে ধূমকেতুদের ঘনত্ব কেমন তা সহজেই অনুমেয়। মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল কৌতুক ক'রে ধূমকেতুদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, ওরা হচ্ছে বস্তা-বোঝাই শূন্যতা (Bags full of nothing)।

একটি ধূমকেতু সূর্যকে পরিক্রমণ করতে কত সময় নিতে পারে?

যে-সব ধূমকেতু পৌনঃপুনিক নয়, তাদের ক্ষেত্রে পরিক্রমণ-কালের প্রশ্ন ওঠে না। যারা উপবৃত্তাকৃতি পথে বারবার ঘুরে ঘুরে আসে, তাদেব নির্দিষ্ট পরিক্রমণ-কাল

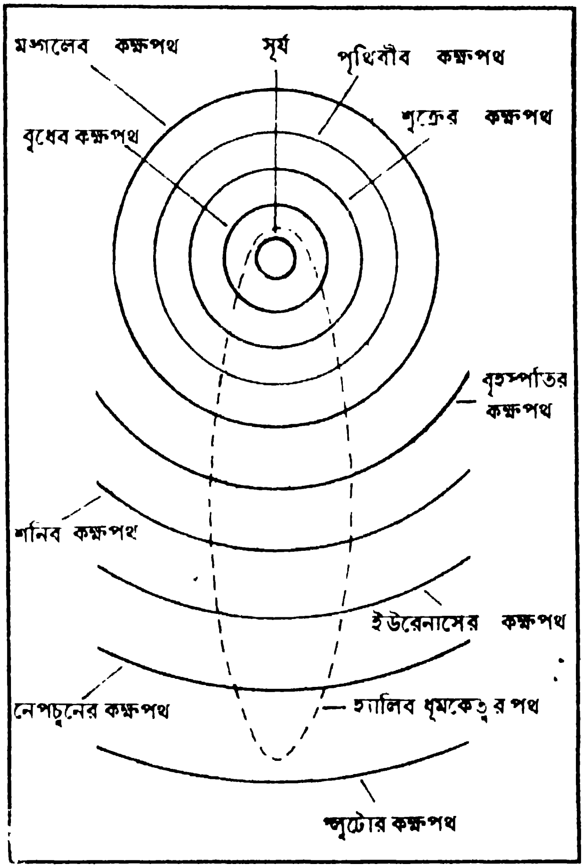
হ্যালির ধূমকেতু কি স্বল্পমেয়াদী

থাকে এবং তার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ধূমকেতুদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—স্বল্পমেয়াদী (Short period) এবং দীর্ঘমেয়াদী (Long period)। স্বল্পমেয়াদী হচ্ছে সেইগুলি যাদের একটি সম্পূর্ণ পরিক্রমণে সময় লাগে 150 বছরের কম। আরো বেশি সময় যারা নেয়, তারা দীর্ঘমেয়াদী। স্বল্পমেয়াদীদের মধ্যে যার সময় স্বল্পতম তার নাম এঙ্কে-র ধূমকেতু (Encke's comet)। এটি মাত্র 3·3 বছর সময়ে একবার সূর্যকে পরিক্রমণ করে। সুবিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু (Halley's comet) এই শ্রেণীতেই পড়ে। এর সময় লাগে প্রায় 76 বছর। দীর্ঘমেয়াদীর এক দৃষ্টান্ত কোহুতেক-এর ধূমকেতু (Comet Kohoutek)। এটি দেখা দিয়েছিল 1973 সালে। আবার দেখা দেবে প্রায় 75,000 বছর পরে।

ধূমকেতুদের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতুর নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত কেন? এই ধূমকেতুটির বিশেষত্ব কী?

একাধিক কারণে হ্যালির ধূমকেতু সাধারণ মানুষের কাছে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছেও এক বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে।

সবচেয়ে বড় কারণ ধূমকেতুটির ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ বা যোগসূত্র। এই ধূমকেতুটি প্রায় প্রতি 76 বছর অন্তর (অর্থাৎ প্রতি শতাব্দীতে একবার অথবা দু'বার করে)



হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ

বারবার মানুষের চোখে ধরা দিয়েছে এবং প্রায় প্রতিবারেই তার আকার-আকৃতি এবং ঔজ্জ্বল্য হয়েছে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে নেবার মত। তার আগেও হয়তো লক্ষিত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব 240 অব্দ থেকে 1986 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 30 বার এই ধূমকেতুর আর্বিভাবের নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করছে মানুষের নানা রচনা—যার মধ্যে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক রচনা তো আছেই, আছে সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতিও। তখন জানা ছিল না, কিন্তু নিয়মমত 1682 খ্রিস্টাব্দে এই ধূমকেতুটির দেখা দেওয়ার কথা ছিল এবং দেখা দিয়েও ছিল। তখন শ্রুতকীর্তি ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালি অনেক রাত ধ'রে ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তার গতিপথ নির্ধারণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, বেশ লম্বাটে এক

উপবৃত্তাকৃতি পথে ধূমকেতুটি সূর্যকে পরিক্রমণ করছে এবং একবার পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করতে 75-76 বছরের মত সময় নিচ্ছে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, 1758-59 সালে আবার ওই ধূমকেতুটির আর্বিভাব হবে। হ্যালির চিন্তা-ভাবনা এবং গণনাকে সার্থক ক'রে সত্যিই ধূমকেতুটি 1758 সালের ডিসেম্বরে দেখা দেয়। আর অতীতে প্রতি প্রায় 76 বছরের ব্যবধানেও যে ওই বিশাল এবং উজ্জ্বল ধূমকেতুটিই বহুবার

ধূমকেতুরা কি সৌরজগতের সদস্য?

দেখা দিয়েছিল, ইতিহাসের নানা উপাদান থেকে তা-ও প্রতিষ্ঠিত হল। ধূমকেতুদের যে সৌরজগতের সদস্য বলা যায়, অর্থাৎ গ্রহ প্রভৃতির মত ওদেরও গতিবিধি যে মুখ্যত সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই সত্য প্রথম হ্যালির ধূমকেতুর সাহায্যে প্রতিপন্ন হয়। দৃষ্ট প্রতিটি ধূমকেতু যে আলাদা নয়—ওদের মধ্যে বেশ কিছু ঘুরে ঘুরে আসে, তা-ও প্রথম সপ্রমাণ করে হ্যালির ধূমকেতু। এই কারণেই এই ধূমকেতুটির ঐতিহাসিক মর্যাদা অপরিসীম।

হ্যালির ধূমকেতু বেশ বড় এবং বেশ উজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করে। বৃহত্তর বা উজ্জ্বলতর কোনো ধূমকেতুর কথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জানা নেই এমন অবশ্য নয়। কিন্তু বেশ কয়েকটি বিশেষত্ব এবং ঘটনার একত্র সমাবেশ হ্যালির ধূমকেতুকে অনন্য করে তুলেছে।

নীহারিকা কী? অন্যান্য শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক থেকে এদের পার্থক্য কোথায়?

নীহারিকা মহাকাশে অবস্থিত বিরাট বিরাট গ্যাসপিণ্ড। এদের মধ্যে কিছু কিছু কঠিন বস্তুকণাও বিধৃত থাকতে পারে। এদের আকার-আকৃতিতে সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। নিজস্ব আকার-আকৃতি অনুযায়ী নীহারিকারা পৃথক পৃথক নাম পেয়ে থাকে, যেমন, 'কালপুরুষের বৃহৎ নীহারিকা' (Great Nebula in Orion), 'উত্তর আমেরিকা নীহারিকা' (North America Nebula), 'কর্কট নীহারিকা' (Crab Nebula); তা ছাড়া, সাধারণ লক্ষণের বিচারে নীহারিকারা হতে পারে 'উজ্জ্বল' (Bright) আর 'কৃষ্ণবর্ণ' (Dark)।

গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু এবং উল্কা থেকে নীহারিকাদের এক বড় পার্থক্য ওদের গঠনে। কারণ গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি মুখ্যত কঠিন পদার্থে গঠিত। আবার গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোলাকৃতি বা প্রায় গোলাকৃতি কিন্তু

নীহারিকাদের আকৃতির কি স্থিরতা আছে?

নীহারিকাদের সম্পর্কে সে-কথা আদৌ খাটে না। গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত—এদের অবস্থান সূর্যের ধারে-কাছে এবং গতিবিধি প্রধানত সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নীহারিকারা কিন্তু সব সূর্য থেকে অনেক অনেক দূরে আছে—ওদের আচার-আচরণে সূর্য প্রায় কোনো ছায়াপাতই করতে পারে না।

ধূমকেতুরা যখন সূর্যের কাছে আসে তখন ওরা মুখ্যত গ্যাসপিণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনই ধূমকেতুর মস্তকে কিছু কিছু ছোট-বড় কঠিন বস্তুখণ্ড থেকে যায়। আর সূর্য থেকে দূরে সরে গেলে ধূমকেতুর গ্যাসীয় অংশ বরফের মত কঠিনাবস্থা ফিরে পায় এবং কঠিনরূপেই স্থিত বস্তুখণ্ড-গুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক বৃহত্তর গোলাকৃতি কঠিন বস্তু-সমবায় গড়ে তোলে। অল্প কালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এমন অবস্থান্তর বা রূপান্তর নীহারিকাদের ক্ষেত্রে ঘটে না—ঘটার কারণও অনুপস্থিত। আবার ধূমকেতুরা—অন্তত পক্ষে দৃষ্ট ধূমকেতুরা—সৌরজগতের সদস্য। অতএব ধূমকেতুদের সঙ্গে নীহারিকাদের আরো এক পার্থক্য থেকে যায়।

তারাদের সঙ্গে নীহারিকাদের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য আছে। তারারা গোলাকৃতি কিন্তু নীহারিকাদের

নীহারিকার উত্তাপ কি তার দেহ-উদ্ভূত শক্তি?

আকৃতির কোনো স্থিরতা নেই। তারারাও গ্যাসপিণ্ড কিন্তু তারারা সাধারণত অত্যুত্তপ্ত, অনেক বেশি ভরবিশিষ্ট এবং ঘনত্বসম্পন্ন। সেই তুলনায় নীহারিকাদের তাপমাত্রা, ভর এবং ঘনত্ব অনেক কম। সবচেয়ে বড় কথা তারারা সংযোজন প্রক্রিয়ায় পারমাণবিক রূপান্তরের মাধ্যমে নিজেদের দেহের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন করে যা তাপ, আলো প্রভৃতি রূপে দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নীহারিকারা তা পারে না। নীহারিকারা অনুজ্জ্বল হতে পারে, উজ্জ্বলও হতে পারে; অনুত্তপ্ত হতে পারে, উত্তপ্তও হতে

পারে। কিন্তু নীহারিকার উত্তাপ বা উজ্জ্বলতার কারণ তার নিজস্ব দেহ-উদ্ভূত শক্তি নয়। আশপাশে অবস্থিত তারাদের আলো, তাপ প্রভৃতি বিকিরণের মাধ্যমে লাভ ক'রে নীহারিকারা কিছুটা উজ্জ্বল বা উত্তপ্ত হয়। কখনো কখনো নিকটবর্তী তারার আলোয় নীহারিকার দেহে প্রতিপ্রভা (Fluorescence)-র সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও মূল শক্তির উৎস তো নীহারিকার নিজস্ব নয়—নিকটবর্তী তারার।

নীহারিকা সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কী বলেন?

নীহারিকাদের সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে, তত্ত্ব আছে। কিন্তু এ-কথাটা ওঁরা স্বীকার করেন যে, ওঁদের তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা অনুমান-ভিত্তিক। পৃথিবীর পরীক্ষাগারে পদার্থের যে-সব ধর্ম ওঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং আকাশে নানা রকমের ঘটনা যা ওঁরা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন সেগুলোকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার ক'রে ওঁরা যে বক্তব্য গঠন করেছেন তা অবশ্যই

অতিনোভা কাকে বলে?

যুক্তিসম্মত—কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণসিদ্ধ নয়। আর, ওঁদের মতে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, ওঁদের তত্ত্ব অনুসারে নীহারিকার উৎপত্তি, উদ্‌বর্তন বা পরিণতি যে-ধারায় ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়, তাতে হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ বছর সময় লেগে যায়—দূরবিন সহযোগে মাত্র কয়েক শ' বছরের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ কোথায়?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব অনুসারে, নীহারিকাদের উৎপত্তি একাধিক সূত্রে ঘটতে পারে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে তারকার বিস্ফোরণ (Explosion)। অতি পরিণত, বার্ধক্যদশায় উপনীত কিছু তারা মাঝে মাঝে অভ্যন্তরীণ কোনো কারণে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। হঠাৎ কয়েক দিনের—বা হতে পারে, কয়েক ঘণ্টার—মধ্যে তারাটি বহুগুণ বৃহত্তর এবং উজ্জ্বলতর হয়ে তার পরে ফেটে পড়ে। অমন পরিবর্তিত তারাকে পরিবর্তনের মাত্রা অনুসারে নোভা (Nova) বা অতিনোভা (Supernova) বলা হয়। উল্লিখিত ঘটনার পর তারাটির বর্হিভাগ তার কেন্দ্রীয় ঘন



নোভা

মধ্যভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় অংশটিতে থেকে যায় ভরের সিংহভাগ; এই অংশটি ধীরে ধীরে আবার প্রায় তার পূর্ব আকার এবং ঔজ্জ্বল্যে ফিরে আসে—হয়তো বা কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্তির লক্ষণ নিয়ে। আর উৎক্ষিপ্ত বর্হিভাগ নীহারিকায় পরিণত হয়।

একটি ছোট নীহারিকা অনেক সময়ে ধীরে ধীরে মহাকাশের চতুর্দিকে বিরাজমান ক্ষীণ, লঘু বস্তুসমাবেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বস্তু নিজের দেহের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিতেও পারে। এইভাবে যখন নীহারিকাটি যথেষ্ট ভরবিশিষ্ট হয়ে পড়ে তখন অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণের বলে সেটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে এবং সেই অনুপাতে ঘন থেকে ঘনতব

হয়। সংকোচনের এক পর্যায়ে এসে গেলে নীহারিকাটির ভিতরে এমন প্রচণ্ড চাপ ও তাপের সৃষ্টি হয় যে, পারমাণবিক রূপান্তর শুরু হয়ে যায়—হাইড্রোজেন প্রভৃতি লঘু মৌলগুলো ধাপে ধাপে আরো গুরুভার মৌলে পরিণত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, কিছুটা পদার্থ প্রভূত শক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শক্তিই হচ্ছে তারাদের অভাবনীয় শক্তির উৎস। নীহারিকার অভ্যন্তরে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গেলেই নীহারিকাটি তারায় পরিণত হয় এবং আকাশের রঙ্গমঞ্চে এক নতুন তারকার আবির্ভাব হয়।

কোয়েসার কী ?

কোয়েসার নব-আবিষ্কৃত এক ধরনের জ্যোতিষ্ক। এদের খালি চোখে দেখা যায় না, দেখতে হলে দূরবিন লাগে। কোয়েসার দেখতে তারাদের মত। আগে তারা বলেই গণ্য হয়ে আসছিল। কিন্তু পরে ওদের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ে

কোয়েসার বা quasar—নামটি এসেছে quasi-star বা quasi-stellar object, এই নামগুলো থেকে, সংক্ষিপ্ত হয়ে। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কোয়েসার কিছুটা তারার মত, কিছুটা নয়—ওরা তারকাপ্রতিম বা নক্ষত্রকল্প।

কিন্তু নামের অর্থ যাই হোক, বাহ্য সাদৃশ্য যাই থাক, কোয়েসার অবশ্যই তারা নয়।

কোয়েসার সর্বপ্রথম কবে আবিষ্কৃত হয়?

আকাশের অসংখ্য তারার ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকে কোয়েসাররা সম্ভবত বহুকাল আগেই পরিলক্ষিত হয়েছিল কিন্তু ওরা যে আর পাঁচটা সাধারণ তারা থেকে স্বতন্ত্র কিছু, সে-কথাটা কোনো কোনো কোয়েসার জানান দেয় এই শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ার দিকে।

প্রথম আবিষ্কৃত কোয়েসারের নাম 3C48। এটি আবিষ্কৃত হয় 1960 সালে। কিন্তু এটি অসাধারণ জ্যোতিষ্ক, সেটা বোঝা গেলেও তখন এর স্বরূপ মোটেই উদ্‌ঘাটিত হয়নি। কোয়েসারদের স্বরূপ প্রথম কিছুটা উদ্‌ঘাটিত হয় 1963 সালে 3C273 নামের কোয়েসারটির ক্ষেত্রে। সে-দিক থেকে বিচার করলে শেষোক্ত জ্যোতিষ্কটিই প্রথম আবিষ্কৃত কোয়েসার।

কোয়েসার যে তারা থেকে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন, কোন ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন?

কোয়েসারদের ভিন্নতা সোচ্চারে ঘোষণা করছে ওদের উজ্জ্বলতা। শ্রেণীগত বিচারে কোয়েসার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। এক একটি কোয়েসার এত উজ্জ্বল যে, বেশ কয়েক হাজার কোটি তারাকে একত্র করলেও তাদের সমকক্ষ না হতে পারে। অথচ কোয়েসার আকারে সেই তুলনায় বেশি বড় নয়। এতে ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেছে, ঘটনা হয়ে পড়েছে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য। কেন না, প্রচুর পরিমাণে দ্রুত শক্তি উৎপন্ন করার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী যে-প্রক্রিয়ার কথা বিজ্ঞানীদের এখন পর্যন্ত জানা আছে (জেনেছেন এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে আইনস্টাইন প্রমুখ কয়েকজন মহাবিজ্ঞানীর কৃতিত্বে), যে-প্রক্রিয়ায় তারারা তাদের শক্তি সৃষ্টি করে, তা কোয়েসারের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

তারারা তাদের দেহের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড চাপ ও তাপের মাধ্যমে রূপান্তর ঘটায়। এই প্রক্রিয়ায় লঘু মৌল ধাপে ধাপে আরো আরো ভারি মৌলে পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে কিছুটা পদার্থের বিনিময়ে বহুগুণ শক্তি উপজাত হয়। এখন এই প্রক্রিয়া প্রচণ্ড বেগে চালাতে হলে লঘু মৌল, যাকে কতকটা কাঁচা মাল বা জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজন, প্রভূত পরিমাণে তার দেহের অভ্যন্তরে থাকা জরুরি, আর তার জন্য প্রয়োজন বিরাট আধার। কোয়েসার যে আকারে তেমন বড় নয়, বরং ঔজ্জ্বল্যের অনুপাতে খুবই ছোট, আবিষ্কৃত এই সত্য বিজ্ঞানীদের যেন অকূল পাথারে ফেলে দিয়েছে।

কোয়েসার কি বিশ্বের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক?

কোয়েসারদের আরো কয়েকটি রহস্যজনক অসাধারণত্ব আছে। ওরা কেউ পৃথিবী বা সূর্যের ধারে কাছে নেই। সূর্যের পরেই যেটি আমাদের নিকটতম তারা সেখান থেকে

আমাদের কাছে আসতে আলোর যে সময় লাগে তা 4 বছরের কিছু বেশি, আর 3C273 থেকে আসতে সময় লাগে প্রায় 150 কোটি বছর। অথচ 3C273 আমাদের উল্লেখযোগ্য নিকটতম কোয়েসার। দূরতম কোয়েসার 3C9 থেকে আলো আমাদের কাছে আসতে সময় নেয় প্রায় 1000 কোটি বছর। এই সব অকল্পনীয় দূরত্বের কারণেই কোয়েসার প্রকৃতপক্ষে অত্যুজ্জ্বল হয়েও, আপাতদৃষ্টিতে প্রায় নিষ্প্রভ। ওদের ঔজ্জ্বল্য হিসেব ক'রে বুঝে নিতে হয়; শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে দেখেও কিছুমাত্র আঁচ করা যায় না।

কোয়েসার কি তারাদের মত অসংখ্য?

না, আবিষ্কৃত কোয়েসারের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত হাজারের নীচেই আছে।

কোয়েসার কী-ভাবে আবিষ্কৃত হল?

কোয়েসার আবিষ্কৃত হল ওদের কতকগুলোর এক বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে। এই শেষোক্ত ধরনের কোয়েসারগুলো শুধু যে আলো পাঠায় তাই নয়, সেই সঙ্গে পাঠায় তীব্র রেডিও-তরঙ্গ।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, প্রায় সব তারাই কিছু না কিছু পরিমাণে রেডিও-তরঙ্গ পাঠায়, কিন্তু তার পরিমাণ খুবই ক্ষীণ। তাই খুব কাছের তারা সূর্য ছাড়া আর কোনো তারার ক্ষেত্রে ওঁরা বিশেষ চেষ্টা ক'রেও সেই রেডিও-তরঙ্গ ধরতে পারছিলেন না। এমন সময়ে আবিষ্কৃত হল দু' তিনটি কোয়েসার। দেখা গেল যে, দেখতে তারার মত বটে কিন্তু

কোয়েসার কি রেডিও-তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম?

ওরা সুতীব্র রেডিও-তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম। ওদের এই চমকপ্রদ অসাধারণত্বই প্রথম ওদের দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি প্রবলভাবে আকর্ষণ করল। ওদের গভীরতর চরিত্রগত পার্থক্য ধরা পড়ল 'বর্ণালী-বিশ্লেষণ' (Spectroscopic analysis)-এর মাধ্যমে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্য কী? এর সার্থকতা কোথায়?

সভ্যতার দীর্ঘ যাত্রাপথে নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এক সময়ে মানুষের এক মূল্যবান উপলব্ধি হয়েছে। ইংরেজ দার্শনিক ফ্র্যান্সিস বেকন-এর ভাষায়—সে উপলব্ধি হল, Knowledge is power, অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি। মানুষ বুঝেছে যে, কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হলে তা অবশ্যই বিফল হয় না—কোনো-না-কোনো ভাবে কখনো-না-কখনো তা কাজে লাগেই। মূল্যবান এই শিক্ষা ইতিপূর্বে বহু ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত সচ্ছলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মানুষের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রকে অনেক পরিমাণে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে, মানুষকে দিয়েছে অনেক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি। আধুনিক মানুষ তাই অনেক সময়েই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে জ্ঞান-চর্চা করে না, অনেক ক্ষেত্রে এখন মানুষের কাছে জ্ঞানেই জ্ঞানের সার্থকতা।

কিন্তু সুদূর অতীতে, মানবসভ্যতার ঊষাকালে অবস্থাটা অবশ্যই এমন ছিল না, তখন মানুষ ছিল খুবই সমস্যা-পীড়িত, অত্যন্ত অসহায়। তখন মানুষ তার জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে বাঁচা-মরার সংগ্রামে নিযুক্ত। জ্ঞান-চর্চার পক্ষে পর্যাপ্ত অবসর বা তার উপযোগী মানসিকতা তখন মানুষের মোটেই ছিল না। মানুষ জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চা বা

ক্যালেণ্ডার কি আকাশ-চর্চার ফল?

আকাশ-চর্চা শুরু করে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। সে-যুগে—এবং পরবর্তী অনেক কাল পর্যন্ত—মানুষের আকাশ-চর্চা ছিল রীতিমতো উদ্দেশ্যমূলক। আকাশ-চর্চার যথেষ্ট ব্যবহারিক মূল্য আছে, এ-কথা বুঝতে পেরেই তখন মানুষ চাঁদ, সূর্য প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহে মনোনিবেশ করে।

সভ্যতার অগ্রগতির পিছনে মানুষের এই আকাশ-চর্চার অবদান অপরিসীম। মাত্র একটি, দু'টি ঘটনা থেকেই তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। মানুষ যে কাল-নির্ণয় এবং কাল-পরিমাপ করতে শিখেছে—ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতির পরিকল্পনা করতে পেরেছে তা আকাশ-চর্চার প্রত্যক্ষ ফল। মানুষ যে কৃষির মাধ্যমে অনেকাংশে নিজের খাদ্য নিজেই উৎপন্ন করে নেয়, তা সম্ভব হয়েছে মানুষ ঋতুচক্রের আবর্তনের রীতিনীতি বুঝতে পেরেছে বলে, আর সে-কৃতিত্ব ক্যালেণ্ডার রচনার কৃতিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ সেখানেও রয়েছে আকাশ-চর্চার ভূমিকা।

কাল-নির্ণয় বা কাল-পরিমাপের ব্যাপারে আকাশ-চর্চা মানুষকে কী-ভাবে সাহায্য করেছে?

ঘটনাবলী যে-ভাবে ঘটেছে তাতে কাল নির্ণয় বা কাল পরিমাপের ব্যাপারে মানুষ প্রায় সর্বতোভাবে আকাশের কাছে ঋণী।

কাল অর্থাৎ সময়ের প্রধান ধর্ম তার গতিশীলতা। কাল কখনো স্থির নয়। আর কালের গতির সঙ্গে যে কোনো কিছুর পরিবর্তনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক—একটিকে অবলম্বন ক'রেই অপরটি ঘটে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অকল্পনীয়। প্রতিটি বর্তমান মুহূর্ত মুহূর্তকাল পরেই অতীতের এক মুহূর্তে পরিণত হয়ে যাচ্ছে—এই নিত্য ঘটনাই হচ্ছে কাল-প্রবাহ। আমরা এই প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হই পরিবর্তনের মাধ্যমে। যে-কোনো একটি মুহূর্ত অপর যে কোনো একটি মুহূর্ত থেকে ভিন্ন—অন্তত কিছু না কিছু ওদের ভিন্নতার স্বাক্ষর বহন করছেই। সে-ভিন্নতা আসতে পারে একটি গাছের পাতার নড়াচড়ার মাধ্যমে, আসতে পারে অন্য রকম হাজার হাজার পরিবর্তনের মাধ্যমে।

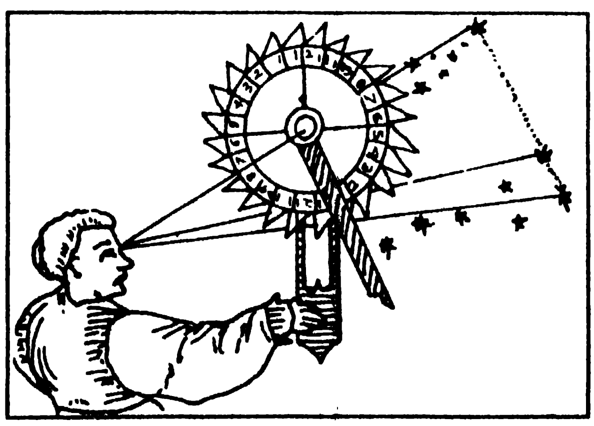
একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, কাল প্রবাহের হিসেব রাখতে হলে একটি পর্যায়ক্রমিক (Periodic) ঘটনার প্রয়োজন—এমন এক ঘটনা যার সুস্পষ্ট শুরু আছে, শেষ আছে, আছে মধ্যবর্তী ব্যাপ্তিকাল এবং শেষের পরেই যে ঘটনা আবার নতুন করে ঘটতে শুরু করে, ঘটে চলে অনুরূপভাবে বারবার। অমন ঘটনা পরপর দুবার শুরু হবার মধ্যবর্তী ব্যবধান কালকে কাল মাপের একক (Unit) করে নেওয়া যায়, তার কোনো গুণিতক বা ভগ্নাংশকে ব্যবহার ক'রে বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর কাল পরিমাণকে প্রকাশ করা যায়। অমন ঘটনার অনেক দৃষ্টান্ত এখন আমাদের চারপাশে ছড়ানো রয়েছে, যেমন, ঘড়ির বড় কাঁটার এক জায়গা থেকে যাত্রা শুরু ক'রে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসা। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাল-ব্যবধানকে আমরা নাম দিয়েছি ঘণ্টা (Hour)। তেমনি ছোট কাঁটার সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরে আসা বা ঘড়ির দোলক (Pendulum)-এর দোল সম্পূর্ণ হওয়া। এগুলো সবই আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাল-পরিমাণকে প্রকাশ করতে কাজে লাগাই। কিন্তু এগুলো সব একই ধরনের ঘটনা—এরা কৃত্রিম অর্থাৎ এরা মানুষের পরিকল্পনা বা চেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্য ধরনের ঘটনাও আছে। সেগুলো মানুষের চেষ্টা-নিরপেক্ষ, প্রাকৃতিক ঘটনা।

আদিম মানুষ পর্যায়ক্রমিক ঘটনা হিসেবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছিল আকাশের কয়েকটি ঘটনাকে। সেই সূত্রেই গঠন করেছিল তার সময় মাপের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রধান কয়েকটি একক। আজও বিচার-বিবেচনার সাহায্যে একটু সংস্কার ক'রে নিয়ে মানুষ সেই এককগুলো ব্যবহার ক'রে চলেছে—দিন (Day), মাস (Month) আর বছর (Year)। এই এককগুলি মানুষ প্রাথমিকভাবে পেয়েছে যথাক্রমে সূর্য, চন্দ্র এবং রাতের আকাশের তারাদের কাছ থেকে, তাদের গতিবিধির ছন্দ অনুধাবন ক'রে।

আদিম মানুষের পক্ষে আকাশের কয়েকটি ঘটনাকে অবলম্বন করা শুধু যে স্বাভাবিক ছিল তাই নয়; সব দিক বিচার করলে সে-যুগে তার কোনো বিকল্প ছিল না।

দিন, মাস এবং বছর—আকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত সময়ের এই এককগুলি ঠিক কি ভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল?

কাল-নির্দেশ বা কাল-পরিমাপ করতে হলে কোনো না কোনো পর্যায়ক্রমিক বা পৌনঃপুনিক ঘটনার প্রয়োজন পড়ে। আদিম মানুষ নিজের প্রয়োজনমত বৃহৎ থেকে বৃহত্তর একক গঠন করতে এক এক ক'রে তিনটি ঘটনাকে বেছে নিয়েছিল, গঠন করেছিল তিনটি প্রধান একক—দিন, মাস এবং বছর। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও মানুষ তার সাধ্য এবং বিচারবুদ্ধি অনুসারে নির্ণয় করেছিল।



রাতের আকাশে তারা দেখে সময় নির্ণয়ের যন্ত্র 'নক্টারনাল'

মানুষের নির্বাচিত প্রথম ঘটনা সূর্যের পর্যায়ক্রমে উদয়াস্ত। এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় বা এক সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল-পরিমাণ হয়ে উঠেছিল মানুষের কাছে সময়ের মাপ প্রকাশের প্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একক। এর নাম দিন। পরবর্তী কালে দিনের সংজ্ঞাকে আরো সুনির্দিষ্ট, আরো সুচারু করে তোলা হয়েছে, কিন্তু প্রধান অবলম্বনটি আজও মূলত অভিন্ন। বলা বাহুল্য, এখানে দিন কথাটি প্রচলিত দু'টি অর্থের মধ্যে যেটি ব্যাপকতর সেই অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ এখানে দিনের অর্থ দিবা-রাত্রি—শুধু তার দিবাভাগ নয়।

সাধারণভাবে দিনের সাহায্যে কালের হিসেব রাখায় অনেক কাজকর্ম বেশ চলে যায়। কিন্তু কাল-পরিমাণ বৃহৎ হলে দিনের সাহায্যে তা প্রকাশ করা অসুবিধেজনক। বিশেষ করে যে-যুগে মানুষ খুব বড় বড় সংখ্যার ধারণা করে উঠতে পারেনি, বা তাদের প্রকাশ করার কৌশল উদ্ভাবন করে উঠতে পারেনি, সেই যুগে অসুবিধে ছিল আরো অনেক বেশি। এই সব কারণে কাল-পরিমাপের বৃহত্তর এককের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ-প্রয়োজন মেটাতে মানুষ অন্য এক আকাশীয় ঘটনার শরণাপন্ন হয়। মানুষের বেছে নেওয়া দ্বিতীয় ঘটনা ছিল চাঁদের কলা (Phase)-র হ্রাসবৃদ্ধি। মানুষ লক্ষ করেছিল যে, কোনো একদিন রাতের আকাশে চাঁদ এক সুগঠিত, সম্পূর্ণ বৃত্তাকৃতি রূপে দেখা দিলে পরবর্তী কতকগুলো রাতে চাঁদের রূপ হতে থাকে

আজকে একটি তারার উদয় যে-সময়ে, আগামীকাল তার উদয় হবে কত আগে?

ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর—আরো আরো ক্ষয়প্রাপ্ত; এর পরিণতি হিসেবে এক সময়ে চাঁদ সারা রাত ধরে আকাশে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত থাকে; তারপর বিপরীতমুখী ঘটনা-পরম্পরা ঘটতে শুরু করে, অবশেষে আবার চাঁদ তার পূর্বের পূর্ণরূপ ফিরে পায়। ব্যাপারটা হল, আমাদের এখনকার প্রচলিত ভাষায়, পালাক্রমে পূর্ণিমা (Full moon) এবং অমাবস্যা (New moon) হওয়ার ঘটনা। এই বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরাকে মানুষ কাজে লাগিয়েছিল। এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা, বা এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল মানুষের কাছে সময়ের হিসেব রাখার এক বৃহত্তর, সুবিধেজনক একক—মাস।

মাসের চেয়ে বড় একক পেতে মানুষকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ তৃতীয় যে-ঘটনাটি মানুষ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল, তা অনুধাবন করতে প্রচুর সময়, ধৈর্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি এই যে, রাতের আকাশের রূপ প্রতিরাত্রে একরূপ নয়—পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে তার এক পরিবর্তন ঘটে। কোনো একটি বিশেষ তারাকে—ধরা যাক, রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধক-কে—বেছে নিয়ে যদি রাতের পর রাত তাকে দেখার চেষ্টা করা হয়, তবে দেখা যাবে সে-চেষ্টা প্রতি রাত্রে সফল হবে না এবং সফল হলেও সাফল্যের বেশ কিছুটা প্রকারভেদ ঘটবে। হয়তো কিছুকাল ধরে প্রতি রাত্রেই তাকে দেখা যাবে, তারপরে মাস দুই-তিন ধ'রে মোটেই দেখা যাবে না, তারপরে আবার প্রতি রাত্রেই দেখা দিতে থাকবে। শুধু তাই নয়। দেখা যাবে যে, কয়েক মাসের মত অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে তারাটি শেষ বার যে-দিন দেখা দেবে, সেদিন দেখা দেবে সন্ধ্যায়—পশ্চিম আকাশে। এর পরে আবার যখন দেখা দিতে শুরু করবে, তখন আত্মপ্রকাশ ঘটবে কোনো এক শেষ রাতে—পুব আকাশে। এ কোনো বিশেষ তারার কথা নয় কিন্তু। রাতের আকাশের প্রতিটি তারা সম্পর্কেই কথাটা প্রযোজ্য। সেই সঙ্গে আরো একটি কথা আছে। কিছুকাল অদৃশ্য থাকার পর প্রথম যে-দিন তারাটি শেষ রাতে পুব আকাশে দেখা দেবে, সে-দিন তাকে বেশিক্ষণ ধরে পাওয়া যাবে না—অল্প কিছুক্ষণ পরেই উদীয়মান সূর্যের উজ্জ্বল আলোর আভায় তারাটি চাপা পড়ে যাবে। পরদিন আবার শেষ রাতে তারাটি দেখা দেবে, কিন্তু আগের দিনের চেয়ে একটু আগে—প্রায় 4 মিনিট আগে; ফলে তাকে পাওয়া যাবে ওইটুকু বেশি সময় ধ'রে। পরদিন আরো প্রায় 4 মিনিট আগে। এইভাবে প্রতি রাত্রে আকাশে তারাটিকে দেখতে পাওয়ার সময়টা দৈর্ঘ্যে বাড়তে থাকবে এবং বাড়তে বাড়তে কোনো এক রাতে তারাটিকে সন্ধ্যা থেকে শেষ রাত পর্যন্ত প্রায় সারাক্ষণ ধ'রে দেখা যাবে—বলা বাহুল্য, আকাশের এক জায়গায় স্থির রূপে নয়, ধীরে ধীরে পুব থেকে পশ্চিমে সঞ্চরণশীল রূপে। তার পরদিন থেকে এই সময়ের মাত্রা কমতে থাকবে, প্রতিদিন প্রায় 4 মিনিট

পরিমাণে। অবশেষে আবার এক সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে অল্প কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়েই তারাটি অস্ত যাবে। তার পরদিন থেকে আর তাকে দেখা যাবে না—রাতের কোনো সময়েই নয়। তখন চলবে, যাকে বলা যায়, কয়েক মাস ধ'রে তারাটির অজ্ঞাতবাসের পালা। রাতের আকাশের এই পর্যায়ক্রমে রূপ বদলের পালা সাঙ্গ হতে যে সময় লাগে তাই হল বৎসর। অর্থাৎ রাতের আকাশের কোনো একটি তারার অজ্ঞাতবাসে যাবার পরের রাত থেকে আবার পরের বার অনুরূপ ভাবে অদৃশ্য হবার ব্যবধান-কাল হল এক বৎসর। এর সঙ্গে শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুগুলোর আনাগোনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে—সেটা বোঝা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু গাত্র-ত্বকের অনুভূতির সাহায্যে তার হিসেব ঠিক মত রাখা যায় না, হিসেব রাখতে হয় রাতের আকাশের তারাদের অবস্থান, তাদের উদয় বা অস্তগমন লক্ষ ক'রে। প্রাচীনকালের মানুষ তাই করেছিল।

আকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সে-যুগের মানুষ দিন, মাস, বছরের ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং ওদের মধ্যে সম্পর্কের এক সূত্র নির্ধারণ করেছিল। সে-সম্পর্কসূত্র নিখুঁত নয়—কিন্তু খুব যে ত্রুটিযুক্ত ছিল, তা-ও নয়। সে-যুগের হিসেবে, মাসে থাকতো 30টি দিন, আর বৎসরে 12টি মাস অর্থাৎ 360 দিন।

আজকাল দিন, মাস এবং বছর সময়ের এই এককগুলোকে মানুষ যে-অর্থে, যে-ভাবে গ্রহণ এবং ব্যবহার ক'রে থাকে, তাতে আকাশের ঘটনাবলীর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী দাঁড়িয়েছে?

দিন ও বছরের আধুনিক অর্থ কম-বেশি আগের মতই আছে—ওরা এখনও অনেকাংশে আকাশীয় ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পরিবর্তন অল্প-স্বল্প যা করা হয়েছে, তা করা হয়েছে প্রধানত ওদের দৈর্ঘ্যকে সুনির্দিষ্ট করতে। ওদের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, তাতে ব্যাপারটা প্রায় ত্রুটিমুক্ত হয়ে গেছে।

মাসের ক্ষেত্রে কিন্তু (আগের যুগের অর্থ থেকে) বিচ্যুতি এখন অনেক বেশি। তার ফলে আকাশের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর। আকাশের কোনো দৃশ্য ঘটনার সঙ্গে মাসের দৈর্ঘ্য আর তেমন সরাসরিভাবে যুক্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে, মাস কথাটার অর্থ এখন একটু অনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, ক্ষেত্রবিশেষে এখন ওর দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট হয়—সদা-সর্বদা একই মাপের থাকে না।

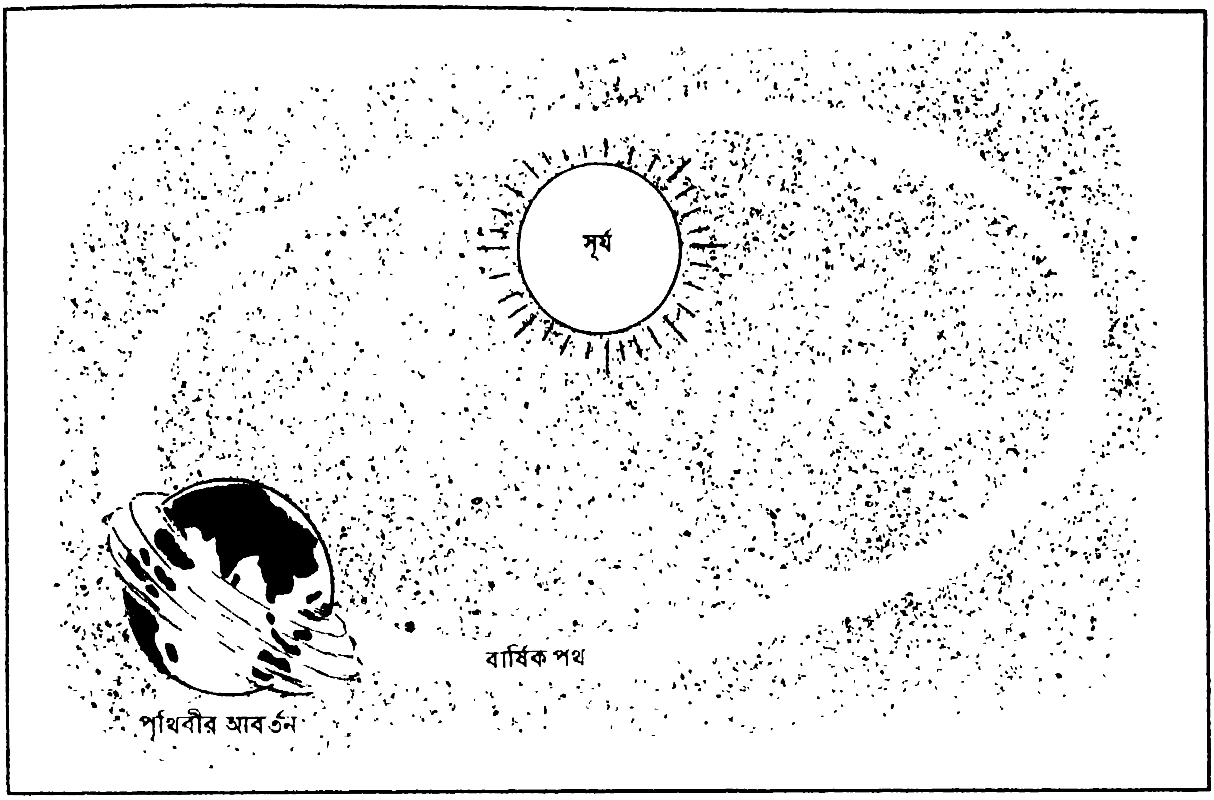
দিন, মাস ও বছর সুদূর অতীতে পরিকল্পিত এই এককগুলির আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত অর্থ কী?

সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়, বা সূর্যাস্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল-পরিমাণকে দিন বলে গ্রহণ করার যে-রীতি প্রাচীনকালে গৃহীত হয়েছিল (এবং এখনও ধর্মীয় বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অনেক সময় গৃহীত হয়ে থাকে), তা বিজ্ঞানানুমোদিত নয়। কারণ, প্রতি দিন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পূর্ব দিনের সঙ্গে তুলনা করলে একই সময়ে হয় না।

কোন মাসে পৃথিবী সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে থাকে?

ঋতুভেদে তো বটেই, এমন কি মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানেই সময়ের এই তফাতটুকু সাধারণ মানুষের চোখেও ধরা পড়ে। ফলে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সাহায্যে দিন-নির্ণয় করা হলে দিনের দৈর্ঘ্য সমান থাকে না—তার বেশ কিছুটা তারতম্য ঘটে। বিজ্ঞানীরা তাই সূর্যের উদয় বা অস্তকে ছেড়ে দিয়ে, তার মধ্যগগনে আসাকে গ্রহণ করেছেন। অতএব এখন দিন হচ্ছে সূর্যের পর পর দু'বার মধ্যগগনে আসার মধ্যবর্তী কাল-পরিমাণ।

মধ্যগগনে আসাকে ইংরেজিতে বলে culmination। বাংলায় বলা যাক 'রোহণ'। রোহণ দু'ভাবে হতে পারে—'আরোহণ' আর 'অবরোহণ', ইংরেজিতে যাদের বলা হয় যথাক্রমে upper culmination আর lower culmination। প্রথমটি ঘটে যখন সূর্য নভোমধ্যরেখা (Celestial meridian)-র ওপরে আসে এবং দর্শকের মাথার ওপরে তাকে দেখা যায়। নভোমধ্যরেখা মানে যে-বৃত্তটি নভোগোলক(Celestial sphere)-কে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ আকাশকে, পূর্বার্ধ এবং পশ্চিমার্ধে বিভক্ত করে। সূর্য এই বৃত্তের ওপরে এমন ভাবেও আসতে পারে যাতে তাকে দেখার প্রশ্ন ওঠে না—সূর্য তখন থাকে মাথার ওপরে নয়,



পায়ের নীচে। তার সেই অবস্থান হিসেব ক'রে নির্ণয় করা যায়—এ-ঘটনা ঘটে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে। এটাই হচ্ছে অবরোহণ। সূর্যের আরোহণ ঘটে মধ্যদিনে বা মধ্যাহ্নে, অবরোহণ মধ্যরাত্রে। আধুনিক বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে, সূর্যের অবরোহণ ঘটলে একটি দিনের শুরু; পরের অবরোহণে সে-দিনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী দিনের শুরু। শুরু বা শেষ আরোহণের সাহায্যেও সূচিত করা যেত, কিন্তু নিছক ব্যবহারিক সুবিধে-অসুবিধের কারণে—অবরোহণকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এতেও সমস্যা অল্প কিছুটা থেকে যায়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে যখন পৃথিবী সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে থাকে তখন পৃথিবীর সূর্যকে ঘিরে ছোটার বেগটা যায় বেড়ে। এতে সূর্যের দুই অবরোহণের (আরোহণেরও বটে) মধ্যে ব্যবধানটা একটু দীর্ঘ হয়। বিপরীত ঘটনা ঘটে জুন-জুলাই মাসে, তখন ব্যবধান হয় কিছুটা হ্রস্ব। এই ত্রুটিটুকু দূর করতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রকৃত, অর্থাৎ দৃশ্য সূর্যকে ত্যাগ করেছেন; তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এক কাল্পনিক সূর্যকে—যার নাম হয়েছে ইংরেজিতে mean sun, বাংলায় বলা যাক 'মধ্যগ সূর্য'। মধ্যগ সূর্যের সঙ্গে প্রকৃত সূর্যের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে নেওয়া হয়েছে। সম্পর্কটা জটিল কিন্তু সুস্পষ্ট, সুস্থির। সে-সম্পর্ক অনুসারে মধ্যগ সূর্য বছরের কোনো কোনো সময়ে যেন আকাশে প্রকৃত সূর্যের কিছুটা আগে অর্থাৎ পশ্চিমে থাকে, আবার কোনো কোনো সময়ে একটু পিছনে অর্থাৎ পুবে, আবার কোনো কোনো সময়ে ওরা থাকে পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে। মধ্যগ সূর্যের গুণ এই যে, তার মধ্যগগনে আসার সময়ের কোনো নড়চড় হয় না। আমরা যে সময় এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করি—বিজ্ঞান-সম্মত এই সময় বৈজ্ঞানিক কাজে-কর্মেও ব্যবহৃত হয়—তা হল mean solar time বা মধ্যগ সৌরকাল। আমাদের ঘড়িতে যখন দুপুর 12টা বাজে, তখন বুঝতে হয় মধ্যগ সূর্যের আরোহণ ঘটেছে। প্রকৃত বা দৃশ্য সূর্যের আরোহণ তখনই ঘটতে পারে, আবার না-ও পারে। হতে পারে, প্রকৃত সূর্যের আরোহণ তার অল্প কিছুটা আগে ঘটে গেছে, বা হতে পারে, ঘটবে কিছুটা পরে। তফাতটা নানা মাপের হতে পারে, কিন্তু কোনো দিনই তা মিনিট কুড়ির বেশি নয়। এক

কথায়, দিনের বিজ্ঞান-সম্মত অর্থ এখন যা হয়েছে তাতে দিনের সূচনা এবং সমাপ্তি একেবারে সুচিহ্নিত, তার দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনীয়—অথচ দৃশ্য সূর্যের ভূমিকা তাতে বর্জিত হয়নি, সে-সূর্যকে জড়িত করেই দিনগুলো গড়ে ওঠে।

মাসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের আরো জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। আদিম মানুষ স্থির করেছিল 30 দিনে এক মাস; কারণ মানুষ লক্ষ করেছিল যে, দুই পূর্ণিমা বা দুই অমাবস্যার মধ্যবর্তী কালে 30টি সূর্যোদয় বা 30টি সূর্যাস্ত ঘটে। এই পর্যবেক্ষণে অবশ্য ভুল ছিল না, কিন্তু

দুই অমাবস্যার মধ্যে ব্যবধান কত?

ঘটনাটা এই যে, ওই সময়ের মধ্যে 30 জোড়া সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত ঘটে না। আসলে দুই পূর্ণিমা বা দুই অমাবস্যার ব্যবধান প্রায় 29.5 দিন। কিন্তু একটু বাস্তববুদ্ধি থাকলেই বোঝা যায় যে, দিনের হিসেবে মাসের দৈর্ঘ্য 29.5 বা যে-কোনো ভগ্নাংশ-সমন্বিত সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত করলে, তা ব্যবহারিক জীবনে প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। তা ছাড়া 29.5 সংখ্যাটি গ্রহণ করলে বছরে বা 12 মাসে দিনের সংখ্যা হয় 354—বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ মাপের চেয়ে প্রায় 11 দিন কম। এমন-কী এই দিক থেকে বিচার করলে 30 দিনের মাসও যথেষ্ট নয়—তাতেও দিনের সংখ্যা হয় অন্তত পক্ষে 5 দিন কম। তাই মাসের মাপ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভূত এবং বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত গ্রেগরীয় (Gregorian) ক্যালেণ্ডারে 12টি মাসে পালাক্রমে 30 ও 31 দিন ধার্য করা হয়েছে—ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আর জুলাই-অগাস্টে। শেষোক্ত মাসগুলোর প্রতিটি 31 দিনে গঠিত। ব্যতিক্রম ফেব্রুয়ারি মাসের ক্ষেত্রেও হয়েছে। ও-মাস সাধারণত 28 দিনে, কখনো কখনো 29 দিনে রচিত হয়। বলা বাহুল্য যে, এই ক্যালেণ্ডারে সুন্দর শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। কিন্তু শৃঙ্খলা আরো বিপর্যস্ত ভারতবর্ষে উদ্ভূত এবং ধর্মীয়-সামাজিক কাজ-কর্মে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত অধিকাংশ ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকায়। দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বঙ্গাব্দের **পঞ্জিকাগুলি**। এ-সবে বছরে চান্দ্র মাসের সংখ্যা সাধারণত 12, কিন্তু কোনো কোনো বছরে 13। পর পর মাসগুলোতে দিনের সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সহজ বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এমন-কী যে-কোনো এক বিশেষ মাসে দিনের সংখ্যাও সুনির্দিষ্ট নয়—এক এক বছরে তা এক এক রকম হতে পারে।

বছরের সঙ্গে ঋতুগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং আছে বলেই মানুষের জীবনচর্যায় বছরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বছর মানুষকে সময় মাপের এক সুবিধেজনক একক যুগিয়েছে, আর শিখিয়েছে কী-কৌশলে ঋতুচক্রের আবর্তনের হিসেব রাখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বিশেষ যত্নের সঙ্গে বছরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে চেয়েছে। এক সময়ে মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, তারকা-খচিত রাতের আকাশ প্রতি 12 মাস পর পর তার অবিকল পূর্বরূপ ফিরে পায়, আর তখনকার মানুষের হিসেবে প্রতিটি মাস ছিল 30 দিনে গঠিত। অতএব তখন মানুষের কাছে বছর ছিল 360 দিনের সমষ্টি। একটি সম্পূর্ণ আবর্তনকে 360টি অংশ বা ডিগরির সমবায় রূপে কল্পনা করার যে-রীতি আজও বিজ্ঞানে সুপ্রচলিত, তার মধ্যে মানুষের সেই সাবেক বিশ্বাস ও বুদ্ধির প্রতিফলন রয়েছে। বেশ কিছুকাল পরে মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে। তখন সংশোধন ক'রে বছরে দিনের সংখ্যা ধার্য করে 365 বা বিকল্পে 366। গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে সাধারণত পর পর তিনটি বছরের দৈর্ঘ্য হয় 365 দিনের এবং পরবর্তী চতুর্থ বছরকে দেওয়া হয় অধিক একটি দিন—সেই বছরের দৈর্ঘ্য হয় 366 দিনের।

গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারের প্রবর্তন হয় কবে, কী ভাবে? এই ক্যালেণ্ডার কি সম্পূর্ণ নির্ভুল?

গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারের প্রবর্তন হয় 1582 খ্রিস্টাব্দে—তারিখটা ছিল এই ক্যালেণ্ডারের হিসেবে, অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত ক্যালেণ্ডারের হিসেবে, 15 অক্টোবর। তখনকার পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি (Gregory) এক অনুজ্ঞা বলে এর প্রবর্তন ঘটান। ওঁর নামেই এর নাম হয়েছে গ্রেগরীয় বা Gregorian। এই ক্যালেণ্ডার উদ্ভাবনের কৃতিত্ব অবশ্য ওঁর ছিল না। সে-কাজটা করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, তবে ওঁর আগ্রহ এবং অনুমোদন ছিল।

পূর্বে প্রচলিত ক্যালেণ্ডারটিতে (যেটি প্রায় 1600 বছর ধরে ইউরোপে প্রচলিত ছিল) কিছুটা ভুল ছিল। ভুলের পরিমাণ অল্প, ফলে অনেক কাল পর্যন্ত মানুষ তাতে প্রায় কোনো অসুবিধেই বোধ করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত

হয়ে সেই ভুল পরে বেশ সমস্যার সৃষ্টি করছিল। ঋতুগুলো আর ক্যালেণ্ডারের দিন-ক্ষণ মেনে আসছিল না—তার আগেই এসে হাজির হচ্ছিল। এতে নানা দিক থেকে বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা ঘটছিল। কৃষি প্রভৃতির কাজ বিঘ্নিত হচ্ছিল, সময় মত রাজস্ব আদায় করা যাচ্ছিল না, সামাজিক বা ধর্মীয় পালা-পার্বণগুলোও উপযুক্ত পরিবেশে প্রতিপালিত হতে পারছিল না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এই অসুবিধেগুলি দূর করতে—এবং ওঁদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনেও বটে—জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রচলিত অশুদ্ধ ক্যালেণ্ডারটি পালটাতে চান। ওঁরা হিসেব-পত্র ক'রে যে-নতুন ক্যালেণ্ডার রচনা করেন সেটিই অনুমোদন ক'রে পোপ গ্রেগরি সর্বসাধারণকে তা ব্যবহার করতে বলেন। তখন ইউরোপের সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রভাব খুব বেশি, ফলে পোপেব মতামতের মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই তুলনায় রাজশক্তির প্রভাব ছিল সীমিত—রাজ্যগুলোর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই শুধু কার্যকরী। পোপকে ক্যালেণ্ডার-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করার এটি ছিল এক বিশেষ কারণ।

গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে অনুসৃত রীতি অনুসারে, সাধারণত প্রতি চার বছরের মধ্যে তিনটির দৈর্ঘ্য হয় দিনের হিসেবে 365, আর একটির 366। অধিক দৈর্ঘ্যের বছরকে বলা হয় অধিবর্ষ (Leap year)। অধিবর্ষের অধিক দিনটি যোগ

১৯০০ সাল কি অধিবর্ষ ছিল?

করা হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। অন্যান্য বছরে ফেব্রুয়ারি হয় 28 দিনে, অধিবর্ষে 29 দিনে। কোন বছর অধিবর্ষ আর কোন বছর নয়, তা বোঝার উপায় হল খ্রিস্টাব্দের হিসেবে বছরের ক্রমবাচক সংখ্যা যেটি, সেটিকে 4 দিয়ে ভাগ করা। ভাগশেষ শূন্য হলে অধিবর্ষ, নচেৎ নয়। দৃষ্টান্ত— 1988 অধিবর্ষ, 1992-ও অধিবর্ষ; কিন্তু 1987, 1989 প্রভৃতি অধিবর্ষ নয়। গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে অনুসৃত রীতির এই অংশটুকু পূর্বতন অশুদ্ধ ক্যালেণ্ডারেও অনুসৃত হত। তফাত এইখানে যে, পূর্বতন ক্যালেণ্ডারে এই রীতি ব্যতিক্রমহীন ভাবে ব্যবহার করা হত কিন্তু গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে বিশেষ



মায়া সভ্যতার ২৬০ দিনের পবিত্র বর্ষপঞ্জীর একটি অংশ

বিশেষ ক্ষেত্রে রীতিটিকে লঙ্ঘন করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রগুলি রচনা করে কোনো কোনো শতবর্ষ-পূর্তির বছর। সেখানে নিয়ম হল, 4 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্যতার শর্ত পূরণ ক'রেও যদি বছরের ক্রমবাচক সংখ্যাটি 400 দ্বারা বিভাজ্যতার দাবি পূরণ করতে না-পারে, তবে বছরটি অধিবর্ষ হবে না। দৃষ্টান্ত, বিগত 1600 সাল অধিবর্ষ ছিল, আগামী 2000 সাল অধিবর্ষ হবে; কিন্তু (4 দ্বারা বিভাজ্য হয়েও) 1700, 1800 এবং 1900 সাল অধিবর্ষ হয়নি, হবে না 2100 সাল। এই সব ক্ষেত্রে 3 বছর অন্তর না-এসে, 7 বছর অন্তর অধিবর্ষ আসে।

গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে ঋতু-চক্রের তুলনায় বর্ষচক্রের এগিয়ে এগিয়ে চলার প্রবণতাকে সংযত করা হয়—যে প্রবণতা পূর্ববর্তী ক্যালেণ্ডারকে দোষযুক্ত করে তুলেছিল। কিন্তু সংযত করাই যথেষ্ট নয়, রাশ টানার আগেই যে-অশুদ্ধি ক্যালেণ্ডারে প্রবেশ ক'রে গিয়েছিল তাকে দূর করারও প্রয়োজন ছিল। তাই গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার থেকে 10 দিন সময় বাদ দিতে হয়। 1582 সালের 4 অক্টোবরের পরের দিনটিকে 5 না-বলে, 15 অক্টোবর বলে ঘোষণা করা হয়।

গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার নিখুঁত নয়। খুঁত আছে মাসের দিন-সংখ্যার বিশৃঙ্খলায়। ক্যালেণ্ডারটি সম্পূর্ণ নির্ভুলও নয়—

গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার কি নির্ভুল?

অতি সামান্য একটু ভুল এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু ভুলটুকু জেনে শুনেও আপাতত রেখে দিতে হয়েছে—ও-টুকু দূর করার সহজ কোনো কৌশল নেই। ভুলের পরিমাণ প্রায় 3300 বছরে একদিন। ওতে ব্যবহারিক জীবনে বহুকাল পর্যন্ত কোনো ইতরবিশেষ হবে না, আর প্রয়োজনে 3300 বছর পরে ক্যালেণ্ডার থেকে একটা দিন বাদ দিয়ে দিলে আবার ওই অতগুলো বছরের মত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিচারে গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারের পূর্ববর্তী ক্যালেণ্ডারে ভুল ছিল কোথায়? সে- ক্যালেণ্ডার কী-ভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল?

প্রাক-গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে বছরের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয়েছিল 365 দিন 6 ঘণ্টা বা দিনের হিসেবে, 365.25 দিন। বাস্তবে কিন্তু ঋতু-নিয়ামক যে-বৎসর তার দৈর্ঘ্য হল 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46.08 সেকেণ্ড বা 365.2422 দিন—অর্থাৎ ভুলক্রমে নির্ধারিত দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রায় 11 মিনিট কম। বৎসরের দৈর্ঘ্য একটু বেশি ক'রে ধরার ফলে এই পূর্বতন ক্যালেণ্ডারের বর্ষচক্র প্রকৃতির ঋতুচক্রের তুলনায় একটু এগিয়ে এগিয়ে চলতো, দু'চার বছরে এই তফাত ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু অবাধে চলতে দিলে ক্রমান্বয়ে বেড়ে বেড়ে পুঞ্জীভূত তফাত ক্যালেণ্ডারকে ক্রমশ অব্যবহার্য করে ফেলে। ধরা যাক, ওই ক্যালেণ্ডার আজও প্রচলিত আছে। তাহলে হত কি, দিন-রাত্রির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য-ঘটিত, অর্থাৎ ঋতুদের পরিবর্তন-ঘটিত আমাদের সব হিসেব-পত্রে বড় রকমের গরমিল হত। দীর্ঘ রাত্রি ক্রমশ তার দৈর্ঘ্য হারাতে হারাতে যে-তারিখে দিনের সঙ্গে সমদৈর্ঘ্য হয়ে বসন্তের সূচনা করবে বলে আমরা আশা করতাম, সেই তারিখে না-ঘটে ঘটনাটি অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যেত তার প্রায় 2 সপ্তাহ আগে। কিন্তু সংশোধিত ক্যালেণ্ডারের হিসেবে এখন প্রতি বছরে ওই ঘটনা ঘটছে 21 মার্চ তারিখে—আমাদের হিসেব বা প্রত্যাশা পূরণ করেই।

কিছুটা ভ্রান্ত ওই পূর্বতন ক্যালেণ্ডারের নাম জুলিয় (Julian) ক্যালেণ্ডার। রোমক সম্রাট জুলিয়াস সিজার ওটিকে প্রচলিত করেছিলেন এখন থেকে প্রায় 2 হাজার বছর আগে—46 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। সিজার ওই সময়ে মিশর জয় করেন এবং সেই সূত্রে সেখানকার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী-পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর পরামর্শ মতই সিজার সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ক্যালেণ্ডারটির প্রবর্তন করেন।

মহাকাশ বিজ্ঞান



বিজ্ঞানের আনুকূল্যে এককালে যা ছিল 'বিপুলা এ পৃথিবী', আজ তা এসে গেছে নাগালের মধ্যে। প্রযুক্তি-উদ্ভাবনের ফলে মহাকাশেও আজ তার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে সভ্যতার যে বিচিত্র ইতিহাস মানুষ রচনা করে চলেছে সভ্যতার আদি যুগ থেকে, সে ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা 1957 সালের 4 অক্টোবর। আকাশে উৎক্ষিপ্ত হল স্পুটনিক। সূত্রপাত হল মহাকাশ যুগের।

মহাকাশ যুগে মানুষের অভাবনীয় সাফল্য এক সময়ে চমক তুলেছিল চন্দ্র-অভিযানে। কিন্তু সেখানেই সে থমকে দাঁড়ায়নি। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে তার দিগ্বিজয় যাত্রা সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে চলেছে ক্রমে ক্রমে। নিজের কর্মক্ষমতায় আস্থা রেখে স্বর্ণাক্ষরে যে বর্ণময় অধ্যায় মানুষ ক্রমাগত রচনা করে চলেছে তা যেমনই চাঞ্চল্যকর, তেমনি রোমহর্ষক। মহাকাশ বিজ্ঞানকে ইংরেজিতে বলা হয় Space Science।

'মহাকাশ' আর 'আকাশ'—এই শব্দ দুটি কি সমার্থক বা অন্ততপক্ষে কতকটা তাই—পার্থক্য যা তা শুধু মাত্রাগত বা পরিমাণগত?

না, আকাশ আর মহাকাশ সমার্থক দুটি শব্দ নয়—আদৌ নয়। ইংরেজিতে ওদের প্রচলিত প্রতিশব্দ হচ্ছে যথাক্রমে sky আর space—আলাদা দুটি শব্দ।

বাংলায় একটির গোড়ায় 'মহা'—এই উপসর্গটি বসিয়ে অন্য শব্দটি গঠিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে যে, ওদের মধ্যে চরিত্রগত মিল আছে। অমিল হচ্ছে মাত্রায় বা পরিমাণে। তা নয় কিন্তু। ওরা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের।

আকাশ কি মহাকাশের অংশবিশেষ, বা তার ক্ষুদ্রতর এক রূপ—যেমন সাগর মহাসাগরের?

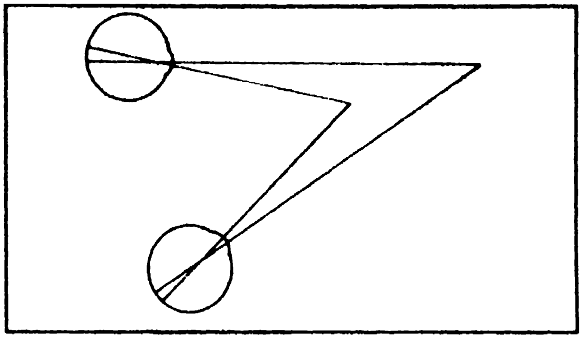
'সাগর' আর 'মহাসাগর'-এর মধ্যে যে-সম্পর্ক বা যে-সম্পর্ক অনুরূপ অন্য কোনো কোনো শব্দযুগলের মধ্যে, আকাশ আর মহাকাশ-এর মধ্যে তেমন কোনো সম্পর্কও নেই।

আসলে আকাশের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, মহাকাশের আছে। ওদের পার্থক্য একেবারে মূলগত।

আকাশের যদি কোনো বাস্তব অস্তিত্ব না-থাকে, তবে আকাশ কী?

আকাশ এক দৃষ্টিবিভ্রম (Optical illusion)। আকাশ প্রকৃতির রাজ্যে কোথাও নেই, আকাশ আছে আমাদের কল্পনা-মিশ্রিত অনুভূতিতে।

ব্যাপারটা হল এই যে, আমাদের এক সহজাত স্বাভাবিক দূরত্ব-বোধ আছে। আমাদের চারপাশে যে-সব বস্তুর সমাবেশ থাকে বা থাকতে পারে—হতে প'র ঘরের চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি, হতে পারে বাইরের কোনো ঘরবাড়ি, গাছপালা প্রভৃতি, হতে পারে আরো দূরের জঙ্গল, পাহাড় প্রভৃতি—তাদের মধ্যে যদি দূরত্বের তারতম্য থাকে তো আমরা সে-তারতম্য প্রায়শ শুধু চোখে দেখেই বুঝতে পারি, তার জন্য কোনো মাপজোখের দরকার হয় না। পারি যে, তার মুখ্য কারণ আমাদের 'দ্বি-চাক্ষুষ দৃষ্টি' (Binocular vision)—আমরা দেখি দুটি চোখের সাহায্যে। দুই কোটরের মধ্যে আমাদের দুটি চোখকে আমরা প্রয়োজনমত কিছুটা ঘোরাতে-ফেরাতে পারি এবং যখন কোনো কিছুকে



ভালভাবে দেখতে চাই তখন দুটি চোখকেই আমরা স্বতন্ত্রভাবে তার দিকে নিবদ্ধ করি। ফলে দুটি দৃষ্টিরেখা উৎপন্ন হয়—উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে একটি কোণ। দেখার বস্তুটি কাছে হলে, দৃষ্টিকোণটির মাপ হয় অপেক্ষাকৃত বড়; বস্তুটি দূরের হলে, ছোট। বলা বাহুল্য, দুটি পৃথক বস্তু না হয়ে যদি একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশ আমাদের কম-বেশি কাছে বা দূরে থাকে তবে সেক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য—যেমন একটি বাড়ির সামনের রোয়াক বা বারান্দা, তার পিছনের ঘর ইত্যাদি। আমরা এক পলক দেখেই বুঝতে পারি, কোন অংশ কাছে, কোন অংশ দূরে।

আকাশ কি মেরু-অঞ্চলে দৃষ্ট মরীচিকার মত কিছু?

আমাদের তুলনামূলক দূরত্ব-বিচারের এই সহজ, অনায়াস উপায় বা কৌশল কিছুটা দূরত্ব পর্যন্ত খুবই কার্যকর, কিন্তু তার পরে আর নয়। ছাদ বা কোনো খোলা জায়গা থেকে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, হয়তো অনেক দূরের গাছ, বাড়ি, কল-কারখানার চিমনি প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হতে পারে কিন্তু ওদের মধ্যে কোনটি তুলনাগতভাবে কম দূরে, কোনটি বেশি, তা বোঝা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তখন মনে হয় দূরে দূরে দৃষ্ট বস্তুগুলো সব আমাদের কাছ থেকে কোনো এক সমান দূরত্বে পাশাপাশি রয়েছে—রয়েছে যেন এক বৃহৎ বৃত্ত রচনা করে, যে-বৃত্তের কেন্দ্রে আমাদের অবস্থান আর দৃষ্ট বস্তুগুলোর অবস্থান সে-বৃত্তের পরিধির ওপর। কিন্তু আসল ঘটনা যে তা নয় বা তা না-হতে পারে, তা তো আমরা সবাই জানিই। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জানি যে, একটি বৃত্তের ওপর ওইভাবে ওদের বিন্যস্ত হয়ে থাকার

ব্যাপারটা আমাদের চোখের ভুল।

আসলে হয় কী, আমাদের দ্বি-চাক্ষুষ দৃষ্টিজনিত যে দুই দৃষ্টিরেখা, দূর দূর বস্তুদের প্রতিটির ক্ষেত্রে তা যেন দুই সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয়—অর্থাৎ তাদের মধ্যে উৎপন্ন কোণের মাপ যেন শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায়। আর যারা শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেছে বলে বোধ হয় এমন দুই বা তার বেশি রাশির মাপের তারতম্য যদি থাকেও, তা কি আর বোধগম্য হতে পারে? না, পারে না। তাই ওদের মধ্যে দূরত্বের তারতম্য আমাদের চোখে আর ধরা পড়ে না।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে যা কিছু আমরা দেখি—যেমন ঘরবাড়ি, গাছ, পাহাড় প্রভৃতি—সে-সব অবশ্যই তুলনামূলক বিচারে আমাদের বেশ কাছেই আছে। তাদের ক্ষেত্রেই যখন এমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে, তখন অন্য ক্ষেত্রে কী হবে—যখন দৃষ্টি পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে তুলে আমরা ওপরে গ্রহ, তারা, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতিকে দেখতে চাই, যারা আরো অনেক অনেক বেশি দূরে আছে? তখন তো আপেক্ষিক দূরত্ব বোধ লোপ পাবেই। মনে হবে ওরা সব আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে আছে কিন্তু সবাই সমান দূরত্বে—যদিও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের বস্তুদের ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় দূরে এক বৃত্ত রয়েছে আর তার পরিধির ওপরে রয়েছে দূরের গাছ, পাহাড় প্রভৃতি; ওপরের দিকে কিন্তু আর এক মাত্রা যুক্ত হয়—মনে হয় গ্রহ, তারা প্রভৃতি কোনো বৃত্তের ওপরে নয়, রয়েছে এক গোলকের গায়ে।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে যেমন বৃত্তটি বাস্তবে নেই, পৃথিবীর চারপাশেও তেমনই গোলকটি বাস্তবে নেই।

দৃষ্টিবিভ্রমজনিত, কল্পিত ওই গোলকটিরই নাম লোকমুখে 'আকাশ'। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা—যাঁরা কখনো কখনো ওই কল্পনার আকাশকে ওঁদের চিন্তা-ভাবনায়, আলাপ-আলোচনায় বেশ ভালমতই কাজে লাগান—সাধারণত বিকল্প অন্য নাম ব্যবহার করেন; বলেন 'নভোগোলক' বা 'খগোল' (Celestial Sphere)।

গ্রহ, তারা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর জ্যোতিষ্কদের—যারা সব আকাশ নামের কল্পিত এক গোলকের গায়ে রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়, তাদের—মহাকাশের সঙ্গে সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ—অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। জ্যোতিষ্করা সব আছে মহাকাশে নিমজ্জিত হয়ে, মহাকাশকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে। শুধু আকাশে দৃষ্ট জ্যোতিষ্করাই নয়, আমাদের পৃথিবী সম্পর্কেও ও-কথা প্রযোজ্য। আরো ব্যাপকভাবে বলা যায়, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' (Universe)-এ যেখানে যা-কিছু আছে—'পদার্থ' (Matter) এবং 'শক্তি' (Energy)-র রূপে—সে-সবই আছে মহাকাশে আশ্রিত হয়ে।

স্থির হয়েই থাকুক বা চলমানই হোক, কোনো কিছুই কখনো মহাকাশের বাইরে নয়।

পৃথিবী যদি মহাকাশের মধ্যেই সদা সর্বদা ভ্রাম্যমাণ হয়, তাহলে কি একথা বলা যায় যে, আমরা সবাই সব সময়ে মহাকাশচারী?

উত্তর হ্যাঁ-ও বটে, না-ও বটে। এক অর্থে হ্যাঁ, অন্য অর্থে না।

মহাকাশ শব্দটিকে তার আদি বা মূলগত অর্থে ব্যবহার করলে, উত্তরে অবশ্যই হ্যাঁ বলা যায়। কিন্তু আমরা আজকাল যখন 'মহাকাশ জয়' (Conquest of space), 'মহাকাশযান' (Space craft), 'মহাকাশচারী' (Space traveller) প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করি, তখন আমরা ওই সব ক্ষেত্রে মহাকাশ শব্দটিতে এক বিশেষ অর্থ—এক খণ্ডিত অর্থ—আরোপ করি। সেটাই এখন প্রচলিত রীতি হয়ে গেছে। এটা করা হয়, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির যে নতুন শাখা সম্প্রতি গড়ে উঠেছে—'নভশ্চরণ-বিদ্যা' (Astronautics বা Cosmonautics)—তার স্বার্থে বা তার দাবিতে।

পৃথিবী যেহেতু মহাকাশে সতত ভ্রাম্যমাণ, আমরা সবাই কি তবে সব সময়ে মহাকাশচারী নই?

মহাকাশের ওই বিশেষ অর্থে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এমন কোনো কিছুকে তো মহাকাশচারী বলা যাবেই না, যাবে না উড়ন্ত কাক চিলকে বা বেলুনকে বা বিমানকেও।

নভশ্চরণ-বিদ্যার বিশেষ অর্থে, কোথা থেকে মহাকাশের শুরু?

এটা একটা সংজ্ঞার ব্যাপার বা, আলোচনা-গবেষণার

সুবিধের কথা ভেবে, একটা কিছু মেনে নেওয়ার ব্যাপার। সবার মধ্যে ঐকমত্য এখনও গড়ে ওঠেনি। যেসব বিজ্ঞানকর্মী বা গবেষক এ-বিষয়ে কাজকর্ম বা চিন্তাভাবনা করেন তাঁরা মোটামুটিভাবে যা স্থির করে নিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠকে ঘিরে যে 'বায়ুমণ্ডল' (Atmosphere) আছে তার উর্ধ্বে বা অন্তত পক্ষে তার নীচের দিকের ঘন ভারী অংশের ওপরে না-গেলে তা মহাকাশে যাওয়া বলে গণ্য হবে না।

পৃথিবী থেকে কতটা দূরে যেতে পারলে, মহাকাশে অভিযান করার কৃতিত্ব দাবি করা যায়?

একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা—নাম তার 'ইন্টারন্যাশনাল এয়ারোনটিক্যাল ফেডারেশন' (International Aeronautical Federation)—স্থির করেছে যে, সেই নিম্নতম উচ্চতা হোক 100 কিলোমিটার (বা প্রায় 62.5 মাইল)। অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অন্ততপক্ষে ওই উচ্চতা পর্যন্ত না-গেলে তাকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ অর্থে মহাকাশ বলা হবে না।

মহাকাশের যে এক বিশেষ অর্থ আছে, সেই অর্থে কি মানুষ মহাকাশে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু পাঠাতে পেরেছে?

হ্যাঁ, অবশ্যই পেরেছে। সর্বপ্রথম 1957 সালে—পরে আরো অনেকবার।

1957 সালের কোন তারিখে ঘটে ওই ঐতিহাসিক ঘটনা?

ঘটনাটি ঘটে 1957 সালের 4 অক্টোবর তারিখে।

বিশেষভাবে স্মরণীয় তারিখ ওটি। সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতির যে-সুদীর্ঘ ইতিহাস, প্রকৃতির কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করে নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মানুষের ইতিহাসে কবে 'মহাকাশ-যুগ'-এর সূচনা?

করার যে-বিচিত্র ইতিহাস মানুষ রচনা করে চলেছে সভ্যতার সূচনা থেকে, সে-ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয় ওই তারিখে। সে-নতুন যুগকে বলা হয় 'মহাকাশ যুগ' (Space Age)।

মহাকাশে পাড়ি দেওয়া প্রথম বস্তুটি পৃথিবীর কোথা থেকে তার যাত্রা শুরু করেছিল?
তাকে নিশ্চয় কোনো নাম দেওয়া হয়েছিল; কী ছিল সে-নাম?
কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল সেটি?

বস্তুটিউৎক্ষিপ্ত হয়েছিল তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের এক অঞ্চল থেকে—ওই দেশেরই বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বে।

তাকে তখন নাম দেওয়া হয়েছিল 'স্পুৎনিক' (Sputnik), রুশ ভাষায় যে-শব্দের অর্থ 'ভ্রমণ-সঙ্গী' (Travelling companion)। নামটি সার্থক; কারণ যে-পৃথিবী স্থির নয় বরং সূর্যের চারপাশে ভ্রাম্যমাণ, স্পুৎনিক সর্বক্ষণ সেই পৃথিবীকে সঙ্গ দিয়েছে—পৃথিবীর চারপাশে আবর্তনশীল থেকে। স্পুৎনিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল চাঁদের মত পৃথিবীর এক 'উপগ্রহ' (Satellite)। অবশ্য চাঁদ হচ্ছে 'প্রাকৃতিক উপগ্রহ' (Natural Satellite), স্পুৎনিক ছিল 'কৃত্রিম উপগ্রহ' (Artificial Satellite)। স্পুৎনিক শব্দটি পরবর্তীকালে—রুশ ভাষা ছাড়া—অন্য অনেক ভাষাতেও গৃহীত হয়ে গেছে—কৃত্রিম উপগ্রহ বোঝাতে।

1957 সালের 4 অক্টোবরের পরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ওই একই নামে আরো অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপ করেছিলেন। পার্থক্য নির্দেশ করতে প্রথমটিকে (অর্থাৎ 1957-এর 4 অক্টোবর তারিখে যেটি উৎক্ষিপ্ত হয় সেটিকে) এখন স্পুৎনিক-1 নামে অভিহিত করা হয়।

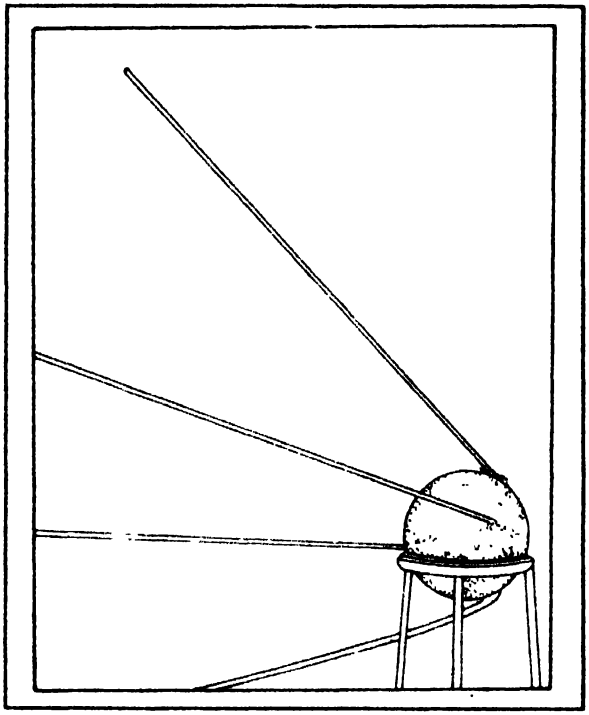
স্পুৎনিক-1 যতদিন মহাকাশে উপগ্রহের রূপে ছিল ততদিন পৃথিবীকে এক 'উপবৃত্তাকৃতি' (Elliptical) পথে—অর্থাৎ, কতকটা ডিম্বাকৃতি এক পথে—পরিক্রমণ করেছিল। তখন পৃথিবী থেকে তার উচ্চতা বা দূরত্ব 228 থেকে 947 কিলোমিটারের (বা প্রায় 142 থেকে প্রায় 588 মাইলের) মধ্যে নামা-ওঠা করতো। অর্থাৎ স্পুৎনিক-1 আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ অর্থেই মহাকাশে অনুপ্রবেশ করেছিল।

স্পুৎনিক-1-এর ওজন, মাপজোখ প্রভৃতি কী ছিল? অবশেষে তার কী হল—সেটি কি এখনও মহাকাশেই আছে?

স্পুৎনিক-1 ছিল মূলত ধাতুনির্মিত এক গোলক। তার সঙ্গে চারটি ভিন্নমুখী দণ্ড বা রড যুক্ত করা ছিল। ওজন

প্রায় 84. কিলোগ্রাম। গোলকটির ব্যাস ছিল 580 মিলিমিটার (বা প্রায় 23 ইঞ্চি)। রডগুলোর দৈর্ঘ্যে প্রয়োজনমত কিছু পার্থক্য রাখা হয়েছিল—গড় দৈর্ঘ্য ছিল 2.65 মিটার (বা প্রায় 8.7 ফুট)।

স্পুৎনিক-1 তিন সপ্তাহ ধরে কার্যক্ষম ছিল—অর্থাৎ ওই

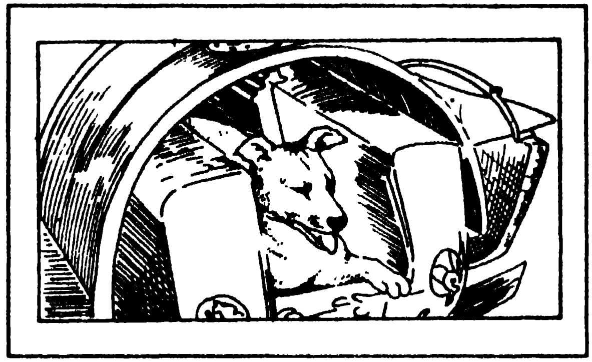


সময় ধরে মহাকাশ সম্পর্কে পূর্বপরিকল্পনামত নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিল এবং বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থায় সেগুলো পাঠিয়েছিল পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। তারপর তার শক্তিভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যায়। তারপরেও স্পুৎনিক-1 বেশ কিছুদিন মহাকাশেই ছিল—পৃথিবীর এক উপগ্রহের রূপে। সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে মোট 92 দিন্। তারপর সেটি উচ্চতা হারাতে থাকে। ক্রমশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘন থেকে ঘনতর অংশে প্রবেশ করে এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষজনিত উত্তাপে অবশেষে জ্বলে পুড়ে বিনষ্ট হয়ে যায়।

স্পুৎনিক-1-এর পর মহাকাশে মানুষের দ্বিতীয় সাফল্য কী?
দ্বিতীয় হওয়া ছাড়া তার কি আরো কোনো স্মরণীয়, গৌরবজনক বৈশিষ্ট্যের দাবি আছে?

মহাকাশে মানুষের দ্বিতীয় সাফল্য স্পুৎনিক-2। আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ এটি। এটি উৎক্ষিপ্ত হয় প্রথমটির এক মাসের মধ্যে—1957-এর 3 নভেম্বর।

নানা দিক থেকে এটি ছিল আরো অনেক বৃহত্তর সাফল্য। পৃথিবী থেকে গড় উচ্চতা ছিল আরো বেশি—948 কিলোমিটার (বা প্রায় 590 মাইল); ওজন অনেক বেশি—508.3 কিলোগ্রাম। কিন্তু এটি সম্পর্কে যা সবচেয়ে



স্মরণযোগ্য তা এই যে, এটিই প্রথম মহাকাশযান যা একটি জীবিত প্রাণীকে মহাকাশে নিয়ে গিয়েছিল—লাইকা (Laika) নামের একটি কুকুরকে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটির অভিধা 'প্রথম জৈব উপগ্রহ' (First Biological Satellite)। একটি প্রাণীদেহে মহাকাশে ভারমুক্ত অবস্থায় কী কী বিকার ঘটতে পারে—নাড়ির গতি, রক্তের চাপ প্রভৃতির কেমন ধরনের পরিবর্তন হয়—মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা তা প্রথম জানার সুযোগ পান স্পুৎনিক-2-এর দৌলতে।

লাইকা কতদিন মহাকাশে ছিল?
আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে এসেছিল কি?

লাইকা মহাকাশে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস ছিল—1958-এর 14 এপ্রিল পর্যন্ত। তারপর মারা যায়।

লাইকাকে জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থাতেই ফিরিয়ে আনা যায়নি—আনার উপায় ছিল না। তখন পর্যন্ত মহাকাশে প্রেরিত কোনো কিছুকে নিয়ন্ত্রিতভাবে ফিরিয়ে আনার কোনো কলাকৌশল বিজ্ঞানীরা আয়ত্ত করতে পারেন নি।

মানুষের সশরীরে মহাকাশ জয়ের প্রচেষ্টায় লাইকার ভূমিকা ছিল কতকটা যেন পুরাণবর্ণিত দধীচির মত।

পৃথিবীর প্রাণী হয়ে সর্বপ্রথম দূর মহাকাশে উপস্থিত হবার গৌরব লাইকার; কিন্তু লাইকা তো আর ফিরে আসেনি—মহাকাশেই তার সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে, মহাকাশে উপনীত হয়ে, আবার প্রাণ নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসার ঐতিহাসিক গৌরব কার প্রাপ্য?

সে-গৌরব প্রাপ্য অন্য দুটি কুকুরের। নাম বেলকা (Belka) আর স্ট্রেলকা (Strelka)। এরাও প্রেরিত হয়েছিল সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের দ্বারা। এদের বাহন ছিল স্পুৎনিক-5। সেটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল 1960-এর 5 এপ্রিল তারিখে। প্রায় বৃত্তাকৃতি এক কক্ষে 24 ঘন্টা ধরে পৃথিবীকে 18 বার প্রদক্ষিণ করার পর সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এটির উদ্দেশে



বিশেষ সংকেত পাঠান যাতে এর 'বিমুখী রকেট' (Retro-rocket)-গুলো কার্যকরী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে অবশেষে বেলকা-স্ট্রেলকার ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসা সম্ভব হয়। মহাকাশে প্রায় 7,00,000 কিলোমিটার (বা প্রায় 4,35,000 মাইল) পরিভ্রমণ করে সেই প্রথম পৃথিবীর প্রাণী আবার সুস্থ, অক্ষত দেহে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে।

মানুষ স্বয়ং কবে, কীভাবে মহাকাশে পাড়ি দেয়? প্রথম প্রচেষ্টাই সফল হয়েছিল কি?

ইতিহাস পৃষ্ঠায় যেন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে সে-তারিখটি—12 এপ্রিল, 1961। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বে সে-দেশের মাটি থেকে যাত্রা শুরু করে দূর মহাকাশে উপনীত হন সে-দেশের বীর সন্তান ইয়ুরি গাগারিন (Yuri Gagarin)। গাগারিনকে যে-বিশেষ মহাকাশযান বহন

প্রথম মহাকাশচারী মানুষ কে?

করেছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল ভোস্তক (Vostok)। পরে ওই নাম ব্যবহার করেই আরো কয়েকটি মহাকাশযান প্রেরিত হয় বলে, গাগারিনের মহাকাশযানটিকে আজকাল



কখনো কখনো ভোস্তক-1 নামেও আভাহত করা হয়—এবং স্বাভাবিকভাবেই অন্যগুলোকে সূচিত করা হয় ভোস্তক-2, ভোস্তক-3 প্রভৃতি নামে।

গাগারিন ভোস্তকবাহিত হয়ে মহাকাশে গিয়ে পৃথিবীকে 108 মিনিট ধরে এক পাক দিয়ে আবার নিরাপদে সুস্থ দেহে পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসেন।

উপবৃত্তাকৃতি পথে পরিক্রমণ কালে, পৃথিবী থেকে গাগারিনের সর্বনিম্ন দূরত্ব ছিল 181 কিলোমিটার (বা প্রায় 112 মাইল), সর্বোচ্চ 327 কিলোমিটার (বা প্রায় 203

মাইল)। ওঁর গতিবেগ ছিল ঘন্টায় প্রায় 28,000 কিলোমিটার (বা প্রায় 17,400 মাইল)।

গাগারিনকে মহাকাশে পাঠাবার প্রচেষ্টা ছিল সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ওই পর্যায়ের প্রথম প্রচেষ্টা এবং সেই প্রথম প্রচেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

গাগারিন ইতিহাস-পৃষ্ঠায় অনন্য মর্যাদাসম্পন্ন এক নাম।

গাগারিনের পরে আরো কোনো কোনো মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন কি?
দিয়ে থাকলে, দ্বিতীয় মহাকাশচারীর মর্যাদা কার প্রাপ্য?

গাগারিনের পরে আরো বেশ কয়েকজন কৃতী পুরুষ ও মহিলা মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বৃহত্তর সাফল্যও অর্জন করতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় সফল মহাকাশচারীর নাম গেরম্যান টিটভ (Gherman Titov)। ইনিও গাগারিনের মত ছিলেন সোভিয়েত নাগরিক। যাত্রা শুরু করেছিলেন 1961 সালের 6 অগাস্ট। মহাকাশে ছিলেন প্রায় 25 ঘণ্টা। মহাকাশযানের নাম ভোস্তক-2।

মহাকাশে প্রথম মহিলা অভিযাত্রী কে?

নাম তাঁর ভ্যালেন্তিনা ভ্লাদিমিরোভ্না তেরেশ্‌কোভা



(Valentina Vladimirovna Tereshkova)। এটাই কুমারী জীবনে তাঁর নাম ছিল—নাম ছিল তখনও যখন 1963 সালের জুন মাসে ভোস্তক-6-বাহিত হয়ে তিনি মহাকাশে প্রথম মহিলা অভিযাত্রী হিসেবে পাড়ি দেন। পরবর্তীকালে বিয়ে করেন অ্যান্ড্রিয়ান নিকোলাইয়েভ (Andriyan Nikolayev)-কে—যিনি ছিলেন গাগারিন ও

কোন মহিলা মহাকাশে প্রথম পাড়ি দিয়েছেন?
প্রথম মহিলা অভিযাত্রী মহাকাশে কতক্ষণ ছিলেন?

টিটভের পরে (1962 সালের অগাস্ট মাসে) তৃতীয় মহাকাশচারী। সেই সূত্রে নিকোলাইয়েভা (Nikolayeva) শব্দটিও পরে তেরেশ্‌কোভা-র নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ভ্যালেন্তিনা তেরেশ্‌কোভা নামেই তিনি জগদ্বিখ্যাত।

ভ্যালেন্তিনা মহাকাশে ছিলেন প্রায় 71 ঘণ্টা (অর্থাৎ প্রায় তিন দিন)। পৃথিবীকে পরিক্রমণ করেছিলেন 48 বার।

মহাকাশ জয়ের প্রসঙ্গে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সব ক'টি ঐতিহাসিক সাফল্যই তো দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। সাফল্যের খতিয়ানে অন্য কোনো দেশের নাম নেই কি?

অবশ্যই আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলোর নাম তো আছেই, আছে ভারতবর্ষের মত কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশেরও নাম।

কিন্তু এ-কথা অবশ্যই ঠিক যে, মহাকাশ যুগের গোড়ার দিকের অতি চমকপ্রদ ঐতিহাসিক সাফল্যগুলো পর পর সবই অর্জন করেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা অল্প-স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ সাফল্য অর্জন তো করেনই, ধাপে ধাপে অর্জন করেন বৃহত্তর, আরো চমকপ্রদ কতকগুলো সাফল্যও।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পরেই—আর সবার আগে—মহাকাশে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন কোন দেশের বিজ্ঞানীরা এবং কী সে-সাফল্য?

মহাকাশ জয়ের প্রচেষ্টায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক প্রথম সাফল্যগুলোর পরেই স্থানাধিকারীর জয়মাল্যে ভূষিত হন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

ওঁদের প্রথম সাফল্য এক্সপ্লোরার (Explorer)-1 নামের কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং মহাকাশে উপনীত হয় 1958 সালের 31 জানুয়ারি—অর্থাৎ স্পুৎনিক-1-এর প্রায় চার মাস পরে। ওজনেও ছিল অনেক পিছিয়ে—স্পুৎনিকের প্রায় 84 কিলোগ্রামের তুলনায় মাত্র 14 কিলোগ্রাম। কিন্তু মূল প্রযুক্তিগত কৃতিত্বের বিচারে কম নয়। তাছাড়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বিচারে কিছু অতি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিল এই এক্সপ্লোরার—যেমন পৃথিবী বেষ্টনকারী 'ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়' (Van Allen Radiation Belt)। পরে এক্সপ্লোরার-পর্যায়ের আরো কতকগুলো মহাকাশযান প্রেরিত হয়—2, 3 ইত্যাদি।

মহাকাশে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা যে-প্রকল্পটি গ্রহণ করেন তার নাম দিয়েছিলেন 'মার্কিউরি প্রকল্প' (Mercury Project)। এই প্রকল্পের একটিতে জন গ্লেন (John Glenn) প্রথম ওই দেশের নাগরিক হিসেবে মহাকাশভ্রমণ করে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন—1962 সালের 20 ফেব্রুয়ারি। পরে এই প্রকল্পের আরো কয়েকটি প্রচেষ্টা অনুরূপ সাফল্য অর্জন করেছিল।

মানুষ সশরীরে মহাকাশে অভিযান করতে পারার চেয়ে বেশি কিছু করতে পেরেছে কি?

হ্যাঁ, কিছুকাল আগে পর্যন্ত যা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য, এমন-কী কল্পনাতেও লোমহর্ষক, সে-কাজও মানুষ করতে পেরেছে। মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। একবার নয়, একাধিকবার।

মানুষ প্রথমবার চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে কী-ভাবে? কে সেই অতুলনীয় কৃতিত্বের অধিকারী?

মানুষ প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে 1969 সালের জুলাই মাসে।

যে-বিশেষ মহাকাশযানটি সেই ঐতিহাসিক অভিযানে মানুষের বাহন হয়েছিল তার নাম অ্যাপলো (Apollo)-11। অভিযান ঘটে মার্কিন বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বে, ওদেশের 'কেপ কেনেডি' (Cape Kennedy) নামে বিখ্যাত উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে। যাত্রারম্ভ 16 জুলাই তারিখে; চাঁদে পৌঁছোয় 20 জুলাই। আরোহী ছিলেন তিন জন—নীল আর্মস্ট্রং (Neil Armstrong), এডুইন অলড্রিন (Edwin Aldrin) ও মাইকেল কলিন্স (Michael Collins)। এঁদের মধ্যে প্রথম দু-জন চাঁদে নেমেছিলেন, তৃতীয় জন নামেন



নি—চাঁদের উপকণ্ঠে থেকে, বারবার চাঁদকে পরিক্রমণ করেছিলেন। প্রথম দু-জন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুটা সময় পরে ওঁদের মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে চাঁদের পিঠে পা রাখেন—প্রথমে আর্মস্ট্রং, প্রায় সাড়ে ছ-ঘণ্টা পরে; তারও প্রায় এক ঘণ্টা পরে, অলড্রিন। এই ছ-সাত ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর মানুষের ক্যালেণ্ডারের হিসেবে একটা দিনের অবসান এবং পরের দিনের সূচনা ঘটে যায়। ফলে মানুষের চাঁদে নামার দিন হিসেবে যে-তারিখ চিহ্নিত হয়ে আছে তা 21 জুলাই।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করা প্রথম মানুষ কতক্ষণ ছিলেন সেখানে?

প্রায় 22 ঘণ্টা চন্দ্রপৃষ্ঠে কাটিয়ে, 21 তারিখেই ওঁরা আবার যাত্রা শুরু করেন—এবার পৃথিবীর অভিমুখে। ফিরে আসেন জুলাই 24 তারিখে।

অ্যাপলো-11 মহাকাশযানকে উৎক্ষেপ করেছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী এক রকেট—স্যাটার্ন (Saturn)-5। এই

মহাকাশযানটির দুটি বিভাজ্য অংশ ছিল। একটির নাম 'লুনার এক্সকারশন মডিয়ুল' (Lunar Excursion Module)—সংক্ষেপে 'লেম' (LEM): অন্যটির 'কমাণ্ড অ্যাণ্ড সার্ভিস মডিয়ুল' (Command and Service Module)। প্রথমোক্তটি চাঁদের পিঠে নেমেছিল—চাঁদের উপকণ্ঠে পৌঁছে, দ্বিতীয়টি থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে। দ্বিতীয়টিতে অবস্থান করছিলেন মাইকেল কলিন্স; এটি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছিল। পরে প্রথমটি ফিরে এসে সাময়িকভাবে আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়, তারপর দ্বিতীয়বার এবং শেষবারের মত আবার বিযুক্ত হয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে চাঁদের মাটিতে। তার আগেই অবশ্য আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন নিজেদের স্থানান্তরিত করে, দ্বিতীয় 'মডিয়ুল'-এ আবার কলিন্স-এর সঙ্গী হয়ে গেছেন। আর তারপর সবার একত্রে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন।

আর্মস্ট্রং, অলড্রিন চাঁদে যে প্রায় একদিন ছিলেন, ওই সময়ে ওঁরা ওখানে কী করেছিলেন?

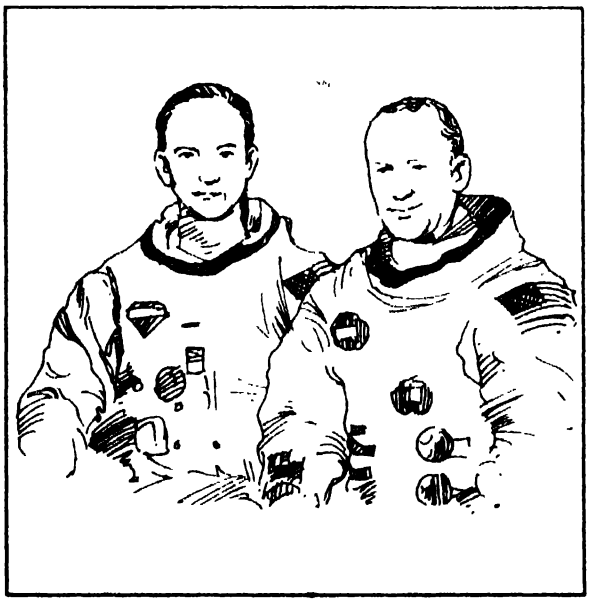
আর্মস্ট্রং, যিনি প্রথম নামেন, চাঁদের পিঠে পা রেখেই একটা কথা সগর্বে উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, একটি মানুষের ওই আপাতক্ষুদ্র পদক্ষেপ হল সমগ্র মানবজাতির এক বিরাট অগ্রগতির নিদর্শন ("That's one small step for a man, one ginat leap for mankind")।

ওঁদের দুজনের অবশ্য-করণীয় ছিল প্রথমেই চাঁদে চলাফেরা করার কলাকৌশলটা সরেজমিনে প্রত্যক্ষভাবে রপ্ত করে নেওয়া—যদিও আগে, দীর্ঘকাল ধরে, পৃথিবীতেই বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে অনুরূপ পরিবেশ রচনা করে ওঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছিলেন। ওঁরা হেঁটেছেন, দৌড়েছেন, লাফিয়েছেন। ছিলেন সব সময়ে 'লেম' থেকে 30 মিটার (বা প্রায় 100 ফুট)-এর মধ্যে। বলা বাহুল্য, এই সময়ে এবং অন্য সময়েও সর্বক্ষণ ওঁদের অঙ্গে ছিল বিশেষ ধরনের বেশবাশ আর তার সঙ্গেই ছিল অক্সিজেন, জল প্রভৃতি জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যাক যাবতীয় উপকরণ।

চন্দ্র-পৃষ্ঠে স্বল্প প্রবাসকালে অভিযাত্রীরা ওখানে কী করেছিলেন? চন্দ্র-অভিযাত্রীরা চন্দ্রদেহের কতখানি উপাদান সংগ্রহ করে আনেন?

নিজেদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে একটা কাজ গোড়াতেই ওঁরা সেরে নেন—চাঁদের মাটিতে উর্ধ্বমুখী করে একটি টিভি ক্যামেরা বসান, যা ওঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য অদূর মহাকাশে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় অপেক্ষারত মহাকাশযান 'কম্যাণ্ড অ্যাণ্ড সার্ভিস মডিয়ুল'-কে যথাসম্ভব নজরবন্দী করে রাখছিল।

ওঁরা এমন এক সূক্ষ্ম, সংবেদী যন্ত্র চাঁদের মাটিতে বসান যাতে ওখানে সামান্যতম কোনো ভূমিকম্পন ঘটলেও তা লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। একটি 'লেজার প্রতিফলক' (Laser reflector)-এর সাহায্যে ওঁরা পৃথিবী-চাঁদের দূরত্ব নিখুঁতভাবে নিরূপণ করেন। সূর্য থেকে নির্গত বিভিন্ন 'নিষ্ক্রিয় গ্যাস' (Inert gas)-এর কিছু পরিমাণ পরমাণু সংগ্রহ করেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দেবার জন্য—যে-পরমাণু কখনো পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছতে পারে না। প্রায় 28 কিলোগ্রাম চন্দ্রদেহের উপাদান সংগ্রহ



করেন ওঁরা, ওঁদের বিশেষ ঝুলিতে। পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কথাবার্তা বিনিময় করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পতাকা চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রোথিত করে দেন। মহাকাশে গেছেন এমন যে-কয়েক জন মানুষ ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন—যেমন গাগারিন, 1961 সালে প্রথম মহাকাশচারী হবার সম্মান অর্জন করার 7 বছর পরে

(অর্থাৎ 1968 সালে) মাত্র 34 বছর বয়েসে যিনি মারা যান—তাঁদের নামখচিত একটি ফলক চন্দ্রপৃষ্ঠে রেখে দেন। আর, যেখানে 'লেম' চন্দ্রপৃষ্ঠকে স্পর্শ করেছিল সেখানে স্থাপিত করেন একটি ফলক, যাতে ইংরেজিতে বর্ণিত ছিল যে ওইখানে 1969 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পৃথিবী থেকে মানুষ প্রথম চাঁদে নেমেছিলেন।

মোটামুটিভাবে এই হল নীল আর্মস্ট্রং ও এড্উইন অলড্রিনের সেই প্রায় একদিনের রোজনামচা।

প্রথম চন্দ্র-অভিযাত্রীরা পৃথিবীতে ফিরে কেমন অভ্যর্থনা পান?

অভ্যর্থনা শেষ পর্যন্ত সব মিলিয়ে যা পেয়েছিলেন তা নেহাত মন্দ নয়। বরং, আলংকারিক ভাষায়, তাকে রাজকীয় বলা যায়। কিন্তু প্রথমটা যা করা হয়েছিল তা খুব সুবিধার

চন্দ্রলোক-প্রত্যাগত মানুষ প্রথম কতদিন বন্দী ছিলেন?

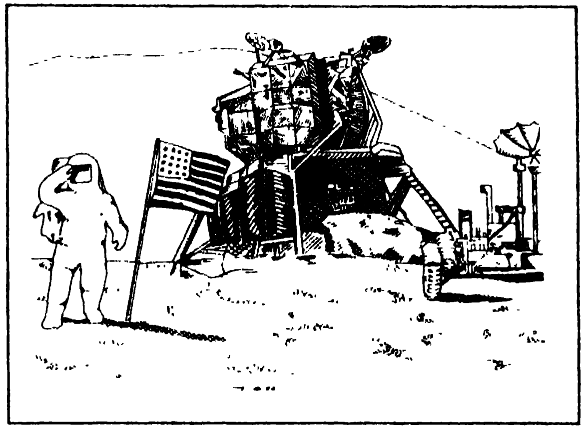
নয়—অন্ততপক্ষে ওঁদের কাছে তাকে নিশ্চয় সুখকর বা আরামপ্রদ বলা যায় না।

প্রথমটা যা করা হয়েছিল তা পূর্ব পরিকল্পনা মতই করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের সুপারিশ অনুসারে, ওঁদের পুরো তিন সপ্তাহ বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সে-বন্দীত্ব সাধারণ ধরনের বন্দীত্ব নয়। ওঁদের রুদ্ধদ্বার কক্ষ ছিল বায়ুসঞ্চালনের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্রভাবে রুদ্ধ।

এই সাধারণ বুদ্ধিতে দুর্বোধ্য, আপাতদৃষ্টিতে অমানুষিক ব্যবহারের পিছনে গূঢ় কারণ ছিল। বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তা ছিল যে, মহাকাশের কোথাও কোনোক্রমে যদি এমন-কোনো মারাত্মক রোগের সংক্রমণ হয়ে থাকে, যে-রোগ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, যার সঙ্গে পৃথিবীর চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনো পরিচয় নেই অতএব যার কোনো ঔষধ বা প্রতিষেধক ওঁদের জানা নেই, তাহলে কী হবে? পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সে-সংক্রমণ হয়তো অপ্রতিহতভাবে ছড়াবে, মহামারীর রূপ নেবে। তখন হয়তো শেষ পর্যন্ত কপাল চাপড়াবার জন্য কোনো লোক আর অবশিষ্ট থাকবে না। তাই ওই আপাতকঠোর সতর্কতা।

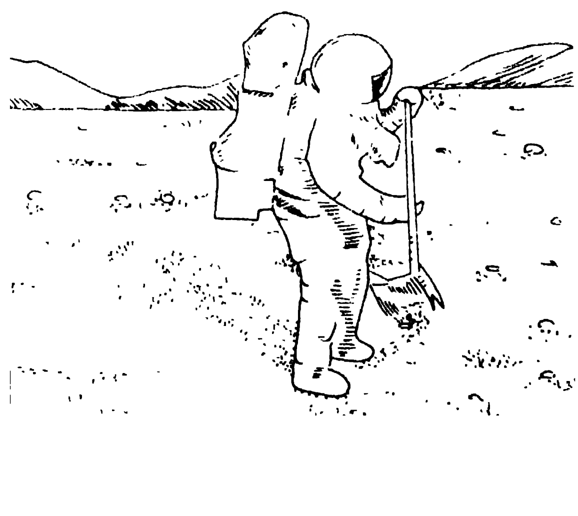
চন্দ্রলোক-প্রত্যাগত ওই বিশেষ ধরনের বন্দীদের 21 দিন ধরে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে, তাঁদের মধ্যে কোনো শারীরিক বৈকল্যের চিহ্নমাত্র না-দেখে, তাঁদের তারপর হই হই করে বাইরে আনা হয়। আর তারপর যে-ব্যবহার করা হয় তাকে অবশ্যই রাজকীয় বলা চলে।

মানুষ মোট ক-বার চাঁদে গেছে?



মানুষ চাঁদে গেছে মোট ছ-বার।

সংশ্লিষ্ট মহাকাশযানগুলোর অভিধা অ্যাপলো-11, -12, -14, -15, -16 ও -17। শেষবারের অভিযান ঘটে 1972-এর ডিসেম্বরে।



অ্যাপলো-13-কে মহাকাশ থেকে ফিরে আসতে

হয়—বা, বলা যায়, কোনোক্রমে ফিরিয়ে আনা যায়। তার এক অংশে ভীষণ আগুন লেগে গিয়েছিল; সুখের কথা, কোনো প্রাণহানি ঘটার আগেই, অভিযাত্রীদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

চন্দ্র-অভিযান আর করা হচ্ছে না কেন?

প্রতিটি অভিযানের পিছনে বিপুল সম্পদ ব্যয় করতে হয়েছে—অর্থের হিসেবে, শ্রমের হিসেবে ও সময়ের হিসেবে।

যে-সব তথ্য সফল অভিযানগুলোর মাধ্যমে সংগ্রহ করা গেছে, যে-তুলনাবিহীন গৌরব ওই সূত্রে অর্জিত হয়েছে, আপাতত তার সঙ্গে গুণগতভাবে আর কিছু যুক্ত করা সম্ভবপর নয়—এটাই বিজ্ঞানীদের এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলোর কর্ণধারদের সিদ্ধান্ত। ভবিষ্যতে আবার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই আপাতত ওই পর্বের ইতি।

চাঁদ ছাড়া আর কোনো জ্যোতিষ্কে মানুষ অভিযান করার চেষ্টা করেছে কি? প্রত্যক্ষভাবে—অর্থাৎ সশরীরে—না-হলেও, অন্তত পক্ষে কোনো মহাকাশযান পাঠিয়ে?

হ্যাঁ, করেছে—এবং সফলও হয়েছে। না, সশরীরে নয়, কিন্তু মহাকাশযান পাঠিয়ে—একাধিকবার।

চাঁদকে বাদ দিয়ে, আর কোন কোন জ্যোতিষ্কে মানুষের পাঠানো মহাকাশযান নামতে পেরেছে? তাদের মধ্যে কোনটিতে প্রথম? কী-ভাবে তা ঘটে?

চাঁদ ছাড়া আর দুটি জ্যোতিষ্কে মানুষের মহাকাশযান এখন পর্যন্ত অবতরণ করেছে। দুটিই গ্রহ। ওরা মহাকাশে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী দুই গ্রহ। একটি পৃথিবীর যে-পাশে সূর্য থাকে সেই পাশের প্রতিবেশী—অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের নিকটতর সেটি; অন্যটি অপর পাশের—অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে দূরতর। প্রথমটি শুক্র (Venus), দ্বিতীয়টি মঙ্গল (Mars)।

এই দুই নিকটতম গ্রহের মধ্যে আবার তুলনাগত-বিচারে শুক্র নিকটতর। পৃথিবী থেকে দূরত্ব অবশ্য সব সময়ে একই থাকে না। কিন্তু শুক্র পৃথিবীর যত কাছে মাঝে মাঝে আসে তত কাছে আর কোনো গ্রহ কখনো আসে না। এই শুক্রগ্রহেই মানুষ প্রথম মহাকাশযান নামাতে পেরেছে। সে 1966 সালের কথা—অর্থাৎ চাঁদে মানুষ নামারও আগে, যদিও অবশ্য চাঁদে যাত্রিবিহীন মহাকাশযান নামার আগে নয়।

চাঁদ ছাড়া আর কোনো জ্যোতিষ্কে মানুষ যেতে পেরেছে কি? বা, অন্তত পক্ষে কোনো মহাকাশযান পাঠাতে? পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে কোন গ্রহ?

প্রচেষ্টাটি সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের। মহাকাশযানটির নাম ছিল—ওঁদের শুক্রসংক্রান্ত বিশেষ প্রকল্পের প্রণালীবদ্ধ নামানুসারে—ভেনেরা (Venera)-3। এই প্রকল্পের আরো কয়েকটি মহাকাশযানও পরবর্তীকালে অনুরূপ বা বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করে।

শুক্রগ্রহের তাপমাত্রা—একাধিক কারণে—পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। শুক্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের যে-চাপ, সে চাপও, ওখানকার অনেক পরিমাণে ঘনতর বায়ুমণ্ডলের কারণে, পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি। তাই শুক্রের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া মহাকাশযানের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। বাস্তবে তা-ই হয়। ভেনেরা-3 বিকল হয়ে যায়, পরে বিনষ্টও হয়ে যায় কিন্তু তবু পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে যাত্রা শুরু করে শুক্রপৃষ্ঠকে প্রথম স্পর্শ করার ঐতিহাসিক মর্যাদা প্রাপ্য এই মহাকাশযানটিরই।

ভেনেরা-3 সবেগে অবতরণ করেছিল, কোনো তথ্য পাঠাতে পারেনি। শুক্র সম্পর্কে তথ্য পাঠানোর কাজ কম-বেশি পরিমাণে করতে পেরেছে তার পরবর্তী কয়েকটি মহাকাশযান—ভেনেরা-4, -5 প্রভৃতি। এরাও শুক্রের দুঃসহ পরিবেশে অচিরে বিনষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কিন্তু তার আগেই করে নিতে পেরেছে কিছু তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহের কাজ, বেতারে পাঠাতে পেরেছে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। এদের মধ্যে ভেনেরা-4-এর ঐতিহাসিক সম্মান এই যে, এটিই 1967 সালে সর্বপ্রথম শুক্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণ করেছে।

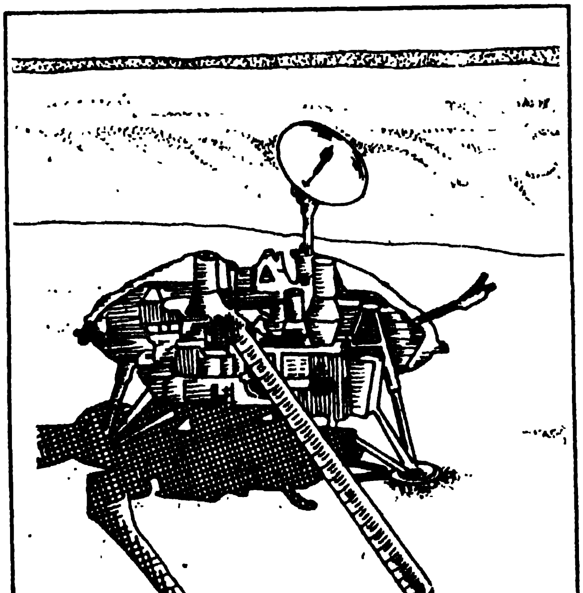
মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে মহাকাশযান পাঠিয়ে মানুষ যে-কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে বা পারেনি, তার খতিয়ান কী?

গোড়ার দিকে মানুষের মঙ্গলসংক্রান্ত প্রচেষ্টাগুলো ঠিক

তার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি—যদিও ইতিহাসের বিচারে প্রথম হবার গৌরবজনক দাবি তাদের মধ্যে কোনো কোনোটির আছে।

সূত্রপাত করেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মার্জ (Mars) নামের কয়েকটি মহাকাশযানকে পর পর পাঠিয়ে।

মার্জ-1 উৎক্ষিপ্ত হয় 1962 সালের শেষ দিকে; মহাকাশে 10 কোটি কিলোমিটারেরও (বা প্রায় সাড়ে ছ-কোটি মাইলেরও) কিছু বেশি দূরত্বে চলে যাবার পর পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে যায়। পরের দুটি—মার্জ-2 ও -3—1971-এর শেষদিকে মঙ্গলের উপকণ্ঠে পৌঁছোয় এবং তাদের অংশবিশেষকে বিচ্ছিন্ন করে নামিয়ে দেয় মঙ্গলপৃষ্ঠের উদ্দেশে। দুটিই মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করে বটে কিন্তু ওই বিশেষ সম্মানের দাবি ছাড়া তাদের আরো বেশি দাবি কিছু নেই। যেটি আগে নামে সেই মার্জ-2 মুহূর্তমধ্যে চুরমার হয়ে যায়; মঙ্গলপৃষ্ঠে দ্বিতীয়টির, অর্থাৎ মার্জ-3-এর—আয়ুষ্কাল ছিল দু-মিনিটেরও কম।



মঙ্গল সম্পর্কে মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের এই সীমিত সাফল্যের দুঃখ অনেক পরিমাণে লঘু হয় 1976 সালে—দুই অতি বৃহৎ সাফল্যের দরুন। ঠিক মানুষ নামানো নয় কিন্তু কতকাংশে তারই কাছাকাছি।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছিলেন দুটি মহাকাশযান—ভাইকিং (Viking)-1 ও -2। ওরা শুধু মহাকাশযানই ছিল না, ছিল স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ংচালিত দুই গবেষণাগারও। দুই ভাইকিং মঙ্গলপৃষ্ঠের দু-জায়গায় ধীরে ধীরে অবতরণ করে; প্রচুর আলোকচিত্র ও অন্যভাবে নানা তথ্য সংগ্রহ করে। আরো যা করে সেটাই সবচেয়ে চমকপ্রদ ও কৃতিত্বপূর্ণ। ওদের দেহের সঙ্গে যুক্ত ছিল যান্ত্রিক হস্ত; সেই হস্ত প্রসারিত ক'রে ওরা মঙ্গলের কয়েক জায়গা থেকে মাটি, পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করে এবং পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া বিশেষ বিশেষ ধরনের সুনির্বাচিত তরল রাসায়নিকের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটার সুযোগ করে দেয়; লক্ষ করতে থাকে কী ঘটে বা না ঘটে। এই শেষোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল একটাই; মঙ্গলপৃষ্ঠে 'প্রাণ' (Life)-এর অস্তিত্বের সন্ধান করা। 'প্রাণ' বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, তার পক্ষে কতকগুলো বিশেষ ধরনের 'জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া' (Biochemical reaction)-য় অংশগ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। মঙ্গলগ্রহে প্রাণী থাকলে, তা থাকতে পারে শুধুমাত্র খুব নিম্নশ্রেণীর জীবাণুর রূপে, আর কোনো রূপে নয়—এই সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীরা কিছুকাল আগেই উপনীত হয়েছিলেন, অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং পর্যবেক্ষণ-গবেষণা করে। জীবাণু থাকলে, তা থাকবে মঙ্গলের মাটি, পাথর ইত্যাদিকে আশ্রয় করে। তাই ওইসব কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা।

ভাইকিং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল বিশ্বস্ততার সঙ্গে পাঠিয়েছে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। ফলাফলগুলো হয়েছে নেতিবাচক বা নৈরাশ্যকর। অর্থাৎ মঙ্গলপৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে যায় এমন কোনো নিদর্শন বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু সে-কথা স্বতন্ত্র বা গৌণ। মূল প্রচেষ্টায় অর্থাৎ মহাকাশ-বিজ্ঞানে ওঁরা এ-ব্যাপারে খুবই সাফল্য লাভ করেছেন।

মহাকাশে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোমহর্ষক নানা কীর্তিকলাপের কথা শোনার পর, স্বদেশানুরাগী ভারতীয় পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন জাগে।

প্রথম প্রশ্ন, মহাকাশ-চর্চায় ভারতের স্থান কোথায়?

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে 'মহাকাশ যুগ'-এর সূচনা

এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। তারপর প্রায় চার দশক সময় কেটেছে। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ ভারতবর্ষও মহাকাশে কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। সে সাফল্যগুলো অবশ্যই যথেষ্ট গৌরবজনক।

মহাকাশ-চর্চার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থান কোথায়? মহাকাশ যুগের সূচনা কবে?

যদিও এখনও পর্যন্ত কোনোটিই ঐতিহাসিক মর্যাদায় ভূষিত হবার মত নয়—অর্থাৎ বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম অর্জিত হল বলে চিহ্নিত হবার মত নয়।

মহাকাশ-চর্চা সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব কী?

বলা যায়, ও-ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতের দৃষ্টি বা চিন্তা গোড়া থেকেই যথোচিত।

মহাকাশ যুগের প্রায় শুরুতেই—1961 সালে—ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর স্পেস রিসার্চ (Indian Council for Space Research)—সংক্ষেপে INCOSPAR—নামে এক সংস্থা গঠিত হয়; তার সভাপতি ডঃ বিক্রম সারাভাই স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে মহাকাশে প্রতিযোগিতায় নামা আদৌ ভারতের লক্ষ্য নয়। কিন্তু ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত মানবকল্যাণে মহাকাশকে কাজে লাগানোর যে-অভিনব পথের সন্ধান পাওয়া গেছে ভারত কোনো মতেই সে-ব্যাপারে অনুদ্যোগী বা নিস্পৃহ থাকতে পারে না।

উল্লেখযোগ্য যে, আরো আগে 1957 সালে—স্পুৎনিক উৎক্ষেপণের খবর পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—উত্তরপ্রদেশের নইনিতাল মানমন্দির থেকে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুধাবন করার এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। পরের বছর 'টাটা ইনসটিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ' (Tata Institute of Fundamental Research) সংক্ষেপে TIFR—থেকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, নিয়মমাফিক প্লাস্টিকের বেলুন পাঠিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের অনেক উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের গতিপ্রকৃতি কেমন সে-সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা শুরু হয়ে যায়। এ-সব ছিল মহাকাশ-চর্চার ব্যাপারে নবীন ভারতের শিক্ষানবিশি।

শিক্ষানবিশি শেষ করে, ভারত কবে, কীভাবে মহাকাশের উদ্দেশে সরাসরি পদক্ষেপ শুরু করে?

1973-এর নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষের মাটি থেকে মহাকাশের উদ্দেশে প্রথম রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়।

এই রকেটটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করা এক 'দ্বি-পর্যায়ী রকেট' (Two-stage rocket)—ওঁদের পরিভাষায়, 'নাইকী-আপ্যাসি রকেট' (Nike-Apache Rocket)। কিন্তু এটিকে উৎক্ষেপের কলাকৌশল প্রয়োগ করেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিজেরাই। উৎক্ষেপ করা হয় কেরালার ত্রিবান্দ্রম শহরের নিকটবর্তী থুম্বা নামের সুনির্বাচিত এক গ্রামের এক অংশ থেকে।

মহাকাশ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক না-হলেও, ইতিহাস-পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা ছোট একটি তথ্যের উল্লেখ এখানে হয়তো দোষজনক হবে না—বরং কোনো কোনো পাঠকের কাছে বেশ চিত্তাকর্ষকই হবে। সেটি এই যে, ভারতভূমি থেকে রকেট-উৎক্ষেপণের এক চিত্তাকর্ষক পূর্ব-ইতিহাস আছে। প্রায় দু-শ বছর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, মহীশূরাধিপতি হায়দার আলি এবং তারপর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে রকেটাস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং অন্ততপক্ষে একবার—1767-69 সালের 'প্রথম মহীশূর মহাযুদ্ধ'-এ—পররাজ্যলোভী ইংরেজকে হতবুদ্ধি ও বিপর্যস্ত করতে পেরেছিলেন; ইংরেজ সে-মহাযুদ্ধে হায়দার-নির্ধারিত শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ রকেট উৎক্ষেপণের জন্য থুম্বা নামের বিশেষ একটি গ্রামকে বেছে নেয় কেন?

থুম্বা গ্রামটি কেরালার রাজধানী ত্রিবান্দ্রম শহরের খুব কাছে—মাত্র 10 কিলোমিটার উত্তরে। ভৌগোলিক বিচারে পৃথিবীর 'নিরক্ষরেখা' (Equator)-এর উপরে ঠিক নয়—অর্থাৎ মাঝামাঝি অঞ্চলের কোথাও ঠিক নয়, কিন্তু কাছেই—মাত্র 8°-র মত উত্তরে বিচ্যুত। অন্যভাবে

বললে, থুম্বার 'অক্ষাংশ' (Latitude) প্রায় 8^{0} উঃ। এগুলো সব থুম্বাকে কমবেশি উপযোগিতা দান করেছে। কিন্তু যা

মহাকাশ-চর্চার ব্যাপারে দক্ষিণ-ভারতের থুম্বা-র কোনো বিশেষ সুযোগ বা সুবিধা আছে কি? থুম্বার চৌম্বক অক্ষাংশ কত?

থুম্বার পক্ষে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে থুম্বার 'চৌম্বক অক্ষাংশ' (Magnetic latitude)। থুম্বার দূরত্ব পৃথিবীর 'চৌম্বক নিরক্ষরেখা' (Magnetic equator) থেকে প্রায় না-থাকার মত। থুম্বার চৌম্বক অক্ষাংশ প্রায় 0^{0}।

এখানে হয়তো একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। এ-কথাটা তো সবারই জানা যে, পৃথিবী যেন এক লাট্টুর মত পশ্চিম থেকে পুবে ঘুরছে। এই ঘোরাটা অবশ্যই পৃথিবীর এক ব্যাসের চারপাশে—উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই ব্যাস হল পৃথিবীর 'ভৌগোলিক অক্ষ' (Geographical axis) বা সংক্ষেপে 'অক্ষ' (Axis)। কিন্তু পৃথিবী শুধু ঘূর্ণমান এক লাট্টুর মত নয়; একই সঙ্গে পৃথিবীর আচার-ব্যবহার যেন এক চুম্বকের মত—অতি বৃহৎ এক 'চুম্বক-দণ্ড' (Bar magnet)-এর মত। এই চুম্বক-দণ্ডটি যেন উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত—ঠিক ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ বরাবর নয়, তবে অনেকটা তা-ই। ফলে পৃথিবীর আর একটি অক্ষের সৃষ্টি হয়েছে, তার 'চৌম্বক অক্ষ' (Magnetic axis)—যে-অক্ষটি ভৌগোলিক অক্ষ থেকে স্বতন্ত্র যদিও ব্যবধান বেশি নয়, যে-অক্ষ ভৌগোলিক অক্ষকে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে ছেদ করেছে কিন্তু অন্যত্র ক্রমশ একটু একটু করে সরে আছে, যে-অক্ষ পৃথিবী-পৃষ্ঠকে স্পর্শ করেছে দুটি বিন্দুতে—পৃথিবীর 'উত্তর মেরু' (North pole) ও 'দক্ষিণ মেরু' (South pole)-এর কাছাকাছি বটে কিন্তু ওদের থেকে পৃথক দুই বিন্দুতে। ব্যাপারটা অতএব এই যে, পৃথিবীর চারটি 'মেরু' (Pole) আছে—দুটি 'উত্তর মেরু', দুটি 'দক্ষিণ মেরু'। উত্তর মেরুদ্বয়ের মধ্যে একটি 'ভৌগোলিক' (উত্তর মেরু বলত সাধারণত এটিকেই বোঝায়), অপরটি 'চৌম্বক'। তেমনই দক্ষিণ মেরুদ্বয়ের ক্ষেত্রেও। এই মেরু ও অক্ষগুলোর সাহায্যে পৃথিবীর দুই প্রকার বিভাজন সম্ভব—একটি ভৌগোলিক (এবং এটিই সর্বজনবিদিত), অপরটি চৌম্বক। অতএব স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর দুটি নিরক্ষরেখা আছে। পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের আছে দুটি অক্ষাংশের মাপ। ভৌগোলিক মাপজোখগুলো প্রায় প্রতি পদেই কাজে লাগে—প্রাচীনকাল থেকে এদের প্রচলন; চৌম্বকগুলো লাগে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে। যতদিন যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া নির্ধারণ প্রভৃতির পক্ষে ভূ-চৌম্বক রাশিগুলোর ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের থুম্বার পক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, পৃথিবীর চৌম্বক নিরক্ষরেখার প্রায় উপরেই থুম্বার অবস্থান।

অবস্থানগত এই সুবিধের জন্য থুম্বা থেকে পৃথিবীর পরিপার্শ্ব সম্পর্কে এমন কিছু কিছু তথ্য নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করা যায়, যা পৃথিবীর খুব কম জায়গা থেকে করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার যে-কয়েকটি অঞ্চল থেকে সম্ভব, তার কোথাও—আগে বা পরে—কোনো রকেট উৎক্ষেপ-কেন্দ্র নির্মিত হয়নি। ফলে 'থুম্বা ইকোয়েটোরিয়াল রকেট লঞ্চিং স্টেশন' (Thumba Equatorial Rocket Launching Station)—সংক্ষেপে TERLS—থেকে যে-সব তথ্য সংগৃহীত হয়, প্রয়োজনমত পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীদের তার ওপর নির্ভর করতে হয়।

থুম্বার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য, সারা পৃথিবীর স্বার্থে, ইউ এন ও (UNO) থেকে এই কেন্দ্রটিকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়।

থুম্বা থেকে কী-ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা সারা পৃথিবীর কাজে লাগে?

পৃথিবীর চৌম্বক নিরক্ষরেখার ওপরে—ভূপৃষ্ঠ থেকে 100 120 কিলোমিটার (বা প্রায় 62.5–75 মাইল) উচ্চতায়—সদা সর্বদা এক ইলেকট্রন-স্রোত প্রবহমান। এই স্রোতের উচ্চতা, তীব্রতা প্রভৃতির কিছু কিছু অনির্দিষ্ট, সাময়িক হেরফের ঘটতে পারে, আর তার নানা ধরনের ফলাফল ঘটতে পারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেতে হলে, আমাদের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা সুচারুভাবে পরিচালনা করতে হলে এই সব ফলাফলের খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ

করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। থুম্বা কেন্দ্রের একটি বড় কাজ এইসব বিবরণ সংগ্রহ করা।

এখান থেকে প্রতি বুধবার রাত্রি ৪টায় একটি ছোট রকেট উৎক্ষেপ করা হয়। রকেটটি 65 কিলোগ্রাম ওজনের এক যন্ত্রসমষ্টিকে 8–10 সেকেণ্ডের মধ্যে 80–90 কিলোমিটার (বা প্রায় 50–56 মাইল) উচ্চতায় তুলে দেয়। রকেটটি অতঃপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সবেগে আরব সাগরের জলে গিয়ে পড়ে, কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলো প্যারাশুটের ওপর ভর করে ধীরে ধীরে—প্রায় 45 মিনিট ধরে—নামতে থাকে আর স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরগুলোর চাপ, তাপমাত্রা, ইলেকট্রন-ঘনত্ব প্রভৃতির পরিমাপ ভূ-পৃষ্ঠে পাঠাতে থাকে। ভারত সারা বিশ্বের সঙ্গে সে-তথ্যসম্পদ ভাগ করে নেয়।

ভারতবর্ষের মহাকাশ-চর্চা কি কেবলমাত্র থুম্বার উৎক্ষেপণ কেন্দ্রকে নিয়েই গঠিত?

না, আরো কিছু আছে—থুম্বাতেও এবং অন্যত্র।

এ-কথা অবশ্যই ঠিক যে ভারতের প্রত্যক্ষ মহাকাশ-চর্চা একদিন থুম্বা থেকেই তার যাত্রা শুরু করে। যা একদিন ছিল আরব সাগরের তীরের ধীবর-অধ্যুষিত অখ্যাত ছোট এক গ্রাম, আজ সেখানে কয়েকটি বিরাট বিরাট সংস্থা মহাকাশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা গবেষণা ও অনুশীলনে রত। TERLS ছাড়া, 'রকেট প্রপেল্যান্ট প্ল্যান্ট' (Rocket Propellant Plant)—সংক্ষেপে RPP, 'রকেট ফ্যাব্রিকেশন ফেসিলিটি' (Rocket Fabrication Facility)—সংক্ষেপে RFF প্রভৃতি মোট পাঁচটি সংস্থা। সব মিলিয়ে যে বিরাট যৌথ-উদ্যোগ তার নাম 'বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার' (Vikram Sarabhai Space Centre)—সংক্ষেপে VSSC।

কেরালার VSSC ছাড়া আরো কয়েকটি সংস্থা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে মহাকাশ-চর্চায় নিযুক্ত আছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য অন্ধ্রপ্রদেশের 'শ্রীহরিকোটা লঞ্চ কম্প্লেক্স' (Sriharikota Launch Complex)—সংক্ষেপে SLC, গুজরাটের আমেদাবাদের 'স্পেস অ্যাপ্লিকেশন্স সেন্টার' (Space Applications Centre)—সংক্ষেপে SAC, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন' (Indian Space Research Organization)—সংক্ষেপে ISRO।

মহাকাশে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কোন কৃতিত্ব প্রথম বড় মাপের সাফল্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে?

সেটি একটি কৃত্তিরম উপগ্রহ; নাম আর্যভট। 1975 সালে উৎক্ষিপ্ত এই কৃত্রিম উপগ্রহটিই প্রথম মহাকাশের উচ্চতা থেকে দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রচার করে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গৌরবজনক কৃতিত্বের কথা।

একথা অবশ্য এ-প্রসঙ্গে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয় যে, ওই সাফল্যের পিছনে ভারতবর্ষ এক বন্ধু-রাষ্ট্রের সহায়তা পেয়েছিল—সোভিয়েত ইউনিয়ন। সে-সহায়তার ভিত্তি রচিত হয় 1972 সালে।

1972 সাল সেই হিসেবে ভারতের মহাকাশ-চর্চার ইতিহাসে এক স্মরণীয় সাল। ওই বছরে মস্কোয় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—মহাকাশের কল্যাণমূলক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভারতের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বতোভাবে সহায়তা দেবে। ওই চুক্তি সম্পাদনের কয়েক মাস পরেই ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা ব্যাঙ্গালোরে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। সেটিই আর্যভট। আর্যভটের প্রায় সর্বাংশই ভারতীয় কৃতিত্বের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। শুধু প্রকল্পটিকে কিছুটা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অল্প কয়েকটি অংশ—যেমন সৌরবিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য বিশেষ ধরনের ফলক, বিদ্যুৎ সঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি প্রভৃতি— সোভিয়েত দেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটিকে উৎক্ষেপ করা হয় 1975 সালের 19 এপ্রিল তারিখে। যথেষ্ট শক্তিশালী ভারতীয় রকেট না-থাকায়, আর্যভটকে পূর্ব-পরিকল্পনামত উৎক্ষেপ করা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটি থেকে ওদেশের রকেটের সাহায্যে। কিন্তু উৎক্ষেপের তিন দিন পর থেকে দূর-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেটিকে চালিত করার পুরো দায়িত্ব নিয়েছিলে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কলাকুশলীরা।

360 কিলোগ্রাম ওজনের এই উপগ্রহটিকে নির্মাণ করতে ভারতের ব্যয় হয়েছিল প্রায় পাঁচ কোটি টাকা।

আর্যভটের মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বা সাধারণভাবে পৃথিবীর বিজ্ঞানীসমাজের বিশেষ লাভ কিছু হয়েছিল কি?

আর্যভট-প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল উপগ্রহ-নির্মাণের এবং তার উৎক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা অন্ততপক্ষে পরোক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা। সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি ছোট ছোট উদ্দেশ্যও যুক্ত করা হয়েছিল—বিশেষ গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে সৌর পদার্থবিজ্ঞান, ঊর্ধ্ববায়ুমণ্ডল এবং এক্স-রশ্মি জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণা-সহায়ক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা।

মুখ্য বা গৌণ যেদিক দিয়ে বিচার করা যাক না কেন, আর্যভট প্রকল্পটি সাফল্য অর্জন করেছিল আশাতিরিক্ত পরিমাণে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে, লক্ষ্যমাত্রা ছিল অন্ততপক্ষে ছ-মাস কার্যক্ষম রাখা, কিন্তু আর্যভট কর্মক্ষম ছিল পাঁচ বছরেরও বেশি।

আর্যভট কি মহাকাশে প্রেরিত ভারতের একমাত্র উপগ্রহ?

না, আর্যভট প্রথম কিন্তু আর্যভটই শেষ নয়। তারপর প্রেরিত হয়েছে ভাস্কর-1, ভাস্কর-2 প্রভৃতি আরো কয়েকটি। আর যেটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে সেটি হল রোহিণী-1।

ভাস্কর পর্যায়ের উপগ্রহগুলো কি মহাকাশচর্চায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আরো বেশি অগ্রগামিতার বা আরো বেশি সফলতার পরিচয় দেয়?

হ্যাঁ, কতকাংশে অবশ্যই তা-ই। ভাস্কর উপগ্রহগুলোর সঙ্গে পূর্ববর্তী আর্যভটের আকৃতি বা গঠনে বেশ কিছু সাদৃশ্য ছিল বটে, কিন্তু দুই ভাস্করই ছিল আরো বৃহদায়তন ও গুরুভার। দুটিরই ওজন ছিল 444 কিলোগ্রাম করে।

এ-দুটির উদ্দেশ্য ছিল আরো জনকল্যাণমুখী। এদের জন্য নির্ধারিত কাজ ছিল ভারতের বিশাল ভূভাগে যে-সব অনাবাদী অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে তাদের কৃষিযোগ্যতা বিচার করা, কোথায় ভূ-গর্ভে কত নীচে কী-পরিমাণে জলসম্পদ লুকানো আছে তার সন্ধান করা ইত্যাদি। দুই ভাস্করই তা বেশ কিছু পরিমাণে করতে পেরেছে।

ভাস্কর-1 উৎক্ষিপ্ত হয় 1979 সালে; দ্বিতীয়টি 1981-তে। দুটিই সোভিয়েত উৎক্ষেপ কেন্দ্র থেকে, ওদেশের রকেটের সাহায্যে।

ভারতবর্ষ কি তার নিজের মাটি থেকে, নিজের উৎক্ষেপক রকেটের সাহায্যে, নিজের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে সক্ষম হয়েছে?

হ্যাঁ, হয়েছে। ও-ব্যাপারে যার নাম সর্বাগ্রে করতে হয় সেটি হল রোহিণী-1।

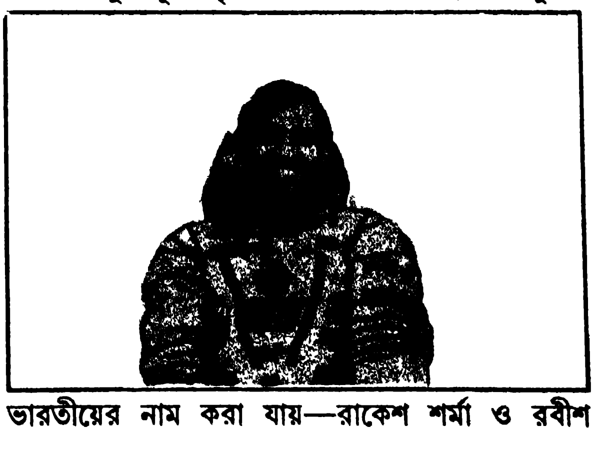
এই উপগ্রহটির ওজন ছিল, আগের ভারতীয় উপগ্রহগুলোর তুলনায় অনেক কম—মাত্র 35 কিলোগ্রাম, কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু উপগ্রহটি নয়, তার উৎক্ষেপক রকেটটিও—যা SLV-3 নামে পরিচিত—ছিল পুরোপুরি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা নির্মিত। রোহিণী-1 উৎক্ষিপ্ত হয় 1980 সালের জুলাই মাসে, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে।

মহাকাশবিজ্ঞানীরা কৌতুক করে যাকে 'মহাকাশ সমিতি' (Space Club) আখ্যা দিয়ে থাকেন, রোহিণী উৎক্ষেপের কৃতিত্বে ভারত তার সম্মানজনক সদস্যপদ লাভ করে। এর পূর্বতন সদস্যরা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান ও চীন।

কোনো ভারতীয় এ-যাবৎ মহাকাশে পাড়ি দিয়ে এসেছেন কি—যেমন দিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরি গাগারিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন গ্লেন প্রভৃতি?

হ্যাঁ, ভারত সে-গৌরবেরও অংশভাক।

প্রায় তুল্যমূল্য কৃতিত্বের অধিকারী হিসেবে দুজন



ভারতীয়ের নাম করা যায়—রাকেশ শর্মা ও রবীশ

মালহোত্র। এঁরা দুজনেই সোভিয়েত ইউনিয়নে কঠোরতম প্রশিক্ষণ নিয়েছেন; দুজনেই মহাকাশে অভিযান করার পক্ষে যোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছেন। অতঃপর এঁদের মধ্যে প্রথম জন সোভিয়েত দেশের দুই মহাকাশচারীর সঙ্গী হয়ে 1984 সালের এপ্রিল মাসে মহাকাশে সপ্তাহকাল কাটিয়ে এসেছেন।

ভারতীয় অভিযাত্রী মহাকাশে পাড়ি দেন কোন সময়ে?

মানুষের মহাকাশ জয়ের প্রসঙ্গে রকেটের কথা বারংবার এসে যায়। এর কারণ কী—এ-ব্যাপারে রকেটের ভূমিকাটা ঠিক কী?

মহাকাশ জয়ের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, সরল-জটিল অনেক কিছু যন্ত্র, কৌশল, উপাদান প্রভৃতি মানুষকে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অন্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে আছে রকেট—থাকবেও চিরকাল। বলা যায়, রকেটবাহিত না-হলে মানুষের পক্ষে বা মানুষ প্রেরিত কোনো কিছুর পক্ষে মহাকাশে প্রবেশাধিকার নেই। কারণ, যে-কথা আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে বা অন্তত পক্ষে তার নীচের দিকের ঘন অংশের ঊর্ধ্বে না-গেলে তা মহাকাশে যাওয়া হয় না; আর এই উচ্চতায় যদিও বেলুন, বিমান প্রভৃতি বায়ুনির্ভর যানবাহন সম্পূর্ণ চলনশক্তি-হীন, রকেটের কিন্তু ওখানে স্বচ্ছন্দ বিহার। বরং বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধ না-থাকায় ওখানে রকেটের চলাফেরা এক হিসেবে সহজতর।

মহাকাশ জয় আর রকেট-চর্চা যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে কেন?

রকেটের বৈশিষ্ট্য কী—কোথায় বেলুন বা বিমানের সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য?

রকেটের বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে, আগে 'গতিবিজ্ঞান' (Dynamics)-এর তিনটি মূল বিধিকে জেনে নিতে হয়। 'নিউটনের গতিসংক্রান্ত বিধি' (Newton's laws of motion) নামে অভিহিত সেই বিধি তিনটিকে এইভাবে বিবৃত করা যায়:

1. বল (Force) প্রয়োগ না-করা পর্যন্ত কোনো স্থির বস্তুর পক্ষে আদৌ গতিশীল হওয়া সম্ভবপর নয়, এবং সম্ভবপর নয় কোনো গতিশীল বস্তুর পক্ষে তার গতিবেগ বা গতিপথের কোনো পরিবর্তন;

2. গতিবেগ বা গতিপথের পরিবর্তন হয় প্রযুক্ত বলের 'অভিমুখ' (Direction)-এ এবং বস্তুটির ভর (Mass) অপরিবর্তিত থাকলে গতিবেগের পরিবর্তন-হার হয় বলের সমানুপাতিক;

3. 'ক্রিয়া' (Action)-মাত্রেরই সমান ও বিপরীত 'প্রতিক্রিয়া' (Reaction) থাকে। অর্থাৎ বল প্রয়োগ করলেই সমপরিমাণে কিন্তু বিপরীত অভিমুখে আর এক বল লাভ ঘটে।

তৃতীয় বিধিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ, আপাতসরল এই বিধিটি প্রায়শ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। তাছাড়া রকেট প্রসঙ্গে এই বিধিটির গুরুত্ব সবিশেষ। টীকা হিসেবে এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথমত, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া (অর্থাৎ প্রযুক্ত বল এবং তার ফলে লব্ধ বল) দুটি পৃথক বস্তুতে বা এক বস্তুর দুই পৃথক অংশে কার্যকর। অর্থাৎ ক-এর ক্রিয়া যদি খ-এর ওপরে হয়, তবে খ-থেকে উৎপন্ন প্রতিক্রিয়া হবে ক-এর ওপর—দুটিই ক-এর ওপর বা দুটিই খ-এর ওপর, এমন নয়। দ্বিতীয়ত, সমপরিমাণ হলেও (ভিন্ন দুই বস্তুতে বা একই বস্তুর ভিন্ন দুই অংশে কার্যকর) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল ভিন্ন পরিমাণের হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গাছ থেকে খসে যাওয়া ফল যখন পৃথিবীর আকর্ষণের বলে সবেগে পতনশীল হয় তখন ফলের সমপরিমাণ আকর্ষণে পৃথিবীর অবস্থানের কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন হয় না।

রকেটের বৈশিষ্ট্য বা অন্যান্য চলনক্ষম বস্তু থেকে তার মূলগত পার্থক্য হচ্ছে তার আত্মনির্ভর চালিকাশক্তি—তার স্বজাত বল। আধুনিক জেট বিমান ছাড়া অন্য সমস্ত যানবাহনই—এমন-কী শামুকগোষ্ঠীর একপ্রকার জলচর প্রাণী ছাড়া সম্ভবত অন্য সব সচল প্রাণীই—চলাফেরার ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে পারিপার্শ্বিক

মাটি, জল, বায়ু প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ করে। দেহসংলগ্ন অপর কোনো-না-কোনো বস্তুর—অর্থাৎ মাটি, জল, বায়ু প্রভৃতির—ওপর ক্রিয়া বা বল প্রয়োগ করে, প্রতিফল হিসেবে স্বদেহে যে-প্রতিক্রিয়া বা বল লাভ করে, তা-ই এ-সকল বস্তুর—বা প্রাণীর—চালিকাশক্তি। আর রকেট? রকেটের ক্ষেত্রেও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা আছে কিন্তু ওখানে বহিঃস্থ কোনো বস্তুর স্থান নেই। রকেটের নিজের এক অংশের ক্রিয়া অপর এক অংশের ওপর; নির্গমনশীল বা নিঃসৃয়মাণ শেষাংশের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমাংশের গতি।

প্রসঙ্গত, ব্যতিক্রম হিসেবে, যে জেট বিমান বা শামুক জাতীয় প্রাণীদের কথা এখনই উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের চালিকাশক্তি রকেটেরই অনুরূপ; কিন্তু তবু তাদেব সঙ্গেও রকেটের গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ আছে। ওরা পরোক্ষভাবে

চলমান অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে রকেটের মূলগত কোনো পার্থক্য আছে কি?

পারিপার্শ্বিকের ব্যবহার করে—জেট বা শামুক যথাক্রমে বাতাস বা জলকে প্রথমে ধীরে ধীরে দেহের অঙ্গীভূত করে, পরে (জেটের ক্ষেত্রে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত রূপে) সবেগে নিষ্কাশিত করে। রকেট—মুক্ত মহাকাশ-পরিব্রাজক রকেট—কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। চলার পথে রকেট বর্জন করে, গ্রহণ করে না।

রকেটের গতির ব্যাপারটা যেন রহস্যময় কিছু বলে মনে হতে পারে। সাধারণ মানুষের পক্ষে, সহজে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব এমন কোনো ঘটনার মাধ্যমে, ব্যাপারটা বোধগম্য হতে পারে কি?

অবশ্যই পারে। ওখানে রহস্যের কিছু নেই। আমাদের চারপাশে অমন ঘটনা অনেক সময়ই ঘটে।

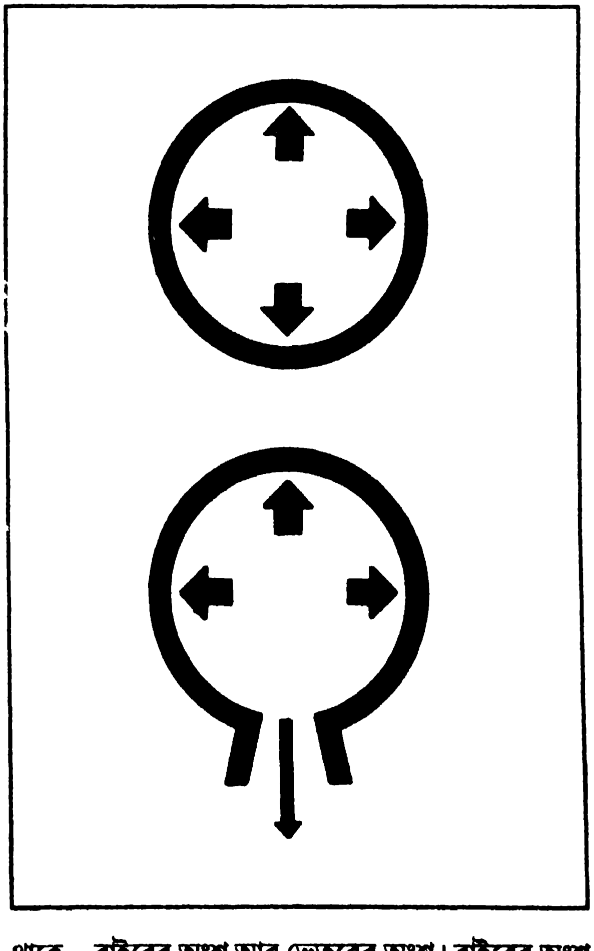
ধরা যাক, একটি ছোট নৌকো এক নদী বা খালের তীর ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। একজন যাত্রী যদি এমন সময়ে নৌকোটি থেকে লাফিয়ে তীরে নামেন, তাহলে নৌকোটি তীর থেকে কিছুটা দূরে পিছিয়ে যাবে। নৌকোটি বড় অর্থাৎ ভারী হলেও তা-ই হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে ফলটা হবে যৎসামান্য—চোখে তেমনভাবে ধরা না-পড়তেও পারে। নৌকো ছোট অর্থাৎ হাল্কা হলে অবশ্যই তা বোঝা যায়।

বন্দুক বা কামান ছুঁড়লে, গুলি বা গোলা যখন সামনে ছুটে যায় তখন বন্দুক বা কামানকেও একটা পিছু হঠতে হয়। যিনি কখনো বন্দুক ছুঁড়েছেন তিনি জানেন যে, ছোঁড়ার ফলে কাঁধে বা বুকে একটা ধাক্কা লাগে।

এ-সব ক্ষেত্রেই যা আগে দেহের অংশ হয়ে ছিল এবং পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবেগে সামনে ছুটে গেল, তার ধাক্কায় দেহের অন্য অংশের উল্টোদিকে যেতে বাধ্য হওয়ার ব্যাপার।

রকেট তার দেহের কোন অংশকে সজোরে নিক্ষেপ করে এবং কীভাবে করে?

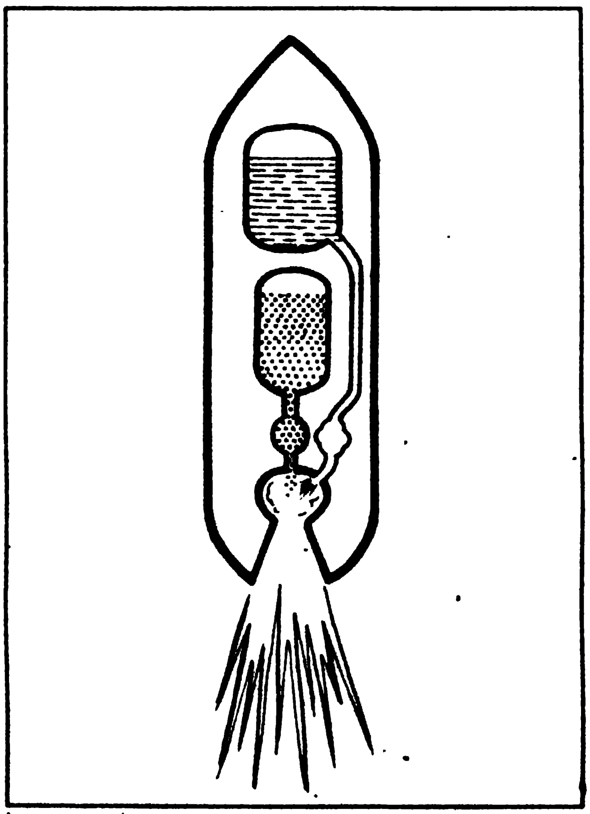
মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, রকেটের দেহে দুটি অংশ



থাকে—বাইরের অংশ আর ভেতরের অংশ। বাইরের অংশ

অভীষ্ট দিকে ছুটে যায় আর ভেতরের অংশকে নিক্ষিপ্ত করা হয় বা ছোটানো হয় উল্টোদিকে।

ভেতরের অংশ আবার মূলত দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত থাকে—দুটি পৃথক কক্ষে রক্ষিত দুই বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। একটি দাহ্য, অপরটি দহনসহায়ক। হতে পারে অ্যালকহল আর অক্সিজেন; হতে পারে ওই দুই জাতীয় অন্য অনেক কিছু। শুরুতে যদিও এরা থাকে দুটি পৃথক কক্ষে আবদ্ধ, পরে কিন্তু যান্ত্রিক কৌশলে নিয়ন্ত্রিত বেগে এদের এক তৃতীয় কক্ষে—বলা যায় 'দহনকক্ষ'-এ—এনে মিশিয়ে দিয়ে দহনক্রিয়া সংঘটিত করা হয়। উৎপন্ন হয় তৃতীয় এক রাসায়নিক পদার্থ। প্রথম দুটি পদার্থ—দাহ্য আর দহনসহায়ক যারা—কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়—যে-কোনো অবস্থায় থাকতে পারে; তাতে আপেক্ষিক সুবিধে-অসুবিধের ব্যাপার জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু আবশ্যিকতার কোনো শর্ত জড়িত থাকে না। দহনের ফলে প্রাপ্ত তৃতীয় রাসায়নিকটিকে কিন্তু গ্যাসীয় অবস্থায়



উৎপন্ন হতেই হবে—যা প্রচুর আয়তন জুড়ে থাকতে চায়, অর্থাৎ তাকে অনেকটা জায়গা দিতে হবে। দহনকক্ষে অবশ্য অতটা জায়গা থাকে না—থাকতেই পারে না; কেননা দাহ্য ও দহনসহায়ককে সুপরিকল্পিতভাবে দ্রুতবেগে আরো আরো বেশি পরিমাণে নিয়ে এসে উত্তরোত্তর তৃতীয় পদার্থটিকে বেশি বেশি করে উৎপন্ন করা হয়। ফলে স্থান-সংকুলান হয় না, দহনকক্ষের দেওয়ালের সঙ্গে প্রচণ্ড চাপাচাপির সৃষ্টি হয়। এই দেওয়ালের একপাশে, এক জায়গায় থাকে এক সরু নির্গমন পথ—বলা যায়, একটি ফুটো। অতএব, স্বাভাবিকভাবেই ওই ফুটো দিয়ে পথ করে নেয় উৎপন্ন প্রভূত গ্যাস—ভেতর থেকে প্রচণ্ড চাপ খেয়ে, বাইরে বেরিয়ে আসে। আর নিউটনের তৃতীয় বিধি অনুসারে দিয়ে আসে ভেতরের অংশকে প্রচণ্ড ধাক্কা।

সব কিছু যাতে ঠিকঠাক হয়, তার জন্য রকেটের ভেতরে অবশ্য নানা যন্ত্রপাতি থাকে—পাম্প, ভাল্‌ব ইত্যাদি। এগুলো মিশ্রণ, দহন এবং নির্গমনকে সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত করায়।

মহাকাশগামী রকেটকে সুবিশাল পথ অতিক্রম করতে হলে ওই পথের পক্ষে পর্যাপ্ত দাহ্য ও দহনসহায়ক পদার্থ নিজের দেহের ভেতরে মজুত রাখার জন্যে বেশ বড়, অতএব ভারী হতেই হবে। আবার বেশি ভারী হওয়া মানেই বেশি চালিকাশক্তির দাবি অর্থাৎ আরো ভারী হওয়া। এই 'দুষ্ট চক্র' (vicious circle) থেকে রকেট মুক্ত হয় কী করে?

দুটি কারণে রকেট ওই জটিল সমস্যার জাল থেকে মুক্তি পায়। প্রথম কারণ গতিসংক্রান্ত 'নিউটনের প্রথম বিধি'। দ্বিতীয় কারণ বৈজ্ঞানিকদের কৌশলী বুদ্ধি।

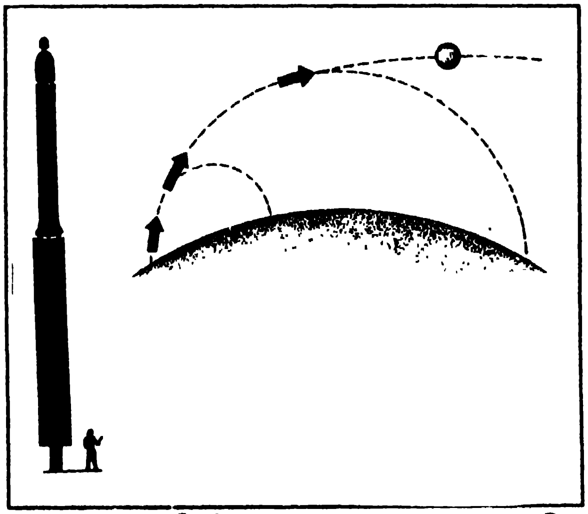
মহাকাশে একবার উপনীত হয়ে গেলে, রকেটের পথ অনেকটাই সুগম। তখন গতিশীল বস্তুকে অপর কোনো বস্তুর 'ঘর্ষণ' (Friction), 'রোধ' (Resistance) প্রভৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয় না বললেই চলে, ফলে চালিকাশক্তির তেমন প্রয়োজন আর থাকে না।

মহাকাশে পাঠানো রকেটের গঠনে বা বিন্যাসে বাহাদুরি থাকে। ও-রকেট 'বহুপর্যায়ী রকেট' (Multistage rocket)—একটি মাত্র রকেট নয়। হয় কী, একটি রকেটের ওপরে বসানো থাকে আর একটি রকেট—প্রয়োজনে তার ওপরে আরো এক বা একাধিক। কাজ শুরু করে প্রথম

রকেটটি—অর্থাৎ যেটি থাকে সবচেয়ে নীচে। সেটিই হয় সবচেয়ে বড়, তাতেই দহনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মালমশলা

'বহুপর্যায়ী রকেট' কাকে বলে? মহাকাশ-অভিযানে তার ভূমিকা কী?

থাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে; কারণ তুলনাগত বিচারে তার কাজটাই সবচেয়ে বেশি আয়াসসাধ্য। প্রথমে তার মধ্যে দহনকার্য শুরু হয়; রকেটটি তার দেহের অভ্যন্তরে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থকে সবেগে পিছনে নিষ্কাশিত করতে করতে ওপরে উঠতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তুলতে থাকে তার দেহের সঙ্গে সংলগ্ন অন্যান্য অংশগুলোকেও—যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এক বা একাধিক অন্য রকেট। প্রথম



রকেটটির জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে গেলে, তার আর কিছু করার থাকে না—অনাবশ্যকভাবে ভার বৃদ্ধি করা ছাড়া। অতএব, করা হয় কী, এই অংশটিকে যান্ত্রিক কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়—অংশটি পৃথিবীর দিকে নিজের ভারে নেমে আসতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় রকেটটির কাজ শুরু হয়ে যায়—দহনকার্য, উৎপন্ন পদাথকে পিছনে ঠেলে দেওয়া এবং বাকি অংশের ওপরে ওঠা। এইভাবেই চলে পর পর—বার বার।

পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, পর পর কার্যকর রকেটদের একত্রে 'বহুপর্যায়ী রকেট' নামে অভিহিত করা যায়। এই ধরনের রকেট উদ্ভাবন করতে না-পারলে, মানুষ বাস্তবে মহাকাশ জয় করতে পারতো না।

বহুপর্যায়ী রকেটে নীচের দিকের রকেটের কাজ বেশি কঠিন কেন?

তার বেশ কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথমত, এই রকেটকে সবচেয়ে বেশি ভারোত্তোলন করতে হয়। পরের দিকে একের পর এক অকেজো রকেট বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে, অবশিষ্ট অংশকে উত্তরোত্তর ভারমুক্ত করে দেয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি রকেটের দায় সে-হিসেবে অবশ্যই বেশ কম।

দ্বিতীয়ত, নিম্নতম রকেটকে ভারোত্তোলন করতে হয় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে। এই অংশে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব অনেক বেশি, তাই এর ঘর্ষণ, রোধ প্রভৃতির বাধাও অনেক বেশি। সেই বেশি বাধাকে পরাভূত করতে হয় নিম্নতম রকেটটিকে।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় রকেট বা তার পরের রকেটকে কাজ শুরু করতে হয় যেখান থেকে, সে-জায়গা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে অধিকতর দূরবর্তী। তাই সেখানে 'মাধ্যাকর্ষণের বল' (Force of gravitation) ক্ষীণতর—অতএব, সে-রকেটের কাজ তুলনাগতভাবে সহজতর।

রকেট ছাড়া যে মহাকাশে যাওয়া যায় না, এ-কথা মানুষ বুঝলো কীভাবে, কবে?

বুঝতে মানুষের অনেক দেরি হয়েছে, যদিও মানুষ মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কথা ভেবেছে বা সে-স্বপ্ন দেখেছে অতি প্রাচীনকালেই।

দেরি হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল এই যে, মানুষ আগে জানতো না, পৃথিবীকে ঘিরে যে-বায়ুমণ্ডল আছে, তা আছে মাত্র কিছুটা দূরত্ব পর্যন্ত—তারপর আর নেই; অতএব, সেখানে ওড়া সম্ভব নয়—না কোনো পাখির পক্ষে, না বেলুনের পক্ষে, না কিছুর পক্ষে। সে-সব দিনে মানুষের সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। যেন 'দুধের সাধ ঘোল দিয়ে মেটানো'-র মত, মানুষ তখন কাহিনী রচনা করতো। সে-সব কাহিনী ছিল 'আকাশকুসুম'-এর মত অবাস্তব। যেমন প্রাচীন ভারতের 'পদ্মপুরাণ'-এর কাহিনী—তাতে ছিল 'গরুড় পাখি'-র পিঠে চড়ে চাঁদে যাওয়ার কথা। গ্রিক পুরাণে ছিল আইকেরাস (Icarus)-এর বৃত্তান্ত। তাঁর পিতা নাকি ছিলেন এক সুকৌশলী কারিগর যিনি কাঠ, পাখির

পালক ইত্যাদি দিয়ে দুটি বিশাল ডানা তৈরি করে মোম দিয়ে ছেলের পিঠে জুড়ে দিয়েছিলেন এবং সেই ডানা মেলে আইকেরাস মহাকাশে চলে যেতে পেরেছিলেন। শেষ পরিণতিটা অবশ্য সুখকর হয়নি—পিতার নিষেধ ছিল কিন্তু সে-কথা ভুলে গিয়ে আইকেরাস সূর্যের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন, ফলে মোম গলে যায় আর আইকেরাস হন পপাত ধরণীতল।

বায়ুমণ্ডল যে মাত্র কিছুটা উচ্চতা পর্যন্ত আছে সেটা মানুষ প্রথম বুঝতে শেখে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে—বলা যায়, 1644 সাল থেকে—যখন ইতালীয় বিজ্ঞানী টরিচেলি (Torricelli)-এর কৃতিত্বে প্রথম 'বায়ুচাপ-মাপক যন্ত্র' (Barometer) নির্মিত হল।

বলা চলে, দূর মহাকাশ যে বায়ুশূন্য—সেখানে যেতে হলে যে রকেট ছাড়া গত্যন্তর নেই, সে-ধারণার ভিত্তি রচিত হল এই ভাবেই। আর তার কয়েক দশক পরে (1687 সালে) প্রণীত হয় নিউটনের মহাগ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia), যাতে গতিসংক্রান্ত 'নিউটনের তৃতীয় বিধি'-এর উল্লেখ ও আলোচনা থাকে, যা কিনা রকেটবিদ্যার মূলমন্ত্র—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিধি।

নিউটনের আগে কি রকেটের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অজানা ছিল?

না, তা নয়। প্রতিক্রিয়াজনিত বলের ব্যাপারটা ভালভাবে না বুঝেও, নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মোটামুটি একটা ধারণা মানুষ গড়তে পেরেছিল অনেক আগেই, আর তা কাজকর্মেও অল্পবিস্তর লাগাতো।

ইতিহাস-পৃষ্ঠায় প্রথম যে-কয়েকটি উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো খ্রিস্টজন্মেরও কিছু আগের—গ্রিক ও রোমান ইতিহাস থেকে। সেগুলো অবশ্য রকেট ছিল না, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার বলকে কাজে লাগানোর নিদর্শন ছিল সেগুলো।

পরবর্তী প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস এ-প্রসঙ্গে নীরব। সরবে মৌনভঙ্গ করেছে একাদশ শতাব্দী। ওই যুগের এক চিনা ঐতিহাসিক এক যুদ্ধের প্রসঙ্গে এক বিচিত্র ধরনের অস্ত্রের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সে-অস্ত্রকে 'অগ্নিবাণ' (Fire arrow) আখ্যা দেওয়া যায়। ওই অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে নাকি ধনুক লাগেনি, করতে হয়েছে তার পিছনে সংলগ্ন বারুদকক্ষে অগ্নিসংযোগ। অগ্নিবাণ সুনিশ্চিতভাবে আধুনিক রকেটের পূর্বপুরুষ।

অগ্নিবাণের উন্নত সংস্করণে অগ্রভাগের সূক্ষ্ম ফলা পরিত্যক্ত হয়। সেখানেও রাখা হত আর এক প্রস্থ বারুদ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বারুদই হত পৃথক পৃথক ভাবে দুটি উদ্দেশ্যের সাধক—ক্ষেপনের এবং ক্ষতিসাধনের। 1232 খ্রিস্টাব্দে পিকিং শহরের প্রতিরক্ষীরা চেংগিজ খাঁর পুত্রের নেতৃত্বে পরিচালিত দুর্ধর্ষ মঙ্গোল হানাদারদের একটি দলকে বারংবার প্রতিহত করে এই ধরনের রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে। আশাহত মঙ্গোলরা পরে রকেটবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং তারাই সম্ভবত সে-বিদ্যা ইওরোপে রপ্তানি করে।

পরবর্তী তিন শ' বছরের ইতিহাসে (অর্থাৎ ষোড়শ শতক পর্যন্ত) রকেট-চর্চার কৃতিত্ব, চীন ছাড়া, কমবেশি আরবদেশ, ইতালি, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানির মধ্যে বণ্টিত। জার্মানির পক্ষে দু-একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও রকেটের জনকল্যাণকর অন্য প্রয়োগের চিন্তা এখানেই প্রথম করা হয়। টান টান করে খাটানো তার থেকে শিথিলভাবে প্রলম্বিত ছোট রকেটের সাহায্যে, অল্প দূরত্বে দ্রুত বার্তা-প্রেরণের যে-চেষ্টা এখানে করা হয়েছিল তাকে আধুনিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার স্থূল পূর্বরূপ বলা যেতে পারে। রকেটকে কার্যশেষে ধীরে ধীরে অবতরণ করানোর বাস্তব পরিকল্পনাও সম্ভবত জার্মান মস্তিষ্ক-প্রসূত।

সে-যুগে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে রকেটের একটি বড় ত্রুটি ছিল—তার লক্ষ্যসন্ধান তেমন সূক্ষ্ম এবং সুনিশ্চিত ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে কামান-বন্দুকের প্রভূত উন্নতি হতে থাকে এবং সেগুলোই যোদ্ধারা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করতে থাকেন। ফলে এই সময় থেকে রকেট-চর্চায় ভাটা পড়তে থাকে।

রকেটের অপর একটি ব্যবহার কিন্তু আবিষ্কারের সময় থেকেই অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। সেটি আতসবাজি বা হাউই হিসেবে। এই সূত্রে রকেটের কিছু কিছু উৎকর্ষ এবং পরিবর্ধনও ঘটে। যেমন 'বহুপর্যায়ী রকেট'—বাজি হিসেবেই এর ব্যবহার প্রথম শুরু হয় এবং তা খুবই জনপ্রিয় হয়।

মহাকাশ জয়ের ব্যাপারে রকেটকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা শুরু করার কৃতিত্ব কার এবং কীভাবে তার সূত্রপাত ঘটে ?

কৃতিত্ব যাঁর, তাঁর নাম কনস্টান্টিন জিওল্‌কভ্‌স্কি (Konstantin Tsiolkovsky)। জন্ম জার-শাসিত অনগ্রসর রুশ দেশে 1857 সালে, মৃত্যু বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে 1935-এ। পেশায় ছিলেন বিদ্যালয়ের গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক; নেশা ছিল মহাকাশ জয়-সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা।

1883 খ্রিস্টাব্দ থেকে এঁর এ-বিষয়ে মৌলিক গবেষণার শুরু। মূল্যবান ফলগুলো প্রকাশিত হয় 1903-1905 সালে। এঁকেই সাধারণত 'আধুনিক রকেটবিদ্যা' বা 'নভশ্চরণবিদ্যা'র জনক বলে অভিহিত করা হয়।

জিওল্‌কভ্‌স্কির বিশদ, পুঙ্খানুপুঙ্খ রকেট-পরিকল্পনা (যে-রকেট মহাকাশে পাড়ি দিতে পারে), তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্ব ও বাস্তবানুগ কৌশল অনেকাংশে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত। প্রসঙ্গত, তাঁর দু-একটি কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রকেটের চালিকাশক্তি যে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ, তার চলার পথে বাতাসের যে প্রতিরোধ সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা নেই আর সর্বোপরি মহাকাশ যে রকেটেরই অধিগম্য—এই অতি প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট

আধুনিক রকেটবিদ্যার জনক কাকে বলা হয় ?

তথ্যগুলো জিওল্‌কভ্‌স্কিই প্রথম সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন এবং সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। এঁর আর একটি মূল্যবান কীর্তি হল রকেটের মধ্যে দহনের উদ্দেশ্যে প্রায় স্বেচ্ছাচারী বারুদের পরিবর্তে বশংবদ দুটি তরলকে দাহ্য ও দাহক হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা। বলাই বাহুল্য, প্রথমে পাম্পের সাহায্যে দুটি পৃথক কক্ষে রক্ষিত তরল দুটিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণাধীনে, ধীরে ধীরে দহনকক্ষে সংমিশ্রিত ও পরে অগ্নিসংযুক্ত করাই এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য।

দুঃখের বিষয়, জার-শাসিত সে-যুগের রুশদেশে, প্রায় আজন্মবধির, আত্মপ্রচার-বিমুখ, দরিদ্র স্কুল-শিক্ষক জিওল্‌কভ্‌স্কির অগ্রগামী গবেষণার সম্যক অর্থবোধেরও যোগ্যতা বিশেষ কারোর ছিল না। বিদেশেও সে-যুগে বা পরবর্তীকালে অনেকদিন পর্যন্ত এঁর নাম বা কীর্তি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল; কারণ এঁর প্রবন্ধাবলীর ভাষা ছিল রুশ ভাষা, যে-ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার খোঁজ-খবর সে-যুগে বহির্বিশ্ব বিশেষ রাখতো না।

জীবনের শেষভাগে, কর্মজীবনের অবসানে আজীবন অবহেলিত, নম্র, লাজুক, জ্ঞানতপস্বী মানুষটি অবশ্য তাঁর প্রাপ্য সম্মানের কিছুটা পেয়েছিলেন। মৃত্যুর তিন বছর আগে, 1932 সালে, এঁর জীবনের 75 বছর পূর্তির দিনটি সোভিয়েত দেশে সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়।

জিওল্‌কভ্‌স্কি কি মহাকাশ জয়ের কোনো ব্যবহারিক প্রচেষ্টা করেছিলেন? তিনি না-করে থাকলে, সে-কৃতিত্ব কার?

না, জিওল্‌কভ্‌স্কি এক হিসেবে অবশ্যই নভশ্চরণবিদ্যার জনক, কিন্তু তাঁর নির্ভুল, অমূল্য গবেষণা ছিল প্রায় সর্বাংশে কাগজে-কলমে।

ব্যবহারিক দিক থেকে যিনি রকেটকে নবজীবন দান করেন—অর্থাৎ নব উদ্দেশ্যে, নব প্রয়োজনে রকেট ব্যবহারের সূত্রপাত করেন—তিনি হচ্ছেন একজন মার্কিন বিজ্ঞানী, নাম রবার্ট হাচিংস গডার্ড (Robert Hutchings Goddard)। এঁর জন্ম 1882 সালে, মৃত্যু 1945।

গডার্ড ছিলেন ম্যাসাচুসেট্‌স-এর ক্লার্ক (Clark) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। রকেট সম্পর্কে ফলিত গবেষণার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ এঁর 1914 সাল থেকে, কিন্তু তখন প্রথম মহাযুদ্ধজনিত নানা বাধা-অসুবিধেয় বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি। যুদ্ধশেষে সুযোগ্য সহকারী হিক্‌ম্যান (Hickman)-এর সহায়তায় পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেন। এই সময়ে, 1919 সালে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অনেক উচ্চতায় উপনীত হওয়ার উপায় সম্পর্কে ইনি একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন; পুস্তিকায় তিনি রকেট সম্পর্কেই সোৎসাহে আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মতপ্রকাশ করেন যে, রকেটের পক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণও অসম্ভব নয়। গডার্ড অবশ্য চাঁদে মানুষ পাঠানোর কথা উত্থাপন করেন নি, শুধু প্রসঙ্গত বলেছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী কোনো বিস্ফোরক পাঠাবার কথা—যার প্রচণ্ড

বিস্ফোরণ দূরবিন দিয়ে পৃথিবী থেকে হয়তো দেখা সম্ভব হতে পারে। গডার্ড বর্ণিত এই গৌণ সম্ভাবনাটি তখন

শুধু তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা বা গাণিতিক হিসেব-নিকাশ নয়—মহাকাশ জয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন কোন বিজ্ঞানী? কোথায়? কবে?

জনমানসে বেশ কিছুটা রেখাপাত করে—পত্র-পত্রিকায় এ-নিয়ে সোৎসাহ সকৌতুক কিছু আলোচনা হয়। গডার্ড কিন্তু এ-প্রতিক্রিয়ায় মোটেই খুশি হননি। প্রসঙ্গচ্যুতভাবে, প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ মূল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারাকে উপেক্ষা করে, শুধু চন্দ্রাভিযানকে গ্রহণ করাটা তাঁর মনোবেদনারই কারণ হয়েছিল। অতঃপর প্রায় দুই দশক ধরে তিনি এ-বিষয়ে যে-মূল্যবান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তা যথাসম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখারই চেষ্টা করেন। এমন-কী,



জনসাধারণের অবাঞ্ছিত কৌতূহল ও প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে, তাঁর গবেষণাক্ষেত্রকে আমেরিকার জনবিরল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। সুখের কথা, আমেরিকার সুবিখ্যাত বিদ্বৎসভা 'স্মিথ্‌সোনিয়ান ইন্‌স্টিটিউট'-এর অর্থানুকূল্য তাঁর পিছনে ছিল। আর ছিল স্বীয় অদম্য উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস।

রকেটের ইতিহাসে কতকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক সাফল্য প্রথম অর্জন করেন গডার্ড। 1926 সালে তিনিই প্রথম 'তরল সঞ্চালক-ব্যবহারকারী রকেট' (Liquid Propellent Rocket) উৎক্ষেপণ করেন। প্রথম দিকে এ-রকেটের গতিবেগ বা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সর্বাধিক উচ্চতা অবশ্য বেশি ছিল না; কিন্তু বারংবার পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমেই তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর সাফল্য লাভ করতে থাকেন। 1935 সালে তিনি ঘণ্টায় প্রায় 1200 কিলোমিটার (বা প্রায় 750 মাইল) বেগে—অর্থাৎ শব্দের চেয়ে দ্রুততর বেগে এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 2.28 কিলোমিটার (বা প্রায় 1.42 মাইল) উচ্চতায় রকেট পাঠাতে সক্ষম হন। গডার্ডের এইসব কৃতিত্বের কথা অবশ্য তখন অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী বা সহকারীর বাইরে কারোরই মনোযোগ পায়নি।

গডার্ড সম্পর্কে আর একটি কথা অবশ্য উল্লেখ্য। সেটি এই যে, যদিও ইতিহাসের বিচারে জিওল্‌কভ্‌স্কি ছিলেন গডার্ডের পূর্ববর্তী, গডার্ড কিন্তু কোনো অংশেই তাঁর কাছে ঋণী ছিলেন না। গডার্ড যা যা করেছেন—গাণিতিক হিসেবপত্র, নক্সা-প্রণয়ন ইত্যাদি আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো বটেই—তা সবই করেছেন নিজের চেষ্টায়। জিওলকভ্‌স্কির কাজের কথা গডার্ডের কিছুমাত্র জানা ছিল না।

জিওলকভ্‌স্কি, গডার্ড প্রভৃতি শুধু যে মহাকাশ জয়ের সঠিক পথ-নির্দেশ করেছিলেন তা-ই নয়, সে-পথ কিছুটা সুগমও করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বাস্তবে মহাকাশ জয় 1957 পর্যন্ত বিলম্বিত হল কেন?

কারণ প্রধানত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক। দুই মহাযুদ্ধ ও তাদের মধ্যবর্তী কালে—অর্থাৎ 1914-1918-এর প্রথম মহাযুদ্ধ, 1939-1945-এর দ্বিতীয় এবং তাদের অন্তর্বর্তী কালে—ইওরোপে এবং তার ফলে প্রকারান্তরে সারা পৃথিবীতেই বিজ্ঞানানুশীলনের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া ছিল না—বিশেষত যে-অনুশীলন

ব্যয়সাপেক্ষ এবং ব্যাপক উদ্যোগসাপেক্ষ। ব্যতিক্রম ছিল প্রধানত এক ধরনের বিজ্ঞানচর্চা যা নাকি যুদ্ধে কাজে লাগতে পারে। ঘটনাক্রমে, রকেটচর্চা যে এই ধরনের উদ্যমের মধ্যে পড়ে এই কথাটা নাৎসি জার্মানির রাষ্ট্রনায়করা খুব ভালভাবে বুঝতে পারেন এবং তাঁদের ব্যবস্থাপনায় জার্মানির পেনেম্যুণ্ডে (Peenemuende) নামক স্থানে, 1937 সালে, গোপনে রকেট-চর্চার সর্বনাশা এক ধারার জন্ম হয়—বা, (যেহেতু রকেট-ইতিহাসের শুরুতে এমন এক ধারাই ছিল, অতএব) বলা যায় পুনর্জন্ম হয়। জার্মানিতে A-4 এবং অন্যান্য দেশে V-2 নামে কুখ্যাত ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র এই অধোগামী রকেট-চর্চার ফল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে, 1942-1945 সালে, V-2 মিত্রপক্ষের—বিশেষ করে, ইংরেজদের—নিদারুণ বিভীষিকার কারণ হয়ে উঠেছিল। এই রকেট এমন শক্তিশালী ছিল যে, ঊর্ধ্বমুখে পাঠালে এদের পক্ষে 150 কিলোমিটারেরও বেশি (বা প্রায় 100 মাইল পর্যন্ত) ওঠা অসম্ভব হত না। কিন্তু কার্যত এদের ক্ষেপণ করা হত প্রতিবেশী বিপক্ষ রাজ্যগুলোর দিকে। মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে এই রকেটাস্ত্রগুলো প্রায় 320 কিলোমিটার (বা প্রায় 200 মাইল) দূরে এক টন বিস্ফোরক নিক্ষেপ করতে পারতো; আক্রান্ত রাজ্যগুলো সতর্কতামূলক কোনো ব্যবস্থাই প্রায় নিয়ে উঠতে পারত না।

ধ্বংসোপকরণ হিসেবে নির্মিত হলেও V-2 রকেটই কিন্তু ছিল আধুনিক মহাকাশজয়ী রকেটের প্রত্যক্ষ ও অতিনিকট পূর্বপুরুষ। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধোত্তর মহাকাশমুখী রকেট-চর্চা অনেকাংশে এগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে—অন্তত্তপক্ষে অন্যতম সফল দেশ আমেরিকার ক্ষেত্রে এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত। যুদ্ধের শেষে মার্কিন সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জার্মান রকেট-ঘাঁটিটি দখল করে নেয় এবং অব্যবহৃত কিন্তু পূর্ণনির্মিত রকেটগুলো এবং তৎসহ সর্বপ্রধান রকেট নির্মাতা ফন ব্রাউন (Von Braun)-কে স্বদেশে রপ্তানি করে। অতঃপর এগুলোকে অবলম্বন করেই মার্কিন দেশে মহাকাশ বিজয়ের উদ্যম শুরু হয়।

প্রথমে অধিকৃত জার্মান V-2 এবং পরে ক্রমে ক্রমে তারই উন্নততর সংস্করণ এয়ারোবী (Aerobee), ভাইকিং (Viking) প্রভৃতি নিয়ে 'নিউ মেক্সিকো'-র 'হোয়াইট স্যাণ্ডস'-এ গবেষণা চলে। এ-গবেষণার এক বিশেষ মূল্যবান দিক ছিল গভীরভাবে 'বহুপর্যায়ী রকেট'-এর চর্চা। প্রাথমিক গবেষণা সম্পূর্ণ করে, প্রাসঙ্গিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তরোত্তর সন্তোষজনক ফললাভ করে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ 1955 সালের জুলাই মাসে তাঁদের সাধনা ও সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। ঘোষণা করেন 'ভ্যানগার্ড পরিকল্পনা' (Project Vanguard) অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে 'কৃত্রিম উপগ্রহ' সৃষ্টির কথা। 1957 সালের ডিসেম্বরে একটি দুঃখজনক ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, 1958-এর 31 জানুয়ারি তারিখে 'এক্সপ্লোরার-1' উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মার্কিন এ-ঘোষণা সার্থক হয়।

চঞ্চল, সুদূরের পিয়াসি রকেটের অবশ্য শৃঙ্খলমুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে তার কিছুদিন আগেই। 1957-এর 4 অক্টোবর তারিখে। ওই তারিখেই 'স্পুৎনিক-1'-বাহী রুশ রকেট ব্লীপ ব্লীপ কলধ্বনিতে মুক্তির স্বচ্ছন্দ ডানা মেলেছে সুদূর, বিপুল সুদূরে—বায়ুমণ্ডলের অতীতে, মহাকাশের শূন্যতায়।

পদার্থবিজ্ঞান



পদার্থ যে-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, তাই হল পদার্থবিজ্ঞান। সন্দেহ নেই আমাদের চারপাশের জগৎই পদার্থের জগৎ। এই জগতেই আমরা বাস করি, এই জগতেই আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যস্ততা-বিনোদন, এই জগতেই আমাদের নিত্যদিনের চলাফেরা। ফলে পদার্থের সঙ্গে আমাদের যে-সম্পর্ক তা আজকের কথা নয়। আমাদের অতিপ্রাচীন পূর্বপুরুষ, বিশিষ্ট দার্শনিকেরাও পদার্থের বিভিন্ন ধর্মের কথা ভেবেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃততর হয়েছে, ততই বিজ্ঞানের এই শাখাটি ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানে পদার্থ নিয়ে নিত্য-নূতন প্রশ্ন, সাড়া জাগানো কৌতূহল। আর এইভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের এক প্রধান শাখা পদার্থবিজ্ঞান। ইংরেজিতে এই শাখাটিকে আমরা বলি Physics।

ছাপাখানার ছাপার টাইপ এক বিশেষ ধাতু দিয়েই তৈরি হয় কেন?

কঠিন থেকে তরল অবস্থায় এলে অনেক পদার্থের আয়তন বাড়ে এবং তরল থেকে কঠিন অবস্থায় ফিরে গেলে আয়তন কমে। কিন্তু এর উলটো ব্যাপারও ঘটে। জল ও কিছু ধাতু তরল থেকে কঠিন হওয়ার বেলায় আয়তনে বাড়ে। এই বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ছাপার টাইপে এক ধরনের ধাতু (সীসে, অ্যান্টিমনি ও দস্তা) ব্যবহৃত হয়—যাতে তরল অবস্থায় ছাঁচে ঢেলে ছাঁচের সমস্ত পরিসরের নিখুঁত আকৃতি পাওয়া যায়। কারণ ছাঁচে ঢালা গরম ধাতু তরল অবস্থা থেকে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হবার সময়ে আয়তনে বাড়তে চাইবে। এর ফলে ছাঁচের ভেতরের সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খাঁজ প্রভৃতির জায়গা দখল করবে। তাই টাইপ ছাঁচের মতই হুবহু একরকম নিখুঁত হবে।

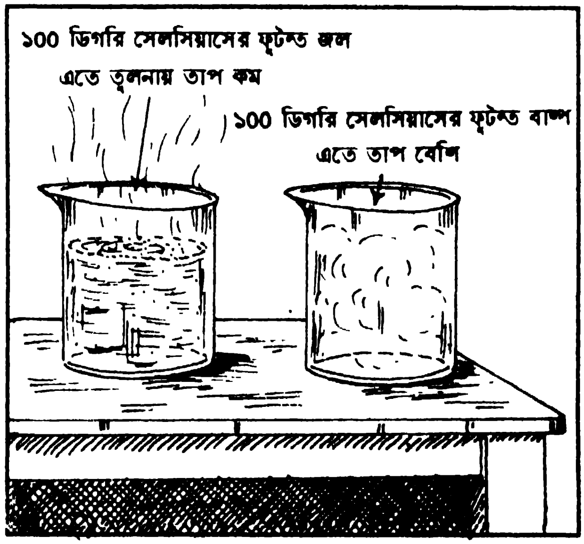
ফুটন্ত জলের চেয়ে 100 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বাষ্পে পুড়ে গেলে যন্ত্রণা বেশি হয় কেন?

বাইরে থেকে তাপ দিয়ে যখন গরম করা হয়, তখন জলের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রমাণ চাপে জল 100 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটে। মজার কথা হল, এই তাপমাত্রায় ফুটন্ত জলে তাপের জোগান অব্যাহত রাখলেও জলের তাপমাত্রা আর বাড়তে পারে না। এই বাড়তি তাপ তখন কোথায় যায়?

লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে, সমস্ত ফুটন্ত জলটা যখন 100 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে

'লীন তাপ' কি থার্মোমিটারে ধরা পড়ে?

তখন তার তাপমাত্রা আবার ধীরে ধীরে বাড়বে। অর্থাৎ ফুটন্ত জল বাষ্পের রূপ না নেওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা 100 ডিগরিতেই স্থির থাকে—বাইরে থেকে তাপের সরবরাহ একই রকম থাকলেও। এ থেকে বোঝা যায়, বাড়তি তাপটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো কাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ তরল অবস্থায় জলের অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন থাকে। কিন্তু বাষ্প অবস্থায় থাকে না। 100 ডিগরিতে ফুটন্ত জলে যে-তাপ দেওয়া হয়, সেই তাপ জলের অণুগুলোর পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন করতে কাজে লাগে। আর এর ফলে জল বাষ্পের আকার নেয়। 1 গ্রাম জলকে 100 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্প করতে গেলে 537 ক্যালরি তাপ লাগে। ক্যালরি হল তাপের একক। জল বাষ্প হতে গেলে যে-তাপ শোষণ করে, তাকে 'লীন তাপ' বা লুকিয়ে থাকা তাপ বলে। কারণ থার্মোমিটার দিয়ে একে ধরা যায় না। অপেক্ষাকৃত শীতল দেহের কোনো অংশ বাষ্প বা স্টিমের সংস্পর্শে এলে স্টিম প্রথমে 100 ডিগরি সেলসিয়াস



তাপমাত্রার জল হতে চাইবে। এ-জন্যে সে তার মধ্যে ধরে রাখা লীন তাপ ছেড়ে দেবে। 100 ডিগরি তাপমাত্রার জল হওয়ার পর সেই জল আরো তাপ ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হতে চাইবে। অর্থাৎ মোট ছেড়ে দেওয়া তাপের পরিমাণ আরো বাড়বে। কিন্তু 100 ডিগরির ফুটন্ত জল দেহে পড়লে শুধু দেহের তাপমাত্রা অনুযায়ী জল ঠাণ্ডা হতে চাইবে এবং সেই অনুযায়ী তাপ ছাড়বে। এ-ক্ষেত্রে বাড়তি লীন তাপের কোনো ব্যাপারই থাকবে না। তাই স্টিমে পুড়ে গেলে দেহ অনেক বেশি তাপ পায়। ফলে ফুটন্ত জলের চেয়ে স্টিমে পুড়ে যাওয়াটা আরো বেশি মারাত্মক।

টি-পটে একটা ছোট ফুটো থাকে কেন?

টি-পট বা চায়ের পাত্রের গরম জলে চা দেওয়ার পরে

ঢাকনা লাগালে গরম জল থেকে বাইরে কিছু তাপ বর্জিত হবে। এতে পাত্রের ভেতরের জমা বাষ্প ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে তরল হয়ে যাবে। বাষ্প তরল হওয়ায় ওই জায়গায় শূন্যস্থান তৈরি হবে। এর ফলে পাত্রের ভেতরের চাপ কমে যাবে এবং ঢাকনির ওপরে বাইরের বায়ুর চাপ ঢাকনিকে নীচের দিকে ঠেলে রাখবে। ভেতরে চাপ কম থাকায় বায়ুনিরুদ্ধ অবস্থায় ঢাকনিকে খুলতে অনেক জোর লাগবে, ঢাকনির ওপরে ফুটো থাকলে বাইরের বায়ুর চাপ ও পাত্রের ভেতরের চাপে কোনো তারতম্য হওয়া সম্ভব নয়. কারণ ফুটো দিয়ে বাইরের বাতাস স্বচ্ছন্দে পাত্রের মধ্যে যাতায়াত করবে। সেইজন্যে এর ঢাকনি খুলতে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হবে না।

পাহাড়ে জমা হিমবাহ নীচের দিক থেকে গলতে দেখা যায় কেন? কী ভাবে তা নীচে নেমে আসে?

জলের অনেক ধর্মই কিন্তু জলের মত স্বচ্ছ নয়। বেশ কিছু ভৌত ধর্ম এমনই উলটো-পালটা যে, জলের প্রকৃতি বুঝতে গেলে অনেক জায়গাতেই হোঁচট খেতে হয়। বেশির ভাগ পদার্থের বেলায় চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক বাড়ে আর

হিমবাহ না গললে কি হত?

চাপ কমালে গলনাঙ্ক কমে। গলনাঙ্ক মানে, যে উষ্ণতায় স্বাভাবিক বায়ুর চাপে বস্তু কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরিত হয়। জল কিন্তু এর ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক চাপে বরফ গলে ০ ডিগরি সেলসিয়াসে কিন্তু চাপ বাড়ালে বরফ আরো কম তাপমাত্রায় গলে যায়। আর এই ব্যতিক্রম আছে বলে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যে, তার এদিক-ওদিক হলে আমাদের রোজকার জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। পাহাড়ের ওপর বরফ জমে ক্রমশ পরিমাণ বাড়তে থাকে। ফলে জমা বরফের তলার দিকে চাপ ক্রমশ বাড়ে। সবচেয়ে নীচের স্তরের বরফের ওপর চাপ খুব বেশি হলে বরফের গলনাঙ্ক কমে যায়। এর ফলে নীচের বরফ গলে গিয়ে একটা জলের পাতলা স্তরের সৃষ্টি হয়। এই স্তরের ওপর দিয়ে পিছলে ওপরের বরফ পাহাড়ের ঢাল অনুযায়ী নীচে নেমে আসে। এর নামই হিমবাহ। উলটো ব্যাপারটা ঘটলে, অর্থাৎ বরফের স্তূপ নীচের দিক থেকে না গললে (চাপের জন্য গলনাঙ্ক কমে না গিয়ে বেড়ে গেলে) হিমবাহ নামতে পারতো না। এতে সমতলভূমির জলাশয়গুলোতে জল কমে যেত ও আনুষঙ্গিক



দুর্যোগ দেখা দিত। তা ছাড়া জমতে জমতে এক সময় বিরাট বিরাট বরফস্তূপ নিজেদের ভারে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতো এবং এক প্রলয়ের সৃষ্টি হত।

রঙিন কাচ গুঁড়ো করলে সাদা হয়ে যায় কেন?

রঙিন কাচ রঙিন দেখানোর কারণ হল, সাদা আলো এর ওপরে পড়লে কাচ নিজের বিশেষ রঙটি ছাড়া বাকি ক'টি রঙ শুষে নেয়। কাচকে গুঁড়ো বা খুব ছোট ছোট টুকরো ক'রে ফেললে টুকরোগুলোর ওপরে আলো পড়ে এলোমেলো ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়।

গোটা অবস্থায় কাচের মসৃণ তল থেকে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন হয়। কিন্তু গুঁড়ো অবস্থায় প্রতিফলন হয় অনিয়মিত। অনিয়মিত প্রতিফলনে শোষণ ক্ষমতা কমে যায়।

রঙিন কাচগুঁড়ো ভেজালে কি রঙিন হয়ে ওঠে?

এর ফলে গুঁড়ো রঙিন কাচ সব ক'টি রঙকেই ছেড়ে দেয় এবং তাকে সাদা দেখায়। কিন্তু এই কাচগুঁড়োকে জলে

ভিজিয়ে দিলে প্রতিফলন আবার নিয়মিত হয়ে যায় এবং সে তার শোষণ ক্ষমতা ফিরে পায়। [দ্রষ্টব্যঃ ভিজে অবস্থায় রঙিন জিনিসের রঙ শুকনো অবস্থার রঙের চেয়ে গাঢ় দেখায় কেন?] ফলে ভিজে কাচগুঁড়ো আবার রঙিন হয়ে ওঠে।

উড়োজাহাজে ওঠার সময়ে ফাউন্টেন পেন কালি না ভরে খালি অবস্থায় নিতে হয় কেন?

আমাদের পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে বায়ুমণ্ডল রয়েছে। এই বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর একেবারে নীচের তলে বা সমুদ্রতলে সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর ভূমিতল থেকে যত উঁচুতে ওঠা যায়, এই চাপের মান ততই কমতে থাকবে। কারণ বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ও ঘনত্ব ক্রমশ কমে যেতে থাকে। ফাউন্টেন পেনে কালি ভরলে কালি ভরা জায়গা ছাড়াও কিছু পরিমাণ বায়ু তার ভেতরে থেকে যায়। উড়োজাহাজ বেশি উচ্চতায় উড়ে গেলে পেনের বাইরের বায়ুর চাপ কমে যাবে। কিন্তু ভেতরে আবদ্ধ বায়ুর চাপ বেশি থাকায় সেই বায়ু পেনের কালিকে জোর ক'রে বাইরে ঠেলে বের ক'রে দিতে চাইবে। এতে পরিধানের জামা-কাপড় নষ্ট হতে পারে। এই কারণেই কালি-ভরা পেন নিয়ে উড়োজাহাজে ওঠা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। উড়োজাহাজের ভেতরে ভূ-পৃষ্ঠের স্বাভাবিক বায়ু-চাপ বজায় রাখার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু নিম্ন-বায়ুচাপ অঞ্চল দিয়ে বেশিক্ষণ চলার ফলে উড়োজাহাজের ভেতরে বায়ু-চাপ কিছুটা কমে যায়। ফলে কালি-দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

একই উচ্চতা থেকে প্যারাসুট ও একটা ঢিল পড়লে, প্যারাসুট অনেক ধীরে ধীরে নামে কেন?

প্যারাসুট ওজনে হালকা এবং তার আকৃতি অনেকটা গোলকের তলের মত।

খোলা অবস্থায় প্যারাসুট যখন বাতাসের ভেতর দিয়ে নামে তখন বাতাস প্যারাসুটকে বাধা দেয়। প্যারাসুটের বিশেষ আকৃতির জন্য তার ক্ষেত্রফল যথেষ্ট বেশি। এই কারণেই তার ওপরে বাতাসের বাধার পরিমাণও বেশি হয়। তাই প্যারাসুটের গতি অনেকটা কমে যায়।



কিন্তু প্যারাসুটের সমান ওজনের একটি ঢিল ওপর থেকে ফেললে অবস্থাটা কি হবে? ওজনের তুলনায় ঢিলের বাইরের তলের ক্ষেত্রফল অনেক কম। ফলে পতনের সময় অনেক কম পরিমাণ বাতাস তাকে বাধা দেবে। সেই কারণে

যদি বাতাস না থাকতো তাহলে একটা ফুটবল আর ইঁট কি একই গতিতে নেমে আসতো?

ঢিলের পতনের গতিবেগের তেমন একটা হেরফের হবে না। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুযায়ী যথেষ্ট বেশি গতিবেগ নিয়েই সেটা মাটিতে নেমে আসবে। কিন্তু বাতাসের বেশি বাধা পাওয়ায় প্যারাসুট দিব্যি ভাসতে ভাসতে নীচে নামবে।

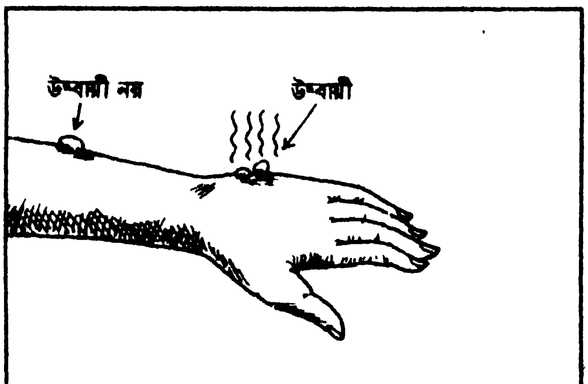
জ্বলন্ত কেরোসিনে জল ঢাললে সহজে আগুন নেভে না কেন?

ঘনত্বের বিচারে অর্থাৎ কার তুলনায় কে বেশি ভারি এই হিসেবে, জল কেরোসিনের তুলনায় ভারি। তাই কেরোসিন জলের ওপরে ভেসে থাকতে চায়। জল ঢাললে জ্বলন্ত কেরোসিন তৎক্ষণাৎ জলের ওপরে উঠে আসে এবং দহনের কাজ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। যদি কোনো ভাবে বায়ুর অক্সিজেনকে কেরোসিনের সংস্পর্শ থেকে

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায়, একমাত্র তবেই দহন বন্ধ করা যেতে পারে এবং তখন আগুনও নিভে যাবে।

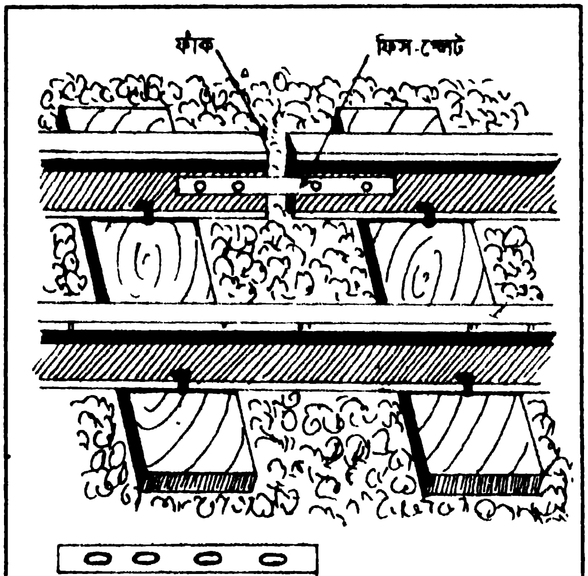
হাতের ওপর এক ফোঁটা ইথার পড়লে ঠাণ্ডা লাগে, কিন্তু গ্লিসারিনের ফোঁটা পড়লে তা মনে হয় না কেন?

কিছু কিছু তরল আছে, যা একটা পাত্রে খোলা অবস্থায় রেখে দিলে ক্রমশ উবে যায়—মানে বাষ্প হয়ে আস্তে আস্তে বাতাসে মিশে যায়। বাষ্প হতে গেলে যে-তাপ লাগে, সেটুকু সে চারপাশের বাতাস থেকে জোগাড় ক'রে নেয়। এই ধরনের তরলকে বলে উদ্বায়ী তরল। এক ফোঁটা ইথার হাতে পড়লে, ইথার খুব তাড়াতাড়ি হাত থেকে উত্তাপ নিয়ে নিজে তরল থেকে বাষ্প হয়ে যেতে পারে। কারণ ইথার খুব বেশি উদ্বায়ী। হাতের উত্তাপ তাড়াতাড়ি ইথারে চলে যাওয়াতে হাতে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি হয়। কিন্তু গ্লিসারিন খুব বেশি উদ্বায়ী নয়। যদি তরল থেকে বাষ্প হতে হয়, তবে গ্লিসারিনের জন্য অনেক বেশি তাপ প্রয়োজন। সেই তাপ সঞ্চয় করতে তার অনেক সময় লাগবে। ফলে ইথারের মত গ্লিসারিন হাতে ঠাণ্ডার অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে না।



রেল লাইনে ফাঁক থাকে অথচ ট্রাম লাইনে ফাঁক রাখা হয় না কেন?

তাপে কঠিন পদার্থ প্রসারিত হয় আর ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয়। লম্বা লম্বা আড়াআড়ি কাঠের (যাকে স্লিপার বলা হয়) ওপরে বসানো রেল লাইনের রেলগুলো দিনের উষ্ণতায় ও ট্রেনের চাকার ঘর্ষণে প্রসারিত হয়। আবার রাতের ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয়। এ-ছাড়া সারা বছরের বিভিন্ন সময়ের উষ্ণতা পার্থক্যও রেল লাইনকে প্রসারিত বা সংকুচিত করতে পারে। প্রসারণে যাতে রেলগুলো বেড়ে গিয়ে লাইন এঁকে-বেঁকে না যায়, তার জন্যে টুকরো টুকরো রেল জুড়ে লম্বা লাইন তৈরি করা হয় এবং প্রত্যেকটি জোড়ার মাঝে একটু ফাঁক রেখে দেওয়া হয়। রেলের জোড়ের ফাঁকগুলো ইস্পাতের পাত বা ফিসপ্লেট দিয়ে নাট-বল্টু এঁটে আটকানো



ফিস-প্লেটে বল্টু যাবার লম্বাটে গর্ত

হয়। আবার নাট-বল্টুগুলো রেলের যে-ফুটোর ভেতর দিয়ে আটকানো হয়, তাদের চেহারা ঠিক গোল না ক'রে ডিমের মত করা হয়—যাতে রেল প্রসারিত হলেও ফুটোর ভেতরে বল্টুর এপাশ-ওপাশ করার জায়গা থাকে। এ-সমস্তই করা হয় যাতে ট্রেন লাইনের ওপর দিয়ে যাবার সময় প্রসারণে বা সংকোচনে লাইন অবাঞ্ছিত ভাবে এঁকে-বেঁকে যাওয়ার জন্যে দুর্ঘটনা না ঘটে।

রেল লাইনে ফাঁক রাখা হলেও ট্রাম লাইনে কিন্তু ফাঁক রাখার দরকার হয় না। কারণ ট্রাম লাইন মাটির মধ্যে পোঁতা থাকে ও পোঁতার সময়ে বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে আশপাশের গর্তকে বুজিয়ে রাখা হয়। এর ফলে ট্রাম

লাইন উত্তপ্ত হলেও উত্তাপকে পাথর মারফত মাটির ভেতর সহজে সঞ্চালন ক'রে দিতে পারে। ফলে লাইন বেঁকে যাওয়ার ভয় থাকে না। কিন্তু রেলের লাইন কাঠের ওপরে থাকে বলে তাপ সঞ্চালনের মাধ্যম পায় না।

শীতকালে ঠোঁট ফাটলে গ্লিসারিন ব্যবহার করা হয় কেন?

শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায় বলে বাতাস শুকনো থাকে। আমাদের শরীরের অনাবৃত অংশ থেকে সব সময়েই কিছু জল বেরিয়ে যেতে চায়। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে, শরীর থেকে যে-হারে জল বেরিয়ে যেতে চায়, বাতাস শুকনো থাকলে এই হার অনেক বেড়ে যায়। তাই ঠোঁট বা চামড়ার ছিদ্র দিয়ে বেশি

বাতাস শুকনো থাকলে শরীর থেকে কি জল বেরোয় বেশি?

হারে জল বেরিয়ে যাওয়ায় শীতকালের শুকনো বাতাসে ঠোঁট ফেটে যায়। গ্লিসারিনের জল শোষণ করার ক্ষমতা আছে। ঠোঁটে গ্লিসারিন লাগালে বাতাসে যা সামান্য জলীয় বাষ্প থাকে গ্লিসারিন তা শুষে নিয়ে ঠোঁটকে জল জোগায় এবং শুকনো বাতাসের সংস্পর্শ থেকে দেহকে আড়াল করে। এতে ঠোঁট বা গায়ের চামড়া ফাটার হাত থেকে রক্ষা পায়। গ্লিসারিন ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি ক্রিম আছে, যেগুলো ঠোঁটে মাখলে ঠোঁট ফাটে না। এর কারণ এই ক্রিমগুলি সাধারণত তৈলাক্ত হয়, ফলে সহজেই শুকনো বাতাস থেকে ঠোঁটকে আড়াল করতে পারে।

পালিশ করা জুতো চকচকে দেখায় কেন?

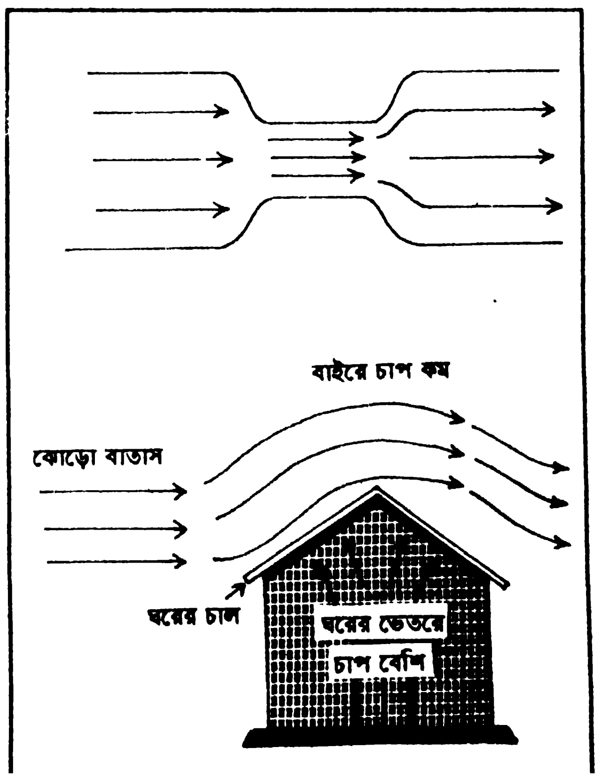
আলো একটা মাধ্যম দিয়ে যেতে যেতে যদি কোনো জিনিসে পড়ে আবার সেই মাধ্যমেই একটা নির্দিষ্ট দিকে ফিরে আসে, তবে আমরা তাকে বলি প্রতিফলন। কিন্তু আলো বস্তুর ওপর পড়ে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়লে প্রতিফলনটা নিয়মিত না হয়ে বিক্ষিপ্ত বা অনিয়মিত হয়। এর ফলে যার ওপর থেকে আলো আসছে সেটা ঠিক উজ্জ্বল দেখায় না। কিন্তু আয়নায় আলো পড়ে যখন প্রতিফলিত হয় তখন আয়না চকচক করে। কারণ আয়নার তল মসৃণ, আলো আয়নায় পড়ে নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয়। ব্যবহারের ফলে জুতোয় সাধারণত অনেক ভাঁজ পড়ে ও

নতুন জুতো চকচক করার কারণ কী?

জুতোর ওপরের তল অমসৃণ হয়ে ওঠে। অমসৃণ তলে আলো পড়ে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়। তাই জুতোর চামড়া উজ্জ্বলতা হারায়, কিন্তু সেই ব্যবহার করা জুতোয় কালি লাগানোর ফলে জুতোর চামড়ায় এবড়ো-খেবড়ো, অমসৃণ জায়গাগুলো অনেকটা ভরাট মসৃণ হয়ে ওঠে। ফলে তখন সেই জুতোয় আলো পড়ে নিয়মিত প্রতিফলন হয়। এই কারণেই পালিশ করা জুতো চকচক করে।

ঝড়ের দাপটে ঘরের চাল উড়ে যায় কেন?

এমন একটা নল নেওয়া যাক, যার মাঝখানটা একটু সরু। এই নলের ভেতর দিয়ে জল পাঠালে কী হবে? জল নলের মাঝখান দিয়ে যাবার সময়ে একটু বেশি গতিবেগে



যাবে, আর ওই জায়গায় নলের ওপর জল কম চাপ দেবে। এই সত্যটা বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী বারনৌলি আবিষ্কার করেছিলেন। এই তত্ত্ব থেকে এটা পরিষ্কার হল যে, যদি কোনো তরল বা গ্যাস (বাতাসও হতে পারে) প্রবাহিত অবস্থায় থাকে, তাহলে তার গতিবেগ বাড়লে চাপ কমবে এবং গতিবেগ কমলে চাপ বেড়ে যাবে। ঘরের চালের ওপর দিয়ে যখন প্রবল বেগে বাতাস বয়ে যায়, তখন বাতাসের গতিবেগ বেশি হওয়ায় ঘরের চালের ওপরের দিকে বাতাসের চাপ বেশ কমে যাবে। কিন্তু ঘরের ভেতরের চাপ তুলনামূলক ভাবে বেশি থাকায় ওই বেশি চাপ চালটা ঠেলে ওপরে তুলতে চাইবে। সুতরাং ঘরের ভেতর ও বাইরের চাপের তারতম্য খুব বেশি হলেই চাল উড়ে যাবে।

ঝড়ের সময়ে চাল দেওয়া ঘরের জানালা কি অল্প খুলে রাখা উচিত?

এই কারণে, খুব জোরে ঝড় বইলে ঘরের জানলা অল্প খুলে রেখে ভেতর ও বাইরের চাপের পার্থক্যকে কমিয়ে দিলে আর চাল উড়ে যাবার ভয় থাকবে না।

সিনেমা হলের দেওয়াল সাধারণ দেওয়ালের মত নয় কেন?

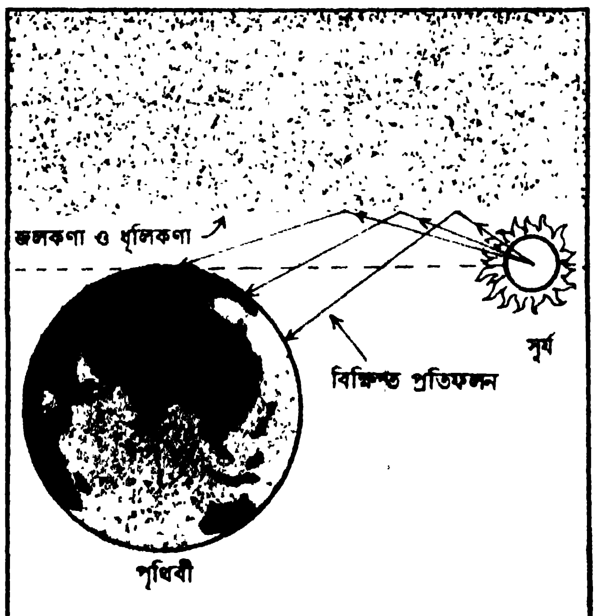
শব্দ মসৃণ তলে এসে পড়লে আলোর মতই প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত শব্দ অনেক সময়েই আমাদের অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিফলন যদি বারবার হয়, তাহলে অসুবিধেটা বাড়তে থাকে। কারণ বারবার প্রতিফলিত হলে যে কোনো শব্দের স্থায়িত্ব বেড়ে যায়, অর্থাৎ একই শব্দের রেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতার কানে বাজতে থাকে। ফলে পরের শব্দটি স্পষ্টভাবে শ্রোতার কানে পৌঁছোতে পারে না। এই অবাঞ্ছিত ঘটনাকে অনুরণন বলে। অনুরণনের জন্যে মূল শব্দ থেমে গেলেও তার রেশ দীর্ঘস্থায়ী ও অবোধ্য হয়। বন্ধ ঘরে বক্তৃতা দিলে এটা বেশ বোঝা যায়। মেঘের গুরু গুরু গর্জনও একটি শব্দেরই বারবার প্রতিফলনের রূপ। সিনেমা হলে যদি প্রতিফলনের মাত্রা কমানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে তবে শ্রোতাদের বেশ বিরক্তিকর অবস্থা হয়। প্রতিফলনকে বাঞ্ছিত সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ক'রে রাখতে সিনেমা হলের দেওয়ালগুলো বিশেষভাবে তৈরি করা হয়, অর্থাৎ মূল দেওয়ালের ওপরে

বন্ধ ঘরে বক্তৃতা দেবার সময়ে একই শব্দ বারবার ফিরে আসে কেন?

শব্দশোষক পদার্থের পুরু আস্তরণ থাকে। তার ওপরে সাধারণত প্লাস্টার অফ প্যারিস জাতীয় জিনিসের শৌখিন পাতলা আবরণ থাকে। তাতে শব্দশোষক পদার্থগুলো সরাসরি চোখে পড়ে না। কিন্তু তারা কাজ করে ঠিক মতই। শব্দশোষক পদার্থের জন্যই সিনেমা হলে প্রতিফলিত শব্দের রেশ কিছুটা দেওয়ালে (প্রতিফলকে) শোষণের পর ক্ষীণ হয়ে যায় ও মূল শব্দ শোনার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

গোধূলি কেন হয়?

সাধারণত দেখা যায়, সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও আকাশে একটা মোলায়েম আলো থাকে। এই আলোকিত অবস্থাকে আমরা গোধূলি বলি। আলো এক মাধ্যম থেকে আর এক



মাধ্যমে যাওয়ার সময়ে দুই মাধ্যমের ঠিক সংযোগ-তল

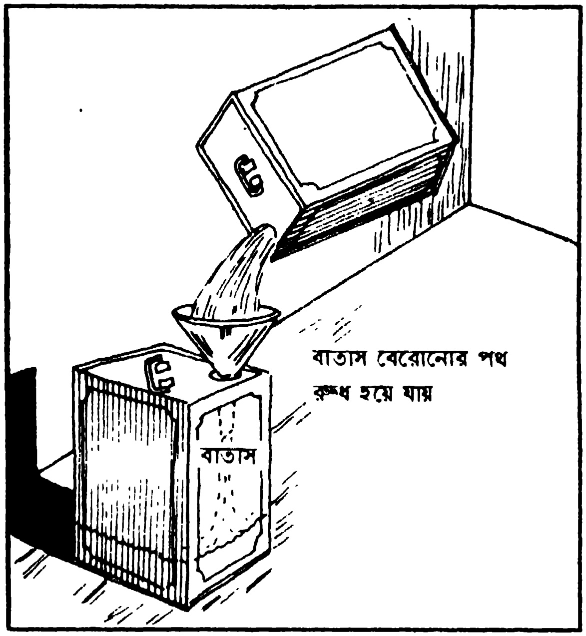
থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। যেমন, বাতাসের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পথে যদি আলোর রশ্মি কাচের ওপর পড়ে, তবে রশ্মির কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়ে আবার বায়ুতে ফিরে আসে। কাচের ওপরটা খুব মসৃণ বলে প্রতিফলিত আলো একটি নির্দিষ্ট দিক বরাবর ফিরে আসে। এই ঘটনাকে বলা হয় নিয়মিত প্রতিফলন। কিন্তু লেখার কাগজ, পর্দা, সিমেন্টের দেওয়াল, ইত্যাদিতে যখন আলো পড়ে, তখন আলোর প্রতিফলন নিয়মিত না হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে নানা দিকে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ প্রতিফলিত আলো নানা দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়।

সূর্য অস্ত যাওয়ার ঠিক পরে সূর্যের কিছু পরিমাণ আলো পৃথিবীতে সরাসরি না এসে তির্যকভাবে আসে। বাতাসে ভেসে বেড়ানো অজস্র ধুলোর কণা, আর কখনো কখনো সূক্ষ্ম জলকণা, সূর্যের সেই আলোকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিফলিত ক'রে পৃথিবী-পৃষ্ঠের দিকে পাঠায়। পৃথিবীতে বেশ কিছুটা আলো এসে পড়ে। তাই সূর্য অস্তাচলে গেলেও সম্পূর্ণ আঁধার না হয়ে 'গোধূলি' দেখা যায়।

ভোরে সূর্য ওঠার আগে যে 'উষাকাল' লক্ষ্য করা যায়, তারও কারণ এই একই।

খালি টিনে একটানা কেরোসিন ঢালতে গেলে উপচে পড়ে কেন?

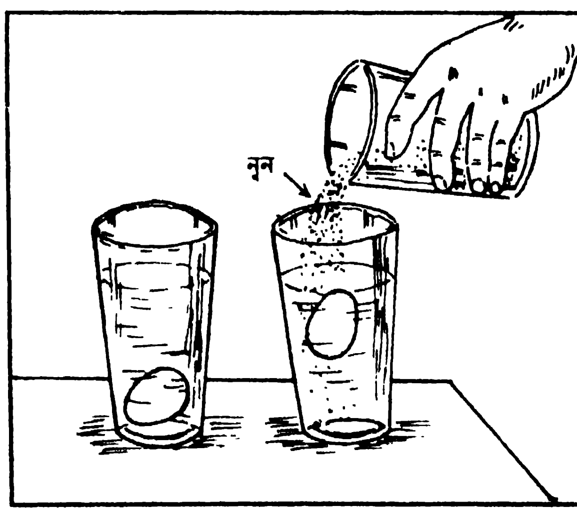
খালি টিন কি সত্যি সত্যি খালি? মোটেই নয়—'খালি' টিনের সবটাই বায়ুতে ভর্তি। সেইজন্যে খালি টিনে কেরোসিন ঢালতে গেলে টিনের ভেতরের বাতাসকে সরিয়ে কেরোসিনকে তার স্থান দখল করতে হবে। সুতরাং যে ছিদ্র দিয়ে কেরোসিন ঢালা হচ্ছে সেই ছিদ্র দিয়েই ভেতরের বাতাসকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া দরকার। এটা সম্ভব হবে যদি কেরোসিন ঢালার হার বাতাস বেরিয়ে যাবার হারের চেয়ে কম হয়। অর্থাৎ যদি একটু থেমে থেমে কেরোসিন ঢালা যায় তবে বাতাস স্বচ্ছন্দে নিজের বেরোনোর পথ খুঁজে পাবে আর কেরোসিনও উপচে পড়বে না। তবে যদি কেরোসিন ঢালার ছিদ্র ছাড়া একটু দূরে আরো একটা ছিদ্র ক'রে দেওয়া যায়, তাহলে আর কোনো অসুবিধেই হবে না। কারণ কেরোসিন যে ছিদ্র দিয়ে ঢালা হচ্ছে, আবদ্ধ বায়ুকে সেই ছিদ্র দিয়ে বেরোতে হবে



না। সে বেরোবে দ্বিতীয় ছিদ্র দিয়ে। সুতরাং কেরোসিন ঢালার হার যাই হোক না কেন, সেটা আর উপচে পড়বে না।

ডিম জলে ডুবে যায়, কিন্তু নুন গোলা জলে ভেসে ওঠে কেন?

ডিম তার সমান আয়তন জলের চেয়ে ভারি। এ-জন্য জলে ডিম ভাসতে পারে না, ডুবে যায়। কিন্তু নুন গোলা



জলের ঘনত্ব সাধারণ জলের চেয়ে বেশি। নুন গোলা জলে

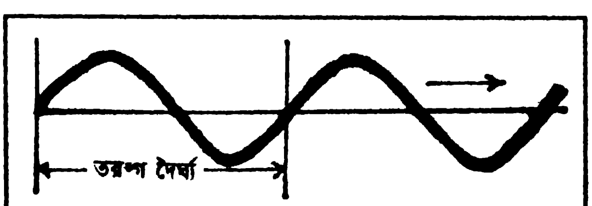
ডিম ফেললে, ডিম যেটুকু নোনা জল সরিয়ে জলে নিজের জায়গা ক'রে নেয়—সেই অপসারিত জলের ওজন ডিমের ওজনের চেয়ে বেশি হয়। তাই নোনা জলে ডিম ভেসে থাকতে পারে—ডুবে যায় না। কিন্তু নোনা জলের নুনের পরিমাণ (বা গাঢ়তা) যদি কমে গিয়ে এমন অবস্থা হয় যে, ডিমের আয়তনের নোনা জলের ওজন ডিমের চেয়ে কম, তাহলে ডিম সেই নোনা জলে ডুবে যাবে। ডিমকে ভাসিয়ে তুলতে গেলে পাত্রে আরো নুন ঢেলে নোনা জলে নুনের গাঢ়তা বাড়াতে হবে। এইভাবে নুন মেশাতে মেশাতে এক সময়ে দেখা যাবে, ডিম ভেসে উঠেছে।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চলার সময়ে মোটর গাড়িতে হলুদ হেড-লাইট জ্বালানো হয় কেন?

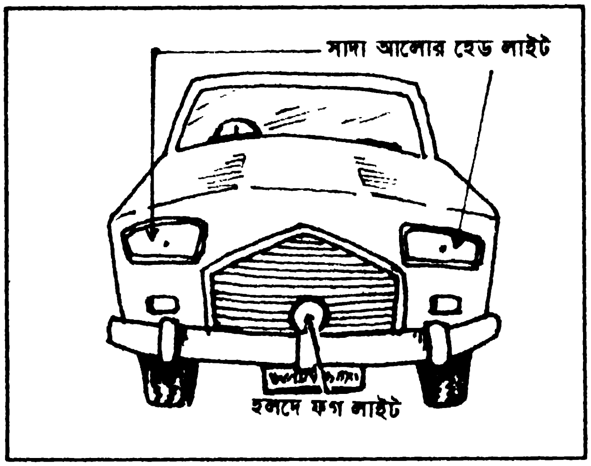
বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধুলো ও জলকণার ওপরে আলো পড়লে এরা আলো শোষণ ক'রে আবার ছড়িয়ে দেয়। এই ছড়িয়ে পড়াকে আলোর বিক্ষেপণ বলে। আলো যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় তখন ঢেউ বা তরঙ্গের আকারে যায়। এক এক রকম রঙের আলো এক এক রকম তরঙ্গ তৈরি করে। একটা তরঙ্গের খানিকটা ওপর দিকে উঁচুমত, আর অর্ধেকটা নীচু-মত। এই একটা উঁচু ও একটা নীচু-মত অংশ মিলে তরঙ্গের যতটা বিস্তার

কুয়াশার জন্যে মোটর গাড়িতে কমলা হেড-লাইট জ্বালানো হয় না কেন?

তাকে বলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। সাদা আলোয় যে-সাত রঙ আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রঙ হচ্ছে



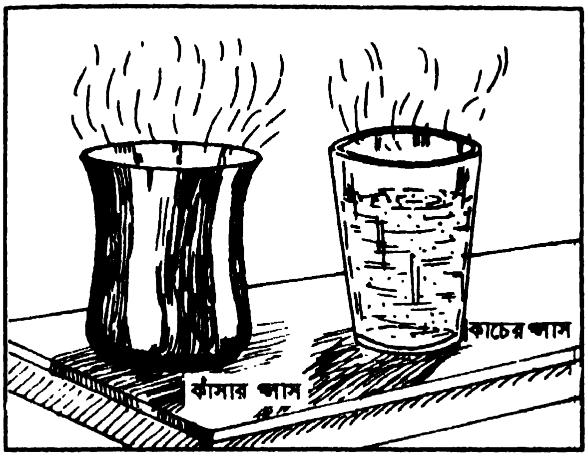
বেগুনি আর সবচেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রঙ লাল। হলুদ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এদের মাঝামাঝি। কুয়াশায় ভেসে থাকা অনেক ছোট ছোট কণা গাড়ির সাধারণ হেড লাইটের সাদা আলোর শক্তিকে শুষে নেয় ও নানাদিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়। ফলে সামনের রাস্তাকে ভালভাবে দেখার আলোয় ঘাটতি পড়ে। বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন, যে-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কম, সেই আলো তত বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে হেডলাইটের জন্য বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো বেছে নিতে পারলে কুয়াশায় ভাসমান কণার দ্বারা সেই আলো কম বিক্ষিপ্ত হবে। সাদা আলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রঙ লাল। আর তারপরেই কমলা ও হলুদ। কিন্তু হেড-লাইটের আলো লাল বা কমলা করলে আলোকিত জিনিসের রঙ স্বাভাবিক থাকবে না। ফলে চালকের যথেষ্ট



অসুবিধে হবে। সেই কারণেই তৃতীয় বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো হলুদকে বেছে নেওয়া হয় এই কাজের জন্য। হলুদ আলো কুয়াশার কণায় পড়ে পাশের দিকে কম বিক্ষিপ্ত হবে ও সামনে রাস্তা দেখার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক আলো পাওয়া যাবে। এই কারণেই কুয়াশায় হলুদ আলো ব্যবহার করা হয় এবং এই হলুদ হেড-লাইটের অপর নাম 'ফগ-লাইট'।

কাচের গ্লাসে গরম দুধ ঢাললে গ্লাস ধরা যায়, কিন্তু কাঁসার গ্লাস ভীষণ গরম হয়ে যায় কেন?

লোহার শিকের এক প্রান্ত উনুনের মধ্যে ঢোকালে হাতে ধ'রে থাকা অন্য প্রান্তটা যে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে, তা টের পেতে দেরি হয় না। কিন্তু একটা কাচের দণ্ডের



একটা প্রান্ত হাতে ধ'রে অন্য প্রান্তটাকে আগুনে রেখে তাপ দিয়ে লাল করলেও বিশেষ গরম লাগে না।

কেন এমন হয়?

এর কারণ, তাপকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সব জিনিসের সমান নয়। কিছু জিনিস আছে যারা গরম হলে সেই তাপকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারে—এদের বলে সুপরিবাহী। এই অর্থে ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, তামা, পেতল, লোহা ইত্যাদির পরিবহণ ক্ষমতা বেশি। তাই এদের বলে তাপ-সুপরিবাহী। আর যে-সব পদার্থ সহজে তাপ পরিবহণ করতে পারে না, তাদের বলা হয় তাপ-কুপরিবাহী—যেমন কাচ। কুপরিবাহী কাচের গ্লাসে ঢেলে নেওয়া গরম দুধ কাচের ভেতর দিয়ে আমাদের হাতে খুব কম তাপ পাঠাতে পারে। তাই হাতে তেমন গরম লাগে না। কিন্তু কাঁসার ধাতব গ্লাস গরম দুধের তাপকে খুব সহজেই পরিবহণ ক'রে আমাদের হাতে পাঠিয়ে দেয়। তাই গ্লাস হাতে ধরে রাখা রীতিমতো কষ্টকর।

বাড়ি, বাঁধ ইত্যাদি তৈরির কাজে কংক্রিট ঢালাইয়ে লোহা অথবা ইস্পাত ব্যবহার করা হয় কেন?

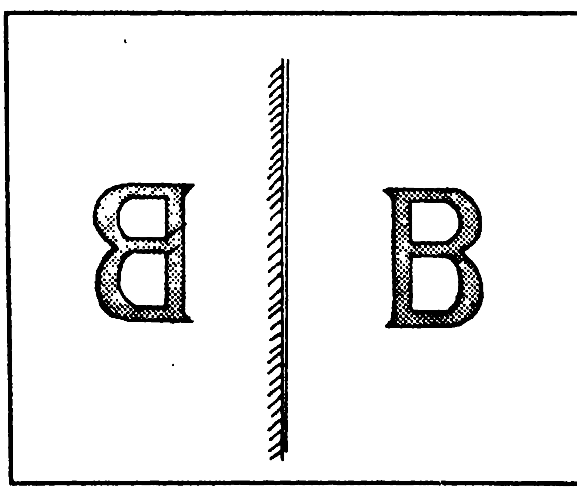
আমরা জানি, ঢালাইয়ের কাজে সাধারণত লোহা বা ইস্পাত ব্যবহার করা হয়। কংক্রিটের মিশ্রণের মধ্যে লোহার রড ইত্যাদি ঢুকিয়ে ঢালাই করলে ঢালাই মজবুত হয়। কিন্তু এটাই কি লোহা ব্যবহারের একমাত্র কারণ? অন্য কোনো ধাতু ব্যবহার করলে কি কোনো ক্ষতি হতে পারে?

কোনো বস্তুকে তাপ দিলে তার দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় আর ঠাণ্ডা করলে দৈর্ঘ্য কমে। এক ডিগরি উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যে-প্রসারণ হয় তাকে দৈর্ঘ্য-প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয়। একক দৈর্ঘ্যের কোনো বস্তুর তাপে কংক্রিটের (সিমেণ্ট, বালি আর পাথরকুচির মিশ্রণ) নিজের নির্দিষ্ট মানের প্রসারণ বা ঠাণ্ডায় সংকোচন হয়। লোহা বা ইস্পাতের প্রসারণ বা সংকোচন গুণাঙ্ক কংক্রিটের প্রসারণ বা সংকোচন গুণাঙ্কের কাছাকাছি (কংক্রিটের গুণাঙ্ক লোহার গুণাঙ্কের প্রায় 0.7 গুণ)। এর ফলে ঢালাইয়ে কংক্রিটের সঙ্গে সঙ্গে লোহা বা ইস্পাতের প্রসারণ কিংবা সংকোচনের তেমন অসমতা থাকে না—অর্থাৎ দু'টো জিনিস একই ভাবে বাড়ে বা কমে। এর ফলে ঢালাইয়ে ফাটল ধরার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু লোহার বদলে ঢালাইয়ে অন্য কোনো ধাতু ব্যবহার করলে তাপমাত্রার তারতম্য হলে ঢালাই ফেটে যাবে। এর কারণ কংক্রিট ও সেই ধাতুর গুণাঙ্কের যথেষ্ট পার্থক্য. যা লোহার ক্ষেত্রে অনেক কম।

আয়নাতে ডান হাত বাঁ হাত দেখায় কেন?

আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমাদের ডান হাতটা বাঁ হাত বলে মনে হয়। এটার কারণ কি?

এর উত্তর জানতে হলে আগে বুঝতে হবে, আমাদের চোখ কেমন ক'রে সব কিছু দেখে। যে-দিক দিয়ে কোনো আলোর রশ্মি চোখে এসে পড়ে আমরা সে-দিক বরাবর



তাকিয়ে আলোকিত জিনিসটিকে দেখি। যেমন, একটা মোমবাতি জ্বলছে। আমরা আয়না দিয়ে সেই মোমবাতিটি

দেখছি। মোমের আলো আয়নার ওপরে এসে পড়েছে। আয়নায় পড়ে সেই আলো যে-দিকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে, চোখ যদি সেই সরলরেখা বরাবর থাকে তবেই চোখের কাছে মনে হবে, মোমবাতিটি আয়নার ভেতর দিয়ে পিছনে কোথাও জ্বলছে। চোখ এখানে যা দেখে তাকে প্রতিবিম্ব বলে। প্রতিবিম্ব ঠিক আসল মোমবাতির অনুরূপ, শুধু তার অবস্থানের তফাত থাকে। সঠিক ভাবে মাপজোখ করতে পারলে দেখা যাবে, কোনো জিনিস আয়না থেকে সামনে যত দূরে থাকবে তার প্রতিবিম্ব আয়না থেকে ঠিক ততটাই পিছনে রইবে। আর এই শর্তটা পূরণ করতেই আমাদের ডান হাতটা প্রতিবিম্বে বাঁ হাত হয়ে যায়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক ইংরেজি অক্ষর B-কে আয়নার সামনে ধরা হল। অক্ষর 'B' মানে সঠিক ভাবে কতকগুলো বিন্দুকে সাজিয়ে এই B-এর আকৃতি। এখন প্রতিফলনে B অক্ষরের প্রত্যেকটা বিন্দু থেকেই আলো এসে আয়নায় পড়বে ও চোখে তার প্রতিবিম্ব ধরা দেবে। মনে রাখা দরকার, প্রতিবিম্ব আর বস্তুর দূরত্ব আয়না থেকে সমান হবে। তাহলে প্রতিবিম্বের আকৃতি কেমন আসবে? ছবিতে ব্যাপারটা দেখানো হল। আয়না থেকে প্রতিটি বিন্দুর দূরত্ব তার প্রতিবিম্ব-দূরত্বের সমান হবে। দূরত্ব সমান রাখতে প্রতিবিম্বের আকৃতিটা পাশের দিকে বদলে গিয়ে B থেকে উলটো B-এর চেহারা নেবে। ঠিক একই কারণে আমাদের ডান হাত এবং বাঁ হাত পাশের দিকে উলটে যায়। ফলে ডান হাতকে বাঁ হাত বলে মনে হয়। এই ঘটনাকে বলা হয় পার্শ্ব পরিবর্তন (Lateral inversion)।

কাপড়ের রঙ দিনের আলো আর কৃত্রিম আলোয় আলাদা আলাদা দেখায় কেন?

যে-সব জিনিসের মধ্যে দিয়ে আলো যেতে পারে না তাদের বলা হয় অস্বচ্ছ। অস্বচ্ছ পদার্থের রঙ নির্ভর করে মূলত দু'টো বিষয়ের ওপরে। একটা হল বাইরে থেকে আলো এসে পড়লে অস্বচ্ছ জিনিসটা কোন বিশেষ আলো ছেড়ে দেয় বা প্রতিফলিত করে। আর দ্বিতীয়টা হল, বাইরে থেকে তার ওপরে কোন রঙের আলো ফেলা হল তার ওপরে। সাদা আলোয় সাতটা রঙ থাকে। যদি দিনের আলোয় লাল ফুল দেখি, তবে ফুলকে লালই দেখায় কারণ সাদা রঙের লাল ছাড়া অন্য সব রঙকেই লাল ফুল শুষে নেয় এবং শুধুমাত্র লাল রঙকেই আমাদের চোখে পাঠায় বা প্রতিফলিত করে।

[দ্রষ্টব্য ঃ ভিজে অবস্থায় কোনো জিনিসের রঙ শুকনো অবস্থার রঙের চেয়ে গাঢ় দেখায় কেন?] কিন্তু নীল আলোয় দেখলে লাল ফুল কালো দেখাবে। কারণ যে-আলো দিয়ে ফুলটাকে আলোকিত করা হল তাতে লাল রঙ নেই।

নীল আলোয় লাল ফুল কালো দেখায় কেন?



ফলে কোনো রঙই সে ছেড়ে দেবে না, তাই ফুলটাকে কালো দেখাবে।

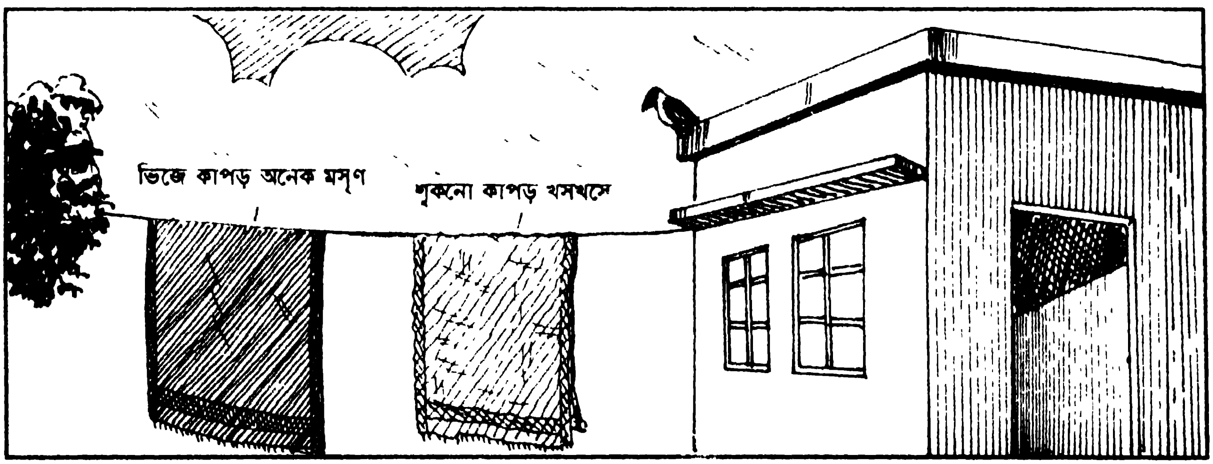
দিনের আলো এবং কৃত্রিম আলোয় যখন একই কাপড়ের রঙের তফাত লক্ষ্য করা হয়, তখন অনুমান করা যায়, দিনের আলো এবং কৃত্রিম আলো হুবহু এক নয়। আসল ঘটনাও তাই। দিনের আলোয় সাতটি রঙ আছে। কৃত্রিম আলোর ক্ষেত্রেও তাই—ওই একই সাতটি রঙ আছে তার মধ্যেও। কিন্তু রঙগুলোর ভাগের রকমফের আছে দু'টি আলোর মধ্যে। যেমন, দিনের আলোর তুলনায় টিউব লাইটের আলোয় লাল রঙের ভাগ কম, বেগুনির ভাগ বেশি। ফলে যে-কাপড়কে দিনের আলোয় বেগুনি-লাল দেখায়, টিউব লাইটের আলোয় তাকে প্রায় বেগুনি দেখাবে। সুতরাং দিনের আলো এবং কৃত্রিম আলোয় সব রঙিন কাপড়েরই রঙে সামান্য তফাত লক্ষ্য করা যাবে।

ভিজে অবস্থায় রঙিন জিনিসের রঙ, শুকনো অবস্থার রঙের চেয়ে গাঢ় দেখায় কেন?

সাদা আলোয় সাতটা রঙ থাকে। কোনো রঙিন জিনিসের ওপরে সাদা আলো পড়লে ওই জিনিস শুধু নিজের রঙটিকেই প্রতিফলিত করে বা বাইরে ছেড়ে দেয়, সাদা রঙের বাকি রঙগুলো শুষে নেয়। তাই কোনো জিনিস সাদা আলোয় কি রকম দেখাবে সেটা নির্ভর করে ওই বস্তু কোন কোন রঙ বাইরে ছেড়ে দেয় তার ওপরে। যেমন, লাল ফুল সাদা আলোয় লাল দেখায়। কারণ লাল ছাড়া অন্য সব রঙ সে শুষে নেয়। যদি কোনো জিনিসের ছেড়ে দেওয়া রঙ (অর্থাৎ সেই জিনিস থেকে প্রতিফলিত আলো) কতকগুলো নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট দিকে বাইরে বেরিয়ে আসে, তবে তাকে বলা হয় নিয়মিত প্রতিফলন। আর যদি নিয়ম না মেনে এলোমেলো ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা হবে বিক্ষিপ্ত বা অনিয়মিত প্রতিফলন।[দ্রষ্টব্য ঃ গোধূলি কেন হয়?]

রঙিন জিনিস ভেজা থাকলে তার ওপরে জলের একটা হাল্কা আস্তরণ পড়ে। ভিজে অবস্থায় জলের স্তর ও রঙিন জিনিসের তল একটা একক মসৃণ তলের মত আচরণ করে। তাই এ-ক্ষেত্রে আলো অপেক্ষাকৃত মসৃণ তলের ওপরে পড়ে এবং তার নিয়মিত প্রতিফলন হয়। কিন্তু শুকনো জিনিসের ক্ষেত্রে তলটা এবড়ো-খেবড়ো অমসৃণ থাকে বলে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়। নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কোনো জিনিসের রঙ যে-রকম দেখায়, অনিয়মিত প্রতিফলনে সেই রঙই কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। কারণ শুকনো অবস্থায় কোনো জিনিস থেকে যে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়, সেই বিক্ষিপ্ত প্রতিফলিত আলোই রঙিন জিনিসটির ছেড়ে দেওয়া আলোর সঙ্গে মিশে সেটার মূল রঙকে অনেকটা ম্লান ক'রে দেয়। কিন্তু জিনিসটি জলে ভেজা থাকলে প্রতিফলন হয় নিয়মিত। ফলে সে তার সঠিক রঙটিকেই প্রতিফলিত করে। অন্য কোনো বিক্ষিপ্ত আলো সেই রঙকে ম্লান করে না। এর ফলে রঙিন জিনিস নিজের রঙের

ভিজে কাপড়ের তল শুকনো কাপড়ের চেয়ে মসৃণ কেন?



গাঢ়তা যেন ফিরে পায়। সেই কারণেই কোনো রঙিন জিনিস ভিজে অবস্থায় গাঢ় দেখায়।

ছাতার আকার অনেকটা অর্ধ-গোলকের মত হয় কেন?

ধরা যাক, একটি নির্দিষ্ট মাপের রেখা নিয়ে তা দিয়ে ঘিরে বিভিন্ন আকারের কয়েকটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হল। তাহলে দেখা যাবে, সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট যে-ক্ষেত্র পাওয়া যাবে, তা একটি বৃত্ত। ঠিক একই ভাবে নির্দিষ্ট

> **নির্দিষ্ট মাপের ক্ষেত্রফলে সীমাবদ্ধ সবচেয়ে বেশি আয়তন কি গোলক?**

মাপের ক্ষেত্রফল দিয়ে সবচেয়ে বেশি যে-আয়তনকে সীমাবদ্ধ করা যায় তা হল গোলক। ছাতা তৈরির ব্যাপারে গোলকের এই ধর্মকেই কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাপের ছাতাব কাপড় দিয়ে সবচেয়ে বেশি আয়তন আচ্ছাদিত করতে গেলে সেই তলের চেহারা গোলকের বক্রতলের মত হওয়া উচিত। সেইজন্যই ছাতার আকার অনেকটা অর্ধ-গোলকের মত। নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী ছাতার কাপড় সবচেয়ে বেশি আয়তন আচ্ছাদিত করার ফলে আমাদের শরীর রোদ বা বৃষ্টির ছাটের হাত থেকে ভাল ভাবে রক্ষা পায়। ওই একই মাপের কাপড় দিয়ে যদি সমতল ছাদের মত ছাতা তৈরি করা হত তাহলে রোদ বা বৃষ্টির ছাটের হাত থেকে আগের মত ভালভাবে আমরা শরীর বাঁচাতে পারতাম না। তার জন্য অনেক বড় মাপের কাপড় নিয়ে অনেক বড় আকারের সমতল ছাতা তৈরি করতে হত। তা ছাড়া, ছাতা অর্ধ-গোলাকৃতি হওয়ার ফলে বৃষ্টির জল সহজে গড়িয়ে কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে।

এই কারণেই ছাতার চেহারা অর্ধ-গোলকের মত।

ট্রাফিক পুলিশের ছাতার রঙ সাদা কেন?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সাধারণত ট্রাফিক পুলিশের ছাতাটি কালো রঙের হয়, শুধু তার ওপরে আলাদা একটা সাদা কাপড় আঁটা থাকে।

কাজের প্রয়োজনে ট্রাফিক পুলিশের ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে না থাকলে চলে না। ফলে তাঁর ছাতার রঙ কালো হলে ছাতার ভেতর দিকে বিকিরিত তাপ তাঁকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলবে। কারণ আপেক্ষিক গতিবেগ না থাকায় বায়ুর পরিচলন স্রোত বিকিরিত তাপকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে না। সেইজন্যেই তাঁর কালো ছাতার ওপরে একটা সাদা কাপড় এঁটে রোদের তাপকে ওপরের তল থেকেই প্রতিফলিত ক'রে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া, সাদা ও কালো কাপড়ের মাঝে একটা সূক্ষ্ম বায়ুস্তর থাকে। এই বায়ুস্তর তাপের কুপরিবাহী। তাই রোদের তাপ কালো কাপড়ে পৌঁছোবার আগে একটা অতিরিক্ত বাধা



পাবে। ফলে ছাতা ব্যবহারকারী রৌদ্রতাপের হাত থেকে আরো সুরক্ষিত হবে।

এ-ছাড়া ছাতায় সাদা কাপড় দেবার ফলে ট্রাফিক পুলিশকে ভিড়ের মাঝে সহজে নজরে পড়ে—এ-ও সাদা ছাতা ব্যবহারের অন্যতম কারণ। আর সাদা কাপড় যদি

ময়লা হয়? তাহলে সাদা কাপড়টি খুলে নিয়ে সাবান জলে কেচে দিলেই হল। তারপরে কালো ছাতার ওপরে সেটা আবার লাগিয়ে দিলেই ধবধবে সাদা ছাতা দিব্যি ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।

ছাতার রঙ কালো কেন?

সূর্যের তাপ সরাসরি পৃথিবীতে এসে পড়ে। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যে-বিরাট দূরত্ব তার বেশির ভাগ স্থানেই কোনো জড় বস্তু নেই। তাই এক মস্ত শূন্যতার ভেতর দিয়ে যে-উপায়ে তাপ পৃথিবীতে এসে পড়ে তার নাম বিকিরণ। বিকীর্ণ তাপ কোনো বস্তুর ওপর পড়লে তার কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়, কিছুটা বস্তু শুষে নেয় আর বাকি যেটা রইলো, সেটা বস্তুর ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। কিছু কিছু বস্তু যেমন ভাল ক'রে তাপ শুষে নিতে পারে, তেমনি নিজেও আবার তাপ ছেড়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। কালো রঙের বস্তুর এই গুণ আছে। ছাতার কাপড়ে সূর্যের উত্তাপ এসে পড়লে প্রথমে কালো কাপড় তাকে ভাল ক'রে শুষে নিতে পারে, আর এই শুষে নেওয়া তাপকে আবার চারদিকে বিকিরণ ক'রে দিতে পারে।

খোলা অবস্থায় ছাতার কাপড় অনেকটা কোনো গোলকের বক্রতলের আকৃতি নেয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুযায়ী, এ-ধরনের বক্রতল থেকে তাপ ভেতরে ও বাইরে গোলকের ব্যাসার্ধ বরাবর বিকিরিত হয়। সেই কারণে গরম ছাতার ভেতর দিকে যে-তাপ বিকিরিত হবে, তা কেন্দ্রীভূত হবে মোটামুটিভাবে ছাতা ব্যবহারকারীর মাথা লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু সাধারণভাবে ছাতা মাথায় দিয়ে আমরা খুব

> **কালো রঙের বস্তু যেমন তাপ শুষে নেয়, তেমনি সে কি শুষে নেওয়া তাপকে আবার চারদিকে বিকিরণ করতে পারে?**

কম সময়েই রোদের তাপে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। ফলে ছাতা মাথায় যখন আমরা পথ চলি, তখন আশপাশের বায়ু আপেক্ষিক গতিবেগের জন্য একটা পরিচলন স্রোত তৈরি করে।

আপেক্ষিক গতিবেগ কাকে বলে? আপেক্ষিক কথাটার মধ্যেই তার আভাস আছে। আপেক্ষিক বললেই একের



সঙ্গে আর একটির তুলনার কথা এসে পড়ে। এমনিতে বাতাস বইছে, কিন্তু জোরে ছুটলে আগের তুলনায় বেশি হাওয়া গায়ে এসে লাগবে। মনে হবে, বাতাসও যেন জোরে বইছে। আপেক্ষিক গতিবেগের জন্যই এমনটা ঘটে। এখানে স্থির থাকার তুলনায় চলবার সময়ে বাতাসের যে-বেগটা, সেটাই আপেক্ষিক বেগ। এখন চলবার সময়ে বাতাসের আপেক্ষিক গতিবেগ যে-পরিচলন স্রোত তৈরি করে, তার ফলে ছাতার ভেতর দিকে বিকিরিত তাপ তেমন অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে না।

ছাতার কাপড় কালো না হয়ে যদি সাদা হত, তাহলে কী হত? সুবিধে হত, না অসুবিধে হত? একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, অসুবিধে হত। এটা ঠিক যে, কাপড়টা সাদা হলে সে তার ধর্ম অনুযায়ী সূর্য থেকে পাওয়া প্রায় সমস্ত তাপই শোষণ না ক'রে প্রতিফলিত ক'রে দিত। ফলে ছাতার ভেতর দিক লক্ষ্য ক'রে বিকিরিত তাপ ব্যবহারকারীকে অস্বস্তিতে ফেলতো না। সুতরাং এ-দিক থেকে বিচার করলে সাদা ছাতা কালো ছাতার চেয়ে ভাল। কিন্তু ছাতা সাদা হলে অন্য একটা বড় অসুবিধে আছে। আমরা সকলেই জানি, ছাতা সাবান দিয়ে কাচা সম্ভব নয়। ছাতার রঙ সাধারণত কালো হয় বলে কাচাকাচির কোনো সমস্যা থাকে না। কারণ কাপড়টা যে ময়লা হয়েছে তা বোঝাই যায় না। কিন্তু ছাতার

কাপড় সাদা হলে সামান্য ময়লা ধরলে তা দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়বে। আর যেহেতু ছাতা কাচা সম্ভব নয়, সেইজন্য কিছুদিন ব্যবহারের পর সেই সাদা ছাতা নিয়ে আমাদের রাস্তায় বেরোনোটাই মুশকিল হত। এই কারণেই ছাতার রঙ কালো।

জুতোর রবার সোলে বা গাড়ির চাকার গায়ে খাঁজকাটা থাকে কেন?

রাস্তায় হাঁটা-চলা বা গাড়ির চলাচলের সুবিধে-অসুবিধে নির্ভর করে রাস্তাটা কতটা শক্ত, মজবুত বা কতখানি নরম তার ওপরে। শক্ত রাস্তায় হাঁটতে গেলে বা গাড়ি চালাতে গেলে মানুষ বা গাড়ি রাস্তার ওপর ভালভাবে বলপ্রয়োগ করতে পারে—কিন্তু রাস্তা নরম হলে রাস্তার ওপরে সুষ্ঠু ভাবে বলপ্রয়োগ করা সম্ভব হবে না, যেমনটা হয় বালির ওপরে হাঁটতে গিয়ে। কারণ রাস্তার ওপর যে-বল আরোপ করা হয় সেই বলের বিপরীত প্রতিক্রিয়া-বলই আমাদের চলতে সাহায্য করে। প্রতিক্রিয়া যত ভালভাবে সৃষ্টি করা যাবে হাঁটা-চলাও তত সহজ হবে। অবশ্য হুমড়ি খেয়ে যাতে পড়ে যেতে না হয় তার জন্যে রাস্তার সঙ্গে পায়ের বা গাড়ির চাকার ঘর্ষণ-বলকেও হাজির থাকতে হবে। তাই

বালির ওপরে হাঁটা সহজ নয় কেন?

রাস্তায় হাঁটতে গেলে রাস্তাকে সঠিকভাবে পা দিয়ে ধরে রেখে বলপ্রয়োগ করতে না পারলে সমূহ বিপদ। পিছল কাদার পথে রাস্তাকে আঁকড়ে ধরার জন্যে পায়ের আঙুলগুলো কুঁকড়ে সাবধানে পা ফেলতে হয়। জুতোর তলা যদি চকচকে মসৃণ হত, তবে রাস্তার সঙ্গে ঘর্ষণ-বল কমে যেত, হাঁটতেও অসুবিধে হত—কারণ জুতো পিছলে যেতে চাইতো। তাই জুতোর রবার সোলে বা গাড়ির চাকায় খাঁজ কেটে রাস্তাকে ভালভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে এবং ঘর্ষণ-বল বাড়াতে সাহায্য করা হয়। মসৃণ সোলের কিছু জুতোও বাজারে দেখা যায়। তবে স্বভাবতই তাদের রাস্তা আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা কম এবং সেই জুতো পরে হাঁটাচলা করলে পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা বেশি।

কোথাও আগুন লাগলে আশপাশের বাতাসের বেগ বেড়ে যায় কেন?

আগুন লাগলে আগুনের তাপে বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে বাতাস গরম হয়ে ওঠে। গরম বায়ু ঠাণ্ডা বায়ুর চেয়ে হাল্কা

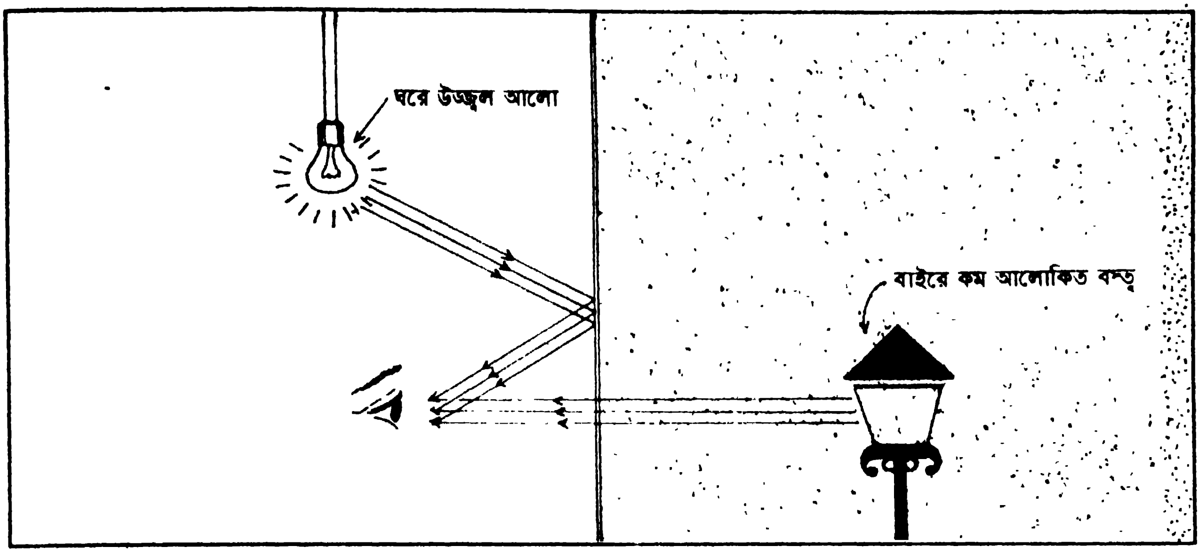


(অর্থাৎ ঘনত্ব কম) বলে ওপরে উঠে যায়। আগুন বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আরও গরম হয়, তার ঘনত্ব আরো কমে যায়। ফলে তার ওপরে ওঠার বেগ দ্রুততর হয়। যেখান থেকে গরম বায়ু ওপরে ওঠে সেই জায়গায় একটা আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতাকে পূর্ণ করার জন্যে আশপাশের বাতাস সেখানে দ্রুত ধেয়ে আসে। সেই কারণেই কোথাও আগুন লাগলে আশপাশের বাতাসের বেগ বেড়ে যায়। এতে আগুন আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কারণ ধেয়ে আসা নতুন ঠাণ্ডা বাতাস আগুনকে অক্সিজেনের জোগান দেয়।

রাত্রিবেলা অন্ধকার ঘরের কাচের জানালা দিয়ে বাইরের জিনিস ভালভাবে দেখা যায়, কিন্তু ঘরের ভেতর আলো জ্বালা থাকলে ভালভাবে দেখা যায় না কেন?

আমরা আলো দেখতে পাই না, কিন্তু কোনো আলোকিত জিনিস থেকে আলো আমাদের চোখে এসে পড়লে আমরা সেই জিনিসটি দেখতে পাই।

রাত্রিবেলা ঘরের বাইরের কোনো বস্তু থেকে আলো কাচের জানলার ভেতর দিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করে।



ঘরের ভেতরটা অন্ধকার থাকলে ওই আলো ঘরের ভেতরে কারোর চোখে এলেই জিনিসটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু যদি ঘরের ভেতর আলো জ্বালানো থাকে তবে ঘরের আলো কাচের জানালায় প্রতিফলিত হয়ে (অনেকটা আয়নার মত) চোখে এসে পড়ে। এই প্রতিফলিত আলো বাইরের বস্তুটির দৃশ্যতা (Visibility) কমিয়ে দেয়। ফলে বাইরের বস্তু থেকে আসা আলোর উপস্থিতি চোখ ঠিকমত বুঝতে পারে না। এ-জন্য বাইরের বস্তুটি অস্পষ্টই থেকে যায়।

রাতের ট্রেনে কাচের জানালার দিকে তাকালে এ-রকম ব্যাপার হামেশাই চোখে পড়ে।

ঘরের কোণে ধুলো জমে কেন?

অনেকদিনের অব্যবহৃত বন্ধ ঘরে ঢুকলে দেখা যায়, সারা মেঝেয়, আসবাব-পত্রে ও অন্যান্য জিনিসের ওপরে একটা ধুলোর আস্তরণ পড়ে আছে। কিন্তু যে-ঘরটা নিয়মিত ব্যবহার করা হয় ও জানালা-দরজা খোলা থাকে তার মেঝের কোণে ধুলো জমতে দেখা যায়।

এর কারণ কি?

বাইরে থেকে হাওয়ার মারফত জানালা-দরজা দিয়ে প্রচুর ধুলো আসে। এই ধুলোর কণাগুলোর আকৃতি নানা ধরনের। আকৃতি খুব ছোট হলে এরা ভেসে বেড়াতে পারে। বাতাসে এই ধরনের প্রচুর ধুলোকণা পাওয়া যায়, যারা অনবরত এলোমেলোভাবে না-ভাসা, না-ডোবা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এই ধরনের ছোট কণার চাঞ্চল্যকে আবিষ্কারক ব্রাউন-এর নাম অনুযায়ী ব্রাউনীয় সঞ্চারণ বলে। এর ফলে ধুলো কখনো ওঠে, কখনো নামে ও ঘোরে এবং নেহাতই সামঞ্জস্যহীন ভাবে ছুটে বেড়ায়। এর ওপরে ঘরের পাখার বাতাসের ঢেউ বা জানালা-দরজা দিয়ে আসা বাতাস এদের ওপর পড়লে এরা দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খায়। ঘরের কোণে যেখানে দুই দেওয়াল ও মেঝের সংযোগ—সেইখানে একবার গিয়ে পড়তে পারলে তবেই এদের নিস্তার। দেওয়ালে ধুলোকণাগুলো আছড়ে পড়লে এদের গতি কমে গিয়ে নিজেদের ওজন অনুযায়ী এরা নীচে পড়ে যাবে। আর যদি ঘরের কোণের দেওয়ালে এইভাবে গতিহীন কণা ক্রমাগত এসে জমা হয়, তবে বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরের কোণটা ধুলোয় ভরে উঠবে। এ-ছাড়া নিবিড় সংস্পর্শে ছোট কণার অণুদের মধ্যে একটা পারস্পরিক আকর্ষণ থাকে, যার ফলে তারা সকলেই এক সঙ্গে থাকতে চায়। এ-ও ধুলো জমার একটা কারণ।

রান্না করার সময়ে হাঁড়ির মুখে ঢাকা দেওয়া হয় কেন?

জল স্বাভাবিক অবস্থায় 100 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটে। স্বাভাবিক অবস্থা বলতে এখানে জলের

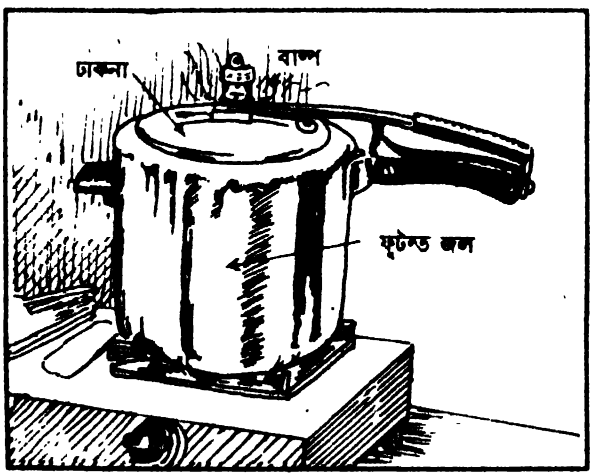
ওপর বাতাসের স্বাভাবিক চাপকে বোঝায়। অর্থাৎ জল ফোটানোর সময়ে যদি জলের ওপরে চাপের তারতম্য (বৃদ্ধি বা হ্রাস) করা হয়, তবে জলের স্ফুটনাঙ্ক (100 ডিগরি সেলসিয়াস) পালটে যায়। ভাত তাড়াতাড়ি রান্নার সময়ে ভাতের হাঁড়ির মুখে ঢাকনা দেওয়া হয়। এর ফলে

চাপ বাড়লে কি জলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়?

হাঁড়ির মধ্যে ক্রমশ জলীয় বাষ্প জমা হতে থাকে এবং হাঁড়ির জলের ওপরে চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। চাপ বাড়ার জন্যে জলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। অর্থাৎ 100

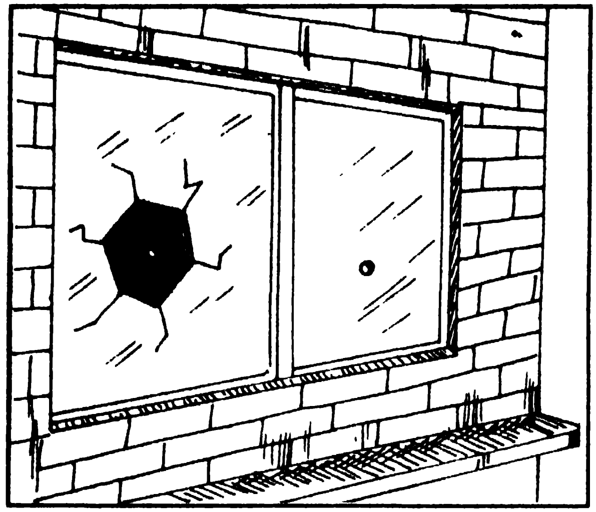
প্রেসার কুকারে তাড়াতাড়ি রান্না হয় কেন?

ডিগরির বদলে আরো বেশি তাপমাত্রায় জল ফুটতে থাকে। বেশি তাপমাত্রায় জল ফুটলে চাল কম সময়ে সেদ্ধ হতে পারে। ফলে ভাত রান্না হবে তাড়াতাড়ি। কিন্তু হাঁড়ির মুখ খোলা থাকলে জল 100 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেই ফুটবে—এতে চাল সেদ্ধ হতে সময় নেবে বেশি। এই কারণেই প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয়।



কাচের জানালায় গুলি করলে কাচ ফুটো হয়ে যায় কিন্তু ভেঙে পড়ে না, অথচ ঢিল ছুঁড়লে কাচ ভেঙে যায় কেন?

পদার্থের একটা মৌলিক ধর্ম হল জড়তা। পদার্থ তার



স্থির অবস্থাকে নিজে থেকে পরিবর্তন করতে পারে না। স্থির হয়ে থাকার এই প্রবণতার নাম স্থিতি-জাড্য। কাচের জানালার যে-জায়গায় বন্দুকের গুলি লাগে, শুধুমাত্র সেই জায়গায় কাচের অণুগুলোই গুলির আঘাতের প্রভাবে নিজেদের স্থিতি-জাড্য হারিয়ে ফেলে। অতএব তারা গুলিকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা ক'রে দেয়। গুলির গতিবেগ অনেক বেশি বলে সংঘর্ষের এত অল্প সময়ে শুধু আঘাতের জায়গাটুকু ছাড়া অন্য জায়গার কাচের অণুগুলি নিজেদের স্থিতি-জাড্য পরিবর্তনের সময় পায় না। তাই তারা স্থির থেকে ওই সব অঞ্চলের কাচকে অক্ষত রাখে। ঢিল ছুঁড়লে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্য রকম। ঢিলের গতিবেগ গুলির চেয়ে

পদার্থ তার স্থির অবস্থাকে কি নিজে থেকে বদলাতে পারে?

অনেক কম। ফলে ঢিল লাগা জায়গার কাচের অণুর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জায়গার কাচের অণুগুলোও স্থিতি-জাড্য পরিবর্তনের যথেষ্ট সময় পায় এবং তারা স্থানচ্যুত হয়। এর ফলে গুলির মত একটা ছোট ফুটো না হয়ে কাচের অনেকখানি জায়গাই এক সঙ্গে ভেঙে পড়ে।

কোনো পানীয়কে বরফের টুকরো মিশিয়ে ঠাণ্ডা করতে হলে কী ভাবে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা যাবে—বরফকে পানীয়ের ওপরে ভাসতে দিয়ে, না বরফকে পানীয়ের তলায় কোনোভাবে ডুবিয়ে রেখে?

সাধারণত পানীয়ের প্রধান উপাদান থাকে জল। ঠাণ্ডা

জলের ঘনত্ব উষ্ণ জলের তুলনায় বেশি (যদি অবশ্য সেই জল ৪ ডিগরি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা না হয়)। পানীয়ের ওপরে বরফের টুকরো ভাসিয়ে দিলে তা আশপাশের জলকে ঠাণ্ডা করবে। ফলে ঠাণ্ডা জলের ঘনত্ব বেড়ে যাবে। সুতরাং সেই জল ভারি হয়ে নীচে নামবে আর অপেক্ষাকৃত গরম জল তলা থেকে ওপরে উঠে আসবে। এই প্রক্রিয়া একই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকলে পাত্রের সবটুকু পানীয়ই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। কিন্তু যদি বরফকে কোনোভাবে পানীয়তে ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা করার

ঠাণ্ডা জলের ঘনত্ব কি ভারি জলের চেয়ে বেশি?

চেষ্টা করা হয় তাহলে শুধুমাত্র নীচের জলটুকুই ঠাণ্ডা হবে এবং ওই জায়গার জলের ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে তা ভারি হয়ে নীচেই পড়ে থাকবে। সুতরাং ওপরের পানীয় আর ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ পাবে না।

একটা গোটা সেদ্ধ-ডিমকে কী ক'রে সরু-মুখ বোতলে ঢোকানো ও বের করা যায়?

অনেক সময় ম্যাজিক দেখতে গিয়ে এই ধরনের মজার খেলা নজরে আসে। যদিও এর মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার লুকিয়ে আছে যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। আমরা জানি, বাতাসের চাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এই সত্যের ওপর ভিত্তি ক'রেই একটা গোটা সেদ্ধ-ডিমকে সরু-মুখ বোতলের মধ্যে প্রথমে ঢোকান যায় ও পরে বের ক'রে আনা চলে।

কিন্তু কি ক'রে? এক টুকরো কাগজে আগুন ধরিয়ে জ্বলন্ত কাগজটা ফেলে দেওয়া হল বোতলের মধ্যে। এবারে সেদ্ধ ডিমটাকে ছবির মত ক'রে বোতলের মুখে রাখতে হবে। জ্বলন্ত কাগজের দহনের জন্য বোতলের অক্সিজেন প্রায় নিঃশেষিত হবে। তখন বোতলের ভেতরের চাপ বাইরের বাতাসের চাপের চেয়ে কমে যাবে। সুতরাং বাইরের অতিরিক্ত চাপ ডিমকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবে ভেতরে।

কিন্তু ডিমটাকে বোতল থেকে বের ক'রে আনা হবে কী কৌশলে?

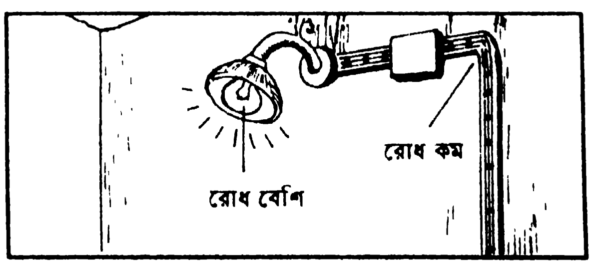
বোতলটাকে এমনভাবে ধরতে হবে যাতে ডিমটা বোতলের ঠিক মুখের কাছে থাকে। এবার ডিমটার পাশ



দিয়ে বোতলের ভেতর জোরে ফুঁ দিয়ে হাওয়া ভরতে থাকলে এক সময়ে বোতলের ভেতরের চাপ বাইরের চাপের চেয়ে বেশি হবে। তখন সেই চাপে ডিমটা বাইরে বেরিয়ে আসবে। বাতাসের চাপের কারিকুরিতেই এই মজার ঘটনাকে ম্যাজিকের মত মনে হয়।

একই বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘরের মধ্যে তারের ও বাতির ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে বাতি জ্বলে কিন্তু বিদ্যুৎবাহী তারগুলো জ্বলে ওঠে না কেন?

অধিকাংশ পদার্থেরই একটা ধর্ম হল, সেটির ভেতর দিয়ে কিছু প্রবাহিত হতে চাইলে সেই প্রবাহকে বাধা দেওয়া।



যখন তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎকে পাঠানো হয় তখন এই তারের উপাদানের রোধ (বিদ্যুৎ-প্রবাহকে বাধা দেবার ধর্ম) যাতে খুব কম হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিদ্যুৎ যাতে অল্প বাধায় যেতে

পারে সেই ধরনের স্বল্প-রোধযুক্ত পরিবাহী নেওয়া হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতির তার বিশেষ উপাদানের তৈরি এবং খুব

তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সময়ে আলোর আগে কি উত্তাপের সৃষ্টি?

সরু। এর কারণ, বিদ্যুৎ-প্রবাহের সময়ে এই বিশেষ তারের রোধ বা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা যাতে অত্যন্ত বেশি হয়। বাধা দেওয়ার ক্ষমতা যত বেশি হবে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ যাওয়ার সময়ে তত বেশি তাপ উৎপন্ন হবে। এই অতিরিক্ত তাপ থেকেই পাওয়া যায় আলো। সুতরাং বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে বৈদ্যুতিক বাতির তারে প্রথমে তাপ, পরে আলো সৃষ্টি হয় এবং বাতি ভাস্বর হয়ে ওঠে। এইভাবে জ্বলে ওঠার জন্য বাতির ভেতরের সরু তার বা ফিলামেন্টের উচ্চ মানের রোধই মূলত দায়ী। কিন্তু স্বল্প-রোধযুক্ত তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহকে শুধু নিয়ে যেতে যে-তাপ উৎপন্ন হয় তা নিতান্তই কম, ফলে বিদ্যুৎবাহী তারগুলো জ্বলে ওঠে না।

ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎ



পদার্থের অতি ক্ষুদ্র কণা ইলেকট্রন। খালি চোখে তো দূরের কথা, অণুবীক্ষণ দিয়েও এই কণাকে দেখা যায় না। অথচ এই সূক্ষ্ম কণাই তড়িৎ-প্রবাহেব মূল কথা। এই ইলেকট্রনের গতিবিধির বৈশিষ্ট্য ও গবেষণা থেকেই গড়ে উঠেছে ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎবিজ্ঞান। মূল উৎস পদার্থবিজ্ঞান হলেও ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎবিজ্ঞান আজ দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা। রেডিও, টিভি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ও আরো নানারকম নতুন নতুন ইলেকট্রনিক যন্ত্র আমাদের অবাক ক'রে দেয়। জানতে ইচ্ছে করে বিদ্যুৎবিজ্ঞানের রহস্য—কারণ ইলেকট্রনিক্সের প্রাণ বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের জীবনযাত্রাও অচল। ইলেকট্রনিক্স আর ইলেকট্রিসিটি, অর্থাৎ বিদ্যুৎবিজ্ঞান, অনেক ক্ষেত্রেই এরা একে অপরের ওপরে নির্ভরশীল। ইংরেজিতে এদের বলা হয় Electronics এবং Electricity।

নাম কেন ইলেকট্রনিক্স?

ইলেকট্রনিক্সের মূলে রয়েছে অতি সূক্ষ্ম কণা ইলেকট্রন। তাই এর নাম ইলেকট্রনিক্স।

প্রতিটি মৌলিক পদার্থ অসংখ্য ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি। কোনো পদার্থের ক্ষুদ্রতম যে-কণা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে বলা হয় পরমাণু। পরমাণুর মধ্যে মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। পরমাণুকে ভাঙলে মোটামুটিভাবে আরো ছোট তিন রকম কণা পাওয়া যায়। তাদের নাম ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এর মধ্যে ইলেকট্রন কণা নেগেটিভ বা ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান যুক্ত, প্রোটনের চার্জ পজিটিভ বা ধনাত্মক, আর নিউট্রনের কোনো চার্জ বা তড়িৎ-আধান নেই। এই কণাগুলো এত ছোট যে, খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের দেখা যায় না। প্রোটন ও নিউট্রন কণা থাকে পরমাণুর কেন্দ্রে আর ইলেকট্রন কণা তাদের ঘিরে নানা কক্ষপথে পাক খায়।

এই ছোট ছোট ইলেকট্রন কণাই বিদ্যুৎ পরিবহনের মূল কারণ। বিদ্যুৎ-প্রবাহ মানেই হল অসংখ্য ইলেকট্রনের প্রবাহ। কঠিন মাধ্যমে যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তেমনি শূন্য বা গ্যাস মাধ্যমেও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। এ-ছাড়া অর্ধপরিবাহী নামে একরকম বিদ্যুৎ পরিবাহী আছে, যারা সাধারণভাবে বিদ্যুৎ কুপরিবাহী হলেও কোনো কোনো শর্ত পূরণ করলে বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে-শাখা শূন্য মাধ্যম, গ্যাস মাধ্যম বা অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রনের প্রবাহ এবং গতি-প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে, তাকেই বলা হয় ইলেকট্রনিক্স। এই শাখায় ইলেকট্রনের নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে তৈরি করা হয় বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক-বর্তনী—যাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক-বর্তনী বা সার্কিট। এই সব বর্তনীতে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট বা যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়। আর নানা জটিল ইলেকট্রনিক-বর্তনী কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় বহুরকম ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, রোবট, কম্পিউটার, ক্যালকুলেটর, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি।

ইলেকট্রনিক্সের শুরু কবে থেকে?

সাধারণভাবে ইলেকট্রনিক্স যুগের সূচনা বলতে বোঝায় ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার। 1948 সালে উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড শকলি ও তাঁর দুই সহযোগী ওয়াল্টার হাউসার ব্র্যাটেইন এবং জন বার্ডিন ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য এই তিন বিজ্ঞানী 1956 সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের পর থেকেই শুরু হয়ে যায় ইলেকট্রনিক্স জগতে বিপ্লব। কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের ভিত্তিপ্রস্তরটি স্থাপন করেছিলেন আমেরিকার মেন্‌লো পার্কের জাদুকর, আবিষ্কারের সম্রাট, টমাস আলভা এডিসন। 1883 সালে

ট্রানজিস্টর কে আবিষ্কার করেন?

উন্নত ধরনের বৈদ্যুতিক আলো তৈরির চেষ্টায় তিনি নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। একটি কাচের বাল্বের উত্তপ্ত ফিলামেন্টের কাছাকাছি তিনি একটি শীতল ধাতব তার রাখার ব্যবস্থা করেন। অবাক হয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, ফিলামেন্ট ও ধাতব তারের মধ্যে ফাঁক থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। 1884 সালে এডিসন এই বৈজ্ঞানিক ঘটনার পেটেন্ট নেন এবং কালক্রমে এই ঘটনার নাম হয় 'এডিসন এফেক্ট'। সুতরাং আলভা এডিসনই প্রথম দেখান যে, তারের যোগাযোগ ছাড়াই দুটি পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়া সম্ভব। পরে 1904 সালে 'এডিসন এফেক্ট'-কে কাজে লাগিয়ে স্যার জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং 'ডায়োড' ভাল্‌ভ্ তৈরি করেন।

এডিসন এফেক্ট-এর মূল তত্ত্ব কী?

আমরা জানি যে, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন ও প্রোটন কণা—যাদের সম্মিলিতভাবে বলা হয় নিউক্লিয়াস। আর ইলেকট্রন কণা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে কক্ষপথে পাক

[illegible]

খায়। যদি কোনোভাবে পরমাণুকে বাইরে থেকে পর্যাপ্ত শক্তি জোগানো যায় তাহলে ইলেকট্রন কণা নিউক্লিয়াসের আকর্ষণের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পড়তে পারে। তখন যদি কাছাকাছি কোনো শক্তিশালী পজিটিভ তড়িৎ-দ্বার থাকে, তাহলে নেগেটিভ ইলেকট্রন কণা সেইদিকে আকর্ষিত হয়।

কোনো ধাতব ফিলামেন্টের গায়ে অসংখ্য পরমাণুর স্তর রয়েছে। সেই সব পরমাণুর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ইলেকট্রন। সুতরাং ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করলে ইলেকট্রন কণাগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়বে। ফিলামেন্টের তাপশক্তি ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের 'বাঁধন ছেঁড়ার' শক্তি জোগাবে। ফলে অতিরিক্ত শক্তি পেয়ে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে পড়বে। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো ফিলামেন্টের পরমাণুর ফাঁক-ফোকর দিয়ে এলোমেলো ভাবে দুরন্ত গতিতে ছোটাছুটি করতে থাকবে। এইভাবে ঘটবে ইলেকট্রন-বিকিরণ, যার ফলে ধাতব ফিলামেন্ট ঘিরে তৈরি হবে মুক্ত ইলেকট্রনের ভিড়—যাকে বলা যায় 'ইলেকট্রন গ্যাস'। এখন যদি কোনোভাবে মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে আকর্ষণ করা যায়, তাহলে পাওয়া যাবে ইলেকট্রন-প্রবাহ—যা তড়িৎ-প্রবাহেরই নামান্তর। ইলেকট্রন নেগেটিভ কণা। অতএব তাকে আকর্ষণ করতে গেলে পজিটিভ তড়িৎ-আধান সম্পন্ন কোনো তড়িৎ-দ্বার প্রয়োজন। এডিসন তাঁর পরীক্ষায় ধাতব তারটি একটি ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন এবং ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত যুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন ফিলামেন্টের সঙ্গে। তার ফলে সরাসরি পরিবাহীর যোগাযোগ ছাড়াই ফিলামেন্ট ও ধাতব তারের মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহ স্থাপিত হয়েছিল। কোনো বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের ভাণ্ডার অফুরন্ত বললেই চলে। সুতরাং যতক্ষণ ইচ্ছে এই ইলেকট্রন-প্রবাহ বজায় রাখতে কোনো অসুবিধে নেই।

এডিসনের পরীক্ষায় একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত। তিনি ফিলামেন্ট ও ধাতব তারটি রেখেছিলেন বায়ুশূন্য কাচের বাল্বের মধ্যে। এর একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। কারণটি হল, মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহের পথকে যতটা সম্ভব বাধাশূন্য রাখা। যদি বায়ুপূর্ণ পথে ইলেকট্রনকে চলাচল করতে হয় তাহলে বায়ুর অণুর সঙ্গে তার ধাক্কা লাগবে এবং সে গতিশক্তি হারাবে। তখন বেশিরভাগ ইলেকট্রন হয়তো শীতল ধাতব তার পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। ফলে ইলেকট্রন-প্রবাহ বা তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণ অনেক কমে যাবে। সুতরাং ইলেকট্রনের পথকে বাধাহীন রাখতে পারলেই সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

'ডায়োড' ভাল্‌ভ্ কী এবং কেমন ক'রে কাজ করে?

টমাস আলভা এডিসন যখন 'এডিসন এফেক্ট' পর্যবেক্ষণ করেন তখন তিনি বুঝতে পারেন নি, উত্তপ্ত ফিলামেন্টের ইলেকট্রন বিকিরণই এর মূল কারণ। 1883 সালে এডিসনের পক্ষে এই রহস্য না জানাটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ তখনও পরমাণুর অন্যতম উপাদান হিসেবে ইলেকট্রনকে সঠিকভাবে চেনা যায়নি। তার নানা ধর্ম এবং স্বরূপ ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা। পরে স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্, স্যার জোসেফ জন টমসন ইত্যাদির গবেষণায় ইলেকট্রনের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। আইরিশ পদার্থবিদ্ জর্জ জনস্টোন স্টোনি তার আগেই, ১৪৯১ সালে, ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-আধানের নাম দিয়েছিলেন ইলেকট্রন। ওই দশকেরই শেষে যখন টমসনের পরীক্ষা সফল হয় এবং ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-আধান সম্পন্ন কণার হদিস পাওয়া যায়, তখন সেই কণার নাম দেওয়া হয় ইলেকট্রন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্যার জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং এডিসনের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন। তখন ইলেকট্রনের স্বরূপ সদ্য জানা গেছে। সুতরাং 'এডিসন এফেক্ট'-এর মূল কারণ যে ইলেকট্রন-বিকিরণ সেটা ফ্লেমিং বুঝতে পেরেছিলেন। 1904 সালে এই তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'ডায়োড' ভাল্‌ভ্। একটি বায়ুশূন্য কাচের বাল্বের ভেতরে একটি উত্তপ্ত ফিলামেন্ট ইলেকট্রন বিকিরণ করে, আর ব্যাটারির পজিটিভ তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে যুক্ত একটি ধাতব পাত সেই মুক্ত ইলেকট্রনকে আকর্ষণ ক'রে টেনে নেয়। অর্থাৎ এডিসনের ব্যবহার করা শীতল ধাতব তারের বদলে ধাতব পাত ব্যবহার করা ছাড়া 'ডায়োড' ভাল্‌ভ্ তৈরির জন্য আর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেন নি ফ্লেমিং। তিনি লক্ষ্য করলেন, ধাতব পাতটি যদি পজিটিভ থাকে তাহলেই ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়। কিন্তু পাতটিকে যদি নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে যুক্ত করা হয় আর ফিলামেন্টকে পজিটিভ তড়িৎ-দ্বারে যুক্ত করা হয়, তাহলে ইলেকট্রন-প্রবাহ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ফিলামেন্ট থেকে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বারে যুক্ত ধাতব পাতের দ্বারা বিকর্ষিত হয় এবং ফিলামেন্ট নিজে পজিটিভ তড়িৎ-দ্বারে যুক্ত হয়ে পড়ায় মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে সে জোরালোভাবে আকর্ষণ করে।

এই ধারণা থেকেই ফ্লেমিং সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন যে, যদি ধাতব পাত ও ফিলামেন্টকে ব্যাটারি দিয়ে যুক্ত না ক'রে কোনো এ সি ভোল্টেজ জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে এ সি থেকে ডি সি ভোল্টেজ পাওয়া সম্ভব। পরিভাষায় একেই বলা হয় 'রেক্টিফিকেশন' বা একমুখীকরণ। এই কারণেই ভাল্‌ভ্ বা কলের সঙ্গে তুলনা করে 'ডায়োড'-কে বলা হয় 'ডায়োড ভাল্‌ভ্' বা 'রেক্টিফায়ার'। ভাল্‌ভ্ যখন 'খোলা' তখন তড়িৎ প্রবাহিত হয়। আবার ভাল্‌ভ্ যখন 'বন্ধ' তখন তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ থাকে।

'ডায়োড'-এর ধাতব পাতটিকে বলা হয় 'অ্যানোড' বা পজিটিভ তড়িৎ-দ্বার এবং ফিলামেন্টকে বলা হয় 'ক্যাথোড' বা নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বার। দুটি ইলেকট্রোড বা তড়িৎ-দ্বার ব্যবহার করা হয় বলেই এই ভাল্‌ভ্‌টির নাম হয়েছে 'ডায়োড'।

ফ্লেমিংয়ের ডায়োড-এ ক্যাথোডকে সরাসরি উত্তপ্ত ক'রে ইলেকট্রন মুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরে হিটার ফিলামেন্টকে ক্যাথোড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়। ফলে ফিলামেন্টকে স্বাধীনভাবে উত্তপ্ত করা যায় এবং ফিলামেন্টের উত্তাপের প্রভাবে ক্যাথোড উত্তপ্ত হয়ে ইলেকট্রন বিকিরণ করে। অনেকটা যেন হিটারের ওপরে বসানো লোহার চাটুর মত। এ-ধরনের ক্যাথোডকে বলা হয় পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত ক্যাথোড।

'ট্রায়োড' ভাল্‌ভ্ কী এবং কেমন ক'রে কাজ করে?

ফ্লেমিংয়ের ডায়োড আবিষ্কারের ঠিক দু'বছর পরে, 1906 সালে, মার্কিন আবিষ্কারক লী ডি ফরেস্ট 'ট্রায়োড' ভাল্‌ভ্ আবিষ্কার করেন। সেই সময়ে অন্তত তিনশো পেটেন্টের অধিকারী হলেও 'ট্রায়োড' ডি ফরেস্ট-এর জীবনের সেরা আবিষ্কার। তিনি এই ভাল্‌ভ্‌টির নাম দিয়েছিলেন 'অডিয়ন'। কিন্তু পরে 'অডিয়ন' নামটি বাতিল হয়ে গিয়ে 'ট্রায়োড' নামটিই জনপ্রিয় হয়ে পড়ে।

নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে 'ট্রায়োড' ভাল্‌ভে তড়িৎ-দ্বারের সংখ্যা তিনটি। আসলে ডি ফরেস্ট যে-কাজটুকু করেছিলেন তা হল ফ্লেমিংয়ের 'ডায়োড'-এর ক্যাথোড ও অ্যানোডের মাঝে তিনি আর একটি নতুন তড়িৎ-দ্বার ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। শুনে কাজটুকু নিতান্তই তুচ্ছ মনে হলেও এই নতুন তড়িৎ-দ্বারই বিপ্লব এনেছিল ইলেকট্রনিক্স জগতে। বলতে গেলে রাতারাতি ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের প্রয়োগ হয়ে গিয়েছিল বহুমুখী। ডি ফরেস্ট-এর সময়েই 'অডিয়ন' কী রকম মূল্যবান ছিল তার প্রমাণ হিসেবে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। আবিষ্কারের প্রায় এক যুগ পরে ডি ফরেস্ট 'অডিয়ন' এর স্বত্ব তিন লক্ষ নব্বই হাজার ডলারে 'আমেরিকান টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানি'-কে বিক্রি করেছিলেন।

ডি ফরেস্ট যে নতুন তড়িৎ-দ্বারের প্রবর্তন করেছিলেন তার নাম 'গ্রিড'। বায়ুশূন্য কাচের বাল্বে ক্যাথোড ও অ্যানোডের মাঝে তড়িৎ-দ্বার দু'টির সঙ্গে সমান্তরালভাবে গ্রিডকে বসানো হয়। গ্রিড কিন্তু ক্যাথোড বা অ্যানোডের মত ধাতব পাত নয়, এটি ঘন ধাতব তারজালি দিয়ে তৈরি। কারণ এর ফলে গ্রিডের তারজালির ফাঁক দিয়ে ইলেকট্রন কণার স্রোত সহজেই ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে প্রবাহিত হতে পারবে। গ্রিড ছিদ্রহীন ধাতব পাত হলে সেটা সম্ভব হত না।

এখন গ্রিডকে যদি ক্যাথোডের তুলনায় বেশি নেগেটিভ কোনো তড়িৎ-দ্বারে যুক্ত করা হয় তাহলে ইলেকট্রনের স্রোত সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ অ্যানোড ইলেকট্রন আকর্ষণ করলেও গ্রিড অতিরিক্ত নেগেটিভ হওয়ায় এবং ক্যাথোডের বেশি কাছে থাকায় মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে বিকর্ষণ ক'রে যেন ধাক্কা মেরে ফিরিয়ে দেবে ক্যাথোডেরই দিকে। ফলে সমস্ত মুক্ত ইলেকট্রন ভিড় ক'রে জড়ো হয়ে থাকবে গ্রিড ও ক্যাথোডের মাঝের জায়গাটুকুতে।

অর্থাৎ, এই পরিস্থিতিতে ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে দিয়ে কোনো তড়িৎ-প্রবাহ সম্ভব হবে না। এই অবস্থাকে বলা হয় 'ট্রায়োড' ভাল্‌ভের 'কাট অফ' অবস্থা।

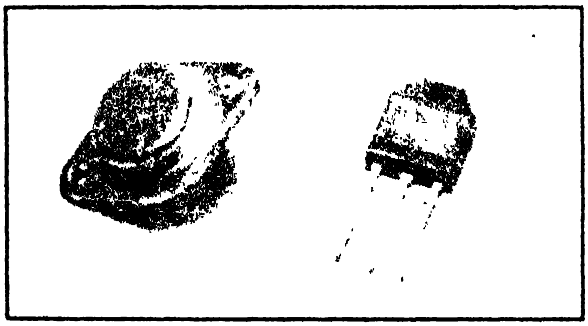
এবারে গ্রিডকে যদি ধীরে ধীরে ক্রমশ কম নেগেটিভ করা হয় তাহলে একটা সময় আসবে যখন কিছু ইলেকট্রন অ্যানোডের আকর্ষণে গ্রিড পেরিয়ে চলে যাবে। এর কারণ, ক্যাথোডের তুলনায় কম নেগেটিভ হয়ে পড়ার ফলে গ্রিডের ইলেকট্রন বিকর্ষণ ক্ষমতা কমে যাবে। এ-ভাবে গ্রিডকে যদি ক্রমশ শূন্য ভোল্টেজে বা নিস্তড়িৎ অবস্থায় আনা যায় তাহলে 'ট্রায়োড' ভাল্‌ভ্ কাজ করবে 'ডায়োড'-এরই মত।

গ্রিডকে পজিটিভ ভোল্টেজে নিয়ে গেলে গ্রিড তখন অ্যানোডকে ইলেকট্রন আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে। ফলে অ্যানোডের আকর্ষণের 'পরিশ্রম' অনেকটা কমে যাবে। কিন্তু গ্রিডকে ক্রমশ বেশি পজিটিভ করে তুললে গ্রিড অ্যানোডকে সাহায্য করার বদলে তার 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হয়ে দাঁড়াবে। এর ফলে ভাল্‌ভের ক্ষতি হতে পারে।

'ট্রায়োড'-এর কার্যপ্রণালী থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, কীভাবে গ্রিডের সামান্য ভোল্টেজ পরিবর্তন ক'রে অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহমাত্রা বাড়িয়ে তোলা যায়। এভাবেই 'ট্রায়োড' ভাল্‌ভ্ অ্যামপ্লিফায়ারের কাজ করে।

'সলিড স্টেট' বলতে কী বোঝায়?

আজকাল নানা জায়গায় 'সলিড স্টেট' কথাটি প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু সলিড স্টেট বলতে আসলে কী বোঝায়? এর অর্থ ভাল্‌ভ্ ব্যবহার না ক'রে তৈরি করা কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র' কিন্তু যে কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রে অ্যামপ্লিফায়ার, রেক্টিফায়ার ইত্যাদি একরকম অপরিহার্য বলা যায়। তাহলে 'ডায়োড' বা 'ট্রায়োড' ভাল্‌ভ্ ব্যবহার



সলিড স্টেট ট্রানজিস্টর

না ক'রে উপায় কী! সেই উপায়টিই খুঁজে দিয়েছে সেমিকণ্ডাক্টর ডায়োড এবং ট্রায়োড। এরা মাপে অনেক ছোট। দামে সস্তা। নির্ভরযোগ্য। আর ভাল্‌ভের চেয়ে অনেক কম বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার ক'রে কাজ করতে পারে। এই সব গুণের জন্য পুরোনো দিনের ভাল্‌ভ্ আজ বলতে গেলে প্রায় বাতিল হয়ে গেছে।

অর্ধপরিবাহী পদার্থ (বা সেমিকণ্ডাক্টর) দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক কম্‌পোনেণ্ট ব্যবহার ক'রে যে-সার্কিট তৈরি করা হয়, তাকেই বলে 'সলিড স্টেট সার্কিট'। আর ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ্ ব্যবহার ক'রে কোনো বর্তনী তৈরি করা হলে তাকে বলা যেতে পারে 'ভাল্‌ভ্ সার্কিট'।

ট্রানজিস্টর কাকে বলে?

ট্রানজিস্টর বলতে সাধারণত আমরা ব্যাটারি চালিত রেডিও বুঝি। কিন্তু এই অর্থ ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে অর্ধ-পরিবাহী 'ট্রায়োড'-কেই ট্রানজিস্টর বলা হয়।

চলতি কথায় ব্যাটারি চালিত রেডিওকে ট্রানজিস্টর বলি কেন?

ট্রানজিস্টরের আসল অর্থ অর্ধপরিবাহী 'ট্রায়োড' হলেও চলতি কথায় আমরা ব্যাটারি চালিত রেডিওকেই ট্রানজিস্টর বলি। কিন্তু কেন? এর কারণ, এই ধরনের রেডিওগুলোর সার্কিট ট্রানজিস্টর, ডায়োড ইত্যাদি সেমিকণ্ডাক্টর ডিভাইস বা অর্ধপরিবাহী যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি। পুরোনো ধরনের রেডিওতে ভাল্‌ভ্ ব্যবহার করা হত। ভাল্‌ভে বেশি বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজন হয় বলে সেই রেডিওগুলো সরাসরি 220-240 ভোল্টের লাইনে যোগ ক'রে চালানো হত। কিন্তু সেমিকণ্ডাক্টর 'ট্রায়োড' বা ট্রানজিস্টরে খুব কম বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে এই ধরনের ট্রানজিস্টর, অর্ধপরিবাহী ডায়োড ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে যে-রেডিও তৈরি করা হয় তা অনেক কম ভোল্টেজে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ সাধারণ নির্জল কোষ বা ব্যাটারি ব্যবহার করলেই ট্রানজিস্টর রেডিও শোনা যায়।

চলতি কথায় 'ট্রানজিস্টর-রেডিও' নামটিই সংক্ষিপ্ত হয়ে শুধু ট্রানজিস্টর-এ দাঁড়িয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো কোনো ট্রানজিস্টর-রেডিও 220-240 এ সি ভোল্টের লাইনে সরাসরি যোগ ক'রেও চালানো যায়। এর রহস্য খুবই সরল। ওই রেডিওগুলোর ভেতরে ব্যাটারি এলিমিনেটর সার্কিট থাকে। এলিমিনেটর মেন লাইনের বেশি ভোল্টেজকে ট্রান্সফর্মার দিয়ে কমিয়ে নেয়। তারপর তাকে রেক্‌টিফাই ক'রে ডি সি ক'রে ব্যাটারির ভোল্টেজের সমান ক'রে নেয়। ব্যাটারির বদলে তখন এলিমিনেটর সার্কিট রেডিওতে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজের যোগান দেয়।

বলা বাহুল্য, এই ধরনের রেডিওগুলো ব্যাটারি ব্যবহার ক'রেও দিব্যি চলতে পারে। এলিমিনেটর ব্যবহার করা হয় ব্যাটারির বদলে—ব্যাটারির খরচ বাঁচানোর জন্যে।

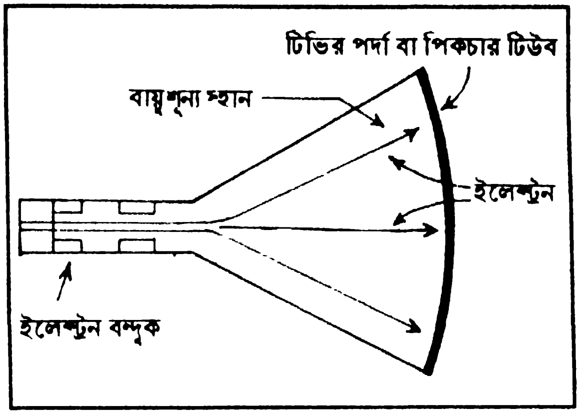
ট্রানজিস্টরে সুইচ অন করলেই সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শোনা যায়, কিন্তু পুরোনো ধরনের ভাল্‌ভ্ রেডিওতে সুইচ অন ক'রে শব্দ পেতে কিছুক্ষণ সময় লাগে কেন?

ট্রানজিস্টর-রেডিওতে অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়। অর্ধপরিবাহী ট্রায়োড, ডায়োড ইত্যাদিতে ভোল্টেজ দেওয়া মাত্রই মুক্ত ইলেকট্রন বা হোল (হোল একটি কাল্পনিক পজিটিভ কণা। প্রকৃতপক্ষে অর্ধপরিবাহীর কেলাসে ইলেকট্রনের অনুপস্থিতি বা শূন্যতাকেই বিজ্ঞানীরা 'হোল' নাম দিয়েছেন) চলাচল শুরু করে এবং তড়িৎ প্রবাহিত হয়। ফলে রেডিও সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু ক'রে দেয়। কিন্তু ভাল্‌ভ্ রেডিওর বেলায় এই ঘটনা ঘটে না। কারণ সেখানে ডায়োড বা ট্রায়োড ভাল্‌ভের ফিলামেন্ট উত্তপ্ত হয়ে ইলেকট্রন মুক্ত হতে কিছুটা সময় লাগে। আর ইলেকট্রন মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয় না এবং রেডিও তার কাজ শুরু করতে পারে না।

শুধু রেডিও নয়, যে-কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কাজ শুরু করার এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য ক'রে বলে দেওয়া যায় সেটা 'সলিড স্টেট' না ভাল্‌ভ্ দিয়ে তৈরি।

সাধারণত টেলিভিশনে সুইচ অন করলে শব্দ সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়, কিন্তু ছবি ফুটে উঠতে দেরি হয় কেন?

আধুনিক টেলিভিশনের বর্তনীতে অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ট্রানজিস্টর রেডিওর মত সুইচ অন করলেই টিভি থেকে শব্দ শোনা যায়। কিন্তু ছবি যে-পর্দায় ফুটে ওঠে তার গঠন অনেকটা ভাল্‌ভের মত। অর্থাৎ পর্দা বা পিকচার টিউবের ভেতরটা ভাল্‌ভের মত বায়ুশূন্য করা থাকে। আর পিকচার টিউবের এক প্রান্ত থেকে মুক্ত ইলেকট্রনের স্রোত এসে আছড়ে পড়ে পিকচার টিউবের আর এক প্রান্তে—যেটাকে আমরা টিভি-পর্দা বলি। বাইরে থেকে পিকচার টিউবের শুধু এই অংশটাই আমরা দেখতে পাই। ইলেকট্রন ছুটে এসে পর্দায় আঘাত করলে সেখানে উজ্জ্বল আলোর বিন্দু দেখা যায়। এর কারণ টিভি পর্দার ভেতর দিকে এক ধরনের প্রতিপ্রভ আস্তরণ দেওয়া থাকে। অসংখ্য ইলেকট্রন পর্দায় আছড়ে পড়ে তৈরি ক'রে অসংখ্য আলোর বিন্দু। টিভির চিত্রসঙ্কেত অনুযায়ী পর্দায় আলোকবিন্দুর ঘনত্ব কম-বেশি হয়। ফলে এই আলোকবিন্দুগুলো সম্মিলিতভাবে তৈরি ক'রে দেয় নানা ছবি।



পিকচার টিউবের ইলেকট্রনের উৎস একটি ইলেকট্রন-বন্দুক বা ইলেকট্রন-গান। কিন্তু আসলে ইলেকট্রন-বন্দুককে মুক্ত ইলেকট্রন জোগায় পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত একটি ক্যাথোড। অর্থাৎ ভাল্‌ভের মত এখানেও ক্যাথোডের পিছনে থাকে একটি উত্তপ্ত হিটার ফিলামেন্ট। ইলেকট্রন-বন্দুকের কাজ হল, বিভিন্ন বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র ও চৌম্বক-ক্ষেত্রের সাহায্যে ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে আসা মুক্ত ইলেকট্রনের স্রোতকে ঠিক মত পিকচার টিউবের প্রতিপ্রভ পর্দায় নিয়ে ফেলা। অবশ্য, হিটার এবং ক্যাথোড, এ-দুটি জিনিসও ইলেকট্রন-বন্দুকেরই অংশ।

সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে, টিভির সুইচ অন করার পর হিটার এবং ক্যাথোড উত্তপ্ত হয়ে ইলেকট্রন মুক্ত হতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে। ফলে টিভির পর্দায় ছবি তৈরি হতেও কিছুটা সময় নেবে—অনেকটা ভাল্‌ভ্ রেডিওর মত।

যে-সব টিভিতে ছবির মত শব্দও দেরিতে শোনা যায়, তাদের বর্তনী ইলেকট্রনিক ভালভ্ দিয়ে তৈরি। অবশ্য, এ-ধরনের টিভি এখন প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে টিভিতে ছবি দেখতে পাওয়া কি সম্ভব?

সাধারণত টিভি-তে সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গেই ছবি

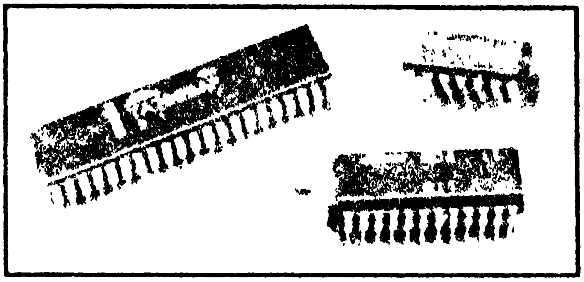
ফুটে ওঠে না। কিন্তু বিশেষ এক ধরনের টিভি-তে সুইচ অন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখতে পাওয়া সম্ভব। তবে তার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি নেওয়া হয়, যার নাম 'ইনস্ট্যান্ট অন অপারেশন'। এই পদ্ধতিতে টিভি-র সুইচ অফ করলেও হিটারকে সব সময়েই উত্তপ্ত রাখা হয়। অবশ্য টিভি চালু অবস্থায় হিটারে যে-ভোল্টেজ দেওয়া হয়, টিভি বন্ধ অবস্থায় তার চেয়ে কম ভোল্টেজ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে হিটার সর্বক্ষণ উত্তপ্ত থাকে বলে টিভি চালু করা মাত্র মুক্ত ইলেকট্রনের জোগান পাওয়া যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছবি ফুটে ওঠে পর্দায়। কিন্তু এর একটা ক্ষতিকর দিক আছে। হিটার সব সময়ে অন থাকার ফলে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ খরচ হয় খুব বেশি। এই কারণেই 'ইনস্ট্যান্ট-অন অপারেশন' পদ্ধতির টেলিভিশন আধুনিক যুগে বাতিল হয়ে গেছে।

মাইক্রোইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?

ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি যতই উন্নত হচ্ছে ততই বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্র মাপে ছোট হচ্ছে। যেমন প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের মাপ ছিল প্রায় 30 মিটার লম্বা, 3 মিটার উঁচু এবং 1 মিটার পুরু। আর এখন একটা কম্পিউটার কোলের ওপরেই বসানো যায়। এ ধরনের কম্পিউটারকে বলা হয় 'ল্যাপটপ' কম্পিউটার। কম্পিউটার এভাবে ক্রমেই মাপে ছোট হওয়ার কারণ, অর্ধপরিবাহী দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যেমন ট্রানজিস্টর, ডায়োড ইত্যাদি ক্রমশই মাপে ছোট হচ্ছে। মাপে ছোট করার এই যে প্রযুক্তি, বিজ্ঞানচর্চার এই শাখাকেই বলা হয় মাইক্রোইলেকট্রনিক্স। উদাহরণ হিসেবে একটি মাইক্রোট্রানজিস্টরের কথা বলা যেতে পারে। আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি এই ট্রানজিস্টরের মাপ 0.8 মিলিমিটার বাই 0.8 মিলিমিটার। আর তার বেধ 4 মিলিমিটারের প্রায় এক কোটি ভাগের এক ভাগ। এ-রকম 50টা ট্রানজিস্টরকে যদি ওপরে ওপরে রাখা যায় তাহলে হয়তো খবরের কাগজের একটা পাতার মত পুরু হবে। আর প্রমাণ মাপের একটা নস্যির ডিবেতে এ-রকম 80,000 ট্রানজিস্টর সহজেই ঢুকে যাবে।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আই সি কাকে বলে?

1958 সালের 12 সেপ্টেম্বর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের



আই সি চিপ

জন্ম হয়। খড়কের চেয়েও সরু আর 12 মিলিমিটার লম্বা জারমেনিয়াম অর্ধপরিবাহীর একটি 'চিপ'-এর ওপরে তৈরি করা হয়েছিল প্রথম আই সি—যার আবিষ্কারক ছিলেন আমেরিকার 'টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট্স'-এর তিরিশ বছর বয়েসী



পিঁপড়ের মুখে মাইক্রোচিপ : মাইক্রোইলেকট্রনিক্সের কীর্তি

ইঞ্জিনিয়ার জ্যাক কিল্‌বি।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটকে একটি সূক্ষ্ম সার্কিট বলা যেতে পারে। খুব ছোট অর্ধপরিবাহী পদার্থের টুকরোর মধ্যে 'ডায়োড', 'ট্রানজিস্টর', রোধ, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি বহু-সংখ্যক বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ জুড়ে গোটা একটি বর্তনী তৈরি ক'রে ফেলা হয়। পরিভাষায় এই অর্ধপরিবাহী পদার্থের টুকরোকে বলা হয় 'সেমিকন্ডাক্টর চিপ'। বর্তমানে সাধারণত এই কাজে সিলিকন ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়। কোনো একটি বিশেষ আই সি চিপের মাপ 6 মিলিমিটার বাই 18 মিলিমিটার হতে পারে। আর তার বেধ 2 থেকে 3 মিলিমিটার। আই সি প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, ইলেকট্রনিক

বর্তনী ততই ছোট হচ্ছে মাপে। কোনো একটি জটিল ইলেকট্রনিক বর্তনীতে তিন-চারটি আই সি ব্যবহার করলে বর্তনীটি যে শুধুই মাপে ছোট হবে তা নয়, তার কারিগরি জটিলতাও অনেক কমে যাবে। কোনো আই সি-কে বর্তনীতে যুক্ত করার জন্য 'পিন টার্মিনাল' থাকে। বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত আই সি-র টার্মিনালের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। যেমন, 8, 10, 14, 16, 40 ইত্যাদি পিন টার্মিনালের সংখ্যা সম্পন্ন আই সি পাওয়া যায়।

আই সি তৈরির প্রযুক্তিকে বলা হয় 'ইন্টিগ্রেশান' বা সমন্বয়। এক-দেড় যুগ আগেও যে-ভাবে আই সি তৈরি হত তাকে বলা হত 'স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশান' বা এস এস আই এবং 'মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশান' বা এম এস আই। আর এখন ব্যবহার করা হচ্ছে, 'লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশান' ও 'ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশান' পদ্ধতি—সংক্ষেপে এদের বলা হয় যথাক্রমে এল এস আই এবং ভি এল এস আই প্রযুক্তি। বোঝাই যাচ্ছে, সমন্বয়ের প্রযুক্তি যত এগোবে, একটি আই সি-তে তত বেশি সংখ্যক ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও কম্পোনেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মাপে ক্রমশ ছোট হবে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই। রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ইত্যাদির মাপগুলো খেয়াল করলেই বোঝা যাবে এদের পেছনে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্সের ভূমিকা কতখানি।

রেডিও কেমন ক'রে কাজ করে?

রেডিও এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ ক'রে তাকে শব্দ-তরঙ্গে পরিণত করতে পারে। অর্থাৎ রেডিও একটি বেতার গ্রাহক যন্ত্র। কিন্তু বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কোথা থেকে? আর বেতার-তরঙ্গের স্বরূপই বা কী? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আগে জানতে হবে তরঙ্গ কাকে বলে। স্থির জলে ঢিল পড়লে জলের উপরিতলে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। ঢিল যেখানে পড়ে, ঠিক সেখান থেকে জন্ম নেয় ঢেউগুলি। তারপর চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে দূরান্তরে। একইভাবে কোনো বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে গুলির শব্দ সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। ঢিল ছোঁড়ার জন্য জলের মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তা থেকেই তৈরি হয় তরঙ্গ। ঠিক সেইভাবেই গুলি ছোঁড়ার জন্য বাতাসে কম্পন এবং তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

বেতার-তরঙ্গ হল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গ শব্দ-তরঙ্গের মতই সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বেতার প্রেরকযন্ত্র বেতার-তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। আলোর গতিতে ছুটে গিয়ে এই

'শক ওয়েভ' কাকে বলে?

তরঙ্গ ছড়িয়ে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। উপযুক্ত গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহার করতে পারলে প্রেরণ করা বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ ক'রে তা থেকে শব্দ-তরঙ্গ পাওয়া সম্ভব।

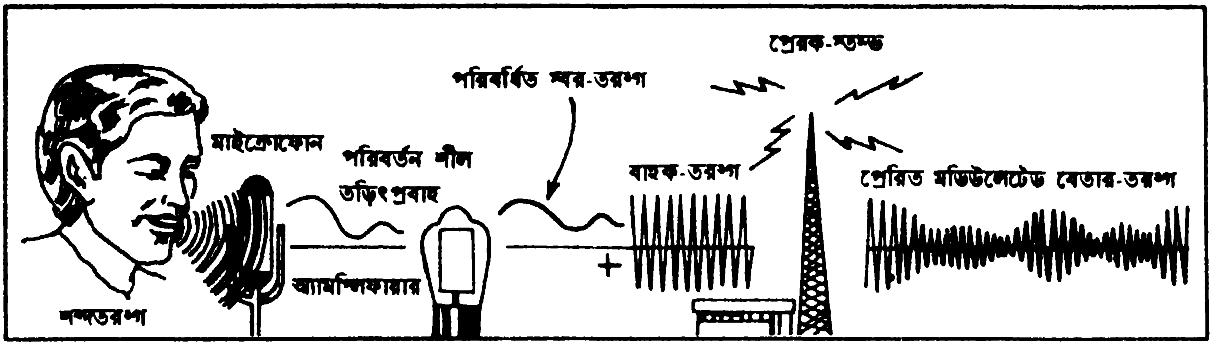
ঢিল ছুঁড়ে যেমন স্থির জলতলকে আচমকা আঘাত করা হয়, তেমনি উচ্চ ভোল্টেজে আচমকা বিদ্যুৎ মোক্ষণ করাতে পারলে বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ-চুম্বকীয় অভিঘাত সৃষ্টি করা সম্ভব। এই তড়িৎ-চুম্বকীয় অভিঘাতই বেতার-তরঙ্গ। জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিশ হার্ৎস ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বেতার সংকেত প্রেরণ করতে সক্ষম হন। জার্মানির কার্লশ্রুতে একটি পরীক্ষাগার ভবনের এক ঘর থেকে আর এক ঘরে তিনি এইরকম 'শক ওয়েভ'-এর মাধ্যমে বেতার সংকেত প্রেরণ করেছিলেন।

1894 সালে তরুণ ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মার্চিজ মার্কনি হার্ৎস-এর পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বার্তা প্রেরণের চেষ্টা করেন। 'কোহারার' নামে একটি যন্ত্রকে তিনি গ্রাহক-যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে বেতার তরঙ্গকে তড়িৎ-প্রবাহে পরিণত করা যেত।

ক্রমশ উন্নত মানের যন্ত্রপাতি তৈরি ক'রে মার্কনি বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ ব্যবস্থাকে উন্নত করে তোলেন। সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য তিনিই প্রথম এরিয়াল বা অ্যান্টেনা ব্যবহার করেন। 1895 সালে তিনি নিজের বাড়ি

'কোহারার' কি জিনিস?

থেকে বাগানে সংকেত প্রেরণ করেন এবং পরে দেড় কিলোমিটারের বেশি দূরে সংকেত প্রেরণ করতে সক্ষম হন। ইটালি সরকার তাঁর গবেষণায় বেশি আগ্রহ না দেখানোয় মার্কিন দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে যান এবং সেখানে প্রায় সাড়ে চোদ্দ কিলোমিটার দূরে বার্তা প্রেরণ করেন। এর পরে মার্কনি বেতারের ইতিহাসে সর্বপ্রথম পেটেন্ট নেন। পরে, 1909 সালে, মূলত এই আবিষ্কারের



রেডিও যেভাবে কাজ করে। মাইক্রোফোন স্বর-তরঙ্গকে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত করে। বেতার কেন্দ্র থেকে বাহক-তরঙ্গের সাহায্যে সেই বিদ্যুৎ সংকেত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাহক যন্ত্র বেতারে সংকেতকে

জন্যই মার্কনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মার্কনির বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি ছিল মর্স কোডের 'ডট' ও 'ড্যাশ' সংকেত ব্যবহার ক'রে, অর্থাৎ, যাকে আমরা টেলিগ্রাফ পদ্ধতি বলে জানি। সেই সময়ে এই পদ্ধতিতে সংকেত প্রেরণকে বলা হত 'মার্কনিগ্রাম'। 1898 সাল থেকে মার্কনি নিজের পদ্ধতিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করা শুরু করেন। প্রথম ব্যবসায়িক মার্কনিগ্রামটি করেছিলেন বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন। তিনি বার্তা পাঠিয়েছিলেন অপর এক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জর্জ স্টোক্‌স্‌-এর কাছে। বার্তা প্রেরণের সময়ে কেলভিনের বয়স ছিল 74 আর স্টোক্‌স্‌-এর 79।

মার্কনির পদ্ধতির ত্রুটি ছিল, তাতে প্রেরিত বেতার-সংকেতের ক্ষমতা কম-বেশি করার উপায় ছিল না। ফলে সেই সংকেত চলার পথে নিজের শক্তি ক্ষয় ক'রে ক্রমশ কমজোরি হয়ে পড়তো এবং শব্দের তরঙ্গের মত তাকে উঁচু গ্রামে বা নীচু গ্রামে খুশিমতো ওঠা-নামা করানো যেত না। বেতার-বিজ্ঞানীরা যখন এই সমস্যার সমাধান খুঁজছেন তখনই বিজ্ঞানের জগতে হাজির হল লী ডি ফরেস্টের

[illegible]

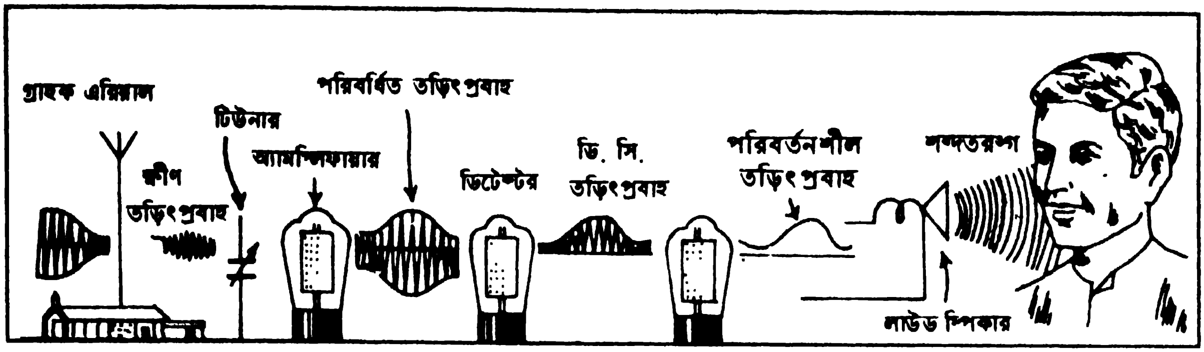
যুগান্তকারী আবিষ্কার 'ট্রায়োড' ভাল্‌ভ্‌। 'ট্রায়োড' কোনো ভোল্টেজ সংকেতকে পরিবর্ধন করতে পারে। আবার প্রয়োজনে—এ. সি. ভোল্টেজকে 'রেক্টিফাই' করে তৈরি করতে পারে ডি. সি. ভোল্টেজ। অতএব 'অ্যামপ্লিফায়ার' ও 'রেক্টিফায়ার' ব্যবহার করে সম্ভব হল খুশিমতো শব্দ সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণ।

মাইক্রোফোনের সামনে কেউ কথা বললে বা গান করলে পরিবর্তী-প্রবাহ বা 'ভ্যারিয়িং কারেন্ট'-এর সৃষ্টি হয়—যা হল, শব্দ-সংকেত অনুযায়ী তৈরি হওয়া বৈদ্যুতিক-সংকেত। অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার ক'রে সেই বৈদ্যুতিক সংকেতকে পরিবর্ধিত করা হয়। তারপরে ভিন্ন কম্পাঙ্কের একটি 'ক্যারিয়ার ওয়েভ' বা বাহক-তরঙ্গ ব্যবহার করে পরিবর্ধিত বৈদ্যুতিক-সংকেতকে 'ট্রান্সমিটিং টাওয়ার' বা প্রেরক-স্তম্ভের অ্যান্টেনার সাহায্যে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ছড়িয়ে দেওয়া এই বেতার-তরঙ্গ রেডিওর এরিয়াল বা অ্যান্টেনায় ধরা পড়ে। তখন খুব ক্ষীণ বৈদ্যুতিক-সংকেত পাওয়া যায়। আবার অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার ক'রে সেই সংকেতকে জোরালো ক'রে তোলা হয়। তারপর তাকে 'রেক্টিফাই' করতে হয়, বাহক-তরঙ্গকে আলাদা ক'রে মূল 'বৈদ্যুতিক-সংকেতটি'কে ছেঁকে নিতে হয়, আর সব শেষে সংকেতটি প্রয়োগ করতে হয় রেডিওর স্পিকারে। তখন হুবহু শোনা যায় মূল কথা বা শব্দ।

[illegible]

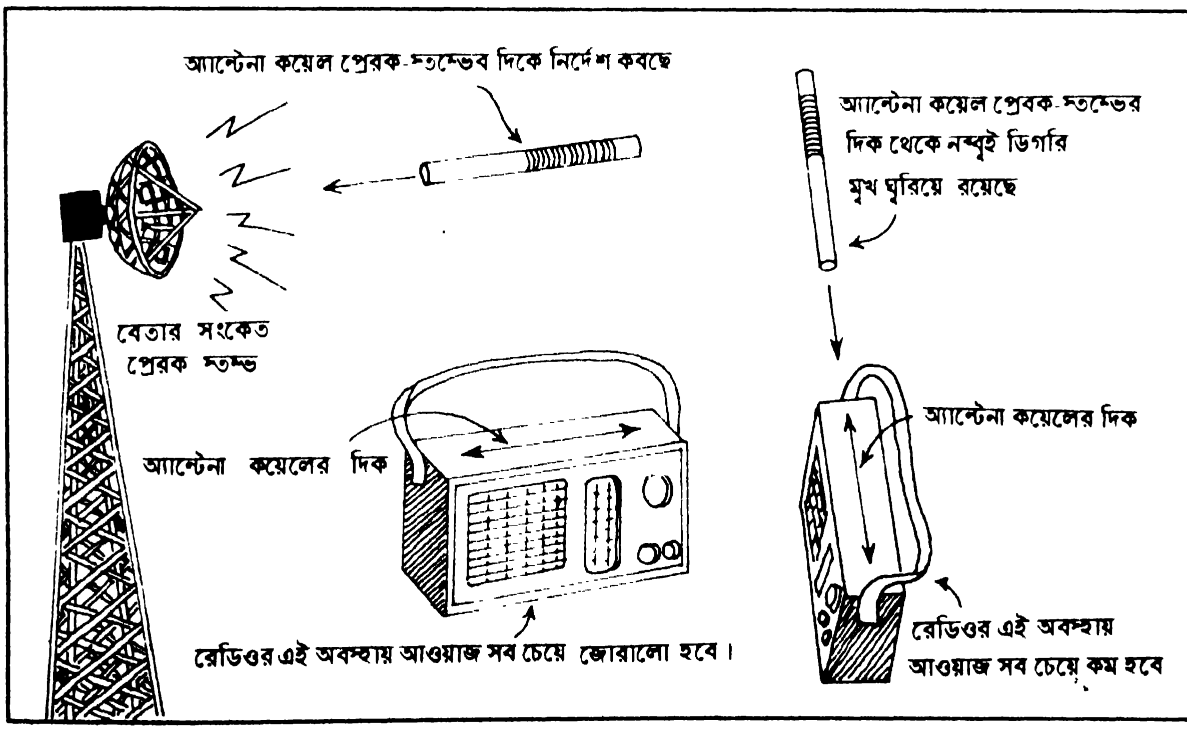
বেতার-সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণের মূল নীতিটুকুই এখানে সংক্ষেপে বলা হল। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারটি যথেষ্ট জটিল। তা ছাড়া আজকের সব রেডিওতে ভাল্‌ভের জায়গাটি ট্রানজিস্টর যুক্তিযুক্তভাবেই দখল করে নিয়েছে।

বেতারের মূল নীতি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে উপহার দিয়েছে রেডার, ওয়াকি-টকি, ট্রান্সমিটার-



পরিবর্ধিত করে, রেক্টিফাই করে এবং বাহক-তরঙ্গ থেকে আলাদা করে নেয়। এই সংকেত লাউডস্পিকারের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে—যা আমরা কানে শুনি। আধুনিক রেডিওতে ভাল্‌ভের জায়গা নিয়েছে অর্ধপরিবাহী ট্রানজিস্টর।

রিসিভার, টেলিটাইপরাইটার, রেডিও-টেলিস্কোপ, টেলিভিশন ইত্যাদি। এ থেকেই বোঝা যায়, বেতার-তরঙ্গ ও ইলেকট্রনিক্স—দু'য়ে মিলে মানব সভ্যতাকে কতখানি এগিয়ে দিয়েছে।



ট্রানজিস্টর রেডিও চালু ক'রে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ধরলে আওয়াজ কম-বেশি হয় কেন?

সাধারণ একটা ধারণা আছে যে, রেডিওকে উত্তর-দক্ষিণে মুখ ক'রে ধরলে আওয়াজ জোরে হয়, আর পুব-পশ্চিম বরাবর রাখলে আওয়াজ কমে যায়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। আসলে রেডিওর আওয়াজের তারতম্য হওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করে, বেতার কেন্দ্রের বেতার সংকেত প্রেরক অ্যান্টেনা কোনদিকে রয়েছে তার ওপর। কলকাতা শহরের ক্ষেত্রে এই প্রেরকস্তম্ভ রয়েছে মোটামুটিভাবে পশ্চিম দিকে। তার ফলেই উত্তর-দক্ষিণ সংক্রান্ত এই ভুল ধারণাটি জোরদার হয়েছে।

প্রেরক-স্তম্ভ থেকে প্রেরণ করা বেতার-সংকেত গ্রহণ করার জন্য রেডিওর ভেতরে গ্রাহক-অ্যান্টেনা থাকে। ট্রানজিস্টর রেডিওর ক্ষেত্রে মূল গ্রাহক-অ্যান্টেনাটি থাকে রেডিওর ভেতরে। রেডিও খুললে এই অ্যান্টেনাটি সহজেই চিনে নেওয়া যাবে। রেডিওর দৈর্ঘ্য বরাবর লম্বা একটি রড থাকে, যাকে বলে ফেরাইট রড। আর তার ওপরে খুব সূক্ষ্ম তার জড়িয়ে একটি লম্বা কয়েল তৈরি করা থাকে। এই কয়েলটি হল অ্যান্টেনা-কয়েল। ফেরাইট রড ও অ্যান্টেনা-কয়েল মিলিয়েই হল রেডিওর মূল অ্যান্টেনা।

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের নীতি অনুযায়ী লম্বা অ্যান্টেনা-কয়েলটি যখন প্রেরক-স্তম্ভের দিক নির্দেশ করবে তখন আবেশ সবচেয়ে বেশি হবে এবং গ্রহণ করা বেতার-সংকেত জোরালো হবে—অর্থাৎ আমরা রেডিও থেকে জোরালো আওয়াজ পাব।

আবার অ্যান্টেনা-কয়েল যখন প্রেরক-স্তম্ভের দিক থেকে নব্বই ডিগ্রী মুখ ঘুরিয়ে থাকবে, তখন আবেশ হবে সবচেয়ে কম—অর্থাৎ রেডিওর জোরালো আওয়াজ কমে যাবে।

> **কলকাতায় রেডিওকে উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে রাখলে আওয়াজ জোরে হয় কেন?**

অ্যান্টেনা-কয়েলের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অবস্থানের জন্যে আবেশ দু'টি চরম মানের মাঝামাঝি মানগুলো গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী আওয়াজেরও সূক্ষ্ম তারতম্য হবে।

কলকাতা শহরের একটা বড় অংশের পরিপ্রেক্ষিতে বেতার-সংকেত প্রেরক-স্তম্ভটি পশ্চিম দিকে থাকায় সেই সব জায়গায় রেডিওকে মোটামুটিভাবে উত্তর-দক্ষিণে ধরলে আওয়াজ জোরে শোনা যায়, (ছবির প্রথম রেডিওটি যে-ভাবে দেখানো হয়েছে) আর পুব-পশ্চিমে ধরলে (ছবিতে দ্বিতীয় রেডিওর অবস্থান) আওয়াজ কমে যায়। তবে শহরের বহু জায়গার ক্ষেত্রেই উত্তর-দক্ষিণ সংক্রান্ত এই ভুল তত্ত্বটি খাটবে না।

শেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ছবিতে রেডিও দু'টিকে যে অবস্থায় দেখানো হয়েছে তার ঠিক বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে ধরলেও (অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রী ঘুরিয়ে ধরলে) আওয়াজ আগের মতই শোনা যাবে। এর কারণ, আওয়াজ কতটা জোরালো হবে তা নির্ভর করে শুধুমাত্র অ্যান্টেনা-কয়েল ও প্রেরক-স্তম্ভের তুলনামূলক অবস্থানের ওপরে। তা-ছাড়া রেডিওর ভলিয়ুম-কন্ট্রোল নবকে একই জায়গায় স্থির রেখে তবেই রেডিও ঘুরিয়ে আওয়াজের তারতম্যের ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে হবে।

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে অনেক সময়ে সমুদ্রে শত্রুপক্ষের জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

টেলিভিশন কে আবিষ্কার করেন?

1926 সালের জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডবাসীরা দূরদর্শনে সরাসরি ছবি দেখতে পান। সর্বসমক্ষে এটাই ছিল টেলিভিশনের প্রথম প্রদর্শন। ঐতিহাসিক এই অনুষ্ঠানের টিভি শিল্পী ছিল একটি কথা-বলা পুতুল। লন্ডনের সোহো অঞ্চলে নিজের পরীক্ষাগারে এই ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন জন লোগি বেয়ার্ড। বলা বাহুল্য, টেলিভিশনের পর্দায় ছবি খুব স্পষ্ট ছিল না, ছবি বারবার কাঁপছিল। কিন্তু তাতেই যথেষ্ট খুশি হয়েছিলেন আবিষ্কারক বেয়ার্ড এবং আমন্ত্রিত দর্শকরা। এর আগে 1925-এর অক্টোবরে, বেয়ার্ডই প্রথম একজন মানুষকে টিভি শিল্পী হিসেবে ব্যবহার করেন। শিল্পী ছিল একজন সাধারণ অফিস-বয়—পনেরো বছরের উইলিয়াম টেনটন। তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে আধ ক্রাউন, অর্থাৎ, সাড়ে বারো পেন্স দেওয়া হয়েছিল।

টেলিভিশনের আবিষ্কারক হিসেবে শুধু জন বেয়ার্ডের নাম বলা কিন্তু ঠিক নয়। বরং বলা যেতে পারে, টেলিভিশনে প্রথম ছবি দেখানোর দুরন্ত প্রতিযোগিতায় বেয়ার্ড প্রথম হয়েছিলেন। প্রথম হওয়ার চেষ্টায় বেয়ার্ড তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তখনকার আধুনিক প্রযুক্তি ছেড়ে

> [illegible]

পুরোনো 'স্ক্যানিং ডিস্ক' প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং ইতিহাসে 'প্রথম' হলেও বেয়ার্ডের টেলিভিশন পদ্ধতি পরবর্তিকালে পুরোপুরি বর্জিত হয়েছে।

টিভি আবিষ্কারের ব্যাপারে জন বেয়ার্ডের নিকটতম

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী চার্লস ফ্রান্সিস জেনকিন্স। 1925 সালে অপরিণত টিভি প্রযুক্তি ব্যবহার ক'রে জেনকিন্স কয়েকটি সিলুয়েট ছবি দেখাতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত তিনি বেয়ার্ডের কাছে হেরে যান।

টেলিভিশন আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটেছিল 1818 সালে। সুইডেনের রসায়নবিদ জন্স জ্যাকব বারজেলিয়াস মৌলিক পদার্থ সিলিনিয়াম আবিষ্কার করলেন। পরে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, সিলিনিয়ামের ওপরে আলো পড়লে তার মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং পতিত আলোর পরিমাণের ওপরে নির্ভর করে তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণ। এই ঘটনাকে বলা হয় 'ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট' বা আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া। আরও পরে, মূলত ফিলিপ লেনার্ড ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণায় আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার তত্ত্ব ও স্বরূপ আবিষ্কৃত হয়।

আলোক-তড়িৎ ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর আলোক-তড়িৎ কোষ ব্যবহার ক'রে 1475 সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জি আর ক্যারি প্রথম মোটা দাগের টেলিভিশন তৈরি করতে চেষ্টা করেন। কোনো বস্তুর ছবি ফোকাস ক'রে সেই আলো আলোক-তড়িৎ কোষগুলোর ওপরে ফেলেন তিনি। তারপর কোষগুলোতে উৎপন্ন তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে অনেকগুলো বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করেন। এই

যে-সব বিজ্ঞানী অল্পের জন্য টেলিভিশন আবিষ্কারের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাঁদের নাম কি?

ভাবে আলোর বিন্দু দিয়ে সেই বস্তুর সীমারেখার মোটামুটি গঠন তৈরি করতে পেরেছিলেন ক্যারি। কিন্তু তাঁর পদ্ধতি এতই জটিল ও অসুবিধেজনক ছিল যে, তা ব্যবহারের যোগ্য বলে মনে করা হয়নি।

1884 সালে পোল্যান্ডের ইঞ্জিনিয়ার পল নিপ্‌কো 'স্ক্যানিং ডিস্ক' বা 'নিপ্‌কো ডিস্ক' আবিষ্কার করেন। তাঁর পদ্ধতিতে আলোক-তড়িৎ কোষ ব্যবহার করা হলেও তা ক্যারির পদ্ধতির তুলনায় অনেক সরল ও বাস্তবসম্মত ছিল।

নিপ্‌কোর পদ্ধতিতে দুটি 'স্ক্যানিং ডিস্ক' ব্যবহার করা হয়েছিল। 1906 সালে জনৈক রুশ গবেষক বোরিস রোজিং একটি 'স্ক্যানিং ডিস্ক' ব্যবহার ক'রে টেলিভিশন তৈরির চেষ্টা শুরু করেন। 1911 সালে পৃথিবীর প্রথম কার্যকরী টেলিভিশন তৈরি করেন রোজিং। তাঁর পদ্ধতিতেই প্রথম ইলেকট্রনিক চিত্র-গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রথম ইলেকট্রনিক টেলিভিশন ক্যামেরা তৈরি করেছিলেন রোজিং-এর ছাত্র ভ্লাদিমির জোরিকিন। 1923

রঙিন টেলিভিশন প্রথম দেখানো হয় কোন বছরে?

সালে আবিষ্কৃত এই ক্যামেরার তিনি নাম দিয়েছিলেন 'ইকনোস্কোপ'। 1925 সালে রঙিন টেলিভিশনের প্রথম পেটেন্ট নিলেও জোরিকিনের গবেষণা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

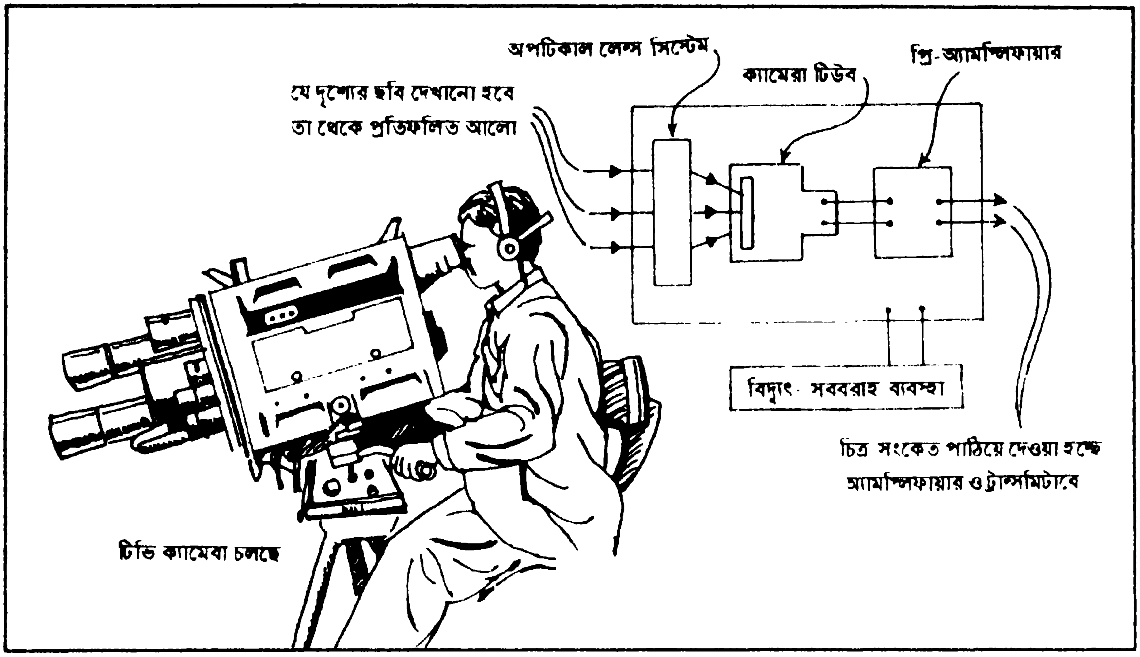
জোরিকিন ও জেনকিন্সকে পিছনে ফেলে 1926 সালে বেয়ার্ড পৃথিবীকে টেলিভিশন উপহার দিলেন। টিভি ক্যামেরা ও চিত্র- গ্রাহক যন্ত্রে দুটি 'নিপ্‌কো ডিস্ক' ব্যবহার করেছিলেন বেয়ার্ড। এ-ছাড়া ব্যবহার করেছিলেন আলোক-তড়িৎ কোষ, ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি।

এর পরে 1928 সালে বেয়ার্ড টেলিভিশনে প্রথম রঙিন ছবি দেখান এবং 1930 সালের জুলাই মাসে বেয়ার্ড তাঁর টেলিভিশন স্টুডিও থেকে বি বি সি প্রযোজিত একটি নাটক টেলিভিশনে প্রচার করেন। এটিই ছিল টেলিভিশনে দেখানো পৃথিবীর প্রথম নাটক। আধ ঘণ্টার এই নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন তিনজন।

এরপরে ইলেকট্রনিক্সের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে টেলিভিশন প্রযুক্তি ক্রমেই উন্নত হয়েছে। এখন মাপে ছোট হতে হতে টিভি একেবারে হাতঘড়ির ডায়ালে জায়গা ক'রে নিয়েছে।

আধুনিক টেলিভিশন কেমন ক'রে কাজ করে?

আধুনিক টেলিভিশন প্রযুক্তিতে টেলিভিশন ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। যে-দৃশ্যের ছবি টেলিভিশনের মাধ্যমে



টিভি ক্যামেবাব বিভিন্ন অংশ

দেখানো হবে, ক্যামেরা সে-দিকে তাক করলেই দৃশ্য থেকে প্রতিফলিত আলো ক্যামেরায় এসে পড়ে। সেই আলোকরশ্মি থেকে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক-সংকেত বা 'ইলেকট্রিক সিগনাল' তৈরি হয় টিভি ক্যামেরার ভেতরে। তারপর ক্যামেরায় পাওয়া বৈদ্যুতিক-সংকেতকে নানা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয় 'ভিশন ট্রান্সমিটার' বা দৃশ্য প্রেরক-যন্ত্রে। সেখান থেকে চিত্র সংকেত বা 'ভিডিও সিগনাল'-কে বেতার-তরঙ্গেব আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রেডিওর মত এ-ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় প্রেরকস্তম্ভ এবং অ্যান্টেনা। একটি 30 মিটার উঁচু অ্যান্টেনা প্রায় 20 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত চিত্র-সংকেতের বেতার-তরঙ্গ পৌঁছে দিতে পারে।

টিভি ক্যামেরায় যখন চিত্র-সংকেত প্রেরণের কাজ করা হয়, তখন পাশাপাশি মাইক্রোফোনের সাহায্যে শব্দগ্রহণ করা হয়। তারপর অনেকটা রেডিওর নীতি অনুসরণ ক'রে শব্দ-সংকেতকে বেতার-তরঙ্গের আকারে প্রেরণ করা হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, চিত্র-সংকেত ও শব্দ-সংকেত যেন সমলয়ে থাকে। তা না হলে টেলিভিশনে ছবি দেখার সময়ে ছবির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠিক কথাগুলো শোনা যাবে না।

চিত্র ও শব্দ-সংকেতের বেতার-তরঙ্গ দু'টির কম্পাঙ্ক ভিন্ন হয়। ফলে একই সঙ্গে প্রেরিত হলেও প্রয়োজন মত সংকেত দু'টিকে আলাদা ক'রে নেওয়া যায়। সংকেত-গ্রাহক যন্ত্রে, অর্থাৎ বাড়ির টেলিভিশন সেট-এ ঠিক এই কাজটিই করা হয়। টেলিভিশনের অ্যান্টেনা চিত্র ও শব্দের বেতার-সংকেত গ্রহণ ক'রে পাঠিয়ে দেয় টেলিভিশনের ভেতরে। সেখানে সংকেত দু'টিকে ইলেকট্রনিক 'ছাঁকনি'র সাহায্যে আলাদা ক'রে নেওয়া হয়। তারপর শব্দ-সংকেত চলে যায় অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি হয়ে স্পিকারে। আর চিত্র-সংকেত তার তীব্রতা অনুযায়ী ইলেকট্রনের স্রোত পাঠিয়ে দেয় টিভির পর্দায়। টিভির ভেতরেই ইলেকট্রন-স্রোত উৎপন্ন করার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার প্রধান অংশ হল 'ইলেকট্রন-গান' বা 'ইলেকট্রন-বন্দুক'।

টিভির পর্দায় 'ফসফর' জাতীয় প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ থাকে। ফলে ইলেকট্রন-স্রোত পর্দায় আছড়ে পড়লেই সেখানে উজ্জ্বল আলোক-বিন্দুর সৃষ্টি হয়। এ-রকম অসংখ্য বিন্দু থেকেই চিত্র-সংকেত অনুযায়ী কোনো ছবি ফুটে ওঠে টিভির পর্দায়। আর স্পিকার থেকে পাশাপাশি আমরা শব্দও শুনতে পাই।

টিভি ক্যামেরায় কি ফিল্ম থাকে?

সাধারণ ক্যামেরায় ফিল্ম থাকে আমরা জানি। টেলিভিশনে ছবি দেখাতে গেলেও টিভি ক্যামেরার প্রয়োজন হয়। কিন্তু টিভি ক্যামেরায় কি সাধারণ ক্যামেরার মত ফিল্ম থাকে?

না, টিভি ক্যামেরায় ফিল্ম থাকে না।

টিভি ক্যামেরার কয়েকটি অংশ আছে। ক্যামেরার প্রথমেই যে-অংশটি থাকে সেটি হল 'অপটিক্যাল লেন্স সিস্টেম'। এর মধ্যে কতকগুলো সূক্ষ্ম ও নিঁখুত লেন্সের সমষ্টি থাকে। ক্যামেরায় যে-দৃশ্যের ছবি 'ধরা' হবে তা থেকে প্রতিফলিত আলো এই লেন্স সমষ্টির ওপরে এসে পড়ে। লেন্স সমষ্টি সেই আলো যথাযথভাবে ফোকাস করে ফেলে দ্বিতীয় অংশ 'ক্যামেরা টিউব'-এর ওপরে। ক্যামেরা টিউবই হল টিভি ক্যামেরার প্রাণ। কারণ যে-আলোক-রশ্মি তার ওপরে এসে পড়ে তা থেকে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক-সংকেত তৈরি করে ক্যামেরা টিউব। ক্যামেরা টিউব নানা রকমের হয়। যেমন, ইকনোস্কোপ, ইমেজ ডিসেক্টর, এমিট্রন, প্লাম্বিকন, ভিডিকন, অর্থিকন ইত্যাদি। ক্যামেরা টিউবে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক সংকেত 'ইনপুট' হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় টিভি ক্যামেরার শেষ অংশ 'প্রি-অ্যামপ্লিফায়ার'-এ। প্রি-অ্যামপ্লিফায়ার এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার। প্রি-অ্যামপ্লিফায়ার থেকে যে-বৈদ্যুতিক-সংকেত পাওয়া যায় তাকে আরো জোরালো ও নিঁখুত করার জন্যে নানা অ্যামপ্লিফায়ার ও নিয়ন্ত্রণ-বর্তনীর মধ্যে দিয়ে চিত্র-প্রেরক যন্ত্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

টিভি ক্যামেরার ক্যামেরা-টিউব ও প্রি-অ্যামপ্লিফায়ারকে কাজ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে।

খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করলে টিভির ছবিতে সরু সরু রেখা দেখা যায় কেন?

মোটামুটি দূর থেকে দেখলে টিভির ছবি ঠিকঠাক দেখা যায় বটে, তবে কাছ থেকে দেখলে অসংখ্য সমান্তরাল সরু সরু রেখা চোখে পড়ে। এই রকম সমান্তরাল রেখা সৃষ্টির জন্য দায়ী ইলেকট্রন-বন্দুক।

টেলিভিশনে মূলত কোনো স্থির ছবিকে পুনর্গঠন করা হয়। অনেকগুলো ছবিকে পর পর খুব দ্রুত দেখানোর ফলে মনে হয় যে, চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ ছবির পাত্র-পাত্রীরা চলেফিরে বেড়াচ্ছে। এই চলচ্চিত্রের প্রত্যেকটি স্থির ছবি ছোট ছোট আলোকিত ও ছায়াবৃত অংশের সমষ্টি।

সাদা-কালোয় ছাপা যে কোনো ছবিকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে ছোট ছোট সাদা এবং কালো ফুটকি দেখা যাবে। সাদা কাগজের ওপরে যদি ছবিটি ছাপা হয়, তাহলে শুধু মাত্র কালো ফুটকির ঘনত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়েই প্রয়োজন মত হালকা ছাই রঙ বা ঘন কালো রঙ ফুটিয়ে তোলা যায়।

ছোট ছোট অংশ দিয়ে গোটা ছবি তৈরি করার এই নীতি রঙিন ছবির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। সেখানেও একাধিক



সমান্তরাল রেখা দিয়ে তৈরি একটি মুখের ছবি

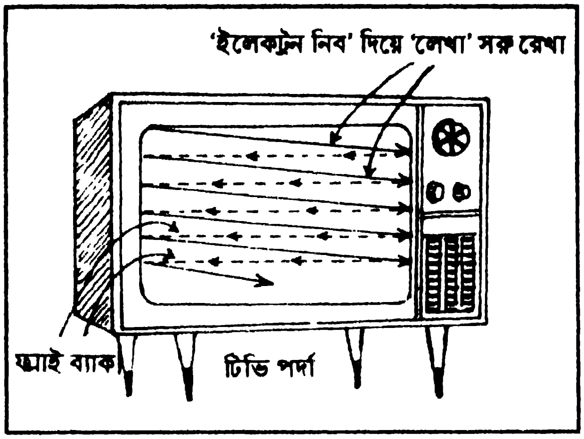
রঙের ফুটকি নানা অনুপাতে মিলে-মিশে রঙিন ছবি তৈরি করে।

কোনো ছবির প্রত্যেকটি ছোট আলোকিত বা অন্ধকার অংশকে বলা হয় 'পিকচার এলিমেন্ট'। সংক্ষেপে যার নাম 'পিক্সেল' বা 'পেল্'। অসংখ্য পিক্সেল একজোট হয়ে তৈরি হয় সম্পূর্ণ একটি ফটোগ্রাফ।

টেলিভিশনে ছবি তৈরি হওয়ার নীতি ঠিক ফটোগ্রাফের মত নয়। সেখানে ফুটকির বদলে থাকে সমান্তরাল সরু রেখা। টিভির গোটা পর্দা জুড়ে এ-রকম অগুনতি সরু সরু রেখা দেখা যায়। চিত্র-সংকেত অনুযায়ী রেখাগুলো জায়গায় জায়গায় সাদা বা কালো হয়ে গিয়ে সবাই মিলে গোটা ছবিটি তৈরি করে। ছাপা ছবির ফুটকির মত এখানে রেখার সংখ্যার ঘনত্বের কোনো হেরফের হয় না। রেখাগুলো খুব সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে একটু দূর থেকে টিভির ছবি দেখলে

সেগুলো আর আলাদা করে আমাদের চোখে পড়ে না—অনেকটা ফটোগ্রাফের সূক্ষ্ম পিক্সেল-এর মত।

ফটোর বেলায় গোটা ছবিটা একই সঙ্গে ফিল্মের ওপরে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সব ক'টি পিক্সেল-ই এক সঙ্গে তৈরি হয়। কিন্তু টেলিভিশনের ছবির ক্ষেত্রে ঘটনাটা অন্যরকম। সেখানে ইলেকট্রন-বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের স্রোত কলমের নিবের মত আঁচড় টেনে চলে টিভির পর্দার ওপরে। পর্দার যেখানেই ইলেকট্রন এসে আঘাত করে সেখানেই জ্বলে ওঠে উজ্জ্বল আলো। যেমন করে আমরা সাদা কাগজে কলম দিয়ে লিখি, ঠিক সে-ভাবে 'ইলেকট্রনের নিব' বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরু সরু আলোর দাগ টেনে চলে পর্দার ওপরে। এই কাজটিকে পরিভাষায় বলা হয় 'স্ক্যানিং'। একই ধরনের স্ক্যানিং চলে টিভি ক্যামেরার ক্যামেরা-টিউবে। এর ফলে যে কোনো ছবিকে ছোট ছোট আলো-ছায়ার অংশে বা পিকচার-এলিমেন্টে ভাগ ক'রে নেওয়া যায়। টেলিভিশন সেট-এ সেই পিকচার-এলিমেন্টগুলোকেই ইলেকট্রনের রেখা দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়। স্ক্যানিংয়ের সময়ে ইলেকট্রনের স্রোত যখন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এক একটি রেখা টানে, তখন সেই রেখার ওপরে যে ক'টি পিকচার-এলিমেন্ট থাকে তার সব কটিকেই সে ছুঁয়ে যায়। একটি রেখা টানা হয়ে গেলে



তখনই আমরা দেখতে পাব পুনর্গঠিত ছবি। অর্থাৎ পর্দায় দেখতে পাওয়া সরু রেখাগুলোই প্রকৃতপক্ষে টেলিভিশনের ছবি তৈরি করে।

পিকচার-এলিমেন্টের সংখ্যা যত বেশি হবে, পুনর্গঠিত ছবি ততই নিখুঁত হবে। সেই কারণেই টেলিভিশনের 'স্ক্যানিং লাইন'-এর সংখ্যা (অর্থাৎ ওই সরু রেখাগুলোর সংখ্যা) যথেষ্ট বেশি রাখা হয়। সাধারণত এই সংখ্যাটি হয় 525 কিংবা 625। অর্থাৎ টিভির পর্দার কাছে দাঁড়িয়ে সরু রেখাগুলি যদি গুনে ফেলা সম্ভব হয় তাহলে এই সংখ্যা দু'টির একটি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সুতরাং একটি স্থির চিত্র পর্দায় আঁকতে গেলে 'ইলেকট্রন-নিব'কে অন্তত 525টি রেখা টানতে হবে। মনে হতে পারে, এতগুলো রেখা যখন টানা হয় তখন আমরা বুঝতে পারি না কেন? এর কারণ, 'ইলেকট্রন-নিব' কাজ করে খুব তাড়াতাড়ি। 525টি রেখা টানতে তার সময় লাগে মাত্র 1/30 সেকেন্ড। অর্থাৎ এক সেকেন্ডে সে 30টি ছবি দর্শকের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারে। 'ইলেকট্রন-নিব'-এর তৈরি করা 525 লাইনের এক একটি ছবিকে বলা হয় 'ফ্রেম'। এক সেকেন্ডে 30টি 'ফ্রেম' দেখানো হয় বলেই টিভিতে চলচ্চিত্র দেখতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। আর এই 30টি ফ্রেমের সবক'টি সরু রেখার দৈর্ঘ্য যোগ করলে হয় প্রায় সাড়ে ছ' কিলোমিটার। সুতরাং 'ইলেকট্রন-নিব'-এর রেখা আঁকার গতিবেগ এক সেকেন্ডে প্রায় সাড়ে ছ' কিলোমিটার।

রঙিন টিভির বেলাতেও স্ক্যানিংয়ের একই নিয়ম-নীতি

'পিক্সেল' কাকে বলে?

'ফ্লাইব্যাক' কাকে বলে?

ইলেকট্রন-বন্দুক 'ইলেকট্রন-নিব'টিকে ডান প্রান্ত থেকে তুলে নিয়ে যায় বাঁ প্রান্তে। তারপর প্রথম রেখার সামান্য নীচ থেকে আবার টানতে শুরু করে নতুন রেখা—ঠিক কাগজে দ্বিতীয় লাইন লেখার মত। এক একটি রেখা টানা হয়ে গেলে 'নিব'কে বাঁ দিকে খুব দ্রুত ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এই কাজটিকে বলা হয় 'রিট্রেস' বা 'ফ্লাইব্যাক'। কোনো একটি স্থির ছবিকে টিভিতে দেখাতে হলে তাকে এইরকমভাবে সরু রেখা দিয়ে স্ক্যান করতে হবে। তারপর টেলিভিশনের পর্দায় সেই ছবিটিকে পুনর্গঠন করতে গেলে ছবি থেকে পাওয়া চিত্রসংকেত অনুযায়ী ইলেকট্রন-বন্দুকের ইলেকট্রনের সংখ্যাকে কম-বেশি করতে হবে। ফলে পর্দায় ইলেকট্রনের 'নিব' যে-রেখাগুলো আঁকবে তাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হবে। 'নিব' দিয়ে সব কটি সরু রেখা যখন টানা হয়ে যাবে,

মেনে চলা হয়। আর সেখানেও থাকে ছবি তৈরির চাবিকাঠি সরু সরু সমান্তরাল রেখা।

টিভির পর্দার আকার আয়তক্ষেত্রের মত কেন?

টিভির পর্দার প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 4/3 বা 1.333। এই অনুপাতটিকে বলা হয় 'অ্যাসপেক্ট রেশিও'। সাধারণ চলচ্চিত্রের জন্যেও সিনেমার পর্দার মাপে একই 'অ্যাসপেক্ট রেশিও' ব্যবহার করা হয়। পর্দার প্রস্থ উচ্চতার চেয়ে 4/3 গুণ বেশি রাখা হয় কারণ তাতে পর্দায় প্রতিবিম্বিত ছবিতে গতি ভালভাবে দেখানো যায়। ছবিতে বিভিন্ন যে সব গতি দেখানো হয় তার বেশিরভাগই অনুভূমিক বা আড়াআড়ি দিক বরাবর। ফলে সে-দিকে পর্দা বড় রাখা হলে দর্শক ছবি দেখে বাস্তবের গতির মত স্বাভাবিক স্বাদ পাবে।

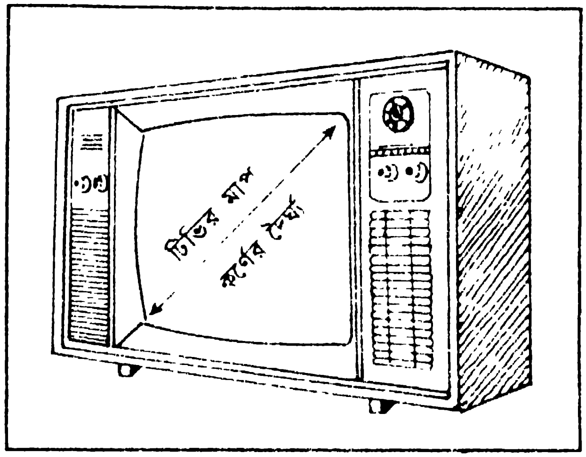
'অ্যাসপেক্ট রেশিও' কাকে বলে?

টিভির পর্দা ছোট-বড় যাই করা হোক না কেন, 'অ্যাসপেক্ট রেশিও'টি ঠিক রাখতে হবে। তা ছাড়া টেলিভিশন ক্যামেরাও এই 'অ্যাসপেক্ট রেশিও' মেনে ছবি পাঠায়। সুতরাং 'অ্যাসপেক্ট রেশিও' ঠিক না রাখলে ছবির কোনো মানুষকে বেশি রোগা কিংবা মোটা দেখাবে।

'অ্যাসপেক্ট রেশিও'-র মান 1-এর চেয়ে বেশি রাখলেই স্বাভাবিক গতি দেখানোর শর্ত পূরণ হয় বটে, তবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে 1.333 অনুপাতটিই আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে আরামপ্রদ।

টিভি কত বড় বোঝাতে যে সংখ্যাটি বলা হয় সেটা টিভির কোন অংশের মাপ?

চোদ্দ ইঞ্চি আর কুড়ি ইঞ্চি টিভি সেটের কথা আজকাল সকলের মুখে মুখে। কিন্তু এই চোদ্দ বা কুড়ি ইঞ্চি দৈর্ঘ্যটি টিভির কোন অংশের মাপ সে-কথা সকলে কি জানে? এটা হল টিভি পর্দার কোনাকুনি মাপ। টিভির পর্দাকে যদি একটা আয়তক্ষেত্র বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তার কর্ণ বা ডায়াগনালের দৈর্ঘ্যই টিভির মাপ নির্দেশ করে।



টিভির পর্দার কাচ বাঁকানো থাকে কেন?

টিভির পর্দায় ছবি তৈরি করে ইলেকট্রনের তীব্র স্রোত। ইলেকট্রন-বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনকে অনেকটা আলোক রশ্মির মতই ফোকাস ক'রে ফেলা হয় টিভির পর্দায়। যদি 'স্ক্যানিং' বন্ধ থাকতো তাহলে পর্দায় আমরা তখন দেখতে পেতাম একটি মাত্র আলোক-বিন্দু। টিভি অফ করলে অনেক সময়ে এই বিন্দুটি দেখা যায়। কিন্তু টিভি অন করলেই 'স্ক্যানিং'-এর জন্য ইলেকট্রনের ফোকাস করা বিন্দুটি পর্দার ওপরে সরু সরু রেখা টানতে শুরু করে—যে রেখা তৈরি করে বিভিন্ন দৃশ্যের পুনর্গঠিত ছবি।

ইলেকট্রন-বন্দুকের ভেতরে এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে টিভির পর্দার যে কোনো জায়গায় ইলেকট্রনের স্রোতকে ফোকাস ক'রে একটি বিন্দুর সৃষ্টি করা যায়। এই বিন্দুটিই যেন 'ইলেকট্রন-নিব'-এর ডগা। সুতরাং পর্দার যে কোনো জায়গায় এ-ধরনের ফোকাস করতে গেলে ইলেকট্রন-বন্দুকের একটি বিশেষ বিন্দু থেকে টিভির পর্দার প্রতিটি বিন্দু সমান দূরত্বে থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ পর্দার কাচটি গোলীয় তল হওয়া উচিত। পর্দা গোলীয় তলবিশিষ্ট না হলে ইলেকট্রনের স্রোতকে পর্দায় সঠিকভাবে ফোকাস করা যাবে না। ফলে টিভির ছবি বিকৃত দেখাবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া পর্দার কাচ বাঁকানো হওয়ার দ্বিতীয় আর একটি কারণও আছে। সেটা হল, বায়ুচাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। পর্দার পিছনটা অর্থাৎ পিকচার টিউবের ভেতরটা বায়ুশূন্য করা থাকে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের বায়ু বাইরে থেকে পর্দার কাচের ওপরে চাপ দেয়। এই চাপের ফলে পর্দা সহজে ভেঙে গিয়ে টিভি নষ্ট হতে পারে।

সমতল কোনো কাচের চেয়ে গোলীয় তলবিশিষ্ট কাচের চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। তাই পর্দার কাচ বাঁকানো হওয়ার ফলে তার চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। একই কারণে পর্দার চারটে কোনাও ভেতর দিকে সামান্য বাঁকানো থাকে। উপরন্তু এক বিশেষ ধরনের পুরু কাচ দিয়ে টিভির পর্দা তৈরি করা হয়। আবার কোনো কোনো সময়ে ইস্পাতের ফিতে দিয়ে পর্দাকে পরিধি বরাবর ঘিরে বেঁধে নিরাপদ করা হয়। তাতে পর্দা ফেটে গেলেও ফিতের বাঁধনে জায়গা মত এঁটে বসে থাকে। সব শেষে একটা কথা ঃ কোনো কারণে যদি টিভির পর্দার কাচ ভেঙে যায়, তাহলে কাচের ভাঙা টুকরোগুলো বাইরে পড়ার চেয়ে ভেতরে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। এর কারণ, পিকচার টিউবের ভেতরটা বায়ুশূন্য থাকায় বাইরের বাতাসের চাপ ভাঙা কাচের টুকরোগুলোকে ভেতর দিকে ঠেলে দেয়। পরিভাষায় এই ঘটনাকে 'ইম্‌প্লোশন' বলে।

কত দূরে বসে টিভি দেখা উচিত?

প্রায়ই আমরা অভিজ্ঞদের পরামর্শ শুনতে পাই, খুব কাছ থেকে টিভি দেখা উচিত নয়। তাহলে ঠিক কতটা দূরে বসে টিভি দেখা উচিত? সাধারণত পর্দায় ছবির যা উচ্চতা তার প্রায় 4 থেকে 8 গুণ দূরে বসে টিভি দেখা উচিত। অর্থাৎ কুড়ি ইঞ্চি টিভির ক্ষেত্রে এই দূরত্ব হবে 4 থেকে 8 ফুট (বা সোয়া মিটার থেকে আড়াই মিটার)। কিন্তু দূরে বসে টিভি দেখার পিছনে কি বৈজ্ঞানিক কোনো যুক্তি আছে? হ্যাঁ, আছে। দূরে বসে টিভি দেখলে দু'টো সুবিধে পাওয়া যায়। প্রথমত স্ক্যানিংয়ের সরু সরু রেখাগুলো আলাদাভাবে দর্শকের চোখে পড়ে না। ফলে ছবি অনেক মোলায়েম বলে মনে হয়। আর দ্বিতীয় সুবিধেটা হল, পর্দা থেকে নির্গত ক্ষতিকর এক্স-রশ্মি থেকে দর্শকের চোখ রক্ষা পায়। এই অতিরিক্ত নিরাপত্তার কথা ভেবেই টিভির পর্দার ওপরে সাধারণত স্বচ্ছ ফিলটার ব্যবহার করা হয়।

টিভি পর্দার ওপরে ফিলটার লাগানো হয় কেন?

দুটি সংকেতই হাওয়ায় ভেসে আসা বেতার-তরঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও টিভির শব্দ রেডিওতে বা রেডিওর শব্দ টিভিতে শোনা যায় না কেন?

টিভি বা রেডিওতে যে-শব্দ আমরা শুনি সেই শব্দ-সংকেত বেতার-তরঙ্গের আকারে প্রেরক-স্তম্ভ থেকে প্রেরণ করা হয়।

এ-ধরনের যে কোনো তরঙ্গেরই একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক-সীমা আছে। এক সেকেন্ডে তরঙ্গ যতবার ওঠা-নামা করে তাকে বলা হয় সেই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক। টেলিভিশনের চিত্র ও শব্দ-সংকেত যে-বাহক তরঙ্গের মাধ্যমে পাঠানো হয় তার কম্পাঙ্ক প্রায় 54 থেকে 890 মেগাহার্জ-এর মধ্যে থাকে। কোনো তরঙ্গ এক সেকেন্ডে 10 লক্ষ বার ওঠা-নামা করলে তার কম্পাঙ্ক হয় 1 মেগাহার্জ; আর সেকেন্ডে 1 বার ওঠানামা করলে তার কম্পাঙ্ক হয় 1 হার্জ। সুতরাং টেলিভিশনের সংকেত আসে খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে।

'এফ এম রেডিও' কাকে বলে?

কিন্তু রেডিও প্রচারে যে-বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তার কম্পাঙ্ক-সীমার মান তুলনায় অনেক কম ঃ প্রায় 535 থেকে 1605 কিলোহার্জের মধ্যে। সেকেন্ডে 1000 বার ওঠানামা করলে কোনো বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 1 কিলোহার্জ হয়। সুতরাং রেডিও ও টেলিভিশনের শব্দ-সংকেত দু'টির মধ্যে কম্পাঙ্কের ব্যবধান অনেক। রেডিওর অ্যান্টেনা ও ইলেকট্রনিক বর্তনী কম কম্পাঙ্কের তরঙ্গ গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত, আর টিভির অ্যান্টেনা ও বর্তনী উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গের কথা মনে রেখেই তৈরি। সেই কারণেই এরা একের শব্দ অপরে ধরতে পারে না। যদি কম্পাঙ্কগুলো খুব কাছাকাছি হত তাহলে একটি যন্ত্রের শব্দ অন্য যন্ত্রে ধরা পড়তো।

অবশ্য বিশেষ ধরনের রেডিও তৈরি ক'রে তাতে টিভির শব্দ ধরা সম্ভব। এই ধরনের রেডিওকে 'এফ-এম রেডিও' বলে।

সাদা-কালো টিভিকে কি রঙিন টিভিতে পরিণত করা সম্ভব?

রঙিন টিভি বাজারে চালু হওয়ার আগে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতো ঃ সাদা-কালো টিভিকে কি রঙিন টিভিতে পরিণত করা সম্ভব? কিন্তু না, তা সম্ভব নয়।

তার কারণ, সাদা-কালো টিভিতে একটি ইলেকট্রন-বন্দুক পর্দায় ইলেকট্রনের 'নিব' দিয়ে ছবি আঁকে, আর রঙিন টিভিতে থাকে তিন-তিনটি ইলেকট্রন-বন্দুক। বেতার-তরঙ্গের আকারে তিনটি চিত্র-সংকেত একই সঙ্গে রঙিন টিভিতে এসে পৌঁছয়। সেই সংকেত অনুযায়ী তিনটি ইলেকট্রন-বন্দুক পর্দা লক্ষ্য ক'রে ইলেকট্রনের স্রোত পাঠায়। তা ছাড়া রঙিন টিভির পর্দায় এক বিশেষ ধরনের প্রতিপ্রভ আস্তরণ থাকে যা সাদা-কালো টিভির পর্দার থেকে আলাদা। এই পর্দাকে বলা হয় 'ফসফর ডট প্লেট'। প্রতিটি ইলেকট্রন-বন্দুক পর্দার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ইলেকট্রনের স্রোত পাঠায়। অর্থাৎ পর্দার যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে দু'টো ইলেকট্রন-বন্দুকের ইলেকট্রন এসে আঘাত করতে পারে না। ফলে প্রতিটি ইলেকট্রন-বন্দুকের 'স্ক্যানিং'-এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙ ফুটে ওঠে পর্দায়। সেই রঙিন বিন্দুগুলো মিলেমিশে তবেই সম্পূর্ণ রঙিন ছবি তৈরি হয়।

এ-থেকেই বোঝা যায় রঙিন টিভির কারিগরি সাদা-কালো টিভির চেয়ে অনেক জটিল এবং সাদা-কালো টিভিকে কখনোই রঙিন টিভি করা যাবে না।

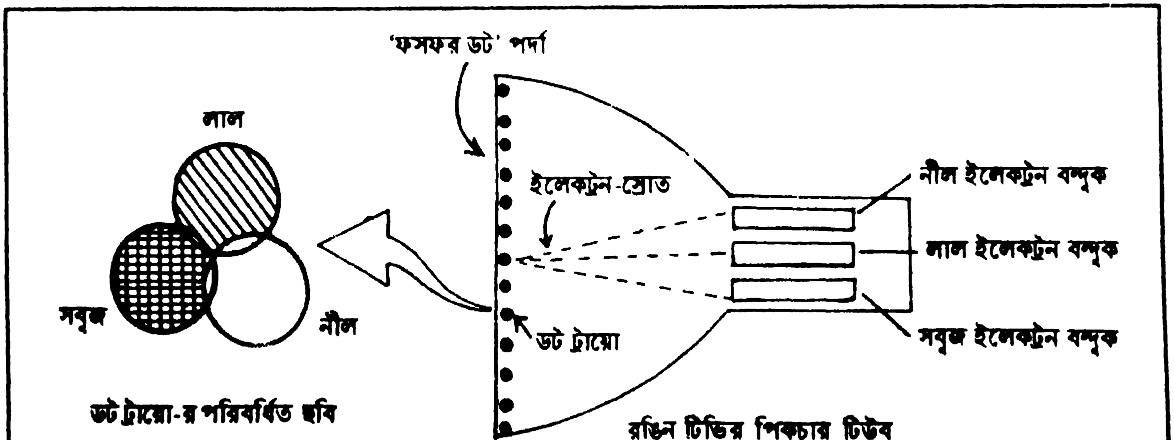
রঙিন টিভিতে বহুরকম রঙ তৈরি হয় কেমন করে?

বর্ণবিজ্ঞানে এটা প্রমাণিত যে, মাত্র তিনটি রঙ মিশিয়েই সবরকম রঙ তৈরি করা সম্ভব। রঙগুলো হল ঃ লাল, নীল ও সবুজ। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এগুলোকে 'প্রাথমিক রঙ' বা 'প্রাইমারি কালার' বলা হয়। তিনটি প্রাথমিক রঙকে সমানভাবে মেশালে পাওয়া যায় সাদা রঙ। লাল ও সবুজ মেশালে তৈরি হয় হলুদ রঙ। সবুজ ও নীল মেশালে পাওয়া যায় এক ধরনের সবুজাভ নীল রঙ যার নাম 'সায়ান'। আর নীল ও লাল মেশালে হয় ম্যাজেন্টা।

'ডট ট্রায়ো' কাকে বলে?

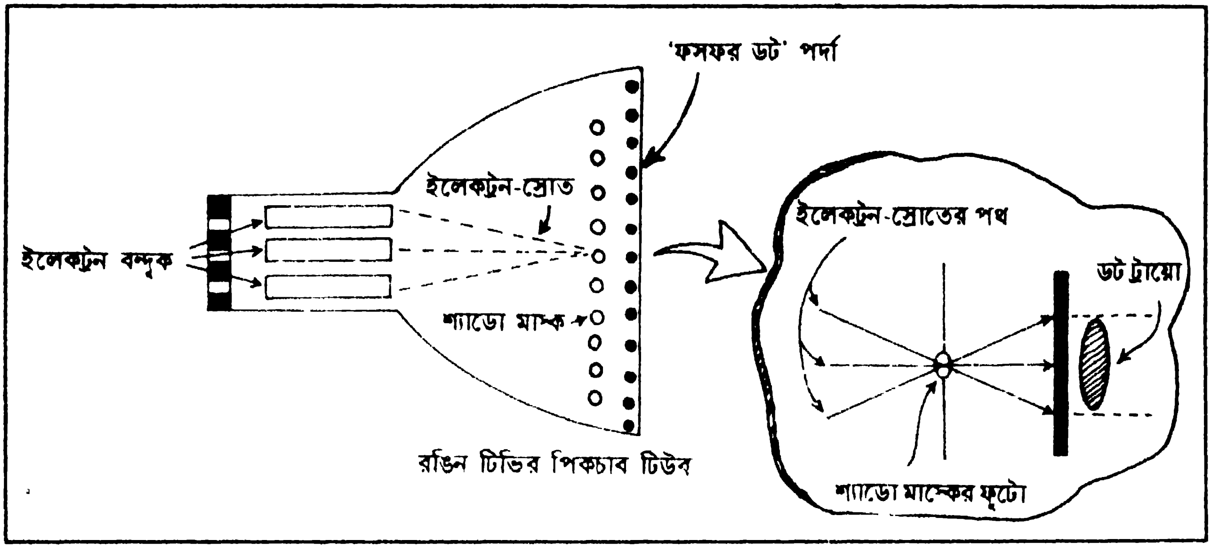
রঙিন টিভি ক্যামেরা যে-কোনো রঙিন ছবিকে লাল, নীল ও সবুজ—তিনটি বিভিন্ন রঙের ছবিতে ভেঙে নেয়। তারপর তিনটি চিত্র-সংকেত তৈরি ক'রে সেই সম্মিলিত সংকেত প্রেরক-স্তম্ভের সাহায্যে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। চিত্র-সংকেতের বেতার-তরঙ্গ রঙিন টিভির অ্যান্টেনা গ্রহণ ক'রে পাঠিয়ে দেয় টিভির ভেতরে। সেখানে সংকেত অনুযায়ী তিনটি ইলেকট্রন-বন্দুক সচল হয়ে ওঠে। এক একটি ইলেকট্রন-বন্দুক পর্দায় এক একটি রঙ সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে। তাই তাদের লাল ইলেকট্রন-বন্দুক, নীল ইলেকট্রন-বন্দুক ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। রঙিন টিভির পর্দায় যে-ফসফর আস্তরণ থাকে তা বিশেষভাবে তৈরি। এর প্রতিটি ফসফর বিন্দুতে তিনরকম ফসফর পদার্থ থাকে। ইলেকট্রন এসে আঘাত করলে একটি ফসফর পদার্থ লাল রঙ দেখায়, দ্বিতীয়টি দেখায় নীল এবং তৃতীয়টি দেয় সবুজ রঙ। এই কারণেই রঙিন টিভির পর্দার এক একটি ফসফর বিন্দুকে 'ডট ট্রায়ো' বলা হয়।

'ড্রট ট্রায়ো' তে সাধারণত যে-তিনটি পদার্থ থাকে তা হল জিংক সিলিকেট (সবুজ রঙের জন্য), ইউরোপিয়াম বা



ডট ট্রায়ো-র পরিবর্ধিত ছবি

রঙিন টিভির পিকচার টিউব



ইট্রিয়াম (লাল রঙের জন্য) এবং জিংক সালফাইড (নীল রঙের জন্য)।

তিনটি ইলেকট্রন-বন্দুক 'স্ক্যানিং' ক'রে পর্দায় তিনটি ছবি ফুটিয়ে তোলে—লাল, নীল ও সবুজ। কিন্তু একইসঙ্গে ঘটনাটি ঘটে বলে আমরা তিনটি ছবির মিলিত রূপ পর্দায় দেখতে পাই—যার মধ্যে বহুরকম রঙ থাকে। পর্দার যে যে জায়গায় তিনটি ছবির রঙ সমানভাবে মেশে, সেখানে আমরা সাদা রঙ দেখি।

সবশেষে একটা কথা বলা দরকার। সেটা হল, তিনটি ইলেকট্রন-বন্দুকের ইলেকট্রন ঠিক নির্দিষ্ট রঙের ফসফর বিন্দুতে আঘাত করে কেমন ক'রে? এটা সম্ভব হয় 'শ্যাডো মাস্ক' নামে একটি পাতলা ইস্পাতের পাতের জন্য। এই পাতটিতে প্রায় তিন লক্ষ সূক্ষ্ম ফুটো থাকে। ফলে এর মধ্যে

'শ্যাডো মাস্ক' কি জিনিস?

দিয়ে ইলেকট্রন বা আলো দিব্যি যাতায়াত করতে পারে। শ্যাডো মাস্ক বসানো থাকে ইলেকট্রন-স্রোতের পথে, 'ফসফর ডট' পর্দার ঠিক সামনে।

ইলেকট্রন-বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের স্রোত শ্যাডো মাস্কের ফুটো দিয়ে ঢুকে ফসফর পর্দার ডট ট্রায়োর ওপরে আঘাত করে। ইলেকট্রন-বন্দুকগুলোর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য একই ফুটো দিয়ে তিনটি ইলেকট্রনের স্রোত তিনটি ভিন্ন পথে প্রবেশ করে। যার ফলে, তারা সব সময়ে একই ডট ট্রায়োর তিনটি ভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। অর্থাৎ এইভাবে প্রতিটি ইলেকট্রন-বন্দুকের জন্য প্রত্যেকটি ডট ট্রায়োর ভিন্ন জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং লাল ইলেকট্রন-বন্দুকের ইলেকট্রন বিভিন্ন ডট ট্রায়োর যে যে জায়গায় এসে আঘাত করে, সেই সেই জায়গায় লাল আলো সৃষ্টিকারী ফসফর পদার্থ লাগানো থাকে। একইরকম ব্যবস্থা করা থাকে নীল ও সবুজ ইলেকট্রন-বন্দুকের জন্যে। ফলে সব মিলিয়ে রঙিন ছবি দেখতে আমাদের কোনো রকম অসুবিধে হয় না।

রঙিন টিভির রিমোট কন্ট্রোল কেমন ক'রে কাজ করে?

টিভির রিমোট-কন্ট্রোল যন্ত্রটি চেহারায় অনেকটা ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটরের মত। এই যন্ত্রটি হাতে থাকলে টিভির কাছে গিয়ে বোতাম টিপতে বা নব্ ঘোরাতে হয় না। টিভি চালু ক'রে দূরে বসে ছবি দেখতে দেখতে খুশিমত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চ্যানেল বদলানো, উজ্জ্বলতা বাড়ানো বা কমানো, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, রঙ ঠিক করা, ইত্যাদি সবই সম্ভব এই রিমোট-কন্ট্রোল যন্ত্র দিয়ে।

রিমোট-কন্ট্রোল যন্ত্রে ক্যালকুলেটরের মতই অনেকগুলো বোতাম থাকে। এর ভেতরে থাকে একটি ছোট ট্রান্সমিটার বা প্রেরক-যন্ত্র। ট্রান্সমিটার থেকে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত বেতার-সংকেত ছড়িয়ে দেবার সুব্যবস্থা আছে। টিভির বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য রিমোট-কন্ট্রোলের ভিন্ন ভিন্ন বোতাম টিপতে হয়। প্রত্যেকটি বোতামের জন্য

নির্দিষ্ট এক একটি বেতার-সংকেত রয়েছে। এই অবলোহিত বেতার-সংকেত গ্রহণের জন্য টিভির ভেতরে ছোট্ট একটি গ্রাহক-যন্ত্র থাকে। গ্রাহক-যন্ত্রটি বিভিন্ন সংকেত গ্রহণ ক'রে বিভিন্ন সুইচ চালু ক'রে দেয় এবং তার ফলে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়।

রিমোট-কন্ট্রোল ব্যবস্থায় ছোট্ট যন্ত্রটিকে টিভির দিকে তাক ক'রে বোতাম টিপতে হয়। তাহলে জোরালো অবলোহিত বেতার-সংকেত সরাসরি টিভির ওপরে গিয়ে পড়তে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ নিখুঁত হয়। বেতার-সংকেতের পথে কোনো বাধা থাকলে যন্ত্র ঠিক মত কাজ করবে না। আর মনে রাখতে হবে, টিভি সেটের সুইচ্ অন করা না থাকলে রিমোট-কন্ট্রোল কাজ করবে না। তবে যন্ত্রটিকে ব্যবহার না করে টিভির পাওয়ার অন করে টিভির গায়ে লাগানো বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের বোতাম টিপেও টিভির ছবি ও শব্দকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রিমোট-কন্ট্রোল একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত ঠিক মত কাজ করে। টিভি থেকে দর্শকের দূরত্ব তার চেয়ে বেশি হলে অবলোহিত বেতার-সংকেত তার ক্ষমতা হারায় এবং নিয়ন্ত্রণের কাজে গোলমাল হয়।

রেডিও চালু অবস্থায় কেউ বাড়ির কলিং বেল বাজালে বা টিউব লাইট অন্ করলে রেডিওতে বিরক্তিকর শব্দ শোনা যায়, কিন্তু টিভিতে সাধারণত সে-জাতীয় কোনোরকম বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না কেন?

যে কোনো বৈদ্যুতিক-বর্তনীর সুইচ অন্ করলে আচমকা তড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয়। আবার সুইচ অফ্ করলে আচমকা তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়। তড়িৎ-প্রবাহ এইরকম আচমকা শুরু বা বন্ধ হলে বর্তনীতে উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। উচ্চ কম্পাঙ্কের এই প্রবাহমাত্রা মূল প্রবাহের তুলনায় অনেক কম এবং তা খুব কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। কিন্তু উচ্চ কম্পাঙ্কের ওই প্রবাহ অল্প সময়ের জন্য উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয় বাতাসে। এই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক মোটামুটি কয়েক শো কিলোহার্জ।

টিউব লাইট অন্ করলে স্টার্টার-বর্তনীতে আচমকা তড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয়। তার পরক্ষণেই স্টার্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তনী বিচ্ছিন্ন করে। তার ফলে টিউব লাইটের ভেতরের পারদ-বাষ্পের মধ্যে আচমকা উচ্চ মানের ভোল্টেজ আরোপিত হয় এবং পারদ বাষ্পের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ শুরু হয়। এর ফলে আমরা আলো পাই। অর্থাৎ টিউব লাইট অন্ করলে তার বর্তনীতে একাধিক বার তড়িৎ-প্রবাহ আচমকা শুরু এবং বন্ধ হয়। সুতরাং অল্প সময়ের জন্য বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে কয়েক শো কিলোহার্জ কম্পাঙ্কের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ।

রেডিও-যে-কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ করে তা কয়েক শো কিলোহার্জ মানের। সুতরাং টিউব লাইট থেকে উৎপন্ন বেতার-তরঙ্গ মোটামুটিভাবে রেডিওর গ্রাহক অ্যান্টেনার কার্যকরী সীমার মধ্যে থাকার ফলে রেডিও সেই তরঙ্গ গ্রহণ করতে পারে। কোনো অর্থপূর্ণ শব্দ থেকে টিউব লাইটের বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং রেডিওর ইলেকট্রনিক-বর্তনী ও স্পিকার এই অর্থহীন বেতার-তরঙ্গ থেকে কেবলমাত্র বিরক্তিকর শব্দেরই জন্ম দিতে পারে। পরিভাষায় এধরনের অবাঞ্ছিত সংকেতকে বলা হয় 'নয়েজ'।

টেলিভিশন যে বেতার-সংকেত নিয়ে কাজ করে তার কম্পাঙ্ক রেডিওর তুলনায় অনেক বেশি— প্রায় 54 থেকে ৪৫০ মেগাহার্জ। টেলিভিশনের গ্রাহক অ্যান্টেনা ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক-বর্তনী এই কম্পাঙ্কেরই উপযুক্ত। ফলে টিউব লাইট থেকে উৎপন্ন কয়েক শো কিলোহার্জ কম্পাঙ্কের 'নয়েজ' টিভির বর্তনীতে কোনো শব্দ বা চিত্র বিকৃতির সৃষ্টি করতে পারে না।

টিউব লাইট অন্ করার মত কলিং বেল বাজালেও তড়িৎ-বর্তনী ছিন্ন ও যুক্ত হয়। যতক্ষণ কলিং বেল বাজে ততক্ষণ এই ছিন্ন ও যুক্ত হওয়ার ঘটনা চলতে থাকে। ফলে 'নয়েজ' সৃষ্টিকারী বেতার-তরঙ্গও ক্রমাগত উৎপন্ন হয়। এর কম্পাঙ্কও কয়েক শো কিলোহার্জ মানের কাছাকাছি। ফলে রেডিওতে বিরক্তিকর শব্দ শোনা গেলেও টিভিতে সাধারণত কোনোরকম বিঘ্ন ঘটে না।

অবশ্য কোনো কারণে যদি টিউব লাইট বা কলিং বেল চালু করলে মেগাহার্জ মানের 'নয়েজ' বেতার-তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহলে টিভিতে তার প্রভাব পড়বে

ভিডিও এবং অডিও শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ কী?

ল্যাটিন ভাষার এই শব্দ দুটির অর্থ বেশ মজার। ভিডিও মানে হল 'আমি দেখি', আর অডিও-র মানে 'আমি শুনি'।

গ্যাস স্টোভ জ্বালানোর ইলেকট্রনিক লাইটারে ব্যাটারি লাগে না কেন?

গ্যাস স্টোভ জ্বালানোর ইলেকট্রনিক লাইটারে খুব ছোট এক ধরনের কেলাস থাকে, যাকে বলা হয় 'পিয়েজো-

'পিয়েজো-ইলেকট্রিক কেলাস' কাকে বলে?

ইলেকট্রিক কেলাস'। এই ধরনের কেলাসে চাপ দিলে তাদের দুই তলের মধ্যে ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। চাপ বাড়ালে ভোল্টেজকে দু'টি পরিবাহীর সাহায্যে 'শর্ট' করলে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ বা ইলেকট্রিক স্পার্ক-এর সৃষ্টি হয়। এই স্ফুলিঙ্গই দাহ্য গ্যাসকে জ্বলে উঠতে সাহায্য করে।

1880 সালে বিজ্ঞানী পিয়ের কুরি ও তাঁর ভাই এই বৈজ্ঞানিক ঘটনা লক্ষ্য করেন। কোয়ার্ট্জ বা স্ফটিক হল এই ধরনের পিয়েজো-ইলেকট্রিক কেলাস। গ্রিক শব্দ 'পিয়েজিন'-এর অর্থ হল চাপ দেওয়া। সুতরাং 'পিয়েজিন' থেকেই পিয়ের ভাইয়েরা এই অভিনব ঘটনার নাম দিয়েছিলেন 'পিয়েজো-ইলেকট্রিসিটি' বা চাপ-বিদ্যুৎ।

ইলেকট্রনিক সিগারেট লাইটারে ব্যাটারি লাগে না কেন?

পিয়েজো-ইলেকট্রিক কেলাস থেকে উৎপন্ন চাপ-বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ কাজে লাগায় বলেই ইলেকট্রনিক গ্যাস লাইটারে ব্যাটারি লাগে না। ঠিক একই কারণে ইলেকট্রনিক সিগারেট লাইটারেও কোনো ব্যাটারির প্রয়োজন হয় না।

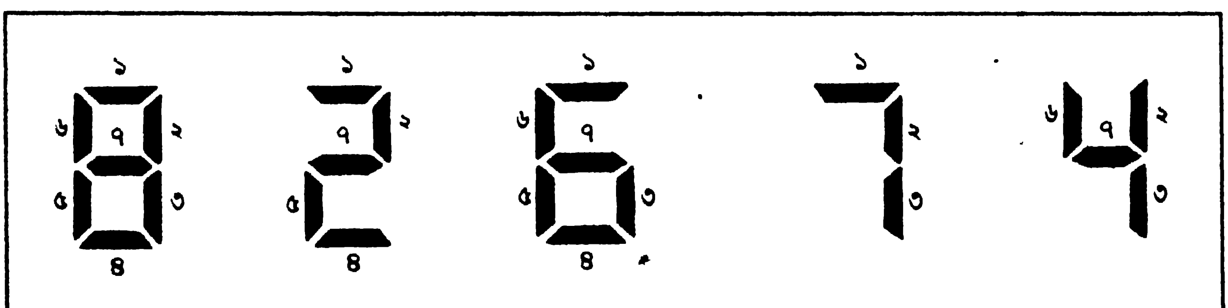
ক্যালকুলেটরের ডায়ালে যে-সংখ্যা ফুটে ওঠে তাদের ডিজিট বা অংকের চেহারা বিচিত্র ধরনের কেন?

ক্যালকুলেটরে যে ক'টি ডিজিট বা অংক ফুটে ওঠে তাদের প্রত্যেকটি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ও 0 এই দশটি অংকের মধ্যে যে-কোনো একটি হতে পারে। সুতরাং প্রতিটি ঘরে 1 থেকে 0 পর্যন্ত দশটি অংকেরই ফুটে ওঠার ব্যবস্থা থাকা চাই। এই কারণেই অংকগুলোকে 'সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে' পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়। সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে পদ্ধতিতে প্রতিটি অংকের জন্য সাতটি সরলরেখা ব্যবহার করা হয়। সাতটি রেখার সব ক'টিকে ব্যবহার ক'রে তৈরি করা যায় 8 অংকটি। পাঁচটি রেখা ব্যবহার ক'রে 2 অংকটি লেখা যায়। এ-রকম বিভিন্ন সংখ্যক রেখা ব্যবহার ক'রে অতি সহজে 1 থেকে 0 পর্যন্ত অংকগুলো এই পদ্ধতিতে লিখে ফেলা যায়। তবে সব ক'টি অংক

'নিয়ন টিউব' কাকে বলে?

সরলরেখার টুকরো দিয়ে লেখার ফলে অংকগুলোর চেহারা বিচিত্র ধরনের হয়।

ক্যালকুলেটরে সাতটি 'সেগমেন্ট' বা রেখা তৈরি করা হয় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লম্বা ধরনের ছোট ছোট আলো জ্বেলে যাদের নাম লাইট এমিটিং ডায়োড বা সংক্ষেপে এল ই ডি, কিংবা কালো কালো রেখা দিয়ে যাকে বলা হয় লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে বা এল সি ডি। বিশেষ বিশেষ অংক লেখার জন্য বিশেষ বিশেষ রেখাগুলো ইলেকট্রনিক



ক্যালকুলেটরের কয়েকটি অংকের চেহারা

পদ্ধতিতে সৃষ্টি করতে হয়। যেমন, রেখাগুলোয় যদি 1 থেকে 7 পর্যন্ত নম্বর দেওয়া যায়, তাহলে 1, 2, 7, 5 ও 4 নম্বর রেখা ফুটিয়ে তুলে ইংরেজি 2 অংকটি লেখা সম্ভব। ছবিতে এ-রকম আরো কয়েকটি উদাহরণ দেখানো হয়েছে।

তবে রেখা ছাড়াও ছোট ছোট বিন্দু ব্যবহার ক'রে বিভিন্ন অংক বা অক্ষর ফুটিয়ে তোলা যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে'।

সেভেন সেগমেণ্ট বা ডট ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি চালু হওয়ার আগে ক্যালকুলেটরের একটি অংকের জায়গায় 1 থেকে 0 পর্যন্ত দশটি অংকই সরু সরু গ্যাস টিউব দিয়ে লেখা থাকতো। এক একটি অংক লেখার জন্য এক একটি টিউব ব্যবহার করা হত। আর অংকগুলো একের পিছনে এক সারি বেঁধে সাজানো থাকতো। তারপর সাজানো দশটি টিউবকে বন্দী করা হত ছোট একটি কাচের বাক্সে—এর নাম 'নিক্সি টিউব'। যখন যে-অংকটি ফুটিয়ে তোলা দরকার তখন সেই অংকের জন্য নির্দিষ্ট টিউবের টার্মিনালে ভোল্টেজ দিয়ে অংকটিকে রঙিন টিউব লাইটের মত উজ্জ্বল ক'রে তোলা হত। এই পদ্ধতিতে সরলরেখা ব্যবহার করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

প্রথম ক্যালকুলেটর কে তৈরি করেছিলেন?

এখন তো সর্বত্রই ক্যালকুলেটর আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু প্রথম ক্যালকুলেটর কে কবে তৈরি করেছিলেন?

প্রথম ক্যালকুলেটর কেউ তৈরি করেন নি। সেটা মানুষ পেয়েছিল তার জন্মসূত্রে। অর্থাৎ প্রথম ক্যালকুলেটর হচ্ছে মানুষের দু' হাতের দশ আঙুল। এখনও গোনার কাজে আমরা আঙুল ব্যবহার করে থাকি। সম্ভবত দশ আঙুলের ব্যবহার থেকেই আদিকালে 1 থেকে 9 ও 0 এই দশটি অংকের চলন হয়েছিল ভারতবর্ষে। তারপর থেকে এই সংখ্যা-পদ্ধতি সারা পৃথিবীর মানুষ আজও ব্যবহার করে চলেছে—যার পোশাকী নাম হল ডেসিম্যাল নাম্বার সিস্টেম বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি।

প্রথম মেকানিকাল ক্যালকুলেটর বা যন্ত্রগণক কে আবিষ্কার করেছিলেন?

1642 সালে, মাত্র উনিশ বছর বয়সে, প্রখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লাজ পাস্কাল ধাতব যন্ত্রাংশ, অর্থাৎ গিয়ার, পিনিয়ন ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে প্রথম যন্ত্রগণক তৈরি করেন। তাঁর যন্ত্রের নাম ছিল 'টুথড্ হুইল্স্'। আবার কেউ কেউ যন্ত্রটিকে 'পাস্কালাইন' বলতো। এই যন্ত্রে শুধুমাত্র যোগ এবং বিয়োগ করা যেত।

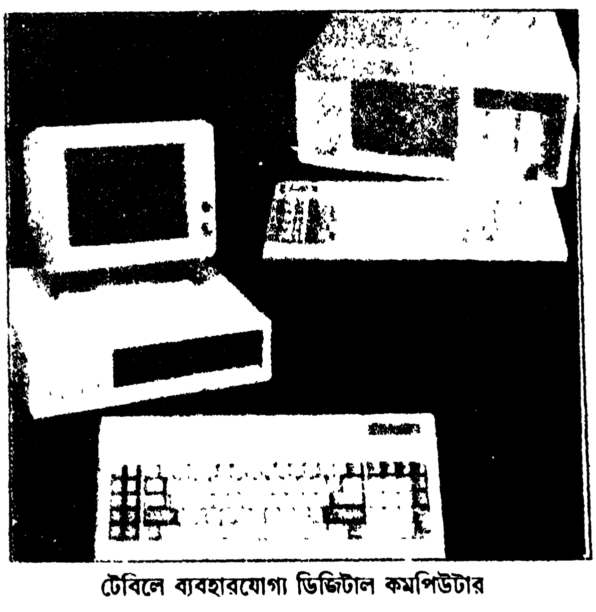
পরে 1671 সালে পাস্কালের যন্ত্রকে উন্নত করেন জার্মান অংকবিদ্ গটফ্রিদ্ উইলহেম লাইপনিৎস এবং 1691 সালে নিজের নক্সা ব্যবহার ক'রে তিনি তৈরি করেন নতুন যন্ত্রগণক 'রেকনিং মেশিন'। যোগ-বিয়োগ ছাড়াও এই যন্ত্রে গুণ করা যেত।

কোন যন্ত্রের নাম 'পাস্কালাইন'?

পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেকানিকাল ক্যালকুলেটর আরো উন্নত হয়। 1887 সাল নাগাদ উইলিয়াম সেওয়ার্ড বারোজ ব্যবসায়িক কাজের পক্ষে উপযুক্ত একটি যন্ত্রগণক আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রটি শুধু যে সেই সময়ে জনপ্রিয় ছিল তা নয়, আজকের ইলেকট্রনিক যুগেও এই ধরনের মেকানিকাল ক্যালকুলেটর একেবারে অচল হয়ে যায়নি।

প্রথম ডিজিটাল কমপিউটার কোথায় কবে তৈরি হয়েছিল?

1944 সালের মে মাসে কেমব্রিজের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ডিজিটাল কমপিউটার তৈরি হয়েছিল। এই কারণেই যন্ত্রগণকটির নাম দেওয়া হয় 'হার্ভার্ড মার্ক-



টেবিলে ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল কমপিউটার

ওয়ান'। এই কমপিউটারটি কিন্তু পুরোপুরি ইলেকট্রনিক ছিল না। এখানে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ও ধাতব যন্ত্রাংশ। হার্ভার্ড মার্ক-ওয়ান মাপে ছিল বিশাল ঃ লম্বায় প্রায় সাড়ে পনেরো মিটার ও উচ্চতায় প্রায় আড়াই মিটার। এতে মোট প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়েছিল, আর বৈদ্যুতিক তার লেগেছিল 800 কিলোমিটারেরও বেশি। দু'টি সংখ্যাকে যোগ করতে মার্ক-ওয়ান-এর 0.3 সেকেন্ড সময় লাগতো এবং গুণ করতে সে সময় নিত 4.5 সেকেন্ড।

আধুনিক ডিজিটাল কমপিউটারের জনক কাকে বলা হয়?

আধুনিক কমপিউটারের গঠন-নীতি প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন ইংল্যান্ডের অংকবিদ্ চার্ল্‌স ব্যাবেজ। 1833 সালে নিজের তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি ক'রে ব্যাবেজ পর পর দু'টি যন্ত্রগণক তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে একটির নাম তিনি দিয়েছিলেন 'ডিফারেন্স ইঞ্জিন' এবং অপরটির নাম দিয়েছিলেন 'অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন'। কিন্তু একটি যন্ত্রও তিনি সম্পূর্ণ তৈরি ক'রে যেতে পারেন নি। ব্যাবেজের পরিকল্পনার প্রায় 100 বছর পরে তাঁর নীতি অনুসরণ ক'রে তৈরি হয় হার্ভার্ড মার্ক-ওয়ান। সেই কারণেই চার্ল্‌স ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

বিশ্বের সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক কমপিউটার কোনটি?

বর্তমানে পৃথিবীর বহু কোম্পানি ইলেকট্রনিক কমপিউটার তৈরি করে কিন্তু সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক কমপিউটারটি কোথায় কবে তৈরি হয়েছিল?

বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রনিক কমপিউটার 'ইনিয়াক'। 'ইনিয়াক'-এর পুরো নাম হল ঃ 'ইলেকট্রনিক নিউমারিক্যাল ইন্টিগ্রেটর অ্যান্ড কমপিউটার'। 1946 সালের 15 ফেব্রুয়ারি এই যন্ত্রগণকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ইনিয়াক তৈরি করেছিলেন পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর স্কুল অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিজ্ঞানীরা।

ইনিয়াক-এর বর্তনীতে ব্যবহার করা হয়েছিল 18000 ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ্‌, 70000 রেজিস্ট্যান্স, 10000 কনডেন্সার ও 6000 সুইচ। এই কমপিউটারটির আকার ছিল হার্ভার্ড মার্ক-ওয়ান-এর চেয়েও বড় ঃ প্রায় 30 মিটার লম্বা, 3 মিটার উঁচু ও 1 মিটার পুরু। দু'টি সংখ্যা যোগ করতে ইনিয়াক এক সেকেন্ডের 5000 ভাগের এক ভাগ সময় নিত। আর গুণ করতে সময় নিত এর 14 গুণ। আজকের দিনের কমপিউটারের তুলনায় ইনিয়াক-এর গতিকে নিতান্তই শামুকের গতি বলা যায়। কারণ 1980-এর দশকের সবচেয়ে দ্রুত একটি সুপার কমপিউটার প্রতি সেকেন্ডে 130 কোটি গণনা করতে পারতো।

আধুনিক সুপারকমপিউটার এক সেকেন্ডে কতগুলো গণনা করতে পারে?

আধুনিক ডিজিটাল কমপিউটার কোন নীতি মেনে কাজ করে?

'ইনিয়াক'-এর পর তৈরি হয়েছিল আর একটি ডিজিটাল কমপিউটার 'এডভ্যাক'। 'এডভ্যাক'-এর পুরো নাম হল ঃ 'ইলেকট্রনিক ডিসক্রিট ভ্যারিয়েব্‌ল ক্যালকুলেটর'। এই কমপিউটার তৈরির কাজে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন জন্মসূত্রে হাঙ্গেরিয়ান গণিতজ্ঞ জন ফন নয়ম্যান। 1945 সালের গোড়ার দিকে 'মুর স্কুল অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ 'ইনিয়াক' নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তিনি যোগ দেন। সেই সময়ে নয়ম্যান কমপিউটারে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলেন। তিনি আরও প্রস্তাব দেন যে, কমপিউটারের গণনা দ্রুততর করার জন্য কিছু কিছু প্রোগ্রাম বা নির্দেশাবলী কমপিউটারের মধ্যেই স্থায়ীভাবে সঞ্চয় করে রাখতে হবে।

এডভ্যাক কমপিউটারের পুরো নাম কি?

এই দুটি প্রস্তাব কমপিউটার গবেষণাকে অনেক উন্নত করে তোলে। আধুনিক ডিজিটাল কমপিউটার সাধারণভাবে জন ফন নয়ম্যানের নীতি মেনেই কাজ করে। তাই এদের অনেক সময় বলা হয় 'ফন নয়ম্যান মেশিন'।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে?

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা অভ্যস্ত।

এই সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট 10টি অংক আছে ঃ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9। আর, এই পদ্ধতির 'বেস' বা 'মূল' হল 10। এই পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যার প্রতিটি 'ডিজিট' বা 'অংক'-এর স্থানীয় মান থাকে। যেমন, 234 সংখ্যাটির মান নির্ণয় করা হয় এইভাবে ঃ

$$234 = 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$
$$= 200 + 30 + 4$$

অর্থাৎ, 10-এর বিভিন্ন ঘাত ব্যবহার করে অংকগুলোর স্থানীয় মান নির্ণয় করা হয়।

ঠিক একই নিয়ম অনুসরণ করে তৈরি হয়েছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মাত্র দুটি অংক 0 এবং 1 ব্যবহার করা হয়। আর এই পদ্ধতির বেস হল 2। যেমন, 1011 বাইনারি সংখ্যাটির মান নির্ণয় করলে পাওয়া যায় ঃ

$$1101 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$= 8 + 4 + 0 + 1$$
$$= 13$$ (দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় করা মান)

সুতরাং আমরা লিখতে পারি $(1101)_2 = (13)_{10}$

এক্ষেত্রে সংখ্যার পাশে, সামান্য নীচে, ছোট করে লেখা সংখ্যাটি (2 ও 10) সংখ্যার বেস-এর মান নির্দেশ করছে। একই নিয়ম মেনে দেখানো যায় $(101)_2=(5)_{10}$ কিংবা $(11001)_2=(25)_{10}$।

বাইনারি সংখ্যা পড়ার নিয়ম হল ঃ 101 (ওয়ান জিরো ওয়ান), 10110 (ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো)।

25-কে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করলে কত হয়?

কমপিউটারে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধের কারণ, এই সংখ্যা পদ্ধতিতে শুধুমাত্র দুটি অংক 1 ও 0 নিয়ে কাজ করতে হয়। ফলে কমপিউটারে গণনার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।

ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটার কত রকমের হয়?

আজকাল যেসব ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটার ব্যবহার করা হয় তাদের মোটামুটিভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(1) ল্যাপটপ কমপিউটার, (2) পার্সোনাল কমপিউটার বা মাইক্রোকমপিউটার (এর প্রচলিত সংক্ষিপ্ত নাম 'পিসি'), (3) মিনিকমপিউটার, (4) মেইনফ্রেম কমপিউটার, (5) সুপারকমপিউটার।

এদের মধ্যে ল্যাপটপ কমপিউটার মাপে সবচেয়ে ছোট। তবে এটি পার্সোনাল কমপিউটারেরই রকমফের। এই কমপিউটার কোলে রেখেই গণনার কাজ করা যায়। এর চেয়ে মাপে বড় 'পিসি'। বর্তমানে এই কমপিউটার সবচেয়ে জনপ্রিয়। 'পিসি'-র পর মাপ ও কার্যক্ষমতায় ক্রমশ বড় হয়েছে মিনিকমপিউটার, মেইনফ্রেম কমপিউটার ও সবার ওপরে সুপারকমপিউটার।

ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটার কে আবিষ্কার করেছেন?

আমেরিকার পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর স্কুল অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দুই অধ্যাপক জন প্রেসপার একার্ট জুনিয়ার ও জন উইলিয়াম মশ্‌লি 1945 সালে তৈরি করেছিলেন 'ইনিয়াক'—বিশ্বের প্রথম পুরোপুরি ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটার। 1945 সালের ডিসেম্বর মাসে 'ইনিয়াক'-কে প্রথম চালু করা হয়। সুতরাং দীর্ঘদিন ধরে সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে, ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটারের আবিষ্কারক একার্ট ও মশ্‌লি। কিন্তু সত্তর দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন আদালত অন্য দুজন বিজ্ঞানীকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। আদালতের রায় অনুযায়ী পদার্থবিজ্ঞানী জন ভিনসেন্ট অ্যাটানাসফ ও ক্লিফোর্ড বেরি 1942 সালে প্রথম ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটারের পেটেন্ট নিয়েছেন। অ্যাটানাসফের বক্তব্য অনুযায়ী, 1940 সালের গোড়াতেই তিনি ও বেরি একটি ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটারের নমুনা তৈরি করে ফেলেছিলেন। 1941 সালে আইওয়া স্টেট কলেজে অ্যাটানাসফের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মশ্‌লি। সেখানে এক সপ্তাহ ধরে দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে কমপিউটার নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় মশ্‌লি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারপর একার্ট ও মশ্‌লির যৌথ গবেষণায় যথাসময়ে জন্ম নিয়েছিল 'ইনিয়াক'।

কাকে বলে সুপারকমপিউটার?

কমপিউটারের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা কখনও থামেনি। কমপিউটারের কার্যক্ষমতা বলতে বোঝায় তার গণনার গতি ও কী পরিমাণ তথ্য নিয়ে সে

গণনা করতে পারে। সাধারণ মেইনফ্রেম কমপিউটারের তুলনায় একটি সুপারকমপিউটারের কার্যক্ষমতা বেশ কয়েকগুণ বেশি। প্রতি সেকেন্ডে সুপারকমপিউটার কটি দশমিক ভগ্নাংশের গণনা সম্পন্ন করতে পারে সেই সংখ্যার ওপর নির্ভর করে তার ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়।

পরিভাষায় দশমিক ভগ্নাংশের এই গণনাকে 'ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশন' বলা হয়। কোনো সংখ্যাকে ফ্লোটিং পয়েন্ট নোটেশনে প্রকাশ করার অর্থ হল তাকে 10-এর ঘাতের গুণিতকে প্রকাশ করা। যেমন, 38.43 এই দশমিক

ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশন কাকে বলে?

ভগ্নাংশটিকে ফ্লোটিং পয়েন্ট নোটেশনে প্রকাশ করে আমরা লিখতে পারি 0.3843×10^2। কমপিউটারে এইভাবে কোনো সংখ্যাকে প্রকাশ করলে কমসংখ্যক স্মৃতিকোষ ব্যবহার করে অনেক বড় সংখ্যা 'লেখা' যায়।

প্রতি সেকেন্ডে ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশনের সংখ্যাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'ফ্লপ'। 1987 সালে আমেরিকার 'ক্রে রিসার্চ ইনকর্পোরেটেড' কোম্পানির কাছ থেকে ভারত প্রথম একটি সুপারকমপিউটার আমদানি করেছিল।

কাকে বলে টেরাফ্লপ?

কমপিউটারটির নাম ছিল 'এক্স এম পি-1'। এর ক্ষমতা ছিল 60 মেগাফ্লপ (অর্থাৎ, 60×10^6 ফ্লপ)। আর আজকের আধুনিক সুপারকমপিউটারের ক্ষমতা হল মেগা-মেগা ফ্লপ বা টেরাফ্লপ (অর্থাৎ, 10^{12} ফ্লপ) পর্যায়ের।

কেমন করে শুরু হয়েছিল সুপারকমপিউটার?

1970-এর দশকের গোড়ায় মিনেসোটার মিনেপোলিস-এ সেমুর ক্রে 'ক্রে রিসার্চ ইনকর্পোরেটেড' কোম্পানিটির পত্তন করেন। শুরুতেই তিনি এমন একটি কমপিউটার তৈরি করেছিলেন যা তখনকার দিনের সবচেয়ে দ্রুত কার্যক্ষম কমপিউটারের চেয়েও পাঁচ থেকে 10 গুণ বেশি গতিসম্পন্ন ছিল। এই অস্বাভাবিক দ্রুতগতি সম্ভব হয়েছিল 1.8 মিটার × 2.7 মিটার মাপের একটি নতুন ধরনের কমপিউটার-মগজ বা প্রসেসর ব্যবহারের জন্য। একাধিক সিলিকন চিপ জুড়ে ক্রে এই প্রসেসরটি তৈরি করেছিলেন। সাধারণ কমপিউটারের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী ও অনেক দ্রুতগতিতে কাজ সারতে পারে বলে ক্রে-এর তৈরি কমপিউটারের নাম হয়ে যায় সুপারকমপিউটার। 1952 সালের একটি কমপিউটারে যে-গণনা করতে এক বছর সময় লাগত, আজকের একটি সুপারকমপিউটার এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে সেই গণনা সেরে ফেলতে পারে।

1978 সালে 'ক্রে রিসার্চ ইনকর্পোরেটেড' পৃথিবীর প্রথম সুপারকমপিউটার 'ক্রে-1' তৈরি করে। এই কমপিউটারটির ক্ষমতা ছিল 20 মেগাফ্লপ। এর ঠিক তিন বছর পরেই মিনেপোলিস-এর কোম্পানি 'কন্ট্রোল ডেটা কর্পোরেশন' দ্বিতীয় সুপারকমপিউটার 'সাইবার-205' তৈরি করে। ক্ষমতায় এই কমপিউটার ছিল 'ক্রে-1'-এর সমকক্ষ। এরপর আমেরিকার প্রখ্যাত কমপিউটার কোম্পানি 'আই বি এম কর্পোরেশন' সুপারকমপিউটার তৈরি করে। তাদের প্রথম মডেলটির নাম ছিল 'আই বি এম-3090-400'।

ভারতে তৈরি প্রথম সুপারকমপিউটারের নাম কি?

ভারতে সুপারকমপিউটারের গবেষণা শুরু হয় 1980-এর দশকের মাঝামাঝি। বাইরে থেকে আমদানি করা সুপারকমপিউটারের অস্বাভাবিক দাম ও আমদানি-সংক্রান্ত জটিল নিয়মকানুন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই গবেষণায় একরকম বাধ্য করেছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, সুপারকমপিউটারে স্বনির্ভর হওয়াটাই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ভারতের প্রথম সুপারকমপিউটারের নাম 'ফ্লোসল্‌ভার'। এটি তৈরি করেছিল বাঙ্গালোরের 'ন্যাশনাল এরোনটিক্যাল ল্যাবরেটরি' (বর্তমান নাম 'ন্যাশনাল এরোস্পেস ল্যাবরেটরিজ')। এই সুপারকম্পিউটারের আধুনিকতম সংস্করণটির নাম 'ফ্লোসল্‌ভার এম কে-3'। এটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাঙ্গালোরের 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স'-এর 'সেন্টার ফর অ্যাটমসফেরিক সায়েন্সেস' বিভাগে।

'ক্রে-এক্স এম পি' সুপারকমপিউটারের তুলনায় 'ফ্লোসল্‌ভার এম কে-3'-এর ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক, কিন্তু এর দামও 'ক্রে-এক্স এম পি'-এর প্রায় 10 ভাগের এক ভাগ।

ভারতের 'পেস' সুপারকমপিউটারের ক্ষমতা কত?

এরপর হায়দ্রাবাদের 'অ্যাডভান্সড নিউমারিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস গ্রুপ' 'পেস' নামে একটি সুপারকমপিউটার তৈরি করে। 'পেস'-এর পুরো নাম হল

'প্রসেসর ফর এরোডায়নামিক কমপিউটেশন অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন'। এর ক্ষমতা হল 100 মেগাফ্লপ।

বিশ্বের দরবারে ভারতের যে সুপারকমপিউটারটি ছাপ ফেলেছে তার নাম হল 'পরম'। এটি তৈরি করেছে পুনের 'সেন্টার ফর ডেভেলাপমেন্ট অফ অ্যাড্ভান্স্ড কমপিউটিং'। 1991 সালে এদের তৈরি মডেল 'পরম-8000'-এর ক্ষমতা ছিল 1 গিগাফ্লপ (অর্থাৎ, 10^9 ফ্লপ)। পরবর্তিকালে 'পরম'-এর আরও উন্নত মডেল 'পরম-8600' ও 'পরম-9000' তৈরি হয়। এর পরের ধাপে পুনের এই গবেষণা সংস্থা

ভারতের আধুনিকতম সুপারকমপিউটারের ক্ষমতা কত?

তৈরি করতে চলেছে ভারতের সর্বাধুনিক ও প্রথম টেরাফ্লপ সুপারকমপিউটার। গবেষকরা জানিয়েছেন, এই কমপিউটারটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হবে 1998-এর শেষে। আর এই কমাপউটারটি আক্ষরিক অর্থে চোখের পলকে 2000 কোটি গণনার কাজ সেরে ফেলবে।

কমপিউটার প্রজন্ম বলতে আমরা কি বুঝি?

'ইনিয়াক' থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যেসব কমপিউটার তৈরি হয়েছে তাদের মোটামুটিভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কমপিউটারগুলোর গঠন পদ্ধতির প্রযুক্তিগত দিক বিবেচনা করেই বিজ্ঞানীরা এই শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

কমপিউটারের বিভিন্ন 'জেনারেশন' বা প্রজন্মকে সময়ের হিসেবে খুব চুলচেরাভাবে ভাগ না করা গেলেও নীচের তালিকায় বিভিন্ন প্রজন্মের 'রাজত্বকালের' মোটামুটি একটা হিসেব দেওয়া হল। সেইসঙ্গে দেওয়া হল তাদের গঠন পদ্ধতির প্রযুক্তির নাম ঃ

কমপিউটার প্রজন্ম	আনুমানিক 'রাজত্বকাল'	গঠন পদ্ধতির প্রযুক্তি
প্রথম	1940—1952	ভাল্ভ
দ্বিতীয়	1952—1964	ট্রানজিস্টর
তৃতীয়	1964—1971	ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আই.সি.) চিপ
চতুর্থ	1971—1984	ভি এল এস আই চিপ
পঞ্চম	1984—বর্তমান সময় পর্যন্ত	সমান্তরাল প্রসেসিং

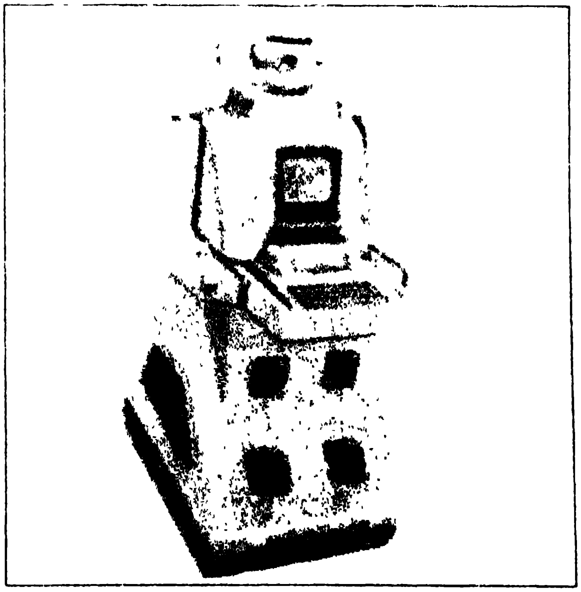
এর মধ্যে সমান্তরাল প্রসেসিং বা 'প্যারালাল প্রসেসিং' হল কমপিউটারের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির সাহায্যে কমপিউটার একই সঙ্গে একাধিক গণনা করতে পারে। আমরা যেমন একই সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করতে পারি, এ যেন অনেকটা সেইরকম।

'রোবট' কথার অর্থ কী?

'রোবট' শব্দটি এসেছে পূর্ব ইউরোপের স্লাভোনিক ভাষা থেকে। স্লাভদের এই ভাষায় 'রোবোটা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দাসত্ব'। এই সূত্র থেকেই যন্ত্র-দাস বা যন্ত্র-ক্রীতদাস অর্থে 'রোবট' শব্দটির ইংরেজি ভাষায় প্রথম ব্যবহার করেন ইউরোপীয় লেখক কারেল চাপেক, তাঁর 'আর-ইউ-আর' নাটকে। নাটকটি প্রাগ-এ প্রথম অভিনীত হয় 1921 সালে। চাপেক-এর নাটকের পর থেকেই 'রোবট' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় পাকাপাকি ভাবে জায়গা ক'রে নেয়।

প্রথম রোবট কে তৈরি করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মার্কিন-ব্রিটিশ স্নায়ুবিজ্ঞানী উইলিয়াম গ্রে ওয়ালটারের নাম করা হয়। সম্ভবত তিনিই প্রথম রোবট-পশু তৈরি করেছিলেন।



ডোমেস্টিক রোবট

ওয়ালটার তাঁর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-পশুর নাম দিয়েছিলেন 'টেসটিউডো'—ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ 'কচ্ছপ'। বিদ্যুৎচালিত 'টেসটিউডো' যন্ত্রটি তিনি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যাতে সেটি কোনো জীবন্ত প্রাণীর একাধিক প্রতিক্রিয়া নকল করতে পারে। যেমন, যন্ত্রটির চোখের জায়গায় বসানো ছিল আলোক-তড়িৎ কোষ; স্পর্শ অনুভব করার জন্য ছিল সুবেদী ব্যবস্থা; এ-ছাড়া, সামনে-পিছনে কিংবা বাঁক নিয়ে চলার জন্য ছিল একাধিক মোটর ও চাকার আয়োজন।

'টেসটিউডো' অন্ধকারে চলে বেড়াতে পারতো। চলার পথে যখনই সে কোনো কিছুতে বাধা পেত তখনই কিছুটা পিছিয়ে এসে সামান্য বাঁক নিয়ে, আবার এগিয়ে যেত সামনের দিকে। এই ভাবে বারবার বাধা পেলেও 'টেসটিউডো' এক সময়ে বাধাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারতো। আবার তার আলোক-তড়িৎ 'চোখ' কোনো আলো 'দেখতে' পেলে সরাসরি এগিয়ে যেত সেই আলোর দিকে। যতই সে এগোয়, আলোর তীব্রতা ততই বেড়ে ওঠে। যখন আলোর তীব্রতা অতিরিক্ত বেড়ে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যেত, তখনই 'টেসটিউডো' স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার পিছিয়ে আসতো। কিন্তু 'টেসটিউডো'-র ব্যাটারির ক্ষমতা কমে গেলে তার 'আচরণ' পালটে যেত। তখন সে 'ক্ষুধার্ত' অবস্থায় অতিরিক্ত তীব্রতা সত্ত্বেও সেই আলোর খুব কাছে এগিয়ে যেত এবং আলোর পাশে রাখা একটি ব্যাটারি-চার্জার-এর সাহায্যে নিজের ব্যাটারিকে আবার চার্জ ক'রে নিত। ব্যাটারি চার্জ ক'রে নেওয়ামাত্রই 'টেসটিউডো' আবার আলোক-সচেতন হয়ে উঠতো। ফলে তীব্র আলোর কাছ থেকে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিছিয়ে আসতো।

আজকের দিনে 'টেসটিউডো'-র মত 'বুদ্ধিমান' খেলনা হয়তো অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু ওয়ালটারের সময়ে তাঁর 'বুদ্ধিমান' রোবট-পশু যে একটি অভিনব আবিষ্কার ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

রোবট কত রকমের হয়?

বিভিন্ন জিনিসের যেমন শ্রেণীবিভাগ আছে, তেমনি রোবটেরও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। রোবটকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ টার্টল, আর্ম ও মোবাইল।

টার্টল অনেকটা গ্রে ওয়ালটারের 'টেসটিউডো'-র মত—ছক বাঁধা নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে চলাফেরা করে।

আর্ম হল বাহুসম্পন্ন রোবট, যা একই জায়গায় স্থির থেকে শুধু যান্ত্রিক হাত নেড়ে কোনো জিনিস তুলে নেয়, জোড়া লাগায় বা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করে।

আর মোবাইল হল টার্টল-এর চেয়ে বুদ্ধিমান চলমান মোটরচালিত রোবট। এ-ধরনের রোবটের বহু বিচিত্র নির্দেশ মেনে কাজ করার ক্ষমতা আছে। যেমন, কুকুরকে বেড়িয়ে নিয়ে আসা, বা গেলাসে জল ঢেলে হাতে তুলে দেওয়া—এ-রকম আরো বহু কাজ।

রোবটের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটি কমপিউটার, আর তাকে যে সব নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলোকে কমপিউটার প্রোগ্রাম বলা যেতে পারে। এই নীতি কাজে লাগিয়ে পশ্চিমের জগতে নানারকম মোবাইল ডোমেস্টিক রোবট কিংবা পার্সোনাল রোবট তৈরি করা হচ্ছে। আর্ম রোবট বেশিরভাগ কল-কারখানায় কাজে লাগানো হয়। আর টার্টল রোবট বিভিন্ন গবেষণা ও 'বুদ্ধিমান' খেলনা তৈরি করতে বেশি কাজে লাগে।

শিল্পে কোন ধরনের রোবটের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি?

রোবট আবিষ্কারের পর প্রথম যুগের রোবটগুলো ছক বাঁধা কতকগুলো নির্দেশ মেনে 'অন্ধের' মত কাজ করে যেত। তারা পারিপার্শ্বিক থেকে কোনও তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বিচার করে তার ফলাফল অনুযায়ী কাজ করতে পারত না। অর্থাৎ, 'ফিডব্যাক' ক্ষমতা ব্যবহারের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই ধরনের রোবটকে বলা হয় প্রথম 'জেনারেশন' বা প্রথম প্রজন্মের রোবট। কিন্তু প্রযুক্তির দিক থেকে সেকেলে হলেও আধুনিক শিল্প এবং কলকারখানায় যেসব রোবট ব্যবহার করা হয় তার শতকরা 95 ভাগই হল প্রথম প্রজন্মের রোবট। এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট আসলে একটি ধাতব বাহু মাত্র। তাই এর প্রচলিত নাম 'আর্ম রোবট'।

আর্ম রোবট কোন প্রজন্মের রোবট?

কমপিউটার প্রোগ্রামচালিত এ ধরনের আর্ম রোবটের প্রথম মার্কিন পেটেন্ট নেন প্রযুক্তিবিদ জর্জ ডেভল, 1945 সালে। ডেভল ও তাঁর সহকারী জোসেফ এঙ্গেলবার্জার যে শিল্প-রোবট ডিজাইন করেছিলেন, তার কাজ ছিল কারখানার এক জায়গা থেকে জিনিস তুলে নিয়ে সেটা আর-এক জায়গায় রেখে আসা।

ডেভলের প্রস্তাব অনুযায়ী তৈরি শিল্প-রোবটের মোটামুটিভাবে তিনটে অংশ আছে ঃ একটি ধাতব হাত—তাতে আছে বিভিন্ন জয়েন্ট ও আঁকড়ে ধরার গ্রিপার, একটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। আধুনিক শিল্প-রোবটে যান্ত্রিক হাতটিকে যেমন উন্নত করা হয়েছে তেমনই উন্নত করা হয়েছে তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার 'মগজ' হিসেবে এসে গেছে কম্পিউটার।

দ্বিতীয় প্রজন্মের রোবট কাকে বলে?

দ্বিতীয় প্রজন্মের রোবটে রয়েছে 'ফিড্‌ব্যাক' নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ফলে তারা প্রথম প্রজন্মের রোবটের মত 'অন্ধ' নয়। এরা জটিল 'সেন্‌সর' বা অনুভবকের সাহায্যে কৃত্রিম 'চোখ' দিয়ে যেমন 'দেখতে' পায়, তেমনই আছে এদের 'ট্যাক্‌টাইল সিগ্‌ন্যাক' বা স্পর্শ অনুভূতি

তৃতীয় প্রজন্মের রোবট কাকে বলে?

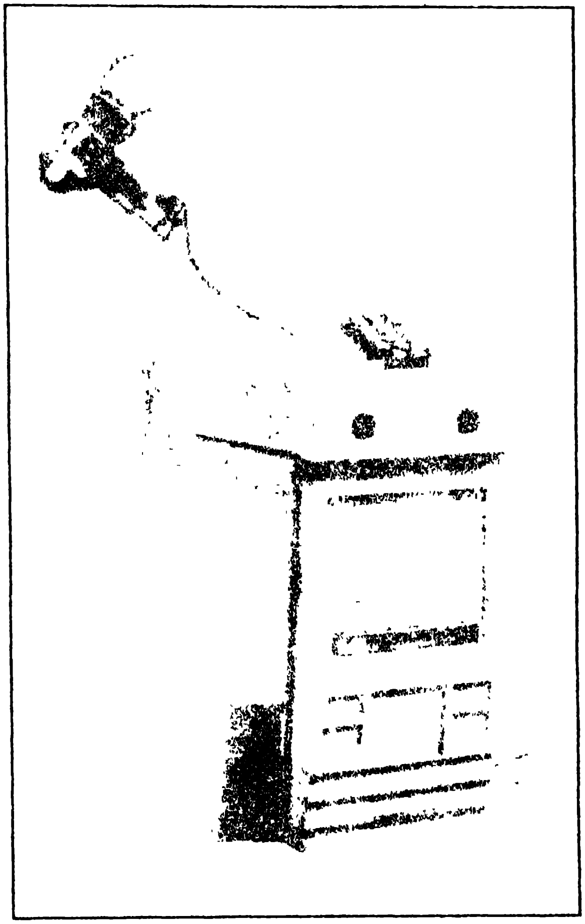
তৃতীয় প্রজন্মের রোবটের জন্য বিজ্ঞানীরা উন্নত কৃত্রিম 'মগজের' কথা ভাবছেন। মানুষ সাধারণ ভাবে বিশেষ একটি ধারায় চিন্তা করে, আশেপাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অবলোকন করে যুক্তি প্রয়োগ করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করে। মানুষের এই চিন্তা করার ধারাটিকে অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা রোবটকে করে তুলতে চাইছেন 'বুদ্ধিমান'। ফলে এই প্রজন্মের রোবটকে 'স্মার্ট' রোবট আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য বিভিন্ন দেশে তৃতীয় প্রজন্মের এই বুদ্ধিমান বা স্মার্ট রোবট এখনও গবেষণার স্তরে রয়েছে।

রোবট কি কোনদিন মানুষের বিকল্প হতে পারবে?

এই গবেষণার সাফল্যের সাম্প্রতিক একটি নজীর হল 'হন্ডা কর্পোরেশন'-এর 'রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট' বিভাগের তৈরি একটি স্বয়ংক্রিয় রোবট। এই রোবটটি উঁচু-নীচু পথে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে, খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠা-নামাও করতে পারে। প্রায় কুড়ি বছরের গবেষণায় তৈরি এই রোবটটির চেহারা অনেকটা মানুষেরই মতো। রোবটটির উচ্চতা প্রায় দু-মিটার ও ওজন (অর্থাৎ, ভর) প্রায় 200 কিলোগ্রাম।

পৃথিবীতে রোবট ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে মাথা পিছু রোবটের সংখ্যা কোন দেশে সবচেয়ে বেশি?

৪0-এর দশকের শেষ দিকের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি দশ লাখ মানুষ পিছু রোবটের সংখ্যা হিসেব করলে



পার্সোনাল রোবট

পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে সুইডেন। সে-দেশে এই সংখ্যা হল 1600। এর অন্যতম কারণ, সুইডেনে শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব। এই হিসেবের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান জাপানের। সেখানে প্রতি দশ লাখ নাগরিক পিছু 1080 টি রোবট রয়েছে। রোবট ব্যবহারকারী উল্লেখযোগ্য দেশগুলোর তালিকায় সবার শেষে ইতালি—তার সাংখ্যমান মাত্র 50। ভারতেও 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট'-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে, তবে সেই সংখ্যা এখনও পর্যন্ত নিতান্তই নগণ্য।

থ্রি-পিন প্লাগের একটি পিন অন্য দুটি পিনের তুলনায় মোটা এবং লম্বা থাকে কেন?

এ সি ভোল্টেজ লাইনে আমরা থ্রি-পিন প্লাগ ব্যবহার ক'রে থাকি। আপাতদৃষ্টিতে প্লাগটিকে ছোট ও তুচ্ছ বলে মনে হলেও এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত।

হিটার, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি বা অন্য কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যখন থ্রি-পিন প্লাগের মাধ্যমে এ সি লাইনে যোগ করা হয়, তখন তিনটি পিন তিনটি ভিন্ন সংযোগ সম্পন্ন করে। সরু ও ছোট পিন দু'টি এ সি 'লাইভ ওয়্যার' ও 'নিউট্রল ওয়্যার'-এ যুক্ত হয়। আর মোটা ও অপেক্ষাকৃত লম্বা পিনটি যুক্ত হয় 'আর্থ ওয়্যার'-এর সঙ্গে।

লাইনের 'লাইভ ওয়্যার'-এ ভোল্টেজ থাকে। যার ফলে লাইন টেস্টার ব্যবহার করলে শুধুমাত্র 'লাইভ ওয়্যার'-এর গর্তে টেস্টার ঢোকালেই আলো জ্বলে ওঠে। সাধারণত 'নিউট্রল ওয়্যার' আর্থ করা থাকে এবং তাতে পজিটিভ বা নেগেটিভ কোনো ভোল্টেজ থাকে না (সেইজন্যই এর নাম 'নিউট্রল' বা উদাসীন)। আর 'আর্থ ওয়্যার'-এ যে কোনো ভোল্টেজ নেই, সে তো তার নামেই স্পষ্ট। সেই কারণেই প্লাগ সকেটের দু'টি গর্তে (নিউট্রল ও আর্থ ওয়্যার-এ) টেস্টার ঢোকালে কোনো আলো জ্বলে না।

যে কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বাইরের ধাতব খোল বা ফ্রেম ইত্যাদি তারের সাহায্যে থ্রি-পিন প্লাগের মোটা পিনটির সঙ্গে যুক্ত করা থাকে। আর সরঞ্জামের বৈদ্যুতিক কয়েল-এর (যেমন, হিটারের কয়েল বা ইলেকট্রিক ইস্ত্রির ভেতরের কয়েল) দু'প্রান্ত যোগ করা থাকে নিউট্রল ও লাইভ ওয়্যারের জন্য নির্দিষ্ট দু'টি সরু পিনের সঙ্গে। লাইভ ও নিউট্রল ওয়্যারের মধ্যে বিভব প্রভেদ থাকে। ফলে প্লাগ সকেটে বসিয়ে দিলেই এই বিভব প্রভেদ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কয়েলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করে এবং কয়েল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

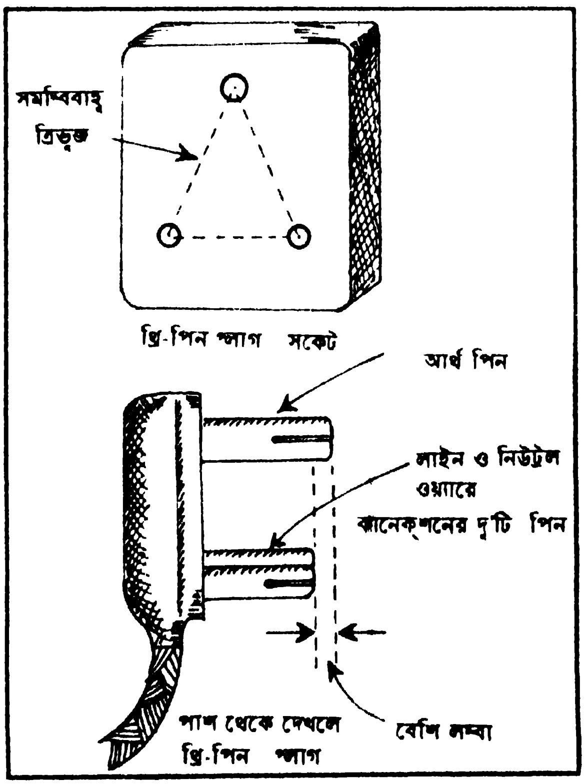
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালু অবস্থায় তার ধাতব খোল বা ফ্রেম-এ হাত দিলে যাতে শক না লাগে সেইজন্য খোলটি যুক্ত করা থাকে আর্থ ওয়্যারের সঙ্গে। এর কারণ, সরঞ্জাম ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা। যদি কোনো কারণে সরঞ্জামের বৈদ্যুতিক কয়েল ধাতব ফ্রেম বা খোল স্পর্শ করে তাহলে সরঞ্জাম চালু করলে তড়িৎ-প্রবাহের একটি অংশ ধাতব ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে সোজা আর্থ ওয়্যারে চলে যাবে। তা যদি না হত, তাহলে ধাতব ফ্রেম তড়িৎ-সজীব হয়ে থাকতো এবং ব্যবহারকারী চালু অবস্থায়

থ্রি-পিন প্লাগে তিনটে পিন থাকে কেন?

সরঞ্জামের ফ্রেম স্পর্শ করলেই তড়িৎ-প্রবাহের একটি অংশ তার দেহ দিয়ে প্রবাহিত হত—অর্থাৎ সে শক খেত।

সুতরাং আর্থ কানেকশন রাখা হয় নিরাপত্তার জন্য। অবাঞ্ছিত তড়িৎ-প্রবাহ যত সহজে আর্থ ওয়্যারে চলে যেতে পারবে, ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা তত জোরদার হবে। কোনো বর্তনী দিয়ে নির্বাধায় তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করতে হলে সেই বর্তনীর রোধ বা রেসিস্ট্যান্স যথাসম্ভব কম হওয়া প্রয়োজন। কোনো তার যত মোটা হয় তার রোধ তত কম হয়। সেই কারণেই রোধ কম রাখার জন্য এবং নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে আর্থ ওয়্যারের পিনটি মোটা রাখা হয়।

আর্থ পিনটি লম্বা রাখার কারণ আর্থ-ওয়্যারের কানেকশনটি সবচেয়ে আগে সম্পন্ন করা। অর্থাৎ নিউট্রল



বা লাইভ ওয়্যারের পিন সকেটের ভেতরে নিউট্রল ও লাইভ ওয়্যারে যুক্ত হওয়ার আগেই লম্বা আর্থ পিন আর্থ ওয়্যারে যুক্ত হয়। ফলে ব্যবহারকারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ধাতব ফ্রেম স্পর্শ ক'রে সরঞ্জাম চালু করলেও, সবচেয়ে আগে সম্পন্ন হওয়া আর্থ কানেকশন তাকে শক খাওয়ার বিপদের হাত থেকে বাঁচায়।

প্লাগ সকেটের সব কটি গর্তে টেস্টার ঢোকালে টেস্টারের আলো জ্বলে না কেন?

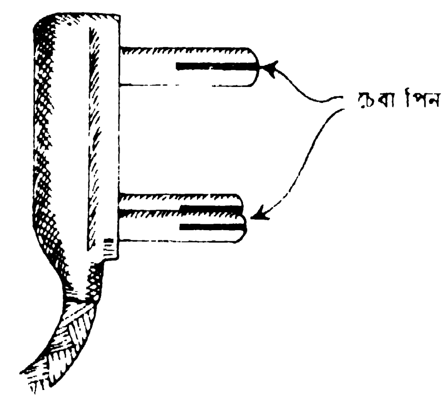
থ্রি-পিন প্লাগ বা সকেটের আরো একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। সেটা হল, তিনটি পিনের কেন্দ্র যোগ করলে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ পাওয়া যায়। এটা করা হয়, ঠিক ঠিক পিন ঠিক ঠিক গর্তে ঢোকানোর ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য। যদি ত্রিভুজটি সমবাহু হত এবং তিনটি পিনই সমান মাপের হত, তাহলে প্লাগটি ঘুরিয়ে তিন রকম ভাবে সকেটে বসানো যেত। তার ফলে আর্থ, নিউট্রল ও লাইভ ওয়্যারের কানেকশনগুলো ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র এক ভাবেই প্লাগ সকেটে ঢুকবে। অবশ্য আর্থ পিন মোটা থাকায় সাধারণ থ্রি-পিন প্লাগে ত্রিভুজটি সমবাহু হলেও তেমন সমস্যা হত না—কারণ তিনটি পিন অন্য কোনো ভাবেই সকেটে ঢোকানো যেত না (যদিও দু'টি সরু পিনকে ঘুরিয়ে একটি মোটা ও একটি সরু গর্তে ঢোকানো সম্ভব হত)। কিন্তু টেলিফোনের প্লাগ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেখানে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ব্যাপারটা কত জরুরি। কারণ সেখানে তিনটি পিনেরই চেহারা হুবহু এক।

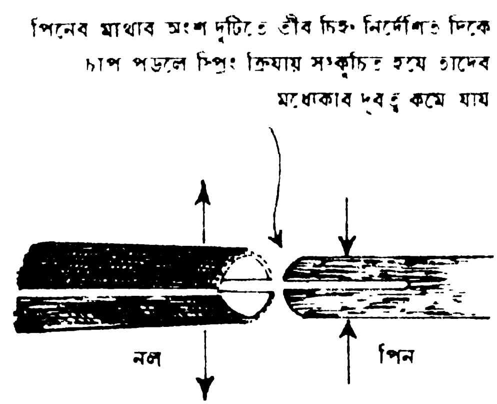
থ্রি-পিন প্লাগের তিনটে গর্তের কেন্দ্র যোগ করলে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ পাওয়া যায়—সমবাহু ত্রিভুজ করা হয় না কেন?

অতএব প্লাগ সব সময়ে সঠিকভাবে সকেটে বসানোর ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে অপেক্ষাকৃত মোটা আর্থ পিন ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আমাদের সাহায্য করে।

থ্রি-পিন বা টু-পিন প্লাগের বেশিরভাগ পিনের মাথাগুলো খানিকটা ক'রে চেরা থাকে কেন?

প্লাগের সকেটের প্রতিটি গর্তের ভেতরে ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পিনগুলো যে-গর্তে গিয়ে ঢোকে সেখানে খানিকটা ভেতরে একটি ক'রে ধাতব নল থাকে। পিনগুলো নলের ভেতরে গিয়ে যত গায়ে এঁটে বসবে, বিভিন্ন ওয়্যারের সঙ্গে (লাইভ ওয়্যার, আর্থ ওয়্যার বা নিউট্রল ওয়্যার) পিনের সংযোগ তত নিখুঁত হবে। তা না হলে পিন ও নলের সংযোগস্থলে উল্লেখযোগ্য রোধ বা রেসিস্ট্যান্স-এর সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে সংযোগস্থল উত্তপ্ত হয়ে উঠে প্লাগটি নষ্ট হতে পারে। এ-ছাড়া সংযোগস্থলে অযথা বৈদ্যুতিক শক্তি নষ্ট হবে। সুতরাং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার কারণে পিনকে নলের ভেতরে এঁটে





চাপ পড়লে নলের ধাতব অংশ দু'টি সংকুচিত বা প্রসারিত হতে পারে। পিন ঢোকানোর সময় অংশ দু'টির মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়, আর পিন বের করে নিলে দূরত্ব স্থায়ী অবস্থায় আসে

বসাতে গেলে উপযুক্ত চাপের প্রয়োজন। আবার এই চাপ বেশি হলে পিন গর্তে ঢোকাতে বা বের করতে কষ্ট হবে। সেই কারণেই পিনের মাথাগুলোকে মাঝামাঝি কিছুটা চিরে সামান্য ফাঁক রেখে স্প্রিং-ক্রিয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। কোনো চিমটের দু'প্রান্ত আঙুলে চাপলে একই ধরনের স্প্রিং-ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। স্প্রিং-ক্রিয়াকে আরো নিখুঁতভাবে কার্যকরী করার জন্য গর্তের ভেতরের নলগুলোকেও বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। সাধারণত দু'টি বাঁকানো ধাতব অংশ সামান্য দূরত্বে রেখে একটি নলের আকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে পিন নলে ঢোকানো বা বের করার সময়ে উভয়ের মধ্যেই স্প্রিং-ক্রিয়া ঘটে। এবং পিন ও নল পরস্পরের গায়ে চাপ দেয়। এই কারণেই প্লাগ সকেটে লাগাতে বা খুলতে আমাদের কোনো অসুবিধে কিংবা কষ্ট হয় না।

বৈদ্যুতিক শক এড়াতে আমরা কাঠের টুল বা পিঁড়ি ব্যবহার ক'রে সজীব বৈদ্যুতিক লাইনে মেরামতের কাজ করি কেন?

কোনো পরিবাহীর দু'প্রান্তে ভোল্টেজ-পার্থক্য বা বিভব-প্রভেদ থাকলে তবেই সেই পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়া সম্ভব। অনেক সময় আমরা যখন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সামান্য বৈদ্যুতিক শক অনুভব করি (যাকে চলতি কথায় 'শক খাওয়া' বলে) তখন সজীব লাইন বা তার থেকে বিদ্যুৎ আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে মেঝেতে প্রবাহিত হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ঘরের মেঝে বা আর্থ সব সময়েই শূন্য ভোল্টেজে থাকে। সেই কারণেই ভোল্টেজ-সম্পন্ন সজীব পরিবাহী ও ঘরের মেঝের মধ্যে বিভব-প্রভেদ থাকে। আমাদের শরীর এই দু'টি বস্তুকে সংযুক্ত করায় আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং আমরা শক অনুভব করি। শক এড়াতে গেলে এই ক্ষতিকর তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যেই

> **হাওয়াই চটি পরে সজীব বৈদ্যুতিক তারে হাত দিলে শক খাই না কেন?**

সতর্কতা হিসেবে কাঠের টুল বা পিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে সজীব বৈদ্যুতিক লাইনে মেরামতের কাজ করা উচিত। এর কারণ, কাঠ হচ্ছে বিদ্যুতের কুপরিবাহী। ফলে তার রোধ অনেক বেশি—অর্থাৎ তড়িৎ-প্রবাহকে সে সম্পূর্ণভাবে বাধা দেবে। সুতরাং সজীব তার ও কাঠের টুলের মধ্যে বিভব-প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারবে না এবং আমাদের শরীর দু'টি বস্তুর (সজীব তার ও কাঠের টুল) মধ্যে সংযোগ সাধন করলেও আমরা কোনো বৈদ্যুতিক শক অনুভব করবো না। একইভাবে হাওয়াই চটি বা রবার সোলের জুতো আমাদের শক খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে—কারণ রবার বিদ্যুৎ-কুপরিবাহী।

ট্রেন বা ট্রামের তারে কিংবা অন্যান্য ওভারহেড লাইনে উচ্চ মানের ভোল্টেজ থাকা সত্ত্বেও পাখিরা নিশ্চিন্তে বসে থাকে কেমন ক'রে?

রাস্তাঘাটে চলার পথে প্রায়ই এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কখনো দেখা যায় না যে, একটি পাখি দু'টি তার স্পর্শ ক'রে বসে আছে।

এর কারণ, কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে গেলে পরিবাহীর দু'প্রান্তের মধ্যে বিভব-প্রভেদ থাকা প্রয়োজন। যখন কোনো পাখি একটি তারের ওপরে বসে থাকে তখন সেই তারটি উচ্চমানের ভোল্টেজ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাখির দেহের দু'প্রান্তে কোনো বিভব-প্রভেদ তৈরি হয় না। ফলে পাখির শরীরের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহিত হয় না এবং পাখিও সহজেই বেঁচে থাকতে পারে। যদি পাখির শরীর একই সঙ্গে তার ও মাটি স্পর্শ করতো তাহলে বিভব-প্রভেদ সৃষ্টি হওয়ার ফলে শক খেয়ে বেচারি মারা যেত। কিন্তু সে বসে থাকে একটি তারে, আর তার শরীরের চারপাশে যে বাতাস থাকে তা সাধারণভাবে বিদ্যুতের কুপরিবাহী। অর্থাৎ সে যেন একটি 'বাতাসের টুলে দাঁড়িয়ে' সজীব তার স্পর্শ করেছে। বাতাস বিদ্যুৎ-কুপরিবাহী হওয়ার ফলে পাখির শরীর দিয়ে কোনোভাবেই তড়িৎ প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু পাখির শরীর যদি ওভারহেড লাইনের দু'টি তার একসঙ্গে স্পর্শ করে তাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিংবা একটি পরিবাহী (কোনো ধাতব তার) যদি তারের ওপরে বসে থাকা পাখিকে এক প্রান্ত দিয়ে ছুঁয়ে তার অন্য প্রান্তটি মাটিতে স্পর্শ করে তাহলে পাখিটির একইরকম করুণ দশা হবে।

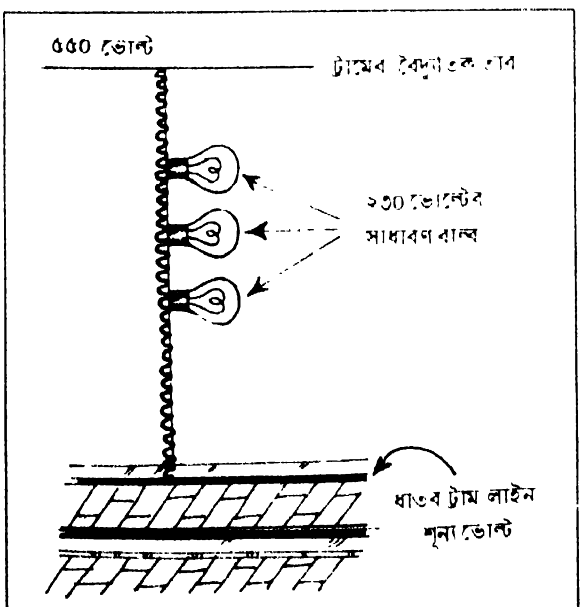
যদি মানুষের শূন্যে ভেসে থাকার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে সজীব বৈদ্যুতিক লাইনে মেরামতের কাজ করার

সময়ে নিরাপত্তার জন্য কাঠের টুল বা পিঁড়ির প্রয়োজন হত না। আমরা পাখিরই মত 'বাতাসের টুলে দাঁড়িয়ে' সেই কাজটুকু নিরাপদে সেরে ফেলতে পারতাম। এই কারণেই শূন্যে লাফিয়ে সজীব তার স্পর্শ করলে শক খাওয়ার ভয় থাকে না।

কেউ যদি শূন্যে লাফিয়ে সজীব বৈদ্যুতিক তারে হাত দেয় তাহলে সে কি শক খাবে?

ট্রামের বৈদ্যুতিক তারে কত ভোল্টেজ থাকে?

ট্রামের বৈদ্যুতিক তারে যে ভোল্টেজ থাকে তা হল 550 ভোল্ট। সেইজন্যই অনেক সময়ে দেখা যায়, ট্রামের বৈদ্যুতিক তারে তদারকির কাজ চালানোর সময়ে কর্মীরা তিনটি সাধারণ বাল্ব পর পর জুড়ে তাদের এক প্রান্ত বৈদ্যুতিক তারে আর অন্য প্রান্ত ধাতব ট্রাম লাইনে স্পর্শ করিয়ে বাল্বগুলো জ্বালিয়ে পরীক্ষা ও মেরামতের কাজ চালায়। এর কারণ, সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্ব 240 ভোল্ট-এ কাজ করার জন্য তৈরি। বেশি ভোল্টেজ-এ যুক্ত করলে এই বাল্ব কেটে যাবে। সুতরাং 550 ভোল্ট-এ কাজ করাতে গেলে অন্তত তিনটি সাধারণ বাল্ব শ্রেণী সমন্বয়ে যুক্ত করতে হবে (যাকে সিরিজ কানেকশন বলা হয়)। তাহলে প্রতিটি বাল্বে



প্রযুক্ত ভোল্টেজ-এর মান হবে 550/3 বা 183 ভোল্ট (প্রায়) এবং বাল্বগুলোর কোনো ক্ষতি হবে না।

ট্রাম মোটরের সাহায্যে চলে। মাথার ওপরের বৈদ্যুতিক তার ও নীচের ধাতব ট্রাম লাইনের সঙ্গে মোটরের দু'প্রান্ত যুক্ত থাকে। ফলে 550 ভোল্টের বিভব-প্রভেদ মোটরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে এবং মোটর ঘুরতে থাকে। তা থেকেই ট্রামের চাকা ঘোরে।

সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের কাচ ফুটো হয়ে গেলে সেটা অকেজো হয়ে যায় কেন?

বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট সাধারণত টাংস্টেন ধাতু দিয়ে তৈরি হয়। টাংস্টেন-এর গলনাঙ্ক 3410 ডিগ্রী সেলসিয়াস। ফলে এই ধাতুর ফিলামেন্টকে খুব উঁচু তাপমাত্রায় উত্তপ্ত ক'রে ফিলামেন্টকে না গলিয়ে তা থেকে আলোক-শক্তি পাওয়া সম্ভব। বৈদ্যুতিক বাল্বের ক্ষেত্রেও ঘটে ঠিক তাই। তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে উত্তপ্ত করলে টাংস্টেন ফিলামেন্ট আলোক-শক্তি দেয়। তবে যে কাচের বাল্বের মধ্যে ফিলামেন্টটি থাকে সেটা অনেক সময়ে নিষ্ক্রিয় গ্যাসে পূর্ণ করা থাকে। এই কাজের জন্য সাধারণত বাল্বটিকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (1.03 কিলোগ্রাম প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটার) নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করা হয়।

উত্তপ্ত ফিলামেন্ট থেকে তাপ পরিচলন, পরিবহণ ও বিকিরণের মাধ্যমে কাচের বাল্বের বাইরে বেরিয়ে এলে অযথা তাপশক্তির অপচয় হয় এবং ফিলামেন্ট পর্যাপ্ত আলোক-শক্তি দিতে পারে না। এই কারণে বাল্ব গবেষণার প্রাথমিক ধাপে সমস্ত কাচের বাল্বকে নাইট্রোজেন পূর্ণ না ক'রে বায়ুশূন্য বা ভ্যাকুয়াম ক'রে রাখা হত। কিন্তু তাতে অন্য অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। কম ওয়াটের বাল্ব এই পদ্ধতিতে ঠিকমত কাজ করলেও বেশি ওয়াটের বাল্ব ঠিক-মত কাজ করতে পারে না। কারণ বেশি ওয়াটের বাল্বে উপযুক্ত আলো পেতে আরো বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। আর উচ্চ তাপমাত্রায় বায়ুশূন্য পরিমণ্ডলে টাংস্টেন ফিলামেন্ট থেকে টাংস্টেন ধাতু ধীরে ধীরে উবে যায়। এর ফলে ফিলামেন্টের তাপমাত্রা খুব বেশি তোলা যায় না—বড়জোর 2400–2500 ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছনো যায়। সুতরাং ফিলামেন্ট থেকে নির্গত আলোক-শক্তি হয় কম।

এই অসুবিধে দূর করতে বেশি ওয়াটের কাচের বাল্বের ভেতরে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ঢোকানো হয়। এতে টাংস্টেন উবে যাওয়ার সমস্যা মেটে এবং আরো উঁচু তাপমাত্রায় (প্রায় 2900 ডিগ্রী সেলসিয়াস) ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত ক'রে তোলা সম্ভব হয়। বায়ুশূন্য বাল্বের তুলনায় নিষ্ক্রিয় গ্যাস পূর্ণ বাল্বে তাপশক্তির অপচয় কিছুটা বাড়লো বটে (কারণ বাল্বের ভেতরের গ্যাস ফিলামেন্ট থেকে বাল্বের কাচে তাপ পরিচলনে সহায়তা করে) কিন্তু উচ্চতর তাপমাত্রায় ফিলামেন্ট কাজ করার ফলে এ-ক্ষেত্রে নির্গত আলোক-শক্তির পরিমাণ আগের তুলনায় বেশি। বাড়িতে সাধারণত যে-বাল্ব আমরা ব্যবহার করি তা বায়ুশূন্য বাল্ব। সেইজনাই এ-ধরনের বাল্ব ফেটে গেলে জোরে শব্দ হয়—কারণ আশপাশের বায়ু শূন্যস্থান পূরণ করতে দ্রুত ধেয়ে আসে।

এখন দেখা যাক, বৈদ্যুতিক বাল্ব ফুটো হয়ে গেলে কী ঘটনা ঘটে।

বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরটা বায়ুশূন্য থাকে না নিষ্ক্রিয় গ্যাসে পূর্ণ থাকে?

উত্তপ্ত অবস্থায় টাংস্টেন ধাতু বায়ুর সংস্পর্শে এলে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এই বিক্রিয়ায় তৈরি হয় টাংস্টেন ট্রাই-অক্সাইড। এই যৌগটির গলনাঙ্ক মাত্র 1473 ডিগ্রী সেলসিয়াস। বাল্বের কাচ ফুটো হয়ে গেলে ভেতরের নিষ্ক্রিয় গ্যাস সরে গিয়ে কিছু বায়ু সেখানে পৌঁছে যায়। তখন বাল্বে ভোল্টেজ দিলে তড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয় এবং ফিলামেন্ট সামান্য উত্তপ্ত হওয়া মাত্রই টাংস্টেন ধাতু বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে টাংস্টেন ট্রাই-অক্সাইড তৈরি করে। ফিলামেন্টের তাপমাত্রা আরো বাড়লে টাংস্টেন ট্রাই-অক্সাইড তার গলনাঙ্কে পৌঁছে যায় এবং ফিলামেন্ট কেটে গিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। এই সমস্ত ঘটনাই ঘটে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। যার জন্য কাচ ফুটো বাল্ব হোল্ডারে লাগিয়ে সুইচ অন্ করা মাত্রই আমরা দেখি, দপ ক'রে এক ঝলক সাদা আলো দিয়েই বাল্ব নিভে গেল—অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে বলা হয়, বাল্ব 'কেটে' গেল।

এ থেকেই বোঝা যায়, নিষ্ক্রিয় গ্যাসপূর্ণ কাচের বাল্বটি ফিলামেন্টের 'স্বাস্থ্যের' জন্য কত জরুরি, আর টাংস্টেন ফিলামেন্টের পক্ষে অক্সিজেন কত ক্ষতিকর।

বৈদ্যুতিক বাল্ব সুইচ অন্ করামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে কেমন ক'রে?

যে কোনো বাল্ব একটা নির্দিষ্ট ওয়াটের হয়—যাকে আমরা বাল্বের পাওয়ার বলি। নির্দিষ্ট ওয়াটের অর্থ বাল্বটি প্রতি সেকেন্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ করতে পারে। বাল্বের ফিলামেন্ট সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং তাপশক্তি থেকে পাওয়া যায় আলোক-শক্তি।

কোনো কঠিন বস্তুকে খুব বেশি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বস্তুটি ভাস্বর হয়ে ওঠে। প্রথমে উত্তপ্ত বস্তুটি লাল হয়, তারপর তাপমাত্রা আরো বাড়ালে তার রঙ হয় হলুদ, আর খুব উঁচু তাপমাত্রায় সে হয় শ্বেত-তপ্ত বা 'হোয়াইট হট'। সাধারণত এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনা ঘটতে কিছুটা সময় লাগে।

কিন্তু বাল্বের ফিলামেন্টের ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো ঘটে যায় প্রায় মুহূর্তের মধ্যে এবং সুইচ অন্ করামাত্রই ফিলামেন্ট শ্বেত-তপ্ত হয়ে জ্বলতে থাকে। এর কারণ ফিলামেন্টের ভর খুব কম এবং তার আপেক্ষিক তাপও কম—মাত্র 0.032 (একক ভরের কোনো বস্তুর এক ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে যে-তাপ লাগে সেটাই সেই বস্তুর আপেক্ষিক তাপের মান)। কোনো বস্তু তাপ গ্রহণ ক'রে কতটা উত্তপ্ত হবে সেটা নির্ভর করে বস্তুর ভর ও আপেক্ষিক তাপের গুণফলের ওপরে। গুণফল বেশি হলে সেই বস্তুর তাপমাত্রা বাড়াতে বেশি তাপের প্রয়োজন হবে এবং সময়ও লাগবে অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু গুণফল যদি কম হয়, তাহলে কম তাপ গ্রহণ ক'রেই বস্তুটি দ্রুত বেশি উত্তপ্ত হয়ে পড়বে। বাল্বের টাংস্টেন ফিলামেন্টের ক্ষেত্রে ভর ও আপেক্ষিক তাপের গুণফল খুবই কম। ফলে তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের জন্য যে-তাপ উৎপন্ন হয় তা অত্যন্ত দ্রুত হারে ফিলামেন্টের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই কারণেই সুইচ অন্ করামাত্রই ফিলামেন্টটি প্রায় 2900 ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পৌঁছে শ্বেত-তপ্ত হয়ে ওঠে ও আলো দেয়।

সুইচ অফ করলে ফিলামেন্ট ঠাণ্ডা হতে তুলনামূলক ভাবে বেশি সময় নেয়, কারণ সে তাপ বর্জন করে অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে। সেইজন্যই পুরোপুরি নিভে

যাবার আগে অনেক ক্ষেত্রে ফিলামেন্টকে লালচে অবস্থায় দেখা যায়।

সুইচ অন্ করামাত্রই হিটার বা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না কেন?

সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে হিটারের কয়েল বা ইস্ত্রির হিটিং কয়েলের (যা ইস্ত্রির ভেতরে অভ্রের পাত দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে) মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয়। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে কয়েলে তাপ উৎপন্ন হয়। এর কারণ শক্তির বিনাশ নেই—তাই বিদ্যুৎ-শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রতি সেকেন্ডে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ কয়েলের রোধ এবং তড়িৎ-প্রবাহের বর্গের গুণফলের ওপরে নির্ভর করে। সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহ শুরু হওয়ামাত্রই কয়েলে নির্দিষ্ট হারে তাপ উৎপন্ন হতে থাকে। এর ফলে কয়েলের তাপমাত্রা বাড়ে। তবে তাপমাত্রা কি হারে বাড়বে সেটা নির্ভর করে কয়েলের ভর ও আপেক্ষিক তাপের গুণফলের ওপরে। হিটার বা ইস্ত্রির কয়েলের ভর বাল্বের ফিলামেন্টের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে এ-জাতীয় কয়েলের ক্ষেত্রে ভর ও আপেক্ষিক তাপের গুণফল বাল্বের ফিলামেন্টের তুলনায় অনেক বড় হয়। সেই কারণেই হিটার বা ইস্ত্রির কয়েলের তাপমাত্রা এক এক ডিগ্রী বাড়াতে বাল্ব-ফিলামেন্টের তুলনায় বেশি তাপের প্রয়োজন হবে। সুতরাং এ-ধরনের কয়েলে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত ধীরে বাড়বে (বাল্বের ক্ষেত্রে যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যায়)। তবে চরম তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠতে মিনিটখানেকের বেশি সময় লাগে না। কয়েলের চরম তাপমাত্রা এমন হিসেব ক'রে ডিজাইন করা হয় যাতে সেটা কয়েলের ধাতুর গলনাঙ্কের বেশ নীচে থাকে। তা না হলে এ-ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালু করতে চাইলে বারবার তার কয়েল কেটে যাবে।

বৈদ্যুতিক হিটারের কয়েল সাধারণত কি ধরনের তার দিয়ে তৈরি করা হয়?

সাধারণত হিটারের কয়েল তৈরি করা হয় নিকেল ও ক্রোমিয়ামের একরকম সংকর ধাতু 'নাইক্রোম' দিয়ে। নাইক্রোমের গলনাঙ্ক প্রায় 1370 ডিগ্রী সেলসিয়াস। অতএব এর ওপর নির্ভর ক'রেই কয়েলের চরম তাপমাত্রা নির্বাচন করতে হয়।

হিটার বা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি যতক্ষণ চালু থাকে ততক্ষণই তার কয়েলে তাপ উৎপন্ন হয়। তাহলে কয়েলের তাপমাত্রা এক টানা বেড়ে না গিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট চরম তাপমাত্রায় স্থির হয় কেমন ক'রে?

যখন কোনো বস্তুর তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকের তুলনায় বেড়ে যায়, তখন সেই উত্তপ্ত বস্তু পারিপার্শ্বিকে তাপ ছেড়ে দিয়ে নিজের তাপমাত্রা কমিয়ে আনতে চেষ্টা করে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বস্তু ও পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা সমান হচ্ছে, ততক্ষণ এই তাপ বর্জন-ক্রিয়া চলতে থাকে। তাপমাত্রার তফাত বাড়লে তাপ বর্জনের হার বেড়ে যায়, আর তফাত কম হলে তাপ বর্জনের হারও কম হয়।

হিটার বা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির উত্তপ্ত কয়েলের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে।

সুইচ অন্ ক'রে কয়েলে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো শুরু হলেই কয়েলে তাপ উৎপন্ন হতে থাকে। ফলে কয়েলের তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকের চেয়ে বেড়ে যায় এবং কয়েল পারিপার্শ্বিকে তাপ বর্জন করতে শুরু করে। প্রথম দিকে তাপমাত্রার এই তফাত কম থাকে বলে কয়েলের তাপ বর্জনের হারও কম থাকে। কিন্তু কয়েলে তাপ উৎপন্ন হওয়ার হার প্রায় একই মানে নির্দিষ্ট থাকে (কারণ তড়িৎ-প্রবাহের মান বা কয়েলের রোধের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না—যার ওপরে উৎপন্ন তাপের হার নির্ভর করে)। ফলে উৎপন্ন তাপ বর্জিত তাপের চেয়ে বেশি হয় এবং কয়েলের তাপমাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকে।

কয়েলের তাপমাত্রা যতই বেড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কয়েলের তাপমাত্রার তফাতও ততই বাড়তে থাকে। ফলে তাপ বর্জনের হারও যায় বেড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তে বাড়তে এই হার এক সময়ে উৎপন্ন তাপের হারের সঙ্গে সমান হয় (কারণ উৎপন্ন তাপের হার গোড়া থেকে প্রায় একই মানে নির্দিষ্ট থাকে)। তখন উৎপন্ন তাপ ও বর্জিত তাপের হার সমান হওয়ায় কয়েলের তাপমাত্রা আর বাড়তে পারে না। ওই অবস্থায় তার যে-তাপমাত্রায় থাকে, সেই চরম মানে স্থির হয়। এই

চরম তাপমাত্রা কয়েলের ধাতুর গলনাঙ্কের চেয়ে বেশ কিছুটা কম হয়।

এই কারণেই হিটার বা ইস্ত্রির কয়েলের তাপমাত্রা একই ভাবে এক টানা বেড়ে যেতে পারে না। যদি তা হত, তাহলে তাপমাত্রা কয়েলের ধাতুর গলনাঙ্কে পৌঁছনোমাত্রই কয়েল কেটে যেত, আর আমরাও কোনোদিন এ-ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারতাম না।

হিটার, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি বা এ-জাতীয় সরঞ্জাম কি বারবার ঠাণ্ডা অবস্থা থেকে চালু করা উচিত?

হিটার বা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির মত সরঞ্জাম ঠাণ্ডা অবস্থা থেকে বারবার চালু করা উচিত হবে না। কারণ ঠাণ্ডা অবস্থা থেকে বারবার চালু করলে এ-জাতীয় সরঞ্জামের পিছনে বিদ্যুৎ খরচ বাড়বে।

হিটার বা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ঠাণ্ডা অবস্থা থেকে চালু করলে বিদ্যুৎ খরচ বেশি হয় কেন?

যে-কোনো ধাতব কয়েলের নির্দিষ্ট রেসিস্ট্যান্স বা রোধ আছে। রোধের ধর্ম হল তড়িৎ-প্রবাহের পথে বাধা দেওয়া। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েলের ধাতুর প্রসারণ ঘটে এবং তার ফলে রোধ বেড়ে যায়। সুতরাং ঠাণ্ডা অবস্থায় হিটার বা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির কয়েলের যা রোধ, উত্তপ্ত অবস্থায় রোধ তার চেয়ে বেশি। এর ফলে, সুইচ অন্ করার সময়ে ঠাণ্ডা কয়েলের মধ্যে দিয়ে যে-পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়, কয়েল উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেই তড়িৎ-প্রবাহের মান কমে যায়। কারণ রোধ বেড়ে গিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের পথে বাধাও যায় বেড়ে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ খরচের হার প্রথম দিকে যা থাকে, পরে তার চেয়ে কমে যায়।

এই কারণেই হিটার বা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি জাতীয় সরঞ্জাম ঠাণ্ডা অবস্থা থেকে বারবার চালু করলে প্রতিবারই চালু করার প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যুৎ খরচের হার বেশি হয়। সেইজন্য হিটার একবার জ্বালিয়ে যাবতীয় রান্নার কাজ একবারে সেরে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি দিয়ে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করার ব্যাপারেও একই নিয়ম মেনে চলতে পারলে আখেরে লাভ হয়।

এ সি ভোল্টেজে সাধারণ টিউব লাইট ঠিকমত আলো দেয়, কিন্তু ডি সি-তে কিছুক্ষণ জ্বলার পরে তার অর্ধেকটা নিভুনিভু হয়ে আসে কেন?

চলতি কথায় টিউব লাইটকে অনেক সময়ে নিওন লাইট বলা হয়। কিন্তু এর মধ্যে নিওন গ্যাসের ছিটেফোঁটাও থাকে না। তা যদি থাকতো তাহলে টিউব লাইটের আলোর রঙ হত লালচে কমলা।

তবে টিউব লাইটের ভেতরে কী থাকে?

টিউব লাইটের দু'প্রান্তে থাকে দু'টো ধাতব ফিলামেন্ট। সহজে ইলেকট্রন মুক্ত করার জন্য ফিলামেন্ট দু'টোর ওপরে বিশেষ ধরনের অক্সাইডের আস্তরণ লাগানো থাকে

টিউব লাইটের ভেতরে কী থাকে?

এবং লম্বা কাচনলের ভেতরে চাপ রাখা হয় খুব কম। এ-ছাড়া নলের ভেতরে সামান্য পারদ রাখা থাকে, আর কাচের ভেতরের দিকে দেওয়া থাকে প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ।

টিউব লাইট চালু করলে স্টার্টারের (বা স্টার্টার সুইচ) সাহায্যে ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং ফিলামেন্ট দু'টো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন কণা মুক্ত হয়। ফলে টিউবের দু'প্রান্তের মধ্যে তড়িৎ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ ডায়োড ভাল্‌ভের মত দু'টো ফিলামেন্টের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয়। তখন স্টার্টার সুইচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অফ হয়ে যায়। ফলে লাইট চালু করার সময়ে প্রাথমিকভাবে ফিলামেন্ট উত্তপ্ত করার জন্যে যে-তড়িৎ স্টার্টারের মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছিল তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে দুই ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে যে তড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয়েছে তা ফিলামেন্ট দু'টোকে উত্তপ্ত রাখতে পারে এবং ইলেকট্রনও নিয়মিত ভাবে মুক্ত হয়।

এই সব ঘটনার সময় টিউবের ভেতরে নিম্নচাপে রাখা পারদ বাষ্পে পরিণত হয়। অসংখ্য গতিশীল ইলেকট্রন চলার পথে অসংখ্য পারদ পরমাণুকে ধাক্কা মারে এবং তার ফলে অতিবেগুনি রশ্মি উৎপন্ন হয়। এই অতিবেগুনি রশ্মির আলোয় আমরা ভাল করে দেখতে পাই না। তা ছাড়া অতিরিক্ত মাত্রার এই রশ্মি আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

তাহলে টিউব লাইটের আলোয় আমরা দেখতে পাই কেমন ক'রে?

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটুকু সম্ভব ক'রে তোলে টিউবের ভেতরের প্রতিপ্রভ আস্তরণ। অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিপ্রভ আস্তরণের ওপরে আছড়ে পড়লেই প্রতিপ্রভার ফলে আমরা দৃশ্য আলো বা 'ভিজিব্‌ল্ লাইট' পাই।

পারদ বাষ্পের মোক্ষণ বা ডিসচার্জের ফলেই টিউব লাইট আলো দিতে সক্ষম হয়। মোক্ষণ প্রক্রিয়ার সময়ে অনেক পারদ পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়ে পজিটিভ চার্জযুক্ত হয়ে পড়ে। ডি সি-তে যখন টিউব লাইট কাজ করে তখন ভেতরের ফিলামেন্ট দু'টোর মধ্যে একটি পজিটিভ ও অন্যটি নেগেটিভ থাকে। ফলে পজিটিভ চার্জযুক্ত পারদ পরমাণু (যাদের পারদ আয়ন বলা হয়) নেগেটিভ ফিলামেন্টের দিকে আকৃষ্ট হয়। যতক্ষণ টিউব লাইট কাজ করে ততক্ষণই এই ঘটনা চলতে থাকে। আবার একইসঙ্গে বহু পারদ আয়ন ছুটোছুটি করা মুক্ত ইলেকট্রনকে বন্দী ক'রে নিস্তড়িৎ পারদ পরমাণু গঠন করে। এইভাবে পারদ বাষ্পের বেশিরভাগ পরমাণু টিউব লাইটের নেগেটিভ প্রান্তে গিয়ে জমা হয়। ফলে শুধু সেই দিকটাই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। আর পারদ পরমাণুর সংখ্যা যে-প্রান্তে কমে যায় সে-দিকটা অন্ধকার হয়ে আসে। এই ঘটনাকে বলা হয় 'মাইগ্রেশান অফ মারকারি' বা 'পারদের পরিযাণ'।

ডি সি-তে টিউব লাইটের এ-রকম অর্ধেক নিভুনিভু অবস্থা হলে আমরা কি করি? টিউবের প্লাগটি খুলে নিয়ে উল্টে লাগাই। এর ফলে নেগেটিভ ফিলামেন্ট পজিটিভ হয়ে যায় এবং পজিটিভ প্রান্ত হয়ে যায় নেগেটিভ। তখন পারদ বাষ্প আবার উল্টো দিকে রওনা হয়। আর টিউব লাইটও কিছুক্ষণ ঠিকমত আলো দেয়। কিন্তু আধঘণ্টাখানেক পরেই আবার সেই একই ঘটনা—পারদের নতুন পরিযাণ শুরু হয়; পারদ-পরমাণুরা গিয়ে জমা হয় টিউবের অন্য প্রান্তে; ফলে বিপরীত প্রান্ত আবার নিভুনিভু হয়ে যায়।

অতএব ডি সি-তে টিউব লাইট থেকে ঠিকমত আলো পেতে গেলে অন্তত আধঘণ্টা অন্তর অন্তর টিউবের প্লাগটিকে উল্টে দিতে হবে। অনেক সময়ে এই কাজটির জন্য টিউব লাইটের বর্তনীতে অটোমেটিক রিভার্সিং সুইচ লাগানো হয়।

এ থেকেই বোঝা যায় এ সি-তে টিউব লাইট কেন ঠিক মত কাজ করে। এ সি ভোল্টেজের বেলায় ফিলামেন্ট দু'টো নিজে থেকেই একবার পজিটিভ আর একবার নেগেটিভ হয়। এর কারণ, এ সি ভোল্টেজ প্রতি সেকেন্ডে একশোবার দিক পরিবর্তন করে (অর্থাৎ যথাক্রমে একশোবার পজিটিভ-নেগেটিভ হয়)। ফলে কোনো ফিলামেন্টই বরাবরের মত নেগেটিভ হয়ে থেকে পারদ আয়নগুলোকে আকর্ষণ ক'রে একেবারে বন্দী করে রাখতে পারে না। সেইজন্য পারদ পরমাণুর পক্ষে পরিযাণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে আর টিউব লাইটও ঠিকমত জ্বলে।

'পারদের পরিযাণ' বলতে কী বুঝি?

কমপিউটার



বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে আজ যে শাখাটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে, তা হল কমপিউটার।

গণনা মানুষের প্রথম শিক্ষা। আঙুলে বা নুড়ি দিয়ে গণনার যে স্থূল সূচনা, বুদ্ধির অনুশীলনে তা শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে কমপিউটারে। তার কাজ চলে মানব মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুযায়ী, কিন্তু দ্রুততায়, ক্ষিপ্রতায়, দক্ষতায় এবং ত্রুটিহীনতায় সে মানব মস্তিষ্ককে ছাড়িয়ে গেছে বহুগুণে। বিরামবিহীন এবং ক্লান্তিহীন সে কাজ করে চলেছে নিপুণতার সঙ্গে।

কমপিউটার আজ শুধু পাটিগণিতের পরিমণ্ডলেই বাঁধা পড়েনি সে আজ দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে গেছে বহুদূর পর্যন্ত।

ইংরেজি শব্দ Computer আজ বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। গণনাযন্ত্র হিসেবে যে কাজ করে তাকে হয়তো যন্ত্রগণক বলা চলে, কিন্তু কমপিউটারের (Computer) কোনো বিকল্প নেই।

নাম কেন কমপিউটার?

কমপিউটার নামটি আমাদের সকলেরই পরিচিত। কিন্তু কমপিউটার নামের উৎপত্তি হল কি ভাবে?

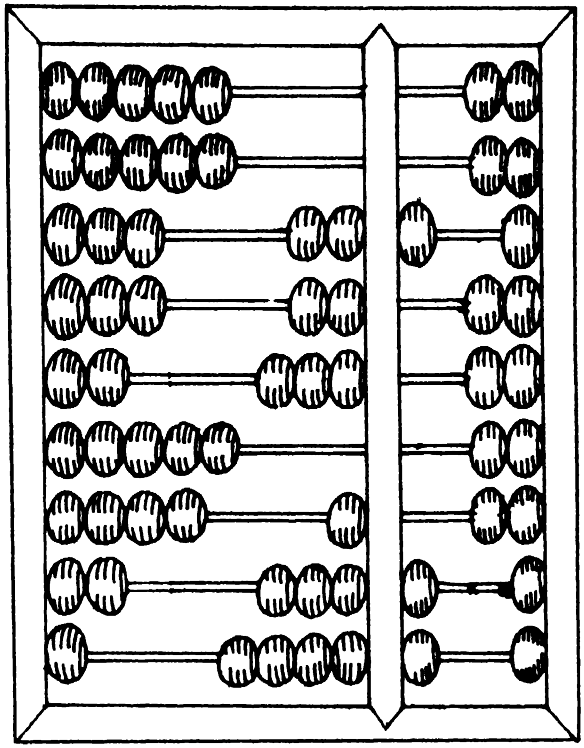
ইংরেজি শব্দ 'কমপিউট' থেকে এই নামের উৎপত্তি। 'কমপিউট' শব্দের অর্থ হিসেব করা বা গণনা করা। যে যন্ত্র হিসেব অর্থাৎ গণনা করতে পারে তাকে 'কমপিউটার' বলা হয়ে থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মত বিভিন্ন ধরনের গণিতের কাজ করা সম্ভব। ক্যালকুলেটারের সাহায্যেও আমরা গণনা করি। কিন্তু কমপিউটারের বিশেষত্ব এই যে, একটি সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব নির্দেশের প্রয়োজন তা আগে থেকেই কমপিউটারে সঞ্চয় করে একটির পর একটি নির্দেশ পালন করে সমস্যাটির সমাধান করা যায়। অন্যদিকে ক্যালকুলেটারে একটি নির্দেশ পালন করার পরই অপর একটি নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে নির্দেশগুলি আগে থেকে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। এই নির্দেশগুলি দুটি সংখ্যার যোগ বা গুণ বা এ রকম কিছু হতে পারে।

কমপিউটারের সঙ্গে ক্যালকুলেটারের কি তফাত ?

অতি প্রাচীনকালে কিভাবে গণনার কাজ করা হত?

সভ্যতার শুরু থেকেই গণনার কাজ। কিন্তু একেবারে প্রথমদিকে গণনা করা হত কি ভাবে?

একেবারে প্রথমদিকে আঙুলকে গণনার কাজে ব্যবহার করা হত। এরপর এল পাথর ও নুড়ির সাহায্যে গণনা। প্রথম যে যন্ত্র গণনার কাজে ব্যবহার করা হল তার নাম 'অ্যাবাকাস' (Abacus)। এতে একটি কাঠের বা ধাতুর ফ্রেমে কয়েক সারি তার এবং প্রত্যেক সারির মধ্যে কয়েকটি পুঁতির সাহায্য নিয়ে গণনা করা হয়ে থাকে। 1700 খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে জন নেপিয়ার গণনার জন্য 'স্লাইড রুল' ব্যবহার করলেন। এরপর ক্রমশ বড় বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগফল নির্ণয়ের জন্যে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার শুরু হল।



কমপিউটার তৈরির কাজ শুরু হল কবে থেকে?

কমপিউটার বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তা তৈরির কাজ শুরু হয় 1942 খ্রিস্টাব্দে। এই যন্ত্রটির জন্ম 1946 খ্রিস্টাব্দের 15 ফেব্রুয়ারি। এর নাম 'এনিয়াক' (ENIAK - Electronic Numerical Integrator And Calculator)। তবে এই যন্ত্র তৈরির অনেক আগেই বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের যন্ত্র তৈরির চেষ্টা চলতে থাকে। 1642 খ্রিস্টাব্দে পাসকাল (Pascal) একটি গণক-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যে খুবই দ্রুত যোগ করা সম্ভব হল। গণিতবিদ্ লিব্‌নিজ (Leibnitz) এই যন্ত্রের উন্নতি করেন। তিনিই প্রথম 0 এবং 1 -এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। এরপর চার্লস ব্যাবেজ 1833 খ্রিস্টাব্দে প্রথম একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। এর নাম দেওয়া হয় 'অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন' (Analytical Engine)। চার্লস ব্যাবেজের পরিকল্পনার অনেকটাই আধুনিক কালের কমপিউটারে ব্যবহার করা হয়েছে। 1890 খ্রিস্টাব্দে হার্মান হলারিথ এক ধরনের কার্ড নিয়ে গণনার কাজ করেন। এই কার্ডের বিভিন্ন স্থানে ছিদ্রের সাহায্যে বিভিন্ন সংখ্যা বোঝানো হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে 1944 খ্রিস্টাব্দে

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হারভার্ড-মার্ক' নামে একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় গণনার যন্ত্র তৈরি হয়।

কমপিউটারের বর্তমান অবস্থার জন্য ডঃ জন ভন নয়ম্যানের অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনিই প্রথম বলেন যে, একটি সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব নির্দেশের প্রয়োজন তা আগে থেকেই কমপিউটারের মধ্যে সঞ্চয় করে রেখে একের পর এক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই নির্দেশগুলি পালন করা সম্ভব। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় এডভ্যাক কমপিউটার (EDVAC— Electronic Discrete Variable Automatic Computer)। এই সময়েই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি যন্ত্র তৈরি হয়। এর নাম 'এডস্যাক' (EDSAC — Electronic Delay Storage Automatic Calculator)।

কমপিউটার বলতে সাধারণত কি ধরনের কমপিউটার বোঝানো হয়?

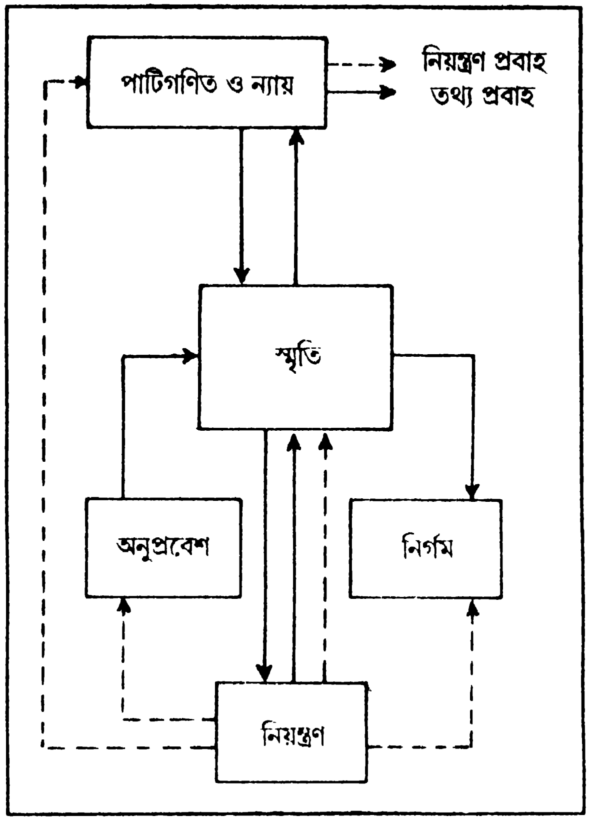
কমপিউটার বলতে সাধারণত সংখ্যাত্মক (Digital) কমপিউটারকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এই সব কমপিউটারে সংখ্যাকে সংখ্যা হিসেবেই দেখানো হয়। এ ছাড়া আর যে কমপিউটারের ব্যবহার আছে তা অনুরূপ (Analog) কমপিউটার নামে পরিচিত। এই কমপিউটারে সংখ্যাকে অন্য কিছু দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন, নেপিয়ারের 'স্লাইড রুল' একটি অনুরূপ কমপিউটার বলা যেতে পারে। এখানে সংখ্যাকে দৈর্ঘ্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আজকাল ঘড়িও দু' রকমের পাওয়া যায়—অনুরূপ ঘড়িতে ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটার অবস্থান থেকে সময় জানা যায় এবং সংখ্যাত্মক ঘড়িতে সংখ্যার সাহায্যেই সময় নির্দেশ করা হয়।

কমপিউটারের কি কি অংশ থাকে?

একটি কমপিউটারে সাধারণত পাঁচটি অংশ থাকে—স্মৃতি (Memory), নিয়ন্ত্রণ (Control), পাটিগণিত ও ন্যায় (Arithmetic and Logic), অনুপ্রবেশ (Input) এবং নির্গম (Output)।

স্মৃতির নামকরণ থেকে স্মৃতি অংশের ব্যবহার অনেকটা বোঝা যায়।

কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব নির্দেশ প্রয়োজন সেই সব নির্দেশ এবং সেই সঙ্গে যে তথ্য (Data) এই



নির্দেশগুলি কাজে লাগাবে তা স্মৃতিতে রাখা হয়। নিয়ন্ত্রণ অংশের কাজ বিশ্লেষণ করা। নিয়ন্ত্রণ অংশ স্মৃতি থেকে একটি নির্দেশ এনে তা বিশ্লেষণ করে দেখে এটি কি ধরনের নির্দেশ। যদি পাটিগণিতের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অংশ পাটিগণিত ও ন্যায় অংশকে নির্দেশ পাঠায় এবং এই নির্দেশ অনুযায়ী পাটিগণিত ও ন্যায় অংশ কাজ করে। এই ভাবে একের পর এক নির্দেশ চলে, নিয়ন্ত্রণ অংশটি কাজ করতে থাকে এবং ফলাফল প্রকাশের প্রয়োজন হলে নির্গম অংশকে নির্দেশ পাঠায়। আবার কোনো তথ্য ও নির্দেশ কমপিউটারের স্মৃতিতে আনতে হলে অনুপ্রবেশ অংশের সাহায্য নেওয়া হয়। কমপিউটারের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘটে অনুপ্রবেশ এবং নির্গম অংশের মাধ্যমে। আজকাল অনেক কমপিউটারেই নিয়ন্ত্রণ এবং পাটিগণিত ও ন্যায় অংশ দুটি একত্রে 'সিপিউ' (CPU — Central Processing Unit) নামে পরিচিত।

কমপিউটার হার্ডওয়্যারে প্রজন্ম বলতে কি বোঝায়?

মানব বিকাশের ধারায় প্রজন্ম আছে। প্রথম প্রজন্মের পরে দ্বিতীয় প্রজন্ম, তারপর আবার পরবর্তী প্রজন্ম। কমপিউটারেও সে-রকম। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম। কমপিউটারের যে প্রথম প্রজন্ম, তাতে ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ ব্যবহার হত। 'এনিয়াক' কমিপিউটারটি প্রথম প্রজন্মের নিদর্শন। এরা আকারে বৃহৎ। এনিয়াক কমপিউটারে 18000 ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ ছিল। এদের সময়কাল 1940 থেকে 1952 পর্যন্ত। দ্বিতীয় প্রজন্ম কমপিউটারে দেখা গেল ট্রানজিসটার। ট্রানজিসটার আকারে অনেক ছোট হওয়াতে এই সব কমপিউটার আকারে ছোট কিন্তু কাজ করতে পারে প্রথম প্রজন্মের থেকে অনেক দ্রুত। 1952 থেকে 1964 এর সময়কাল বলা চলে।

তৃতীয় প্রজন্মের কমপিউটারগুলি তৈরি করা আরম্ভ হল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের সাহায্যে। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটকে সংক্ষেপে বলা হয় আই সি (IC)। এরা আকারে আরো ছোট কিন্তু কাজ করতে পারে অনেক দ্রুত। এর সময়কাল 1964 থেকে 1972 পর্যন্ত। এরপর এল চতুর্থ প্রজন্মের কমপিউটার। এখানে যে সব আই সি আছে সেখানে 5 বর্গ মিমি ও 1 মিমি বেধের আয়তনে 30000-এর মত যন্ত্রাংশের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়েছে। কাজেই এরা আকারে খুব ছোট হলেও অনেক বেশি কাজ করার ক্ষমতাযুক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জগতে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কমপিউটারেও নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটছে।

'রম' ও 'র‍্যাম'-এর পার্থক্য কি?

কমপিউটারে সাধারণত দু' ধরনের স্মৃতি ব্যবহার করা হয়। এক ধরনের স্মৃতিকে 'রম' (ROM — Read Only Memory) বলে। এই ধরনের স্মৃতি তৈরির সময়ে যা সঞ্চয় করা হয় তা সহজে মুছে যায় না, কমপিউটার চালানোর পর সুইচ বন্ধ করে দিলেও এর সঞ্চিত তথ্য থেকে যায়। এই ধরনের স্মৃতি থেকে সহজে যেমন কিছু মোছা যায় না তেমনি আবার নতুন তথ্যও কমপিউটার দিয়ে সহজে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়

দ্বিতীয় ধরনের স্মৃতিকে 'র‍্যাম' (RAM — Random Access Memory) বলা হয়। এখানে কমপিউটারের সাহায্যে তথ্য সঞ্চয় করা সম্ভব, সেই সঞ্চিত তথ্য দিয়ে কাজ করে তার জায়গায় আবার নতুন তথ্য সঞ্চয় করা যায়। এখানে কোনো তথ্য থাকলে কমপিউটারে সুইচ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা মুছে যায়। এই সব স্মৃতিতে কয়েক হাজার কোষ থাকা সম্ভব এবং যে কোনো একটি কোষ থেকে তথ্য আনতে বা রাখতে কমপিউটারের একই সময় লাগে।

কমপিউটারে এই দুই ধরনের স্মৃতিরই প্রয়োজন আছে। কমপিউটার যখন চালানো শুরু হয় তখন 'রম' স্মৃতিতে যে সব নির্দেশ সঞ্চিত থাকে তার সাহায্যেই কাজ আরম্ভ করতে পারে। এই নির্দেশগুলি না থাকলে কমপিউটারে কাজ আরম্ভ করার খুব অসুবিধে হত। কাজেই সুইচ বন্ধ করলেও এই সব নির্দেশ যাতে মুছে না যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার কমপিউটারের সাহায্যে নতুন সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজনে নির্দেশগুলি স্মৃতিতে রাখার দরকার। সেক্ষেত্রে 'র‍্যাম' স্মৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে।

কত বিভিন্ন ধরনের স্মৃতি (Memory) সাধারণত ব্যবহৃত হয়?

কমপিউটারে নিয়ন্ত্রণ এবং পাটিগণিত ও ন্যায় অংশে নির্দেশ এবং তথ্য এনে কাজ করার জন্য যে জায়গা থাকে তা বিশেষ স্মৃতি অংশ হিসেবে চিহ্নিত। এই ধরনের স্মৃতিকে 'রেজিস্টার' (Register) বলে। এই রেজিস্টারও মূল স্মৃতিকোষের ন্যায় কতকগুলি বিট দিয়ে তৈরি। একটি রেজিস্টারে বিটের সংখ্যা এবং মোট কত গুলি রেজিস্টার থাকবে তা সেই কমপিউটারের ওপর নির্ভর করে। এই রেজিস্টারগুলির কাজ করার ক্ষমতা খুব দ্রুত।

কমপিউটারের মূল স্মৃতি এবং রেজিস্টারের মধ্যে আর এক ধরনের স্মৃতির ব্যবহার হয়। এর নাম ক্যাশে (Cache) স্মৃতি। রেজিস্টারগুলি খুব দ্রুত কাজ করায় সক্ষম। কিন্তু রেজিস্টার তৈরি করতে বেশি অর্থের প্রয়োজন। সেইজন্যে একটি কমপিউটারে বেশি সংখ্যক রেজিস্টার রাখা সম্ভব নয়। এদিকে মূল স্মৃতি থেকে রেজিস্টারে নির্দেশ এবং তথ্য আনতে সময় বেশি লাগে। কাজেই আজকাল প্রায় সব কমপিউটারেই ক্যাশে স্মৃতি রাখার ব্যবস্থা আছে। মূল স্মৃতি থেকে কিছু সংখ্যক নির্দেশ

ও তথ্য এই স্মৃতিতে রাখা হয়। কোনো নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার সময় নিয়ন্ত্রণ অংশ নির্দেশটি ও তার আনুষঙ্গিক তথ্য ক্যাশে স্মৃতি থেকে রেজিস্টারে নিয়ে আসে। ক্যাশে স্মৃতির দাম মূল স্মৃতির চেয়ে বেশি কিন্তু রেজিস্টারে তথ্য আনতে সময় লাগে কম। বেশি অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে এই স্মৃতিও খুব বেশি পরিমাণে রাখা সম্ভব নয়।

প্রথম দুই ধরনের স্মৃতি থেকে মূল স্মৃতির দাম কম হওয়াতে এই ধরনের স্মৃতি কিছুটা বেশি পরিমাণে রাখা হয়ে থাকে। এই স্মৃতি সাধারণত দু' ধরনের হয়— 'রম' ও 'র‍্যাম'।

অনেক সময়ে কোনো সমস্যা সমাধানে প্রচুর পরিমাণে তথ্য রাখার প্রয়োজন হয়। এত তথ্য এক সঙ্গে মূল স্মৃতিতে রাখতে হলে প্রচুর মূল স্মৃতির দরকার। কিন্তু মূল স্মৃতির দাম সহযোগী (Auxilary) স্মৃতি থেকে অনেক বেশি। সেইজন্যে সব তথ্যই প্রথমে সহযোগী স্মৃতিতে রাখা হয়। এরপর কিছু সংখ্যক তথ্য মূল স্মৃতিতে এনে কাজ করে তা আবার সহযোগী স্মৃতিতে রেখে অন্য তথ্য আনা হয়। ম্যাগনেটিক ডিস্‌ক, ফ্লপি ডিস্‌ক, ম্যাগনেটিক টেপ সহযোগী স্মৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

একটি কমপিউটারের সঙ্গে অনেক ধরনের স্মৃতি রাখা সম্ভব। কোন স্মৃতি কি পরিমাণে আছে তার ওপর কমপিউটারের দাম এবং কাজ করার ক্ষমতা নির্ভর করে।

কত বিভিন্ন ধরনের অনুপ্রবেশ অংশ পাওয়া যায় কমপিউটারে?

নানা ধরনের অনুপ্রবেশ অংশ পাওয়া যায় কমপিউটারে।

কমপিউটারের সঙ্গে যে 'কী-বোর্ড' থাকে তার সাহায্যে নির্দেশ ও তথ্য কমপিউটারের স্মৃতিতে সঞ্চয় করা যায়। ওই 'কী বোর্ড'কে একটি অনুপ্রবেশ অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। সাতের দশক পর্যন্ত এক ধরনের কার্ডের ব্যবহার হত। এই কার্ডে ছিদ্রের সাহায্যে বিভিন্ন অক্ষর ও অঙ্ক বোঝানো সম্ভব। কাজেই কোনো নির্দেশ ও তথ্য এই কার্ডের মাধ্যমে দেওয়া যায়। এই কার্ডটি পড়ে তার তত্ত্ব কমপিউটারে আনতে হলে কার্ড রীডারের সাহায্যে তা করা হত। তখন এই কার্ড রীডারের ব্যবহার ছিল একটি অনুপ্রবেশ অংশ হিসেবে। কার্ডের ব্যবহারের আগে পেপার টেপের ব্যবহার ছিল এবং পেপার টেপ রীডারকে অনুপ্রবেশ অংশ হিসেবে দেখা যেত।

আজকাল গ্রাফিক্‌সের ক্ষেত্রে 'ডেটা ট্যাবলেট' (Data tablet) অনুপ্রবেশ অংশ হিসেবে ব্যবহার হয়। এর সাহায্যে সংখ্যাত্মক সংকেত তৈরি করা যায়। 'মাউস' নামে একটি যন্ত্র-হাতের সাহায্যে কোনো কমপিউটারের পর্দায় একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করা সম্ভব। এটি একটি অনুপ্রবেশ অংশ। লাইট পেনও কমপিউটারের পর্দায় নির্দিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট ক'রে কমপিউটারে কিছু সংকেত পাঠানো যায়। বিভিন্ন ধরনের ডিস্‌ক্‌ও অনুপ্রবেশ অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ম্যাগনেটিক টেপও অনুপ্রবেশ অংশ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে।

কত বিভিন্ন ধরনের নির্গম অংশ হয় কমপিউটারে?

কমপিউটার এবং তার পরিচালকের মধ্যে তথ্য ও নির্দেশাবলীর আদান-প্রদান ঘটানো সম্ভব বিভিন্ন অনুপ্রবেশ ও নির্গম অংশের সাহায্যে। নির্গম অংশ হিসেবে প্রিন্টারের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। প্রিন্টার সাধারণত দু'ধরনের হয়। এক ধরনের প্রিন্টারে অক্ষর এবং কাগজের মধ্যেকার মসীলিপ্ত ফিতের ওপর অক্ষরগুলি আঘাতের ফলেই ছাপ ফুটে ওঠে এবং অন্য আর এক ধরনে বিনা আঘাতেই এই অক্ষরের ছাপ ফোটানো হয়। দ্বিতীয় ধরনের প্রিন্টারে মেকানিক্যাল যন্ত্রাংশ না থাকায় এরা অত্যন্ত দ্রুত কাজ করতে পারে কিন্তু এদের দাম খুব বেশি। এই রকমের প্রিন্টারের উদাহরণ হিসেবে 'লেসার' প্রিন্টারের উল্লেখ করা যায়। এখানে ছাপানোর কাজ চলে 'লেসার' প্রয়োগ করে। প্রথম ধরনের প্রিন্টারকে আবার দু'ভাবে ভাগ করা যায়। এর একটিতে এক লাইনের সব কটি অক্ষর একসঙ্গে ছাপানো যায় এবং এর নাম লাইন প্রিন্টার। অন্যটিতে ছাপানো সম্ভব একটি করে অক্ষর এবং তার নাম 'ডট ম্যাট্রিক্স' প্রিন্টার। আরো এক ধরনের প্রিন্টার ব্যবহার হয়। এদের বলা হয় ইন্‌কজেট (Ink Jet) প্রিন্টার। এতে থাকে কালির কাট্রিজ (Ink Cartridge)।

কমপিউটারের নির্গম অংশ হিসেবে খুবই জনপ্রিয় টিভির মত একটি পর্দা থাকে। একে বলা হয় ভিসুয়্যাল ডিসপ্লে ইউনিট (V D U)। প্রায় সমস্ত কমপিউটারের সঙ্গে এই ইউনিটকে দেখা যায়। কমপিউটার কিছু নির্দেশ বা তথ্য বা ফলাফল পরিচালককে জানাতে চাইলে এই পর্দায় ফুটে ওঠে। এই পর্দাতে সাধারণত এক সঙ্গে 25 লাইন এবং 1 লাইনে 40টির মত অক্ষর দেখা যেতে পারে। এই V D U সাদা কালো এবং রঙিন দু' ধরনেরই হতে পারে।

এছাড়া ফ্লপি ডিস্ক বা ম্যাগনেটিক টেপ নির্গম ও অনুপ্রবেশ অংশ দু'ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে।

ওপরে যে সব নির্গম অংশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে মাল্টিমিডিয়া (Multimedia) ভিত্তিক কমপিউটারে তা ছাড়াও সাউণ্ড বক্স (Sound Box) থাকে।

'বিট' ও 'বাইট' কাকে বলে?

কমপিউটারে বিট এবং বাইট দুটি খুব পরিচিত শব্দ। কিন্তু বিট ও বাইট বলতে কি বোঝানো হয়?

কমপিউটারের ভাষায় 0 এবং 1 অঙ্ক দুটিকে বিট (Bit) বলা হয়। Binary digit এই ইংরেজি শব্দ দুটির প্রথমটির প্রথম অক্ষরটি এবং দ্বিতীয়টির শেষ দুটি অক্ষর নিয়ে এই Bit শব্দটি গঠন করা হয়েছে। কমপিউটারে নির্দেশ ও তথ্য এই 0 এবং 1 -এর সাহায্যে রাখা হয়ে থাকে।

একটি বাইট (Byte) কয়েকটি বিটের সমষ্টি। কমপিউটারে কোনো একটি অক্ষর বা চিহ্নের জন্য একটি বাইটের প্রয়োজন। একটি কমপিউটারে অক্ষর বা চিহ্ন বোঝানোর জন্য তিন ধরনের সংকেত পদ্ধতি আছে —6-বিট 'বিসিডি' (BCD - Binary Coded Decimal), 7-বিট 'অ্যাসকাই' (ASCII - American Standard Code for Information Interchange) এবং 8-বিট 'ইবিসিডি-আইসি (EBCDIC–Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)। এর মধ্যে কমপিউটার যে কোনো এক ধরনের সংকেত পদ্ধতি ব্যবহার করে। সাধারণত বাইট বলতে 8টি পরপর বিটকেই বোঝানো হয়। কাজেই 'ইবিসিডিআইসি' সংকেত পদ্ধতিতে একটি বাইটের সাহায্যে একটি চিহ্ন বা অক্ষর বোঝানো হয়ে থাকে।

কমপিউটারে তথ্য কি ভাবে রাখা হয়?

কমপিউটারে সব কিছুই 0 এবং 1-এর সাহায্যে বোঝানো হয়। কমপিউটারে ইংরেজি বর্ণমালা, কিছু বিশেষ চিহ্ন (যথা +, −, × প্রভৃতি) এবং দশমিকের দশটি অঙ্ক প্রত্যেককেই এক একটি আলাদা চিহ্ন হিসেবে চেনানোর জন্য 0 এবং 1 -এর সাহায্যে বিভিন্ন সংকেত তৈরি হয়। সাধারণত তিন ধরনের সংকেত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন, 6-বিট 'বিসিডি' (BCD – Binary Coded Decimal), 7-বিট 'অ্যাসকাই' (ASCII – American Standard Code for Information Interchange) এবং 8-বিট 'ইবিসিডিআইসি' (EBCDIC – Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)।প্রত্যেক সংকেত পদ্ধতিতে যে কোনো চিহ্নের জন্যই একই সংখ্যক বিট ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'ইবিসিডিআইসি' সংকেত পদ্ধতিতে A বোঝানোর জন্যও ৪-টি বিটের প্রয়োজন। আবার সমান (=) চিহ্নের জন্যও ৪টি -বিটের দরকার। এই পদ্ধতিতে A এবং সমান চিহ্নের জন্য যে ভিন্ন ৪-টি বিট ব্যবহার হয় তা নীচে দেখানো হচ্ছে।

A	11000001
=	01111110

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, টেলিগ্রাফে যেমন ডট এবং ড্যাসের সাহায্যে চিহ্নের সাংকেতিক রূপ দেওয়া হয়, কমপিউটারেও তেমনি 0 এবং 1 -এর সাহায্যে তা করা হয় এবং এইভাবেই সব তথ্য কমপিউটারে রাখা সম্ভব।

মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) কি?

কমপিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 'সি পি ইউ' (CPU — Central Processing Unit)। এর সাহায্যে কমপিউটার সমস্ত গণনা বা অন্য কাজ সম্পন্ন করে। কমপিউটারে এই সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয় তা হল মূলত resistor, transistor প্রভৃতি। IC (Integrated circuit) প্রযুক্তিতে একসঙ্গে অনেক resistor বা transistor-কে একটি সিলিকন চিপের ওপর তৈরি করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বর্তমানে এই প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে পুরো 'সি পি ইউ' কেই একটি

সিলিকন চিপে ধরানো যায়। একে সাধারণত বলা হয় মাইক্রোপ্রসেসর। এখনকার একটি মাইক্রোপ্রসেসরে থাকে লক্ষ লক্ষ transistor। এই মুহূর্তে 'ইন্টেল' (Intel) -এর তৈরি 486, 586 (Pentium) এবং 'আই বি এম (IBM) তৈরি (Power pc) বাজারে খুব জনপ্রিয়। যে কোনো কমপিউটারের মধ্যেই রয়েছে এক বা একাধিক মাইক্রোপ্রসেসর এবং এই মাইক্রোপ্রসেসর যত শক্তিশালী হবে কমপিউটারটিও ততই ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

কোনো দশমিক সংখ্যাকে অঙ্ক আর সংখ্যা হিসেবে আলাদা ক'রে রাখা কি সম্ভব?

কমপিউটারে তথ্য রাখা হয় এবং সেই তথ্য রাখার জন্য তিন ধরনের সংকেত পদ্ধতির যে কোনো এক ধরনের সংকেত পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। কোনো দশমিক সংখ্যার প্রত্যেকটি অঙ্ককে এই সংকেত পদ্ধতির সাহায্যে লেখা সম্ভব। নীচে তিন সংকেত পদ্ধতির প্রত্যেকটিতে দশমিক অঙ্কগুলি কি-ভাবে লেখা হয় তা দেখানো হচ্ছে।

অঙ্ক	বিসিডি (6-বিট)	অ্যাসকাই (7-বিট)	ইবিসিডিআইসি (8-বিট)
0	001010	0110000	11110000
1	000001	0110001	11110001
2	000010	0110010	11110010
3	000011	0110011	11110011
4	000100	0110100	11110100
5	000101	0110101	11110101
6	000110	0110110	11110110
7	000111	0110111	11110111
8	001000	0111000	11111000
9	001001	0111001	11111001

এবারে দশমিক সংখ্যা 27-কে অঙ্ক হিসেবে রাখার প্রয়োজন হলে 2 এবং 7 অঙ্ক দুটি আলাদা করে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতেই রাখা যাবে। আবার 27-কে সংখ্যা হিসেবে রাখতে হলে এই দশমিক সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগশেষ 1 হয়। পাশে দেখানো হচ্ছে 27—এই দশমিক সংখ্যার সমান দ্বি-নিধানী সংখ্যাটি কত হবে।

```
2 | 27
2 | 13   1
 2 | 6   1
  2 | 3  0
     1   1
```

সংখ্যাটি হল 11011। কাজেই 27 দশমিক সংখ্যাটি অঙ্ক হিসেবে রাখলে ইবিসিডিআইসি সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি 8 বিটের প্রয়োজন এবং ৪ বিটের স্মৃতিকোষের 2টি স্মৃতিকোষ প্রয়োজন। কিন্তু সংখ্যা হিসেবে একটি 8-বিটের স্মৃতিকোষে রাখা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি হবে 00011011।

আজকাল কত রকমের পার্সোনাল কমপিউটার পাওয়া যায়?

আজকাল কমপিউটার ব্যবহারের ব্যাপক অগ্রগতির জন্য পার্সোনাল কমপিউটারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পার্সোনাল কমপিউটার (PC) দামেও সস্তা, আকারেও ছোট এবং ব্যবহার করা সহজ। তবে পার্সোনাল কমপিউটারেরও রকমফের রয়েছে। সবচেয়ে কমদামী ও কম ক্ষমতাশালী পিসিতে কোনো হার্ড ডিস্ক থাকে না। তার বদলে সেখানে আছে দুটি ফ্লপি ড্রাইভ। এই ফ্লপি ড্রাইভের সাহায্যে কমপিউটার প্রয়োজনীয় যাবতীয় নির্দেশাবলী ও তথ্য পায় এবং তা নিয়ে কাজ করে। এর থেকে ক্ষমতাশালী এবং হার্ড ডিস্ক যুক্ত কমপিউটারকে সাধারণত PC-XT বলা হয়। PC-XT সাধারণত '286' চিপ ব্যবহার করে এবং এতে থাকে 20-40 মেগাবাইট হার্ড ডিস্ক এবং 640 কিলোবাইট র‍্যাম। PC-XT-এর থেকে ক্ষমতাশালী এবং দ্রুত কমপিউটারগুলিকে বলা হয় PC-AT। PC-AT '386' চিপ ব্যবহার করে। PC-AT 386-এ 'Window' ভিত্তিক প্রোগ্রাম চালানো সম্ভব তবে তা আরো বেশি শক্তিশালী '486' চিপভিত্তিক কমপিউটারেই চালানো হয়। এখন আরো শক্তিশালী '586' (Pentium) চিপ ব্যবহৃত কমপিউটার বাজারে এসে গেছে। গ্রাফিক্স ভিত্তিক প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে খুব জনপ্রিয় ম্যাকিন্টস কমপিউটার। এখনকার ম্যাকিন্টস কমপিউটারগুলি 'পাওয়ার পিসি' (Power PC) চিপ ব্যবহার করে।

ফ্লপি ডিস্কের ব্যবহার কি ভাবে হয়?

ফ্লপি ডিস্ক অনুপ্রবেশ এবং নির্গম অংশ—দুভাবেই ব্যবহার করা হয়। এই ফ্লপি ডিস্কটি একটি কভারের মধ্যে থাকে। এটি মাইলার দিয়ে তৈরি এবং এর পৃষ্ঠদেশে আছে চৌম্বক পদার্থ। অবশ্য এখন আরো ছোট $3\frac{1}{2}$ইঞ্চি ফ্লপি বাজারে এসে গেছে। এগুলি একটি শক্ত আবরণের মধ্যে থাকে। এই ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার করতে হলে এটিকে ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভের ওপর রাখতে হয়। ফ্লপি ড্রাইভের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লপিটিও মিনিটে 300 বার ঘোরে। ফ্লপি ঘোরার সময় এ থেকে কিছু পড়া বা এতে কিছু লেখার যন্ত্রটা (read/write head) এগিয়ে পিছিয়ে গিয়ে ঠিকমত জায়গায় পৌছে যায় এবং প্রয়োজনমত কিছু লেখা বা পড়ার কাজটা সম্পূর্ণ করে। প্রত্যেকটি ডিস্কেই একটি নির্ধারিত ট্র্যাক আছে যেখানে ডিস্কের কোন সেক্টর কি তথ্যযুক্ত সেই সংবাদটি ধরা থাকে। কাজেই প্রয়োজনে সেই ট্র্যাকের সাহায্যে কোনো একটি ট্র্যাকের বিশেষ কোনো সেকটরে সরাসরি যাওয়া সম্ভব। এই ডিস্কের কেন্দ্রস্থলে একটি গর্ত অবস্থিত। এর সাহায্যে কমপিউটার প্রথম সেকটরটি খুঁজে বের করে এবং সরাসরি অন্যান্য সেকটরে চলে যেতে পারে। ফ্লপি ডিস্কটির পাশের দিকে একটি খাঁজ আছে। যখন কোনো ফ্লপিতে এই খাঁজটি ঢাকা থাকে তখন সেই ফ্লপিতে কিছু লেখা যায় না, শুধু সেই ফ্লপিতে যে তথ্য সঞ্চিত আছে তা পড়া সম্ভব। একটি ডিস্কে যে কোনো স্থানে তথ্য রাখা এবং তা থেকে তথ্য পড়া সম্ভব বলে একে ডাইরেক্ট অ্যাকসেস-স্টোরেজ ডিভাইস (Direct Access Storage Device) বলা হয়।

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে কিভাবে লেখা হয়?

কমপিউটারের নির্গম অংশ হিসেবে প্রিন্টারের ব্যবহার বহু প্রচলিত। এই প্রিন্টার সাধারণত দু' ধরনের। এক ধরনের প্রিন্টারে, যে কোনো সাধারণ 'Typewriter'-এর মত অক্ষর আছে এবং কাগজের মধ্যেকার মসীলিপ্ত ফিতের ওপর অক্ষরগুলির আঘাতের ফলেই ছাপ ফুটে ওঠে। 'ডট ম্যাট্রিক্স' এই ধরনেরই প্রিন্টার। এই প্রিন্টারের বিশেষত্ব হল, এটি একটি করে অক্ষর ছাপায়, সুতরাং 'লেসার' বা লাইন প্রিন্টারের মত অন্য দ্রুত গতির প্রিন্টার থেকে অনেক বেশি মন্থর। কিন্তু এগুলির দাম অনেক কম, তাই পার্সোনাল কমপিউটারের তুলনায় এগুলির ব্যবহার অনেক বেশি। এই জাতীয় প্রিন্টার এক সেকেণ্ডে 40 থেকে 200টি অক্ষর লিখতে পারে। প্রিন্টারের ঠিক যে অংশটি দিয়ে ছাপানো হয় সেটির আকারের ওপর নির্ভর ক'রে এই 'ডট ম্যাট্রিক্স' প্রিন্টারের নানা রকমের নাম দেওয়া হয়। যেমন ডেইজি হুইল, গল্‌ফ বল ইত্যাদি। এই নাম দেখেই বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে, এই অংশটি গোলাকৃতি। এই অংশে রয়েছে সাইকেলের চাকার স্পোকের মত একাধিক স্পোক যার মাথায় থাকে অক্ষরগুলি। এই অক্ষরগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী মসীলিপ্ত ফিতের ওপর আঘাত করিয়ে কাগজে তার ছাপ ফুটিয়ে তোলা হয়।

ম্যাগনেটিক টেপ ও ডিস্কের মধ্যে কার ব্যবহার বেশি এবং কেন?

ম্যাগনেটিক টেপ ও ডিস্ক উভয়েই অনুপ্রবেশ এবং নির্গম—দু' ভাবেই ব্যবহৃত হয়। তবে ডিস্কের যে কোনো অংশের সঞ্চিত তথ্য যেমন সরাসরি নিয়ে আসা সম্ভব কিংবা কোনো একটি বিশেষ অংশে তথ্য যেমন সরাসরি সঞ্চয় করা যায়, টেপে সে-রকম চলে না। টেপের কোনো একটি বিশেষ অংশের তথ্য নিয়ে কাজ করতে হলে তার আগের সমস্ত তথ্য পড়ে নিয়ে তবেই সেই অংশের তথ্য আনা সম্ভব। অনেকটা ক্যাসেটের টেপের মত। অন্যদিকে ডিস্কের ক্ষেত্রে, গানের রেকর্ডের মত, সরাসরি যে অংশে যেতে চাই সেখানে যাওয়া সম্ভব। কমপিউটার ও ডিস্কের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যেমন দরকার হয় ডিস্ক ড্রাইভের, তেমনি টেপের ক্ষেত্রে দরকার হয় টেপ ড্রাইভের।

প্রথম দিকে সহায়ক স্মৃতি হিসেবে টেপেরই ব্যবহার হত। কিন্তু এখন সাইজে ছোট এবং ডিস্কের যে কোনো অংশে তথ্য সঞ্চয় করা ও তা থেকে পড়া সম্ভব বলে ডিস্কের ব্যবহারই বেশি। তাছাড়া এখনকার বহুল প্রচলিত PC-গুলির সঙ্গে প্রায় সবক্ষেত্রেই ডিস্ক ড্রাইভ থাকে—যার ফলে ডিস্কের ব্যবহার বেশি। অবশ্য টেপের দাম অনেক কম এবং রাখার সুবিধের জন্য যেখানে অনেক

তথ্য সঞ্চয় করে রাখতে হয় সেখানে এখনও টেপের ব্যবহারই প্রাধান্য পায়।

'ইন্টার রেকর্ড গ্যাপ' (IRG) কাকে বলে?

একটি ফাইলে বহু সংখ্যক রেকর্ড থাকা সম্ভব। দুটি রেকর্ডের মধ্যে অনেক সময়ে কিছুটা স্থানে কোনো তথ্য রাখা যায় না। এই ফাঁকা স্থানকেই 'ইন্টার রেকর্ড গ্যাপ' বলা হয়। একটি ম্যাগনেটিক টেপে যখন কোনো কিছু রাখার বা টেপ থেকে কিছু পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন টেপ ড্রাইভটি চলতে আরম্ভ করে। টেপ ড্রাইভ চলার সঙ্গে সঙ্গেই টেপটির গতি বাড়তে থাকে এবং কিছু সময় বাদে তা ধ্রুবক গতি লাভ করে। ধ্রুবক গতি লাভ করার পরই এই টেপে কিছু তথ্য সঞ্চয় করা বা এর থেকে কিছু তথ্য পড়া সম্ভব। কাজেই এই ধ্রুবক গতি না হওয়া পর্যন্ত টেপটির যে অংশ চলে যায়, তা ফাঁকা থাকে। আবার টেপটি থামার নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থামতে পারে না। এর জন্যও কিছু সময় অতিবাহিত হয় এবং সে সময়েও টেপের কিছু অংশ ফাঁকা থেকে যায়। কাজেই কোনো তথ্য লেখার পর বা থামার নির্দেশ পাওয়ার পর টেপে যে অংশ ফাঁকা থাকে এবং এরপর আবার নতুন তথ্য টেপে সঞ্চয় করার সময় যে অংশটি ফাঁকা থাকে সেই অংশ দুটি একত্রে যে শেষ ফাঁকা স্থান পাওয়া যায় তাই 'ইন্টার রেকর্ড গ্যাপ' নামে অভিহিত। একটি টেপে 1 সেমি জায়গাতে 80 থেকে 2500 টি পর্যন্ত অক্ষর সঞ্চয় করে রাখা চলে। এই 'ইন্টার রেকর্ড গ্যাপ' 0.6 সেমি হতে পারে। ম্যাগনেটিক ডিস্কেও এই 'ইন্টার রেকর্ড গ্যাপ' হওয়া সম্ভব। অনেক সময়ে একটি রেকর্ডে যে সংখ্যক অক্ষর থাকে তা ডিস্কের একটি সেকটরে যত সংখ্যক অক্ষর রাখা সম্ভব তার সমান নাও হতে পারে। কিন্তু ডিস্কে যখন কিছু তথ্য সঞ্চয় করা হয় তা একটি সেকটরের প্রথম থেকেই শুরু হয়। কাজেই পরের রেকর্ড আবার নতুন সেকটরের প্রথম থেকেই আরম্ভ করা হয়। কাজেই যে জায়গাটা ফাঁকা থাকলো সেই জায়গাটিকেই 'ইন্টার রেকর্ড গ্যাপ' হিসেবে ধরা যেতে পারে।

সফ্টওয়্যার বলতে কি বোঝায়?

কমপিউটারের হার্ডওয়ার (Hardware) ইলেকট্রিকাল, মেকানিকাল এবং ইলেকট্রনিক অংশের সাহায্যে তৈরি। এই যন্ত্রের সাহায্যে কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক মৌলিক কাজ করা সম্ভব এবং এই কাজও 0 এবং 1 দিয়ে তৈরি নির্দেশ দিয়ে করতে হয়। কমপিউটার হার্ডওয়ারটি খুব সহজে ব্যবহার করা সম্ভব সফ্টওয়ারের (Software) সাহায্যে। এই সফ্টওয়ার কতগুলি প্রোগ্রামের সমষ্টি। এই প্রোগ্রামগুলি না থাকলে কমপিউটার ব্যবহার খুব কষ্টসাধ্য হয়। সফ্টওয়ারকে সাধারণত দু' ভাবে ভাগ করা হয়—সিসটেম সফ্টওয়ার (System software) এবং অ্যাপলিকেশন সফ্টওয়ার (Application software)।

যে সব প্রোগ্রামের সাহায্যে কমপিউটার সহজে ব্যবহার করা যায় তাদের সিসটেম সফ্টওয়ার বলে। কমপিউটারে যখন কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য প্রক্রিয়া ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয় কমপিউটার তা বুঝে কাজ করতে পারে না। প্রথমে কমপিউটারের ভাষায় নির্দেশগুলির রূপান্তর ঘটানো হয়। এই কাজ কতগুলি প্রোগ্রামের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। এদের সিসটেম সফ্টওয়ার বলে। আবার যে

সিসটেম সফ্টওয়ার কাকে বলে?

সব প্রোগ্রাম কিছু বিশেষ ধরনের সমস্যার সমাধান করে সে সব প্রোগ্রাম 'অ্যাপলিকেশন সফ্টওয়ার' নামে অভিহিত। কোনো কোম্পানির কর্মচারীদের মাসের প্রথমে মাহিনা দেওয়ার জন্য কমপিউটারে প্রোগ্রাম চালানো হতে পারে। সেই প্রোগ্রামটিকে অ্যাপলিকেশন সফ্টওয়ারের দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায়।

1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যাকে দ্বি-নিধানী সংখ্যায় কীভাবে লেখা সম্ভব?

দশমিক সংখ্যা-পদ্ধতির মত দ্বি-নিধানী সংখ্যা-পদ্ধতিও আছে। দশমিকে 1 থেকে 10, দ্বি-নিধানীতে 0 আর 1। কিন্তু দশমিকের সব সংখ্যাকেই দ্বি-নিধানীতে প্রকাশ করা চলে। দশমিক 1 দ্বি-নিধানী সংখ্যাতেও 1 হিসেবে লেখা হয়। কিন্তু দ্বি-নিধানী সংখ্যায় যেহেতু 0 এবং 1 লেখা সম্ভব, কাজেই দশমিক 2-কে দ্বি-নিধানী সংখ্যায় 01 হিসেবে লেখা হবে। দশমিকে যেমন 9-এর বেশি হলে দুটি ঘর প্রয়োজন, 99-এর বেশি হলে তিনটি ঘরের, সেইরকম দ্বি-নিধানী সংখ্যায় 1-এর বেশি হলে 2টি ঘর, 3-র বেশি হলে 3টি, 7-এর বেশি হলে 4টি ঘরের প্রয়োজন। নীচে দশমিক 1

থেকে 10 দ্বি-নিধানী সংখ্যায় কি হবে তা দেখানো হচ্ছে।

দশমিক	দ্বি-নিধানী
1	1
2	01
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010

দ্বি নিধানী সংখ্যা-পদ্ধতিতে 2-কে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। কাজেই 101 দ্বি-নিধানী সংখ্যা দশমিকে হবে $1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0 = 4+0+1 = 5$। এইভাবে 1010 দ্বি-নিধানী সংখ্যার সমতুল দশমিক সংখ্যা হবে $1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+0\times2^0=8+0+2+0=10$।

কমপিউটার কিভাবে কোন সংখ্যা বুঝতে পারে?

কমপিউটারে সব সংখ্যাই 0 এবং 1-এর সাহায্যে বোঝানো হয়। দশমিক সংখ্যা-পদ্ধতিতে যেমন 10-কে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়, এই সংখ্যা-পদ্ধতিতে তেমনি 2-কে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। এই সংখ্যা-পদ্ধতিতে কেবলমাত্র 2টি অঙ্কযুক্ত 0 এবং 1 থাকায় এই পদ্ধতিকে দ্বি-নিধানী সংখ্যা পদ্ধতি (Binary number system) বলে। কোনো একটি দশমিক সংখ্যার সমতুল দ্বি-নিধানী সংখ্যা বের করতে হলে সংখ্যাটিকে ক্রমান্বয়ে 2 দিয়ে ভাগ করে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগফল 1 হয়। ভাগশেষগুলি নিয়েই দ্বি-নিধানী সংখ্যাটি তৈরি হবে। 21 দশমিক সংখ্যার সমান দ্বি-নিধানী সংখ্যাটি কত হবে?

	ভাগশেষ
2 | 21	
2 | 10	1
2 | 5	0
2 | 2	1
1	0

সংখ্যাটি হল 10 101। এইভাবে যে কোনো দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকেই দ্বি-নিধানী সংখ্যা হিসেবে লেখা সম্ভব। এবারে একটি দশমিক ভগ্নাংশ এই সংখ্যা-পদ্ধতিতে কিভাবে লেখা হবে তা দেখানো হচ্ছে।

একটি অখণ্ড সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করার বদলে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। এইবার যে অখণ্ড সংখ্যাটি পাওয়া গেল তাকে আবার 2 দিয়ে গুণ করা হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে গুণ চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগ্নাংশটি শূন্য আসে অথবা একটি স্মৃতিকোষে ভগ্নাংশের জন্য নির্দিষ্ট রাখা সব কটি বিট যতক্ষণ পর্যন্ত না বের করা হয়।

উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাক।

দশমিক ভগ্নাংশ 0.5 দ্বি-নিধানী সংখ্যায় কত হবে?

$$0.5\times2 = 1.00$$

অর্থাৎ 0.5 এই দশমিক ভগ্নাংশের সমান হবে .1 দ্বি-নিধানী ভগ্নাংশ। এবারে দেখা যাক 0.15 দশমিক সংখ্যাকে কি ভাবে দ্বি-নিধানী সংখ্যাতে লেখা যাবে।

0.15×2	=	0.30	0
0.30×2		0.60	0
0.60×2		1.20	1
0.20×2		0.40	0
0.40×2		0.80	0
0.80×2		1.60	1
0.60×2		1.20	1
0.20×2		0.40	0

এইভাবে চলতেই থাকবে। তখন ভগ্নাংশের জন্য 8টি বিট নির্দিষ্ট করা থাকে। সেক্ষেত্রে 0.15-এর সমান দ্বি-নিধানী ভগ্নাংশটি হবে 0.00100110। যেহেতু 2 দিয়ে গুণ করার পর ভগ্নাংশটি শূন্য হল না কাজেই এই দ্বি-নিধানী সংখ্যাটি কখনোই 0.15-এর সমান হবে না। এই সংখ্যাটির সমান দশমিক ভগ্নাংশ কত হবে?

$$0.00100110 = 0\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}+0\times2^{-4}+0\times2^{-5}+1\times2^{-6}+1\times2^{-7}+0\times2^{-8}$$
$$= 0+0+.125+0+0+.015625+.0078125+0$$
$$= 0.1484375।$$

অর্থাৎ 0.00100110 একেবারে 0.15-এর সমান নয়, কিন্তু তার কাছাকাছি। আরো কিছু-সংখ্যক বেশি বিট এই

ভগ্নাংশের জন্য নির্দিষ্ট থাকলে আরো কাছাকাছি পাওয়া যেত। এখানে একটা কথা বলা দরকার, যে কোনো দশমিক পূর্ণ সংখ্যাই কমপিউটারে সঞ্চয় করা সম্ভবু নয়। সবচেয়ে বড় কোন দশমিক পূর্ণসংখ্যা রাখা সম্ভব তা নির্ভর করে ওই কমপিউটারের স্মৃতিকোষের বিটের সংখ্যার ওপর।

কমপিউটার কিভাবে অঙ্ক কষে?

লজিক গেটের সাহায্য নিয়ে কমপিউটারে দুটি দ্বি-নিধানী সংখ্যা যোগ করা সম্ভব। একথা সবাই জানে যে, কমপিউটার 0 এবং 1 এই সংখ্যা দুটিই কেবল বুঝতে পারে। লজিক গেটের সাহায্যে বর্তনী তৈরি করে 0 এবং 0, 0 এবং 1 বা 1 এবং 1-এর যোগফল করতে পারে। আরো জানা কথা, যে কোনো দুটি দশমিক সংখ্যাকেই দ্বি-নিধানী সংখ্যাতে লেখা সম্ভব। দুটি দশমিক সংখ্যা 12 এবং 15 যোগ করলে কি হবে তা নীচে দেখানো হচ্ছে।

12 এবং 15 এই দুটি সংখ্যা দ্বি-নিধানী সংখ্যায় হবে যথাক্রমে 1'00 এবং 1111। এবারে এদের যোগফল হবে—

1100	(12)
1111	(15)
11011	(27)

একটি সংখ্যা থেকে আর একটি সংখ্যা কি ভাবে বিয়োগ হবে তা দেখানো হচ্ছে। 15 থেকে 12-এর বিয়োগ অর্থাৎ 1111 এই দ্বি-নিধানী সংখ্যা থেকে 1100 দ্বি-নিধানী সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে। আবার এই সংখ্যাটির প্রত্যেকটি বিটের 1-এর পরিপূরক করলে পাওয়া যাবে 0011। এই সংখ্যাটি 1111-এর সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে।

1111	
0011	
10010	
1	
0011	(3)

যোগ করার পর হাতে সবশেষে যে 1 থাকছে তা একেবারে প্রথম বিটটির সঙ্গে যোগ করে আসল বিয়োগফল হল 0011 অর্থাৎ 3। কাজেই একটি সংখ্যা থেকে অপর একটি সংখ্যা বিয়োগ করার সময়েও আমরা কেবলমাত্র তা যোগের সাহায্যেই করতে পারছি। এই বিয়োগ করার সময় 1-এর পরিপূরক বের করাও লজিক গেটের সাহায্যে খুব সহজেই সম্ভব। গুণের বেলাতেও বারবার যোগ করা হয়ে থাকে এবং ভাগ ও একপ্রকার বার বার যোগ করেই করা যেতে পারে। কাজেই কেবলমাত্র যোগের সাহায্যেই কমপিউটারে সব রকম পাটিগণিত করা সম্ভব।

কমপিউটার বিয়োগ করে কেমন করে? কমপিউটারে গুণ-ভাগ কেমন ক'রে করা সম্ভব?

একটি সংখ্যার সঙ্গে আর একটি সংখ্যা যোগ করা যায় কমপিউটারে। কিন্তু একটি সংখ্যা থেকে আর একটি সংখ্যা বিয়োগ করবো কী করে? একটি সংখ্যা আর একটি সংখ্যা থেকে বিয়োগ করার বেলায় কমপিউটারে তা যোগের সাহায্যে করা সম্ভব। কিন্তু কী ভাবে সেই যোগ করা হয়? কমপিউটার যেহেতু 0 এবং 1 এই দুটি সংখ্যা নিয়ে কাজ করে সেইজন্যে, মনে করা যাক, 00011011 এই দ্বি-নিধানী সংখ্যা থেকে 00010001 এই দ্বি-নিধানী সংখ্যাটি বাদ দেওয়া হবে। এখন দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যাটি থেকে বাদ দিতে হবে বলে ওই সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে 1-এর প্রতিপূরক হিসেবে লিখতে হবে। 1-এর প্রতিপূরক অর্থাৎ প্রতিটি 1-কে 0 এবং প্রতিটি 0-কে 1 লিখতে হবে। এর ফলে সংখ্যাটি হবে 11101110। এখন এই সংখ্যা দুটি যোগ করা হচ্ছে।

```
   00011011
 + 11101110
  100001001
 +└──────→1
   00001010 (= 10₁₀)
```

দ্বি-নিধানী সংখ্যা দুটি দশমিকে লিখলে হবে যথাক্রমে 27_{10} এবং 17_{10}। কাজেই 27 থেকে 17 বাদ গেলে সঠিক উত্তর হবে 10। আমরা এখানে প্রতিটি সংখ্যাকে 8টি বিটের সাহায্যে লিখছি এবং যোগ করার পর যদি অষ্টম বিটটি 0 হয় তবে বুঝতে হবে যোগফলটি ধনাত্মক, কিন্তু 1 হলে যোগফলটি হবে ঋণাত্মক। ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে সঠিক বিয়োগফল পেতে হলে সংখ্যাটির অঙ্কগুলির

প্রত্যেকটির আবার 1-এর প্রতিপূরক বের করা হয়।

কমপিউটারে বারবার যোগ করার মাধ্যমে একটি সংখ্যাকে অপর একটি সংখ্যার দ্বারা গুণ করা সম্ভব। একইভাবে বারবার একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে ভাগ করাও যেতে পারে।

অ্যালগরিদম্ কাকে বলে?

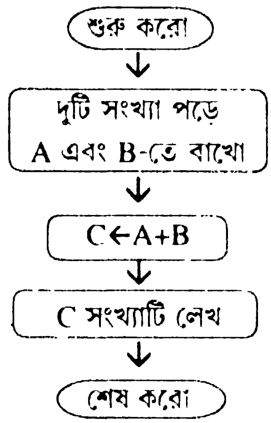
কমপিউটারের নিজের থেকে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা নেই। ফলে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন কমপিউটারকে যথাযথ নির্দেশ দান। যথাযথ নির্দেশের অর্থ কি? যথাযথ নির্দেশের অর্থ, এই নির্দেশগুলিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে কমপিউটার বুঝতে পারে কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশ পালন করতে হবে। সঠিকভাবে সাজানো নির্দেশগুলির সাহায্যে কোনো সমস্যার সমাধান পাওয়া গেলে সেই নির্দেশগুলিকে কমপিউটারের ভাষায় 'অ্যালগরিদম্' (Algorithm) বলা হয়। এই অ্যালগরিদম্ কমপিউটারের ভাষায় কিংবা সহজ ইংরেজি ভাষাতেও লেখা সম্ভব। তবে যে কোনো কমপিউটারের ভাষায় লেখার আগে অ্যালগরিদম্‌টি ঠিকমত কাজ করবে কিনা তা অনেক সময়েই ফ্লো-চার্ট বা প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে দেখে নেওয়া হয়।

ফ্লো-চার্ট কাকে বলে? ফ্লো-চার্টের সাহায্যে দুটি সংখ্যার যোগফল বের করা হবে কি ভাবে?

ফ্লো-চার্ট প্রবাহ চিত্র। এই চার্টে একটি অ্যালগরিদম্‌কে চিত্রের সাহায্যে বোঝানো হয়। একটি সমস্যা সমাধানের জন্য কমপিউটারে কোন কাজের পর কোন কাজটি করা প্রয়োজন, ফ্লো-চার্ট তার একটি পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তোলে। প্রবাহ-চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের নকশার ব্যবহার করা হয়। এই নকশাগুলি সাধারণত কিরকম হয় তা নীচে দেখানো হচ্ছে।

1. উপবৃত্তাকার ক্ষেত্র (⬭)—প্রবাহ চিত্র শেষ এবং শুরু বোঝাতে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়।
2. সামান্তরিক ক্ষেত্র (▱)—অনুপ্রবেশ অংশ কিংবা নির্গম অংশ হিসেবে এর ব্যবহার।
3. আয়তাকার ক্ষেত্র (▭)—সাধারণত এই চিহ্ন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি পাটিগণিত করার নির্দেশ বোঝানো হয়।
4. হীরকাকৃতি ক্ষেত্র (◊)—সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশের জন্য এই নকশার প্রয়োজন।
5. তীর চিহ্ন (→)—এই চিহ্নের সাহায্যে কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশ করা হবে তা বোঝানো হয়।

এবারে দুটি সংখ্যার যোগফল বের করার ফ্লো-চার্ট দেখানো হচ্ছে।



উপরের ফ্লো-চার্টে শুরু করার পর প্রথম নির্দেশ হল দুটি সংখ্যা পড়ে A এবং B নামে স্মৃতিকোষে তা রাখা হবে। এরপর A এবং B-এর সংখ্যা দুটি যোগ করে যোগফল C নামের স্মৃতিকোষে রাখা হল। তীর চিহ্ন অনুসরণ করে পরের নির্দেশটি হল এই যোগফল নির্গম অংশের সাহায্যে লেখা এবং সবশেষে নির্দেশ অনুযায়ী থেমে যাওয়া।

'ফ্লো-চার্ট' ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি?

কমপিউটারে কোনো সমস্যা সমাধানের আগে সেই সমস্যাটির অ্যালগরিদম্ তৈরি করে নিয়ে তার ভিত্তিতে প্রোগ্রাম লেখা হয়। কিন্তু প্রোগ্রাম লেখার আগে এই অ্যালগরিদম্‌টি ঠিকমত কাজ করবে কিনা সাধারণত একটি 'ফ্লো-চার্ট' বা প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে দেখে নেওয়া হয়। এই ফ্লো-চার্টে একটি অ্যালগরিদম্‌কে একটি চিত্রের সাহায্যে বোঝানো হয়ে থাকে। এই চিত্রে এক এক ধরনের নির্দেশের জন্য এক এক রকমের নক্‌শার সাহায্য নেওয়া হয়। কমপিউটার অবশ্য প্রবাহ চিত্র বুঝতে পারে না, কিন্তু এর সুবিধে, কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশটি একে পালন

করতে হবে তার একটি পরিষ্কার ছবি এতে ফুটে ওঠে। ফলে সমস্যাটি সমাধানের জন্য নির্দেশগুলি সঠিকভাবে সাজানো হয়েছে কিনা, তা এ থেকে বুঝে নেওয়া যায়। যদি নির্দেশগুলি সঠিকভাবে সাজানো থাকে তাহলে এর থেকে সরাসরি কোনো একটি উচ্চ পর্যায়ের ভাষায় আলগরিদমটি লিখে কমপিউটারে চালিয়ে সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব। নতুন কারো পক্ষেও প্রবাহ চিত্র দেখে সমস্যাটি সহজে বুঝে নেওয়া যায়।

প্রবাহ চিত্র সাধারণত দু'রকমের—সিসটেম ফ্লো-চার্ট এবং প্রোগ্রাম ফ্লো-চার্ট। সিস্টেম ফ্লো-চার্টের সাহায্যে একটি সংস্থায় কোন কাজের পরে কোন কাজটি করা প্রয়োজন তার একটি পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তোলা চলে। কমপিউটারের সাহায্যে কোনো কাজ সমাধান করার সময় কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশটি পালন করতে হবে তা বোঝানোর জন্য দ্বিতীয় ধরনের প্রবাহ চিত্রের ব্যবহার হয়।

সাধারণ ধারণায় প্রোগ্রামের অর্থ আমরা বুঝি। কিন্তু কমপিউটারে প্রোগ্রাম বলতে কি বোঝানো হয়? প্রোগ্রাম কাকে বলে?

কমপিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য যখন কমপিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজন ঘটে, তখন একটি কর্মসূচী তৈরি করা হয়। এই কর্মসূচীকেই 'প্রোগ্রাম' (Program) বলে। এই প্রোগ্রাম কয়েকটি নির্দেশের সমষ্টি। এই সকল নির্দেশ কমপিউটারে প্রথমে সঞ্চয় করা হয়। এরপর নির্দেশগুলি এক এক করে পালন করে সমস্যাটির সমাধান করা হয়। এই নির্দেশ যন্ত্রের ভাষায় (Machine Language), প্রতীকী ভাষায় (Assembly Language) বা উচ্চ পর্যায়ের ভাষায় (High level Language) দেওয়া যেতে পারে।

একটি উঁচুস্তরের ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম কমপিউটার কি ভাবে বুঝতে পারে?

কমপিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হলে কমপিউটারের বোধগম্য কোনো ভাষার ব্যবহার করা প্রয়োজন। কমপিউটার সাধারণত 0 এবং 1 বুঝতে পারে। কাজেই এর ভাষাও 0 এবং 1 নিয়েই তৈরি। 0 এবং 1 দিয়ে লেখা কোনো ভাষাকে যন্ত্রের ভাষা বলা হয়। উঁচুস্তরের ভাষায় লেখা কোনো প্রোগ্রাম কমপিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। এই সকল উঁচুস্তরের ভাষায় লেখা নির্দেশগুলি কমপিউটার-বোধ্য ভাষায় রূপান্তর করার জন্য 'সংকলক' বা কমপাইলার (Compiler) নামে একটি প্রোগ্রামের প্রয়োজন। এই কমপাইলার উঁচুস্তরের ভাষায় লেখা নির্দেশগুলি কমপিউটারের বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করে দেবে। এরপর কমপিউটার তার কাজ করতে পারবে। উঁচুস্তরের ভাষার কমপাইলার এক এক ধরনের কমপিউটারের জন্য এক একরকম। এর কারণ বিভিন্ন কমপিউটারের যন্ত্রের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন।

কমপিউটারে কত বিভিন্ন স্তরের ভাষা ব্যবহার হয়?

কমপিউটার কেবলমাত্র 0 এবং 1 বুঝতে পারে, সুতরাং কমপিউটারের ভাষাও 0 এবং 1 দিয়েই তৈরি। 0 এবং 1 দিয়ে তৈরি ভাষাকে যন্ত্রের ভাষা (Machine language) বলে। কমপিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য 0 এবং 1 দিয়ে কিছু সংখ্যক নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশগুলির সাহায্যে একটি কর্মসূচী তৈরি হয়। একে 'প্রোগ্রাম' (Program) বলে।

প্রথম দিকের কমপিউটারে এই যন্ত্রের ভাষাতেই কর্মসূচী রচনা করা হত। এই ভাষা ব্যবহার যথেষ্ট শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। কমপিউটারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এরপর যে ভাষার প্রবর্তন হল তাকে প্রতীকী ভাষা (Assembly language) বলা হয়। এই ভাষায় 0 এবং 1 -এর পরিবর্তে স্মৃতি-সহায়ক (Mnemonic) নাম ব্যবহার করা হয়। যেমন, কোনো কমপিউটারে যোগ করা বোঝানোর জন্য 0 এবং 1-এর সাংকেতিক রূপ ব্যবহার করার পরিবর্তে স্মৃতি-সহায়ক নাম ADD এই শব্দটি ব্যবহার করা সম্ভব। এই ভাষাতে কর্মসূচী তৈরি করা সহজ হলেও এক্ষেত্রেও একটি সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকগুলি নির্দেশের প্রয়োজন। এছাড়া যন্ত্রের ভাষার মত এই প্রতীকী ভাষা যন্ত্রনির্ভর। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ভাষা যেমন বিভিন্ন সেইরকম এক একটি যন্ত্রের প্রতীকী ভাষা এক একরকম।

বর্তমানে কমপিউটারের অগ্রগতির সঙ্গে এর ব্যবহারও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। কিন্তু ব্যবহারকারীরা ক্রমে বুঝতে পারেন যে, যন্ত্রের ভাষা ও প্রতীকী ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা বেশ অসুবিধেজনক। এছাড়া এরা কমপিউটারনির্ভর। কাজেই এমন স্তরের ভাষার প্রয়োজন দেখা দিল যার সাহায্যে প্রোগ্রাম লেখা সহজ হয় এবং এই সব ভাষাতে লেখা প্রোগ্রাম যে কোনো ধরনের কমপিউটারে চালানো

ফরট্রান, কোবল কি উচ্চ পর্যায়ের ভাষা?

যায়। এই ধরনের ভাষা তৈরির জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হল। এর ফলে উঁচু পর্যায়ের ভাষার (High level language) আবির্ভাব ঘটলো। আজকাল বিভিন্ন ধরনের উঁচু পর্যায়ের ভাষার ব্যবহার হয়। যেমন, ফরট্রান, কোবল, সি, বেসিক প্রভৃতি।

কমপিউটারে সাধারণত এই তিন স্তরের ভাষারই ব্যবহার হয়—যন্ত্রের ভাষা, প্রতীকী ভাষা এবং উচ্চস্তরের ভাষা বা প্রক্রিয়া ভাষা।

বিভিন্ন ধরনের সমস্যার জন্য কি কমপিউটারে একই উঁচুস্তরের ভাষা ব্যবহার করা হয়?

কমপিউটারে অনেক উঁচুস্তরের ভাষা ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এক এক ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য এক এক ধরনের ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যে সব সমস্যা দেখা যায় তার সমাধানের জন্য অ্যালগল (ALGOL— Algorithmic Language)

কোবল ভাষার সঙ্গে কি ইংরেজি ভাষার মিল আছে?

এবং 'ফরট্র্যান' (FORTRAN — FORmula TRANslation) নামে দুটি ভাষার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বড় বড় সূত্র এইসব ভাষাতে একটি নির্দেশেই লেখা সম্ভব। এরপর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে 'কোবল' (COBOL — Common Business Oriented Language) ভাষার প্রচলন হয়। এই ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার অনেকটাই মিল আছে। আজকাল যে সকল পার্সোনাল কমপিউটার বেরিয়েছে তার জন্য 'বেসিক' (BASIC— Beginners All purpose Symbolic Instruction Code) ভাষার চল হয়েছে। 'ফরট্রান' ভাষার সঙ্গে এই ভাষার কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। কমপিউটার ব্যবহার সহজ করার জন্য যে সকল 'সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার' লেখা হয় তা উঁচুস্তরের ভাষাতেও লেখা যায়। 'সি' (C) নামে একটি ভাষার প্রচলন আজকাল খুব বেশি এই কারণেই। এই ভাষাতে যেমন 'সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার' লেখা সম্ভব আবার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্যও এই ভাষা ব্যবহার হয়। উপরে যে সব ভাষার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়াও আরো অনেক উঁচুস্তরের ভাষার ব্যবহার হয়। যেমন, পাশকাল (Pascal), লিস্‌প্‌ (LISP—LISt Processing) ইত্যাদি।

অপারেটিং সিসটেমের কাজ কি?

অপারেটিং সিসটেমকে অনেক সময় সুপারভাইজার (Supervisor), মনিটর (Monitor) বা একসিকিউটিভ (Executive) নামে আখ্যা দেওয়া হয়। এই অপারেটিং সিসটেমের একটি অংশ সব সময়ই কমপিউটারের রম (ROM) স্মৃতিতে অবস্থান করে। বাকি অংশের অবস্থান ডিস্‌ক, টেপের মত সহায়ক স্মৃতিতে। প্রয়োজন হলে কমপিউটারের স্মৃতিতে ওই বাকি অংশটি আনা হয়ে থাকে।

কোনো একটি প্রোগ্রাম কমপিউটারে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপারেটিং সিসটেম দেখে সেই প্রোগ্রামটি কোন ভাষায় লেখা। অপারেটিং সিসটেম তখন সেই ভাষার সংকলকটি স্মৃতিতে আনার ব্যবস্থা করে। এরপর সংকলকটি প্রোগ্রামের নির্দেশগুলি সঠিক কিনা দেখে নেয়। যদি সেগুলি সঠিক থাকে তাহলে সেটিকে যন্ত্রের ভাষায় পরিবর্তন করে। এরপর যদি প্রোগ্রামটি চালানোর দরকার হয় তাহলে অপারেটিং সিসটেম আবার 'লিনকার' এবং 'লোডার'কে নির্দেশ পাঠায়। তবে কাজ চলার সময় অনুপ্রবেশ ও নির্গম অংশের দরকার হলে আবার অপারেটিং সিসটেমের ডাক পড়ে। অপারেটিং সিসটেম তখন 'আই/ও প্রোসেসার'কে কাজটি করার নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে সিপিউ-এর সাহায্যে অন্য কোনো প্রোগ্রামের নির্দেশগুলি আরম্ভ করার নির্দেশও

পাঠায়। অপারেটিং সিসটেম একই সময়ে একের বেশি প্রোগ্রামের কাজ চলতে সাহায্য করে। যখন এক সঙ্গে একটির বেশি প্রোগ্রামের কাজ চলে তখন তাকে 'মালটি-প্রোগ্রামিং' (Multi-programing) বলা হয়। এদিকে 'আই/ও প্রোসেসার'-এর কাজ শেষ হয়ে গেলেই অপারেটিং সিসটেমকে সংকেত পাঠায়। অপারেটিং সিসটেম আবার সিপিউতে যে প্রোগ্রামটি চলছিল তাকে থামিয়ে দিয়ে আগের প্রোগ্রামটির যে পর্যন্ত কাজ হয়েছিল তারপর থেকে করার জন্য সিপিউকে নির্দেশ পাঠায়। একটি কমপিউটারে যে সব অংশ আছে এবং তার সঙ্গে যে সব যন্ত্র লাগানো থাকে প্রোগ্রামগুলির প্রয়োজন অনুসারে সে সব যন্ত্রাংশ সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা অপারেটিং সিসটেমের কাজ। 'সিপিউ'-এর সময়ের যেন কোনো অপচয় না ঘটে, অপারেটিং সিসটেম তার দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে।

মালটি-প্রোগ্রামিং কি?

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) তৈরির পদ্ধতিতে প্রভূত উন্নতি ঘটার ফলে আজকাল বাজারে যে সকল মাইক্রোপ্রসেসর পাওয়া যায় তা অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন। কিন্তু যে সকল ইনপুট আউটপুট (I/O) যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় তা এই মাইক্রো-প্রসেসরের সঙ্গে তাল রেখে দ্রুতগতিতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ কোনো প্রোগ্রাম চলাকালীন যদি কমপিউটারের কোনো ইনপুট দরকার হয় বা কোনো আউটপুট সে দেয় তাহলে যতক্ষণ না এই আই/ও'র কাজ সম্পন্ন হয় ততক্ষণ কমপিউটারের প্রসেসরকে বেকার হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু তা না করে যদি সিপিউকে অন্য প্রোগ্রামের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয় তাহলে এই সময়টা নষ্ট না হয়ে বেঁচে যায়। অপারেটিং সিসটেম একই সময়ে একের বেশি প্রোগ্রামকে চলতে সাহায্য করে। যখন একসঙ্গে একটির বেশি প্রোগ্রামের কাজ চলে তখন তাকে 'মাল্টি-প্রোগ্রামিং' বলা হয়। কোন প্রোগ্রাম কতটা কাজ করলো এবং কখন কোন প্রোগ্রাম -এর কাজ সিপিউ করবে বা কোন প্রোগ্রাম কমপিউটারের কতটা 'রিসোর্স' (Resource) ব্যবহার করবে তা ঠিক করে অপারেটিং সিসটেম। তাই 'মাল্টি-প্রোগ্রামিং'-এর ক্ষেত্রে অপারেটিং সিসটেমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপারেটিং সিসটেম এমনভাবে পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা করে যে ব্যবহারকারীর মনেই হতে পারে যে সবকটা প্রোগ্রাম যেন একই সঙ্গে সিপিউ-কে ব্যবহার করছে। কিন্তু তা যে নয় তা তো আমরা দেখতেই পেলাম।

কমপিউটারে এখন কি কি করা সম্ভব ?

এই শতকের প্রথমার্ধে যখন কমপিউটারের আবির্ভাব ঘটে তখন জটিল গণনার কাজেই তার ব্যবহার হত। তারপরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কমপিউটারের ব্যবহার সীমিত ছিল বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের মধ্যেই। তার কারণ তখন কমপিউটারের আকার ছিল বৃহৎ, দামও ছিল বেশি এবং তা ব্যবহার করার যোগ্যতা ছিল খুব অল্প সংখ্যক মানুষের। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কমপিউটারের ব্যবহার সহজ হয়ে এসেছে এবং এখন তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রয়েছে। আজকাল নিজেদের চারদিকে তাকালে সহজেই বোঝা যাবে যে, কমপিউটারের ব্যবহার কত ব্যাপক। সামান্য একটা রেলের টিকিট কাটতে গেলে দেখা যায় যে সেখানেও রয়েছে কমপিউটার। তারপর বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আজকাল কাজকর্ম সম্পন্ন হচ্ছে কমপিউটারের সাহায্যে। ভারতের বৃহৎ শেয়ার বাজারগুলি ক্রমশ

শেয়ার বাজারেও কি কমপিউটার আসতে পারে?

screen based trading system ব্যবহার করতে আরম্ভ করছে যা কিনা পরিচালিত হবে এই কমপিউটারের সাহায্যে। বর্তমানে শিল্পে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে Computer aided design (CAD) and Computer aided Manufacturing (CAM)। আগে যে সব নক্শা হাতে করতে হত এবং ভুল হলে আবার সব ফেলে দিয়ে নতুন করে করার হয়তো দরকার হত তা এখন অতি সহজেই কমপিউটারের সাহায্যে করা যায়। শুধু প্রয়োজনীয় স্থানে ভুল শুধরে নিলেই চলে। নতুন করে সব কিছু করার আর দরকার হয় না।

নোটবুক কমপিউটার কি?

এই শতকের প্রথমার্ধে যে কমপিউটারগুলি তৈরি

হয়েছিল সেগুলি আকারে ছিল সুবৃহৎ। ক্রমশ প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কমপিউটারের আকার হয়ে আসে ছোট আর বাড়ে তার ক্ষমতা। 'ভি এল এস আই'-এর (V L SI —Very large scale integration) আবির্ভাবের পর কমপিউটার ছোট হয়ে চলে আসে মানুষের ঘরের টেবিলে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। টেবিলের কমপিউটার কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার সময়ে পথে এই ধরনের কমপিউটারে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই এই mobile computer -এর দরকার মেটাতে এল নোটবুক কমপিউটার। নোটবুক কমপিউটার তৈরিতে প্রথমত দুটি বড় বাধাকে অতিক্রম করতে হয়েছে—এক ঃ এই বৃহৎ আকার টিভি স্ক্রিনকে ছোট করা আর দ্বিতীয় ঃ কমপিউটারের হার্ডওয়ারকে একটি ছোট জায়গায় ধরানো। প্রথম বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে L C D (Liquid crystal display) প্রযুক্তিতে তৈরি ছোট ও খুবই হাল্কা স্ক্রিনের সাহায্যে। প্রযুক্তিগত উন্নতির সাহায্যে কমপিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে minitiarization পদ্ধতিতে খুবই ছোট জায়গার মধ্যে প্যাক করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। আকারে ছোট হলেও এই নোটবুক কমপিউটার কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বহু শক্তিশালী 'সফ্‌টওয়ার' এতে চালানো সম্ভব—অবশ্য সাধারণ কমপিউটারের তুলনায় এর দাম একটু বেশি। ছোট নোটবুকের মত পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব না হলেও নোটবুক কমপিউটারকে স্বচ্ছন্দে একটি ব্যাগে বা ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে ফেলা যায়। কমপিউটার প্রফেশানাল, বিজনেস বা সেল্‌স ম্যানেজার—যাঁদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় তাঁদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করছে এই নোটবুক। তাছাড়া এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে কোনো প্রদর্শনী দিতে গেলেও এই নোটবুক খুবই উপযোগী।

মাল্টিমিডিয়া (Multimedia) কাকে বলে?

আজকাল মাল্টিমিডিয়া কথাটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আমরা টেলিভিশন, টেলিফোন প্রভৃতি তথ্য সরবরাহকারী যন্ত্র বা মিডিয়ার সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে পরিচিত। কিন্তু অডিও, ভিডিও, কমপিউটার ও বিভিন্ন যোগাযোগের (Communication) যন্ত্রপাতি, যেমন, টেলিফোন, মডেম প্রভৃতির সন্নিবেশে যে সিস্টেমটি তৈরি হয় তাকেই সাধারণত মাল্টিমিডিয়া বা একাধিক মিডিয়ার মিলন বলা হয়। খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক

মাল্টিমিডিয়া কি শিক্ষামূলক কাজে লাগে?

মিডিয়ার মিলন এই সিস্টেমকে কতখানি শক্তিশালী করে তুলেছে। আশা করা যায়, মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্য, কমিউনিকেশন ও কমপিউটেশনের (Computation) সব দরকার সে একাই পূরণ করতে পারবে। এই মুহূর্তে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষামূলক কাজে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করছে কেন না এক্ষেত্রে অনেক বেশি পারস্পরিক ক্রিয়াশীলভাবে শিক্ষা দান করা যায় যা অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাছাড়া মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে সাধারণ ভিডিও গেম্‌স বা কমপিউটার গেম্‌সকে বহুগুণ চিত্তাকর্ষক করে তোলা সম্ভব।

কমপিউটার কি ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করতে পারে?

ক্লাসে যখন কোনো শিক্ষক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তখন সব ছাত্রছাত্রীই যে একবারে তা বুঝতে পারবে তা নাও হতে পারে। অনেক সময়েই বেশ কয়েকবার তা আলোচনা করার পর তবেই বোঝানো সম্ভব হয়। এই বারবার বোঝানোর কাজটা কমপিউটারের সাহায্যে করা সম্ভব। শিক্ষকের পড়ানোর বিষয়টি কমপিউটারে এমনভাবে তৈরি করা যায় যার ফলে একজন তা বারবার চালিয়ে ওই বিষয়ে নিজেকে পারদর্শী করতে পারে। একে কমপিউটারের সাহায্যে শিক্ষা (CAL—Computer Aided Learning) বলা হয়। অনেক বিষয়েই আজকাল এইরকম কমপিউটার প্রোগ্রাম লেখা হয় এবং একজন শিক্ষার্থী ওই প্রোগ্রাম বারবার চালিয়ে বিষয়টি রপ্ত করতে পারে।

বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় কী ভাবে?

আজকাল বই এবং জার্নালের যে পরিমাণ দাম বেড়েছে

সেক্ষেত্রে আমাদের মত দেশে প্রত্যেক সংস্থার লাইব্রেরিতে সবকটি বই এবং জার্নাল নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই অভাব পূরণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই নেটওয়ার্ক (Network)-এর সাহায্য নেওয়া হয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি PC/AT কমপিউটার এবং Modem নামে একটি বস্তুর। এর ফলে টেলিফোন লাইনের সাহায্যে কমপিউটারে যে সব তত্ত্ব রাখা যায় তা এক স্থান থেকে অপর স্থানে পাঠানো সম্ভব। একে ইলেকট্রনিক মেল (e mail) বলা হয়। এইভাবে আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের তত্ত্ব এই ইলেকট্রনিক মেলের সাহায্যে আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সংস্থার লাইব্রেরির মধ্যে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও তত্ত্ব দেওয়া-নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের ব্যবহার আছে। বিদেশ সঞ্চার নিগম (VSNL) অতি সাম্প্রতিক সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের খবরাখবর আমাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইনটার নেটের (Inter net) সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছে।

কমপিউটার কি দাবা খেলতে পারে?

কমপিউটার একটি যন্ত্র। তার পক্ষে মানুষের মত চিন্তা-ভাবনা করে দাবা খেলা সম্ভব নয়। তবে উন্নত মানের software -এর সাহায্যে কমপিউটারের পক্ষে দাবা খেলা সম্ভব। দাবা খেলার মূল কাজ প্রতিপক্ষের চালকে বিশ্লেষণ করা, নিজের চাল ঠিক করা এবং প্রতিপক্ষ ও নিজের চাল সম্পর্কে আগাম চিন্তা-ভাবনা করে রাখা। যেহেতু কমপিউটারে খুব দ্রুত গতিতে গণনার কাজ করা সম্ভব তাই তাকে কাজে লাগিয়ে এমন কমপিউটার প্রোগ্রাম লেখা হয় যা অসংখ্য সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের চাল এবং কমপিউটারের নিজের পাল্টা চাল সৃষ্টি করে এবং তার ভিত্তিতেই খেলে। কমপিউটারকে দিয়ে দাবা খেলার মত চিন্তা-ভাবনা করার কাজ করানো 'artificial intelligence' -এর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবু এখনও এমন কমপিউটার দাবাড়ু তৈরি করা যায়নি যা দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ানকে হারাতে পারে।

আবহাওয়া জানাতে কমপিউটারের ভূমিকা আছে কি?

রোজ টিভিতে বা রেডিওতে আমরা আবহাওয়ার কথা শুনি। সেখানে বলা হয় বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা আর বৃষ্টিপাতের খবর আর সেই সঙ্গে আগামী 24 ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস। এই আবহাওয়ার খোঁজ খবরের পিছনে কিন্তু কমপিউটারের ভূমিকা খুব কম নয়। দৈনন্দিন জীবনে আবহাওয়ার ভূমিকা ছাড়াও নানা ধরনের গবেষণায় ও কৃষিকাজেও আবহাওয়ার খবর খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর কেমন বৃষ্টি হবে, কখন কোথায় কতটা বর্ষা নামবে, যদি আগে থেকে সঠিকভাবে আন্দাজ করা যায়, তাহলে কৃষকেরা সেই অনুযায়ী নিজেদের কৃষিকাজকে পরিচালনা করতে পারবে। এই কাজের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত আবহাওয়া দপ্তর ও পৃথিবীর ওপর অবস্থিত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আবহাওয়ার সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে কমপিউটারের সাহায্যে আবহাওয়ার বিভিন্ন মডেল তৈরি করে আবার কমপিউটারের সাহায্যেই সেই মডেলগুলিকে বিশ্লেষণ করে আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস দেওয়া হয়। কিন্তু এই কাজ কোনো সাধারণ কমপিউটারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এতই জটিল এই কাজ যে, এর জন্য ব্যবহার করা হয় সুপার কমপিউটার (Super Computer)। দিল্লিতে আবহাওয়ার কাজের জন্য এমন একটি সুপার কমপিউটার রয়েছে।

আমাদের দেশে কি সুপার কমপিউটার এসেছে?

'জুরাসিক পার্ক' ছবিটির জন্য কি কমপিউটার ব্যবহার হয়েছে?

'জুরাসিক পার্ক' ছবিটি অনেককেই অবাক করেছে। কত ডাইনোসোর এবং তাদের কার্যকলাপ কি সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে—ঠিক যেন এক বাস্তব চিত্র। কিভাবে সম্ভব হল এই অবাস্তবকে বাস্তবায়িত করা? এর পিছনে রয়েছে উন্নত মানের কমপিউটার গ্র্যাফিক্স প্রযুক্তি। এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল Silicon Graphics -এর Indigo Series Computer। এই কমপিউটারগুলি visual computing বা এই ধরনের উন্নত মানের গ্র্যাফিক্সের কাজ করার পক্ষে আদর্শ। আজকাল বিভিন্ন অ্যানিমেশন

ফিল্ম্, সায়েন্স ফিকশন ফিল্মে এই ধরনের কর্মপিউটার গ্র্যাফিক্সের সাহায্যে অবাস্তবকে জীবন্ত করে তোলা হচ্ছে কিন্তু 'জুরাসিক পার্ক' ছবিটিতে এর ব্যবহার হয়েছে অত্যন্ত দর্শনীয়ভাবে। কর্মাপউটার গ্র্যাফিক্সের ব্যবহার আজ শুধুমাত্র ফিল্মের মধ্যে সীমিত নয়, এর ব্যবহার আরো ব্যাপক। যেমন গাড়ি বা বিমানের নক্শা তৈরি করতেও কমপিউটার গ্র্যাফিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

কমপিউটার ভাইরাস বলতে কি বোঝায়?

আমাদের অসুস্থ শরীরে যে ভাইরাস পাওয়া যায় তার সঙ্গে কমপিউটারের ভাইরাসের কোনো সম্পর্ক নেই। কমপিউটার ভাইরাস মানুষেরই সৃষ্টি একটি কমপিউটার প্রোগ্রাম। সাধারণ কোনো প্রোগ্রাম থেকে তার পার্থক্য হল এই যে, এটি বহুদিন পর্যন্ত কোনো কর্মপিউটারের সিস্টেমের মধ্যে চুপচাপ (Dormant) বসে থাকতে পারে এবং সে অবস্থায় মানুষের দেহের ভাইরাসের মত সেই কমপিউটার সিস্টেমকে নষ্ট করতে থাকে। এই ভাইরাস সাধারণত একটা কমপিউটার থেকে অন্য কমপিউটারে প্রবেশ করে ফ্লপি ডিস্কের সাহায্যে বা দুটি কর্মপিউটার নেটওয়ার্ক (Network) দ্বারা সংযুক্ত থেকে পরস্পরের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান ঘটিয়ে। এই ভাইরাস নানারূপে হতে পারে। 'Raindrop' এক ধরনের ভাইরাস যার প্রভাবে কমপিউটারের পর্দা থেকে আচমকা অক্ষরগুলো টুপ টুপ করে পড়তে থাকে। বিভিন্ন ভাইরাসকে সনাক্ত করার প্রোগ্রামও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু তাও অনেক নতুন ভাইরাস এগুলির নজর এড়িয়ে কমপিউটারের ভয়ানক ক্ষতি করতে পারে। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ভাইরাসের প্রকোপে লক্ষ লক্ষ ডলারের ক্ষতি হয়েছে এবং অনেক মূল্যবান তথ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে।

শহরের কোনো রেলওয়ে বুকিং কাউন্টার থেকে কমপিউটারে টিকিট করার সময়ে টিকিট আছে কি নেই তা জানতে পারি কি ক'রে?

দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ বা উত্তর কলকাতার কোনো বুকিং কাউন্টার থেকে কমপিউটারে টিকিট কাটতে চাই দূরপাল্লার কোনো ট্রেনের। অবাক লাগে যখন কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খবর আসে, টিকিট নেই, কিংবা থাকলেও তার কি অবস্থা।

কমপিউটারে টিকিট করার সময়ে খবর আসে কি ক'রে? আসলে কোনো কেন্দ্রীয় স্থানে একটি কমপিউটারে প্রত্যেকটি রেলের সমস্ত তথ্য রাখা থাকে। এখন যে কোনো রেলওয়ে বুকিং কাউন্টার থেকে টিকিট কাটার সময় বুকিং কাউন্টারের কর্মী তার কমপিউটারের সাহায্যে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে এই কেন্দ্রীয় কমপিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে জেনে নেয় কোনো একটি ট্রেনের টিকিটের অবস্থান কি। তার মানে এই নয় যে, টেলিফোন করে জেনে নেওয়া হচ্ছে। আসলে যা হচ্ছে, তা হ'ল, টেলিফোন লাইনটি বুকিং কাউন্টারের কমপিউটার এবং কেন্দ্রীয় কমপিউটারের মধ্যে যোগাযোগ করাই থাকে। বুকিং কাউন্টারের কর্মী কমপিউটারে তার প্রয়োজনীয় নির্দেশটি দেয়। এই নির্দেশটি তখন টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমপিউটারে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যটি আবার এই টেলিফোন লাইনের মাধ্যমেই বুকিং কাউন্টারের কমপিউটারে পৌঁছে যায় এবং প্রয়োজনমত টিকিটও ওই কমপিউটারে যে প্রিন্টার লাগানো থাকে তার সাহায্যে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসে।

কল্পবাস্তব (virtual reality) কাকে বলে?

সিনেমার পর্দায় আমার কল্পনার জগতের নানা ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা শুধুমাত্র নীরব দর্শকের, তার চোখের সামনে ঘটতে থাকা ঘটনাবলীতে তার কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু আধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে কল্পনার জগতের ঘটনাকে জীবন্তের মত করে তোলা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে দর্শক তার সামনে ঘটনাগুলিকে শুধু ঘটতে দেখবে না—তার মনে হবে সে যেন এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই রয়েছে, যেন সে তারই এক চরিত্র। তাই সত্যিকারের বাস্তব না হলেও তা বাস্তব হিসেবে ভ্রম হবে যে কোনো মানুষের, আর এরই নাম কল্পবাস্তব (Virtual reality) অর্থাৎ কল্পনা ও বাস্তবের এক অদ্ভুত সন্নিবেশ।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমপিউটার, ভিস্যুয়াল এফেক্ট (Visual effect), নানা যন্ত্রপাতি, ভিউয়ার (Viewer), ঘটনা প্রবাহ অনুযায়ী সাউণ্ড সিস্টেম (Sound system) ব্যবহার করে যে কল্পবাস্তবের জগৎ সৃষ্টি করা হয় তাকে বলে সাইবারস্পেস (Cyberspace)। কমপিউটারের সাহায্যে কোনো ঘটনা বা দৃশ্যকে 'সিমুলেট' (Simulate) করে এই 'Cyberspace' সৃষ্টি করা হয়। এই কল্পবাস্তব তৈরির প্রযুক্তি এখনও একেবারে নিখুঁত হয়ে ওঠেনি কিন্তু আশা

সাইবারস্পেস কাকে বলে?

করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যেখানে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে তফাত বের করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়বে।

এই কল্পবাস্তবকে নানারকম ব্যবহারিক কাজে লাগানো যেতে পারে। ধরা যাক, একজন সার্জেনকে একটি অতি সূক্ষ্ম অপারেশন করতে হবে। তিনি কল্পবাস্তবের জগতে সেই অপারেশনের অভ্যেস করতে পারেন আসল অপারেশনের আগে। আবার এমন যদি হয়, জঙ্গী বিমানের বৈমানিকদের একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে। তখন তাদের নানা কলা-কৌশলের মহড়া দেওয়া যেতে পারে এই কল্পবাস্তবের সাহায্যে। তাছাড়া প্রমোদ উপকরণের ক্ষেত্রেও এর অনেক ব্যবহার সম্ভব। কল্পবাস্তবের প্রযুক্তির সাহায্যে সাধারণ ভিডিও গেম্‌সকে এক নতুন মাত্রা যোগ করে তাকে আরো বেশি interactive করে তোলা চলে।

রসায়ন বিজ্ঞান



আমাদের চারপাশের জগতে যত পদার্থ তা সংখ্যাহীন। এক এক পদার্থের এক এক রকম বৈচিত্র্য। কোনো পদার্থ গঠনে তরল, কেউ কঠিন, কেউ বা আবার গ্যাসীয়। উপাদান বা ধর্মের দিক দিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করবার মত। কোন প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ খুঁজে চলেছে পদার্থের ধর্ম, গঠন আর উপাদান, পরীক্ষা করেছে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আদিকালে যে শাস্ত্র ছিল অনেকটা অন্ধকার, অচেনা, আজ সেটাই হয়ে উঠেছে অনেক বেশি আলোকিত। ফলে রসায়ন নিয়ে আজ প্রশ্ন এবং কৌতূহলের শেষ নেই। রসায়ন চর্চার আদি যুগকে বলা হয় অ্যালকেমি, যার উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ কিমিয়া থেকে।

অ্যালকেমি থেকেই রসায়ন বিজ্ঞানের ইংরেজি নাম দেওয়া হয়েছে Chemistry।

মোমবাতি কেমন ক'রে জ্বলে?

মোমবাতি যে জ্বলে, আপাতদৃষ্টিতে এটা খুবই সাধারণ ঘটনা—কিন্তু এর পিছনেও বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ রয়েছে।

মোমবাতি তৈরি হয় মোম দিয়ে। মোমের মধ্যে থাকে হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbon) নামে এক প্রকার জৈব রাসায়নিক বস্তু। হাইড্রোজেন ও কার্বন, দু'টি মৌলিক পদার্থের সংযোগে হাইড্রোকার্বন গঠিত হয়।

মোমবাতির ভেতর দিয়ে একটি সুতোর তৈরি পলতে ঢোকানো থাকে। পলতেয় আগুন ধরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? প্রথমে কঠিন মোম গলে গিয়ে তরল হবে। তারপর ওই তরল মোম রূপান্তরিত হবে বাষ্পতে—যে-বাষ্প জ্বলতে পারে। মোমবাতির পলতের মাথায় ওই তরল মোম ম্যাজিকের মত উঠে আসে। পদার্থবিজ্ঞানের যে-নিয়মে ওটা পলতের মাথায় উঠে আসে তাকে বলে ক্যাপিলারি অ্যাকশন (Capillary action)। মোমবাতির হাইড্রোকার্বনের দাহ্য বাষ্প পোড়ার ফলেই ওতে আগুন জ্বলে। এই প্রজ্বলনের সময় বাতাসের অক্সিজেন চাই। বাতাসের অক্সিজেন ও মোমবাতির বাষ্পের (যেটা তরল মোম থেকে তৈরি হচ্ছে) রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। তখন মোমবাতি থেকে আলো ও তাপ দু'টোই পাওয়া যায়।

মোমের বাষ্প পোড়ার ফলেই কি মোমবাতির আগুন পাওয়া যায়?

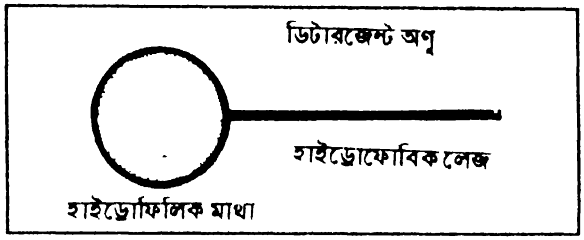
মোমবাতির আগুন যে মোমের বাষ্প পোড়ার ফলেই পাওয়া যাচ্ছে সেটা একটা সহজ উপায়ে প্রমাণ করা সম্ভব। মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে তক্ষুণি একটা জ্বলন্ত দেশলাই-য়ের কাঠি পলতের এক ইঞ্চি ওপরে ধরলে সেটা আবার দপ ক'রে জ্বলে উঠবে। কারণ তখন মোমবাতির পলতের ওপরের দাহ্য বাষ্পে আগুন ধরে যায়। সেই সঙ্গে পলতেটাতেও আগুন জ্বলে ওঠে।

মোমের মধ্যে যে কার্বন রয়েছে তা প্রমাণ করতে হলে একটা কাচের প্লেট মোমবাতির আগুনের শিখায় ধরতে হবে। কালো রঙের ভুসো পড়বে প্লেটের গায়ে। মোমের মধ্যে যে হাইড্রোজেন রয়েছে সেটা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে পুড়ে জল উৎপন্ন করে। সেই সঙ্গে অবশ্য কার্বন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসও তৈরি হয়।

সাবান অথবা ডিটারজেন্ট পাউডার ময়লা পরিষ্কার করে কি ভাবে?

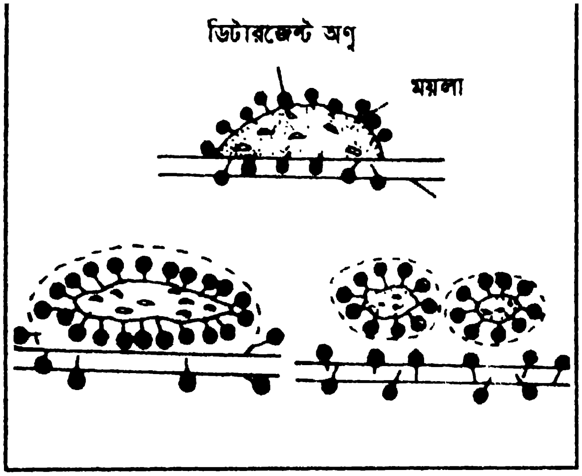
আমরা যে সমস্ত সাবান ব্যবহার করে থাকি সেগুলো তৈরি হয় যথেষ্ট খাদ্যগুণ-সম্পন্ন ভোজ্য তেল থেকে।

প্রথমেই একটা কথা বলা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে, পরিষ্কার করতে পারে এমন সমস্ত cleaning agent-কে ডিটারজেন্ট বলা হয়। এই ডিটারজেন্টদের মধ্যে কোনোটার সাবানের গুণ আছে, আবার কোনোটার তা নেই। কিন্তু সাবান কাকে বলে? সাবান চর্বি জাতীয় অ্যাসিডের (Fatty acids) সোডিয়াম অথবা পটাশিয়াম লবণ থেকে তৈরি হয়। ডিটারজেন্ট সিনথেটিক অর্থাৎ কৃত্রিম জিনিস। সাধারণ সাবানে যে-সব রাসায়নিক পদার্থ থাকে, বাজারে ডিটারজেন্ট হিসেবে যা চালু আছে, তাতে তা পাওয়া যায় না।



কিন্তু ডিটারজেন্ট কী ভাবে ময়লা পরিষ্কার করে? কোনো বস্তুর (জামা, কাপড় ইত্যাদি) গায়ে ময়লা জমে সেখানে আটকে থাকতে পারে তিনভাবে: রাসায়নিক, যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক বলের সাহায্যে। যে-জিনিসটা ময়লা আটকে রাখে সেটা প্রায়শই তেলতেলে হয়। সেখানে জল দিলে জায়গাটার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যায়, কিন্তু ময়লাটা উঠতে চায় না। ডিটারজেন্টের কাজ হল ময়লা

একটা ছোট পোকা অনেক সময়ে জলের ওপরে ভেসে বেড়ায় কিসের জোরে?



আটকে থাকার বাঁধনকে আলগা করে দেওয়া। বিজ্ঞানের যে নিয়ম অনুসারে এই ঘটনা ঘটে তার নাম পৃষ্ঠ-টান, ইংরেজি কথায় সারফেস টেনসন (Surface tension); এই সারফেস টেনসনের শক্তির জোরেই কোনো তরলের ওপরের তল টানটান অবস্থায় থাকে। একটা অতি ক্ষুদ্র কীট অনেক সময়ে জলের ওপরে ভেসে বেড়াতে পারে। ওই ক্ষুদ্র কীট যে জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে না তার কারণ কি? পৃষ্ঠ-টানের জন্য জলের ওপরের তল পর্দার মত এমন টানটান অবস্থায় থাকে যে সেটা সহসা ভেঙে যায় না।

জলের পৃষ্ঠ-টান আসলে নীচে, ওপরে; পাশে সব দিকেই পড়ে। কলের মুখ থেকে খুব আস্তে একটা ফোঁটা ক্রমশ ছোট থেকে বড় হয়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওই জলের ফোঁটা গোল হয়ে থাকে—চট করে পড়ে যায় না। জলের ফোঁটাটি বড় হতে হতে ঝরে পড়বে তখনই, যখন পৃষ্ঠ-টানের জোরে আর তা নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। পৃষ্ঠ-টানের জন্যেই জলের ফোঁটা যতদূর সম্ভব অল্প জায়গার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে আনতে চায়।

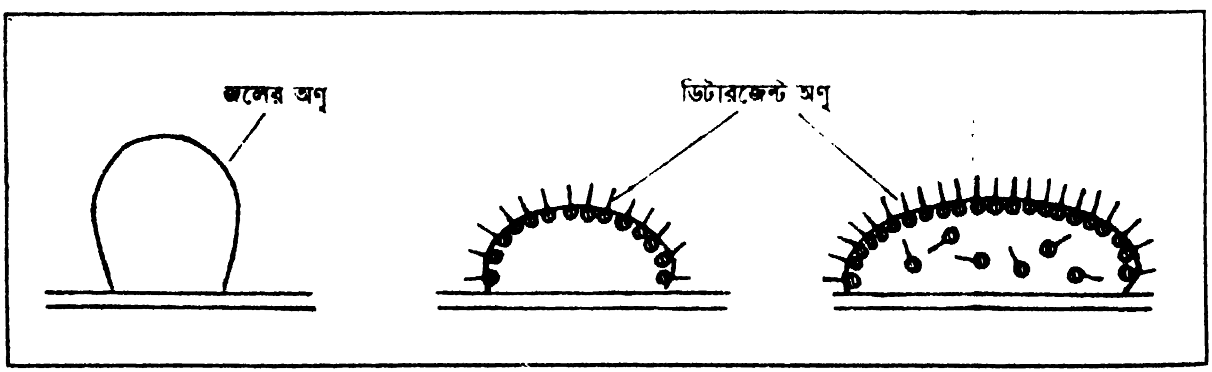
পৃষ্ঠ-টানের কারণ কি? জলের অণুর দল ইতস্তত চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা পরস্পরকে প্রবলভাবে আকর্ষণ ক'রে থাকে। যে কোনো পরিমাণে জলের ভেতরের অণুগুলি চারদিক থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এ-রকম একটি অণুর কথা চিন্তা করা যাক—চারদিক থেকেই তার ওপর পড়ছে টান। যেহেতু অণুর চারদিক থেকেই সমান টান পড়ে, কাজেই ওই অণু কোনোরকম বল অনুভব না ক'রেই নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারে।

কিন্তু জলপৃষ্ঠের আবরণের অণুগুলির ব্যাপার আলাদা. তারা অন্যান্য অণুগুলির দ্বারা নীচে ও অন্যান্য দিকে টান অনুভব করছে। কিন্তু এই অণুগুলি ওপরের দিকে কোনো টান অনুভব করছে না।

অর্থাৎ কিছু পরিমাণ জলের (বা অন্য কোনো তরলের) পৃষ্ঠতলের অণুগুলিই সব সময় শুধু ভেতর দিকে ও পাশে টান অনুভব করে। এই কারণে পৃষ্ঠ-টান ক্রিয়া সর্বদা পৃষ্ঠতলেই লক্ষ্য করা যায়।

যে-তরলের সারফেস টেনসন যত বেশি হবে, ভিজিয়ে দেবার শক্তিও তার তত কমতে থাকবে। পারদের সারফেস টেনসন খুব বেশি, তাই পারদ কাচ অথবা অন্য কোনো পাত্রের গা ভেজায় না।

কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করবার জন্য আমরা সাধারণত জল ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, জলের ভেজানোর ক্ষমতা খুব বেশি নয়। এক ফোঁটা জল নিয়ে একটা প্লেটের ওপর রাখলে দেখা যাবে, সেটা গোল ফোঁটা হয়ে প্লেটের ওপর রয়েছে। এবার একটু সাবান অথবা সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ওর মধ্যে যোগ করলে ভারি মজার ব্যাপার ঘটবে। জলের ওই গোল ফোঁটাটা আস্তে আস্তে



প্লেটের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কেন? ডিটারজেন্ট দেওয়ার ফলেই জলের সারফেস টেনসন কমে গিয়েছে। ময়লা তোলার ব্যাপারে এই কৌশলই কাজে লাগিয়ে কোনো জিনিস পরিষ্কার করা হয়। কারণ তখন জল সবরকম ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে পড়ে সহজে সাফাইয়ের কাজ করতে পারে।

ডিটারজেন্ট যে-ভাবে এই কাণ্ডটা করে সেটা লক্ষ্য করার মত। ডিটারজেন্ট অণুর মধ্যে আছে একটা মাথা আর একটা লেজ। ডিটারজেন্ট অণুর মাথা জল ভালবাসে (Hydrophillic), লেজ কিন্তু জল মোটেই পছন্দ করে না। বরং উল্টে জলকে দূরে ঠেলে দিতে চায় (Hydrophobic); জলের মধ্যে ডিটারজেন্টের এই লেজ জল ঠেলে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে থাকে। এইভাবে জলবিন্দুর গোলাকার গঠন ভেঙ্গে গিয়ে জলের সারফেস টেনসন কমে যায় এবং জল ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর ফলে ডিটারজেন্ট অণুর দলও বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা ক্রমাগত চলতে থাকে।

কিন্তু ডিটারজেন্ট পালোয়ানের মত ময়লাকে টেনে তোলে কি ভাবে? ময়লার কণার প্রতি ডিটারজেন্টের লেজের অণুর একটা আসক্তি আছে। ময়লার কণার ওপর ডিটারজেন্টের অণু লেজ দিয়ে আটকে যায়। তারপর লেজের হ্যাঁচকা টানে ময়লা সরে আসে। এই ঘটনা ঘটতে অবশ্য কিছুক্ষণ সময় লাগে, তাই কয়েক ঘণ্টা ডিটারজেন্টে ভিজিয়ে রাখলে ময়লা তাড়াতাড়ি সরে যায়, তখন কাপড়-চোপড় পরিষ্কারও হয় বেশ দ্রুত। আবার ঠাণ্ডা জলের চাইতে গরম জলে জামা-কাপড় কাচলে ওটা আরো তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়। কারণ তাপ দিয়ে জল গরম করলে ওই জলের সারফেস টেনসন কমে যায়। খুব ভাল জাতের সিনথেটিক ডিটারজেন্ট অবশ্য ঠাণ্ডা জলেও কাপড়-জামা সুন্দর পরিষ্কার করতে পারে।

গরম জলে কাপড়-জামা কেন তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়?

ময়লা একবার জামা-কাপড় থেকে আলগা হয়ে এলে সামান্য ঘষা দিলেই সরে আসে। তখন ডিটারজেন্ট অণুর দল ময়লা কণার চারদিকে একটা পাতলা ফিল্মের আবরণ সৃষ্টি করে। হাত দিয়ে ঘষে সাবানের যে-ফেনা উৎপন্ন হয় সেই ফেনাই পাতলা ফিল্মের আবরণ। ডিটারজেন্ট দিয়ে ঘষাঘষির ফলে স্থির বিদ্যুৎ তৈরি হয়। এই বিদ্যুৎ-আধানের জন্যই ময়লার কণা আবার জামা-কাপড়ে গিয়ে জমতে পারে না।

সিনথেটিক ডিটারজেন্ট তৈরি করতে চাই অ্যালকিল বেনজিন—এটা পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্ন হয়। এ-ছাড়া থাকে সোডিয়াম ট্রাই পলিফসফেট, সোডিয়াম সিলিকেট এবং ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট। সোডিয়াম পারবোরেট, কিছু এনজাইম, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম কার্বনেটও যোগ করা হয় ডিটারজেন্ট পাউডার উৎপাদন করতে।

অ্যান্টিবায়োটিক কাকে বলে?

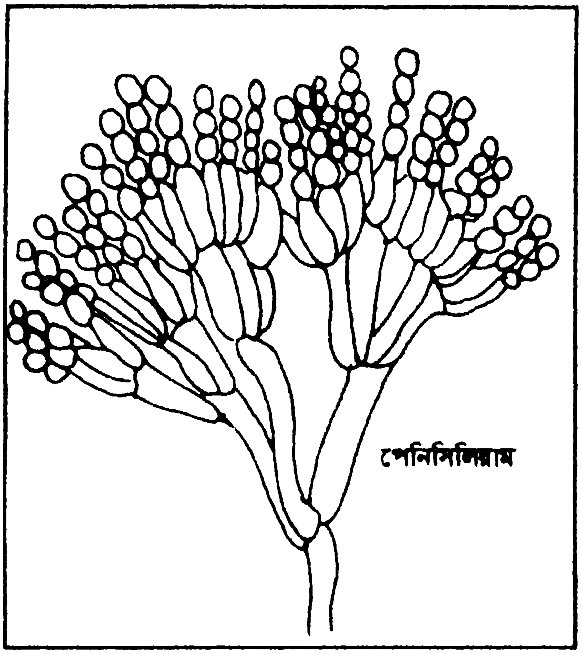
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বর্তমান যুগকে বলা যায় অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। কিন্তু কাকে বলে অ্যান্টিবায়োটিক?

'অ্যান্টি' কথাটির অর্থ হল—বিরুদ্ধে আর 'বায়োটিক' মানে জীবন। অ্যান্টি-বায়োটিক অণুজীব (Micro-organisms) দ্বারা সৃষ্ট। এরা আকারে এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে এদের দেখার কথাই ওঠে না। আমরা যেমন 'কলোনি' গড়ে অনেকে মিলে একসঙ্গে থাকতে চাই, তেমনি এরা নিঃসঙ্গতা এড়িয়ে দলবদ্ধ হয়ে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করে। পাঁউরুটিতে যে ছাতা পড়ে, তা এক রকমের অণুজীবের কলোনি।

অ্যান্টিবায়োটিক কি থেকে তৈরি করা হয়?

এই পৃথিবী অণুজীবে পূর্ণ। এমন অনেক অণুজীব আছে যারা নানা ধরনের রোগের কারণ। এদের আমরা ব্যাকটেরিয়া বলি।

কিন্তু আবার নানারকম অণুজীব পাওয়া যায় যারা নিজেদের শরীর থেকে এমন সব রাসায়নিক জিনিস তৈরি করে যা অন্য ক্ষতিকর অণুজীবদের ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। এই রাসায়নিক পদার্থের নাম অ্যান্টিবায়োটিক। বিজ্ঞানীরা কৌশলে এই সব জীবাণুদের বন্ধু ক'রে মানুষের দেহে যে-সব জীবাণু ক্ষতি করে, তাদের ধ্বংসের কাজে এদের লাগান। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, নিওমাইসিন,



যে ছত্রাক থেকে পেনিসিলিনের জন্ম

অরিমাইসিন, গ্যারামাইসিন, অ্যামপিসিলিন, টেরামাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন—এই সব অ্যান্টিবায়োটিক আজকাল চিকিৎসকেরা প্রায় ব্যবহার করে থাকেন।

আজকাল অবশ্য পেনিসিলিন থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে 'অ্যামপিসিলিন' তৈরি হয়েছে যা নাকি পেনিসিলিনের থেকে আরো বেশি শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক।

শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে অ্যান্টিবায়োটিক কি ভাবে ক্ষতিকর জীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ করে তার উত্তর এখনও সঠিক জানা যায়নি। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা, জীবাণুদের বেড়ে ওঠার জন্য সাধারণত যে-সব খাদ্যের প্রয়োজন হয় অ্যান্টিবায়োটিক সেই খাদ্যের জোগান বন্ধ করে দেয়।

অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয় জীবাণু (Bacteria), জীবদেহাবশেষপূর্ণ মাটি (Mould) বা বড় ধরনের লতা গাছ (Large Plant) থেকে।

ফুলের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন?

এমন অনেক গোলাপ গাছ আছে, যার কুঁড়ি দেখে বিন্দুমাত্র বোঝা যায় না, কি রঙের ফুল ফুটবে। কিন্তু সেই কুঁড়িটি যখন দিব্যি ফুটে উঠে নিজেকে মেলে ধরল প্রকৃতির কাছে—তখন হয়তো দেখা গেল, ভারি সুন্দর একটা লাল ফুল ফুটেছে। ওই শ্রেণীরই ভিন্ন প্রজাতির আর একটি গাছে যখন গোলাপী, হলুদ অথবা সাদা রঙের ফুল ফোটে, তখন বাস্তবিকই অবাক হওয়ারই কথা। হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়, নানা রঙের গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, জিনিয়া, জবা, স্থলপদ্ম, গাঁদা, দোপাটি—এই সব ফুল। এদের মধ্যে আবার গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার যে কত রঙের রকমফের ফুল হয়, তা ব'লে শেষ করা যায় না। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, কয়েকশোরও বেশি গোলাপ গাছের প্রজাতি আছে। এর কোনোটায় লাল, কোনোটায় গোলাপী, কোনোটায় হলুদ, এই সব ফুল ফোটে।

আমরা সকলেই জানি একটা ফুলকে লাল দেখায়, তার কারণ ওই ফুল সূর্যকিরণের সব ক'টি রঙকে (রামধনুর সাত রঙ—বেগুনি, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল—ইংরেজিতে এদের সংক্ষেপে বলা হয় VIBGYOR) শোষণ ক'রে নেয়—কেবল মাত্র লাল রঙ ছাড়া। লাল রঙকে ওই ফুল ফিরিয়ে দেয়—আর এইজন্যেই ওই ফুলটিকে লাল রঙের দেখায়। ঠিক তেমনি হলুদ ফুল

একই রকম দেখতে দু'টি গাছে ভিন্ন রঙের ফুল ফোটে কি ক'রে?

সূর্যকিরণের সব ক'টি রঙ শোষণ করে, একমাত্র হলুদ রঙ ছাড়া এবং ফিরিয়ে দেওয়া হলুদ রঙের জন্যই ওটাকে হলুদ দেখায়। এখন প্রশ্ন, একই রকম দেখতে দু'টি গাছে ভিন্ন রঙের ফুল ফোটে কি ক'রে? ফুলের পাপড়ির বিভিন্ন ধরনের রঙ ফিরিয়ে দেবার শক্তিই বা আসে কোথা থেকে? এর কারণ হল, ওই শ্রেণীর ফুলের পাপড়িতে এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু থাকে, যার নাম—অ্যানথোসায়ানিন (Anthocyanin)। এই রাসায়নিক বস্তুটি ফুলের পাপড়িতে খুবই অল্প পরিমাণে থাকে। কিন্তু তবুও এই অ্যানথোসায়ানিন ফুলের বিভিন্ন রঙ সৃষ্টি করতে পারে। লাল গোলাপ এবং লাল ডালিয়ার মধ্যে যে অ্যানথোসায়ানিন থাকে তার নাম সায়ানিডিন (Cyanidin)। তেমনি গোলাপী এবং নীল ফুলের পাপড়িতে থাকে ডেলফিনিডিন (Delphinidin)। সায়ানিডিন ও ডেলফিনিডিন অণুর গঠনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কেবল ডেলফিনিডিনের মধ্যে একটি

অক্সিজেন পরমাণু বেশি থাকার ফলে একটি পাপড়ি হল লাল—অন্যটির রঙ গোলাপী ও নীল। এই রকম আরো নানাপ্রকার অ্যানথোসায়ানিন আছে বিভিন্ন ফুলের ভেতর, আর তারাই ওই ফুলের সত্যিকারের রঙ নির্দেশ করে। অবশ্য কোনো কোনো ফুলের একই পাপড়ির মধ্যে দু' তিন রকমের অ্যানথোসায়ানিন থাকতে পারে। এদের পরিমাণ কম-বেশির ওপর ফুলের আসল রঙ নির্ভর করে। কখনো কখনো একই শ্রেণীভুক্ত দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের ফুলগাছ থেকে নতুন একটি সংকর গাছ (Hybrid) তৈরি করলে দেখা গেছে, গাছটিতে নতুন রঙের ফুল ফুটেছে, যার রঙ আগের ফুলগাছ দু'টির ফুলের রঙের সংমিশ্রণ। কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে গাছ এই রাসায়নিক বস্তুটি তৈরি ক'রে নয়নাভিরাম বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটায়, তা এক আশ্চর্য ব্যাপার। ফুলের পাপড়ি থেকে অ্যানথোসায়ানিন বিচ্ছিন্ন ক'রে তাদের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

কর্পূর উবে যায় কেন?

কর্পূর দেখতে সাদা দানাদার পদার্থ। এর একটা বেশ মৃদু সুগন্ধও রয়েছে। জলে ফেললে কিছুক্ষণ বাদে কর্পূর গুলে যায়। বাতাসেও রেখে দিলে ধীরে ধীরে উবে যেতে থাকে।

অনেকে ভাবে কর্পূর বুঝি কোনো গাছের আঠা। কিন্তু তা নয়। কর্পূর গাছ থেকেই হয়—তবে ওটা কোনো আঠা নয়। কর্পূর গাছ চির-সবুজ। ফরমোজা দ্বীপ, জাপান এবং মধ্য চীন হচ্ছে এই গাছের আদি উৎপত্তি স্থান। এই গাছ দ্বি-বীজ পত্রী। নাম—সিন্নামোমেম কামফোরা। এই গাছে ছোট ছোট ফিকে সবুজ ফুল হয়, কিন্তু ফুলের কোনো পাপড়ি নেই। এর ফল ছোট ছোট কুলের মত দেখতে। তিরিশ মিটার পর্যন্ত এই গাছ লম্বা হয়ে থাকে।

কর্পূর গাছের সমস্ত অংশেই কর্পূর তেল বর্তমান। কর্পূর গাছের টুকরো, শিকড়, ডালপালা ও পাতা মাটির বড় পাত্রে রেখে তার মধ্যে চালানো হয় গরম বাষ্প। গরম বাষ্পের সংস্পর্শে এসে ওর ভেতরের কর্পূর-প্রধান তেল জাতীয় পদার্থ বাষ্পের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে আসে। তারপর ওই মাটির পাত্রের ওপর দিকের শীতল অংশে কঠিন হয়ে জমা হয়। সেখান থেকে ওগুলি তুলে নেওয়া হয়। সাধারণত এই কর্পূর নিষ্কাশনের কাজটা করা হয় পুরোনো গাছ থেকে।

কর্পূর নামটি সংস্কৃত। এর আরবী নাম হল 'কেফের'। তার থেকে ইংরেজি নাম এসেছে 'ক্যাম্ফর'। বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ডুমাস ও ব্ল্যানচেট কর্পূর অণুর সংকেত বের করেন—$C_{10}H_{16}O$।

ভারত ও চীন-জাপানের অনেক ওষুধেই কর্পূর ব্যবহৃত হয়। পেটের অসুখ, চুলকানি প্রভৃতি রোগে এটা ভাল কাজ করে। অবিশুদ্ধ কর্পূর তেল বাতের রোগের পক্ষে উপযোগী। কর্পূর বহু প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুদের পূজা মন্দিরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেলুলয়েড, প্লাসটিক, ধূমহীন বারুদ, বিস্ফোরক পদার্থ, সুগন্ধি-দ্রব্য তৈরিতে কর্পূর খুবই দরকার।

কর্পূর কি কোনো গাছের আঠা?

প্রতি বছর জঙ্গলের বহু সংখ্যক কর্পূর গাছ কেটে তার কাঠগুলোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে বাষ্পের সাহায্যে অবিশুদ্ধ কর্পূর নিষ্কাশিত হয়। তারপরে বড় বড় নাদায় এটার সঙ্গে চুন, কাঠ কয়লা আর নুন মিশিয়ে বিশুদ্ধ করা হয়। তার থেকে পাওয়া যায় সাদা চকচকে দানা।

তাপ পেলে কঠিন পদার্থ সাধারণত তরলে পরিণত হয়। কিন্তু কর্পূরের বেলায় তা হয় না। তাপ পেলে কঠিন কর্পূর বাষ্পাকারে উবে যায়। আবার ওই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে তরল না হয়ে সরাসরি ওটা কঠিনে রূপান্তরিত হবে। ইংরেজিতে একে বলে সাবলিমেশান (Sublimation)—ন্যাপথলিন বা আয়োডিনও একই ভাবে তাপ পেলে সরাসরি কঠিন থেকে বাষ্পে পরিণত হয়—তরল অবস্থার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে। আমরা জানি যে সাধারণত পদার্থের তিনটি অবস্থা থাকে : কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। যেমন, বরফ, জল ও স্টিম একই পদার্থের তিনটি অবস্থা। বরফে তাপ দিলে তা গলে জলে পরিণত হয়। সেই জলকে আরো উত্তপ্ত করলে এক সময়ে পাওয়া যায় স্টিম। এই ঘটনা ঘটে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে। কোনো পদার্থ কখন কোন অবস্থায় রূপান্তরিত হবে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র তাপমাত্রার ওপরে নির্ভর করে না। চাপের ওপরেও নির্ভর করে। চাপ ও তাপমাত্রার হেরফের ঘটিয়ে কোনো পদার্থকে কঠিন, তরল বা বাষ্পীয়—যে কোনো অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়। একটি বিশেষ চাপ ও তাপমাত্রায় কোনো পদার্থকে একই

সঙ্গে তিনটি অবস্থাতেই সুস্থিতভাবে হাজির করা যেতে পারে। এই বিশেষ চাপ ও তাপমাত্রা নির্দেশকারী অবস্থাকে বলা হয় ত্রিদশা বিন্দু (Triple point)। বিভিন্ন পদার্থের ত্রিদশা বিন্দু বিভিন্ন। কোনো পদার্থের ত্রিদশা বিন্দুতে চাপের মান যদি স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের তুলনায় বেশি হয়,

গাছের কোন অংশ থেকে কর্পূর পাওয়া যায়?

তাহলে সেই পদার্থকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে রেখে তাপ দিলে সে কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্পে রূপান্তরিত হবে। ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে কর্পূর বা আয়োডিনের ক্ষেত্রে। যদি কোনো উপায়ে চাপ বাড়িয়ে ত্রিদশা বিন্দুর চাপমানের চেয়ে বেশি করা যায় এবং সেই অবস্থায় কর্পূর বা আয়োডিনকে তাপ দেওয়া যায়, তাহলে এই পদার্থগুলি কঠিন থেকে আগে তরলে পরিণত হবে, তারপর রূপান্তরিত হবে বাষ্পে।

যেমন, কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড বা শুষ্ক বরফের ত্রিদশা বিন্দুর চাপমান বায়ুমণ্ডলীয় চাপের 73 গুণ। তাই স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তাপ পেলে শুষ্ক বরফ সরাসরি গ্যাসীয় কার্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হবে। চাপ বাড়িয়ে যদি বায়ুমণ্ডলীয় চাপের 74 গুণ করা যায়, তাহলে শুষ্ক বরফ থেকে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যাবে।

তারপিন ও ইউক্যালিপ্টাস তেল থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আজকাল প্রচুর পরিমাণে সিনথেটিক কর্পূর তৈরি হচ্ছে। সিনথেটিক কর্পূর স্বাভাবিক কর্পূরের মতই—কেবল আকারেই নয়, কাজে ও গন্ধেও।

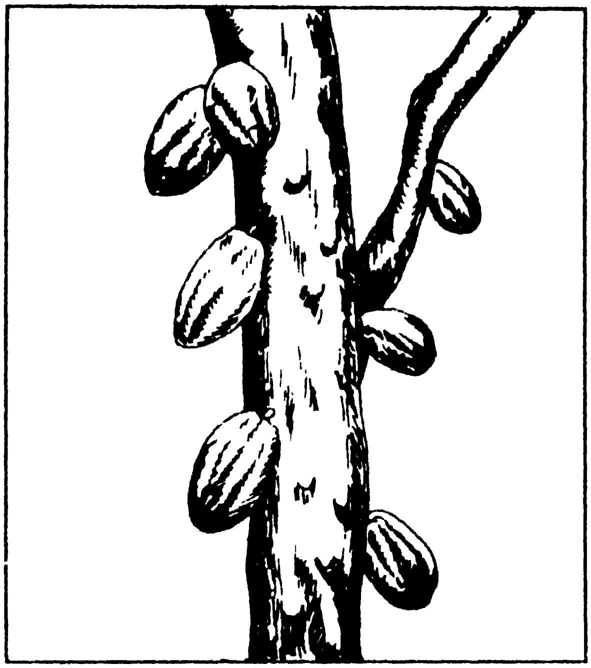
চকোলেট তৈরি হয় কী দিয়ে?

বিখ্যাত অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস যে বহু অজানা দেশ আবিষ্কার করেছিলেন—এ-কথা আজ কারো অজানা নয়। কিন্তু আরো একটা জিনিস আবিষ্কার ক'রে তিনি শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। এটি চকোলেট। ক্যাকাও

কোকো কোন গাছের ফল?

গাছের ফল একটি অতি সামান্য জিনিস। এর থেকে আমরা পেয়ে থাকি কোকো আর চকোলেট।

ক্যাকাও গাছ অন্যান্য আর পাঁচটা গাছেরই মত। এই



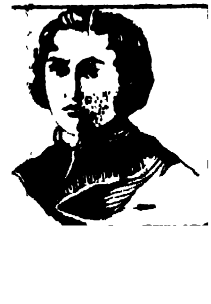
ক্যাকাও গাছ

গাছেও কুঁড়ি, ফুল-ফল সবই হয়।

কলম্বাস লক্ষ্য করেছিলেন, আমেরিকার বর্বর অধিবাসীরা গাছ থেকে ক্যাকাও ফল তোলে, তারপর তার শাঁস বের করে সূর্যের তাপে শুকিয়ে নেয়। এরপরে মহানন্দে ওদের ছেলেবুড়ো সব্বাই এগুলো খেতে থাকে। কলম্বাসকে ওখানকার একজন বুড়ো ক্যাকাও গাছের ফল সেদ্ধ করে এক ধরনের পানীয় খেতে দেয়। কলম্বাস দেখলেন, এর স্বাদটাও ভারি চমৎকার। খেলে মনে স্ফূর্তি আসে, দেহের ক্লান্তি ও অবসন্ন ভাবটা কেটে যায়।

আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবার সময়ে ক্রিস্টোফার তাঁর পকেটে অন্যান্য আরো অনেক জিনিসের





কলম্বাস

সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু ক্যাকাও ফল।

এ-কথা সত্যি যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় কোকো গাছের ফল খাদ্য ও সুস্বাদু পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কলম্বাস চিনিয়ে দেবার পরই অবশ্য এই পানীয় প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সারা ইউরোপে তার ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। যে-পানীয় এক সময়ে ছিল বর্বর নিগ্রোদের খাদ্য, ইউরোপে এসে তা রাতারাতি বনেদী ডাইনিং টেবিলে উঠে পড়ল। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় থেকেই চকোলেট ও কোকো সেখানকার ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করে।

আমেরিকা ও আফ্রিকা দু'দেশ থেকেই এখন ক্যাকাও ফল আসে। এমন-কি সারা বিশ্বের ব্যবহৃত প্রায় এক লক্ষ টন কোকোর শতকরা ষাট ভাগই আসে আফ্রিকা থেকে।

কোকো গাছ লাগাবার তিন-চার বছর পরেই তাতে ফল ধরে। এই গাছ ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত ফল দেয়। গাছের গুঁড়ি থেকেই গোলাপী রংয়ের ফুল দেখা দেয়—অনেকটা আমাদের পেঁপে গাছের মতন। পরে এর থেকে দশ-বারো ইঞ্চি সবুজ ক্যাপসুল বেরোয়। পাকলে ফলগুলির কমলালেবুর মত রঙ হয়। ওই ক্যাপসুলের ভেতরে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশটা বীজ পাওয়া যায়। বীজগুলিও বেশ মোটা।

বীজগুলিকে বের করে নিয়ে আট-দশ দিন ধরে গেঁজানো হয়। তখন এর থেকে একটা তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। তারপর ওগুলিকে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে কোকো তৈরির জায়গায় সিদ্ধ করা হয়। এই সময়ে যে-গন্ধ বেরোয় সেটা বেশ মৃদু। সিদ্ধ করা হয়ে গেলে ওগুলিকে ভেঙে তার শক্ত খোলাটা ছাড়িয়ে ফেলা হয়। তরল চকোলেট ঠাণ্ডা করার পর শক্ত মেটে রঙের হয়ে যায়। ওটার সঙ্গে দুধ, চিনি ও আরো অনেক কিছু মিশিয়ে স্বয়ংক্রিয় মেশিনে তৈরি করা হয় আধুনিক চকোলেট। তারপরে ওটাকে মেশিনে কেটে নিয়ে পছন্দ মত রংচং-য়ে কাগজের প্যাকেটে বন্দী ক'রে চালান দেওয়া হয়।

কফি তৈরি হয় কিসের থেকে?

চা আর কোকোর মত কফিও পাওয়া যায় গাছ থেকে। কফি গাছের আদিম জন্মস্থান আফ্রিকার আবিসিনিয়া। এখান থেকেই আরব দেশের ধর্মপ্রাণ ইমামদের কাছে আসে কফি। ইমামরা জানতে পেরেছিলেন যে, কফির বীজ সিদ্ধ করা নির্যাস একটা উত্তেজক পানীয়। অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত আরব, পারস্য এবং তুরস্কে এর প্রচলন হয়ে পড়েছিল। পরে তুরস্কের মাধ্যমে ইউরোপেও কফির আমদানি হয়।

সমস্ত পৃথিবীতে এখন প্রায় পাঁচ লক্ষ টন কফি উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে আবার দক্ষিণ আমেরিকা একাই একশো—তারা উৎপন্ন করে প্রায় চার লক্ষ টন। ভারতে মাত্র ষাট হাজার টন কফি উৎপন্ন হলেও আস্বাদের দিক থেকে এই কফি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

কফি গাছ বীজ থেকে হয়। তিন বছর পরে এর গাছে ফল দেখা দেয়। পঞ্চাশ বছর বা তার কিছু বেশি সময় এই গাছ বেঁচে থাকে। বসন্তের প্রথম দিকে বৃষ্টির পর এই গাছে সাদা সুগন্ধি ফুল দেখা দেয়। ফুলের পাপড়ি ঝরে যাবার পর দেখা যায় ফল। ফল পাকতে সময় লাগে সাত-আট মাস। এই ফল তুলে নিয়ে এর থেকে বিভিন্ন প্রথায় কফি তৈরি করা হয়।

কফি তৈরির একটা প্রথা হচ্ছে পাকা ফলগুলিকে তুলে প্রথমে রোদে শুকানো হয়। তারপর ওর খোলটা সরিয়ে দিয়ে বীজটাকে বের করে নেওয়া হয়। একে চেরি কফি বলে। দক্ষিণ আমেরিকায় সব জায়গাতেই এই প্রথায় কফি তৈরি হয়।

অন্য আর এক প্রথায় ফলটাকে ভাল ক'রে সেদ্ধ ক'রে তারপরে তার নরম লেইটা ধুয়ে ফেললে পার্চমেণ্ট কফি পাওয়া যায়। এই বীজগুলিতে একটা পাতলা সাদা আবরণ থাকে। এই আবরণটা ছাড়িয়ে নিলে ভাল কফি পাওয়া যায়। চেরি কফির চাইতে এই কফির সুগন্ধ বেশি ভাল।

কোনো কোনো কফির বীজের দু'টো অংশকে এক সঙ্গে জুড়ে বাজারে বিক্রি করা হয়। একে বলে পি-বেরি কফি। এর গন্ধটা সব চাইতে মিষ্টি।

দু' রকমের কফি চারার মধ্যে অ্যারাবিকা চারাটাই সাধারণত চাষ করা হয়। কাঁচা কফির অবশ্য তেমন কিছু আস্বাদ নেই। জ্বাল দিয়ে নিলে তবেই ওর আস্বাদ খোলে। জ্বাল দেবার পর কফি বীজের রঙটাও সবুজ থেকে মেটে হয়ে যায়।

বাড়িতে কলের পানীয় জল শোধন করা হয় কী ভাবে?

বাড়িতে কলের মুখ খুলে দিলেই অঝোর ধারায় জল

বেরোতে থাকে। কিন্তু এই জল বিশুদ্ধ করা হয় কী ভাবে? পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে পাতন পদ্ধতিতে জল বিশুদ্ধ করা যায়। দৈনন্দিন ঘরের কাজে আমাদের খুব বেশি বিশুদ্ধ জল না হলেও চলে। কিন্তু পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পানীয় জলের ভেতর যেন কোনো জীবাণু না থাকে তা দেখতে হবে। এ-ছাড়া স্বল্প পরিমাণ খনিজ লবণ এবং দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। আমাদের শরীরের পক্ষেও এই ধরনের জল বিশেষ উপযোগী।

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দিয়ে কি জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব?

সাধারণত পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্য না নিয়ে নদী, পুকুর প্রভৃতির জল পাম্প ক'রে তুলে এনে শোধন করা হয়। প্রথমে জলকে একটা জায়গায় রেখে তার ময়লাগুলো নীচে থিতিয়ে ফেলা হয়। এর জন্য পটাশ অ্যালাম বা ফিটকিরি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সূর্যের কিরণ ও সরাসরি তাপেও অনেক জীবাণু ধ্বংস হয়। তারপর এই জল বালি ও পাথরের স্তর অতিক্রম করে। একটা পাম্পের সাহায্যে এই জলকে খুব উঁচু জায়গায় তুলে তারপর বিভিন্ন নলের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। অনেক সময়ে জীবাণুমুক্ত করবার জন্য এই ট্যাঙ্কের জলের সঙ্গে ব্লিচিং পাউডার অথবা ক্লোরিন মিশিয়ে দেওয়া হয়। ক্লোরামিন টি, অতি বেগুনী রশ্মি (আলট্রা ভায়োলেট রে) দিয়েও জীবাণু ধ্বংস করা যায়।

কাচ তৈরি করা হয় কী ক'রে?

কাচ একরকম স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ। কিন্তু এ সহজেই ভেঙে যেতে পারে। তাই কাচকে বলা হয় ভঙ্গুর জিনিস। বালি ও সোডা তাপ দিয়ে গলিয়ে যে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বস্তু পাওয়া যায়, সেটা জলে গুলে যায়। কাজেই এই দু'টি জিনিসের সাহায্যে কাচ তৈরি হয় না। কিন্তু বালি, চুন ও সোডা গলিয়ে যে বস্তু পাওয়া যায় সেটা জলে গুলে যায় না, দেখতে বেশ স্বচ্ছ। এটাই হল সাধারণ কাচ। নানা ধরনের শিশি, বোতল ও কম দামের কাচের জিনিসপত্র এর থেকেই তৈরি হয়। অনেক সময়ে চুনের বদলে বেরিয়াম অক্সাইড নামে এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করলে ওই কাচের উজ্জ্বলতা বাড়ে।

মোটর গাড়ির কাচ সহজে ভাঙে না কেন?

ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের কাচের যন্ত্রপাতি থাকে। সেখানে যে-সব কাচের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তারা বেশি তাপ সহ্য করতে পারে। এই সব যন্ত্রপাতির কাচ তৈরিতে সোডার বদলে পটাশ ব্যবহার করা হয়। রসায়নাগারের ফ্লাস্ক, টেস্টটিউব, বিকারের মত জিনিস তৈরি করতে এই কাচ চাই। বোরো সিলিকেট কাচ দিয়ে তৈরি হয় থার্মোমিটারের নল। বিখ্যাত 'জেনা' ও 'পাইরেক্স' কাচে প্রায় শতকরা দশভাগ বোরিক অ্যাসিড থাকে। কাচে বালি (সিলিকা) ও বোরিক অ্যাসিড থাকলে তাকে বোরো সিলিকেট কাচ বলে। বোরো সিলিকেট কাচ উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। আজকাল এক ধরনের কাচ তৈরি হয়েছে যা প্রচণ্ড আঘাতেও সহসা ভাঙে না। মোটর গাড়ির কাচ বেশ পুরু হয়। সাধারণ কাচের দু'টি স্তরের মাঝখানে প্লাস্টিক জাতীয় কোনো স্বচ্ছ বস্তু প্রবেশ করালে ওই কাচ খুব শক্ত হয়, চট ক'রে ভেঙে ছিটকে ওই কাচের টুকরো বাইরে বেরিয়ে আসে না। এই একই ভাবে তিনটে কাচের চাদর এক ধরনের আঠা (কানাডা বালসাম) দিয়ে জুড়ে দিলে সেটা খুব মজবুত ও শক্ত হয়।

সাদা কাচকে সবুজ করা যায় কি ক'রে?

পরিষ্কার সাদা কাচকে রঙিন করতে হলে তার মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইড মেশানো দরকার। যেমন, সবুজ কাচের জন্য চাই কপার অক্সাইড, নীলের জন্য কোবাল্ট অক্সাইড আর বেগুনী কাচের জন্য ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড।

কাচের কোনো জিনিস তৈরি করবার সময়ে প্রথমে ওই জিনিসের একটা ছাঁচ বানিয়ে নিতে হয়। তারপর নলের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে কাচকে নরম অবস্থায় ফোলানো হয়। কাচের জিনিস যাতে চট করে ভেঙে না যায় তার জন্য ওই কাচের জিনিষপত্র আবার উত্তপ্ত করে তারপর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা দরকার। এর নাম অ্যানিলিং বা মৃদুকরণ পদ্ধতি।

এ-ছাড়া ছাঁচের সাহায্যে চাপ দিয়েও কাচের প্লেট, রেকাব, ডিশ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কাদা মাটির দলা ছাঁচের মধ্যে ফেলে চাপ দিয়ে কুমোর যেমন মাটির জিনিস বানায়, অনেকটা সেইরকম আর কি!

চশমা ও টেলিস্কোপের লেন্স তৈরির জন্য বিশেষ ধরনের কাচ চাই। এমনভাবে এই কাচ তৈরি করতে হবে যাতে তার আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি শুষে নেবার যোগ্যতা

Crookes কাচের বৈশিষ্ট্য কি?

থাকে। এক ধরনের দামী চশমার কাচ তৈরি হয় Crookes বা Zeiss লেন্স দিয়ে যার মধ্যে আলট্রা-ভায়োলেট আলো সহজে ঢোকে না। তাই আমাদের চোখ নিরাপদ ও স্নিগ্ধ থাকে।

আয়নার পিছনের প্রলেপ সাধারণত লাল রঙের হয় কেন?

আয়না তৈরি করতে হলে কাচের পিছনে রুপোর একটা প্রলেপ লাগানো দরকার। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে অ্যামোনিয়া মেশালে কাচপাত্রের গায়ে সিলভার অধঃক্ষেপ পড়ে। ওই স্তরটি বিভিন্ন উপায়ে সংরক্ষণ করা হয় যাতে সেটা নষ্ট হয়ে না যায়। রুপোর এই প্রলেপটির স্তর খুবই পাতলা, সহজেই উঠে যেতে পারে, তাই দামী আয়নার পিছনে তামার ইলেক্ট্রোপ্লেটিং করা হয়। কিন্তু তামার ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ব্যয়বহুল ব্যাপার—তাই সাধারণ সস্তা আয়নার পিছনে রেড লেড নামে এক প্রকার রাসায়নিক বস্তুর প্রলেপ দেওয়া হয়। এই রেড লেডের রঙ লাল সিঁদুরের মত দেখতে। তাই আয়নার পিছনের রঙ সাধারণত লাল রঙের হয়।

অনেক কাচের পাত্রে সুন্দর ছবি আঁকা কী ভাবে হয়?

কাচের পাত্রে চিত্রাঙ্কন ক'রে তার সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। রোমানরা কাচ দিয়ে নানা ধরনের অলংকার, এমন-কি, ঘরবাড়ির জানালাও তৈরি করতো। ইতালির ভেনিস নগরী রঙিন কাচ নির্মাণ ও তার ওপর স্বর্ণখচিত কারুকার্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিল। ইউরোপের বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে যে সমস্ত গির্জা তৈরি হয়েছিল সেগুলির কারুশৈলী আজও আমাদের মুগ্ধ করে।

কিন্তু কাচের পাত্রে সুদৃশ্য চিত্রাবলী আঁকা যায় কি করে? সাধারণ অ্যাসিডের সঙ্গে কাচের কোনো বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড (যার সংকেত HF) কাচের কোনো অংশে লাগলে সেখানে একটা স্থায়ী দাগ পড়ে। কাচের গায়ে চিত্রাঙ্কন করতে হলে প্রথমে ওই কাচে মোমের একটা প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর ওই মোমের আবরণে কোনো শলাকা দিয়ে খুশিমতো চিত্র এঁকে নিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, শলাকার আঁকা রেখা বরাবর ওই মোম সরে গিয়ে তলার কাচ যেন বেরিয়ে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে চিত্রসহ কাচের পাত্রটি হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে নিলে মোম সরে যাওয়া কাচের অংশ অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে ক্ষয়ে যায়। কিন্তু মোমের আবরণ দেওয়া অংশ অক্ষত থাকে। তখন পাত্রটিকে অ্যাসিড থেকে তুলে নিয়ে গরম জলের সাহায্যে মোমের আস্তরণ অপসারিত করলেই শলাকা দিয়ে আঁকা ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—দেখে মনে হয় যেন কাচের ওপরে খোদাই করা এক অপূর্ব কারুকাজ।

পলিথিন কি?

পলিথিন এই নামের সঙ্গে আমরা এখন সকলেই পরিচিত। পলিথিনের পাতলা চাদর টেবিল ক্লথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ-ছাড়া পলিথিন দিয়ে ফ্রিজ, টিভির ঢাকনা, বোতল, পাইপ—এই সব তৈরি হয়। কিন্তু পলিথিন কি?

ইথিলিন অণু (সংকেত C_2H_4) তীব্র চাপ ও তাপের প্রভাবে পরস্পর জুড়ে গিয়ে দীর্ঘ শৃংখলযুক্ত অতিকায় পলিথিন অণুর সৃষ্টি করে। একে পলিমার বলে। পলিমার জলে ভিজে যায় না, অ্যাসিড বা ক্ষারেও এর প্রতিক্রিয়া কম। তা ছাড়া এটি ভাল বৈদ্যুতিক অন্তরক (ইনসুলেটর)। পলিথিন হচ্ছে থার্মোপ্লাস্টিক [সেলুলয়েড কি? দ্রষ্টব্য] জাতীয় জিনিস। একশো দশ ডিগরি সেলসিয়াস তাপে এটা বেশ নরম হয়। তখন একে ছাঁচে ফেলে তার থেকে বোতল, শিট, পাইপ এই সব সহজেই তৈরি করা যায়। কিছুদিন আগে পলিথিন প্লাস্টিকের তৈরি সম্পূর্ণ মোটর লঞ্চ তৈরি

হয়েছে—যা প্রায় ইস্পাতের মতই টেকসই কিন্তু বেশ হাল্কা।

সেলুলয়েড কাকে বলে?

সেলুলয়েড এক ধরনের প্লাস্টিক। এদের নাম থার্মোপ্লাস্টিক। সমস্ত প্লাস্টিককেই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, থার্মোপ্লাস্টিক এবং থার্মোসেটিং প্লাস্টিক। তাপের প্রভাবে এদের আবরণের পার্থক্যের জন্যই এই নাম। থার্মোপ্লাস্টিক বস্তুগুলি তাপের প্রভাবে নরম হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডা হলে শক্ত হয়। যদি এই থার্মোপ্লাস্টিক জিনিসকে আবার তাপ দেওয়া যায় তাহলে সেটা আবারও নরম হবে। এই নরম থার্মোপ্লাস্টিক বস্তুকে প্রয়োজনমাফিক আগের আকার, অথবা ইচ্ছেমত বিভিন্ন আকার দেওয়া যেতে পারে।

সেলুলয়েড কি শুধুই সাদা?

এখানে বস্তুর ভৌত পরিবর্তন ঘটছে, রাসায়নিক পরিবর্তন নয়। প্রকৃতিতে অবশ্য এই ধরনের আরো অনেক বস্তু আছে যারা প্লাস্টিক নয়, কিন্তু এ-রকম আচরণ ক'রে থাকে, যেমন, মোম।

তাপের প্রভাবে থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের আচরণ কিন্তু থার্মোপ্লাস্টিকের থেকে আলাদা। তাপ প্রয়োগে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক প্রথমে নরম হয়, তারপর থার্মোপ্লাস্টিকের মতই শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আবার তাপ প্রয়োগ ক'রে একে আর নরম করা যায় না।

নাইট্রোসেলুলোজ এবং কর্পূর মিশিয়ে তৈরি হয় সেলুলয়েড। এই সেলুলয়েড তৈরির পিছনেও ইতিহাস আছে।

সেলুলয়েড ব্যবহারের সব চেয়ে বড় অসুবিধে কি?

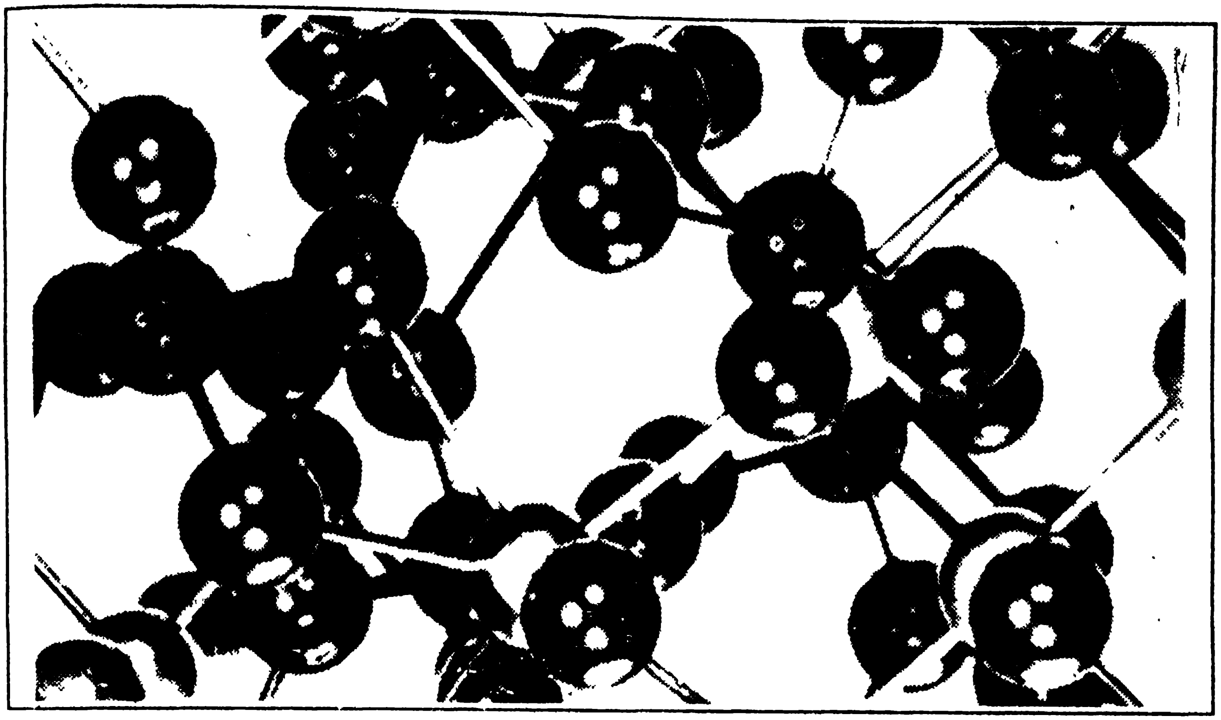
হাতির দাঁত দিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার বল তৈরি হয়। এক সময়ে আমেরিকায় এর আমদানি কমে যাওয়ায় বিলিয়ার্ড বলের ব্যবসায়ীরা পড়লেন মুশকিলে। তখন নিউইয়র্কের একটা ফার্ম ঘোষণা করল, বিলিয়ার্ড খেলার ওই হাতির দাঁতের অনুরূপ বিকল্প কোনো রাসায়নিক বস্তু যদি কেউ আবিষ্কার করতে পারে তবে তাকে বেশ মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ঘোষণার কথা শুনে জন ওয়েসলি হায়াট এবং তাঁর ভাই কাজে নেমে গেলেন। ওঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, কলোডিয়ন নামে এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু দেহের কাটা জায়গায় ঢাললে সেখানকার রক্ত তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে যায়। কলোডিয়ান তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় নাইট্রোসেলুলোজ। হায়াট নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে অবিকল হাতির দাঁতের মত সাদা জিনিস তৈরি ক'রে ফেললেন। এটাকে সহজেই ছাঁচে ঢালাই করা যায়। এরই নাম সেলুলয়েড। প্রথম থেকেই সেলুলয়েড দিয়ে সাদা, স্বচ্ছ বা রঙিন বস্তু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এর সব চাইতে বড় অসুবিধে হল যে, এটা দাহ্য।

প্লাস্টিকে কি থাকে?

প্লাস্টিক কথাটির অর্থ হল যা ছাঁচ অনুযায়ী গড়া যায়। কাজেই সব প্লাস্টিকই নমনীয়। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—সব নমনীয় বস্তুই প্লাস্টিক নয়। নানারকম অজৈব বস্তু, যেমন কাদা, কাচ, কংক্রিট, নানারকম ধাতু—এরা প্লাস্টিক শিল্পের মধ্যে পড়ে না। প্লাস্টিক এক ধরনের পলিমার। কিন্তু পলিমার কাকে বলে? একটা ক্ষুদ্র সাধারণ অণু থেকে সেই জাতীয় অথবা ভিন্ন জাতীয় অনেকগুলি অণুর সংযোগে একটি বৃহৎ দৈত্যাকার অণুর সৃষ্টি হলে তাকে পলিমার বলা হয়। সাধারণ একটি ক্ষুদ্র অণু থেকে এই জাতীয় দৈত্যাকার অণুতে পরিণত হওয়ার ফলে ওই ক্ষুদ্র অণুর সাধারণ ধর্মেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে। দৈত্যাকার অণু সম্পূর্ণ একটি আলাদা ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থ। আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই অবশ্য অনেক পলিমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যেমন, কার্পাসের তুলোয় রয়েছে পলিমার সেলুলোজ। অনেকগুলি গ্লুকোজের মালা পরস্পর এক সঙ্গে জুড়ে তৈরি হয় সেলুলোজ। সেলুলোজ পলিমারের কিন্তু প্লাস্টিক ধর্ম নেই। অথচ আশ্চর্যের কথা, সেলুলোজের সঙ্গে অ্যাসিটিক অ্যাসিড মিশিয়ে, যে-সেলুলোজ অ্যাসিটেট তৈরি করা যায় তা নমনীয় এবং তার চমৎকার প্লাস্টিক ধর্ম রয়েছে। চিরুনি, দাঁত মাজার ব্রাশ, যন্ত্রপাতির হাতল, টর্চ, পেন, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, নানা ধরনের খেলনা—এই সব তৈরি হচ্ছে সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাস্টিক থেকে।

নাইলন কাকে বলে?

প্লাস্টিক যেমন, নাইলনও সে-রকম এক ধরনের



পলিমারের বিরাট অণু

পলিমার। দু'টি রাসায়নিক জিনিস লাগে নাইলন তৈরি করার জন্যে। এদের নাম হল অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সামিথিলিন-ডাই-আমিন। হিসেব করে দেখা গেছে যে, প্রায় পঞ্চাশটি অ্যাডিপিক অ্যাসিড এবং পঞ্চাশটি হেক্সামিথিলিন-ডাই-অ্যামিনের ধারাবাহিক বিন্যাসে নাইলনের একটি দৈত্যাকার অণু তৈরি হয়। নাইলনের সুতো বেশ শক্ত এবং টেঁকেও অনেকদিন। জলে কাচার পরে নাইলনের কাপড়-চোপড় বেশ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। আজকাল হামেশাই নাইলনের মোজা, গেঞ্জি, ব্রাশ, দড়ি এই সব তৈরি হচ্ছে।

পলিয়েস্টার কাকে বলে?

নাইলনের মত টেরিলিন ও ডেক্রন-ও এক ধরনের পলিমার। গ্লাইকল ও টেরিথ্যালিক অ্যাসিড পরপর মালার মত জুড়ে তৈরি হয় টেরিলিন। গ্লাইকল এক ধরনের অ্যালকোহল। অ্যালকোহল ও অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ইস্টার তৈরি হয়। কাজেই এদের সাধারণভাবে নামকরণ করা হয়েছে পলিয়েস্টার। এই পলিয়েস্টার থেকে যে তন্তু পাওয়া যায়, তার নাম পলিয়েস্টার ফাইবার (Polyester fibre); এই তন্তু দিয়ে আজকাল নানা ধরনের পোশাক বস্ত্র তৈরি হচ্ছে; এই আধুনিক বস্ত্রগুলি বেশ টেঁকসই এবং বাজারে এর চাহিদাও সুতি বস্ত্রের চাইতে কিছু কম নয়।

ডেক্রনও এক ধরনের পলিয়েস্টার তন্তু। এটা তৈরি হয় ডাইমিথাইল টেরিথ্যালেট ও ইথিলিন গ্লাইকল থেকে। বায়ুশূন্য স্থানে উচ্চ তাপে এই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়। এক পাউণ্ড ডেক্রন তৈরি করতে 0.31 পাউণ্ড ইথিলিন গ্লাইকল ও 0.86 পাউণ্ড ডাইমিথাইল টেরিথ্যালেট লাগে। এই বিক্রিয়া চলার সময়ে মিথাইল অ্যালকোহল বেরিয়ে আসে এবং পলিয়েস্টার তৈরি হয়।

ডেক্রন কি এক ধরনের পলিয়েস্টার তন্তু?

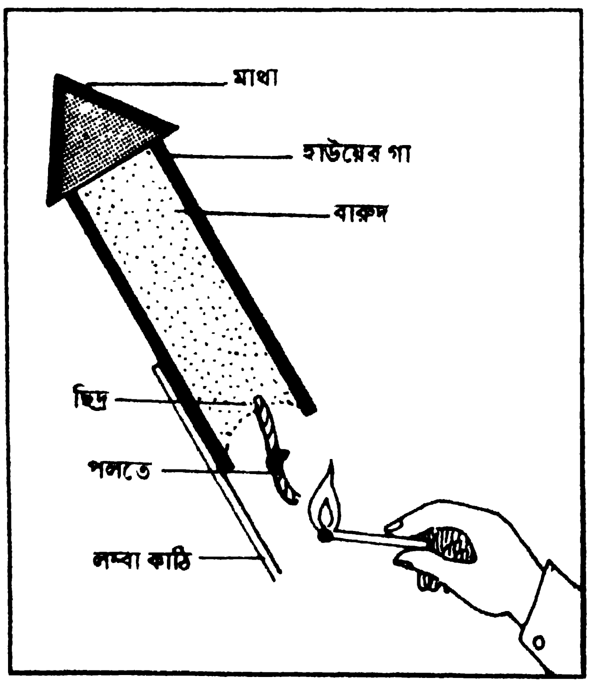
টেরিকটন কাপড় কী দিয়ে তৈরি হয়?

টেরিলিন পলিমার তন্তুটি তৈরি হয় টেরিথ্যালিক অ্যাসিড ও গ্লাইকল মিশিয়ে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে

শুধুমাত্র টেরিলিনের পোশাক খুব আরামদায়ক নয়। এর সঙ্গে কার্পাস সুতো বা কটন মিশিয়ে যে তন্তু তৈরি হয়, সেটাও বেশ টেকসই এবং আমাদের দেশের আবহাওয়ার পক্ষে উপযোগী। শুধু আমাদের দেশের কথাই বা বলি কেন, বহু দেশেই আজকাল টেরিকটনের তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি হচ্ছে। যেমন, শতকরা 70 ভাগ টেরিলিনের তন্তু এবং শতকরা 30 ভাগ কটনের তন্তু এক সঙ্গে মিশিয়ে (একে ব্লেণ্ড করা বলে) টেরিকটনের কাপড় তৈরি হয়। এই মিশ্রণের অনুপাত প্রয়োজন মত কম-বেশি করা যেতে পারে। যেমন, শতকরা 75 ভাগ টেরিলিন, 25 ভাগ কার্পাস সুতোর তন্তু, অথবা শতকরা 80 ভাগ টেরিলিন, 20 ভাগ কটন, এই রকম আর কি! এই ব্লেণ্ডেড বস্ত্রের তন্তু আজকাল বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর এনেছে।

হাউই বাজি ওপরে উঠে যায় কী করে?

হাউই বাজি সকলেরই ভারি প্রিয়। হাউই বাজি নিয়ে ছোট বড় সবাই মজা ক'রে, কিন্তু কি করে আগুন দিলেই ফস করে এটা ওপরে উঠে যায়, কে বলতে পারে? বসানো তুবড়ি ওঠে না, চরকি ওঠে না, ফুলঝুরি ওঠে না, কিন্তু



হাউই বাজি

হাউই বাজি উঠে যায় কেন?

হাউই বাজিকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার মাথা, দেহ, বারুদ, পলতে ও কাঠি রয়েছে। পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা পিচবোর্ড অথবা বাঁশের সরু খোলের মধ্যে থাকে বারুদ পোরা। খোলটার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ওর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় লম্বা একটা কাঠি। বাজিটার পলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণের টান উপেক্ষা করে হুস করে ওপরে উঠে যায় ওই লম্বা খোলটা। তারপর

বসানো তুবড়ি উড়ে যায় না কেন?

ওটা অনেক ওপরে গিয়ে আবার নীচে নেমে আসে। কিন্তু কতখানি ওপরে হাউই বাজি উঠবে? কেনই বা তা উঠে যাবে?

হাউই বাজির পলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলে বারুদটা পুড়ে সঙ্গে সঙ্গে যে গ্যাস তৈরি হয়, সেটা বেরোবার পথ খোঁজে। নীচের দিকেই তার মুখ থাকে। ফলে ঠেলাটা লাগে ওই নীচের বা পেছনের দিকে। আর যে দিকে ঠেলা, হাউই এগোয় তার উল্টো দিকে, অর্থাৎ সে ছুটে চলে সামনে। নিউটন বলেছেন তাঁর গতিসূত্রে, 'যেখানেই কোনো ক্রিয়া হবে, সেখানে সমপরিমাণ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়াও ঘটবে।' এখানে পিছন দিক থেকে হাউই বাজির গ্যাস পুড়ে যে বেরিয়ে যাচ্ছে—এটা হল ক্রিয়া, আর সামনের দিকে হাউই বাজি যে ঠেলে উঠছে, সেটা হল প্রতিক্রিয়া।

যে-সব বাজি ওপরে ওঠে, ঘেরা খোলের মধ্যে তাদের মুখ থাকে নীচের দিকে। তুবড়ির মুখ ওপরে আর চরকি বা

রকেট কি আকাশে ওড়ে হাউই-বাজির নিয়মে?

ফুলঝুরির সে রকম কোনো খোলই নেই যে তা ওপরে উঠে যাবে। তা ছাড়া উঠবার জন্য অনেক গ্যাস তৈরি হওয়া দরকার।

একটা বেলুন ফুলিয়ে তার মুখ থেকে বাতাস ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, যে-দিক দিয়ে বাতাসটা বেরিয়ে যাচ্ছে, বেলুনটা ছুটবে ঠিক তার উল্টো দিকে। রকেটও মহাকাশে ওঠে হাউই বাজির পদ্ধতিতে।

কিন্তু হাউই বাজি কতটা ওপরে উঠবে? এটা নির্ভর

করবে, যে বেগে সে যাচ্ছে, তার ওপরে।

এই বেগটা ঠিক হবে আবার বারুদের পোড়ার ওপরে। বারুদটা শেষ হয়ে যাবার পর আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ওই খোলটা মাটিতে পড়ে যাবে। কারণ তার গতি তখন শেষ, সুতরাং পৃথিবীর ম্যাধ্যাকর্ষণে তাকে নীচে ফিরে আসতে হবে।

সিমেন্ট কি?

বাড়ি-ঘর তৈরি করতে, রাস্তা বানাতে, নদীর বাঁধ দিতে সিমেন্ট না হলে আমাদের চলে না। সিমেন্টকে বিলিতি মাটি বলা হয়। ছেলেবেলায় মনে হত, বিলেত থেকে এই মাটি আনা হয়েছে বলেই বুঝি ওর নাম বিলিতি মাটি। কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়। অবশ্য আজকাল আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে সিমেন্ট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সিমেন্ট কি?

সিমেন্টের আসল নাম হল পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট। পোর্টল্যাণ্ড হল বিলেতের একটা জায়গার নাম। এখানকার এক রকমের পাথরের রঙ সিমেন্টের রঙের মত বলেই

সিমেন্টের আর এক নাম পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট কেন?

এর নাম পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট এবং যেহেতু পোর্টল্যাণ্ড বিলেতের একটা জায়গা তাই আমরা এটাকে বলে থাকি বিলিতি মাটি।

যোশেফ নামে একজন ইংরেজ 1824 সালে এক ধরনের চুন (Hydraulic lime) পেটেন্ট ক'রে নেন। তার রঙ থেকে এর নাম দেওয়া হয় পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট। এটা প্রধানত সিলিকেট এবং ক্যালসিয়ামের খুব সূক্ষ্ম গুঁড়োর মিশ্রণে তৈরি। এর বিভিন্ন উপাদানের শতকরা পরিমাণ হচ্ছে ঃ

সিলিকা—22%
আয়রন অক্সাইড—2.5%
অ্যালুমিনা—7.5%
লাইম—62.0%

এ-ছাড়া আছে ম্যাগনেসিয়া ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড। সিমেন্ট তৈরি করতে হলে যে-সব কাঁচামাল লাগে তাদের দুই শ্রেণীতে ধরা যেতে পারে। এক শ্রেণীর কাঁচামাল লাইম সরবরাহ করে। আর অন্য শ্রেণীর কাঁচামাল সিলিকা, আয়রন অক্সাইড এবং অ্যালুমিনা যোগায়। মনে রাখতে হবে এ-সব আসে রক-ক্লে থেকে।

এবার সিমেন্ট তৈরি করার কথায় আসা যাক। সিমেন্ট তৈরির জন্যে যে সব কাঁচামালের দরকার, সেগুলি যেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানেই সাধারণত সিমেন্টের কারখানা বসানো হয়।

কাঁচামাল অনুপাত মত মিশিয়ে ওটাকে পেষাই করা দরকার। এ-জন্য দু'টো পদ্ধতি প্রচলিত—ভিজে পদ্ধতি এবং শুকনো পদ্ধতি।

ভিজে পদ্ধতিটাই আগে প্রচলিত ছিল। দু'টো পদ্ধতিতেই অবশ্য একমাত্র কাঁচা মালের ব্যবহার ছাড়া যন্ত্রপাতি বা অন্য কিছুতে বিশেষ পার্থক্য নেই।

ওয়েট বা ভিজে পদ্ধতিতে রক-ক্লে বেশ ভাল ক'রে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তারপরে গুঁড়ো করা লাইম স্টোন অনুপাত অনুসারে ওই রক-ক্লের সঙ্গে মেশানো দরকার। এর থেকে মিশ্রণের চেহারা হয় তরল। এই তরল বস্তুটায় শতকরা 35 থেকে 40 ভাগ জল থাকে। সরাসরি চুল্লীতে (Kiln) চালান করে পুড়িয়ে নিতে হবে ওটাকে।

শুকনো বা ড্রাই পদ্ধতিতে রক-ক্লে সাধারণত গুঁড়ো ক'রে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই শুকনো মালটা এক জায়গায় গাদা ক'রে রেখে প্রয়োজন মত কাজ করা চলে।

আঠা আমরা কোথা থেকে পাই?

আঠা আমাদের অনেক কাজেই লাগে। ঘুড়ি তৈরি করতে, বইয়ের পাতা আঁটতে, খামের ওপর স্ট্যাম্প মারতে, বই বাঁধাই করতে—এমন কি, তৈলচিত্রের রঙ, ছাপাকাল, কত কাজেই না আমরা আঠা ব্যবহার করি।

গাছ থেকেই আঠা পাওয়া যায়। কোনো গাছের ফল থেকে আঠা আসে, আবার কোনো গাছের নির্যাস বা রস থেকে। বলার গাছ বলে একরকম গাছ আছে। ছোট ছোট কুলের মত তার থোকা থোকা ফল হয়। এই ফল পাকলে বেশ আঠা পাওয়া যায় তার থেকে। অবশ্য এর আঠা খুব বেশি স্থায়ী হয় না।

বেলের ভিতরেও যে-আঠা থাকে সেটা দিয়েও অনেক

কাজ হয়। এই আঠা দিয়ে অপরিষ্কার সুতো মাজলে বেশ ধবধবে পরিষ্কার হয়ে যায়। ময়দা জ্বাল দিয়েও ভাল আঠা তৈরি করা চলে। এই ময়দার আঠায় বই বাঁধানো, ঠোঙা তৈরি, ঘুড়ি বানানোর মত অনেক কাজ হয়।

গাছের গাঢ় রস থেকে যে-আঠা হয় সেটা দু' রকমে পাওয়া যায়। কোনো গাছ থেকে আপনা আপনিই এই আঠা বেরিয়ে আসে, যেমন জিউলি। আবার কোনো কোনো গাছের গায়ে ক্ষত সৃষ্টি ক'রে আঠা বের করা হয়। আম, বাবলা প্রভৃতি গাছের ছাল কেটে রাখলে আঠা বেরিয়ে আসে। আম গাছের আঠায় বিশেষ কোনো কাজ হয় না, ওটা খুব গাঢ়। জল দিলেও গলে না। যে গাছের রস শুকোবার পরে জলে গুলে নেওয়া যায়—তার থেকেই হয় আঠা। জিউলি গাছের আঠায় একটা বিশ্রি দুর্গন্ধ আছে এবং ওটা স্থায়ীও হয় না। বাবলার আঠাই আমাদের দেশে বিশেষ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর আঠাকেই আমরা গাম বলি।

বাবলার গাছে ক্ষত ক'রে রাখলে মাসখানেকের মধ্যে তার থেকে আঠা বেরিয়ে জমা হতে থাকে। ওগুলি সংগ্রহ ক'রে সাদা ও লালচে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তারপর জলে গুলে তা বিশুদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় গঁদের আঠা বিদেশেও রপ্তানি করা হয়ে থাকে। আজকাল অবশ্য গাছের আঠা ছাড়াও অনেক সিনথেটিক আঠা বাজারে চালু হয়েছে।

মেথিলেটেড স্পিরিট কি?

ইথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে কিছুটা মিথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে দিলে সেটা পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এই দুই অ্যালকোহলের মিশ্রণের নাম মেথিলেটেড স্পিরিট। এটা জ্বালানি হিসেবে স্পিরিট ল্যাম্পে ব্যবহৃত হয়।

এই তরল জ্বালানির মধ্যে আয়তনিক হিসেবে রয়েছে 90% ইথাইল অ্যালকোহল (ইথাইল অ্যালকোহলের আর এক নাম ইথানল), 9.5% মিথাইল অ্যালকোহল (মিথানল) ও 0.5% পিরিডিন। এর সঙ্গে অবশ্য খুব স্বল্প পরিমাণে পেট্রোলিয়াম ও মিথাইল ভায়োলেট রঞ্জক যোগ করা থাকে।

চিনির মধ্যে কি আছে? ওটার স্বাদ মিষ্টি কেন?

চিনি তো আমরা সবাই খাই। কিন্তু চিনির মধ্যে কি আছে? চিনি হচ্ছে এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট। এর মধ্যে আছে কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন।

এক অণু চিনি বারোটি কার্বন পরমাণু, এগারোটি অক্সিজেন পরমাণু ও বাইশটি হাইড্রোজেন পরমাণু সংযোগে তৈরি। আখের রস ও বীট থেকে চিনি উৎপন্ন হয়। খুব মৃদু অ্যাসিডের সহযোগে এটা গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ তৈরি করে। চিনি খেলে মগজের স্বাদবহ স্নায়ুর সাহায্যে আমরা মিষ্টি স্বাদ পাই।

আখের ফালি কেটে খণ্ড ক'রে পিষে তার থেকে রস নিংড়ে বের ক'রে নেওয়া হয়। নিংড়োনোর সময়ে তার মধ্যে সামান্য জল ছিটিয়ে দিলে ভাল হয়। তারপর ওই রসটা ছেঁকে নিয়ে পরিষ্কার করবার জন্য ফসফোরিক অ্যাসিড দেওয়া প্রয়োজন। কিছু চুনও মেশাতে হয় ওই রসের সঙ্গে। এর পরে বেশ উচ্চ চাপ দিয়ে বাষ্পের সাহায্যে ওই রস গরম ক'রে একটা ট্যাঙ্কে থিতোনো হয়। এই থিতোনো গুড় থেকে চিনি করতে হলে এক ধরনের ড্রামের মধ্যে ফেলে ওটাকে পিষতে হবে। তারপর জ্বাল দিয়ে মেটে রঙের গুড় তৈরি হয়। এর থেকেই শোধন করে সাদা চিনির দানা পাওয়া যায়।

বীট থেকে চিনি হয় কী ক'রে?

বীট পালং আমরা সব্জি হিসেবে জমিতে আবাদ করি। এর পাতা পালং শাকের মত ব্যবহার করা চলে। এ-ছাড়া বীট একটা উৎকৃষ্ট তরকারিও বটে। কিন্তু আরো একটা জিনিস আমরা বীট থেকে পেতে পারি—সেটা হচ্ছে চিনি, আজকাল যেটা দুর্মূল্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বীট থেকে চিনি হয় কী ক'রে?

আমরা সাধারণত যে লালচে রংয়ের বীট তরকারি হিসেবে রান্না ক'রে খাই, তার আস্বাদ বেশ মিষ্টি হলেও ওটার থেকে চিনি পাওয়া যায় না।

যে-বীটে চিনি পাওয়া যায় সেটা আমাদের দেশে নতুন আমদানি হয়েছে। তার খোসা এবং শাঁস দুই-ই সাদা। আজকাল এই বীট আমাদের দেশের পাঞ্জাব, রাজস্থান,

হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে আবাদ করা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

নোনা মাটিতে বীট ভাল জন্মায়। বেশি জল বা খরা বীট গাছ সহ্য করতে পারে না। তাই অক্টোবরের মাঝামাঝি

কোন ধরনের বীট থেকে চিনি পাওয়া যায়?

বীজ থেকে চারা করে বীট লাগাতে হয়। বীটের খোসা ছাড়িয়ে চাকা চাকা ক'রে নিয়ে পিষে রস বের ক'রে তার পরে তার থেকে হয় চিনি।

আখ থেকে চিনি তৈরির কাজ এপ্রিল থেকে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে যদি বীট মাড়াই ক'রে ওই কলে চিনি তৈরি হয়, তাহলে মে মাস পর্যন্ত কাজ চলতে পারে।

আমাদের দেশে আখ থেকে যে-চিনি হয় সেটা দেশের চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট নয়---তার ওপর বিদেশেও মাঝে মাঝে রপ্তানি করতে হয়। এ-রকম অবস্থায় বীট থেকে চিনি তৈরির কাজ যাতে আরো প্রসারিত হয়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রাবার কি?

প্রাকৃতিক রাবার হচ্ছে হিভিয়া নামে একরকম বুনো গাছের আঠা। ইংরেজিতে এর নাম ল্যাটেক্স (Latex)। ল্যাটেক্স দেখতে দুধের মত সাদা।

রাবারও এক ধরনের পলিমার। অনেকগুলো ক্ষুদ্র অণু একসঙ্গে যুক্ত হয়ে রাবার পলিমার সৃষ্টি করে। টানলে এদের শৃংখল বাড়ে আবার ছেড়ে দিলে গুটিয়ে আসে।

সম্ভবত স্পেনের মানুষই প্রথম রাবার আবিষ্কার করে। রাবারের ধর্মই হল পেন্সিলের দাগ তুলে দেবার ক্ষমতা। এটা আবিষ্কার করেছিলেন প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী প্রিস্ট্‌লে।

1839 সালে চার্লস গুডইয়ার নামে একজন আমেরিকান রাবারের আঠার সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে দেখলেন, এটা

ভালকানাইজড় রাবার কাকে বলে?

স্বাভাবিক তাপে সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করা চলে এবং টেকেও বেশিদিন। এই ভাবে গন্ধক মিশিয়ে রাবারের গুণ বাড়িয়ে দিয়ে যে রাবার তৈরি হল তার নাম 'ভালকানাইজড় রাবার', আর এই পদ্ধতির নাম ভালকানাইজেসন।

আজকাল গাছ থেকে রাবার তৈরি ছাড়াও বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে সিনথেটিক রাবার তৈরি করেছেন। এই সিন্থেটিক রাবার বৃক্ষজাত রাবারের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। সিন্থেটিক রাবারও পলিমার বুটাডাইন ও স্টাইরিন নামক দু'টো রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে তৈরি হয়। এ-ছাড়া

প্রেসার কুকারের গ্যাসকেট কিসে তৈরি?

আরো অনেক সিনথেটিক রাবার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, ক্লোরোপ্রিন থেকে নিওপ্রিন রাবার সিলিকোন রাবার উচ্চতাপ সহ্য করতে পারে, তাই প্রেসার কুকারের গ্যাসকেট সিলিকোন রাবার থেকে তৈরি হয়।

গায়ে মাখার পাউডারে কী আছে?

আজকাল যে কোনো স্টেশনারি দোকানে গেলেই চোখে পড়বে নানা ধরনের সুদৃশ্য কৌটোয় ভরা সুগন্ধি পাউডার। প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে পাউডার খুবই জনপ্রিয়।

পাউডার উৎপাদন করা হয় ট্যাল্‌ক (Talc) নামে এক প্রকার খনিজ পাথর গুঁড়িয়ে। এই উপাদান হল ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট। এটা প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। আধুনিক যন্ত্রে এই পাথর খুব মিহি ক'রে গুঁড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে সুগন্ধ দ্রব্যাদি মেশানো হয়ে থাকে। যেমন, জুঁই ফুলের গন্ধ আছে এমন পাউডারে সিনথেটিক জেসমিন সেন্ট যোগ করা হয়। একই ভাবে চন্দন, বকুল, চামেলি, বেলফুল, গোলাপ ইত্যাদির গন্ধযুক্ত সুগন্ধি বস্তু (Perfumes) মিশিয়ে বিভিন্ন সুগন্ধি পাউডার তৈরি করা হয়। এর ফলে প্রসাধন সামগ্রীগুলি আমাদের খুবই সুখানুভূতির তৃপ্তি প্রদান করে।

সুগন্ধি দ্রব্য বা সেন্ট কোথা থেকে আমরা পাই?

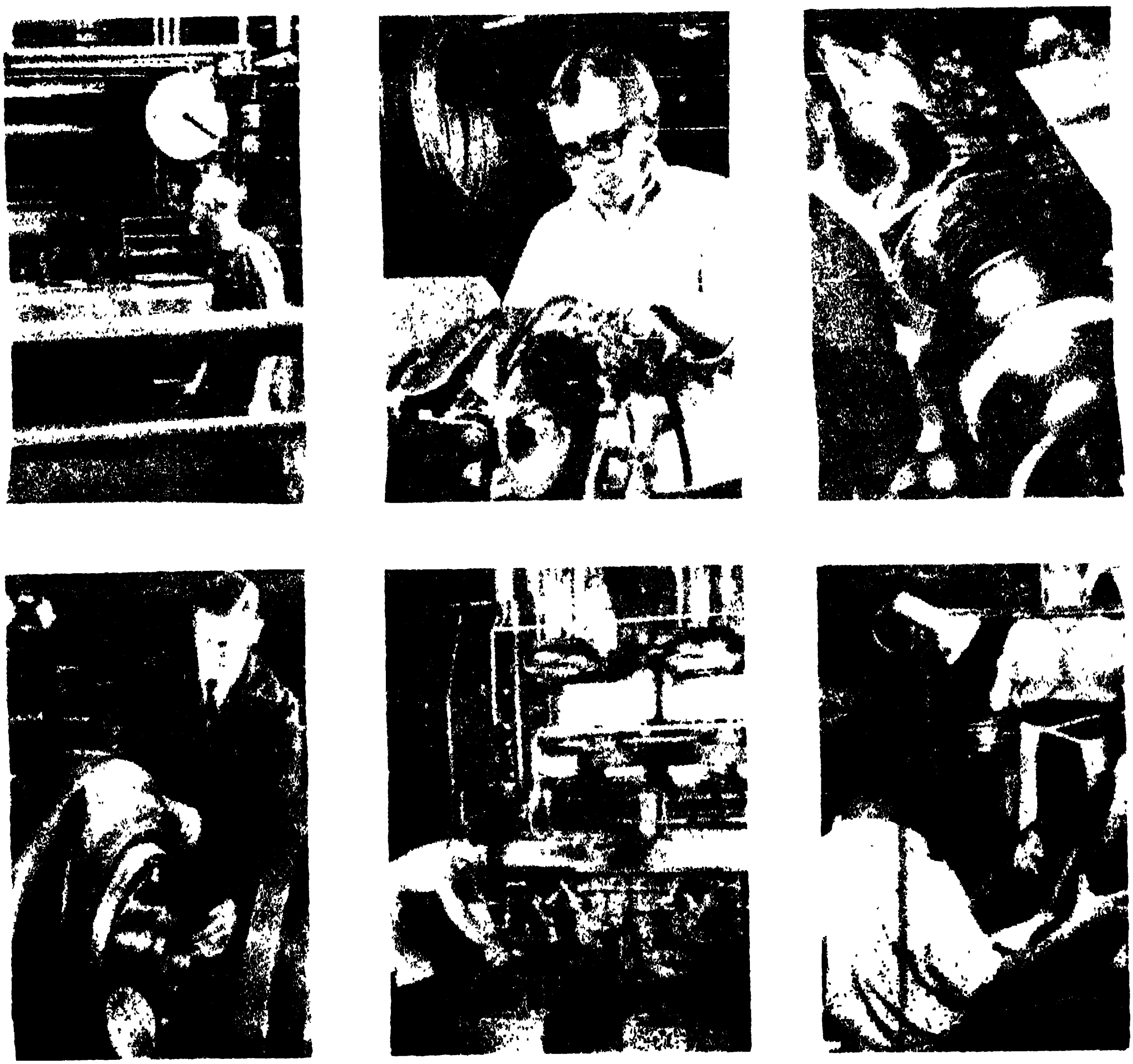
আধুনিক সভ্যতার জন্ম হওয়ার বহু বছর আগে, এমন কি খ্রিস্ট-জন্মেরও বহু পূর্বে, সুগন্ধি দ্রব্য মানুষ ব্যবহার করতো। সুগন্ধ কথাটির ইংরেজি হচ্ছে—পারফিউম। এর

আসল অর্থ 'ধোঁয়ার মাধ্যমে', যদিও আজকাল কথাটি সুগন্ধি দ্রব্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

সুগন্ধি দ্রব্য কোথা থেকে পাওয়া যায়?

আমাদের প্রকৃতিই হচ্ছে সুগন্ধি দ্রব্যের এক মস্ত বড় ভাণ্ডার। ফুল, ফল, সুরভিত তেল—এই সব অসংখ্য জিনিসের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কত বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি। মিশরীয়রা মৃতদেহ মমি ক'রে তার মধ্যে প্রচুর সুবাসিত তেল ঢেলে দিতেন। এই সুগন্ধের রেশ একদিন, দু'দিন নয়, একশো, দুশো বছরও নয়, হাজার বছর পরেও বাতাসে থেকে যায়। প্রাচীন মিশরের একটি উন্নত ধরনের সুগন্ধি বস্তুর নাম ছিল কাফী। এক সময়ে আরব দেশের গোলাপের আতরের কথা সারা দুনিয়ার লোক জানতো। গ্রীস ও রোমের লোকেরাও সুগন্ধি জিনিসের ব্যবহার করতো।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় বিরাট বিরাট সুগন্ধি শিল্প গড়ে উঠেছে। উদ্ভিদের পাতা, ফুল, বীজ, শিকড় ও অন্যান্য অংশ থেকে সুগন্ধি তেল বৈজ্ঞানিক কৌশলে নিষ্কাশিত ক'রে



কারখানায় রাবারের চাকা তৈরি হচ্ছে

বিভিন্ন মানুষের রুচি অনুসারে—কোনোটা মৃদু, কোনোটা উগ্র, কোনোটা আবার মৃদু ও উগ্র গন্ধের মাঝামাঝি ক'রে বাজারে ছাড়া হয়।

গোলাপ ফুলের পাপড়িতে এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু থাকে—তার নাম ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল। এটা জলে গুলে যায় সহজে। এই জলে দ্রবণীয় জিনিসটা 'রোজ সেন্ট' হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়। তাজা গোলাপ ফুলের পাপড়ি থেকে নিষ্কাশন ক'রে এই সেন্ট বানানো চলে। অবশ্য আজকাল ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে এই ফিনাইল

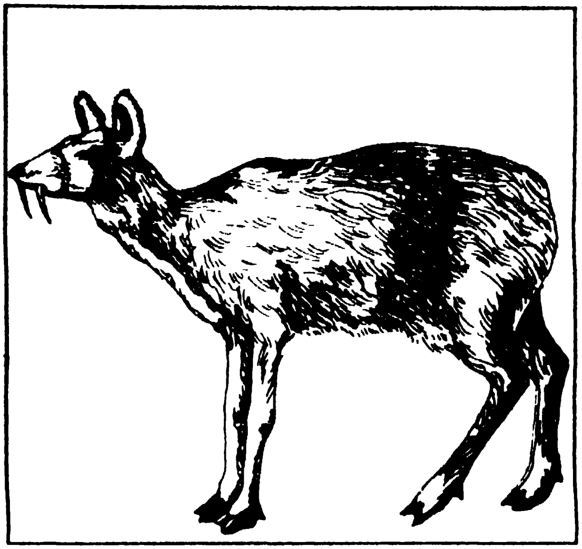
ফুল থেকেই কি শুধু সুগন্ধি পাওয়া যায়?

ইথাইল অ্যালকোহলও তৈরি হচ্ছে। সিট্রাল, লিমোনিন, লিনালুল, জিরানিওল প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদান সুগন্ধযুক্ত। এ-ছাড়া বিটা-আয়োনোন ও নাইট্রোমাস্ক ল্যাবরেটরিতে এই দু'টো সংশ্লেষিত সুগন্ধি দ্রব্য খুবই মূল্যবান। বিটা-আয়োনোনকে এক সময়ে বলা হত 'সুগন্ধির রাণী'। কস্তুরী মৃগের নাভিতে যে কস্তুরী থাকে (Musk-Ketone) তার গন্ধও অপূর্ব।

কস্তুরী সুগন্ধি জিনিসটা কি?

হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে এবং তার লাগোয়া ব্রহ্ম ও কাম্বোডিয়ায় কস্তুরী মৃগ (Musk deer) নামে এক প্রকার পুরুষ হরিণ পাওয়া যায়। এরা খুব লাজুক প্রকৃতির। তাই নির্জনে বিচরণ করতে ভালবাসে। কিন্তু কস্তুরী সুগন্ধি জিনিসটা কি? এদের নাভিমূলের গ্রন্থিতে একটা কোষ জন্মায়। এই কোষটি যখন পূর্ণাঙ্গ হয় তখন তার থেকে সুগন্ধ বেরোতে থাকে। হরিণ এই গন্ধের সন্ধানে পাগলের মত ছুটোছুটি করে। সে বুঝতেই পারে না গন্ধটা তার নিজের দেহের মধ্যেই রয়েছে।

বছর দশেক বয়স হলে কস্তুরী মৃগের এই কোষটি পূর্ণাঙ্গ হয়। তখন ওই মৃগকে হত্যা ক'রে তার গ্রন্থিটা সম্পূর্ণ তুলে নিয়ে রোদে শুকনো করা হয়। একটি কোষের ওজন প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। কস্তুরী মৃগের কোষের বাইরের দিকটায় থাকে লোম আর মাঝখানে ছোট্ট একটা ছিদ্র। কাঁচা অবস্থায় ওই গ্রন্থি বা কোষ থেকে কিছু বোঝা যায় না যে ওর মধ্যে এত সুগন্ধ লুকানো আছে। কিন্তু যখন চামড়া ও লোমগুলি কোষ থেকে তুলে ফেলে গ্রন্থিটাকে



কস্তুরীমৃগ

জলে ভেজানো হয়, তখনই ওর সুগন্ধ বেরোতে আরম্ভ করে। কস্তুরী শুধুমাত্র গন্ধ পাগল করা সুগন্ধি হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, হৃদ্‌যন্ত্রের পরিপুষ্টির জন্য, হরমোন এবং ওষুধ রূপেও এর ব্যবহার আছে।

বিড়াল, ইঁদুর বা গাছের শিকড়েও কি কস্তুরীর মত সুগন্ধি থাকতে পারে?

হরিণের মধ্যে খুব কম পরিমাণে কস্তুরী পাওয়া যায়। এক কিলোগ্রাম কস্তুরী পেতে হলে প্রায় দু'হাজার হরিণকে মেরে ফেলা দরকার। তাই রাসায়নিকেরা কৃত্রিম উপায়ে এটাকে তৈরির চেষ্টা করতে লাগলেন। জার্মান ও সুইডিস বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে কস্তুরী তৈরি করে তার নাম দিলেন মাস্ক-কোন (Musk-Cone)। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, সিভেট (Civet) নামে এক ধরনের বেড়াল ও আমেরিকায় মাস্ক ইঁদুরের (Musk rat) দেহের ভেতরেও কস্তুরী মৃগের অনুরূপ সুগন্ধি পাওয়া যায়। সিভেট বিড়াল থেকে প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি Civetone সংগ্রহ করা হয় এবং কস্তুরী মৃগের মত একে মেরে ফেলার প্রয়োজন হয় না। আজকাল

রসায়নাগারে সিনথেটিক পদ্ধতিতেও সিভেটোন তৈরি হচ্ছে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মাস্ক-কোন এবং সিভেটোন অণুর গঠনে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। এদের অণু কার্বন, হাইড্রোজেন এবং একটি মাত্র অক্সিজেন দিয়ে তৈরি।

> **শুধুমাত্র কস্তুরী মৃগই কি সুগন্ধ বহন ক'রে থাকে?**

পনেরো থেকে সতেরোটি কার্বন পরমাণু-বিশিষ্ট অণুরই শুধু সুগন্ধ আছে।

কস্তুরী যে কেবল হরিণ, বেড়াল বা ইঁদুরের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা নয়। কোনো কোনো গাছের বীজ ও শিকড়ের ভেতরেও কস্তুরী লুকিয়ে আছে।

লাল মরিচ খেলে ঝাল লাগে কেন?

লাল মরিচ এক ধরনের মশলা। আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই লাল মরিচের আদি জন্মস্থান।

পর্তুগীজরা এটাকে ভারতে নিয়ে আসে সপ্তদশ শতাব্দীতে। আমাদের দেশে বছরে প্রায় চার লক্ষ টন লাল মরিচ উৎপন্ন হয়।

লাল মরিচের কদর তার সুন্দর রঙ এবং ঝাল আস্বাদের জন্য। মাংস রান্নায় এবং সস তৈরিতে এটা এখন অপরিহার্য। ফার্মাসিউটিক্যালসেও এর অনেক ব্যবহার আছে। কিন্তু লাল মরিচের রঙ এত লাল দেখায় কেন বা তা খেলে এত ঝালই বা লাগে কেন?

ওর মধ্যে Carotenoid pigment নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে। সেইজন্যে একে লাল দেখায়। তবে লাল মরিচে ঝাল লাগার কারণ আলাদা। এতে Capaicin নামে একটি রাসায়নিক বস্তু থাকায় ঝাল লাগে।

> **লাল মরিচ লাল দেখায় কেন?**

এই জৈব যৌগটি এত ঝাল যে কল্পনা করাও যায় না। আমাদের মগজের আস্বাদবহ স্নায়ুর সংস্পর্শে এটা এলেই আমাদের ঝালের অনুভূতি হয়। দ্রবণে Capaicin-এর মাত্রা হাজার গুণ লঘু করলেও এর একটা মৃদু প্রভাব থেকেই যায়।

গোলমরিচ দেখতে কালো, আর খেতে ঝাল লাগে কেন?

গোলমরিচ বা ব্ল্যাক পেপার আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মশলার মধ্যে অন্যতম। এটা বছরে প্রায় এক লক্ষ টন দরকার এবং পৃথিবীর সব দেশেই এর ব্যবহার আছে।

গোলমরিচের সবুজ ফল ধরে শস্যের বীজের ভেতর। ফল পাকলে সেগুলো রোদে ভাল ক'রে শুকিয়ে নেওয়া হয়। ফলের গায়ে যে-রাসায়নিক বস্তু (পলি ফেনল) থাকে এনজাইমের সংস্পর্শে এসে তা কালো হয়ে যায়। এইভাবে গোলমরিচ কালো হয়। কিন্তু সাদা গোলমরিচও হয়। যেমন, ইন্দোনেশিয়ায় পেপার ফলকে ভাল ক'রে পাকতে দিলে তার রঙটা সাদা হয়ে যায়। পরে ওটাকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। রঙ ছাড়া সাদা এবং কালো মরিচের মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য নেই। গোলমরিচের মধ্যে প্রচুর টারপিন জাতীয় উদ্বায়ী জৈব যৌগ থাকে। মশলার গন্ধ ও ঝাল হয় এইজন্যেই। গুঁড়ো অনেকদিন ধরে রেখে দিলে এর সুগন্ধ অতটা পাওয়া যায় না—তবে ঝাল ঠিকই থাকে।

> **গোলমরিচ কি সাদাও হয়?**

নেমন্তন্ন বাড়ির পোলাও-এর চমৎকার গন্ধ আসে কিসের থেকে?

নেমন্তন্ন বাড়ির পোলাও-এর মধ্যে জাফরান দেওয়া হয়। জাফরানের চমৎকার গন্ধ মনকে মাতোয়ারা ক'রে তোলে। তার জন্যই সুগন্ধটা ভেসে আসে। নবাবি আমলে জাফরান না হলে খানাপিনা অচল হয়ে যেত। আজকাল অবশ্য উৎকৃষ্ট ও খাঁটি জাফরান পাওয়া খুবই মুশকিল।

জাফরানের মধ্যেও রকমফের ও ভালমন্দ আছে। নানা রকম ওষুধ ও সুগন্ধি তৈরি হয় ওই জাফরান গাছের ফুল থেকে। তার মধ্যে আবার ফুলের পরাগবাহী গর্ভকেশর থেকে যে-জাফরান তৈরি হয় সেটা খুবই উচ্চ স্তরের। একে

বলে শাহী জাফরান। রাজা-বাদশাদের খানাপিনায় লাগতো বলেই হয়তো বা এই নাম। গর্ভকেশরগুলি তুলে নেওয়ার পর বাদবাকি ফুল থেকে যে জাফরান তৈরি হয় সেটা লাচ্ছা জাফরান।

জাফরান কাশ্মীরী জিনিস। শ্রীনগরের কাছে ছোট একটা মালভূমির মত জায়গার নাম পমপোর। এখানে জাফরান গাছের চাষ হয়। এখানকার লোকেরা জাফরানকে বলে কং। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উপরে এই পমপোর উপত্যকা। মেয়ে-পুরুষ সেখানে এই জাফরানের চাষ করে।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জাফরান এক কিলো পেতে হলে কমপক্ষে দশ হাজার ফুল দরকার। ফুল ও পাপড়ি সংগ্রহ করে কাশ্মীরের মেয়েরা। সকালে ফুলে যতক্ষণ শিশির থাকে ততক্ষণ তারা হাত দেয় না গাছে। শিশির শুকিয়ে গেলে সবাই কাজে লেগে যায়। ফুলগুলো তোলার পর রোদে শুকিয়ে নিয়ে শুকনো ফুলের কেশরগুলি হাত দিয়ে টেনে

জাফরান কি তৈরি হয় গাছের ফুল থেকে?

বের করতে হয়। এর থেকেই তৈরি হয় উচ্চ শ্রেণীর জাফরান। কেশরগুলি বের করে নেওয়ার পর শুকনো ফুলগুলিকে লাঠির মৃদু আঘাত ক'রে জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। পাপড়িগুলি ভেসে উঠলে যে অংশ জলে ডুবে যায়, তা আলাদা ক'রে শুকিয়ে দ্বিতীয়বার জলে ফেলা প্রয়োজন। এইভাবে কয়েকবার শুকিয়ে আর জলে ফেলে লাচ্ছা জাফরান তৈরি করা হয়।

পাঁউরুটি ফুলে ওঠে কেন?

পাঁউরুটি তৈরি করতে ময়দা চাই আর তার সঙ্গে আর একটি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে হয়। এই রাসায়নিক বস্তুটির নাম—বেকিং পাউডার। সোডিয়াম বাই কার্বনেট ও টার্টারিক অ্যাসিড মিশিয়ে বেকিং পাউডার তৈরি হয়। বেকারিতে পাঁউরুটি উৎপাদনের সময় এই মিশ্রণ থেকে ভুস ভুস ক'রে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোতে থাকে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই পাঁউরুটিকে ফুলিয়ে দেয়।

দেশলাইয়ে ঘষা দিলেই দপ ক'রে আগুন জ্বলে ওঠে কেন?

দেশলাই কাঠি দিয়ে তার বাক্সের এক দিকে ঘষে চট ক'রে আমরা আগুন জ্বালাতে পারি। কিন্তু দেশলাইয়ের বাক্সে বা কাঠিতে কি থাকে যাতে চট ক'রে আগুন ধরে যায়?

দেশলাইয়ের কাঠির মাথা তৈরি হয় গন্ধক ও পটাশিয়াম ক্লোরেট (যাকে চলতি কথায় বলে পটাশ) আঠার সঙ্গে মিশিয়ে। দেশলাই বাক্সের একপাশে, অর্থাৎ যে জায়গায় কাঠিটা ঘষে আগুন ধরানো হয়, সেখানে থাকে লাল ফসফরাস ও অ্যান্টিমনি সালফাইড। দু'টি জিনিসে ঘষা লাগলে যে-তাপ উৎপন্ন হয় তাতে দেশলাই কাঠির বারুদ জ্বলে ওঠে। মসৃণ ঘরের মেঝেতে ঘষেও দেশলাই কাঠি জ্বালানো যায়। তবে বাক্সের নির্দিষ্ট জায়গায় ঘষলে অনেক কম পরিশ্রমে বেশ সহজে কাঠি জ্বলে ওঠে।

শুকনো বরফ কাকে বলে?

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নাম কে না জানে। বাতাসের মধ্যেও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রয়েছে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে চাপ দিলে ও ঠাণ্ডা করলে প্রথমে তরল ও পরে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। কঠিন অবস্থায় এর চেহারা তুষারশুভ্র বরফের মত। সেইজন্যই একে বলে ড্রাই আইস বা শুকনো বরফ।

দুটো ধাতুকে গ্যাস ওয়েল্ডিং ক'রে জোড়া দেবার জন্য সাধারণত কোন জিনিস ব্যবহার করা হয়?

দুটো ধাতুকে জোড়া দেবার জন্য যে-জিনিস ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা (Oxy-acetylene flame); এর মধ্যে দু'টো গ্যাস রয়েছে, একটা অক্সিজেন গ্যাস ও অপরটি অ্যাসিটিলিন গ্যাস। ব্লো পাইপের সাহায্যে এই গ্যাস দিয়ে যখন দু'টি ধাতুকে ওয়েল্ডিং ক'রে জোড় দেওয়া হয়, তখন খুবই উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্ট হয়ে থাকে।

ব্লিচিং পাউডার কি?

ব্লিচিং পাউডার একটি রাসায়নিক যৌগ, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি মৌলিক পদার্থ ক্যালসিয়াম, অক্সিজেন ও ক্লোরিন। সংকেত হল Ca(OCl)Cl। ব্লিচিং পাউডার জীবাণুনাশক দ্রব্য। জলের মধ্যে নানা প্রকার জীবাণু থাকে। ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সেই সব জীবাণু ধ্বংস করা হয়। কোথাও ব্লিচিং পাউডার ফেললে সেখানে ক্লোরিন গ্যাস বেরোয়। এই ক্লোরিনের জন্যই জীবাণু ইত্যাদি ধ্বংস হয়। ব্লিচিং পাউডারের চেহারা সাদা গুঁড়োর মত।

স্টেইনলেস স্টিল কাকে বলে? এতে মরচে পড়ে না কেন?

যে স্টিলে মরচে পড়ে না এবং যার উঁচু তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা আছে তাকে স্টেইনলেস স্টিল বলে। গলিত লোহার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ ও ফসফরাস যোগ ক'রে (স্পিজেল) ইস্পাত তৈরি হয়। আজকাল স্টেইনলেস স্টিলের প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে। সাধারণ ইস্পাত বা স্টিল স্টেইনলেস স্টিল নয়। এদের সঙ্গে স্টেইনলেস স্টিলের উপাদানের পার্থক্য রয়েছে। স্টেইনলেস স্টিল তৈরি করতে হলে লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম, সামান্য নিকেল, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ এবং কার্বন মিশিয়ে ধাতু সংকর (Alloy) সৃষ্টি করা দরকার। স্টেইনলেস স্টিলে সাধারণত থাকে, লোহা 70%-90%, ক্রোমিয়াম 12%-20% এবং 0.1%-0.7% কার্বন।

স্টেইনলেস স্টিলের বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে সাধারণ ইস্পাতের মত মরচে পড়ে না। এর কারণ কি? এর কারণ, স্টেইনলেস স্টিলের মধ্যে ক্রোমিয়ামের ভাগ বেশি থাকে। সেই ক্রোমিয়াম বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে তৈরি করে ক্রোমিয়াম অক্সাইড (সংকেত Cr_2O_3)। এই ক্রোমিয়াম অক্সাইড খুব সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পর্দার আকারে স্টেইনলেস স্টিলের সমস্ত পৃষ্ঠতলকে ঘিরে রাখে। ফলে বাতাসের জলীয় বাষ্প বা অক্সিজেন এই পর্দা ভেদ ক'রে ইস্পাতের সংস্পর্শে আসতে পারে না। সুতরাং এই ইস্পাতে মরচেও পড়ে না। অর্থাৎ, মরিচা বা আয়রন অক্সাইড (যার সংকেত, Fe_2O_3, H_2O) তৈরি হতে পারে না। যদি কোনো ভাবে স্টেইনলেস স্টিলের গায়ে আঁচড় কেটে ক্রোমিয়াম অক্সাইডের অদৃশ্য পর্দাকে ছিন্ন করা যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই আঁচড় কাটা জায়গার ক্রোমিয়ামের সঙ্গে নতুন ক'রে বাতাসের অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয় এবং নতুন ক্রোমিয়াম অক্সাইডের পর্দা তৈরি হয়ে ইস্পাতকে মরচে পড়ার হাত থেকে বাঁচায়। এই কারণেই স্টেইনলেস স্টিলে কখনো মরচে পড়ে না। আর তাই এই ইস্পাতের এত কদর।

পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের তেলের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন তেল তিনটেই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এদের সকলকেই পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম থেকে। কোনো বাপ-মার তিন ছেলে যেমন এক রকমের হয় না, এ-ও অনেকটা সেই রকম ব্যাপার আর কি! বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব (অর্থাৎ, সম-আয়তন জলের তুলনায় কতগুণ ভারি), দহন ক্ষমতা এবং জ্বালানি গুণ এক নয়—একটার সঙ্গে অন্যের তফাত রয়েছে। পেট্রোলিয়ামকে আংশিক পাতন (বিভিন্ন তরলের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন। তাই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট তরল বাষ্প হয়। সেই বাষ্পকে শীতল করলে মিশ্রণের একটি তরলকে ভিন্ন করা সম্ভব। এইভাবে একে একে বিভিন্ন তাপমাত্রায় গঠিত বিভিন্ন বাষ্পকে শীতল ক'রে মিশ্রণের সব ক'টি তরলকেই আলাদা করা যায়। এই পদ্ধতিকেই আংশিক পাতন বলে।) করলে প্রথম দিকে আসে কেরোসিন, ডিজেল তেল ইত্যাদি। আর পেট্রোল পাওয়া যায় ক্র্যাকিং পদ্ধতির সাহায্যে (Cracking of petroleum)।

ভ্যানিসিং রঙের মধ্যে কি থাকে?

দোলের সময়ে ভ্যানিসিং রঙ নিয়ে খেলাটা নতুন কিছু নয়। সাদা জামায় গোলাপী রঙ—মনে হল, সে রঙ বুঝি আর উঠবে না কিন্তু খানিক বাদেই দেখা গেল, রঙ উধাও। জামা যেমন ছিল, তেমনি ধবধবে সাদাই রয়ে গেছে।

ভ্যানিসিং রঙের মধ্যে থাকে ফেনলপ্থ্যালিন নামে বর্ণহীন একটি রাসায়নিক বস্তু। কিন্তু ক্ষারীয় দ্রবণে কয়েক ফোঁটা ফেনলপ্থ্যালিন দিলেই সেই দ্রবণের রঙ গোলাপী

হয়ে যায়। এটা ফেনল্‌প্‌থ্যালিনের ধর্ম। কিন্তু সেই দ্রবণকে যদি প্রশমিত বা নিউট্রালাইজ করা যায় তাহলে দ্রবণতার রঙ হারায়। কারণ প্রশমিত কোনো দ্রবণে ফেনল্‌প্‌থ্যালিন মেশালে তার রঙের কোনো পরিবর্তন হয় না।

ভ্যানিসিং রঙের মূল উপাদান অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (সংকেত NH_4OH)। অ্যামোনিয়া গ্যাস ও জলের মিশ্রণে এই দ্রবণ তৈরি হয়। এই দ্রবণকেই 'স্মেলিং সল্ট' বলা হয়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ ক্ষারীয়। সুতরাং এই দ্রবণে কয়েক ফোঁটা ফেনল্‌প্‌থ্যালিন দিলেই দ্রবণের রঙ উজ্জ্বল

স্মেলিং সল্ট কাকে বলে?

গোলাপী হয়ে যায়। কিন্তু এই দ্রবণ অনেকক্ষণ খোলা রেখে দিলে, বা জামা কাপড়ে কিছুটা ঢেলে দিলে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্রবণ থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে যায়। তখন পড়ে থাকে শুধু জল। জল যেহেতু ক্ষারীয় নয় সেইজন্যে তখন ফেনল্‌প্‌থ্যালিন তার রঙ হারায় ও গোলাপী রঙ উবে যায়।

আদা মুখে দিলে ঝাল লাগে কেন?

মুখরোচক রান্না করতে আদা না হলে আমাদের চলে না। আদার আস্বাদ ঝাল, এর কারণ কি? আদার মধ্যে প্রয়োজনীয় তেল থাকে (Essential oil—2.5%); এই তেলের ভেতর টারপিন জাতীয় জৈব যৌগও আছে অনেক। তবে Gingerol নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ আছে বলেই আদা মুখে দিলে ঝাল লাগে। এ-ছাড়া আদার নির্যাস অনেক প্রসাধন দ্রব্য তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

দোকান থেকে আমরা যে সাবু দানা কিনি সেটা কি?

কেউ যদি কোনো ভারি কাজ করতে না পারে তখন আমরা তাকে ঠাট্টা করে বলি—সাবু খেয়ে এসেছো নাকি? সাবুতে কি থাকে? সাবু (বা সাগু একই জিনিস) খুবই পুষ্টিকর বস্তু। এর মধ্যে আছে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। ট্যাপিওকা নামে এক ধরনের গাছের শিকড়ের নির্যাস থেকে সাবু প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। অবশ্য সাবু গাছ থেকেও সাবু তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু সাবু গাছ থেকে সাবুর দানা তৈরি করা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অথচ ট্যাপিওকা গাছ থেকে এটা সহজেই তৈরি করা যায়। ভারতের সাবু শিল্পের অধিকাংশই তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় অবস্থিত।



ট্যাপিওকা গাছের শিকড় থেকে সাবু তৈরি হয়

কয়লা, গ্রাফাইট আর হীরের মধ্যে তফাত কি?

চেহারা, দাম এবং ব্যবহারের জন্যেই কয়লা, গ্রাফাইট এবং হীরের তফাত। আসলে এরা একই মৌলিক পদার্থ কার্বন দিয়ে তৈরি। এরা কার্বনেরই বিভিন্ন রকমফের রূপ—কোনোটা কয়লা, কোনোটা গ্রাফাইট আবার কোনোটা বহুমূল্য হীরে। মনে হতে পারে, এরা যখন আদতে একই জিনিস তখন সস্তায় কয়লা কিনে তার থেকে রাতারাতি হীরে বানিয়ে নিলে কেমন হয়? কিন্তু সেটা হবার নয়। কারণ প্রকৃতিতে কার্বন পরমাণুদল তিন রকম ভাবে নিজেদের সাজাতে পারে। আর এই সজ্জা-বিন্যাসের তফাতের জন্যেই তাদের রূপে-গুণে এত পার্থক্য। দুনিয়ার যত পদার্থ আছে তার মধ্যে হীরেই হল সবচেয়ে শক্ত। এই

হীরের টুকরো দিয়ে সহজেই কাচ কাটা যায়। গ্রাফাইট দিয়ে পেনসিলের শিস তৈরি হয়ে থাকে। আর কয়লা দেখতে যদিও কালো, তবু এর গুণের শেষ নেই। কয়লা হীরের মত



এই সব উদ্ভিদ মাটির নীচে চাপা পড়ে কয়লা তৈরি হয়েছে

জ্বলজ্বল ক'রে সৌন্দর্য ছড়ায় না ঠিকই—তবু এর নাম কালো হীরে। কোটি কোটি বছর ধ'রে উদ্ভিদ মাটির নীচে চাপা পড়ে তৈরি করেছে কয়লা। কয়লা, গ্রাফাইট আর হীরে—এরা একই মৌলিক পদার্থ থেকে তৈরি, কিন্তু এদের পরমাণুর বিন্যাস আলাদা বলে রসায়ন শাস্ত্রে এই ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে বহুরূপতা (Allotropy)।

হলুদের রঙ হলুদ কেন?

হলুদ রান্নায় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু হলুদের রঙ হলদে হওয়ার কারণ কি? হলুদের হলদে রঙটা আসে এর মধ্যে কারকিউমিন (Curcumin) নামে রাসায়নিক পদার্থ থাকার জন্য।

হলুদ জন্মায় মাটির নীচে, ছোট ছোট আঙুলের আকারে। এগুলিকে ভেঙে নিয়ে প্রথমে সেদ্ধ করা হয়। তারপরে রোদে শুকোনোর পরে এরা শক্ত হয়ে যায়। হলুদের মধ্যেও অনেক প্রয়োজনীয় তেল (3-4%) ও টারপিন জাতীয় জৈব যৌগ আছে (60%)। ভারতে বছরে প্রায় দেড় লক্ষ টন হলুদ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে বিদেশে চালান যায় দশ হাজার টন। হলুদের চমৎকার রঙ এবং সুন্দর গন্ধের জন্যে এটা ছাড়া এখন রান্নার কথা ভাবাও যায় না।

রেফ্রিজারেটর ঠাণ্ডা করতে যে-তরল পদার্থ কম্প্রেসারের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়, সেটা কী?

রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারের মধ্যে যে-তরল ব্যবহার করা হয় তার নাম ফ্রিওন। এটা ফ্লুরো-কার্বন। ফ্লোরিন ও কার্বনের দৃঢ় বন্ধনে উৎপন্ন হয় ফ্লুরো-কার্বন। ফ্লুরো-কার্বনের বহুবিধ ব্যবহার আছে। এর মধ্যে যে ফ্লুরো-কার্বনের বাণিজ্যিক নাম ফ্রিওন, সেটা কার্বন, ফ্লোরিন ও ক্লোরিনের বিবিধ মিশ্রণে তৈরি। এগুলি জলের মত অদাহ্য তরল পদার্থ। রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা ছাড়াও অবশ্য ফ্রিওন পোকা-মাকড় ধ্বংস করতে, শৌখিন প্রসাধন সামগ্রী ও সুগন্ধী দ্রব্য তৈরি করতে, এমন কি অগ্নি-নির্বাপক হিসেবেও কাজে লাগে।

লবঙ্গের মধ্যে কি থাকে?

লবঙ্গ এক ধরনের ফুলের শুকনো কুঁড়ি। জ্যাঞ্জিবার এবং মাদাগাস্কারে এটা বেশি ক'রে উৎপন্ন হয়। লবঙ্গের মধ্যে তেলের ভাগ খুব বেশি আছে—প্রায় 17-18 শতাংশ। এই তেলের সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্ধের কারণ ইউগেনল নামে এক প্রকার ফেনল জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। লবঙ্গের তেল মাড়ি সুস্থ রাখে। দাঁতের ব্যথায় লবঙ্গের তেল বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনেক টুথ-পেস্টেও এই লবঙ্গের তেল মেশানো থাকে।

চুনকে জলে ফেলে দিলে জল টগবগ করে ফুটতে থাকে কেন?

বাড়িতে মিস্ত্রিরা চুনকামের কাজ করতে এলে আগে চুন ভেজানো হয় জলের মধ্যে ফেলে। আর তখনই জল টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে। ব্যাপারটা দেখে অবাক হবারই কথা। আসলে পাথুরে চুনের মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (সংকেত CaO)। এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ক'রে কলিচুন বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [সংকেত $Ca(OH)_2$] উৎপন্ন করে। পাথুরে চুন থেকে কলিচুনে পরিবর্তনের সময় বেশ তাপ সৃষ্টি হয়। এটা একটা রাসায়নিক পরিবর্তনের ঘটনা। কারণ এখানে সম্পূর্ণ নতুন একটি পদার্থের (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড) সৃষ্টি হয়েছে।

ভূ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান



দুরন্ত পৃথিবীর জলে স্থলে সব সময়ে চলেছে এক বিরাট এবং জটিল পরিবর্তনের পালা। অনেক প্লাবন, দুর্যোগ পেরিয়ে মানুষ বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবীকে কখনোই শান্ত বলা চলে না। সেখানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, ভূপৃষ্ঠের কম্পন আছে। ভূপৃষ্ঠের ওপরে এই যে পরিবর্তন, এর শুরু আজ থেকে প্রায় 460 কোটি বছর আগে, যে-দিন পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। পৃথিবীর এই বিচিত্র পরিবর্তনের কার্য-কারণের বিশ্লেষণ থেকেই জন্ম নিয়েছে ভূবিজ্ঞান। এর ভেতরের শিলাস্তর, তার গঠনের ইতিহাস এবং খনিজ সম্পদের মত আরো অনেক কিছুই আজ এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। শুধু ভূপৃষ্ঠ নয়, সমস্ত পৃথিবীর গঠন ও চরিত্র নিয়ে আধুনিক গবেষণা তার অনেক রহস্যের ওপরে আলোকপাত করে চলেছে। ভূবিজ্ঞানকে ইংরেজিতে বলা হয় Geology। সমুদ্র ভূবিজ্ঞান (Marine Geology) এরই একটি শাখা।

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলাটি কোথায় পাওয়া গেছে?

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম শিলাটি একেবারে হাল আমলে পাওয়া গেছে ওড়িশার কেওনঝার জেলার চামপুয়ায়। এটি একটি রূপান্তরিত শিলা (অর্থাৎ যে-পাথর আগ্নেয় অথবা পাললিক শিলা থেকে রূপান্তরের ফলে তৈরি হয়েছে)। ভূ-বিজ্ঞানীর ভাষায় 'টোনালাইট নাইস'। বয়স আনুমানিক 380 কোটি বছর। ওড়িশার এই পাথরটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব ডঃ আশিস বসু, ডঃ সাগরলাল সাহা, ডঃ অজিতকুমার সাহা ও ডঃ সমর সরকারের।

একমাত্র গ্রিনল্যাণ্ড ছাড়া এত প্রাচীন পাথর পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায়নি। মনে হতে পারে, পৃথিবীর বয়স তো 460 কোটি বছর, তবে কেন 380 কোটি থেকে 460 কোটি বছরের কোনো পাথর পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি!

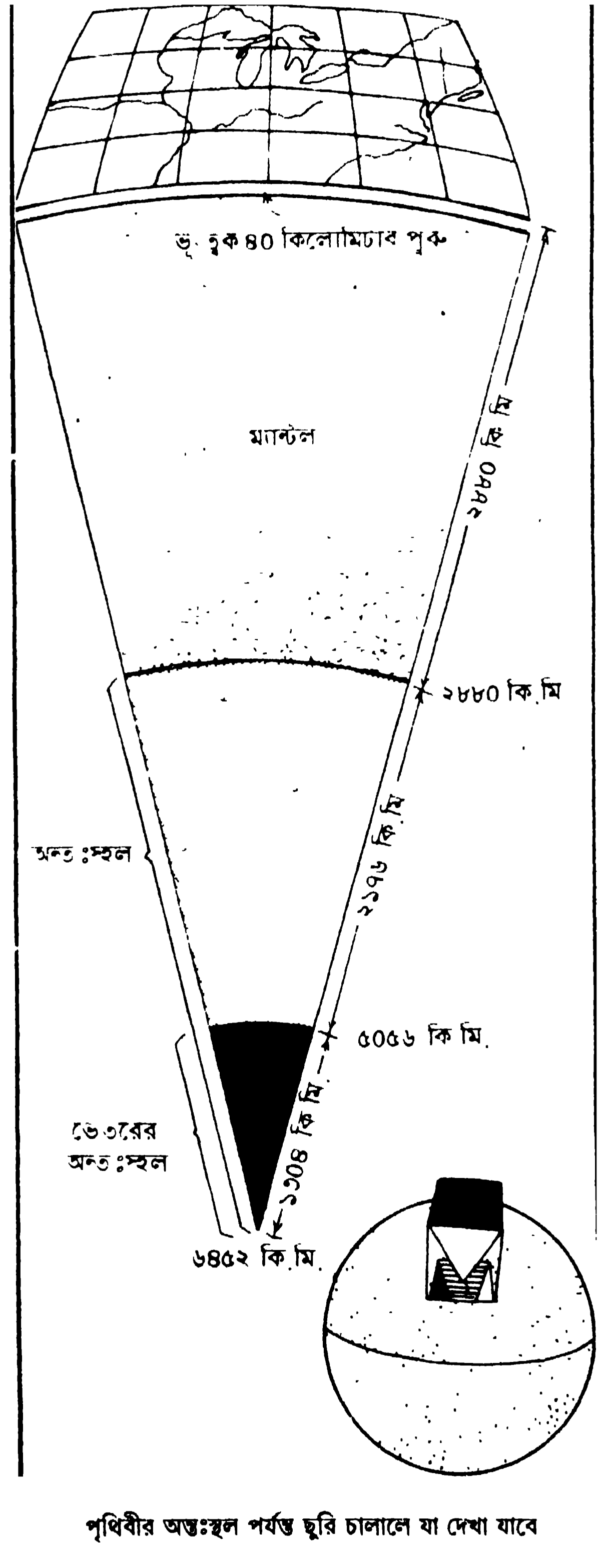
পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলাটি কত বছরের পুরনো?

আসল কথা হল, সৃষ্টির পর পৃথিবী প্রথমে ছিল গ্যাসীয় অবস্থায়, তারপরে তরল অবস্থায়! শক্ত পাথর তৈরি হয়েছে অনেক পরে। তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে বয়স হিসেব করবার জন্য শক্ত কঠিন পাথরই তো প্রয়োজন। আর তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে সেই কঠিন পাথর তৈরির সময়টাই হিসেব কষে বের করা যায়।

ওড়িশার এই পাথরটি ছাড়া এর আগে পশ্চিম গ্রিনল্যাণ্ড থেকে যে গ্র্যানাইট পাথর পাওয়া গিয়েছিল, সেটিও খুব প্রাচীন। বয়স আনুমানিক 380 কোটি বছর। এ-ছাড়া শোনা গেছে, অস্ট্রেলীয় ভূ-বিজ্ঞানীরা প্রায় 410-420 কোটি বছরের পুরনো খনিজ খুঁজে বের করেছেন। তবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে তাপ ও চাপের পরিমাণ কত?

বিজ্ঞানীরা তো বটেই, একথা সবাই জানে যে, গলন্ত অবস্থা থেকে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী আজকের অবস্থায় পৌঁছেচে। তবে পৃথিবীর ওপরের স্তর ঠাণ্ডা হয়ে এলেও ভেতরটা কিন্তু এখনও বেশ তপ্ত অবস্থায় রয়েছে।



পৃথিবীর অন্তঃস্থল পর্যন্ত ছুরি চালালে যা দেখা যাবে

কয়লা বা সোনার খনিতে নামলে এ-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আরো গভীরে নামতে নামতে আমরা যদি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যাই, তাহলে সেখানে তাপ আর চাপের পরিমাণ কী রকম হবে?

বিজ্ঞানীদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে, সাধারণভাবে 20 থেকে 50 মিটার গভীরতা বৃদ্ধি হলে 1 ডিগরি সেলসিয়াস তাপ বেড়ে যায়। অবশ্য শুধু গভীরতা নয়, পাথরের প্রকৃতির ওপরেও তাপবৃদ্ধির পরিমাণ অনেকটাই নির্ভর করে। যেমন, যেসব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, সেখানে তাপবৃদ্ধির হার তো বেশি হবেই। সে যাই হোক, বিজ্ঞানীরা নানা রকম হিসেব-নিকেশ করে বলেছেন, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা 2700-2800 ডিগরি কেলভিন (বা 2427 ডিগরি-2527 ডিগরি সেলসিয়াস)। তবে সব বিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে এক মত নন। এই মতের অমিল খুবই স্বাভাবিক, কারণ পরোক্ষভাবে নির্ণয় করা এই তাপমাত্রা প্রত্যক্ষভাবে মাপবার কোনো সুযোগই নেই।

গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তাপমাত্রাই নয়, চাপের পরিমাণও অনেক বেড়ে যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠের 1.6 কিলোমিটার (এক মাইল) নীচে চাপ, প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় প্রায় 0.5 মেট্রিক টনের

ভূগর্ভে কতটা গভীরতায় 1 ডিগরি সেলসিয়াস উত্তাপ বাড়ে?

কাছাকাছি। এই গড় হিসেব থেকে বলা যায়, কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় 2222 মেট্রিক টনের কাছাকাছি। তবে এ-হিসেব যে একেবারে নিখুঁত নয় সে-কথা বলাই বাহুল্য। আর একটি হিসেব অনুযায়ী, কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ 15 থেকে 30 লক্ষ অ্যাটমসফিয়ার (1 অ্যাটমসফিয়ার = প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে 1.033 কিলোগ্রাম চাপ)।

ভূমিকম্প কেন হয়?

বহু যুগ ধরেই মানুষ ভূমিকম্পকে দেবতার অভিশাপ বলে মনে ক'রে এসেছে। কিন্তু জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পেরেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে দেবতার রোষের কোনো সম্পর্কই নেই। তাহলে ভূমিকম্প কেন হয়?

ভূমিকম্পের মূলে রয়েছে কিছু প্রাকৃতিক শক্তির কার্য-কারণের সম্পর্ক। মনীষী অ্যারিসটটল (384-322 খ্রিপূ) বলেছিলেন, ভূপৃষ্ঠের নীচে জমে থাকা গ্যাস মুক্তির জন্য শিলাস্তরে ক্রমাগত আঘাত ক'রে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি করে। আরেক গ্রিক মনীষী লুক্রেটিয়াস বিশ্বাস করতেন, ভূ-গর্ভের কোনো গুহা যখন কোনো দুর্যোগে ভেঙে পড়ে,

সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে কি ভূ-কম্পন হতে পারে?

তখনই ভূস্তরে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প। তবে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানীর গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে ভূমিকম্পের প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত কারণ। যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ম্যালে, মিলনে, রিড, ইমানুরা, ওমরী প্রমুখ ভূ-বিজ্ঞানীরা।

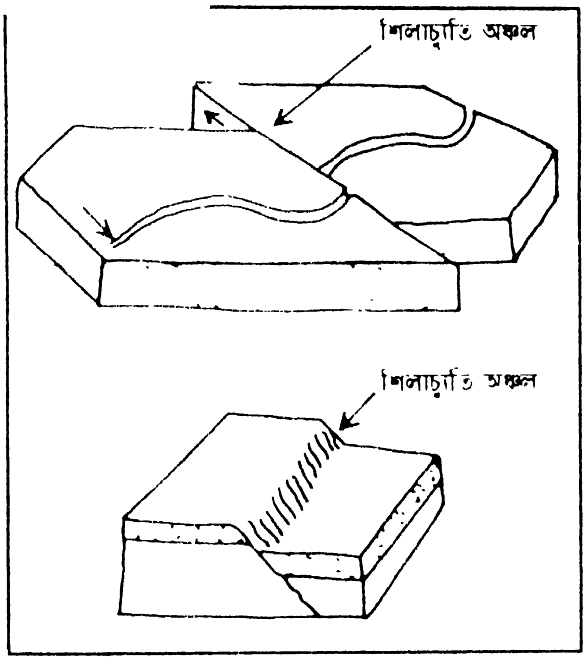
সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে, যেমন (1) ভূপৃষ্ঠ-জনিত, (2) আগ্নেয়গিরি-জনিত এবং (3) শিলাচ্যুতি-জনিত।

1. ভূপৃষ্ঠ-জনিত কারণ: পাহাড়ী অঞ্চলে ধস নামবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, 1911 সালে তুর্কিস্তানের ভূমিকম্পে পামির উপত্যকা অঞ্চলে 50000 কোটি টন ওজনের বিশাল ধস (Landslide) পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, এই বিরাট ধস নামবার ফলেই এই ভূমিকম্প। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ভূ-বিজ্ঞানী আর ডি ওল্ডহ্যামও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, অনেক সময়ে ভূ-কম্পনের ফলেই পাহাড়ী জায়গায় বিরাট আকারের ধস নামতে শুরু করে। কিন্তু ধস আগে, না ভূমিকম্প আগে? এই প্রশ্নের উত্তর অনেকটা 'ডিম আগে না মুরগি আগে'-র মতই জটিল। এ-ছাড়া অন্যান্য কারণে, যেমন, মহাদেশের উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে যে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়, তা মৃদু হলেও কলকাতার আবহাওয়া-অফিসের যন্ত্রে প্রায়ই ধরা পড়ে।

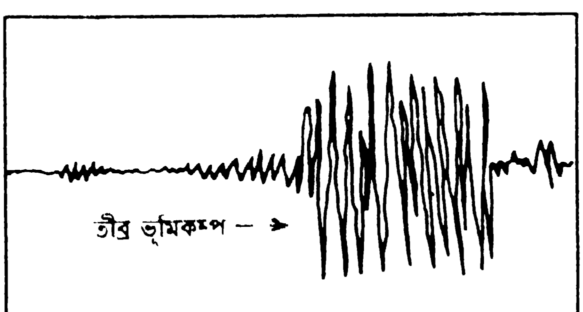
2. আগ্নেয়গিরি-জনিত কারণ: ভূ-বিজ্ঞানীরা

বলেছেন, কখনো কখনো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে ভূমিকম্পের জন্ম হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় প্রচণ্ড শক্তিতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের (Crater) ভেতরের ভূ-স্তরে আঘাত করতে থাকে। সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। এ-ভাবেই ১৮৮৪ সালে সুমাত্রার ক্রাকাতোয়ায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উদ্‌গীরণের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বছরেই জাপানের বন্দইসানে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভাস্রোত বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভূ-কম্পন অনুভব করা গিয়েছিল।

3. শিলাচ্যুতি-জনিত কারণ ঃ আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীদের



এ-ধরনের শিলাচ্যুতির ফলে ভূমিকম্প হতে পারে

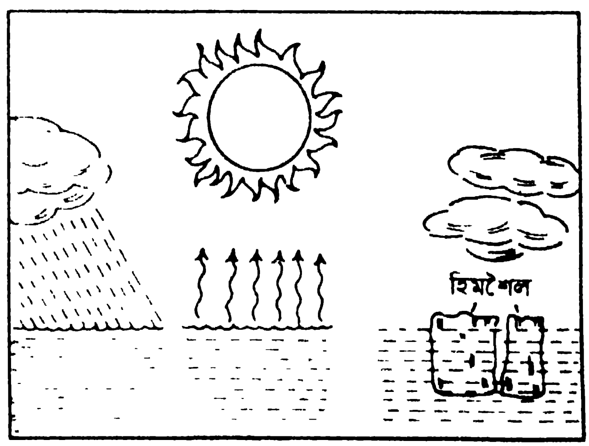


ভূমিকম্পের কাঁপুনির রেখাচিত্র ভূকম্প মাপক যন্ত্রে

মতে, ভূগর্ভের ভেতরে শিলাচ্যুতিই ভূমিকম্পের মূল কারণ। 1906 সালের সানফ্রানসিসকো ভূমিকম্পের সঙ্গে সান আনড্রিয়াস শিলাচ্যুতির (Fault) সম্পর্ক লক্ষ্য ক'রে অধ্যাপক এইচ এফ রিড ভূমিকম্পের কারণ দেখিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঘোষণা করেন। এই স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত

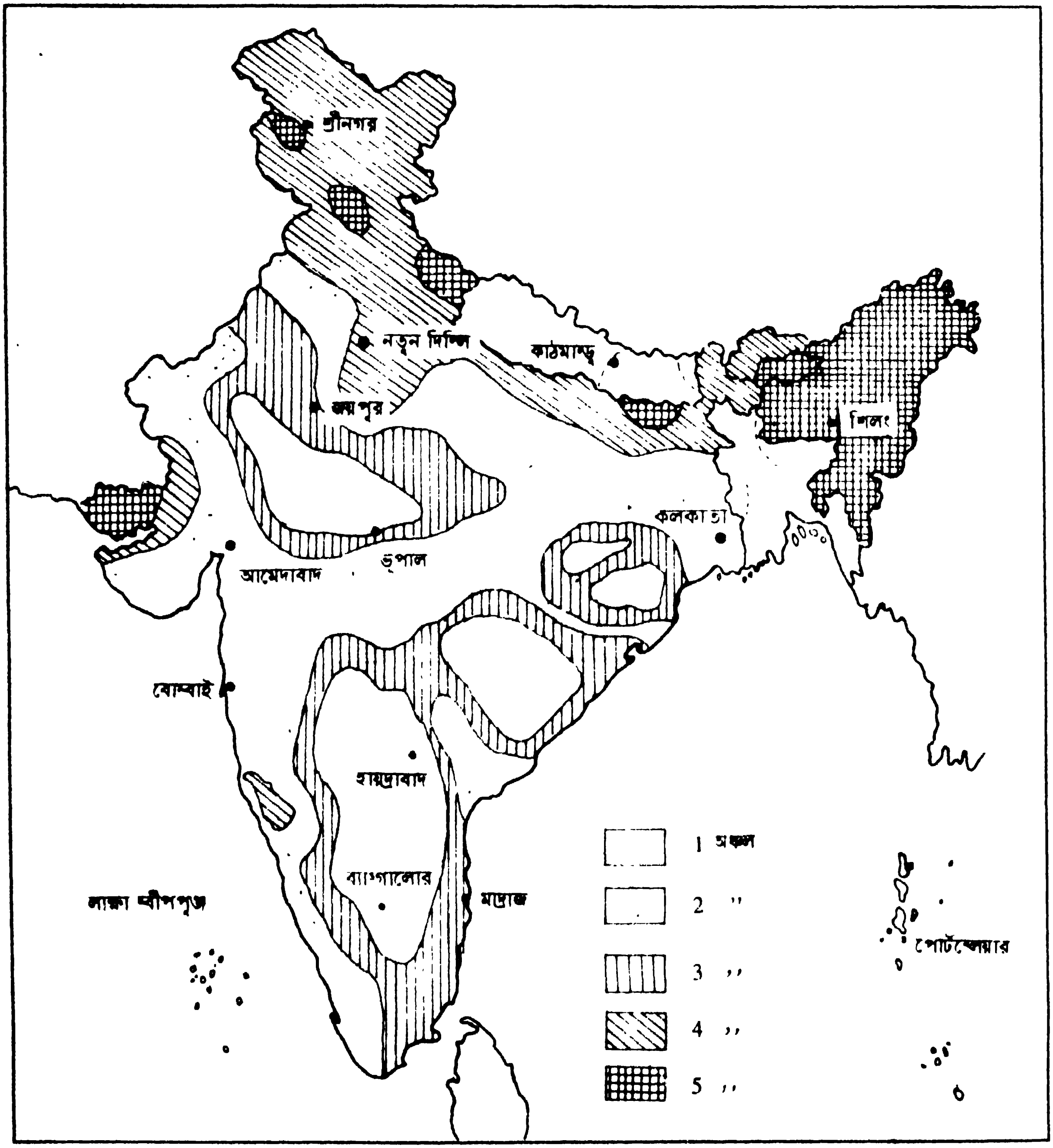
কোথাও কোথাও ভূমিকম্প বেশি হয় কেন?

তত্ত্বটির (Elastic rebound theory) সাহায্যেই ভূমিকম্পের জটিল গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ওঁর মতে ভূমিকম্পের আগে সম্ভাব্য শিলাচ্যুতি তলের (Fault plane) দু' পাশে নানা কারণে ক্রমশ টান পড়তে থাকে। ফলে শিলাস্তরটি বাঁকতে বাঁকতে ক্রমে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন শিলাস্তরটির পক্ষে আর শক্ত ও স্থির অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। স্থিতিস্থাপকতার (Elasticity) সীমা অতিক্রম করলেই শিলাস্তরের আচমকা বিচ্যুতি ঘটে। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে শিলাস্তরটিকে ভেঙে দু' টুকরোয় আলাদা করে দিয়েছে। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে শিলাস্তরটির একটি অংশ ওপরে উঠে যায় আর অন্য অংশটি নেমে আসে নীচে। এই বিরাট শিলাচ্যুতির ফলে কাঁপতে থাকে আশেপাশের সমস্ত শিলাস্তর এবং উৎপত্তি হয় ভূমিকম্পের। শিলার এ ধরনের চ্যুতি-বিচ্যুতি ভঙ্গিল পর্বতমালার (Fold mountain) মধ্যেই বেশি। তাই এ-সব



সমুদ্র জলের নোনতা ভাব যে-কারণে বাড়ে (1) বৃষ্টির ফলে কমে (2) জল বাষ্পীভূত হলে বাড়ে (3) হিমশৈল তৈরি হলে বাড়ে

অঞ্চলেই আকছার ভূমিকম্প হয়। 1897 সালের আসাম ভূমিকম্পে চিদরং শিলাচ্যুতির ফলে একটি শিলাস্তর প্রায় 10.5 মিটার নীচে নেমে গিয়েছিল। পেরু (1970), ইরাণ (1978, 1979, 1981, 1983), মেকসিকো (1985), উত্তরকাশী (1991) কিংবা লাটুর-এর (1993) সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণও অন্য কিছু নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শিলাচ্যুতির ফলেই এই সব ভূমিকম্পের উৎপত্তি।



ভূমিকম্পের প্রবণতা হিসেবে ভারতকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 5 নং অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প-প্রবণ।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেওয়া কি সম্ভব?

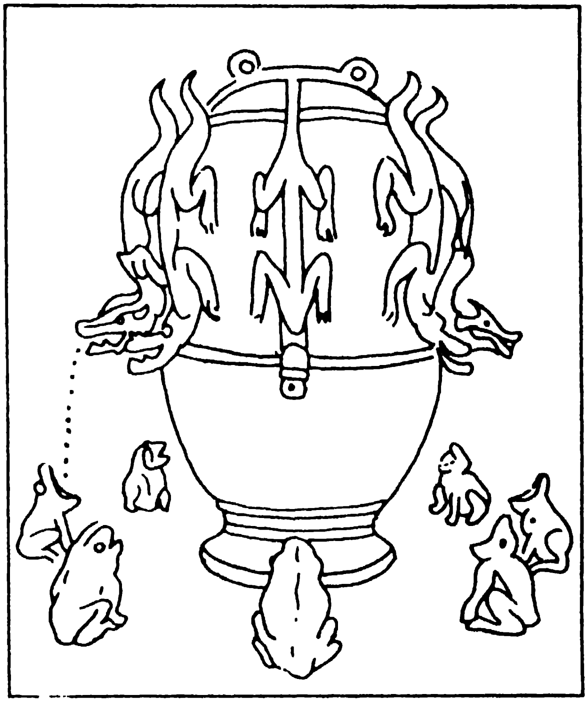
আবহাওয়ার পূর্বাভাষের মত ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেওয়া কি সম্ভব, এই প্রশ্নটি নিয়ে শুধু সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানীরা নয়, পুরনো দিনের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরাও বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব কিনা-এ সম্পর্কে প্রাচীনকালে যে-সব দেশে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, তার মধ্যে জাপান, চীন, ভারত ইত্যাদি কয়েকটি দেশ নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য।

প্রাচীনকালের কিছু কিছু কাহিনী পড়ে জানা যায়, ভূমিকম্পের আগে জলের মধ্যে অসম্ভব চঞ্চল হয়ে ওঠে মাছ (বিশেষত মাগুর মাছ)। ব্যাঙ ও সাপ মাটির তলার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, আকাশে আচমকা রামধনু ফুটে ওঠে, চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কিম্বা কুয়োর জল হয়ে ওঠে ঘোলাটে।

ভূমিকম্পের আগে মাগুর মাছের চঞ্চল হয়ে ওঠবার ব্যাপারটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালান জাপানী ভূ-পদার্থবিদ্ টেরাদা। সমীক্ষায় তিনি এই দু'টি ব্যাপারের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রথমে যিনি তাৎপর্যময় গবেষণা করেছেন, তিনি হলেন চীনা বিজ্ঞানী জান হেন (78-139 সাল)। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ঠিক করবার জন্য তিনি এক ধরনের পাত্রের ভেতরে রাখেন একটি ঝুলন্ত পেণ্ডুলাম, তার সঙ্গে ৪টি কপিকল কোণাকুণি জোড়া। প্রত্যেকটি কপিকলের বাইরের দিকে শেষ প্রান্তে লাগানো ৪টি ড্রাগন। প্রত্যেকটি ড্রাগনের হাঁ করা মুখে একটি ক'রে বল আটকানো রয়েছে। ভূমিকম্পের সময় কপিকলে টান পড়লেই ড্রাগনের মুখ পুরোপুরি খুলে বল পড়ে যায় নীচে। আর পড়বি তো পড়, পড়ে নীচে বসিয়ে রাখা ব্যাঙের মুখে। ড্রাগনের মুখ থেকে ব্যাঙের মুখে বল পড়লেই বুঝতে হবে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সেই প্রাচীনকালেই যে এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরের ভূমিকম্পও বুঝতে পারা যেত, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

প্রতি বছর ভূমিকম্পের ফলে সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ মারা যায়। তাই ভূমিকম্প সম্বন্ধে যদি পূর্বাভাষ করা যায়, তবে এই মৃত্যুর হার নিশ্চয়ই অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। ভূমিকম্পের পূর্বাভাষের অর্থ হল, কোথায় কখন কতটা তীব্রতার ভূমিকম্প হতে পারে, তা আগেভাগে বলতে পারা। এখনও পর্যন্ত কোথায় কতটা তীব্রতার ভূমিকম্প হতে পারে, তা হয়তো মোটামুটিভাবে বলতে পারা সম্ভব, কিন্তু কবে, কখন হবে, এই প্রশ্ন নিয়ে ভূ-বিজ্ঞানীরা খুবই বিব্রত। এ-কথা জানা আছে, ভূমিকম্পের কিছুদিন আগে



প্রাচীন এই চীনা যন্ত্রে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সূচিত হত

থেকেই ভূমিকম্পগ্রস্ত অঞ্চলের ভূমি মৃদুভাবে কাঁপতে থাকে আর মাঝে মাঝে তা হেলে পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে ভূমির এই কাঁপুনি রেকর্ড ক'রে ও ভূমি হেলে পড়ার খবর ভূমিকম্প-পূর্বাভাষ কেন্দ্রে পাঠানো হলে তা বিশ্লেষণ ক'রে ভূমিকম্পের দিনক্ষণ আগাম বাতলে দেওয়া অনেকটাই সম্ভব। তবু এখনও পর্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব ও তথ্য বিশ্লেষণের সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকায় ভূমিকম্পের আগাম আভাস নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এ-সব নানা অসুবিধে সত্ত্বেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানে। নানা আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে রাশিয়ান ভূ-বিজ্ঞানীরা 1966 সালের (26 এপ্রিল) তাশখন্দ ভূমিকম্প সম্পর্কে সঠিকভাবে পূর্বাভাষ করতে পেরেছিলেন।

কয়েক বছর আগে একটি বড় আকারের ভূমিকম্প পূর্বাভাষ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে চীনে। এই কেন্দ্র থেকে সাম্প্রতিক কালের দু'টি বড় আকারের ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ করাও সম্ভব হয়েছে।

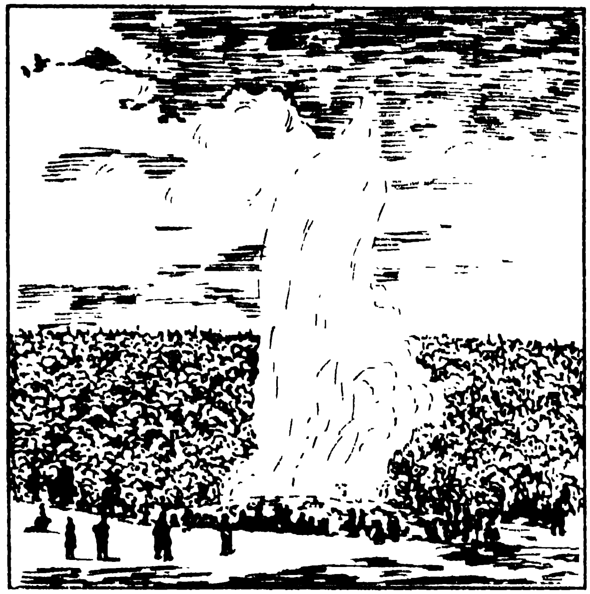
ভূমিকম্প-বিশারদরা মনে করছেন, অদূর ভবিষ্যতে ভূমিকম্প সম্পর্কে শুধু পূর্বাভাষ নয়, ভূমিকম্প যাতে না হয় অথবা তীব্রতা কমে যায়, এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নেওয়া সম্ভব হবে।

আগ্নেয়গিরি কি আমাদের কোনো উপকার করে?

আগ্নেয়গিরিকে আমরা সবাই ধ্বংসের প্রতিমূর্তি বলেই মনে করি। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আগ্নেয়গিরি শুধু মানুষের জীবনে ধ্বংস বা অভিশাপই বয়ে আনে না, কোনো কোনো দিক থেকে পরোক্ষভাবে আমাদের উপকারও করে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, আগ্নেয়গিরি-জাত তাপ মানুষের বহু প্রয়োজন মেটাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই বিদ্যুৎ-শক্তির ঘাটতি বেশ কিছুটা পূরণ করছে আগ্নেয়গিরি-জাত তাপশক্তি।

আগ্নেয়গিরি-প্রধান অঞ্চলগুলিতে আকছাব দেখতে পাওয়া যায় উষ্ণ-প্রস্রবণ (Hot spring), গিজার (Gey-ser) এবং ধূম-প্রস্রবণ (Fumarole)। শুনলে অবাক হতে হবে, এ-সব তাপের মূল উৎস কিন্তু আগ্নেয়গিরি। কোনো আগ্নেয়গিরি যখন নির্জীব হয়ে আসে, তার ভেতরের তরল পাথর বা ম্যাগমাও (Magma) তখন ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়। আর ঠাণ্ডা হতে হতে ম্যাগমা থেকে বেরিয়ে আসে গরম গ্যাস। এ-সব গ্যাসের মধ্যে অবশ্য বেশির ভাগই জলীয় বাষ্প, আর থাকে সামান্য কিছু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন ইত্যাদি। এই গরম গ্যাস ও বাষ্প পাথরের ফাটল দিয়ে ওপরে উঠে ভূ-জল (Ground water) অর্থাৎ পাথরের ভেতরের সঞ্চিত জলের সঙ্গে মিশে যায়। আগ্নেয়গিরির গ্যাসের সংস্পর্শে ভূ-জল গরম হয়ে ওঠে। এ-ভাবেই সৃষ্টি হয় উষ্ণ প্রস্রবণ বা গিজার। উদাহরণ হিসেবে বলতে হয়, আমেরিকার ইয়োলোস্টোন পার্কের গিজারের কথা। ভারতেও পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর ও বিহারের রাজগীর অঞ্চলের উষ্ণ-প্রস্রবণ অনেকেরই পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকেই উষ্ণ প্রস্রবণের জলে মানুষ স্নান, কাপড় কাচার



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের 'ওল্ড ফেইথফুল গিজার'। এই ভূ-তাপ মানুষের অনেক কাজে লাগানো যেতে পারে।

কাজ করেছে। রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট ও অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিদের জন্য উষ্ণ প্রস্রবণের অঞ্চলে মনোরম সুসজ্জিত স্নান-ঘর থাকতো। আজকাল অবশ্য এ-সব অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের জন্যও বিশাল স্নানঘর আর স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে উঠেছে। অনেকেরই ধারণা, এ-সব উষ্ণ প্রস্রবণের জলে মিশ্রিত খনিজ পদার্থ স্নায়ুরোগ ও চর্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আজকাল উষ্ণ-প্রস্রবণ বা গিজারের তাপশক্তিকে (Geothermal energy) বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে মানুষের প্রয়োজনে লাগানো হচ্ছে। এ-কাজে প্রথম পথ দেখায় ইতালি। অবশ্য তার প্রধান কারণ, ইতালির এক বিস্তৃত অঞ্চল আগ্নেয়গিরি-প্রধান হওয়ায় প্রচুর উষ্ণ-প্রস্রবণ বা গিজার রয়েছে। আর একটা কারণ, ইতালিতে কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রকৃতিক গ্যাসের অনটন। তাই গিজারের বাষ্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ছাড়া আর কী উপায় ছিল! এই পদ্ধতিতে গিজারের বাষ্পের ধাক্কায় টারবাইন চালিয়ে জেনারেটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। এ-

ভাবে শুধু ইতালি নয়, পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই (যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জাপান, এল সালভাদর, নিকারাগুয়া ইত্যাদি) বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। ভারতের লাডাক অঞ্চলের পুগা উপত্যকাতেও বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে একই ভাবে। উষ্ণ-প্রস্রবণের জল ও বাষ্প থেকে শুধু বিদ্যুৎ তৈরি নয়, বোরিক অ্যাসিডও (Boric acid) পাওয়া যাচ্ছে। এ-ব্যাপারেও ইতালি সবাইকে টেক্কা দিয়েছে।

আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষত রাজধানী রেকিয়াভিকের (যেখানে মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক দাবার আসর বসে) আশেপাশে বেশ কিছু উষ্ণ প্রস্রবণ বা গিজার দেখা যায়। এ-জন্য বহু দিন থেকেই রেকিয়াভিক শহরে রয়েছে জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যের অনেক স্নানাগার। শুধু তাই নয়, রেকিয়াভিক ও সেলফস শহরের প্রতিটি বাড়িতেই এখন পাইপের মাধ্যমে গরম জল পাঠানো হয়। দারুণ ব্যাপার নয় কি!

পশ্চিমবঙ্গে কোথায় উষ্ণ প্রস্রবণ আছে?

শুধু ভূ-তাপশক্তির অবদান নয়, আগ্নেয়গিরির আর একটি সুফলের কথাও জানা গেছে। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে যে ছাই বেরিয়ে আসে, তাতে কখনও কখনও ফসফরাস ও নাইট্রোজেন যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এই পদার্থ মাটির সঙ্গে মিশে অনেক সময়েই মাটির উর্বরা-শক্তি বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অনুর্বর জমিও উর্বর হয়ে উঠেছে, এমন প্রমাণ রয়েছে।

এ-সব দিক থেকে বিচার করলে আগ্নেয়গিরিকে সব সময় ধ্বংসের প্রতিমূর্তি বোধ হয় বলা যায় না।

'ভূমধ্যসাগরের লাইটহাউস' কাকে বলে?

নীল ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সিসিলি দ্বীপের উত্তরে লিপারি দ্বীপপুঞ্জ। সেই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেই বিখ্যাত স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরি। এই আগ্নেয়গিরি থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে। তবে লাভার প্রকৃতি কম তরল হওয়ায় অগ্ন্যুৎপাতের সময় লাভার জমাট খণ্ড প্রায়ই আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এ-ছাড়া প্রতিবার বিস্ফোরণের সময় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে যে-গ্যাস বেরিয়ে আসে, তাতে সহজেই আগুন লেগে যায়। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের এই আগুন রাত্তিরে দূর থেকে দেওয়ালির আলো বলে ভুল হতে পারে। এ-জন্যই স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরিকে অনেকে বলে থাকেন 'ভূমধ্যসাগরের লাইটহাউস'। লাইটহাউস যেমন অচেনা সমুদ্রে জাহাজকে পথ দেখায়, তেমনি দূর থেকে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরিকে দেখতে পেলে জাহাজের নাবিকরা বুঝতে পারেন, তাঁদের জাহাজ কোথায় এসে পৌঁছেছে।

পাহাড় কী করে হল?

পাহাড় কী ক'রে হল, কেনই বা তা উঁচু, এ-নিয়ে ভূ-বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাতে এক পাহাড়ের সঙ্গে আরেক পাহাড়ের নানা পার্থক্য ধরা পড়েছে। পাহাড়ের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ ক'রে, ভূ-বিজ্ঞানীরা মোট পাঁচ রকমের পাহাড়ের কথা বলেছেন।

প্রথম ধরনের পাহাড়ের মধ্যে আছে হিমালয়, আল্পস, রকিজ কিংবা আন্দিজের মত বড় বড় পাহাড়। এ-ধরনের পাহাড়ের নাম Fold mountain বা ভঙ্গিল পর্বত। নাম শুনে মনে হতে পারে, এ-সব পাহাড়ের মধ্যে নির্ঘাত ভাঙাভাঙির কোনো ব্যাপার আছে। সত্যিই তাই। সমুদ্রের নীচে পলি জমে জমে যে-পাললিক শিলাস্তর (Sedimentary rocks) গড়ে ওঠে, দামাল প্রকৃতির নানা শক্তির চাপে সেই শিলাস্তর ভাঁজ পড়ে ক্রমেই তা পাহাড়ের চেহারা নেয়। ব্যাপারটা আর একটু খোলসা ক'রে বলা দরকার। একটা বড় কাগজ হাতে নিয়ে, সেটাকে কয়েকবার ভাঁজ করতে করতে দেখা যায়, পাতলা কাগজটাই বার কয়েক ভাঁজের পরে বেশ খানিকটা মোটা হয়ে উঠেছে। অনেকটা এ-ভাবেই বেশ কয়েকবার ভাঁজ পড়ে পাথরের স্তরও মোটা বা উঁচু হয়ে ওঠে। তবে কাগজের ভাঁজের সঙ্গে একটা ব্যাপারে অমিল আছে। কাগজটা ভাঁজ করতে যেখানে মাত্র দু' তিন মিনিট লেগেছে, সেখানে একটা ভঙ্গিল পর্বত তৈরি হতে দু' তিন কোটি বছর লেগে যাওয়াটা আশ্চর্যের নয়।

দ্বিতীয় ধরনের পাহাড় স্তূপ-পর্বত বা চ্যুতি পর্বত (Block mountain), যার জন্ম চ্যুতির ফলে ' সমতল ভূমি থেকে কোনো পাথুরে অংশ ফাটল বরাবর ঠেলে বেরিয়ে এসে কিংবা নীচে বসে গিয়ে তৈরি হতে পারে এ-ধরনের

পাহাড়। গুজরাতের আরাবল্লী কিংবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়েরা নেভাদা পর্বত এই জাতের।

তৃতীয় জাতের পাহাড় গম্বুজ পর্বত (Dome mountain)। নামের মত চেহারাও জমকালো, গম্বুজের মত। এই গম্বুজ পাহাড়ের ঢাল কেন্দ্রবিন্দু থেকে সব দিকে ছড়ানো। আসামের কিছু কিছু পাহাড় আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওজার্ক পাহাড় এই ধরনের।

চতুর্থ ধরনের পাহাড়ের জন্ম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে। গলন্ত লাভা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে এই পাহাড় তৈরি হয়। তাই এই পাহাড়ের নাম আগ্নেয় পর্বত (Volcanic mountain)। পশ্চিমবঙ্গ-বিহারের রাজমহল পাহাড়, পশ্চিম ভারতের ডেকান মালভূমি, ইতালির ভিসুভিয়াস কিংবা জাপানের ফুজিয়ামা পাহাড় এই জাতের।

এবার পাঁচ নম্বর পাহাড়ের কথা। উঁচু মালভূমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা রকম প্রাকৃতিক শক্তি জল-হাওয়া রোদ ইত্যাদির এক টানা পিটুনিতে ক্ষয়ে যায়। এ-ভাবেই হয় ক্ষয়জাত পাহাড়ের (Residual mountain) জন্ম। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ছোট-বড় মাঝারি বেশ কিছু পাহাড় কিংবা মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যপর্বত যে এই ক্ষয়জাত পাহাড়ের দলে, সে-কথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে।

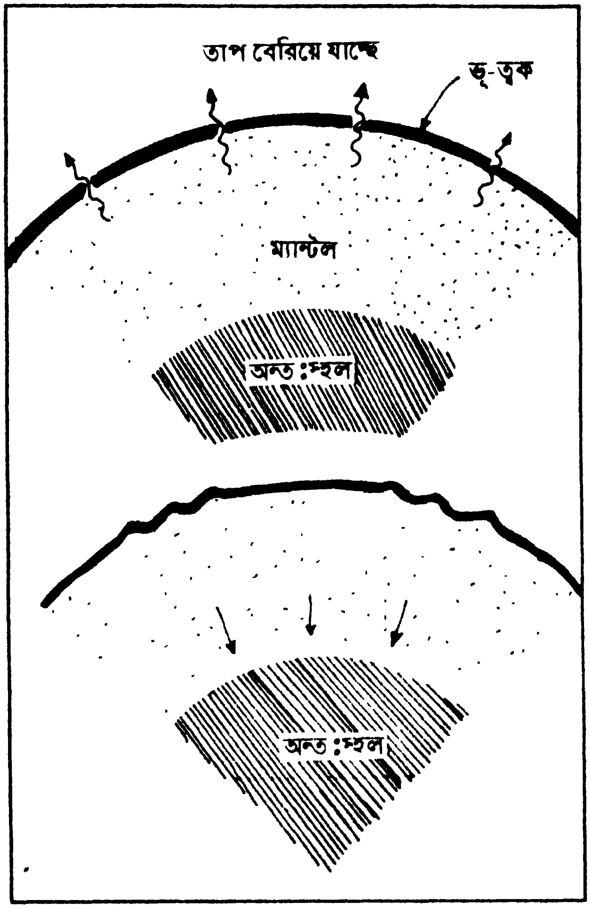
কেন কী ভাবে তৈরি হল পৃথিবীর পর্বতমালা, বিশেষত ভঙ্গিল পর্বতমালা, তা বোঝানোর জন্য ভূ-বিজ্ঞানীরা আমাদের উপহার দিয়েছেন বেশ কয়েকটি তত্ত্ব।

এ-রকমই একটি তত্ত্বের নাম সংকোচন তত্ত্ব (Contraction theory)। এই তত্ত্বের সার কথা হল, জন্মের সময় পৃথিবী ছিল ফুটন্ত তরল গোল বলের মত।

পৃথিবীর সব মহাদেশই কি আগে একটা অখণ্ড মহাদেশ হিসেবে ছিল?

ক্রমে সেই উত্তপ্ত গোলাকার তরল পিণ্ডটি ঠাণ্ডা হতে হতে তার ওপরে তৈরি হল ফলের খোসার মত ভূত্বক। ভূত্বক তৈরি হলেও ভূত্বকের নীচে তরল শিলারাশির ঠাণ্ডা হওয়া থামেনি। সেগুলি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমেই আকারে ছোট হয়ে আসছিল। এই সংকোচন বা ছোট হওয়ার ফলে বাইরের ভূত্বকে কুঁচকে গিয়ে ভাঁজ তৈরি হয়েছে।

আর একটা তত্ত্ব ভূ-বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনারের।



সংকোচন-তত্ত্ব অনুসারে কী ভাবে ভূত্বকে পাহাড় তৈরি হল

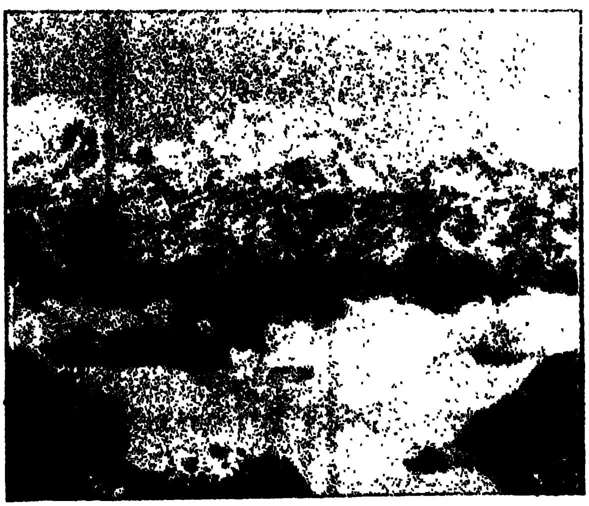
উনি বলেছেন, পৃথিবীর মহাদেশগুলো বোধহয় আগে এক সঙ্গে জোড়া ছিল। পরে ছিঁড়ে খুঁড়ে খণ্ড খণ্ড অংশগুলি, অর্থাৎ মহাদেশগুলি, আজকের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে। মানচিত্র খুলে একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, আফ্রিকার পশ্চিমতটের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বতট ও ইউরোপের পশ্চিমতটের কী আশ্চর্য মিল। সে যাই হোক, ওয়েগনারের মতে, পৃথিবীর সব মহাদেশই আগে একটি একক অখণ্ড মহাদেশ ছিল। সেই প্রাচীন মহাদেশের নাম ছিল প্যানজিয়া। 1912 সালে আলফ্রেড ওয়েগনার বললেন, খুব সম্ভবত আজ থেকে 20 কোটি বছর আগে মেসোজয়িক যুগের গোড়ার দিকে প্যানজিয়া মহাদেশ ভেঙে গিয়ে চলতে শুরু করে। তবে চলার গতি খুবই কম। বছরে কয়েক ইনচির বেশি নয়। সেই সময় প্যানজিয়া মহাদেশের ভেতরে টেথিস নামে একটা লম্বা চেহারার সমুদ্র ছিল। ওদিকে যেমন

আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ছিঁড়ে দূরে চলে যাচ্ছিল, এদিকে তেমনি টেথিস সমুদ্রের দু'পাশের দু'টি মহাদেশের গতি ছিল পরস্পরের দিকে। দু'পাশ থেকে দু'টি বিপরীত দিকে চলমান মহাদেশের চাপের ফলে টেথিস সাগরের পলি থেকেই তৈরি হয়েছে দীর্ঘ আল্পস ও হিমালয়ের মত ভঙ্গিল পর্বতমালা। এই পাহাড়গুলি যে এক দিন সমুদ্রের নীচে ছিল তার মোক্ষম প্রমাণ, এই পাহাড়গুলির মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। আর আজকের ভূমধ্যসাগর বোধহয় সেই অতীতের টেথিস সাগরের স্মৃতি বহন করছে। [দ্রষ্টব্য ঃ মহাদেশগুলির চেহারা কি বরাবর একই রকম ছিল ?]

আরও একটা কথা, পাহাড় কিন্তু শুধু মহাদেশের ওপরেই নেই, রয়েছে নীল সমুদ্রের জলের নীচেও। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সমুদ্র-তলদেশের মানচিত্র তৈরি ক'রে দেখা গেছে, নীল সাগরের ঢেউয়ের তলায় লুকিয়ে আছে আর এক পাহাড়ের দেশ, যার কথা বহুদিন ছিল আমাদের অগোচরে। [দ্রষ্টব্য ঃ সমুদ্রের তলার গঠন কেমন?]

হিমালয় কি কোনোদিন সমুদ্রের নীচে ছিল?

হিমালয় পাহাড় যে সমুদ্রের নীচে ছিল, তার মোক্ষম প্রমাণ দু'টি। প্রথমত, হিমালয়ের পাথরের চরিত্র, দ্বিতীয়ত, ওই পাথরের ভেতরে পাওয়া ফসিল। হিমালয় পর্বতের মধ্যে যে ধরনের চুনাপাথর আছে, তা কেবল তৈরি হয় সমুদ্রের তলদেশে। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট চুনাপাথরেই তৈরি।



হিমালয়

এভারেস্ট কোন পাথরে তৈরি?

এ-ছাড়া হিমালয়ের পাথরের মধ্যে যে ফসিল পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বেশ কিছু ফসিল নিঃসন্দেহে সামুদ্রিক প্রাণীর। যেমন বেলেমনাইট, অ্যামোনাইট, রেডিয়োলারিয়া, ফোরামিনিফার ইত্যাদি। এ-সব প্রাণীরা সমুদ্রের জল ছাড়া কোথাও বাঁচতেই পারতো না।

হিমালয়ের উচ্চতা কি বাড়ছে?

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হিমালয়। এই হিমালয়েই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট (প্রায় ৮৮৪৮ মি)। কিন্তু এর উচ্চতা কি একই থাকবে চিরকাল, নাকি বাড়বে?

প্রাচীন পৃথিবীতে টেথিস নামে যে সরু লম্বা সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রের দু'পাশে ছিল দু'টি প্রাচীন মহাদেশ—লরেশিয়া আর গণ্ডোয়ানা। বিপরীত দিকে চলমান এই দু'টি মহাদেশের চাপের ফলে টেথিস সাগরের পলি থেকেই তৈরি হয়েছে দীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালা। এই পর্বতমালা আসলে ভঙ্গিল প্রকৃতির। তার মানে, দু'পাশের চাপের ফলে পাথরে ভাঁজ পড়েছে, কোথাও বা শিলাচ্যুতি ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পাহাড়ের ভেতরে এখনও ভাঁজ (Fold) ও চ্যুতির (Fault) পারস্পরিক খেলা চলেছে। এ-থেকে বোঝা যায়, হিমালয় পর্বতকে এখনও সম্প্রসারণশীল শক্তি বা ঊর্ধ্ব চাপের মোকাবিলা করতে হচ্ছে এবং হিমালয় পর্বতের মাথা উঁচু করা এখনও বন্ধ হয়নি। সুতরাং ভবিষ্যতে হিমালয় পর্বত আরো উঁচু হয়ে উঠলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। তবে এ-কথা মনে রাখতে হবে, এই উচ্চতাবৃদ্ধি ঘটছে খুবই ধীরে ধীরে।

পৃথিবীর ওজন কি বাড়ছে?

প্রশ্নটির উত্তর দু'ভাবে দেওয়া যায়। প্রথমত, পৃথিবীতে

মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সংখ্যা বাড়া মানেই ওজন বাড়া, পৃথিবীরই মোট ওজন বেড়ে যাওয়া। জুলিয়াস সিজারের (100-44 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) সময় পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র 15 কোটি। আর 2000 সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় 600 কোটি। যে-হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে 5000 সালে কেবল মানুষের ওজন পৃথিবীর ওজনের সমান হয়ে যাবে, যদি না জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায়। তবে

প্রতি বছর পৃথিবীতে কতটা মহাজাগতিক ধূলিকণা এসে জমা হয়?

লোকের ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কিছুর ওজন কমছে কিনা তা জানা যায়নি।

এ-ছাড়া এই প্রশ্নের অন্য আরেকটা উত্তরও আছে। প্রতি বছর পৃথিবীতে যে মহাজাগতিক ধূলিকণা (Cosmic dust) ও উল্কাপিণ্ড এসে পড়ছে, তাতে খুব স্বাভাবিক কারণেই পৃথিবীর ওজন বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদলের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, প্রতি বছর প্রায় 10 হাজার টন মহাজাগতিক ধূলিকণা পৃথিবীতে পড়ছে। দেখা গেছে, এর মধ্যে অনেকটাই জমা পড়েছে গ্রিনল্যাণ্ড ও তার আশেপাশের অঞ্চলে। 1984 সালের এই সমীক্ষক দলে ছিলেন ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা।

তাই বোধ হয় এ-কথা সহজেই বলা চলে, পৃথিবীর ওজন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

উল্কায় কি খুব দামী ধাতু বা খনিজ থাকে?

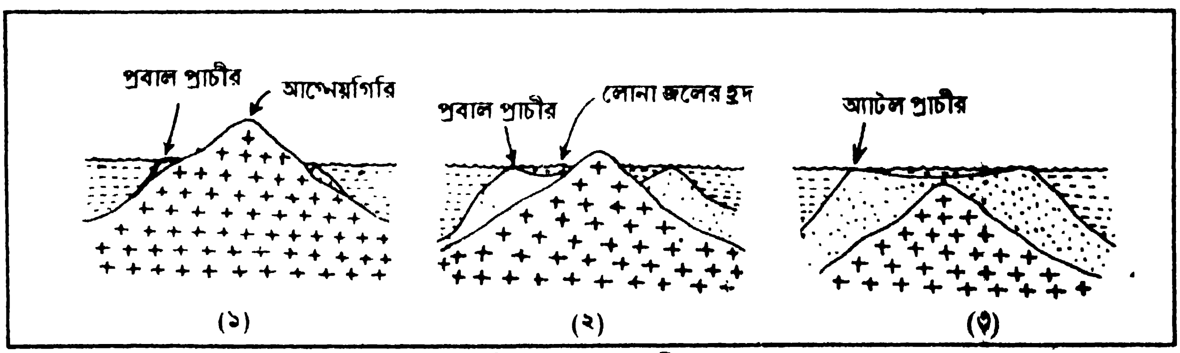
মহাকর্ষের টানে মহাকাশ থেকে বড় প্রস্তরখণ্ডের আকারে যে উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে এসে পড়ে, তা মোটামুটি ভাবে তিন ধরনের। (1) এরোলাইট (Aerolite), (2) সিডেরাইট (Siderite) ও (3) সিডেরোলাইট (Siderolite)।

এরোলাইটের উপাদান মূলত পাথর। এতে ধাতু প্রায় নেই বললেই চলে। সিডেরাইট প্রধানত লোহা, নিকেল (শতকরা 7-8 ভাগ) ও কোবাল্টের (শতকরা 0.5 ভাগ) সংমিশ্রণ—অনেকটা মিশ্র ধাতুর (Alloy) মত। এ-ছাড়া এই ধরনের উল্কায় কিছুটা গ্রাফাইট, আয়রন সালফাইড আর ফসফরাসও থাকে। এমন-কি মাঝে মাঝে হীরাও পাওয়া যায় এর মধ্যে। এই সিডেরাইট উল্কা নিয়ে একটা গল্প আছে। এক আমেরিকান চাষী এক দিন তাঁর বাড়ির ছোট বাগানে পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময়ে আকাশ থেকে বিশাল এক উল্কাপিণ্ড এসে পড়ে ওঁর পায়ের ওপর। ফলে চিরকালের মত খোঁড়া হয়ে যান বেচারা ভদ্রলোক। কিন্তু পরে ওই উল্কাপিণ্ডটি শহরে বিক্রি ক'রে পান বেশ কয়েক লক্ষ ডলার। তাই পা গেলেও পায়ের ওপর পা তুলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেন ভদ্রলোক।

সিডেরোলাইট উল্কা আসলে এরোলাইট ও সিডেরাইটের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ এতে পাথরও থাকে, আবার লোহা, নিকেলও থাকে অল্পবিস্তর।

প্রবালদ্বীপ কী করে তৈরি হয়?

নাম শুনে বুঝতে পারা যায়, প্রবালদ্বীপ (Coral island) তৈরি হয় প্রবাল নামের ছোট ছোট সামুদ্রিক কীট (Coral polyp) থেকে। এই প্রবাল কীট সমুদ্রের মধ্যে দল



তিন ধরনের প্রবাল দ্বীপ

বেঁধে থাকে। এরা যখন মারা যায়, এদেরই মৃতদেহ জমে জমে তৈরি হয় প্রবাল দ্বীপ, যা আকারে ছোট বড় মাঝারি হতে পারে।

প্রবাল কীট সাধারণত দু' জাতের। একক (Solitary) প্রবাল ও দ্বীপ গঠনকারী (Reef -building) প্রবাল। প্রথম জাতের প্রবাল পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রেই দেখা যায়, তবে এদের বসবাস একটু গভীর সমুদ্রে। সাধারণভাবে দেখা যায়, একক প্রবাল 50 থেকে 1500 ফ্যাদম (1 ফ্যাদম = 1.83 মিটার) গভীরতায় ঠাণ্ডা সমুদ্রের নীচে থাকে। কারণ শীতল সমুদ্রের গভীরে আলোর অভাবে এই জাতীয় প্রবালের বৃদ্ধি হয় কম। এই ধরনের ভঙ্গুর ও দুর্বল গঠনের প্রবালের মৃতদেহ সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে সহজেই ভেঙ্গে

প্রাণধারণের জন্যে প্রবাল কীট নিজেকে কী ভাবে রক্ষা করে?

যায়। ফলে এই প্রবাল থেকে প্রবাল দ্বীপ তৈরি হতে পাবে না।

দ্বীপ গঠনকারী প্রবালের বাস সাধারণভাবে কর্কট ও মকরক্রান্তীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 25 ফ্যাদম গভীরতার মধ্যে। এছাড়া কাদামাটি মেশানো সমুদ্রজলের উষ্ণতা সব সময় 21 থেকে প্রায় 24 ডিগরি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকা চাই। প্রসঙ্গত বলা যায়, মাত্র দু' একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আর কোনো জাতের প্রবালই লবণাক্ত সমুদ্রজল ছাড়া বাঁচতে পারে না। তবে কর্কট ও মকরক্রান্তীয় অঞ্চলের বাইরেও প্রবহমান উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে প্রবালদ্বীপের গঠন সম্ভবপর হতে পারে। অরবিসেলা (Orbicella), অ্যাক্রোপোরা (Acropora) ইত্যাদি নানা জাতের প্রবাল দিয়েই গড়ে ওঠে সিন্ধুর টিপের মত প্রবালদ্বীপ। নামে প্রবালদ্বীপ হলেও দ্বীপের সবটাই কিন্তু প্রবালের তৈরি নয়। সাধারণত যে সমুদ্রস্রোতের তেজ কম, এমন সমুদ্রে জলের তলায় লুকনো আগ্নেয়গিরি বা দ্বীপকে আশ্রয় ক'রে মালার মত বেড়ে ওঠে প্রবাল প্রাচীর (Coral reef)। এ-সব প্রবাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দ্বীপকেই সাধারণভাবে প্রবালদ্বীপ বলা হয়।

জীবিত অবস্থায় প্রাণধারণের তাগিদে প্রবালকীট নিজেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পুরু পরদা দিয়ে ঢেকে নেয়। পরে মরে গেলে এই সব ঝাঁক ঝাঁক মৃত প্রবালের স্তূপ জমে সমুদ্রে অগভীর তলে কিংবা কোনো দ্বীপের আনাচে কানাচে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে প্রবাল প্রাচীর। কচি

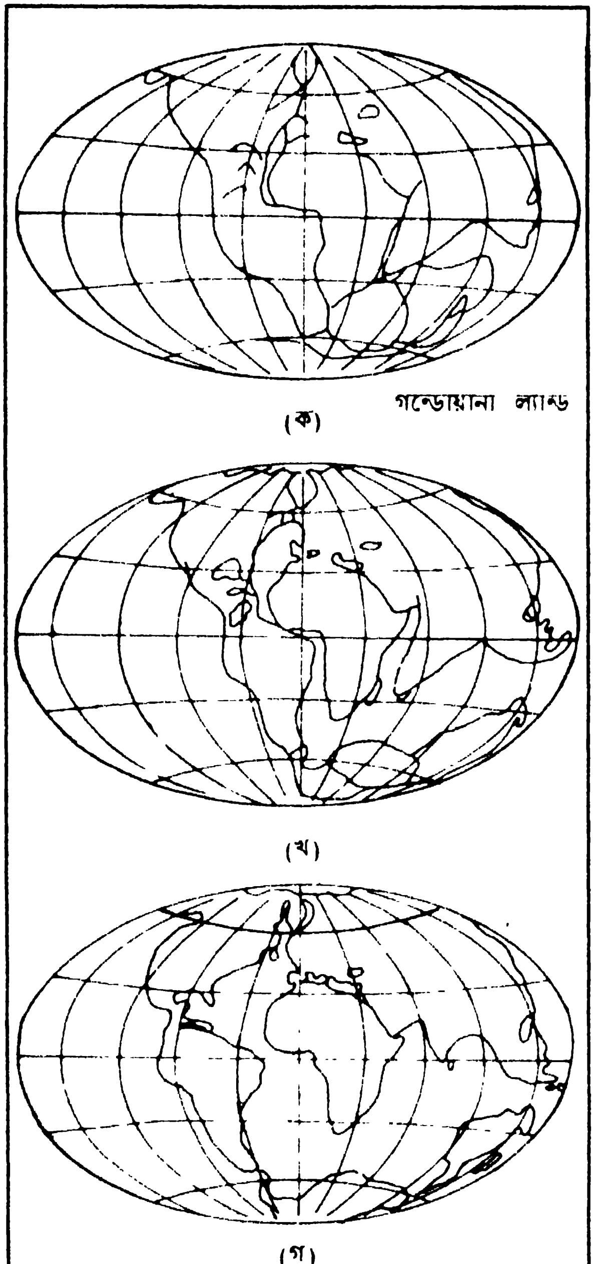
প্রবাল দ্বীপ কি শুধুমাত্র প্রবাল কীট দিয়েই তৈরি?

কিশলয়ের মত ক্রমেই প্রবালদ্বীপ বাড়তে থাকে ওপরের দিকে, তারপরে একদিন সমুদ্র-পৃষ্ঠের (Sea level) কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়। কারণ প্রবালকীট সমুদ্রজলের ওপরে পর্যাপ্ত আলো হাওয়ায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে না। প্রবালদ্বীপ গঠনের কাজে নানা ধরনের শ্যাওলা জাতীয় প্রাণী (Algae), সামুদ্রিক কম্বোজ (Mollusc) ইত্যাদির অবদানও কম নয়।

প্রসঙ্গত কয়েকটি পরিচিত প্রবালদ্বীপের নাম জেনে রাখা ভাল। আরব সাগরের বুকে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ কিংবা আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপই প্রবালদ্বীপ। আমেরিকান পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি বিকিনি দ্বীপের কথা নিশ্চয়ই অনেকেরই জানা আছে। এটি এক বিশেষ ধরনের বৃত্তাকার প্রবালদ্বীপ—যার নাম অ্যাটল (Atoll)। এ-ধরনের দ্বীপের চারপাশে থাকে প্রবাল প্রাচীর আর মাঝখানে অগভীর হ্রদ (Lagoon)। প্রশান্ত মহাসাগরের দু'টি উল্লেখযোগ্য অ্যাটল হল মারশাল দ্বীপপুঞ্জের কাওয়াজেলিন দ্বীপ ও লাইন দ্বীপপুঞ্জের খ্রিশমাস দ্বীপ।

মহাদেশগুলির চেহারা কি বরাবর একই রকম ছিল?

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে মহাদেশগুলির চেহারা চিরকাল এ-রকম ছিল না। এমন কি অবস্থানও একই জায়গায় ছিল না। এই যে ধারণা বা প্রকল্প, এর প্রবক্তা জারমান ভূ-বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনার (1912)। অবশ্য উনিই প্রথম নন, ওঁর আগেও এমন কথা বলেছিলেন আরো কেউ কেউ। ইংরেজ লেখক ও দার্শনিক ফ্রানসিস বেকন বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, অতলান্তিকের দু'পাশের তটরেখায় মিল রয়েছে। 1620 সালে তিনি বলেছিলেন, মনে হচ্ছে মিলটা নেহাত আকস্মিক নয়। 1800 সালে জারমান প্রকৃতিবিদ আলেকজাণ্ডার ফন হামবোল্ট



বিভিন্ন যুগে মহাদেশগুলির অবস্থা—ক) 20 কোটি বছর আগে খ) 6 কোটি বছর আগে গ) 10 লক্ষ বছর আগে

বলেছিলেন, অতলান্তিকের দু' পারের মহাদেশগুলি বোধহয় যুক্ত ছিল। আর মাঝখানের অংশগুলিকে খেয়ে ফেলেছে বিশাল সমুদ্রের জলরাশি। এ-ছাড়া আমেরিকান ভূ-বিজ্ঞানী ফ্রাংক টেলরের প্রকল্পটিও অনেকটা এ-রকম। তবে 'চলমান মহাদেশ' প্রকল্পটির মূল প্রবক্তা হিসেবে ওয়েগনারকেই সবাই মেনে নিয়েছেন।

পৃথিবীর মহাদেশগুলি বোধহয় একসঙ্গে জোড়া ছিল, পরে কোনো কারণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে দূরে ছিটকে গিয়েছে—ওয়েগনারের এই ভাবনার পেছনে যে যুক্তিগুলো কাজ করেছে তা হল এই। মানচিত্র খুললে দেখা যাবে, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বের তটরেখার সঙ্গে আফ্রিকার পশ্চিম তটরেখা খাপে খাপে মিলে যায়। উত্তর আমেরিকার পূর্বতট ও ইউরোপের পশ্চিমতট সম্বন্ধেও একই কথা। শুধুমাত্র তটরেখার মিলই নয়, পাহাড়-পর্বতের অবস্থান, এমনকি খোদ ভূতাত্ত্বিক উপাদানে পর্যন্ত আশ্চর্য মিল।

এই প্রকল্প অনুসারে পৃথিবীতে আজ থেকে 25 কোটি বছর আগে একটি মহাদেশ আর একটিই সমুদ্র ছিল। ওয়েগনার এই মহাদেশের নাম দিয়েছিলেন প্যানজিয়া (Pangaea), যার অর্থ স্থলভাগ, আর সমুদ্রের নাম প্যানথালসা, যার অর্থ মহাসাগর। পৃথিবীর সব মহাদেশ মিলে প্যানজিয়া ছিল এক বিশাল প্রাচীন মহাদেশ। আয়তন প্রায় 15 কোটি বর্গ কিলোমিটার। বিজ্ঞানীদের মতে, এই বিশাল প্যানজিয়া মহাদেশে ভাঙ্গন ধরে আজ থেকে প্রায় 20 কোটি বছর আগে। প্রায় 6-7 কোটি বছর আগে ইয়োসিন যুগে (Eocene) বিচ্ছিন্ন অংশগুলি অনেকটা দূরে সরে যায়। শেষে প্লায়াস্টোসিন (Pleistocene) যুগে, মাত্র 10 লক্ষ বছর আগে, মহাদেশগুলি মোটামুটিভাবে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁচেছে।

আজ থেকে 25 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ক'টি সমুদ্র ছিল?

আজকাল 'চলমান মহাদেশ' প্রকল্পের বদলে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা প্লেট টেকটনিক্‌স্ (Plate tectonics) প্রকল্পের কথা বলছেন, যা আসলে ওয়েগনারের প্রকল্পেরই সংশোধিত চেহারা। এতে ধরা হয়েছে, পৃথিবীর পিঠ তৈরি হয়েছে কতকগুলি পাত (Plate) দিয়ে, আলাদাভাবে মহাদেশ আর সমুদ্রতল দিয়ে নয়। পৃথিবীর এই পাতগুলি নানা মাপের—কোনোটা বড়, আবার কোনোটা ছোট। এক একটা পাতের মধ্যে যেমন রয়েছে মহাদেশের অংশবিশেষ, তেমনি রয়েছে সমুদ্রতলেরও খানিকটা অংশ।

হ্রদের জন্ম হয় কী ভাবে?

পৃথিবীতে নানা মাপের, চেহারার ও গভীরতার হ্রদ দেখতে পাওয়া যায়। কোনোটি মিষ্টি জলের, কোনোটি আবার নোনা জলের। সব হ্রদের জন্ম কি হয়েছে একই ভাবে?

মোটেই নয়। পৃথিবীর বুকে বহু বিচিত্র কারণেই হ্রদের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি কারণ এইরকম ঃ

1. শিলাচ্যুতি ও ভাঁজ-জাত ঃ ভূতাত্ত্বিক কারণে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ বসে গেলে অথবা উঠে এলে কিংবা কোথাও ভাঁজ পড়লে ভূপৃষ্ঠে গহ্বরের সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষত নদীগর্ভের অংশবিশেষ ওপরে উঠে বাধার সৃষ্টি হলে নদীর চড়াইয়ের দিকে হ্রদের সৃষ্টি হতে পারে। কাশ্মীর ও কুমায়ুন (নৈনিতাল, ভীমতাল, খেওয়ানতাল) অঞ্চলের বহু হ্রদ রাশিয়ার বৈকাল, আফ্রিকার টাঙ্গানিকা ও সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা ও কনস্ট্যান্স লেকের জন্ম খুব সম্ভবত এ-ভাবেই। গঙ্গার এক উপনদীর বুকে শিলাচ্যুতির ফলে বিশাল ধস নেমে আসায় সাময়িকভাবে একটি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল 1893 সালে।

2. হিমবাহ-জাত ঃ হিমবাহ-প্রধান অঞ্চলে বহু হ্রদ দেখা যায়। এর কারণ আর কিছুই নয়, চলমান হিমবাহের ঘর্ষণে পাথরের গায়ে বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই গহ্বরগুলি হিমবাহগলিত জলধারায় ভর্তি হয়ে বহু মিঠে জলের হ্রদের সৃষ্টি হয়। স্ক্যানডিনেভিয়া অঞ্চলে এ-ধরনের বহু হ্রদের দেখা মেলে। হিমালয় পর্বত অঞ্চলেও এ-রকম কিছু হ্রদ রয়েছে।

3. নদী-উপত্যকা জাত ঃ বহমান নদী ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করলে পরিত্যক্ত নদীখাতে হ্রদের উৎপত্তি হতে পারে। অনেক সময়ে এ-সব হ্রদের আকার অশ্বখুরের মত। কাশ্মীরের উলার ও ডাল হ্রদ খুব সম্ভবত ঝিলম নদীর পরিত্যক্ত খাতে গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে উপনদী বাহিত পলির পরিমাণ এত বেশি হয়ে পড়ে যে, তার ফলে মূল নদীগর্ভে পলিমাটির এক বাঁধ গড়ে ওঠে। ফলে নদীর উজানে গড়ে ওঠে হ্রদ। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, কাশ্মীরের প্রায় 4270 মিটার উঁচুতে অবস্থিত পাভকং হ্রদ এ-ভাবেই তৈরি হয়েছে। এটি লম্বায় প্রায় 65 কিলোমিটার ও চওড়ায় 3 থেকে 6.5 কিলোমিটারের কাছাকাছি।

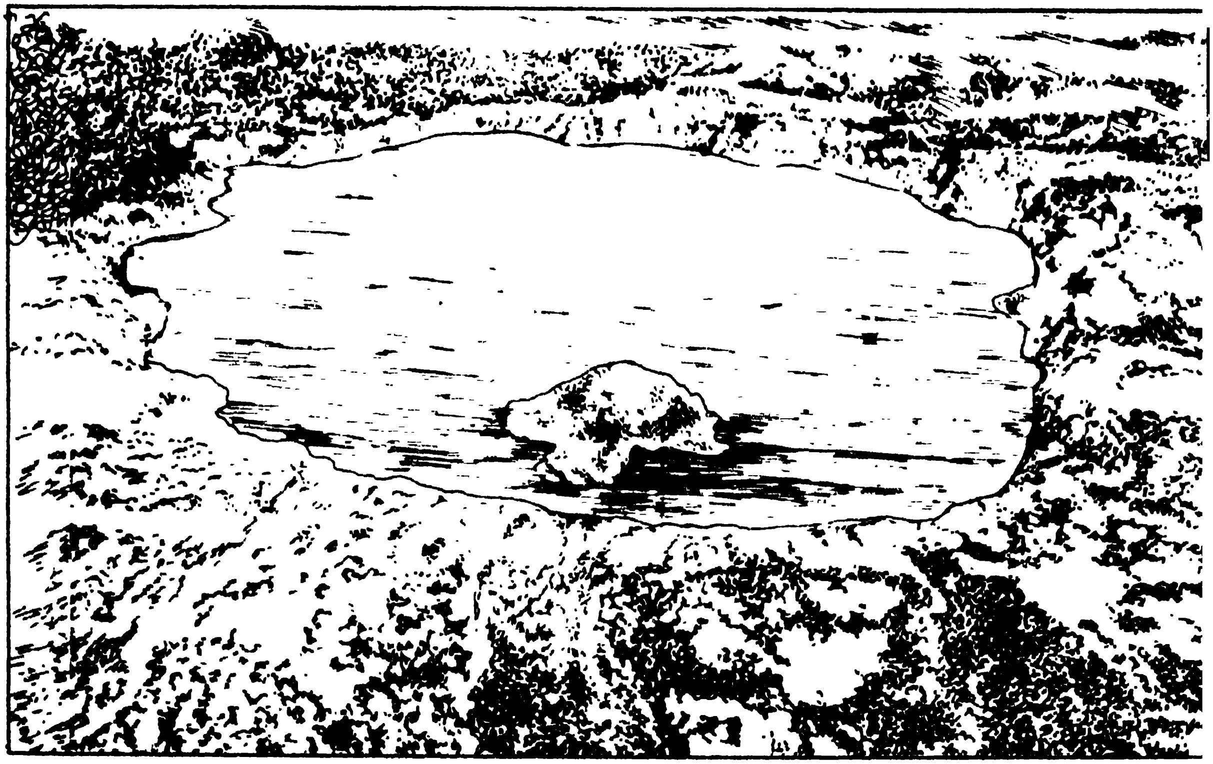
4. আগ্নেয়গিরি-জাত হ্রদ ঃ অনেক সময় মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ জলে ভর্তি হলে হ্রদের সৃষ্টি হয়। যেমন, মহারাষ্ট্রের বুলদানা জেলার লোনার হ্রদ। এটির ব্যাস প্রায় দেড় কিলোমিটার ও গভীরতা 90 মিটারের কাছাকাছি। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো ভূ-বিজ্ঞানী বলেছেন, আকাশ থেকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষেই বোধহয় লোনার হ্রদের বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপের ব্যাভেরিয়া, ইতালি ও আইসল্যাণ্ডের কিছু কিছু হ্রদের জন্মও এইভাবে।

5. সমুদ্র-জাত হ্রদ ঃ পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু নোনা জলের হ্রদ। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে অবস্থিত এই হ্রদের জলের স্বাদ নোনা বলে ভূ-বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এ হ্রদের জন্ম সমুদ্র থেকে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাধ্যমে বয়ে আসা বালি থেকে ধীরে ধীরে বাঁধের সৃষ্টি হয়, তার পরে ক্রমশ এগুলি সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় নোনা জলের হ্রদ কোনটি?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নোনা জলের হ্রদ কাসপিয়ান সাগর রাশিয়া ও কাজাগস্থানের সীমানায় অবস্থিত। এটি আকারে এতই বড় যে, একে সাগর বলেও অভিহিত করা হয়, যদিও এটি একটি হ্রদ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে কাসপিয়ান সাগর যে এককালে সমুদ্রের অংশ ছিল, এ-তত্ত্ব কোনো ভূ-বিজ্ঞানী অবিশ্বাস করেন না। কেরালার মালাবার উপকূলের বহু কয়াল (Lagoon শব্দের মালয়ালম প্রতিরূপ), তামিলনাড়ুর কালিকট হ্রদ ও ওড়িশার চিলকা এ-জাতীয় হ্রদের মধ্যেই পড়ে।

6. মরুভূমির হ্রদ ঃ মরুভূমির বুকে প্রচণ্ড বালি ঝড়ের ফলে মাঝে মাঝে গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই গহ্বরগুলিই জলে ভর্তি হয়ে বর্ষাকালে হ্রদের আকার নেয়। তবে মরু অঞ্চলে অবস্থিত বলে বছরের অন্যান্য সময়ে এগুলি শুকনোই থাকে। সিন্ধু ও পশ্চিম রাজস্থানে এ-ধরনের বহু হ্রদের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজস্থানের সম্বর হ্রদের উৎপত্তি বোধ হয় এ-ভাবেই হয়েছে—যদিও কেউ কেউ মনে করেন, এটি এককালে সাগরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই হ্রদটি মাত্র এক মিটারের কিছু বেশি গভীর ও বর্ষাকালে এর আয়তন দাঁড়ায় প্রায় 200 বর্গ কিলোমিটার।



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি আগ্নেয় হ্রদ। আগে এটি ছিল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ

7. দ্রবণ-জাত হ্রদ ঃ কোনো কোনো সময়ে চুনাপাথর জাতীয় শিলায় দ্রবণের ফলে বড় গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই সব গহ্বর জলে ভর্তি হয়ে হ্রদের জন্ম দেয়।

পাহাড় থেকে ধস নামে কেন?

বর্ষার সময়ে দার্জিলিং বেড়াতে গেলে চোখে পড়ে, পাহাড়ের ঢালে মাঝে মাঝে ল্যাম্পপোস্ট, গাছ, পাথর বা সিমেণ্টের থাম উল্টে ভেঙে পড়ে রয়েছে। এরই নাম ধস। কিন্তু কেন ঘটে এ-সব ঘটনা?

পাহাড়ী অঞ্চলে ধস বা মৃত্তিকাস্খলন একটি সাধারণ ঘটনা। তাই পাহাড়ী অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই বর্ষার জলের প্রভাবে ঢাল বেয়ে ছোটখাটো মাটির ধস নামতে দেখা যায়। এই ধরনের ধসে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই মাটির ধসের জার্মান নাম শুটরুটশুনগেন। দার্জিলিংয়ের আশেপাশে (যেমন হিল কার্ট রোডে) প্রায়ই এই ধরনের ধসের ফলে রাস্তাঘাট বসে যায় ও যাতায়াতের অসুবিধে হয়। কিন্তু এই মাটির ধসই যখন বিরাট আকারে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নামে, তখন তা এক মূর্তিমান বিভীষিকার মত নেমে এসে ধ্বংস করে পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা বসতি। এই ধরনের বিধ্বংসী মাটির ধসের বৈজ্ঞানিক নাম শুট্‌সটুর্জ্‌।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, প্রবল বর্ষণ ছাড়াই শিথিল ও অসংলগ্ন পাথরের চাঁই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আচমকা নীচে গড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের শিলাবিচ্যুতির ফলে পাহাড়ী রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি, সব কিছুরই দারুণ ক্ষতি হয়। এই ধরনের শিলাবিচ্যুতিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, রক স্লিপ বা ফেল্‌স্‌ক্লিপ্‌ফ্‌। এই শিলা-বিচ্যুতি প্রসঙ্গে ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, পাথরের স্তরগুলি যখন পাহাড়ের ঢালের দিকে ঝুঁকে থাকে, তখন বিপদের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত রক স্লিপ ঘটতে পারে। পাথরের চাঁই ধীরে ধীরে আলগা ও শিথিল হয়ে এলে হঠাৎ একদিন বিশাল পাথরের ধস মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে খসে পড়ে নীচের দিকে। হিমালয় পাহাড়ে এ-ধরনের শিলাবিচ্যুতির ঘটনা তো আকছার ঘটছে। 1893 সালে উত্তর হিমালয়ের গোহনার কাছে বিরহী গঙ্গা উপত্যকায় পাহাড় ভেঙে

একবার বিরাট ধসের সৃষ্টি হয়েছিল।

পাহাড়ের অতিরিক্ত খাড়াই, ভূমিকম্প, পাথরের সংপৃক্তি (Saturation) বা অতিপৃক্তি (Oversaturation), পাথরের ফাঁকে ফাঁকে হিমকণার অবস্থিতি, অথবা পাহাড়ের ভেতরে গোপন গুহার অবস্থান ইত্যাদি নানা কারণেও শিলা-বিচ্যুতি ঘটে থাকে পাহাড়ী অঞ্চলে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই ধরনের পাথুরে ধসের নাম রকফল্‌স্‌ বা ফেল্‌সর্টুর্জ্‌। 1934 সালের ভূমিকম্পে দার্জিলিংয়ের বহু জায়গায় ভয়াবহ আকারে এই ধরনের পাথরের ধস নেমেছিল।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, পাহাড়ী অঞ্চলে যে-কোনো ধসের মূল কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, মাটি ও পাথরের অতিপৃক্তি, পাহাড়ের ঢালে মাটি ও পাথরকে ধরে রাখবার মত যথেষ্ট উদ্ভিদের অভাব, পাহাড়ের অতিরিক্ত ঢাল, শিলার দুর্বল গঠন ইত্যাদি; বিশেষত পাহাড়ের ঢালের ওপর ধস

পাহাড়ের ঢাল কত বেশি হলে ধস নামার আশঙ্কা থাকে?

অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। যেমন, পাহাড়ের ঢাল চল্লিশ ডিগরির বেশি হলে বিপদের সম্ভাবনা বেশি। তবে পাহাড়ের ঢাল পঁচিশ ডিগরির কম হলে ক্ষতিকর ধসের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

'কাবেরী' নদীর নামের অর্থ কী? 'নর্মদা' শব্দটির মানেই বা কী?

কাবেরী নদীর নামটি এসেছে তামিল শব্দ থেকে। তামিলে 'কা' শব্দের অর্থ বাগান আর 'এরী' শব্দের মানে সরোবর। সব মিলিয়ে কাবেরী শব্দের অর্থ বাগানযুক্ত সরোবর।

প্রসঙ্গত বলি, সাবরমতী নদীর দু'পারে বাস করতো বহু সাবর অর্থাৎ হরিণ। তাই এই নাম। তাম্রপর্ণী নদীর অর্থ তামার জল। নামকরণ ঠিকই হয়েছে, কারণ নদীগর্ভে পলির রঙ লাল। মাছকুণ্ড নদীর নামকরণের কারণ ওই নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত।

নর্মদা শব্দের অর্থ গভীর নীল জল। কথিত আছে, অমরকণ্টক পাহাড়ে বিশ্রামরত ব্রহ্মার চোখ থেকে ঝরে পড়ে দু'ফোঁটা চোখের জল। সেই চোখের জল থেকে তৈরি হয়েছে পাহাড়ের এক পাশে শোন, অন্য পাশে নর্মদা। বাস্তব ক্ষেত্রেও শোন ও নর্মদা নদীর মাঝখানে রয়েছে একটি শৈলশিরা। নর্মদা নদীর জলকে মনে করা হয় খুবই পবিত্র। পুণ্যলোভাতুরদের ধারণা, সরস্বতীতে তিন দিন, যমুনা

তাম্রপর্ণী নদীর নামের অর্থ কি?

নদীতে সাত দিন ও গঙ্গায় যেখানে মাত্র একবার ডুব দিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, সেখানে নর্মদা নদীর জল দর্শন করলেই সেই পুণ্য অর্জিত হয়।

বন্যা কেন হয়?

প্রতি বছর বর্ষাকালে ও তারপর খবরের কাগজে পড়ি বা নিজের চোখেও দেখি, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা হচ্ছে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, প্রায় বছরই ঘটে এ-ধরনের বন্যা। কিন্তু কেন ঘটে এমন বন্যা? কোনো রাস্তাই কি নেই এই বন্যার হাত থেকে বাঁচবার?

প্রাকৃতিক নিয়মে কোনো নদীতেই সব সময়ে একরকম জল থাকে না। দিন মাস বছর হিসেবে নদীখাতে জলপ্রবাহ বাড়ে ও কমে। জটিল আবহাওয়াগত কারণেও নদীর জলপ্রবাহে তারতম্য ঘটে।

নদীখাতের জল ধারণের যা ক্ষমতা, তার চেয়ে বেশি জল এলে স্বাভাবিক নিয়মেই নদীতে বন্যা হবে। তবে বন্যার তীব্রতা কতটা হবে, তা নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, স্থায়িত্ব এবং ভূমির অবস্থার ওপরে। মরুভূমি ও আধামরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না, ফলে ওখানে বৃষ্টির জল নিকাশের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তাই এ-সব অঞ্চলে হঠাৎ খুব বৃষ্টি হলে জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকায় মাঝে মাঝেই বন্যা হয়ে থাকে।

অন্যান্য যে সব কারণে বন্যার তীব্রতা বাড়ে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিক্ষয় ও নদীতে পলি মাটির পরিমাণ বৃদ্ধি। এর ফলে নদীখাতে জল বহনের ক্ষমতা কমে যায়, নদীর গতিপথ আঁকাবাঁকা (Meandering) হ'য়ে পড়ে। ভূমিকম্প, ধস, প্রধান ও অন্যান্য উপনদীগুলিতে একই সময়ে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি, জোয়ারের জন্য নদীপ্রবাহের

ধীর গতি হওয়া, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাও বন্যার তীব্রতা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়।

নদীখাতে কতটা জল প্রবাহিত হবে, তা প্রধানত নির্ভর করে ভূমির ঢাল, গাছপালার প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং বৃষ্টিপাত কতটা সময় ধরে কতখানি হচ্ছে, তার ওপরে। যদি ভূমির ওপরে ঘাসের আচ্ছাদন থাকে, তবে জলপ্রবাহের পরিমাণ মোট বৃষ্টিপাতের মাত্র শতকরা 4 ভাগ হতে পারে, কিন্তু ভুট্টাক্ষেত অঞ্চলে জলপ্রবাহের পরিমাণ খুব সহজেই শতকরা 30-32 ভাগ পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। নিবিড় অরণ্য ভূমির ওপরে জলপ্রবাহ কমিয়ে দেয়। কারণ গাছের শিকড় মাটিকে শক্ত ক'রে রাখে আর এই মাটি বৃষ্টির জল সহজেই শুষে নেয়।

প্লাবন-ভূমিতে (Flood plain) খুব সহজেই জনবসতি গড়ে ওঠে, কারণ এই ভূমি অত্যন্ত উর্বর ও আরো কিছু সুবিধে আছে এখানে। তাই মিশর গড়ে উঠেছে নীল নদের প্লাবন-ভূমিতে, ব্যাবিলন শহর টাইগ্রিস নদীর প্লাবন-ভূমিতে। উত্তর ভারতের অনেক শহরও গড়ে উঠেছে গঙ্গা নদীর দু'পাশে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, কেবল মাত্র গঙ্গা নদীর অববাহিকাতেই ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় 35 ভাগ বসবাস করে।

ভারতের নদীগুলির প্লাবন-ভূমিগুলিকে সার্বিক পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তোলা হচ্ছে না। ফলে প্রতি বছরই বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতি

মরুভূমিতে কি বন্যা হতে পারে?

বৃদ্ধির আর একটা কারণ এই, জনসংখ্যার চাপে নদীর প্লাবনভূমিতে অনেক জনপদ গড়ে উঠেছে। প্লাবনভূমি যখন শুধুমাত্র কৃষির কাজে ব্যবহৃত হত, তখন ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম ছিল।

সব ক'টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে বন্যাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। শুধু ধ্বংসের দিক থেকে নয়, খরচের দিক থেকেও। কারণ বন্যা-নিরোধক ব্যবস্থাগুলি খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। যেমন, 1980 সালে ভারতে বৃষ্টিপাত ঠিকঠাক হয়েছে, তেমন বড় আকারের কোনো বন্যা হয়নি, তবু সে-বছর প্রায় 1 কোটি 12 লক্ষ হেক্টর জমিতে জলপ্লাবন ঘটেছে, 5 কোটি মানুষ বন্যার কবলে পড়েছে। আর ক্ষয়-ক্ষতির মোট পরিমাণ প্রায় 484 কোটি টাকা।

বক্রেশ্বরের উষ্ণ-প্রস্রবণে কী কী খনিজ আছে?

আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে স্নান করবার। এ-ভাবে হয়তো কারো কারো শরীরের চর্মরোগ সেরে গেছে বা কমেছে। ব্যাস, ওইটুকুই। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, এ-সব উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে কী থাকে, কী ভাবে থাকে? বক্রেশ্বরে এক উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। এর জলে কী কী খনিজ পাওয়া যায়?

বীরভূম জেলার উষ্ণ প্রস্রবণে যে-সব খনিজ আছে, তার মধ্যে প্রধান হল সিলিকন ডাই অক্সাইড (৪7 পি পি এম) [1 পি পি এম = 10 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ], সোডিয়াম (120 পি পি এম), পটাশিয়াম (2.৪ পি পি এম), ক্যালসিয়াম (1.96 পি পি এম), ম্যাগনেসিয়াম (0.46 পি পি এম), কার্বোনেট (35 পি পি এম), বাইকার্বোনেট (46 পি পি এম), সালফেট (2৪ পি পি এম), ক্লোরিন (৪৪ পি পি এম) এবং ফ্লোরিন (৪ পি পি এম)।

যে-সব ধাতু বা খনিজ খুব সামান্য পরিমাণে আছে, তার মধ্যে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, জার্মেনিয়াম, টাংস্টেন, রুবিডিয়াম, লিথিয়াম, তামা, বোরন ইত্যাদি।

উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে যে সব গ্যাস রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আছে নাইট্রোজেন (91%), মিথেন (3.5%), ইথেন (2.4%) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (0.1%)। এ-ছাড়া হাইড্রোজেন সালফাইড ও হিলিয়াম গ্যাস খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেছে।

জলে দ্রবীভূত অবস্থায় তেজস্ক্রিয় গ্যাস রেডন থাকার ফলে উষ্ণ-প্রস্রবণের জল প্রকৃতিতে খুবই তেজস্ক্রিয় (Radioactive)। জলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থের মোট পরিমাণ 410 পি পি এম।

রাসায়নিক দিক থেকে প্রস্রবণের জল ভিকি ওয়াটারের সমতুল্য। তাই পেটের নানা গণ্ডগোলের নিরাময়ে এই জল প্রায় ধন্বন্তরির মত। দ্রবীভূত রেডনের জন্য শরীরের বিপাকীয় (Metabolism) কাজে এই জল কাজে লাগতে পারে।

গাছ থেকে কয়লা হতে কতটা সময় লাগে?

গাছ থেকে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে কয়লার জন্ম, এ খবর নতুন নয়। কিন্তু এর জন্যে কতটা সময়ের প্রয়োজন? জলা জায়গায় গাছপালা সঞ্চিত হবার সময় হিসেব ক'রে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, 30 সেন্টিমিটার বেধের বিটুমিনাস কয়লার স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ জমতে সময় লাগে 125 থেকে 150 বছর, আর অ্যানথ্রাসাইট কয়লার জন্য 175 থেকে 200 বছর।

গাছপালা থেকে কয়লা তৈরির প্রসঙ্গে বার্জিয়াস নামে এক বিজ্ঞানী বলেছেন, পিট কয়লা থেকে বিটুমিনাস কয়লায় (সাধারণ কয়লা) পরিণত হতে সময় লাগে প্রায় 80 লক্ষ বছর। আর গাছপালা থেকে পিট কয়লা হতে প্রায় 2-3 লক্ষ বছর প্রয়োজন।

কলকাতার তলায় কি পিট কয়লা পাওয়া যায়?

সত্যি বলতে কি, পিটকে ঠিক কয়লা বলা যায় না। তবে যেহেতু উদ্ভিদ পদার্থ থেকে পরিবর্তনের ফলেই পিটের উৎপত্তি এবং পিট পর্যায়ের ভেতর দিয়ে কয়লার জন্ম, তাই একে কয়লার মধ্যে রাখা হয়েছে।

একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, খোদ কলকাতা শহরের নীচে প্রায় 6 থেকে 9 মিটার গভীরতায় বালি ও মাটির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পিটের স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশেষত বেলেঘাটায় লেক খননের সময়ে ও হুগলি নদী অঞ্চলেই মিলেছে পিটের স্তরের সন্ধান। এই পিটের মধ্যে হেরিটিয়েরা লিটোরালিস (সুন্দরী গাছ), উইলো, সাইপ্রেস, ফ্রাগমাটিটিস, ফিকাশ করডিফলিয়া (ডুমুর গাছের পাতা) ও অন্যান্য গাছের সমন্বয় দেখা গেছে। এই তথ্য থেকে কলকাতার প্রাগৈতিহাসিক চেহারার হয়তো কিছুটা কল্পনা করা যায়। অর্থাৎ কলকাতা ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা এক গা ছমছমে জলা জংলা জায়গা।

কয়লা থেকে পেট্রোলিয়াম তৈরি করা যায় কি?

সারা পৃথিবীতেই পেট্রোলিয়ামের ঘাটতি। চাহিদার তুলনায় জোগান কম। তবে তুলনামূলক ভাবে পেট্রোলিয়ামের চেয়ে কয়লার মজুত বেশি, বিশেষত ভারতবর্ষে। তাই যদি কোনো উপায়ে কয়লা থেকে পেট্রোলিয়াম তৈরির ব্যবস্থা করা যায়, তবে খুব ভাল হয়। কিন্তু সত্যিই কি সে-রকম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব?

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বার্জিয়াস ও ভেরবিন নামে দু'জন রসায়নবিদ্ উঁচুমাত্রার তাপ ও চাপে অনুঘটকের (Catalyst) সাহায্যে বিশেষ ধরনের কয়লার সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের মিলন ঘটিয়ে কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম তৈরি করেন। পরে এই কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন তাপমাত্রার পাতন প্রক্রিয়ায় (আংশিক পাতন) পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন তেল সবই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জার্মানিতে পাঁচটি কারখানা থেকে এই পদ্ধতিতে বছরে 2 লক্ষ টন পেট্রোল উৎপাদিত হত। এই বার্জিয়াস পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য 15 শতাংশের কম ছাইয়ের ভাগযুক্ত কয়লা প্রয়োজন। কয়লাকে কম তাপে গরম করলে যে আলকাতরা তৈরি হয়, তার শতকরা প্রায় 98 ভাগই এই বার্জিয়াস পদ্ধতিতে কৃত্রিম পেট্রোলিয়ামে পরিবর্তিত করা সম্ভব। তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ কয়লাতেই ছাইয়ের পরিমাণ বেশি। তাই এ-দেশের কয়লার জন্য ফিশার ট্রপ্‌স্ পদ্ধতিই উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি কারখানায় এই পদ্ধতিতে শুধু কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম নয়, আরো বেশ কিছু পেট্রোকেমিক্যাল্‌সও তৈরি হয়। আমাদের দেশের কয়লার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও এই পদ্ধতিটি খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত কয়লার মাত্র 20 শতাংশ কৃত্রিম তেলে পরিণত হয়।

আমাদের দেশে অণ্ডাল অঞ্চলের কয়লা থেকে কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম তৈরি করার সম্ভাবনা যাচাই করবার জন্য বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও আমেরিকার কোপার্স কোম্পানির সহযোগিতায় 1948 সালে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষক দলের অভিমত অনুকূলে থাকলেও পরবর্তী কালে নানা কারণে প্রচেষ্টাটি পরিত্যক্ত হয়।

প্রাচীন মিশরে মমি সংরক্ষণের জন্য কোন তেল ব্যবহার করা হত?

প্রাচীন মিশরে মমি সংরক্ষণের জন্যে নানা জিনিসের মধ্যে মিশরীয়েরা যে-তেল ব্যবহার করতেন, তা হল খনিজ তেল।

ভারতে পেট্রোলিয়াম প্রথম পাওয়া গেল কী ক'রে?

1849 সাল। তখন অসমে লিডো থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত রেল লাইন পাতার কাজ চলছে। কাজ করবার সময়ে এক দিন আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা দেখতে পেলেন, ওদের একটা হাতির পায়ের তলায় কালো চটচটে কী একটা জিনিস লেগে আছে। নেহাতই কৌতূহলের বশে হাতির পায়ের দাগ ধরে ডোবায় পৌঁছলেন ওঁরা। আর সেই ডোবাতেই ছিল পেট্রোলিয়াম। জায়গাটার নাম ডিগবয়। তারপর 1499 সালে প্রতিষ্ঠিত হল আসাম অয়েল কোম্পানি।

'বোম্বে হাই' কী?

পেট্রোলিয়ামের প্রসঙ্গে গত দশ-বারো বছর ধরে 'বোম্বে হাই'-এর নামটা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় খবরের কাগজে। কেউ কেউ বলেন, 'বোম্বে হাই' সমুদ্রের মধ্যে। তবে কি সমুদ্রের জল থেকে তেল পাওয়া যাচ্ছে?

'বোম্বে হাই' নামটির সঙ্গে সত্যিই পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে। 'বোম্বে হাই' বোম্বাই শহর থেকে 120 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিম আরব সাগরের মধ্যে একটি অঞ্চল। আসলে বোম্বাইয়ের উপসাগরীয় অঞ্চলে বলে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের সময় এই অঞ্চলটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ হয় 'বোম্বে হাই'। অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম পাওয়ার ব্যাপারে এই অঞ্চলটির হাই পোটেনশিয়াল (খুবই সম্ভাবনাময়) আছে। সত্যিই বোম্বে হাইয়ের তেলকূপ থেকে প্রথম পেট্রোলিয়াম বেরিয়ে আসে 1974 সালের 19 ফেব্রুয়ারি। এখন বোম্বে হাই থেকে বছরে প্রায় 200 লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাচ্ছে। তবে সমুদ্রের জল নয়, সমুদ্রের মহীসোপান (Shelf) অঞ্চলের শিলা-স্তরের ভেতর থেকে খনিজ তেল উত্তোলিত হচ্ছে।

কলকাতার মাটির তলায় কি পেট্রোলিয়াম আছে?

দশ-পনেরো বছর আগে প্রায়ই শোনা যেত কলকাতার মাটির তলায় নাকি আছে বিরাট পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার। আর সে জন্য প্রায়ই কলকাতার আশেপাশে খননের কাজ হয়েছে। কথাটি কি সত্যি?

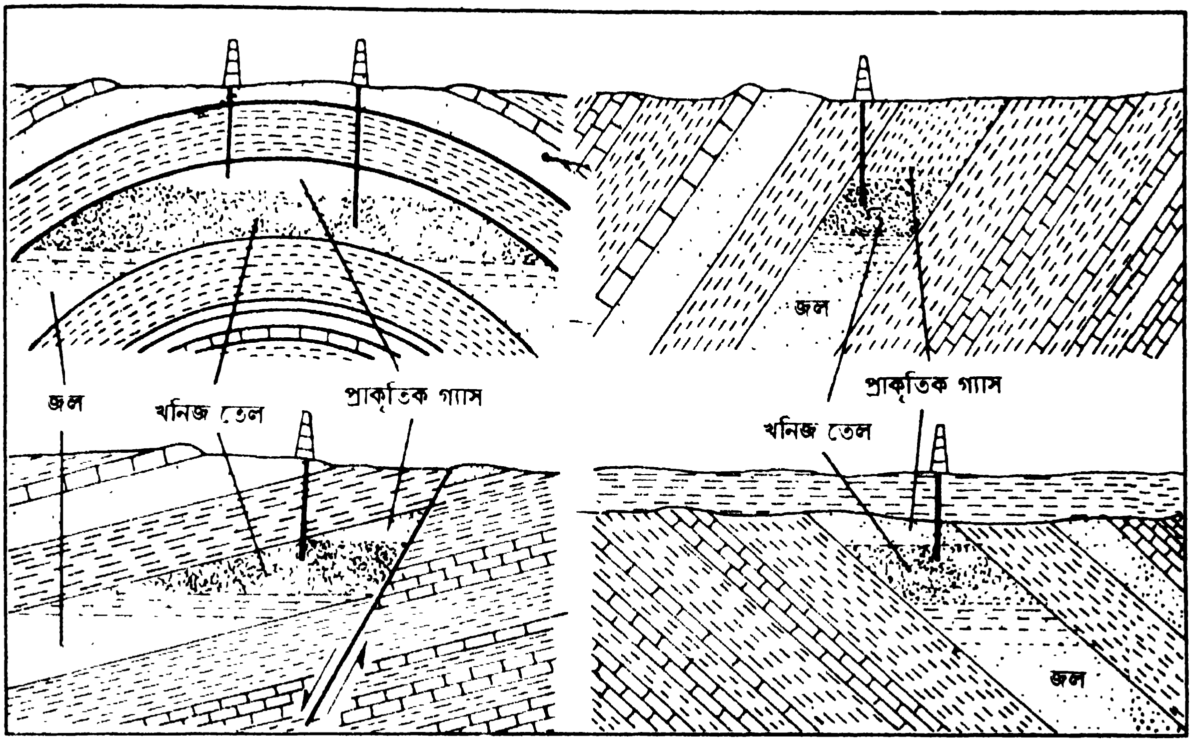
কলকাতার মাটির তলায় পেট্রোলিয়াম আছে কিনা সে-বিষয়ে পেট্রোলিয়াম বিশেষজ্ঞরা স্থিরনিশ্চয় না হলেও অনেকটাই আশাবাদী। তাই তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের (ONGC) পক্ষ থেকে কলকাতার যে বিস্তীর্ণ জায়গায় সমীক্ষা চালানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মানিকতলা, বিবেকানন্দ রোড, চিৎপুর, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, চৌরঙ্গী, ময়দান অঞ্চল ও বেহালা। এই শহরে বহু লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস। তাই এই সমীক্ষায় গতানুগতিক পদ্ধতি মোটেই ব্যবহার করা হয়নি, গ্রহণ করা হয়েছে অত্যন্ত আধুনিক এক ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা যা এই ধরনের শহরের পক্ষে খুবই উপযোগী। এ-জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে চারটি আধুনিক 'ভাইব্রেটার' আনা হয়েছিল। গভীর রাতে 'ভাইব্রোসিস' পদ্ধতিতে কাজ চালালেও কলকাতার মানুষ মোটেই টের পাননি, কখন এই শহরের পেট্রোলিয়ামের জন্য সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তাই নয় কি!

এই যন্ত্রে যে-সব তথ্য ধরা পড়েছে তার বিশ্লেষণ চলছে দেরাদুনে, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের সদর দপ্তরের আধুনিক কমপিউটারে।

পৃথিবীর বুক থেকে পেট্রোলিয়াম কি একদিন শেষ হয়ে যাবে?

আজকাল প্রায় সব কাজেই পেট্রোলিয়াম-জাত জিনিসপত্র লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোলিয়ামের চাহিদাও প্রায় প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে। ফলে পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হওয়ার আশঙ্কা। সত্যিই কি তাই? এ-ভাবে চললে আর কতদিন চলবে আমাদের পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার?

সারা পৃথিবীতে এখন যে পরিমাণ (আনুমানিক 13000 কোটি মেট্রিক টন) পেট্রোলিয়াম মজুত আছে, তা ফুরোতে নাকি আর বড় জোর 100 বছর! তবে আরো পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া গেলে এই সময়ের সীমা যে আরো বাড়বে, তাতে সন্দেহ কি! কিন্তু পেট্রোলিয়াম এমন ধরনের খনিজ পদার্থ, যা একবার ফুরিয়ে গেলে আর নতুন করে তৈরি করা যাবে না। তখন মানুষ তার জ্বালানি পাবে কোত্থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই খুঁজছেন।



পৃথিবীর বুকে পাথরের স্তরের ভেতরে ড্রিলিং ক'রে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস বের করার প্রক্রিয়া

রসায়নবিদেরা অবশ্য মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে পেট্রোলিয়ামের বদলে ব্যবহার করতে হবে সৌরশক্তি ও

পৃথিবীতে এখন কত পেট্রোলিয়াম মজুত আছে?

অ্যালকোহল—যা খুব সহজেই আখের রস থেকে তৈরি করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, অ্যালকোহল থেকে প্রায় সব পেট্রো-কেমিক্যাল্‌সই তৈরি করা সম্ভব। আর পৃথিবীর বুক থেকে পেট্রোলিয়াম ফুরিয়ে গেলেও মাটি আর জল শেষ হবে না। তাই আখ এবং আখের রসও থাকবে ততদিন।

পৃথিবীতে প্রথম তামার খনির পত্তন হয়েছিল কবে?

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে নব্যপ্রস্তর যুগের পর এসেছিল তাম্র যুগ, যখন মানুষ প্রথম তামার আকরিক গালিয়ে বের করেছিল তামা। সে আজ বহুদিন আগের কথা। এ-ভাবেই একদিন পত্তন হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম তামা-খনিটির। কিন্তু কত দিন আগের ঘটনা সেটি?

পুরনো ইতিহাস ঘাঁটলে জানতে পারা যায়, পৃথিবীর প্রথম তামার খনিটির পত্তন হয় সম্ভবত মিশরের মাডি শহরে খ্রিস্টপূর্ব 3300 সালে। মাডি শহরের অবস্থান বর্তমান কায়রোর 10 কিলোমিটার দক্ষিণে।

মাডি শহরের তামার খনির পত্তনের ভেতর দিয়ে শুরু হয়েছিল ধাতব যুগের।

তামার পাত্রে সবুজ মরচে পড়ে কেন?

লোহার পাত্র বাইরে খোলা অবস্থায় রাখলে তার ওপরে ঘন বাদামী রঙের মরচে ধরে। কিন্তু তামার পাত্র রেখে দিলেও কি মরচে ধরে? তার রঙ কি বাদামী, নাকি অন্য রকম?

রোদ জল হাওয়ার সংস্পর্শে তামা পরিণত হয় কপার কার্বোনেট ও হাইড্রক্সাইডে [সংকেত $CuCO_3$, $Cu(OH)_2$]। এই খনিজটির নাম ম্যালাকাইট। রঙ সবুজ। ফলে তামার মরচে লোহার মরচের মত লাল নয়, সবুজ।

কিছু কিছু নদীর বালিতে সোনা পাওয়া যায় কেন?

আগেকার দিনে মাঝে মাঝে গল্প শোনা যেত, কে নাকি নদীর বালিতে সোনার তাল পেয়ে বিরাট বড়লোক হয়ে গেছে। এটা-কি নিছক গল্প, নাকি এতে সত্যের ছোঁয়া আছে খানিকটা?

এ গল্পে সত্যের ছোঁয়া আছে, কারণ বেশ কিছু নদীর বালিতে সোনা পাওয়া গেছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ-বিহারের সুবর্ণরেখা নদী। বহুদিন ধ'রেই এই নদীর বালি থেকে সোনা পাওয়া যাচ্ছে। এমন কি বহু মানুষ এই নদীর বালি ছেঁকে সোনা বের ক'রে জীবিকা নির্বাহ করছেন। 1889 সালে সুবর্ণরেখার একটি উপনদীতে, সোনাপেটের কাছে, 28.6 গ্রাম ওজনের বিশুদ্ধ সোনার পিণ্ড বা নাগেট (Nugget) পাওয়া গিয়েছিল। যিনি ওটি পেয়েছিলেন, তিনি ওই সোনার পিণ্ডটি বিক্রি ক'রে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যান। শুধু সুবর্ণরেখা নয়, বহু নদীর বালিতেই সোনা পাওয়া যায়। আসামের সুবর্নসিরি, লোহিত, ডিহিং, বুড়ি ডিহিং, জংলু পানি ইত্যাদি নদীর বালি চালাচালি করে বেশ কিছু পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে। ইউরোপীয় পর্যটক ট্র্যাভেরনিয়ারের বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রায় 12,000 থেকে 20,000 লোক এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং 1751 থেকে 1768 সালের ভেতরে এই অঞ্চলগুলি থেকে প্রতি বছর প্রায় 50 কিলোগ্রাম সোনা রাজা রাজেশ্বর সিংকে খাজনা দেওয়া হত।

নদীর বালির সঙ্গে মিশে থাকা এই সোনার জন্ম কিন্তু নদীতে নয়, সোনাযুক্ত কোয়ার্টজ রীফে, অর্থাৎ সোনার আকরিকের পাহাড়ে। কোনো নদী যখন এই পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পথ ক'রে নেয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই এই পাহাড়ের পাথর ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ে নদীর খাতে। ক্রমে পাথর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোনা মিশে যায় নদীর বালির সঙ্গে। আর সেই নদী কালক্রমে হয়ে ওঠে কিংবদন্তির নদী। মানুষ ভিড় করে এই নদীর আশেপাশে, যদি কোনো সময়ে পাওয়া যায় প্রার্থিত সোনার পিণ্ড।

নদীর বালি থেকে সোনা উদ্ধার করার কাজ বহু প্রাচীন কাল থেকে চালু থাকলেও এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব নামমাত্র, কারণ এ-ভাবে উদ্ধার করা সোনার পরিমাণ খুব বেশি নয়।

কোন খনিজ আলট্রা-ভায়োলেট (অতিবেগুনী) রশ্মিতে ঝকঝক ক'রে ওঠে?

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে অনেক কিছুরই রঙ বদলে যায়। বদলে যায় অনেক খনিজের রঙ-রূপ। এই রশ্মির প্রভাবে কোন খনিজ ঝকঝক করে?

এই রশ্মিতে যে-খনিজ ঝকঝক ক'রে ওঠে, তা হল টাংস্টেনের আকরিক শিলাইট। এর রাসায়নিক সংকেত ক্যালসিয়াম টাংস্টেট ($CaWO_4$)। এতে WO_3-এর পরিমাণ শতকরা 80.6 ভাগ, টাংস্টেন (সংকেত W) শতকরা 64 ভাগ। এই খনিজ আলট্রা-ভায়োলেট বা অতিবেগুনী আলোয় নীল আভায় ঝলসে ওঠে। অনেক পাথরের ভেতর থেকে শিলাইট চিনে নেবার এটি সবচেয়ে ভাল উপায়।

চোখে যে সুরমা লাগানো হয়, তা আসলে কী?

চোখের সৌন্দর্য বাড়াতে যে কালো ঝকঝকে গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়, অনেকে বলেন তা এক ধরনের খনিজ। সত্যিই কি তাই?

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষজন গুঁড়ো স্টিবনাইট খনিজ চোখের সুরমা হিসেবে ব্যবহার করছে। খনিজ হলেও এটি কিন্তু খুবই নরম, ফলে চোখের পাতায় লাগাতে কোনো অসুবিধে হয় না। স্টিবনাইট অ্যানটিমনি ধাতুর প্রধান খনিজ। এর রাসায়নিক নাম অ্যানটিমনি সালফাইড (সংকেত Sb_2S_3)। এতে অ্যানটিমনির পরিমাণ শতকরা 71 4 ভাগ।

আগুনে পোড়ে না এমন জিনিস তৈরিতে কোন খনিজ লাগে?

ঝট ক'রে আগুন লাগলে প্রথমেই যে-কথাটা মনে পড়ে, তা হল আগুনে পোড়ে না এমন জামা-কাপড় তৈরি করা কি সম্ভব? দমকল-কর্মীরা যখন আগুন নেভানোর কাজ করেন, তখন তারা কোন ধরনের পোশাক পরেন? যাঁরা সার্কাসে আগুন নিয়ে খেলা দেখান, তাঁরাই বা কী রকমের জামা-কাপড় পরে থাকেন? এ-সব প্রশ্নের উত্তর একটাই। অ্যাসবেস্টস খনিজের সুতোয় তৈরি জামা-কাপড়ে আগুন লাগে না।

গ্রিক ভাষায় 'অ্যাসবেস্টস' শব্দের অর্থ 'যা সুতোর মত' (Fibrous)। অ্যাসবেস্টস হল সেই খনিজ যা সুতোর মত

দেখতে। সুতোর মত দেখতে হলেও অ্যাসবেস্টসের টেনসাইল (Tensile) শক্তি লোহার মত। তা ছাড়া অ্যাসিডে ভিজলেও অ্যাসবেস্টস কোনোরকম বিক্রিয়া করে না। রোমান সাম্রাজ্যের সেই সোনালী দিনগুলিতে প্রদীপের পলতে হিসেবে ব্যবহৃত হত অ্যাসবেস্টস। মিশর এবং চিনদেশেও অ্যাসবেস্টসের মাদুর বোনা হত, যা আগুনে পোড়ে না। ফরাসি সম্রাট প্রথম চার্লস তো বন্ধু-বান্ধব অভ্যাগতদের ভেলকি দেখিয়েছিলেন অ্যাসবেস্টসের টেবিল ঢাকনা জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিয়ে। সেই ঢাকনা আগুনে পুড়ল না দেখে অতিথিরা সবাই তাজ্জব।

দমকল কর্মীরা যখন আগুন নেভানোর কাজ করেন তখন তাঁরা কোন ধরনের পোশাক পরেন?

অ্যাসবেস্টসের সুতো মূল পাথর থেকে আলাদা করে চাদর, ফিতে অথবা কাগজের আকারে বানানো চলে, যা থেকে প্রয়োজন মত তাপ-নিরোধক আস্তরণ বানানো সম্ভব। এই ধরনের পাথর ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক আর ওড়িশায় পাওয়া যায়।

'প্লাসটার অফ প্যারিস' কোন খনিজ থেকে তৈরি হয়?

অনেকের বাড়িতেই আছে শ্বেতশুভ্র মূর্তি—গৌতম বুদ্ধ, যিশুখ্রিস্ট বা অন্য কোনো মহাপুরুষের। মূর্তি দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু অনেকেই হয়তো জানি না এ-মূর্তি তৈরি হয়েছে এক ধরনের খনিজ থেকে, যার ডাক নাম 'প্লাসটার অফ প্যারিস'। নামটা এসেছে বোধহয় এই কারণে যে, প্যারিসের শিল্পীরাই প্রথম এই প্লাসটারে গড়েছেন মূর্তি অথবা অন্য শিল্পসামগ্রী। এই প্লাসটারের অন্য নাম জিপসাম। একটি বিশেষ গুণ বা ধর্মের জন্য শিল্পের জগতে জিপসামের খুবই কদর। অল্প তাপে (130 ডিগরি সেলসিয়াস) পোড়ালে জিপসামের ভেতরকার শতকরা 15 ভাগ জলই উবে যায়, আর এই পোড়া জিপসামকে ঠাণ্ডা ও গুঁড়ো ক'রে জল মিশিয়ে ছাঁচ ইত্যাদি তৈরির কাজে সুন্দর ব্যবহার করা যায়। এই পোড়া জিপসামই 'প্লাসটার অফ প্যারিস' নামে ভাস্কর শিল্পীদের কাছে একটি শিল্প-মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

জিপসামের রাসায়নিক পরিচয় ক্যালসিয়াম সালফেট, সঙ্গে কিছুটা জল (সংকেত $CaSO_4, 2H_2O$)। তিন ধরনের জিপসাম প্রকৃতিতে পাওয়া যায়—সেলেনাইট, আলাবাসটার ও সাটিনস্পার। সেলেনাইট কেলাসিত প্রকৃতির, স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছাভ। পিণ্ডকার জিপসামের নাম আলাবাসটার, আর সিলকের সুতোর মত আঁশযুক্ত জিপসামের নাম সাটিনস্পার। পোড়া জিপসাম শুধুমাত্র ছাঁচ তৈরির কাজেই লাগে না, লাগে আরো হরেক রকম কাজে। দেয়াল, মেঝে, ছাদ প্লাসটার করা, সেরামিক, দাঁত-চিকিৎসা, ভাঙ্গা হাত-পা প্লাসটার করা ইত্যাদি কাজেও এর খুব চাহিদা।

বাইবেলে 'ব্রিমস্টোন' নামে যে পাথরের কথা রয়েছে, তা আসলে কী?

খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে 'জেনেসিস' গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে পৃথিবী ও স্বর্গের উৎপত্তি সম্পর্কে। সেই গ্রন্থেই উল্লেখ আছে, 'ব্রিমস্টোনের'। শব্দটির উৎস বোধহয় 'বার্ন' ও স্টোন' কথা দু'টি থেকে, অর্থাৎ যে পাথর জ্বলে। বাইবেলে এই খনিজের নাম থাকার অর্থ প্রাচীন সময় থেকেই মানুষ জানতো ব্রিমস্টোনের কথা। জানতো এর নানা রকমের ব্যবহার।

'ব্রিমস্টোন' আসলে গন্ধক। হলুদ রঙের এই জিনিসটি রসায়ন শিল্পের জগতে অপরিহার্য। নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির কাজে গন্ধকের জুড়ি নেই। তার মধ্যে এক নম্বর হল সালফিউরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড তৈরির জন্য পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা 65 ভাগ গন্ধকই ব্যবহার করা হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সার—সুপার ফসফেট ও অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরির কাজে। কাশ্মীরের পুগা উপত্যকায় (লাডাক) কাঁচা গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে উষ্ণ প্রস্রবণের সঙ্গে মিশে থাকা গন্ধক জমা পড়েছে আশেপাশের পাথরের ফাটলে ও গ্রন্থির ভেতরে। তবে ভারতে খননের উপযোগী তেমন কোনো গন্ধকের ভাণ্ডার নেই। তাই দেশের প্রয়োজনের গন্ধক প্রায় সবটাই আসে বিদেশ থেকে। অবশ্য তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ

রিফাইনারিতে পেট্রোলিয়াম শোধনের সময়ে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মিশে থাকা বেশ কিছু গন্ধক উদ্ধার করা হচ্ছে।

অ্যাসিড পড়লে কোন পাথরে সহজেই বিক্রিয়া হয়? এই পাথর ভারতে কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?

চুনাপাথর। চুনাপাথর কথাটি এসেছে চুন-পাথর থেকে অর্থাৎ যে পাথর থেকে চুন তৈরি হয়। চুনাপাথর এমন এক ধরনের পাললিক শিলা, যা থেকে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অকসাইড বেরিয়ে যায় আর চুন (সংকেত CaO) পড়ে থাকে। তবে চুনাপাথরের রাসায়নিক পরিচয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (সংকেত $CaCO_3$)।

ভারতবর্ষে চুনাপাথরের ভাণ্ডার অজস্র। আরকিয়ান থেকে শুরু ক'রে টারশিয়ারি পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি ভূ-তাত্ত্বিক যুগের (Geological age) পাথরেই প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর পাওয়া যায়। ভাল জাতের চুনাপাথরের সন্ধান মেলে ভারতবর্ষের প্রায় সব ক'টি প্রদেশেই। তবে পশ্চিমবঙ্গে ভাল জাতের চুনাপাথর পাওয়া যায় না। এখানে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং পুরুলিয়া (ঝালদা) জেলায় নীচু মানের কিছু চুনাপাথর পাওয়া যায়, যা চুন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পুরুলিয়া জেলার চুনাপাথর ভাল জাতের চুনাপাথরের সঙ্গে মিশিয়ে সিমেন্ট তৈরির কাজে লাগানো চলতে পারে। এরই ভিত্তিতে পুরুলিয়ায় একটি সিমেন্ট কারখানা তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার মধুকুণ্ডায় স্থাপিত এই কারখানায় বছরে প্রায় 2.5 লক্ষ মেট্রিক টন সিমেন্ট তৈরি করা যাবে।

চিনামাটি আসলে কী? এটি আমাদের কী কাজে লাগে?

সুন্দর কাজ করা চিনামাটির কাপ, প্লেট, ডিশ সকলের বাড়িতেই আছে। কিন্তু এই কাপ প্লেট তৈরি হয়েছে কী ভাবে, কোন খনিজের উপাদান রয়েছে এদের শরীরে?

এদের মূল কিন্তু চিনামাটি। নামে মাটি হলেও চিনামাটি আসলে কয়েক ধরনের খনিজ পদার্থের মিশ্রণ। তবে এর মূল উপাদান কেওলিনাইট। রাসায়নিক সংকেত $Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$। কেওলিনাইট ছাড়া চিনামাটির মধ্যে অন্যান্য যে-সব খনিজ পদার্থ রয়েছে তা হল মন্টমরিলোনাইট, ইলাইট, ডিকাইট, ন্যাকরাইট, হ্যালয়সাইট, অ্যানকসাইট ইত্যাদি। তবে বাজারে যে-চিনামাটি বিক্রি হয়, তার মধ্যে থাকে আরো নানারকম অবাঞ্ছিত পদার্থের মিশেল। অন্যান্য ধরনের মাটির চেয়ে চিনামাটি বেশি নমনীয়, নরম, সাদা ও জলে গুললে সহজেই জলের সঙ্গে মিশে যায়।

সিরামিক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল চিনামাটি। কাপ, ডিশ প্লেট, পাত্রের মত বিদ্যুৎ শিল্পের বহু যন্ত্রপাতি তৈরিতেও চিনামাটি একান্ত অপরিহার্য। এ-ছাড়া কাগজ, কাপড়, লিনোলিয়াম, রবার, চামড়া, রঙ ইত্যাদি শিল্পের হরেক রকম প্রয়োজনও মেটায় চিনামাটি। শুনলে অবাক লাগবে, পাউডার, ওষুধপত্র ইত্যাদি তৈরিতেও নিষ্ক্রিয় পদার্থ (Filler) হিসেবে চিনামাটি ব্যবহার করতে হয়। সিরামিক শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী চিনামাটিতে অভ্র, কোয়ার্ট্জ ও লোহাজাত পদার্থ যথাসম্ভব কম থাকা উচিত। উঁচু মানের চিনামাটি অভঙ্গুর ও নমনীয়। একে ইচ্ছেমত যে-কোনো আকার দেওয়া যায়।

কোন মাটি তাপে সহজে গলে না?

বালতির উনুনের মাটি যদি অল্প তাপেই গলে তরল হয়ে যেত, তবে রান্নাবান্নার যে-হাল হত, সে-কথা কি আর নতুন ক'রে বলতে হবে! তাই এই উনুন তৈরিতে এমন মাটি ব্যবহার করতে হবে, যা অল্প তাপে সহজে গলে যায় না। প্রকৃতিতে এমন মাটি দুর্লভ নয়। এর নাম দুর্গল মাটি। নাম থেকেই মালুম হয়, এই মাটি গলানো সহজ কাজ নয়। মোদ্দা কথা, দুর্গল মাটি (Fire clay) তাকেই বলে যা সহজে আগুনের আঁচে গলে যায় না। এই ধরনের মাটির ভেতরে আয়রন অক্সাইড, চুন, ম্যাগনেশিয়া ও ক্ষার-জাতীয় পদার্থ কম। বেশি তাপে এই মাটির ভেতর থেকে শুধু জল বেরিয়ে গেলেও অন্য কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে না। দেখা গেছে ভাল জাতের দুর্গল মাটি মোটামুটি 1580 ডিগরি সেলসিয়াস তাপের নীচে গলে না।

দুর্গল মাটির প্রধান ব্যবহার তাপ সহনকারী ইঁট তৈরিতে। বেশি তাপে কাজ করবার বকযন্ত্র, ক্রুসিব্‌ল্ বা পাত্র ইত্যাদি তৈরিতেও দুর্গল মাটি লাগে। তবে নীচু

জাতের দুর্গল মাটি লাগানো হয় বাথটাব, পাইপ ও নানা ধরনের স্যানিটারি জিনিসপত্র বানাতে। এ-ছাড়া এ-কথা সকলেরই জানা, দুর্গল মাটির ইঁট লাগে নানা মাপের ও প্রয়োজনের উনুন বা চুল্লি তৈরি করতে।

দুর্গল মাটির উৎপত্তি দু'ভাবে। জলের নীচে অ্যালুমিনা-সমৃদ্ধ পলিমাটি স্তরীভূত হয়ে পাললিক দুর্গল মাটি সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের দুর্গল মাটির উৎপত্তি অ্যালুমিনা-সমৃদ্ধ প্রাচীন শিলার ওপরে রোদ-বৃষ্টি-বাতাসের বিক্রিয়ায়।

ব্যারাইট কী? এর নামকরণ কী ভাবে হল?

ব্যারাইট বা ব্যারাইট্‌স্ নামের উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'Barys' থেকে, যার অর্থ ভারী। নামকরণ ঠিকই হয়েছে, কারণ ব্যারাইট (Barite বা Barytes) সত্যিই খুব ভারী খনিজ। এর রাসায়নিক সংকেত বেরিয়াম সালফেট ($BaSO_4$)। সাধারণভাবে এই খনিজের রঙ সাদা এবং এর কেলাস (Crystal) খুব স্বচ্ছ নয়। তবে মাঝে মাঝে অন্য রঙের—যেমন হালকা হলুদ বা গোলাপীও হতে পারে।

ব্যারাইট খনিজ বেশ ভারী হওয়ার দরুণ 'ড্রিলিং মাড' তৈরির কাজে লাগে। পাথরের বুকে ড্রিলিং করার জন্য এর প্রয়োজন। এ-ছাড়া অন্যান্য টুকিটাকি প্রয়োজনের মধ্যে আছে রঙ তৈরি, নানারকম রাসায়নিক জিনিসপত্র বানানো, কাঁচ, রবার ও চামড়া শিল্পের চাহিদা মেটানো।

গেরুমাটি কী?

গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীর দেখা পাননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু আমরা সবাই কি জানি সন্ন্যাসীর পরনের কাপড় রাঙানো হয়েছে কোন রঙে?

এই রঙ আসলে গেরুমাটি, যা পাওয়া যায় প্রকৃতিরই বুকে। গেরুমাটি বা ওকার (Ochre) এক ধরনের বিয়োজিত (Decomposed) খনিজ, যার মূল উপাদান লোহার আকরিক—যেমন, হেমাটাইট, লিমোনাইট বা এদের মিশ্রণ। বিয়োজিত নরম হেমাটাইট (সংকেত Fe_2O_3) বা রুজ হল লাল রঞ্জক আর লিমোনাইট (সংকেত $2Fe_2O_3$, $3H_2O$) হল গাঢ় বাদামী রঞ্জক। এদের সঙ্গে সাদা রঙ মিশিয়ে নানা ধরনের রঙ তৈরি সম্ভব। এই প্রাকৃতিক রঞ্জকের সঙ্গে মিশে থাকে বেশ খানিকটা মাটি, যার পরিমাণ শতকরা 5 থেকে 95 ভাগ হতে পারে।

ওকারের ভেতরে লোহার পরিমাণ কমে গেলে ক্রমশ

গেরুমাটির গুণ কী?

'সিয়েনা' (ইতালি দেশ থেকে নামকরণ) তৈরি হয়, যার রঙ বাদামী থেকে কমলা। আবার এর সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ মিশলে রঙ হয় 'অ্যামবার' (বাদামী থেকে কালো বাদামী)। এই ধরনের প্রাকৃতিক রঞ্জক জলে ধুয়ে যায় না। ফলে খুব সহজেই রঞ্জক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। স্টুকো, সিমেন্ট, লিনোলিয়াম, রবার, প্লাসটিক, এনামেল ইত্যাদি রঙিন করার কাজে লাগে এই ওকার। এই ধরনের প্রাকৃতিক রঞ্জকের উৎকর্ষে মাঝে মাঝে হেরফের দেখা গেলেও রঙগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী। আলট্রা-ভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মি এই রঙের প্রলেপ ভেদ করতে পারে না। গেরুমাটি থেকে তৈরি রঙের প্রলেপ লোহা ও আসবাব-পত্রকে জল-হাওয়ার ক্ষয় থেকে বাঁচায়।

আবিরের ভেতরে যা চিকচিক করে, তা আসলে কী?

হোলি বা দোল খেলার সময়ে আবির নিয়ে খেলি আমরা সবাই। বন্ধুর গায়ে আবির মাখাতে মাখাতে আমাদের অনেকেরই নজর এড়ায় না, আবিরের মধ্যে চিকচিক করছে কী সব দানা। এগুলি আসলে কী?

আবিরের ভেতরে যা চিকচিক করে, তা আসলে অভ্র—এক ধরনের খনিজ। এই অভ্রের তৈরি আচ্ছাদনে ঢাকা হয় পাড়াগাঁয়ের হ্যাজাক বাতি। একজন রসায়নবিদের চোখে অভ্র অবশ্য অ্যালকালি অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, সঙ্গে থাকে হাইড্রোক্সিল। অভ্র দেখতে স্বচ্ছ কাঁচের মত, তবে পাতলা পাতার মত পরতে পরতে খুলে ফেলা যায়। প্রকৃতিতে রয়েছে সাত রকমের অভ্র। তবে এদের মধ্যে মাসকোভাইট ও বায়োটাইট প্রকৃতির বুকে সহজেই মেলে।

প্রধানত অভ্র বিদ্যুৎ কুপরিবাহী এবং উচ্চ তাপমাত্রাতেও সে এই কুপরিবাহীতা ধর্ম বজায় রাখতে পারে। এ-ছাড়া এটি তাপেরও কুপরিবাহী। বিদ্যুৎ শিল্পের কাজকর্মে অন্তরক (Insulator) হিসেবে ব্যবহার প্রায় একচেটিয়া।

এক মিলিমিটার পুরু অভ্রের পাতা অক্লেশে 1000 এমন-কি 1500 ভোল্ট তীব্রতার বিভব প্রভেদ সহ্য করতে পারে। এ-ছাড়া অভ্রের পাত থেকে 0.0006 সেন্টিমিটার বেধের অতি মিহি পাতলা পাতা বের করা সম্ভব। এই গুণটির জন্য বহু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ভেতরেও অভ্রের পাতা ব্যবহার করা হয়।

সিঁদুর কী?

হিন্দু বিবাহিত মেয়েরা বেশির ভাগই লাল সিঁদুর পরেন। কিন্তু এই সিঁদুর আসলে কী?

আগেকার দিনে সিঁদুর হিসেবে 'সিনাবার' নামের একটি খনিজ ব্যবহৃত হত, রাসায়নিক পরিচয় মারকিউরিক সালফাইড (সংকেত HgS)। সিনাবার খনিজটি নরম এবং এর গুঁড়োর রঙ লাল। তবে ভারতে এই খনিজটি বিশেষ পাওয়া যায় না। আজকাল অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে সিঁদুর তৈরি হচ্ছে।

ট্যালকাম পাউডার কোন পাথর থেকে তৈরি হয়?

ঝকঝকে দোকানের শো-কেসে সাজানো বিভিন্ন কোম্পানির রকমারি পাউডারের কেস দেখে মুগ্ধ হই আমরা। মনের আনাচে কানাচে প্রশ্ন ভিড় করে, কী করে তৈরি হয় এই ট্যালকাম পাউডার?

ভাল জাতের ট্যালকাম পাউডার তৈরি হয় ট্যাল্‌ক্ (Talc) খনিজ থেকে। ট্যাল্‌ক্ গুঁড়ো করে তৈরি বলেই এর নাম ট্যালকাম পাউডার। পাউডার তৈরির কাজে ট্যাল্‌ক্ ব্যবহৃত হয়, কারণ এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে নরম খনিজ। ইতিহাস পড়ে জানা গেছে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই প্রসাধন হিসেবে ট্যাল্‌কের পাউডার ব্যবহৃত হত মিশর, রোম, গ্রিস এবং মধ্য-প্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে, যদিও সারা ইউরোপে এর ব্যবহার প্রসারিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

ট্যাল্‌ক্ (বা স্টিয়াটাইট) থেকে তৈরি পাউডারই সবচেয়ে ভাল, তবে কেওলিন বা চিনামাটি থেকে যে-পাউডার তৈরি হয়, তা-ও খারাপ নয়। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে যে-সস্তার পাউডার বিক্রি হয়, তাতে নানা ধরনের ভেজাল থাকে। যেমন, কোয়ার্টজ, ক্যালসাইট, ডলোমাইট, ম্যাগনেসাইট, সারপেনটিন, ক্লোরাইট, ট্রেমলাইট, অ্যানথোফিলাইট ইত্যাদি। এ-সব কম দামী শক্ত খনিজকেও ভাল ক'রে গুঁড়ো ক'রে পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ট্যাল্‌কের সঙ্গে এ-ধরনের ভেজাল শরীরের পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

ট্যাল্‌কের রাসায়নিক পরিচয় হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট। হালকা সবুজ ট্যাল্‌কের গঠন অনেকটা অভ্রের মত, তবে খুব নরম আর সাবানের মত মোলায়েম। পিণ্ডাকার ট্যাল্‌কের নাম স্টিয়াটাইট। মহেঞ্জোদড়োতে স্টিয়াটাইটের তৈরি নানা জন্তু-জানোয়ারের (বিশেষত ষাঁড়) ছবির সিলমোহর পাওয়া গেছে। অশুদ্ধ প্রকৃতির স্টিয়াটাইটের নাম পটস্টোন। বিশুদ্ধ গুঁড়ো ট্যাল্‌কের নাম ফ্রেঞ্চ চক, যা প্রধানত পাউডার তৈরির কাজে লাগানো হয়। পিণ্ডাকার ট্যাল্‌ক্, অর্থাৎ স্টিয়াটাইট লাগে চুল্লী, রান্নাঘরের বেসিন কিংবা অ্যাসিড নিয়ে কাজ-কর্ম করবার পাত্র তৈরিতে। এ-ছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্লেটে লেখবার পেনসিলও এই স্টিয়াটাইট বা পটস্টোন থেকে তৈরি।

হীরা কি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত খনিজ?

পৃথিবীতে পাথর, লোহা, ইস্পাতের মত কত শক্ত শক্ত জিনিস রয়েছে। হীরা কি এ-সব শক্ত জিনিসের চেয়েও কঠিন জিনিস?

খনিজের কাঠিন্য মাপবার জন্য বিজ্ঞানী ফ্রিডরিখ মোজ -এর একটি স্কেল (Mohs' scale) রয়েছে। সেই স্কেল অনুযায়ী পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাকৃতিক জিনিসের মধ্যে হীরাই সবচেয়ে কঠিন। কোনো কৃত্রিম পদার্থ হীরার মত কঠিন হলেও হতে পারে, কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক পদার্থ নয়। তাই শক্ত যে কোনো জিনিস, তা সে হীরা বা শক্ত ইস্পাতই হোক, কাটতে লাগে হীরা। নিরেট শক্ত পাথরের স্তর ভেদ করতে যে-ড্রিলিং যন্ত্র লাগে, তার 'বিট' অর্থাৎ দাঁত তৈরি করতে প্রয়োজন হয় হীরার। তবে এই হীরা দ্যুতিময় ঝকমকে হীরা নয়, অস্বচ্ছ ও দাগওলা হীরা। কারণ এই হীরা অলংকার বা মণিরত্ন হিসেবে ব্যবহারের অযোগ্য।

হীরা কি ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয়?

আজকাল তো শোনা যায়, হরেক রকম জিনিস তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে। কিন্তু হীরা কি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি

করা যায়?

হ্যাঁ, হীরা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব। সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে হীরা তৈরি করেছিলেন ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদ্ জে বি হান্নে 1880 সালে। উনি কতগুলি লোহার টিউবে মোম, বোন অয়েল আর লিথিয়াম ধাতু মিশিয়ে খুব উঁচু তাপমাত্রায় ফুটিয়েছিলেন। 80 বার পরীক্ষার মধ্যে 77 বার বিস্ফোরণ ঘটে ও তারপর কিছু কেলাস পাওয়া যায় লোহার টিউবের মধ্যে। তখন স্বীকৃতি না মিললেও পরে জানা যায়, হান্নেই প্রথম কৃত্রিম হীরা তৈরি করেছিলেন।

এরপর 1953 সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের ল্যাবরেটরিতে ডঃ রিগনার লিলজেবাড কৃত্রিম হীরা তৈরি করতে পেরেছিলেন। পরের বছর 1954 সালে নিউ ইয়র্কে জেনারেল ইলেকট্রিকের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম হীরা তৈরি হয়। এই হীরার রঙ ছিল ধূসর সবুজ ও হলুদ। এই কৃত্রিম হীরা তৈরির জন্য একটি বিশেষ ধরনের কার্বনের যৌগ পদার্থকে 15 লক্ষ অ্যাটমসফিয়ার (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যে চাপ রয়েছে তার প্রায় 15 লক্ষ গুণ বেশি) চাপে ও 2760 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করানো হয়। এই তাপ ও চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্য, ভূপৃষ্ঠের প্রায় 380 কিলোমিটার নীচে যে-অবস্থা আছে, সেই রকম পরিবেশ তৈরি করা। এই তাপ ও চাপেই প্রকৃতিতে হীরা তৈরি হয়।

কয়েক বছর পরে 1957 সালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও বাজারে কৃত্রিম হীরা বিক্রি শুরু হয়।



হীরাটি আসল না নকল?

'কোহিনূর' নামের বিশ্ববিখ্যাত হীরাটি কী ভাবে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?

কোহিনূরের কথা মনে পড়লে ইতিহাসের পাতাগুলি যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। 1739 সালে পারস্যের রাজা দিল্লীর মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে পরাজিত ক'রে যে-বিরাট ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যান, তার মধ্যে ছিল বিশ্ববিখ্যাত হীরা কোহিনূর। পরে এটি আফগান রাজা শাহ সুজার কাছ থেকে কেড়ে নেন পাঞ্জাবের অধিপতি রণজিৎ সিং। এটি এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। কিংবদন্তী রয়েছে 'কোহিনূর' নামের হীরাটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ গোদাবরী নদীর পাড়ে মসুলীপট্টমে পেয়েছিলেন। আরো শুনতে পাওয়া যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৫৬ সালে এই 'কোহিনূর' হীরা ছিল উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে। তবে হীরা-বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এটি আবিষ্কৃত হয় অন্ধ্রপ্রদেশে গোলকুণ্ডার কাছে কলুর খনিতে। প্রথম অবস্থায় 'কোহিনূর' হীরার ওজন ছিল 793 ক্যারাট, কাটবার পর ওজন দাঁড়ায় 191 ক্যারাট (আগে 1 ক্যারাটের মান ছিল 0.2053 গ্রাম। কিন্তু এখন প্রমাণ মান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্যারাটের প্রবর্তন হয়েছে। এই হিসেব অনুযায়ী 1 ক্যারাট=0.2 গ্রাম)।

কোহিনূরের ওজন কত?

হীরা কি কালো হয়?

হীরার রাসায়নিক উপাদান কার্বন। অর্থাৎ কালো কয়লার মুল উপাদান আর হীরার মুল উপাদান একই। তাহলে হীরার রঙই বা কয়লার মত কালো নয় কেন! হীরার রঙ কি কালো হয় না?

শুধু কালো কেন, হীরা যে কোনো রঙেরই হতে পারে। পরিমাণের দিক থেকে হিসেব করলে দেখা যায়, প্রকৃতির বুক থেকে যত হীরা পাওয়া যায়, তার মধ্যে মাত্র শতকরা কুড়ি ভাগ মণিরত্ন শ্রেণীর, বাদবাকি সবটাই খরচ হয়

যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে। দামের দিক থেকে অবশ্য মণিপাথর হিসেবে ব্যবহৃত হীরার মূল্য অনেক বেশি। যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে যে হীরা ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের রঙ ময়লা হলুদ থেকে কালো। প্রকৃতি অনুযায়ী এ-রকম হীরা তিন ধরনের—

1. বোর্ট ঃ কালো অথবা ময়লা হলুদ রঙের হীরা যা পরিপূর্ণ কেলাস হিসেবে বেড়ে ওঠেনি।

2. ব্যালাস ঃ খুব শক্ত গোল আর অপরিণত কেলাসের আকৃতির হীরা।

3. কার্বনাডো বা কালো হীরা ঃ খুব শক্ত আর সম্ভেদহীন (অর্থাৎ সূক্ষ্ম ফাটলহীন) কালো অস্বচ্ছ হীরা।

পেনসিলের শিস কী থেকে তৈরি হয়?

ড্রয়িং অথবা লেখা—যাই হোক না কেন—স্কুলের পড়াশোনার একটা বড় অংশই সারতে হয় পেনসিলে। কত রকম, কত রঙের পেনসিল! কোনো পেনসিলের শিস নরম, আবার কোনোটা বা শক্ত। এক এক ধরনের শিস এক এক কাজে লাগে। কিন্তু কী ক'রে তৈরি হয় এই পেনসিলের শিস?

পেনসিলের শিস তৈরি হয় গ্রাফাইট খনিজের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে। খুব সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দী থেকেই পেনসিলের সঙ্গে গ্রাফাইটের এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

গ্রাফাইট দেখতে ঝকঝকে কালো, ওজনে হালকা, মসৃণ, নরম, সহজেই কাগজের ওপর দাগ পড়ে। হাতে ধরলে সাবানের মত পিছল মনে হয়। রাসায়নিক দৃষ্টিতে গ্রাফাইট আসলে কার্বন। শুধুমাত্র পেনসিলের শিস নয়, অন্যান্য নানা কাজেও গ্রাফাইটের কদর। কারণ গ্রাফাইট বিদ্যুৎ ও অনেক তাপ সইতে পারে (এর গলনাংক 3000 ডিগরি সেলসিয়াস) ও অ্যাসিডের সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া করে না। কাঁসা, তামার মত ধাতু গলানোর পাত্র, ব্যাটারি, ইলেকট্রোড তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কার্বন। পারমাণবিক চুল্লিতে নিউট্রনের ক্রিয়াকে শ্লথগতি করবার জন্যও গ্রাফাইট কাজে লাগে। প্রকৃতিতে গ্রাফাইট পাওয়া যায় রূপান্তরিত শিলায়।

পোখরাজ কী?

পোখরাজের আংটির কথা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু এই পোখরাজ কী, কোন উপাদানে তৈরি এই রত্ন?

পোখরাজ এক ধরনের মণিপাথর। বৈজ্ঞানিক নাম টোপাজ। এর রাসায়নিক সংকেত $Al_2SiO_4(F_4OH_2)$। রঙ জলের মত, হালকা হলুদ কিংবা হালকা নীল হতে পারে। নীচু মানের টোপাজ অবশ্য ঘষে মসৃণ করার কাজে (Abrasive) লাগানো হয়।

টোপাজ সাধারণভাবে পাওয়া যায় গ্র্যানাইট বা পেগমাটাইট পাথরের ভেতরে। এর জন্ম নিউম্যাটোলিটিক প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ গলিত ম্যাগমার গ্যাস থেকে সরাসরি কেলাসিত হয়ে টোপাজের উৎপত্তি।

ভারতে ভাল জাতের টোপাজ পাওয়া যায় বিহারের সিংভূম ও মহারাষ্ট্রের ভানডারা জেলায়।

কুরুবিন্দম কী?

তামিল শব্দ কুরুবিন্দম বলতে বোঝায় ইংরেজি কোরানডাম (Corundum) নামের একটি খনিজ। তেলুগু ভাষায় এরই নাম কুরুন্দীম। কোরানডামের রাসায়নিক উপাদান অ্যালুমিনিয়াম অকসাইড। কাঠিন্য হীরার চেয়ে একটু কম। তবে হীরার মত মণিপাথর হিসেবে সকলের কাছে এর খুবই কদর।

স্বচ্ছ লাল রঙের কোরানডাম হল চুনি আর স্বচ্ছ নীল কোরানডামের নাম নীলা। মণিপাথর ছাড়া ঘষে মসৃণ করার কাজেও কোরানডামের যথেষ্ট ব্যবহার।

প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে রয়েছে, নীলা কলিঙ্গ ও কালপুরে পাওয়া যেত। তবে বর্তমান প্রাচীন কলিঙ্গ ও কালপুর বলতে যে-অঞ্চল বোঝায় সেখানে আজকাল আর নীলা পাওয়া যায় না।

অল্প কিছু নীলা ও চুনি পাওয়া গিয়েছে জম্মুর কিশটাওয়ার জেলার বিখ্যাত সুমজাম খনি থেকে। কাশ্মীরের প্রায় সাড়ে চার হাজার মিটার উঁচু এই নীলার খনি প্রায় সারা বছরই বরফে ঢাকা থাকে। ফলে বছরে শুধু তিন মাস—জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত—খনিতে কাজকর্ম হয়। 1887 সালে এই খনিতে পাওয়া সবচেয়ে বড় নীলার ওজন ছিল 930 ক্যারাটের মত। 1946 সালে প্রায় 7 লক্ষ ক্যারাট ও 1951 সালে সওয়া দু'লক্ষ ক্যারাট ওজনের নীলা পাওয়া গিয়েছিল এই খনি থেকে।

এ-ছাড়া মেঘালয় ও তামিলনাড়ুতেও বেশ কিছু কোরানডাম পাওয়া যায়।

মণিপাথর আসল কি নকল বুঝব কী ক'রে?

বাজারে নানারকম মণিপাথর পাওয়া যায়। চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাদের রঙ আর ঔজ্জ্বল্য দেখলে। কিন্তু এত সব মণিরত্নের ভিড়ে কী করে চেনা যাবে কোনটা আসল, কোনটা নকল?

মণিপাথর (Gemstone) আসল কি নকল বুঝবার জন্য অভিজ্ঞ চোখ প্রয়োজন। প্রথমত, মণিপাথরের আকৃতি, রঙ, স্বচ্ছতা ও এর ভেতরে সূক্ষ্ম যে-সব অবাঞ্ছিত পদার্থ থাকে, তার বিন্যাস দেখে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে হবে।

এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা তৈরির জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যও নিতে হবে। তবে মণিপাথর যাচাই করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হল মণিপাথরের প্রতিসরাঙ্ক (Refractive index) নির্ণয় করা। নানা প্রতিসরাঙ্কের তরল পদার্থের সাহায্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মণিপাথরের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করতে হয়। নির্দিষ্ট মণিপাথরের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করা হলে তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে মণিপাথরের সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কারণ কোনো বিশেষ মণিপাথরের প্রতিসরাঙ্ক নির্দিষ্ট—এর হেরফের বিশেষ দেখা যায় না। যেমন হীরার প্রতিসরাঙ্ক 2.417। এ-ছাড়া বিচ্ছুরণ ধর্ম যাচাই ক'রেও মণিপাথরের আসল-নকল বের করা সম্ভব।

রাস্তা তৈরিতে কোন পাথর লাগে?

কতগুলি বিশেষ গুণ থাকলে তবেই সেই পাথর রাস্তা তৈরিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই ধরনের পাথর হতে হবে শক্ত, যাতে সহজে ক্ষয়ে না যায়। আর এই কাজে মিহি দানার পাথরই বাঞ্ছনীয়।

এ-সব দিক থেকে বিচার করলে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যাসল্টকেই প্রায় আদর্শ বলা যেতে পারে। ব্যাসল্ট (Basalt) এক ধরনের ঘন সবুজ অথবা কালো রঙের আগ্নেয় শিলা। অপ্রীতিকর রঙের জন্য ঘর-বাড়ি তৈরির কাজে এর তেমন কদর নেই। তবে বোম্বাইয়ের কাছাকাছি কয়েকটি জায়গায়, বিশেষ ক'রে সলসেটি দ্বীপে এক ধরনের হলুদ রঙের ব্যাসল্ট পাওয়া যায়, যা ঘর-বাড়ি তৈরির কাজে অল্পসল্প লাগানো হয়। তবে পথ-ঘাট তৈরির কাজে ব্যাসল্টের জুড়ি নেই। আলকাতরা দেওয়া পাকা রাস্তা তৈরি, ট্রাম ও রেলওয়ে লাইন বসানোর কাজে ব্যাসল্টের ব্যবহার প্রায় একচেটিয়া। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের রাজমহল অঞ্চলে প্রচুর ব্যাসল্ট পাওয়া যায়।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরায় শক্ত পাথর না পাওয়ার ফলে রাস্তাঘাট তৈরির কাজে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশেও শক্ত পাথরের বেশ অভাব। ফলে রাস্তা-ঘাট তৈরির ব্যাপারে ওখানেও যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। তবে শোনা গেছে বাংলাদেশে মাটির নীচে ড্রিলিং ক'রে শক্ত আগ্নেয় পাথরের হদিশ পাওয়া গেছে।

থর মরুভূমিতে কি কোনো নদী আছে?

থর মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত খুবই কম, কিন্তু তবুও এই মরুভূমির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে লুনি নদী। লুনি নামেই নদী, তার শুধু নদীখাত রয়েছে। সারা বছরের বেশির ভাগ সময়েই এতে কোনো জল থাকে না। দেখা গেছে, প্রায় 16 বছর পরপর লুনি নদী ভরে যায় বৃষ্টির জলে। বন্যাও হয়। এই নদীটির একটি উপনদীও আছে, নাম সুকরি।

তা ছাড়া বেশ কয়েক বছর আগে একটি বড় খাল (রাজস্থান খাল) কেটে মরুভূমির ভেতরে চাষবাস করার চেষ্টা চলছে। এই খালে জল আসছে রবি, বিপাশা ও শতদ্রু নদী থেকে।

মরুভূমি কি এগিয়ে আসছে?

মরুভূমি নাম শুনলেই বুকের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে আসে। তার ওপর আবার কেউ যদি বলে মরুভূমি আরো এগিয়ে আসছে, তবে তো ভিরমি খেতে হবে। ব্যাপারটা কি সত্যি? মরুভূমি কি এগিয়ে আসছে?

সাধারণ মানুষের চোখে মরুভূমি মানে শুধু বালি আর বালি, বালির ঝড়, আরব বেদুইন, মরুদ্যান আর খেজুর গাছ হলেও বিশেষজ্ঞদের ভাষায় বৃষ্টিহীন বালি অথবা প্রস্তরময় রুক্ষ বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে বলা হয় মরুভূমি। পৃথিবীর

মোট স্থলভাগের ছ' ভাগের প্রায় এক ভাগ মরুভূমি। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মরুভূমিগুলির অবস্থান মোটামুটি ভাবে ক্রান্তীয় (কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি) অঞ্চলে। এই সব অঞ্চলে বাতাস শুকনো, মেঘ খুবই কম, বৃষ্টিপাত অল্প (বছরে 25 সেন্টিমিটারের কম) এবং বাষ্পীভবন খুবই বেশি। পৃথিবীর কয়েকটি বিশাল মরুভূমি—যেমন মধ্য এশিয়া কিংবা উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলের মরুভূমিগুলি বিরাট উঁচু পাহাড়ের আড়ালে বৃষ্টিহীন অঞ্চলে অবস্থিত। কারণ পাহাড়ের উচ্চতার জন্য অসহায় জলভরা মেঘ পাহাড় ডিঙিয়ে বৃষ্টির ধারা বইয়ে দিতে পারে না এ-সব অঞ্চলে। তারই বিষময় ফল এই সব রুক্ষ তৃণহীন মরুভূমি। রুক্ষ মরুভূমিগুলির অন্যান্য বিশেষত্বগুলি মোটামুটি এইরকম ঃ

ক. মরুভূমি অঞ্চলে গাছপালার অভাব। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ভূমি ক্ষয়ে যায়।

খ. মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টি আর নদী-নালার আকাল। তাই জলের অভাবে মরুভূমির রুক্ষতা বেড়েই চলে।

গ. মরুভূমি অঞ্চলে ক্ষয়ের প্রধান মাধ্যম হাওয়া। আর এই হাওয়া-বাহিত বালিকণা থেকেই তৈরি হয় বালিয়াড়ি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোয় প্রায় 150 মিটার উঁচু বালিয়াড়ি দেখা গেছে।

ঘ. পৃথিবীর কিছু কিছু মরুভূমির অবস্থান সমুদ্র থেকে বেশ দূরে। ফলে সমুদ্র থেকে হাওয়ার সঙ্গে যে জলীয় বাষ্প ছুটে আসে মহাদেশের ভেতরে, তা মরুভূমির কাছে পৌঁছোবার আগেই ঝরে পড়ে বৃষ্টি হয়ে। যেমন, মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি, অস্ট্রেলিয়ার টোনামি ও সিম্পসন মরুভূমি, ইরাণের দস্ত্-ই-কবীর ও দস্ত্-ই-লুট মরুভূমি, চীনের টাকলামাকান মরুভূমি। ভারতের থর মরুভূমিও সমুদ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরেই অবস্থিত।

মরুভূমির উৎপত্তির বিষয়টি বেশ জটিল, কেবলমাত্র একটি কার্যকারণের ওপর ভিত্তি ক'রে কোনো মরুভূমি গড়ে ওঠে না। সে যাই হোক, মরুভূমির উৎপত্তির বিষয়টি শুধু মাত্র নিছক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য নয়, সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্যই এ-বিষয়ে সার্বিক গবেষণা প্রয়োজন। কারণ যদি চাষের জমি ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হয়, তবে তা সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর। অন্য দিকে মরুভূমিতে চাষবাসের বন্দোবস্ত করা গেলে তা আমাদের সকলের কাছে আশীর্বাদের মত।

পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর আবহাওয়া যুগে যুগে বদলে গেছে। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে মরুভূমির চেহারারও বদল হয়েছে বারবার। সাম্প্রতিক এক বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফলে জানা গেছে আজকের সাহারা মরুভূমির পশ্চিম ভাগে মালি রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল টলটলে নীল জলে ভরা বহু সরোবর বা হ্রদ। সেই সরোবর ঘিরে বিস্তৃত ছিল সাভানা ঘাসের মায়াবী প্রান্তর। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সাত থেকে তিন হাজার বছর আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলে বসবাস করতো মানুষ। নব্যপ্রস্তর যুগের সেই সব মানুষেরা জীবন ধারণের জন্য এ-সব জলাশয় থেকে শিকার করতো মাছ আর কচ্ছপ। কিন্তু সাহারা মরুভূমি এগিয়ে আসায় এই সব মানুষকে বাধ্য হয়ে সরে যেতে হয়েছে অন্য জায়গায়।

বিরাট রোম সাম্রাজ্যের যে-সব জায়গা জুড়ে এককালে ছিল বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত, এখন সে-সব জায়গা অনুর্বর রুক্ষ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এসব ঐতিহাসিক খবরাখবর বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় মরুভূমি এগিয়ে আসছে।

কোনো খনিজ পদার্থের কাঠিন্য কী ভাবে মাপা হয়?

পৃথিবীতে নানা ধরনের খনিজ পদার্থ রয়েছে। কেয়োলিন, গ্রাফাইট, ট্যাল্‌ক্, হীরা-কত কি! এদের মধ্যে কোনোটি নরম, কোনোটি কঠিন। কিন্তু কোনটি কতখানি কঠিন অথবা নরম তা বোঝা যাবে কেমন ক'রে?

কোনো খনিজ পদার্থের কাঠিন্য নির্ণয় করবার জন্য 1822 সালে ভূ-বিজ্ঞানী ফ্রিডরিখ মোজ একটি স্কেল (Mohs' scale of hardness) তৈরি করেছেন। এই স্কেলে দশটি খনিজ পদার্থের নাম রয়েছে। সবচেয়ে নরম খনিজ ট্যাল্‌ক্ থেকে শুরু ক'রে কঠিনতম খনিজ হীরা পর্যন্ত খনিজের তালিকাটি এইরকম ঃ

1. ট্যাল্‌ক্ 2. জিপসাম 3. ক্যালসাইট 4. ফ্লোরাইট 5. অ্যাপেটাইট 6. অর্থোক্লেজ 7. কোয়ার্ট্‌জ 8. টোপাজ 9. কোরানডাম 10. হীরা।

কোনো নির্দিষ্ট খনিজ পদার্থের কাঠিন্য নির্ণয় করতে হলে ওপরের তালিকার প্রায় সমমানের কোনো খনিজের সঙ্গে ঘষাঘষি ক'রে দেখতে হবে কোন খনিজটি বেশি

কঠিন। যে খনিজটি কম কঠিন, স্বভাবতই সেটির অংশবিশেষ ঘষে উঠে আসবে। পরবর্তী পর্যায়ে অবস্থা বিশেষে ঠিক নীচের অথবা ওপরের খনিজের সঙ্গে আবার নির্দিষ্ট খনিজটি ঘষে দেখতে হবে কোনটি কঠিনতর। এভাবেই বার কয়েক ঘষাঘষি করতে করতে বোঝা যাবে নির্দিষ্ট খনিজটির আনুমানিক কাঠিন্য কতখানি।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, পান্না রত্নের (Emerald) কথা। ঘষাঘষির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, এটি কোয়ার্ট্‌জের চেয়ে কঠিন, কিন্তু টোপাজের চেয়ে নরম। অর্থাৎ পান্নার আনুমানিক কাঠিন্য কোয়ার্ট্‌জ ও টোপাজের মাঝামাঝি বা 7.5।

কোন পাথর থেকে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়?

ইউরেনিয়ামের কথা উঠলেই মনে পড়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা। অবশ্য শুধু পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্যেই নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা সম্ভব এবং তা হচ্ছেও। কিন্তু এই শক্তিধর ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় কোন পাথরে?

যেসব খনিজে ইউরেনিয়াম রয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নামী আকরিক হল ইউর‍্যানিনাইট (Uraninite) বা পিচব্লেণ্ড (Pitchblende)। এর রাসায়নিক সংকেত $2UO_3$, UO_2। ইউরেনিয়াম ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে সামান্য থোরিয়াম, জারকোনিয়াম, হিলিয়াম, আরগন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ আকরিকের

> **ভারতে কত ইউরেনিয়াম আছে?**

মধ্যে রয়েছে টরবারনাইট, অটুনাইট ও গুমাইট যা ইউরানিনাইট থেকে রূপান্তরের ফলে তৈরি।

ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় ইউরেনিয়ামের আকরিকের সন্ধান মিলেছে। তবে কেবলমাত্র বিহারের সিংভূম জেলার যাদুগোরা অঞ্চলেই ইউরেনিয়াম উত্তোলনের খনি রয়েছে। ইউরেনিয়ামের আকরিক সাধারণত পাওয়া যায় এক ধরনের পাথর পেগমাটাইটের (Pegmatite) ভেতরে পাতলা বা মাঝারি শিরার (Vein) আকারে। একটি রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, বিহারের 21 কোটি মেট্রিক টন আকরিকে প্রায় 72500 মেট্রিক টন ইউরেনিয়াম অকসাইড (সংকেত U_3O_8) রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি অঞ্চলের উঁচু মানের আকরিকে সাধারণত শতকরা 0.1 থেকে 0.2 ভাগ ইউরেনিয়াম অকসাইড থাকে। তবে ভারতে অত ভাল জাতের আকরিক নেই। যাদুগোরা অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল জাতের আকরিকেও U_3O_8 এর পরিমাণ শতকরা মাত্র 0.067 ভাগ। নারোয়া পাহাড় অঞ্চলের আকরিকে U_3O_8 এর পরিমাণ শতকরা 0.05 ভাগ। যাদুগোরা ছাড়াও বিহারের অভ্রক্ষেত্রে গয়া, মুংগের ও হাজারিবাগ অঞ্চলে প্রায় 24 টি পেগমাটাইট পাথর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে রয়েছে ইউরেনিয়ামের আকরিক।

বিহার ছাড়াও ভারতের রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মেঘালয়, কেরল, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জায়গাতেও ইউরেনিয়ামযুক্ত খনিজের সন্ধান মিলেছে। ভারতে ইউরেনিয়াম খনিজের মোট মজুত আনুমানিক ৪০ হাজার মেট্রিক টন। অবশ্য আসল পরিমাণ এর অনেক বেশিও হতে পারে, কারণ নিরাপত্তার কারণে ব্যাপারটি গোপনীয়।

শালগ্রাম শিলা কী?

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও বাংলার ঘরে ঘরে শালগ্রাম শিলাকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করা হত। আসলে শালগ্রাম শিলা এক ধরনের ফসিল, যার নাম অ্যামোনাইট (Ammonite)। ভূ-তাত্ত্বিকরা বলেন, এখন যেখানে হিমালয় পর্বত, এককালে সেখানে ছিল টেথিস সাগর। আজ থেকে প্রায় 2-3 কোটি বছর আগে 'টারশিয়ারি' যুগে ভূগর্ভের আলোড়নের ফলে হিমালয় সমুদ্রের তলা থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এই টেথিস সমুদ্রে সাঁতার কাটতো প্রায় 15 কোটি বছর আগের জুরাসিক যুগের প্রাণী-দল অ্যামোনাইট। কালক্রমে প্রাণ হারিয়ে হিমালয়ের পাথরের স্তরেই ফসিল হয়ে থেকে গেছে এই সব প্রাণী। সংস্কৃতে এর নাম বজ্রকীট। ফসিলে রূপান্তরের সময়ে গোলাকার শক্ত খোলসের রেখাগুলি শিলার গায়ে চিহ্নিত থেকে গেছে। শালগ্রাম শিলার গায়ে সোনার আভাস থাকে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, হিমালয় দেবতাদের বাসভূমি। স্বর্গের স্বর্ণরত্নাদি

তাই শালগ্রাম শিলার আধারে দেবতারা রেখে দেন। তবে ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ওগুলো সোনার আভাস নয়, পাইরাইট্স্ নামের সোনালী রঙের খনিজ। পাইরাইট্সের রাসায়নিক উপাদান আয়রন সালফাইড।

আমাদের শাস্ত্রকাররাও জানতেন যে, শালগ্রাম শিলা সামুদ্রিক কীটের দেহাবশেষ এবং এগুলি হিমালয়ের দক্ষিণে গণ্ডক নদীর তীরে পাওয়া যায়। হয়তো এই কারণেই নেপালে গণ্ডক নদীর নাম শালগ্রামী।

রবীন্দ্রনাথও শালগ্রাম শিলা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাই তিনি লিখেছেন, 'শালগ্রাম শিলা তো কিছুই দেখায় না। ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না, সেখানেই দেখব, এই হোক আমার সাধনা।'



ক্রেটোশাস যুগের অ্যামোনাইট, যার ফসিল সাধারণ মানুষের কাছে শালগ্রাম শিলা নামে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের নামে কি কোনো ফসিলের নাম আছে?

রবীন্দ্রনাথের নামে ডাইনোসরের একটি ফসিলের নামকরণ হয়েছে 'বরাপোসরাস ট্যাগোরাই'। এই ফসিলটি গোদাবরী উপত্যকা থেকে আবিষ্কার করেন ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের একদল ভূ-বিজ্ঞানী। এটি রাখা আছে ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সংগ্রহশালায়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষের সময়কালে ফসিলটি আবিষ্কৃত হয়েছে বলেই এই নামকরণ।

ডাইনোসর কি ডিম পাড়তো?

ডাইনোসরের যা বিরাট আকার ছিল, তার কাছে আজকের হাতিও তুচ্ছ। এত বিশাল যার আকার, যা আজকের যে কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়েও বড়, তা কি দেওয়ালের সামান্য টিকটিকির মত ডিম পাড়তো?

ডাইনোসর জীবজগতে সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে একটি লুপ্ত গোষ্ঠী। ডাইনোসর শব্দটি তৈরি হয়েছে গ্রিক ভাষা থেকে, সহজ বাংলায় যার অর্থ ভয়ংকর টিকটিকি। টিকটিকি

পাখি কি ডাইনোসর থেকে এসেছে?

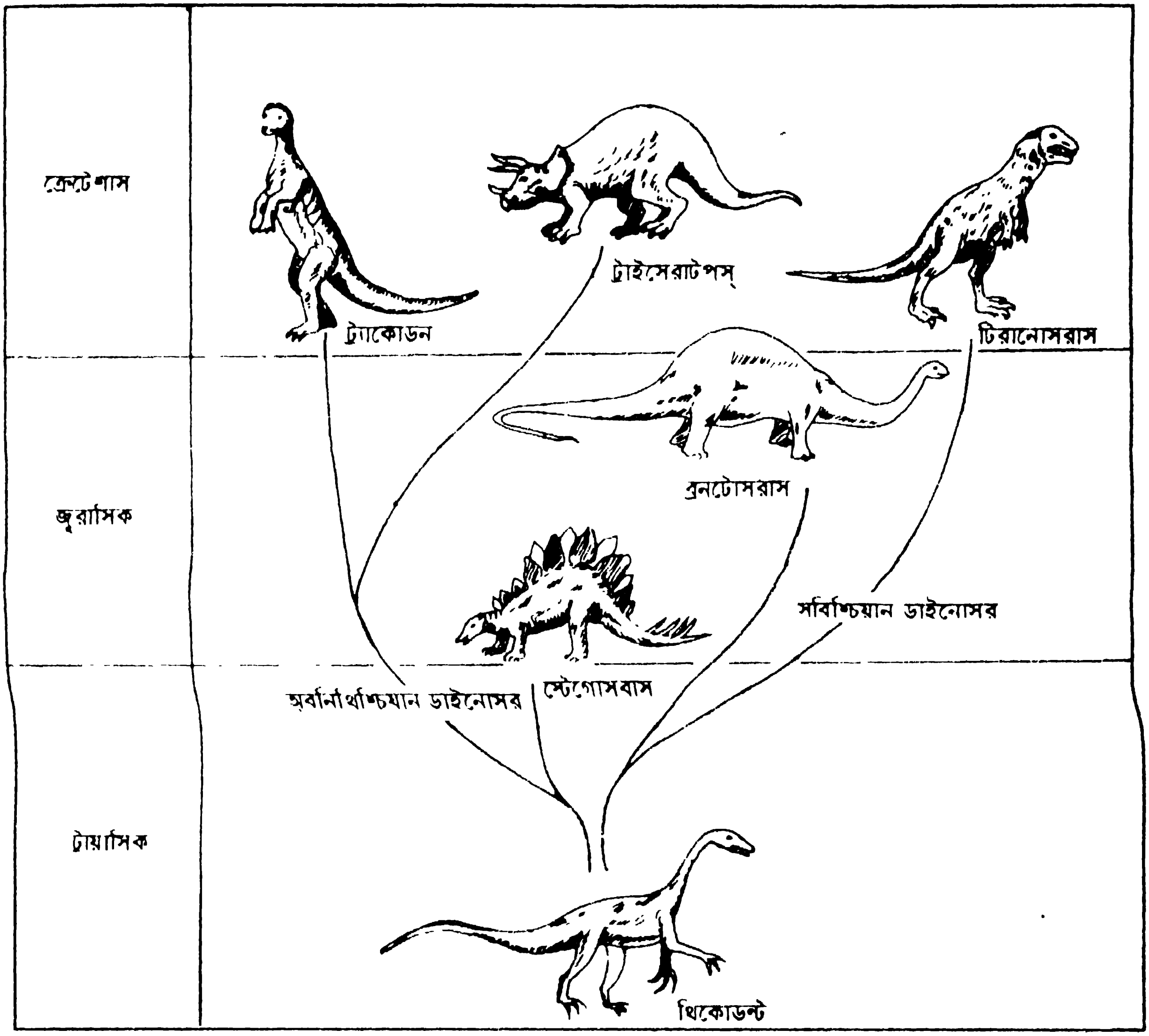
যেমন ডিম পাড়ে, কয়েক ধরনের ডাইনোসরও তেমনি ডিম পাড়তো, যদিও আকারে টিকটিকির চেয়ে অনেকগুণ বড় ছিল ডাইনোসর।

গোবি মরুভূমিতে বেশ কিছু ডাইনোসরের ডিমের ফসিল সত্যি সত্যিই পাওয়া গেছে। এগুলোর আকৃতি অনেকটাই ওষুধের ক্যাপসুলের মতই লম্বাটে, যদিও আকারে অনেক বড়।

বিজ্ঞানীরা ডাইনোসরের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, পৃথিবীতে পাখির সৃষ্টি হয়েছিল ডাইনোসর থেকেই। এই সব কারণেই জীববিজ্ঞানে ডাইনোসরের গুরুত্ব অনেকখানি।

ভূতাত্ত্বিক সময়-সারণী বলতে কী বোঝায়?

আমাদের এই পৃথিবীর বয়স কম নয়। ভূতাত্ত্বিকদের



মেসোজয়িক যুগের ডাইনোসর—এরা ডিম পাড়তো

হিসেবে পৃথিবীর বয়স অন্তত‍পক্ষে 460 কোটি বছর। কিন্তু এরও গোড়ার দিকে প্রায় 100 কোটি বছরের ইতিহাস আমাদের কিছুই জানা নেই। যে-কালের কথা আমরা কিছু কিছু জানতে পেরেছি, তার ব্যাপ্তি প্রায় 60 কোটি বছর।

পৃথিবীর ইতিহাসকে সঠিকভাবে বোঝবার জন্য ভূ-তাত্ত্বিকরা এই বিপুল সময়কে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। এই ভাগগুলির নাম অধিযুগ (Era)। এই অধিযুগের ব্যাপ্তিও বড় কম নয়। তাই এই অধিযুগগুলিকে ভাগ করা হয়েছে কতগুলি যুগে (Period)। এই যুগগুলিকে আবার ভাগ করা হয়েছে উপযুগে (Epoch)। এ-ভাবেই গড়ে উঠেছে ভূতাত্ত্বিক সময়-সারণী (Geological time scale)। অনেকটা ইতিহাসের যুগের মতই (মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ ইত্যাদি)।

জীবন্ত ফসিল কী?

ফসিল বলতে আমরা বুঝি বহুদিন আগের মৃত-প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্। কিন্তু এরাই আবার জীবন্ত কী করে হয় ভেবে সত্যিই অবাক হতে হয়। একই সঙ্গে জীবন্ত অথচ মৃত কোনো জিনিস হওয়া কি সম্ভব?

জীবন্ত ফসিল হল এমন কতকগুলো জীব, সুদূর অতীতে জন্ম হলেও যাদের বংশধরেরা আজও পৃথিবীতে বেঁচে আছে। **অথচ এদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় সকল** প্রাণীই বহু পূর্বে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। বিবর্তনের ইতিহাসে এদের **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো পরিবর্তন** হয়নি।

অধিযুগ	যুগ	সময়-সীমা
কোয়াটারনারি (Quaternary)	সাম্প্রতিক (Holocene)	সাম্প্রতিক থেকে 10 হাজার বছর আগে
	প্লায়াস্টোসিন (Pleistocene)	10 হাজার থেকে 10 লক্ষ
টারশিয়ারি (Tertiary) বা সেনোজয়িক (Cenozoic) বা নবজীবীয়	প্লায়োসিন pliocene	10 লক্ষ থেকে 1 কোটি 10 লক্ষ
	মায়োসিন (Miocene)	1 কোটি 10 লক্ষ থেকে 2 কোটি 50 লক্ষ
	অলিগোসিন (Oligocene)	2 কোটি 50 লক্ষ থেকে 4 কোটি
	ইয়োসিন (Eocene)	4 কোটি থেকে 6 কোটি
	প্যালিয়োসিন (Palaeocene)	6 কোটি থেকে 7 কোটি
সেকেণ্ডারি (Secondary) বা মেসোজয়িক (Mesozoic) বা মধ্যজীবীয়	ক্রেটেশাস (Cretaceous)	7 কোটি থেকে 13 কোটি
	জুরাসিক (Jurassic)	13 কোটি থেকে 18 কোটি
	ট্রায়াসিক (Triassic)	18 কোটি থেকে 22 কোটি 50 লক্ষ

অধিযুগ	যুগ	সময়-সীমা
প্রাইমারি (Primary) বা প্যালিয়োজয়িক (Palaeozoic) বা পুরাজীবীয়	পারমিয়ান (Permian)	22 কোটি 50 লক্ষ থেকে 27 কোটি
	কার্বোনিফেরাস (Carboniferous)	27 কোটি থেকে 35 কোটি
	ডেভনিয়ান (Devonian)	35 কোটি থেকে 40 কোটি
	সিলুরিয়ান (Silurian)	40 কোটি থেকে 44 কোটি
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)	44 কোটি থেকে 50 কোটি
	কেমব্রিয়ান (Cambrian)	50 কোটি থেকে 60 কোটি
প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic) বা আরকিয়ান (Archaean)	প্রাক-কেমব্রিয়ান (Precambrian)	60 কোটির চেয়ে প্রাচীন

যেমন, মাছের মধ্যে সিলাকান্থ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্য প্লাটিপাস, সরীসৃপের মধ্যে স্ফেনোডন, উদ্ভিদ শ্রেণীর ডিঙ্গোবাইলোবা ইত্যাদি। পাথরের মধ্যে এদের ফসিলও পাওয়া যায়।

কোন পাথরের নাম জোব চারনকের নামে?

কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চারনকের নামে যে পাথরের নামকরণ হয়েছে, সেটি এক ধরনের গ্র্যানাইট। এই গ্র্যানাইটে হাইপার্সথিন নামে একটি খনিজ রয়েছে তাই এর নাম হাইপার্সথিন গ্র্যানাইট। পাথরটি খুবই দৃঢ় সংহত প্রকৃতির। রং ধূসর হালকা-নীল। এই পাথর প্রথম পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে। পরে মাদ্রাজ শহরের কাছে সেন্ট টমাস মাউন্ট্স্ ও পল্লাভরামেও এই পাথরের দেখা মেলে। বিলাসবহুল অট্টালিকা তৈরিতে এই পাথর প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। পাথরের এই নামকরণ করেন ভূ-বিজ্ঞানী টমাস হলাণ্ড।

পৃথিবীতে আবার কি তুষার যুগ আসছে?

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর ভূতত্ত্বীয় ইতিহাসে প্লায়াস্টোসিন যুগে অন্তত চারবার তুষার যুগ এসেছে। কেন এসেছে, এ প্রশ্নের উত্তরে ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, হয়তো সে-সময়ে সৌরজগৎ কোনো মেঘমালার ভেতর দিয়ে

নিজের পথ ক'রে নিয়েছে। ফলে পৃথিবীর বুকে সূর্যের তাপমাত্রা কমে গেছে। অথবা সূর্যের শরীরে সৌরকলঙ্ক (Sun spot) বেড়ে যাওয়ায় হয়তো সূর্যের তাপ বিকিরণের ক্ষমতা সাময়িকভাবে কমে গেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড রয়েছে, তা কমে যেতে পারে, যদি পৃথিবীর গাছপালা বেশি মাত্রায় এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শুষে নেয়। পৃথিবীতে যে সূর্যের তাপ আসে, তা শুষে নিয়ে উত্তাপ ধরে রাখে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড। তাই পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে গেলে পৃথিবীর তাপমাত্রাও কমে যায়। শুরু হয় ঠাণ্ডা আবহাওয়া। অথবা চলমানতার ফলে পৃথিবীর মহাদেশগুলি মেরু অঞ্চলে ভিড় করলেও মহাদেশগুলিতে মিনি তুষার যুগ শুরু হতে পারে ।

পৃথিবীতে শেষ তুষার যুগ দেখা গেছে প্লায়াস্টোসিন যুগের শেষ ভাগে। 'গ্রেট আইস এজ' নামে পরিচিত এই

পৃথিবীতে শেষ তুষার যুগ কবে এসেছিল?

তুষার যুগে বেশ কয়েক শো মিটার পুরু বরফের স্তূপ জমে উঠেছিল। এই বরফের যুগ শুরু হয়েছিল আনুমানিক 6 থেকে 10 লক্ষ বছরের মধ্যে এবং চলেছিল আজ থেকে প্রায় 10 হাজার বছর আগে পর্যন্ত। তারপর থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমেই উষ্ণতর হয়ে উঠছে। তবু এখনও পর্যন্ত কুমেরু ও গ্রিনল্যাণ্ডে বেশ কয়েক শো মিটার বরফের চাঁই জমে রয়েছে। প্লায়াস্টোসিন যুগের ফসিল সংগ্রহ ক'রে বোঝা গেছে, কানাডা, উত্তর ইউরোপ ও সাইবেরিয়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশাল বরফের স্তূপ গলে যাওয়ায় নানা ধরনের প্রাণী আবার বাসা বাঁধে এ-সব অঞ্চলে। তুষার যুগের ভেতরে এই উষ্ণ বসন্তকালেই (যার সময়-সীমা আজ থেকে 1 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ বছরের মধ্যে) পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে আধুনিক মানুষ, আধুনিক ঘোড়া ও অন্যান্য নানা প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর। তাই তুষার যুগের মধ্যে এই উষ্ণ বসন্তকালের গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ভূ-বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সাম্প্রতিক সময়ে আমরা, আধুনিক মানুষেরা, দু'টি তুষার যুগের মাঝে এমনই একটি উষ্ণ বসন্তকালে বাস করছি। এই বসন্ত কেটে গেলে আবার আসবে শীত, যা ভূ-বিজ্ঞানীদের ভাষায় তুষার যুগ ছাড়া কিছু নয়। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর তাপমাত্রা 7-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমলেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে শীতল তুষার যুগ। ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেই অবাঞ্ছিত আগমন খুব একটা দূরে নয়। আগামী 5-10 হাজার বছরের মধ্যেই তা এসে পড়তে পারে আমাদের এই পৃথিবীতে।

সমুদ্র তৈরি হল কেমন করে?

পৃথিবীর মানচিত্র মাপজোখ করলে দেখা যাবে, পাঁচটা মহাসমুদ্র আর ছেষট্টিটা সমুদ্র মিলিয়ে পৃথিবীর প্রায় একাত্তর ভাগ অংশই জলে ঢাকা, আর বাদবাকিটা ডাঙা, অর্থাৎ মহাদেশ। সমুদ্র যে কত বড় (361,000,000 বর্গ কিমি) তা অনেকটাই মালুম হয় সমুদ্রের পাড়ে বসে চোখ দু'টো সামনে মেলে দিলে। শুধু আকারেই বড় নয়, গভীরও দারুণ। কোথাও কোথাও এত গভীর যে, সেখানে আমাদের ডাঙার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হিমালয়কে ছেড়ে দিলে তার কিছুই আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তাই মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, এত বিশাল গভীর সমুদ্র তৈরি হল কী করে!

এই প্রশ্নটা শুধু সাধারণ মানুষের মনকেই নয়, ভূ-বিজ্ঞানীদের চিন্তাকেও নাড়া দিয়েছে। এ-বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য মতবাদটি বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনের ছেলে জর্জ ডারউইনের। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে 1878 সালে জর্জ ডারউইন শোনালেন মহাসাগর সৃষ্টির ব্যাপারে আশ্চর্য চমকপ্রদ অনেক কথা। তিনি বললেন, প্রায় চারশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর বাইরের খোলস যখন পুরোপুরি শক্ত হয়নি ভেতরে নরম-গরম অবস্থা, সেই সময়ে সূর্যের টানে পৃথিবীর তরল বুক থেকে খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল মহাকাশে। সেই উপড়ে চলে যাওয়া অংশই হল চাঁদ। এরই ফলে পৃথিবীর বুকে তৈরি হল এক বিরাট গর্ত, যার নাম প্রশান্ত মহাসাগর।

জর্জ ডারউইনের এই মতবাদ উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে খুব আলোড়ন তুললেও পরবর্তী সময়ে কোনো বিজ্ঞানীই আর এই মতবাদে বিশ্বাস করেন নি। এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীরা যুক্তি দিলেন, ভূস্তর

সৃষ্টির পর, তা যত পাতলাই হোক, এমনই কঠিন হয়ে পড়েছিল যে তখন তার পক্ষে আর পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া প্রায় সব বিজ্ঞানীই এখন মেনে নিয়েছেন, কেবলমাত্র চাঁদই নয়, অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহগুলিরও সৃষ্টি হয়েছে গ্যাসীয় অবস্থায়। সাম্প্রতিক কালে, মানুষ চাঁদ থেকে ঘুরে আসবার পর দেখা গেছে, চাঁদের মাটিতে এমন সব পদার্থের সন্ধান মিলেছে, যা এ-যাবৎ খোদ পৃথিবীতেই মেলেনি। তা ছাড়া বয়সের হিসেবে দেখা গেছে, চাঁদের পাথরের বয়স পৃথিবীর পাথরের বয়সের চেয়ে মোটেই কম নয়, বরং খানিকটা বেশিই হতে পারে। অর্থাৎ চাঁদের পাথর হয়তো কিছু আগেই ঠাণ্ডা হয়েছে।

মহাসাগর সৃষ্টির ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বটি হল জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী ওয়েগনারের (1880-1930)। 1912 সালে প্রচারিত ওঁর 'চলমান মহাদেশ' তত্ত্বটিতে তিনি মহাসাগর সৃষ্টির কথা বলেন।

ওয়েগনার বলেছেন, আজ থেকে পঁচিশ কোটি বছর আগেও পৃথিবীর মহাদেশ আর মহাসমুদ্রের চেহারা এই রকম ছিল না। তখন পৃথিবীর সব মহাদেশগুলি মিলে একটিই মহাদেশ ছিল। সেই আদি প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশ ঘিরে ছিল এক আদি মহাসমুদ্র প্যানথালসা। ভূ-বিজ্ঞানী ওয়েগনারের মতে, খুব সম্ভবত (Mesozoic) যুগের প্রথম দিকে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় কুড়ি কোটি বছর

সমুদ্র কত বড়?

আগে, প্রাকৃতিক কারণে প্যানজিয়া মহাদেশটি [দ্রষ্টব্যঃ মহাদেশগুলির চেহারা কি বরাবর একই রকম ছিল?] দু'টো টুকরোয় ভেঙ্গে গিয়ে স'রে গেল একে অন্যের কাছ থেকে। তাদের একটা টুকরোর নাম 'গণ্ডোয়ানা'—মধ্যপ্রদেশের 'গণ্ড' আদিবাসীদের নামানুসারে। এতে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া আর কুমেরু। অন্যটার নাম 'লরেশিয়া'—যাতে ছিল ইউরোপ, এশিয়া, গ্রিনল্যাণ্ড আর উত্তর আমেরিকা। এই দুই মহাদেশের মাঝখানে রইল টেথিস সাগর। পরে গণ্ডোয়ানা আর লরেশিয়া আরো কয়েকটা টুকরোয় ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, আর তাদের মাঝখানে আদি মহাসাগর প্যানথালসার রূপ বদল হয়ে জন্ম নিল আজকের মহাসাগরগুলি। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা ভেঙে সরে গেল গণ্ডোয়ানা থেকে। এদের মাঝে জন্ম নিল দক্ষিণ অতলান্তিক মহাসাগর।

এ-দু'টি প্রকল্প ছাড়াও আরো বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে মহাদেশ ও সমুদ্র সৃষ্টির ব্যাপারে। তবে আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যুগে সেই প্রকল্পগুলি নেহাতই সেকেলে।

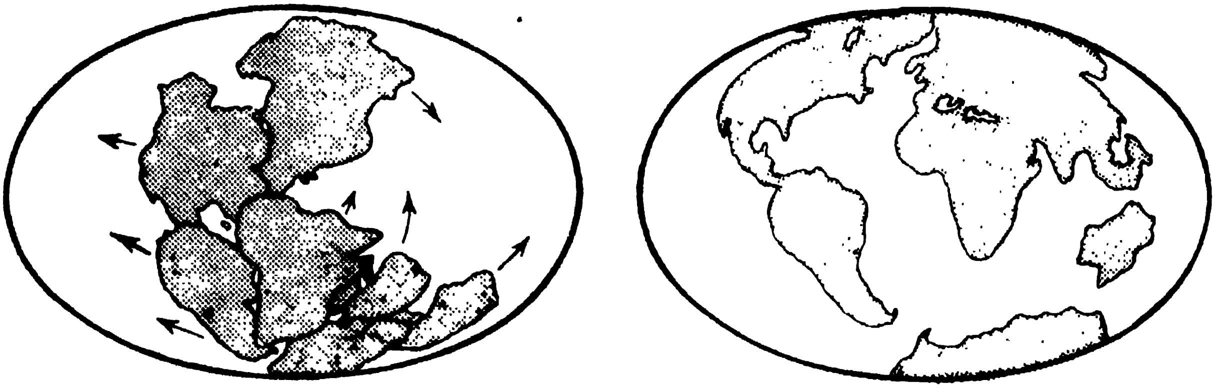
সমুদ্রে এত জল কোথা থেকে এল?

সব সমুদ্রের মোট জলের পরিমাণ পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় কম হলেও আমাদের কাছে নেহাত ফেলনা নয়। প্রায় 137 কোটি ঘন কিলোমিটার জল, আর তা পৃথিবীর পিঠে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার পুরু জলের স্তর তৈরি করেছে। কিন্তু এই জল এল কী করে?

আপাত সহজ এই প্রশ্নের উত্তরে ভূ-বিজ্ঞানীরা জবাব দিয়েছেন, কোথা থেকে জল এল, এ-কথা বলার চেয়ে কোথা থেকে আসেনি, এ-কথা বলা বোধহয় অনেক সোজা। পৃথিবীর আবহমণ্ডল থেকে এ-জল পাওয়া যায়নি, কারণ আবহমণ্ডলের জল ধ'রে রাখবার যা ক্ষমতা, তাতে পৃথিবীর সমুদ্র জলের উচ্চতা বড়জোর 5 সেন্টিমিটার বাড়ানো যেতে পারে, তার বেশি নয়। কিন্তু পাঁচ কিলোমিটার পুরু জলের স্তর! নিতান্ত অসম্ভব। এরপর ভূ-বিজ্ঞানীরা তাকিয়েছেন ভূত্বকের (Crust) দিকে, যদিও তা থেকে জলের হদিশ মেলেনি। কারণ হিসেব-নিকেশ ক'রে দেখা গেছে, পৃথিবীর ভূত্বক যতটা পুরু, তাতে এতটা জল ধরে রাখা অসম্ভব ছিল।

ভূত্বকের নীচে রয়েছে ম্যান্টল (Mantle), যা তরল ও কঠিনের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আছে। ম্যান্টলের চরিত্র বিচার ক'রে ভূ-বিজ্ঞানীরা রায় দিয়েছেন, পৃথিবীর এত জল এসেছে ম্যান্টলের পেট থেকে আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে।

এ-কথা তো জানাই আছে, অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে যে-গ্যাস বেরিয়ে আসে তার অনেকটাই জলীয় বাষ্প। এই জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়েই যে-জলের জন্ম তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু আগ্নেয়গিরির পেটে এত জলীয় বাষ্প জমে কী ক'রে? ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, এই জল এসেছে জল (বা হাইড্রোক্সিল)-বাহী কিছু



এক মহাদেশ ভেঙে দূরে সরে গেলে এইভাবে পৃথিবীর সমুদ্রগুলি এখনকার চেহারা পেয়েছে

খনিজ থেকে, যা থাকে ম্যাগমার ভেতরে। যেমন, অভ্র (Mica), সারপেনটিন (Serpentine), অ্যামফিবোল (Amphibole) ইত্যাদি খনিজগুলি যদি 230 ডিগরি সেলসিয়াসে পোড়ে, তবে এই খনিজের জলটুকু বাইরে বেরিয়ে আসে জলীয় বাষ্পের আকারে। ম্যান্টলের শিলার মধ্যে এ-ধরনের খনিজ পর্যাপ্তই রয়েছে। ফলে পৃথিবীর সমুদ্রগহ্বর পরিপূর্ণ হতে বেশি সময় লাগেনি। পৃথিবীর পিঠে যত জল রয়েছে, তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ জল পৃথিবীর বহু খনিজের মধ্যে এখনও বন্দী।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীর মোট জলের শতকরা 98 ভাগই সমুদ্রের নোনা জল। বাদবাকি 2 শতাংশ ছড়িয়ে আছে হ্রদ, নদী, হিমবাহ, মেঘ ও পাথরের ফাটলে সঞ্চিত ভূ-জলে।

সমুদ্রের জল নোনা কেন?

নদীর জল মিষ্টি, অথচ সমুদ্রের জল নোনতা। 'অবাক জলপান'-এর মত প্রশ্নটা ভাবায় বই কি। অথচ দু'টোই এই পৃথিবীরই জল। আর নদীর জল গিয়ে মিশছে সেই সমুদ্রেই। তবে সত্যি বলতে কি, নদীর জলে একেবারে নুন নেই, তা নয়। তবে তার পরিমাণ অনেক কম। প্রতিদিন পৃথিবীর সব নদী একটু একটু ক'রে নুন ফেলছে সাগরে, আর তাতেই সমুদ্রের জল হয়ে উঠছে নোনতা—এ কথাটা 1715 সালেই বলেছিলেন এডমণ্ড হ্যালি নামে এক বিজ্ঞানী।

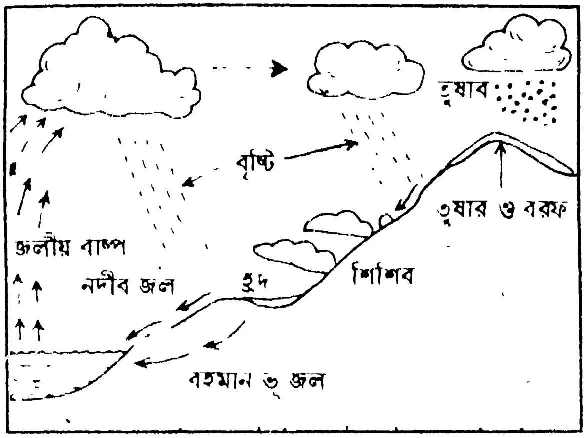
পরে মহাসাগরগুলি সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে 1872 সালে ব্রিটিশ জাহাজ 'চ্যালেঞ্জার' বিভিন্ন সমুদ্রের মোট 77টি বিভিন্ন জায়গা থেকে জলের যে নমুনা সংগ্রহ করেছিল, তা বিশ্লেষণ ক'রে ব্রিটিশ রসায়নবিদ্ ডিটমার (1884) দেখেছেন, প্রতি লিটার সমুদ্রের জলে নানা জাতের নুনের পরিমাণ প্রায় 35 গ্রাম। অথচ প্রায় একশো বছর পরেও দেখা যাচ্ছে সমুদ্রজলে

সমুদ্রের নোনতা ভাব কি বাড়ছে?

নুনের পরিমাণ প্রায় একই আছে। যদিও অতলান্তিক মহাসাগরের জলে নুনের পরিমাণ (লিটারে 34.90 গ্রাম), ভারত (লিটারে 34.76 গ্রাম) ও প্রশান্ত (লিটারে 34.62 গ্রাম) মহাসাগরের চেয়ে সামান্য বেশি। তবে এ তফাত ধর্তব্যের মধ্যে নয় মোটেই। তবু এরই মধ্যে একটা মোদ্দা কথা বোঝা গেছে, নদীগুলো যতই নুন এনে ফেলুক না সাগরের জলে, সমুদ্রের নোনতা ভাব তাতে বাড়ছে না। ভূ-বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলেছেন, সমুদ্রের জলে মোট 5×10^{18} কিলোগ্রাম নুন মিশে আছে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, সমুদ্রের জলে সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ নদীর জলের তুলনায় অন্তত 17 গুণ বেশি। এ-সব সত্ত্বেও নিজস্ব প্রক্রিয়ায় সমুদ্রজল তার নোনতা ভাব একই জায়গায় ধরে রাখছে। এই প্রক্রিয়ার একটা ব্যাপার হল, মহাদেশগুলি থেকে অসংখ্য নদী-নালা মারফৎ নানা ধরনের নুন সমুদ্র যতটা নেয় তার অনেকটাই আবার ফিরিয়ে দেয় মহাদেশকে। যেমন জোয়ারের সময়ে সাগরজল যখন ঢুকে পড়ে ডাঙায়, সেই সময়ে সাগরজলে মিশে থাকা নুনটুকু থিতিয়ে যায় মাটির শরীরে। সমুদ্রের জলকণা বাষ্প হয়ে মহাদেশগুলির দিকে ছুটে যাওয়ার সময়েও সঙ্গে ক'রে অনেকটা নুন নিয়ে যায়।

এই নুনের কিছুটা অবশ্য পরে আবার নদীজলের সঙ্গে মিশে সমুদ্রে ফিরে আসে, তবে বাদবাকি বেশ কিছুটা পড়ে থাকে ডাঙার মাটিতে। এ-ছাড়া সমুদ্রের জলে বিভিন্ন ধরনের নুনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অধঃক্ষেপ (Precipitate) তৈরি হয়, যা থেকে নতুন সামুদ্রিক স্তর অথবা খনিজ নুড়িও (Nodule) তৈরি হতে পারে।



সমুদ্রের জল কী ভাবে আবার সমুদ্রে ফিরে আসে

সমুদ্রে নুনের পরিমাণ সব সময়ে মোটামুটি একই রকম থাকলেও মাঝে মাঝে তারতম্য হয় বই কি! যেমন, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ফলে সমুদ্রের নোনতা ভাব সাময়িক ভাবে যেমন কমে, তেমনি, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে গেলে সমুদ্রের নোনতা ভাব খানিকটা বাড়বেই। এ-ছাড়া সমুদ্রের জল ঠাণ্ডায় জমে হিমশৈল তৈরি হলেও যে সমুদ্রে নুনের ভাগ বাড়বে, এ-কথা বোঝা কঠিন নয়, কারণ জল থেকে বরফ হবার সময়ে শতকরা মাত্র 30 ভাগ নুনই বরফের ভেতরে যেতে পারে, বাদবাকি 70 ভাগই পড়ে থাকে সমুদ্রের জলে।

প্রসঙ্গত জল কতটা নোনতা তা প্রকাশ করা হয় প্রতি কিলোগ্রাম (বা লিটার) সমুদ্রের জলে কত গ্রাম নুন আছে, সেই পরিমাণ দিয়ে। যেমন 35‰ (সহস্রাংশ) বলতে বোঝায় 1 লিটার জলে 35 গ্রাম নুন রয়েছে।

ডেড সীতে মানুষ ভাসে কেন?

নামে সমুদ্র হলেও ডেড আসলে একটি হ্রদ (Lake)। অবস্থান ইসরায়েল ও জর্ডনের মাঝখানে। এর জলের তল সমুদ্র-পৃষ্ঠের চেয়েও 393 মিটার নীচে। হয়তো আগে কোনোদিন এটি সাগরের সঙ্গে যুক্ত ছিল আকাবা উপসাগরের মাধ্যমে, কিন্তু এখন এটি অবরুদ্ধ হ্রদ ছাড়া কিছু নয়। আর এর অবস্থান আরবের শুষ্ক অঞ্চলে হওয়ার ফলে হ্রদ থেকে বাষ্পীভবন—অর্থাৎ জল থেকে বাষ্প হওয়ার প্রবণতা—অনেক বেশি। আর সেখানে বৃষ্টিপাতও নামমাত্র। তাই প্রতিদিনই নদীবাহিত নুন জমে ডেড সী'-এর জলে নুনের অনুপাত বেড়ে যাচ্ছে। বাড়তে বাড়তে অবস্থা এখন এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে এর জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব মানুষের পুরো শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্বের চেয়েও বেশি। ফলে কোনো মানুষই এর জলে ঝাঁপ দিলে এখন আর ডোবে না, ভেসেই থাকে। নামে 'ডেড সী' হলেও এর জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরা প্রায় অসম্ভব।

কয়েক বছর আগে এক ভদ্রমহিলা ডেড সী'র জলে চেয়ারে বসবার ভঙ্গীতে বসে একটি ভাসন্ত টেবিলে কাপ রেখে চা খেয়ে রেকর্ড করেছেন। এর ছবিও ছাপা হয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিকের একটি পুরনো সংখ্যায়।

সমুদ্রের জলে কী কী উপাদান আছে?

সমুদ্রের জলে প্রচুর নুন (5×18^{18} কিলোগ্রাম) তো মিশে আছেই। কিন্তু এই নুনের রাসায়নিক চরিত্র বা উপাদান কী?

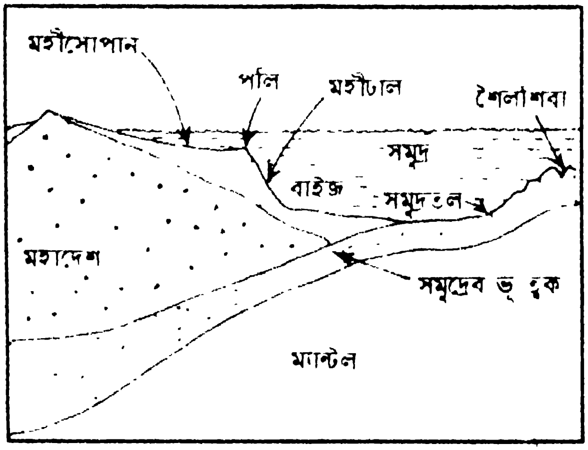
প্রতি লিটার সাগর জলে নানা ধরনের নুনের পরিমাণ প্রায় 35 গ্রাম। এর মধ্যে 27.2 গ্রাম খাবার নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে 3.8 গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট 1.7 গ্রাম, ক্যালসিয়াম সালফেট 1.3 গ্রাম, আর পটাশিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের মোট পরিমাণ 1 গ্রামেরও কম। এ-ছাড়া অন্য যে-সব পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সিলিকন, ফসফরাস, আয়োডিন, লোহা, ব্রোমিন, ফ্লোরিন, ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক, সীসা ও পারদ। দ্রবীভূত গ্যাসের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড (0.009%), নাইট্রোজেন (0.0014%), অক্সিজেন (0.0005%) ও হাইড্রোজেন। দ্রবীভূত অবস্থায় সমুদ্রের জলে নুন থাকে আয়নিত অবস্থায়। রসায়নবিদেরা বলেছেন,

11টি প্রধান আয়ন রয়েছে সমুদ্রের জলে, যা নীচের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে।

আয়ন	**প্রতি লিটার সমুদ্রজলে আয়নের পরিমাণ (গ্রাম)**
ক্লোরাইড	18.980
সোডিয়াম	10.556
সালফেট	2.649
ম্যাগনেসিয়াম	1.272
ক্যালসিয়াম	0.400
পটাশিয়াম	0.380
বাইকার্বোনেট	0.140
ব্রোমাইড	0.065
বোরিক অ্যাসিড	0.026
স্ট্রনশিয়াম	0.013
ফ্লোরাইড	0.001

সমুদ্রের তলার গঠন কেমন?

সমুদ্রের ওপরের চেহারাটা দেখে মনে হয় সমুদ্রের তলের চেহারাটা বুঝি সমান মসৃণ। উনিশ শতকে কিছু মানুষেরও ধারণা ছিল, সমুদ্রের তলদেশ বোধহয় চৌবাচ্চার মেঝের মত সমান মসৃণ। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশের আসল চেহারাটা কী রকম?



সমুদ্রতলের চেহারা পাশ থেকে যেমন দেখাবে

সমুদ্রের তলদেশ মোটেই সমান বা মসৃণ নয়। সমুদ্রের তলায়ও অনেক ডুবো পাহাড় আছে।

সমুদ্রতলের মেঝেটা কেমন, এ-তথ্য কিন্তু মানুষ এক দিনে জানতে পারেনি। সমুদ্রতলের চেহারা, মেজাজ, ভঙ্গী বোঝবার জন্য মানুষকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। জাহাজ নিয়ে অনেক অভিযান চালাতে হয়েছে নানা ঝামেলার মধ্যে। তবেই সমুদ্রতলের খবরাখবর জানা গেছে। কিন্তু সব খবরই যে পাওয়া গেছে, সে-কথাই বা বলি কী ক'রে! অনেকটা জানা গেলেও আরো অনেক কিছুই যে এখনও জানতে বাকি।

যতটুকু জানা গেছে, সেই তথ্যের ভিত্তিতে সমুদ্রতলকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন ঃ (1) মহাদেশের লাগোয়া অঞ্চল (Continental margin), (2) সমুদ্রতলের মেঝে (Ocean-basin floor), (3) সামুদ্রিক শৈলশিরা (Oceanic ridge)।

1. মহাদেশের লাগোয়া অঞ্চল

সব মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে মহীসোপান বা মহাদেশীয় সোপান (Continental shelf)। সমুদ্র এখানে একেবারেই গভীর নয়। আর সমুদ্রের তলাটাও মোটামুটি মসৃণ। সব উপকূলের মহীসোপান কিন্তু সমান চওড়া বা গভীর নয়। কোথাও মহীসোপান চওড়ায় মাত্র কয়েক শো মিটার, কোথাও বা কয়েক শো কিলোমিটার। গভীরতা সম্বন্ধেও একই কথা। কোনো কোনো মহীসোপান মাত্র 20-30 মিটার গভীর, অন্য কোথাও আবার 600 মিটার গভীরতাও দেখা গেছে। তবে মোটামুটিভাবে মহীসোপানের গড় গভীরতা প্রায় 150 মিটার। মহাদেশের নদীগুলো ক্রমাগত যে পলি এনে সমুদ্রে ফেলে তা থেকেই তৈরি হয়েছে মহীসোপান অঞ্চল। সমুদ্রের অংশ হলেও ডাঙার চরিত্রের সঙ্গে এর অনেক মিল। সূর্যের আলো পৌঁছোয় বলে শতকরা 90 ভাগ সামুদ্রিক প্রাণী আর গাছপালার ভিড় এখানে। সমুদ্রের বেশির ভাগ খনিজ সম্পদও পাওয়া যায় এই অঞ্চল থেকেই।

মহীসোপানের শেষ যেখানে, মহীঢাল বা মহাদেশীয় ঢালের (Continental slope) শুরু সেখানে। বলতে গেলে আসল সমুদ্রের শুরু এখান থেকেই। এরপর সমুদ্রতল অনেকটা গড়ানে ঢালে নেমে যায় 200-250 মিটার গভীরে। এই অঞ্চলের গড়পড়তা ঢাল 20-30 ডিগরির

মধ্যে। এখানকার চেহারাটা স্থলভূমির চেয়ে অনেকটাই আলাদা। গাছপালা দেখা যায় না, বালির বদলে পাওয়া যায় ধূসর সবুজ অথবা নীল রঙের কাদা। মহাদেশীয় ঢালের গড় গভীরতা তিন-চার হাজার মিটার হলেও, কোনো কোনো জায়গায় তা ন'-দশ হাজার মিটারও হতে পারে।

মহাদেশীয় ঢাল অঞ্চলের কোথাও কোথাও আড়াআড়ি ভাবে গভীর পরিখার (Sub-marine canyons) দেখা মিলেছে। যেমন উত্তর আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে, আফ্রিকার কঙ্গো নদীর মোহনা অঞ্চলে। এই পরিখাগুলির চেহারা ইংরেজি V-অক্ষরের মত, নদী উপত্যকার সঙ্গে দারুণ মিল। তাই অনেক ভূ-বিজ্ঞানী মনে করেন, এই পরিখাগুলি আগে মহাদেশেরই অংশ ছিল। তুষার যুগে যখন সমুদ্রের জল অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছিল, সে সময়ে এই পরিখা দিয়েই বয়ে যেত নদীর জল। তবে বেশ কিছু ভূ-বিজ্ঞানীর মতে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম, কেন না তুষার যুগে সমুদ্রের জল যে এতটা নীচে নেমে গিয়েছিল, তার তেমন জোরদার প্রমাণ এখনও মেলেনি। অনেকের ধারণা, সমুদ্রের নীচে এক বিশেষ ধরনের ঢেউয়ের ধাক্কায় তৈরি হয়েছে এ-সব পরিখা। কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করেন, ধস বা ভূমিকম্পের ফলেই এ-সব পরিখার জন্ম।

কোথাও কোথাও মহাদেশীয় ঢাল ও সমুদ্রতলের মেঝের মধ্যে থাকে সমুদ্রপলিতে তৈরি ভূমি। এর নাম মহাদেশীয় রাইজ (Continental rise)। সব উপকূলে অবশ্য এদের দেখা মেলে না।

2. সমুদ্রতলের মেঝে

মহাদেশীয় ঢাল ধরে নাক বরাবর নেমে গেলেই পৌঁছনো সম্ভব সমুদ্রের তলদেশে। কোনো সন্দেহ নেই, এটিই হল সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর অঞ্চল —গড় গভীরতা প্রায় 4000 মিটার। আর এর মোট বিস্তৃতি সমুদ্রের সাত ভাগের পাঁচ ভাগ। সমুদ্রের তলদেশ কিন্তু মোটেই মসৃণ সমতল নয়, বরং কোথাও কোথাও মহাদেশের চেয়েও অনেক বেশি এবড়ো-খেবড়ো। সমুদ্র-তলদেশে মসৃণ সমতল জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু ডাঙার ওপর নদী-উপত্যকায় বিস্তীর্ণ সমতলভূমি চোখে পড়ে। সমুদ্র-তলদেশে রয়েছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি, বহু পাহাড়, শৈলশিরা, বিস্তীর্ণ ফাটল ও গভীর খাত (Trenches)। কোনো সন্দেহ নেই, এই গভীর খাতগুলিই পৃথিবীর গভীরতম অঞ্চল। এদের মধ্যে সবচেয়ে নাম-করা গভীর খাত হল প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন্স দ্বীপপুঞ্জের পুব-দিকে ও নিউ গিনির উত্তরে মারিয়ানা খাত (Mariana trench), যার সবচেয়ে গভীর বিন্দু 11,035 মিটার নীচে। আজ পর্যন্ত যতটা জানা গেছে, তাতে বলা চলে এটিই পৃথিবীর গভীরতম বিন্দু। গভীর সমুদ্র এলাকায় এ-পর্যন্ত 23টি খাতের সন্ধান মিলেছে, যার মধ্যে 18টি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। অন্যান্য খাতের মধ্যে যে-সব নাম না জানলেই নয়, তারা হল জাভা (7450 মিটার), ফিলিপাইন (10,265 মিটার), ইজু-বনিন (9810 মিটার), টঙ্গা (10,822 মিটার), কারমাডেক (10,047 মিটার), আটাকামা (8064 মিটার), কুরিল-কামচাটকা (10,542 মিটার), অ্যালিউশিয়ান (7822 মিটার) ও পোয়ের্টো রিকো (8385 মিটার)

3. সামুদ্রিক শৈলশিরা অঞ্চল

পৃথিবীর সব সমুদ্রতলেই মাঝের জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ শৈলশিরা। অবস্থানের কথা বিচার করলে শৈলশিরার আলোচনা বোধহয় সমুদ্রতলের মেঝের সঙ্গেই করা উচিত ছিল, কিন্তু চেহারার দিক থেকে শৈলশিরা এতই বিশাল যে এর আলাদা শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন।

পৃথিবীর সব সমুদ্র জুড়ে যে দীর্ঘ পর্বতমালা বা শৈলশিরা রয়েছে, তার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 65,000 কিলোমিটার, যা পৃথিবীকে প্রায় দেড়বার স্বচ্ছন্দে পাক দিতে পারে। চওড়ায় গড়পড়তা এক হাজার কিলোমিটার বেশি, উচ্চতা সব জায়গাতেই সমুদ্রতল থেকে অন্তত দু'এক কিলোমিটার উঁচু, কোথাও কোথাও সমুদ্রের জলের ওপর মাথা তুলে নবীন দ্বীপের চেহারা নিয়েছে।

মহাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ পর্বতমালা যেমন দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, সমুদ্রের সবচেয়ে দীর্ঘ শৈলশিরা তেমনি মধ্য অতলান্তিক পর্বতমালা (Mid Atlantic ridge)

ভারত মহাসাগরেও কি পর্বতমালা আছে?

যা দৈর্ঘ্যে আন্দিজের চেয়েও বেশ কয়েক গুণ বড়। এই পর্বতমালা ছড়িয়ে আছে আইসল্যাণ্ড থেকে কুমেরু পর্যন্ত প্রায় 16,000 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে।

অতলান্তিকের কোনো কোনো জায়গায় এই শৈলশিরা মাথা উঁচু করে দ্বীপের চেহারা নিয়েছে, যদিও এই শৈলশিরার বেশির ভাগ অংশই এখন জলের নীচে। সমুদ্রতল থেকে এর অধিকাংশ চূড়ার উচ্চতা 1500 থেকে 3500 মিটারের মধ্যে। তবে এর সবচেয়ে উঁচু চূড়া— 'পিকো' পর্তুগালের অধীন অ্যাজোর্স দ্বীপপুঞ্জের (Azores) একটি ছোট দ্বীপ, যা সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রায় 7000 মিটার উঁচু। দ্বীপটি জলের ওপরেই মাথা তুলেছে প্রায় 2285 মিটার।

সামুদ্রিক পর্বতমালা মোটামুটি সমুদ্রতল অঞ্চলের মাঝ বরাবর দু'পাশের মহাদেশ থেকে সমান দূরত্বে রয়েছে, তবে

পৃথিবীর সব সমুদ্র জুড়ে যে পর্বতমালা, তার দৈর্ঘ্য কত?

কোথাও কোথাও মহাদেশের ধার ঘেঁষে যে নেই, তা নয়। যেমন, এই শৈলশিরারই দক্ষিণের একটি শাখা আফ্রিকা মহাদেশের পুব দিকের সীমানা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে।

এই শৈলশিরার নীচের দিকের চেয়ে ওপরেই এবড়ো খেবড়ো ভাব বেশি। তারই মধ্যে পাহাড়ের মাঝের অংশই বেশি উঁচু। ইকো-সাউনডিং সিস্টেম (Echo-sounding system) ব্যবহারের ফলে এই শৈলশিরার যে ছবি ফুটে উঠেছে, তাতে দেখা গেছে, বহু আড়াআড়ি বিচ্যুতির (Fault) ফলে শৈলশিরাটি কখনো পুবে কখনো বা পশ্চিমে সরে গেছে। ফলে মধ্য অতলান্তিক শৈলশিরার চেহারা দাঁড়িয়েছে ইংরেজি S-অক্ষরের মত।

অতলান্তিকের মত প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরেও বেশ কিছু পর্বতমালার হদিশ মিলেছে, যদিও আকারে তারা তেমন বড় নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের তলার পর্বতমালাও কোথাও কোথাও দ্বীপ হিসেবে জেগে উঠেছে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সমুদ্রতলের মোট অংশের শতকরা কতটুকু কোন শ্রেণীতে পড়ে। শ্রেণী বিভাগটি এই রকম ঃ মহাদেশীয় সোপান (6%), মহাদেশীয় ঢাল (4%), রাইজ (4%), সমুদ্রতলের মেঝে (30%), শৈলশিরা (23%), খাত (1%) ও আগ্নেয়গিরি (2%)।

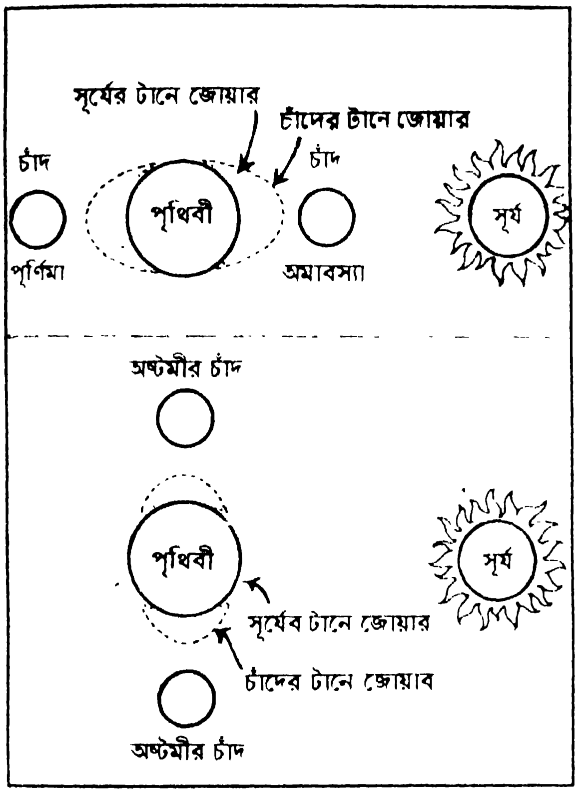
সমুদ্রের গভীরতা কী করে মাপা হয়?

যখন ইকো সাউণ্ডের (Echo sounder) আবিষ্কৃত হয়নি, সেই বিশ শতকের গোড়ার আগে পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা মাপা হত একেবারে সাবেকী প্রথায়। কুয়োর মধ্যে জল কত নীচে, সেটা দেখতে যেমন দড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়, সমুদ্রের গভীরতা মাপতেও জাহাজ থেকে ঠিক তেমনি নামিয়ে দেওয়া হত সীসে-বাঁধা দড়ি। জলের নীচে ঠেকলেই দড়ি উঠিয়ে মেপে নেওয়া হত দৈর্ঘ্যটুকু। এ-ভাবেই আন্দাজ করা হত সমুদ্রের গভীরতা। আন্দাজ বলছি, কারণ এ-ভাবে গভীরতা মাপতে গিয়ে মাঝে মাঝে ভুলচুক হতই। কেন না জলে নামানোর দড়ি এত লম্বা ও ভারি হত যে, প্রায়ই বোঝা যেত না, কখন দড়িটা সত্যিই সমুদ্রতল ছুঁয়েছে। তবে 1919 সালে ইকো সাউণ্ডার আবিষ্কৃত হবার পরে সমুদ্রের গভীরতা মাপাটা খুব সহজ হয়ে যায়। এই যন্ত্রের মোদ্দা ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয়। জাহাজ থেকে সমুদ্রের নীচে শব্দ-তরঙ্গ পাঠানো হয়। সেই তরঙ্গ সমুদ্রতলে প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে এলে তা রেকর্ড করা হয় জাহাজের মাইক্রোফোনের মাধ্যমে। জলের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ জানা থাকায় এবং শব্দ-তরঙ্গ ফিরে আসতে কতটা সময় নেয় তা মেপে হিসেব কষে এই পদ্ধতিতে মোটামুটি নিঁখুতভাবে সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়। অবশ্য 1919 সালের পর এই 7৪ বছরে ইকো সাউণ্ডার যন্ত্রেরও যে অনেক আধুনিকীকরণ হয়েছে, সে কথা বোঝাই যায়।

সমুদ্রে কি জোয়ার-ভাটা হয়?

নদীর জোয়ার-ভাটার মত সমুদ্রেও কি জোয়ার-ভাটা হয়? হ্যাঁ, নদীর জোয়ার-ভাটা আসলে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রভাবেই হয়ে থাকে। সমুদ্রে বিশাল জলরাশি সূর্য ও চাঁদ—এই দু'য়ের টানেই ফুলে-ফেঁপে ওঠে। পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যায় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ যখন একই রেখায় থাকে, তখন টান বেশি হওয়ায় সমুদ্রের জল বেশি ফুলে ওঠে। এর নাম ভরা কোটাল (Spring tide)। আর যখন চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর সঙ্গে সমকোণের সৃষ্টি করে, তখন জোয়ার একটু কমজোরী হয়। এই জোয়ারের নাম মরা কোটাল (Neap tide)। সাধারণত কৃষ্ণা আর শুক্লা অষ্টমীতেই মরা কোটাল হয়। জোয়ার এলে সমুদ্রের জল মোহনা দিয়ে ডাঙার ভেতরে নদীর খাতে ঢুকে পড়ে। তখন নদীতে জোয়ার হয়। সমুদ্রের জোয়ার বেশি হলে, নদীতেও তার প্রভাব পড়ে।

ফলে সে-সময়ে প্লাবিত হয় নদীর দু' পাশের গ্রাম, শহর, প্রান্তর।

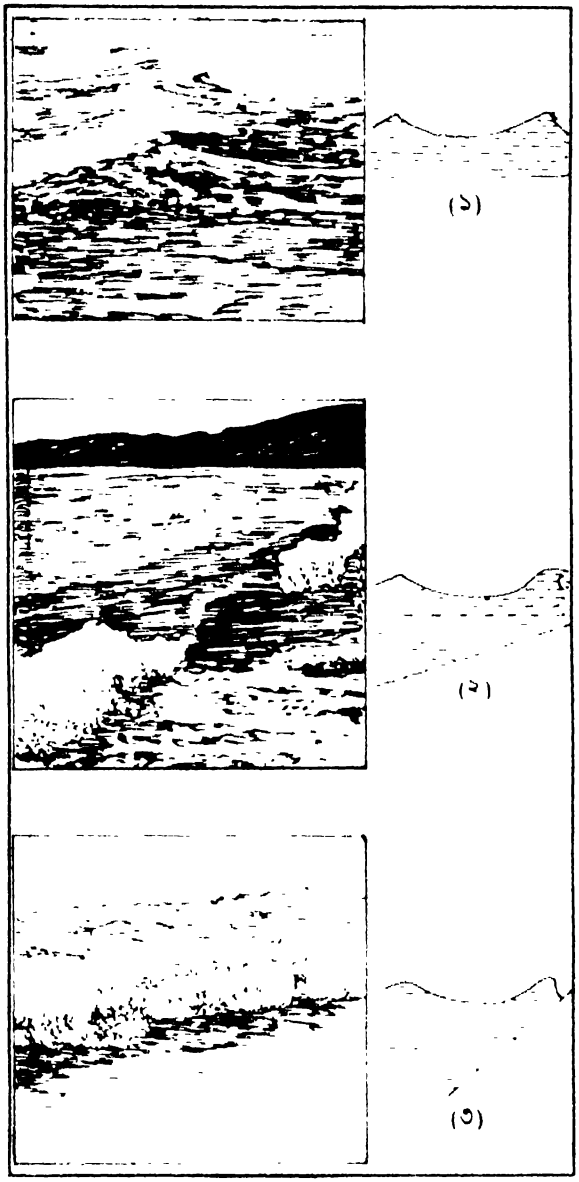


সূর্য ও চাঁদের টানে যে-ভাবে জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টি হয়

পুরীতে সমুদ্রের ঢেউ যেমন বড়, দীঘায় তেমন নয় কেন?

পুরীর সমুদ্রে কী সুন্দর কী বিশাল ঢেউ পাড়ে এসে ভেঙে পড়ছে অবিরাম। কিন্তু দীঘার সমুদ্রে এত বড় ঢেউ ওঠে না। এর কি কোনো কারণ আছে?

সমুদ্রের ঢেউ কত বড় হবে, তা মোটামুটিভাবে নির্ভর করে কয়েকটি কার্য-কারণের ওপর। প্রথমত হাওয়ার গতি। তাই সমুদ্রের ওপর বয়ে যাওয়া হাওয়ার গতি যত বেশি হবে, ঢেউয়ের আকারও তত বাড়বে। তারপর কতক্ষণ হাওয়া বয়েছে আর সমুদ্রের কতখানি অংশের ওপর দিয়ে হাওয়া বইছে, তাও দেখা দরকার। অর্থাৎ হাওয়ার তীব্রতা বা দাপটের ওপর ঢেউয়ের আকার নির্ভর করে। তবে এ দু'টি ব্যাপারেই দীঘা আর পুরীর মধ্যে তেমন কোনো তফাত নেই।



তিন ধরনের ঢেউ। (১) যখন বেলাভূমি প্রায় সমতল (২) যখন বেলাভূমির ঢাল মাঝারি (৩) যখন বেলাভূমির ঢাল বেশি

এ ছাড়া আর যে-গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি আছে, তা হল গভীরতা। দীঘায় মহীসোপানের ঢাল পুরীর মহীসোপানের চেয়ে কম। অর্থাৎ দীঘার বেলাভূমি পুরীর বেলাভূমির তুলনায় অগভীর। ফলে দূর থেকে আসা সমুদ্রের ঢেউ দীঘায় তটরেখা থেকে বেশ খানিকটা দূরেই ভেঙে পড়ে। কিন্তু পুরীতে ঢেউ ভাঙে তটরেখার অনেক কাছে। ফলে পুরীতে তটরেখার কাছে ঢেউয়ের আকার অনেক বড়

দীঘার তুলনায়। কারণ ঢেউ ভেঙে পড়ার জায়গা থেকে যত দূরেই যাওয়া যাবে, ততই ঢেউয়ের আকার ছোট হয়ে আসবে।

সমুদ্রের ধারে এত বালি কেন?

পুরী কিংবা দীঘায় গেলেই দেখা যাবে, সমুদ্রের ধার ঘেঁসে প্রচুর বালি। তাই সমুদ্রের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হতেই পারে সমুদ্রের ধারে মরুভূমির মত এত বালি থাকে কেন?

সমুদ্রবিজ্ঞানীরা বলেছেন, মহাদেশের সব নদীগুলি অবিরাম বালি এনে ফেলছে সমুদ্রে, যা গিয়ে জমা হচ্ছে সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চলে। ফলে এখানে তৈরি হয়েছে বালির এক অফুরান ভাণ্ডার। মহীসোপান অঞ্চলের এই বালিই ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে সমুদ্রের বেলাভূমিতে। আবার ফিরেও যায়। তবে সবটা নয়, তার কিছুটা থেকে যায়। ফলে ধীরে ধীরে সমুদ্র-বেলাভূমিতে গড়ে ওঠে বিশাল বালিয়াড়ি।

এ-ছাড়া অবশ্য ঢেউয়ের ধাক্কায় তটদেশের পাথরও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়, ফলে বেলাভূমিতে বালির ভাগ বাড়ে। অবশ্য সমুদ্র-বেলাভূমিতে ভাল বালিয়াড়ি গড়ে ওঠবার জন্য প্রয়োজন অল্প ঢালের প্রায় সমতলভূমি, যাতে সহজেই বালি জমতে পারে।

হিমশৈল জলে ভাসে কেন?

হিমশৈল কথাটির মানে বরফের পাহাড়। এই পাহাড় পুরোপুরি বরফেরই তৈরি, পাহাড়ের গায়ে বরফ জমে তৈরি বরফের পাহাড় নয়। এই পাহাড় কেন সমুদ্রের জলে থাকে, ভাসেই বা কী করে!

জল জমে বরফ হয়। পাহাড়ী এলাকায় এই বরফ যখন চলতে শুরু করে, তখন তাকে বলে হিমবাহ (Glacier)। হিমবাহ থেকে বিরাট বরফের চাঙড় সমুদ্রে ভেঙে পড়লে তা হয় হিমশৈল (Iceberg)। জল জমে বরফ হলেও, বরফের ঘনত্ব জলের চেয়ে কম। তাই হিমশৈল জলে ভাসে, যদিও ভাসমান অবস্থায় হিমশৈলের দশ ভাগের ন'ভাগ অংশই জলের নীচে ডুবে থাকে। তাই কেবল ভাসমান অংশটুকু দেখে পুরো হিমশৈলের আকার কল্পনা করা খুবই কঠিন। সাধারণ অবস্থায় হিমশৈলের দেখা মেলে মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে, কিন্তু সমুদ্রস্রোতের ধাক্কায় মেরু অঞ্চলের সমুদ্র ছেড়ে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রে প্রায়ই চলে আসে। জাহাজ চলাচলের পথে হিমশৈল প্রায়ই সমস্যার সৃষ্টি করে। 1912 সালের 15 এপ্রিল ব্রিটিশ জাহাজ 'টাইটানিক' সাদাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পথে এক পেল্লাই চেহারার হিমশৈলের ধাক্কায় ডুবে যায়। প্রাণ হারায় 1513 জন মানুষ। আজকাল তাই জাহাজের যাত্রাপথ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ রাখার জন্য মেরু অঞ্চলের দেশগুলির রক্ষীজাহাজ হিমশৈলের ওপর কড়া নজর রাখে।

সমুদ্রের জল কি কমে যাচ্ছে?

সমুদ্রের মোট জলের পরিমাণ মোটেই কমছে না, বরং বেড়েই চলেছে। সমুদ্রের নীচে ও ওপরের আগ্নেয়গিরিগুলি থেকে যে-গ্যাস বেরিয়ে আসে, তার অনেকটাই জলীয় বাষ্প। এই জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে জলের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়েই তুলছে। তবু বিগত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সময়ে বিশেষত প্লায়াস্টোসিন যুগে (Pleistocene), তুষার যুগ আসবার ফলে সমুদ্রের অনেকটা জলই বেশ কয়েকবার জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। তখন সমুদ্রের জলের উচ্চতা অনেকটা নেমে যায়, কমে গিয়েছিল মোট জলের পরিমাণ। সুতরাং নতুন তুষার যুগ এলে আবার তরল জল কমে গিয়ে বেড়ে যেতে পারে বরফের পরিমাণ।

কলকাতা কি কোনোদিন সমুদ্রের নীচে ডুবে যেতে পারে?

মাঝে মাঝেই শোনা যায় সমুদ্রের জল বেড়ে গিয়ে নাকি পৃথিবীর বহু বড় শহরকে ডুবিয়ে দেবে। এই নামের তালিকায় কলকাতার নামও আছে। সত্যিই কি তাই! সমুদ্রের জল বেড়ে কি কলকাতাকে ডুবিয়ে দিতে পারে?

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্তত তিনটি ভূতাত্ত্বিক সময়ে তুষার যুগ এসেছিল, প্রাক-কেমব্রিয়ান যুগের শেষ ভাগে (60-65 কোটি বছর আগে), পারমো-কার্বোনিফেরাস যুগে (25 কোটি বছর আগে) ও প্লায়াস্টোসিন যুগে (10 থেকে 1 লক্ষ

বছর আগে)। প্লায়াস্টোসিন যুগে আবার চারটি মিনি তুষার যুগের দেখা মিলেছে। অনেকেরই হয়তো মনে হবে, সামুদ্রিক প্লাবনের কথায় আবার তুষার যুগের প্রসঙ্গ আসছে কী করে। সম্পর্ক খুবই আছে, কারণ সমুদ্রের জল জমে যদি বরফের পাহাড় তৈরি হয়, তবে সমুদ্রের জল কমবেই। বা ঘুরিয়ে বলা যায়, সমুদ্রের জলরেখা নেমে যাবে, যেমন নেমে গিয়েছিল প্লায়াস্টোসিন যুগের শেষ দিকে। প্রায় এক লাখ বছর আগে পৃথিবীতে যে শেষ তুষার যুগ এসেছিল, তার ফলে সমুদ্রের জল নেমে গিয়েছিল অন্তত একশো মিটার। সেই তুষার যুগ শেষ হয়েছে মাত্র দশ হাজার বছর আগে। শুরু হয়েছে উষ্ণ যুগের, ভূ-বিজ্ঞানীর ভাষায় তুষার-মধ্যবর্তী যুগ বা Interglacial period। তুষার যুগে দুই মেরুতে যে বরফ জমেছিল, তা এখন গলছে। হয়তো এই বরফ গলা শেষ হয়নি এখনও। যদি আরো বরফ গলে, তবে সমুদ্রের জলের উচ্চতা যে আরো বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভূ-বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, মেরু অঞ্চলের সব বরফ যদি গলে, তবে শুধু কলকাতা নয়, পৃথিবীর আরো অনেক বড় শহরই ডুবে যাবে জলের নীচে। তবে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বেড়ে যাওয়াটা কখনোই এক দিনে হবে না। সব বরফ গলতে হয়তো আরো কয়েক হাজার বছর লেগে যাবে।

তুষার যুগে কি উষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রের জলও ববফ হয়ে গিয়েছিল?

তুষার যুগে সব সমুদ্রের জল বরফ হয়ে যায়নি, কেবল মাত্র মেরু অঞ্চলের সীমানাই বেড়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সব প্রাণীরই মোটামুটি অস্তিত্ব ছিল, তবে সংখ্যায় হয়তো তারা কিছুটা কমে যায়। একটি হিসেব থেকে জানা গেছে, তুষার যুগে পৃথিবীর বার্ষিক গড় তাপমাত্রা কমেছিল 7 থেকে 10 ডিগরি সেলসিয়াস।

সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর জায়গা কোনখানে?

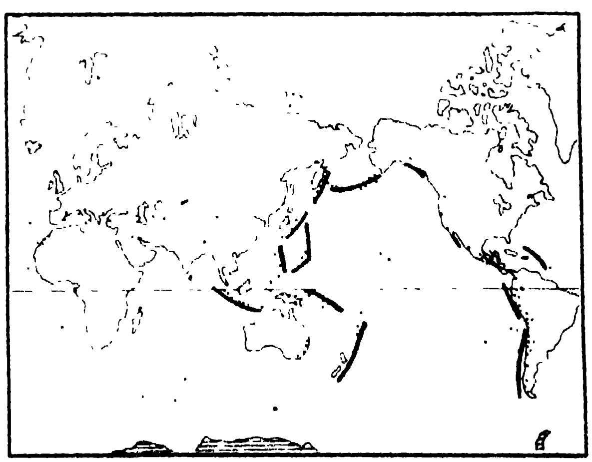
পৃথিবীর সব সমুদ্র মিলিয়ে সবচেয়ে গভীর জায়গা প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা খাত। এর সবচেয়ে গভীর বিন্দুটি 11,035 মিটার।

সমুদ্রের নীচে কি আগ্নেয়গিরি আছে?

নানা দেশ থেকে মাঝে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাতের খবর পাওয়া যায়, কিন্তু সমুদ্রজলের নীচের কোনো অগ্ন্যুৎপাতের খবর তো পাওয়া যায় না। তবে কি সমুদ্রের জলের নীচে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই!

আছে। পৃথিবীর ডাঙায় যত আগ্নেয়গিরি আছে, তার চেয়েও ঢের বেশি আগ্নেয়গিরি রয়েছে সমুদ্রের জলের তলায়। পৃথিবীর শতকরা 29 ভাগ স্থল, 71 ভাগ জল। তাই ডাঙার মত সমুদ্রের নীচেও যে প্রায়ই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সমুদ্রের গড় গভীরতা 5000 মিটার ধরে নিলে বুঝতে পারা যায়, আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি এক একটি আগ্নেয়দ্বীপ গড়তে কতখানি লাভার উদ্‌গীরণ প্রয়োজন। তবু এ-ভাবেই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তৈরি হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই, তাহিতি, অতলান্তিকের অ্যাজোর্স দ্বীপপুঞ্জ কিংবা সেন্ট হেলেনা দ্বীপ।

অতল সাগরের নীচে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে সাধারণভাবে তার হদিশ পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, অবশ্য কোনো অগ্ন্যুৎপাত বা বিস্ফোরণ ঘটলে কাছাকাছি অঞ্চলের জল উত্তপ্ত ও কালো হয়ে ওঠে। সেই সময়ে কোনো জাহাজ কাছাকাছি এসে পড়লে তার নাবিকদের চোখে অগ্ন্যুৎপাত ধরা পড়তে পারে, যদিও সে-সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। তবে সমুদ্রের বুকে নতুন কোনো দ্বীপ জেগে



মোটা রেখাগুলি সমুদ্রের খাত (Trench)। ফুটকি দিয়ে বোঝানো হয়েছে আগ্নেয়গিরি।

উঠলে তা এক দিন ধরা পড়ে যায় অভিজ্ঞ নাবিকের সন্ধানী চোখে।

এ-ভাবেই সমুদ্রের নীচে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে 1831 সালে ভূমধ্যসাগরের বুকে একটি নতুন আগ্নেয়দ্বীপ জেগে ওঠে। এই গ্রাহাম দ্বীপের অবস্থান সিসিলি দ্বীপ থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। অথচ জন্মের বছর কয়েক আগেও এই গ্রাহাম দ্বীপের জায়গায় সমুদ্রের গভীরতা ছিল প্রায় 180 মিটার।

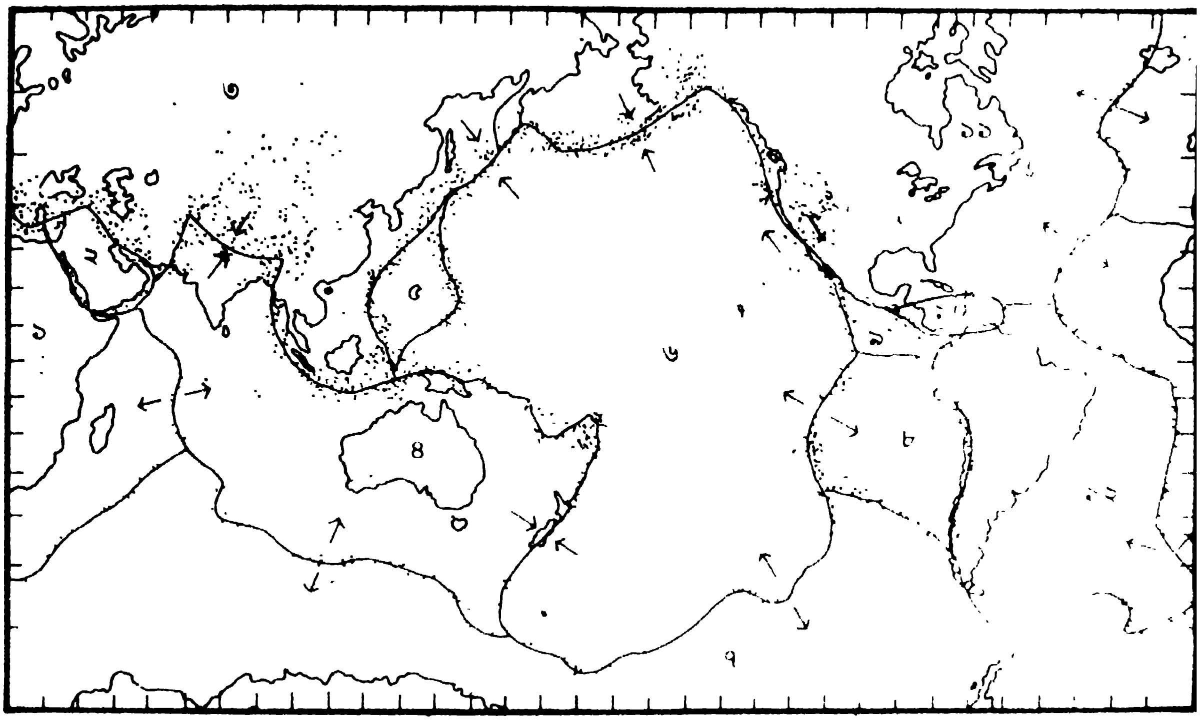
গ্রাহাম দ্বীপের জন্মের সপ্তাহ দুয়েক আগে 1831 সালে ওই অঞ্চল পেরোবার সময়ে একটি জাহাজের আরোহীদের মনে হয়, জাহাজটা যেন কোনো ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে। আসলে সমুদ্রের নীচে ডুবো পাহাড়ে তখন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সে কম্পন অনুভব করা গেছে সিসিলি দ্বীপেরও তটদেশে। এরপর 10 জুলাই নাগাদ ওই অঞ্চল পেরোবার সময়ে আর একটি জাহাজের নাবিকরা দেখতে পায়, সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে আসছে প্রায় 18 মিটার উঁচু, 730 মিটার পরিধির এক বিরাট জলস্তম্ভ। জলপুঞ্জের পেছন পেছন ঘন পুঞ্জীভূত বাষ্প শূন্যে প্রায় 550 মিটার ওপরে উৎক্ষিপ্ত হল। কিছুদিন পরে ফেরার পথে জাহাজের নাবিকরা দেখলো, ওখানে জলের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি নতুন দ্বীপ। জল থেকে দ্বীপটি তখন প্রায় 3.5—4 মিটার উঁচু। তার মাঝের একটি জ্বালামুখ থেকে প্রচুর বাষ্প, পাথরের টুকরো উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। সমুদ্রে ভাসছে অজস্র মৃত মাছের শরীর। জলের রঙ বাদামী লাল, টগবগ ক'রে ফুটছে। সারা জুলাই মাস এ-রকমই চললো। এর মধ্যে দ্বীপটির উচ্চতা বেড়ে হল 27.5 মিটার, পরিধি 1.2 কিলোমিটার। কিন্তু আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই দ্বীপটির উচ্চতা বেড়ে হল 60 মিটার, পরিধি প্রায় 5 কিলোমিটার। আরো দু'মাসের মধ্যেই দ্বীপটি তার পূর্ণাঙ্গ চেহারা পেয়ে গেল। গ্রাহাম দ্বীপের এই হল জন্মকাহিনী। এ-ভাবেই সমুদ্রের মধ্যে জন্ম হয়েছে আরো কয়েক গণ্ডা আগ্নেয়দ্বীপের। হাল আমলে উল্লেখযোগ্য জাপানের কাছে মায়োজিন দ্বীপ, যার জন্ম 1952-53 সালে, কিন্তু পরে বিস্ফোরণের ফলে ওই দ্বীপটি আবার তলিয়ে যায় সাগরের গভীরে। এ-ছাড়া রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফ্যালকন দ্বীপ (1913 সালে ডুবে গিয়ে আবার মাথা তোলে 1926 সালে), আইসল্যাণ্ডের কাছে সার্টসে দ্বীপ (1963) ও ইন্দোনেশিয়ার আনা কাকাতোয়া দ্বীপ (1929)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ব্যারেন দ্বীপ (Barren Island) ও নারকোনডাম (নারকোনডাম শব্দের অর্থ নরক-কুণ্ড) দ্বীপের (Narcondam Island) কথা—যারা আসলে যথাক্রমে সজীব ও ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, সুদূর অতীতে এ-দু'টি আগ্নেয়দ্বীপও ছিল নীল সমুদ্রের নীচে। হাল আমলের মধ্যে ব্যারেন দ্বীপে 1795, 1803, 1991 ও 1995 সালে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, কিন্তু নারকোনডাম আগ্নেয়গিরিটি সজীব ছিল প্রায় দশ লাখ বছর আগে, প্লায়াস্টোসিন যুগে। অতলান্তিক মহাসমুদ্রের নীচে মধ্য অতলান্তিক শৈলশিরায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে বহু সজীব আগ্নেয়গিরি রয়েছে। সারা পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির মানচিত্রটি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, সমুদ্রের গভীর খাতগুলির পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ডুবো আগ্নেয়গিরি।

সমুদ্রের নীচে কি ভূমিকম্প হয়?

'ভূমিকম্প' কথাটির অর্থ ভূমির কম্পন। এখানে ভূমি বলতে বোঝাচ্ছে পৃথিবীর ভূমি, যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রতল ও মহাদেশের স্থলভাগ দুই-ই। তাই ভূমিকম্প যেমন ডাঙাতে হচ্ছে, জলের নীচে সমুদ্রতলের শিলাস্তরেও ঘটছে অহরহ।

ভূপৃষ্ঠ, অর্থাৎ পৃথিবীর পিঠ, তা সে ডাঙাতেই হোক বা জলের নীচেই হোক, বেশ কতকগুলো প্লেট বা পাত দিয়ে তৈরি। একটা শিলার পাত আরেকটা পাতের সঙ্গে লেগে আছে মাত্র, শক্তভাবে জোড়া নেই। তাই পৃথিবীর ভেতরের গ্যাস বা লাভা যখন বেরিয়ে আসবার জন্য চেষ্টা করে, অথবা অন্য কারণে আলোড়ন হয়, তখন ওই পাতগুলি দু'পাশে সরে গিয়ে অন্য পাতের গায়ে ধাক্কা মারে। ফলে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। [দ্রষ্টব্য ঃ ভূমিকম্প কেন হয়?] ডাঙা আর সমুদ্রের সব জায়গা জুড়েই তখন ভূমিকম্পের প্রলয় নাচন শুরু হয়।

ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রগুলির (Epicentre) ছক দেখলে বোঝা যায়, এদের অবস্থান মোটামুটিভাবে পৃথিবীর পাতগুলির সীমানায়। এই উপকেন্দ্রগুলি অনেকটা মালার



পৃথিবীর পিঠ এই প্রধান 12টি পাত দিয়ে তৈরি। ফুটকি দিয়ে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Epicentre) বোঝানো হয়েছে।

মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পৃথিবীর গলায়। একটা নয়, বেশ কয়েকটা বড় মালার আকারে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বা দামাল ভূমিকম্পের মালাটি হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় মণ্ডল (Circum-Pacific belt), যা প্রশান্ত মহাসাগরে চারদিক থেকে মেখলার মত ঘিরে রেখেছে। অন্যটি ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল (Mediterranean belt) যার পরিধি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু ক'রে হিমালয় ও এশিয়া মাইনর হয়ে আল্পস পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত। এই পরিমণ্ডলের অনেকটাই ডাঙা হলেও বেশ খানিকটা অঞ্চল সমুদ্রের মধ্যেই অথবা ধারে কাছে রয়েছে।

বিশ বছর আগের কথা। 1964 সালের 27 মার্চ গুড ফ্রাইডের দিন প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আলাস্কাতে এক ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়ে গেল। তীর ছাপিয়ে জলের ঢেউ উঠল 3.5 মিটার। সমুদ্রের জলে তৈরি হল ভয়ংকর ঢেউয়ের ফণা, যা আলাস্কার কয়েকটি বন্দরকে পুরোপুরি ধ্বংস করল, অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারালো। শুধু আলাস্কা নয়, কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে সাগর পারের অনেক শহর এবং গ্রামকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বহু কোটি ডলারের সম্পত্তি নষ্ট হল। এই ভয়ংকর সামুদ্রিক ঢেউয়ের নাম 'সুনামি' (Tsunami), জাপানি ভাষায় এর অর্থ 'নীল মৃত্যু'। এর জন্ম কোনো জোয়ার-ভাটা বা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য নয়, এর কারণ একটাই, তা হল ভূমিকম্প।

1883 সালের 27 আগস্ট এই রকমের আর একটি সুনামি তৈরি হয়েছিল ক্রাকাতোয়া দ্বীপে ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে। সেদিন সমুদ্রের উত্তপ্ত জল সাপের মত ফণা তুলে প্রচণ্ড বেগে বয়ে গিয়েছিল সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের কয়েক শো গ্রামের ওপর দিয়ে। প্রাণ হারিয়েছিল কয়েক লক্ষ অসহায় মানুষ।

সমুদ্রজল থেকে কি বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে?

আজকাল তো প্রায়ই লোডশেডিং। অর্থাৎ বিদ্যুতের ঘাটতি পড়ছে প্রায় প্রতিনিয়তই। তা এই বিদ্যুৎ ঘাটতির কিছুটা কি মেটানো যায় সমুদ্রজল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি ক'রে?

সমুদ্রজল থেকে দু'ভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে। প্রথমত, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার শক্তি থেকে। দ্বিতীয়ত, সমুদ্রজলে ওপরের স্তর ও নীচের স্তরের মধ্যে তাপের তারতম্যকে কাজে লাগিয়ে।

জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরির চিন্তা মানুষের বহুদিনের। পৃথিবীর মধ্যে গ্রিকরাই বোধ হয় প্রথম এ-ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিল। অবশ্য ইংরেজরাও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি। ডোভার বন্দরে ঢোকার মুখে খাঁড়িতে ইংরেজরা মিল বসিয়েছিল জোয়ারের শক্তিকে কাজে লাগাবে বলে। 1967 সালে ফরাসি বিজ্ঞানীরা ভূমধ্যসাগরের তীরে রানস্ নদীর খাড়িতে সাগরের জোয়ার-ভাটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কেন্দ্রটি চালু করেন বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে। এ-ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র পৃথিবীতে এই প্রথম। এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় 8 কোটি ডলার।

এ-ভাবে বিদ্যুৎ তৈরির সূত্রটি তেমন জটিল নয়। জোয়ারের সময়ে ঢুকে পড়া সমুদ্রের জলকে আটকে, পরে সেই জলের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পৃথিবীর সব সমুদ্রোপকূলেই অবশ্য এ-জাতীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ বাঁধ দেওয়ার জন্য খাড়ির মুখ যথেষ্ট সরু হওয়া দরকার, তা ছাড়া জোয়ারের জলের উচ্চতাও অন্তত 4 মিটার বাড়া প্রয়োজন। না হলে খরচ ও প্রযুক্তির দিক থেকে অসুবিধেয় পড়তে হয়। এ-ধরনের বেশ কিছু জায়গা ভারতের উপকূলেও মিলবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। আপাতত এ ধরনের একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কান্দলা বন্দরের কাছে তৈরি হওয়ার কথা।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির ব্যাপারে আরো যে-সব দেশ এগিয়ে এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, নরওয়ে ও ভারত। ইতিমধ্যে রাশিয়া বারেন্টস সাগরের তীরে কিসলয় খাড়ি অঞ্চলে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়েছে। মিজেন উপসাগরে ও খোটস অঞ্চলেও আরো দু'টি বসাচ্ছে।

একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, জোয়ারের সময়ে জলের উচ্চতা 9 মিটার থেকে 14 মিটার হলে 544 মেগাওয়াট ক্ষমতা-সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা যায়।

শুধু জোয়ার-ভাটা নয়, সাগরের ঢেউয়ের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ঝোড়ো হাওয়ায় অতলান্তিক মহাসাগরের যে ঢেউ ওঠে সেগুলির প্রতি মিটার উচ্চতায় প্রায় 10 মেগাওয়াট শক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে পারে। সাগরের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কাজে পৃথিবীর বহু দেশ এগিয়ে এসেছে। 1980 সালে ওয়াশিংটনে এ-ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনও হয়ে গেছে। জানা গেছে, সমুদ্রের বুকে প্ল্যাটফর্ম বা জাহাজ বসিয়ে ঢেউয়ের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যাবে।

শুধুমাত্র সমুদ্রের জোয়ার ভাটা বা ঢেউ নয়, সাগর-জলের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে উষ্ণতার তফাত রয়েছে, তার তারতম্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করা সম্ভব। দেখা গেছে, কর্কট ও মকর ক্রান্তীয় এলাকায় সমুদ্রের ওপরের স্তর ও 300 মিটার গভীর জলের স্তরের মধ্যে তাপমাত্রার তফাত প্রায় 20 ডিগরি সেলসিয়াস। তাপমাত্রার এই তফাত থেকে প্রথম বিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনা করেন আরসেন দ্য আরসনভাল। এ-ভাবে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য একটি বাষ্পীয় টারবাইন বিদ্যুৎ জেনারেটরের পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন।

> **সমুদ্রের জলের কতটা উচ্চতায় 500 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব?**

তবে এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার কৃতিত্ব ফরাসি বিজ্ঞানী জর্জ ক্লদের। 1929 সালে কিউবার সমুদ্র উপকূলে এ-ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও সফলতা আসে অনেক পরে 1979 সালে। সে-সময়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রজলের উষ্ণতার হেরফেরকে কাজে লাগিয়ে তরল অ্যামোনিয়াকে বাষ্পীভূত ক'রে টারবাইন চালানো হয়। এ-ভাবে প্রায় 50 কিলোওয়াট শক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বসানো সম্ভব হয়েছিল। হাল আমলেও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র উপকূলে ইয়াহোল পয়েন্টে 20 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানো হয়েছে। কথা আছে, কাজ ঠিক মত চললে পরে এটির ক্ষমতা বাড়িয়ে করা হবে 35 মেগাওয়াট। এ-সব বিদ্যুৎকেন্দ্রে বাষ্পীভবনের জন্য

ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যামোনিয়ার বদলে তরল রাসায়নিক ফ্রিওন, যা বাষ্পীভূত হয়ে ঘোরাবে টারবাইনের চাকা। ভারতেও মাদ্রাজ আই আই টি এ-ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই লাক্ষা দ্বীপে এ-ধরনের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করার প্রস্তাব রয়েছে।

সমুদ্রে কি অনেক খনিজ পাওয়া সম্ভব?

মহাদেশের বুক থেকে যে-হারে নানা ধরনের খনিজ তুলে খরচ ক'রে ফেলা হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতেই যে খনিজের ভাঁড়ার শূন্য হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই সময় থাকতেই মানুষ খনিজের সন্ধানে হাত বাড়িয়েছে সমুদ্রের দিকে। এ পর্যন্ত যতটা জানা গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের খনিজ সম্পদ মোটেই হেলাফেলা করার নয়। সারা পৃথিবীতে এখন প্রতি বছর সমুদ্র থেকে যতটা খনিজ সম্পদ আহরিত হচ্ছে, তার দাম আনুমানিক 4000 কোটি ডলারের বেশি। আর এই অঙ্কটি প্রতি বছরই বেড়ে যাচ্ছে।

সমুদ্র থেকে যে-খনিজ সম্পদ আমরা আহরণ করছি, তা মোটামুটি দু' ধরনের। (1) সমুদ্রজল থেকে ও (2) সমুদ্রতল থেকে। অর্থাৎ খনিজ সম্পদের একাংশ আমরা নিষ্কাশন করছি সমুদ্রজল থেকে, অন্য অংশটি খনন বা ড্রিলিং ক'রে তুলে আনছি সমুদ্রের তলা থেকে।

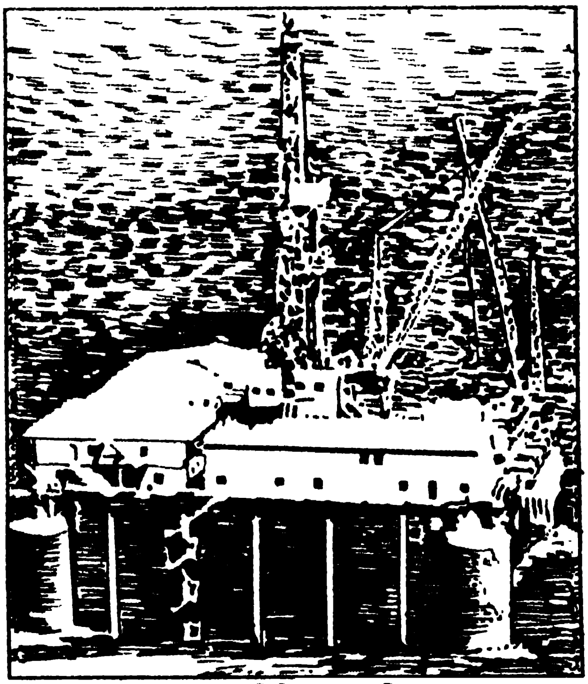
সমুদ্রজল থেকে আমরা যা পাই, তা হল খাবার নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ধাতু ও ম্যাগনেসিয়াম সল্ট, ব্রোমিন ও নুন-মুক্ত জল। এ-ছাড়া জলে আর যা আছে, যেমন সোনা, রুপো, ভ্যানাডিয়াম ইত্যাদি, তা এখনও পর্যন্ত লাভজনক ভাবে নিষ্কাশনের পদ্ধতি আয়ত্ত করা যায়নি। এক হাজার ঘন মিটার সমুদ্রজল থেকে 1.25 মেট্রিক টন নুন পাওয়া সম্ভব। সেই মত হিসেব করলে সমুদ্রজল থেকে এত কোটি কোটি টন নুন পাওয়া যাবে যে কোনো দিনই আর মানুষের নুনের ভাঁড়ারে টান পড়ার কথা নয়।

নুনের পর এবার আসি ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর কথায়। দেওয়ালির সময়ে ছোটরা ম্যাগনেসিয়ামের তার জ্বালিয়ে রোশনাই করলেও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর আসল কদর উড়ো-জাহাজের শরীর তৈরির কাজে। কারণ ম্যাগনেসিয়াম ধাতু হালকা অথচ শক্ত। তাই অ্যালুমিনিয়ামের বদলে সংকর ধাতু তৈরিতে আজকাল এর খুবই চাহিদা। এই সংকর ধাতু উড়ো-জাহাজের কাঠামো ছাড়াও অন্যান্য কাজে লাগে। ডাঙায় ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর ঘাটতি পড়ায় মানুষের নজর পড়েছে সমুদ্রের দিকে। এখন নয়, আজ থেকে প্রায় 70-80 বছর আগেই। দেখা গেছে, এক ঘন মিটার সমুদ্রজলে প্রায় 1 কিলোগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম আছে। সবটা না হলেও এর অনেকটাই উদ্ধার করা সম্ভব। 1916 সালে ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরা সমুদ্রজল থেকে প্রথম ম্যাগনেসিয়াম আলাদা করতে সক্ষম হন।

ম্যাগনেসিয়াম ধাতু ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম-ঘটিত লবণ উদ্ধার করা হচ্ছে সমুদ্রজল থেকে, যা ব্যাপকভাবে ওষুধ তৈরির কাজে লাগছে।

সমুদ্রজলের প্রতি ঘন মিটারে প্রায় 400 গ্রাম পটাসিয়াম ধাতু থাকলেও সমুদ্রজল থেকে এই ধাতু উদ্ধারের প্রচেষ্টা এখনও তেমন জোরদার হয়নি।

সমুদ্রজলে যে ব্রোমিন আছে, এ কথা 1926 সালে প্রথম বলেছিলেন বিজ্ঞানী আঁতোয়া জেরোম ব্যালার। আজকাল ব্রোমিনের খুবই চাহিদা, কারণ ব্রোমিন থেকে ইথিলিন



সমুদ্রে ভাসমান মঞ্চ থেকে ড্রিলিং করে খনিজ তেল তোলা হচ্ছে

ডাইব্রোমাইড নামে এমন একটি যৌগ তৈরি হয়, যা পেট্রোলের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বাড়তি চাহিদা মেটাতে সমুদ্রজল থেকে ব্রোমিন নিষ্কাশনের

জন্য বহু কারখানা সমুদ্রের উপকূল জুড়ে গড়ে উঠেছে। বলতে গেলে, সারা পৃথিবীর মোট চাহিদার প্রায় অর্ধেকই মেটাচ্ছে সমুদ্রের জল।

সমুদ্রের জল ছেড়ে সমুদ্রতলের দিকে তাকালেও আমরা বহু খনিজের সন্ধান পাব, যা মোটামুটিভাবে মহীসোপান ও মহীঢাল অঞ্চলেই ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে রয়েছে (1) পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও গন্ধক (2) ম্যাঙ্গানিজ নুড়ি, ফসফোরাইট নুড়ি ইত্যাদি (3) নুড়ি ও বালি।

আজকের পৃথিবীতে মোট যে-পরিমাণ পেট্রোলিয়াম প্রতি বছর খরচ হচ্ছে, তার মধ্যে শতকরা 25 ভাগই আসছে সমুদ্রের মহাদেশীয় সোপান ও ঢাল অঞ্চল থেকে। আগে তেল-বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল সাগর অঞ্চলের সব পেট্রোলিয়ামই রয়েছে মহীসোপান অঞ্চলে, কিন্তু মেক্সিকো উপসাগরে এখন খনিজ তেল উঠছে 3—4 হাজার মিটার গভীর মহীঢাল অঞ্চল থেকেও। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য মহীঢাল অঞ্চলেও তেলের জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীদের হিসেব মত সমুদ্রের নীচে প্রায় 2,00,000

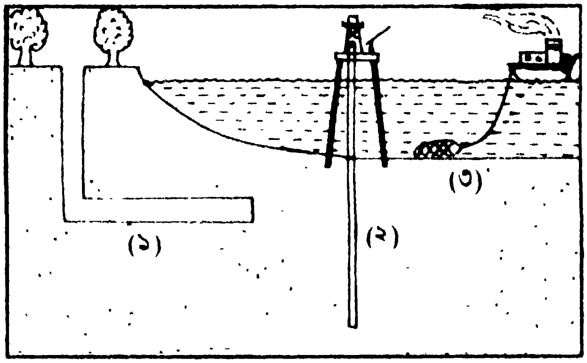
সমুদ্রের নীচে কত পেট্রোলিয়াম আছে?

কোটি ব্যারেল পেট্রোলিয়াম মজুত আছে (1 ব্যারেল= 0.164 ঘনমিটার)।

ভারতের উপসাগরীয় অঞ্চলেও, যেমন মুম্বাই শহর থেকে 120 কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগরে অবস্থিত বোম্বে হাই থেকে প্রচুর পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত এখান থেকে বছরে প্রায় 200 লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম সংগ্রহ করা হচ্ছে। বম্বে হাই ছাড়াও তেলের খোঁজ মিলেছে বঙ্গোপসাগরে গোদাবরীর মোহনায় ও আরব সাগরে নর্মদার মোহনায়। প্রাকৃতিক গ্যাস মিলেছে আন্দামানের উপকূলে, পণ্ডিচেরির কাছে পোর্তো নোভো অঞ্চলে। এ-ছাড়া সমুদ্রের নীচে লবণ গম্বুজ (Salt dome) থেকে বেশ কিছুটা গন্ধকও উদ্ধার করা হচ্ছে, যেমন, মেকসিকো উপসাগর থেকে।

সমুদ্রজলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে-রাসায়নিক খনিজের (Chemogeneous) জন্ম তার মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ নুড়ি, ফসফোরাইট নুড়ি ও বেরিয়াম নুড়ি।

ভূ-বিজ্ঞানীদের একটা হিসেব থেকে জানা গেছে, ভারত মহাসাগরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে অপর্যাপ্ত ম্যাঙ্গানিজ নুড়ি। কোনো কোনো জায়গায় ম্যাঙ্গানিজ নুড়ির পরিমাণ এতই বেশি যে, এক বর্গ কিলোমিটার এলাকায় 20 হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি নুড়ি রয়েছে বলে ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই ধরনের নুড়ির মধ্যে শুধু ম্যাঙ্গানিজ (36% পর্যন্ত) নয়, লোহা (36% পর্যন্ত), নিকেল (2 % পর্যন্ত), তামা (2.5 % পর্যন্ত), কোবাল্ট (2 %পর্যন্ত) ইত্যাদি অন্যান্য ধাতুও পাওয়া গেছে।



সমুদ্র তল থেকে তিনভাবে খনিজ সম্পদ তোলা হয় (1) খনি থেকে (2) ড্রিলিং করে (3) ড্রেজিং করে অর্থাৎ বেলচার সাহায্যে

উত্তর আন্দামানের পুবদিকের সমুদ্রে ফসফোরাইট নুড়ি পাওয়া গেছে 165 মিটার গভীরতায়। যকৃৎ আকারের এই কালো রঙের নুড়ি খুবই শক্ত। কেরালার উপকূল অঞ্চলে যে ফসফোরাইট নুড়ি পাওয়া গেছে, তাতে ফসফেটের পরিমাণ শতকরা 18 ভাগ পর্যন্ত।

ক্যালসিয়াম সালফেট, স্ট্রনসিয়াম সালফেট মিশ্রিত কিছু বেরিয়াম নুড়িও পাওয়া গেছে ভারতের সমুদ্র এলাকায়।

এ-সব ছাড়াও সমুদ্রের তলা থেকে প্রতি বছর প্রায় 10 কোটি টন বালি ও পাথরের নুড়ি তোলা হচ্ছে, যা বহু দেশেই রাস্তা-ঘাট বা বাড়ি-ঘর তৈরির কাজে লাগছে। তবে তীরের কাছাকাছি এ-ধরনের খননের কাজ চালালে কিছু কিছু পরিবেশগত ক্ষতি হতে পারে।

এ-ছাড়াও পৃথিবীর কোথাও কোথাও—বিশেষত স্কটল্যাণ্ড ও জাপানে—সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চল থেকে কয়লা কেটে ওপরে তোলা হচ্ছে।

আমাদের সমুদ্র কি ক্রমে নোংরা হয়ে যাচ্ছে?

বহুদিন ধরে আমাদের ধারণা ছিল পৃথিবীর যত কিছু

জঞ্জাল আবর্জনা তা সমুদ্রে ফেললেই সব মুশকিল আসান। তাই যুগ যুগ ধ'রে আমরা নানা ধরনের নোংরা আবর্জনা নির্বিচারে ফেলেছি সর্বংসহা সমুদ্রের বুকে। একথা সত্যি যে নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতায় নানা রকম দূষিত পদার্থের অনেকটাই হজম ক'রে নেয় সমুদ্র। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। ফলে আমাদের সমুদ্র আমাদের চোখের সামনেই নোংরা হয়ে যাচ্ছে বিপজ্জনকভাবে।

1954 সালে প্রশান্ত মহাসাগরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কথা মনে করা যাক। এই বিস্ফোরণের ফলে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরের জাপানী জেলেরাও তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়ে পড়ে। একজন মারা যায়। বহু শিশুর গলগণ্ড রোগ দেখা দেয়।

এখানেই শেষ নয়, 1968 সালে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটা দেশ তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ভর্তি বেশ কিছু থলে ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রের জলে। বলা যায় না, ওই সব থলেগুলো ফেটে গিয়ে হয়তো সেই আবর্জনা মিশে গিয়েছে সমুদ্রের জলে! তার ফলাফল কি ভয়ঙ্করই না হতে পারে!

জ্বালানি তেল মিশে সমুদ্রের জল নোংরা হওয়ার ঘটনাও আমাদের চোখের সামনেই অহরহ ঘটছে। 1967 সালে কুয়েতের পেট্রোলিয়াম-বোঝাই 'টোরি ক্যানিয়ন' নামে একটা জাহাজ ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেল সমুদ্রে। তেলের ট্যাংকার ফেটে হুড়হুড় ক'রে 117 হাজার টন তেল বেরিয়ে মিশে গেল সমুদ্রে। কিন্তু তেল-জল মিশ খায় না, তাই জলের ওপর তেলের এক বিশাল আস্তরণ তৈরি হল। ফলে ওই অঞ্চলে সূর্যের আলো ও অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ল অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী, নষ্ট হল প্রচুর সামুদ্রিক উদ্ভিদ। এই ক্ষতি যে কতখানি তার বিচার কেবল টাকার অঙ্কে হয় না। শুধু ওই একটা জাহাজই নয়, প্রায় প্রতি বছরই একটা না একটা দুর্ঘটনা লেগেই আছে। 1976 সালে স্পেনের উপকূলে 'উরকিয়োলা' নামে আরেকটা তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণের ফলে জাহাজ থেকে প্রায় 1 লাখ 1 হাজার মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল পড়ে যায় সমুদ্রের জলে। 1978 সালে 'অ্যামোকো ক্যাডিজ' জাহাজটিও ডুবে যায় ফ্রান্সের উপকূলে। ফলে প্রায় 64 হাজার মেট্রিক টন তেল মিশে যায় সমুদ্রের জলে। এর কোনোটির ফলাফলই সুখকর হয়নি। 1979 সালে স্পেনের উপকূলে 'অ্যানড্রোর প্যাট্রিয়া' জাহাজে আগুন লাগার ফলে প্রায় 61 হাজার মেট্রিক টন তেল সমুদ্রের জলে মিশে গিয়ে কম ঝঞ্ঝাট হয়নি।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কল-কারখানার আবর্জনা প্রতিদিন ফেলা হচ্ছে নদী ও সমুদ্রের খাঁড়ি এলাকায়। ফলে পরিবেশ দূষণের সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের মানুষের মধ্যে নানা ধরনের রোগ, বিশেষত চর্মরোগ খুবই ছড়াচ্ছে।

প্রসঙ্গত, জাপানের মিনামাতা রোগের কথা বলা যায়। 1950 সালে জাপানের কিউসু দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে মিনামাতা শহরের একটি প্লাসটিক কারখানা থেকে স্থানীয় মিনামাতা উপসাগরে প্রচুর আবর্জনা ফেলা হত। কিন্তু ওই আবর্জনার মধ্যে পারদের মাত্রা ছিল বিপদ-সীমার ওপরে। ফলে যা হবার তাই হল। ওই উপসাগরের পারদ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত মাছ খেয়ে ওই শহরের প্রায় দশ হাজার মানুষ অসুস্থ হলেন, পঙ্গু হলেন প্রায় সাতশো জন, মারাও পড়লেন প্রায় একশো মানুষ। এইভাবে পারদ মেশানো আবর্জনা সাগরে ফেলবার খেসারত গুনতে হয়েছিল প্রায় এক দশক ধরে।

প্রায় একই ভাবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের কাছে লেন কোভ লেন নদীর মোহনার জল বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায় 1971 সালে 5 লাখ ইল (বান) মাছ ও 50 লাখ লাল মুলেট মাছ মারা পড়ে। কারণ সেই একই। আশেপাশের কারখানা থেকে গন্ধক-মেশানো বর্জ্য পদার্থ ক্রমাগত ফেলা হচ্ছিল নদীর জলে।

পোকামাকড় মারার ওষুধ, ডি ডি টি আর নানা ধরনের ক্লোরিন জাতীয় উপাদান সমুদ্রের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এ-সব জিনিস সমুদ্রের মাছের শত্রু। অথচ নানা নদী-নালার ভেতর দিয়ে প্রতিদিন এ-সব অবাঞ্ছিত পদার্থ পড়ছে গিয়ে সমুদ্রে। বিখ্যাত সমুদ্র-বিজ্ঞানী জ্যাক্‌স্ পিকার বলেছেন, বর্তমান দূষণের হার বজায় থাকলে আগামী ২৫ বছরেই সমুদ্রে সব প্রাণের অস্তিত্বই নষ্ট হয়ে যাবে।

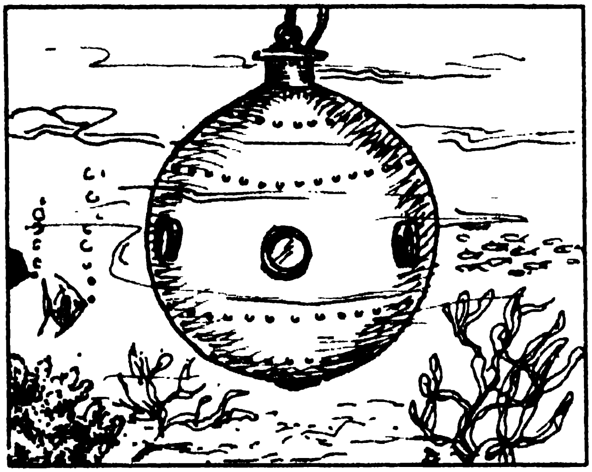
সমুদ্র আমাদের পথপ্রদর্শক, দার্শনিক ও বন্ধুর মত। একে আমরা যদি ঠিকমতো রক্ষা করতে না পারি, তাহলে আমাদের জীবনে অনিবার্য ভাবেই বিপদ নেমে আসবে।

ব্যাথিস্কেপ কী?

সমুদ্রের অতলে জলের নীচে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করার ছোট ডুবো জাহাজই হল ব্যাথিস্কেপ (Bathy-

scaphe)। এটি তৈরি করেন সুইস বিজ্ঞানী অগাস্ট পিকার ও তাঁর ছেলে জ্যাক্স্।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে 1946-48 সালের মধ্যে প্রথম



ব্যাথিস্কেপ (এফ এন আর এস- 2) তৈরি হয় বেলজিয়ামে। তবে 1948 সালে কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জের কাছে মহড়া দেবার সময়ে এটি দুর্ঘটনায় পড়ে বাতিল হয়। পরে সারাই করে নতুন নাম 'এফ এন আর এস-3' নাম দিয়ে আবার এটিকে কাজে নামানো হয়। 1954 সাল পর্যন্ত এই ব্যাথিস্কেপটি ডাকার ও সেনেগালের পাশে অতলান্তিক সমুদ্রের গভীরে (প্রায় 2750 মিটার) সমীক্ষা চালায়। ইতিমধ্যে 1953 সালে আরেকটি আধুনিক ব্যাথিস্কেপ 'ত্রিয়েস্তে' তৈরি হয়, আর সে-বছরই সমুদ্রের নীচে 3150 মিটার গভীরতায় চক্কর দিয়ে ফিরে আসে। 1958 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী একটা 'ত্রিয়েস্তে' কিনে ফেলে। তারপরে তার সঙ্গে চটপট আর একটা কেবিন জুড়ে ও কিছু কিছু রদবদল করে সেটিকে গভীর সমুদ্রের আরো বেশি উপযোগী ক'রে তোলা হয়—যাতে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর খাতগুলিতেও সমীক্ষা চালানো যায়। এই ব্যাথিস্কেপে চেপেই জ্যাক্স্ পিকার ও লেঃ ডন ওয়ালশ পৃথিবীর গভীরতম মারিয়ানা খাতে 10915 মিটার গভীরতায় নামেন। দিনটি ছিল 1960 সালের 23 জানুয়ারি।

ব্যাথিস্কেপের মূল কাঠামোয় দু'টো জিনিস আছে। ইস্পাতের তৈরি কেবিন-ঘর ও গ্যাসোলিনে-ভর্তি একটা ঘর, যা হালকা হওয়ায় ব্যাথিস্কেপকে জলের ওপরে উঠতে সাহায্য করে। সমুদ্রে নামার আগে তড়িৎ-চুম্বক দিয়ে কিছু লোহার বল ব্যাথিস্কেপের একটা অংশে আটকানো হয়। এদের ওজনের ফলে জলের চাপ অগ্রাহ্য ক'রে জলের গভীরে নামতে পারে ব্যাথিস্কেপ। তলদেশ থেকে ওপরে ওঠবার সময়ে লোহার বলগুলো বাইরে ফেলে দেওয়া হলে, ব্যাথিস্কেপ আবার হালকা হয়ে ভেসে উঠতে থাকে। তবে আজকাল আধুনিক মডেলে ব্যাথিস্কেপের ট্যাংক প্রয়োজন মত জলে ভর্তি অথবা খালি ক'রেই ওঠা-নামার কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক ব্যাথিস্কেপে ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ ক্যামেরা বসানো থাকে, যার সাহায্যে হাজার হাজার ফটো চটপট তোলা সম্ভব হয়।

মৌসুম বিজ্ঞান



আমরা যে-আবহমণ্ডলে বাস করি, তার ভেতরে প্রতিনিয়ত নানা রকম আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে। সৌরকিরণ ভূ-পৃষ্ঠে কোথাও লম্বভাবে পড়ছে, কোথাও বা তির্যকভাবে। এ-ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট স্থানেও বছরের এক এক সময়ে তার এক এক রকম হালচাল। সেই কারণেই ঋতুর পরিবর্তন হয়ে চলেছে একের পর এক। এ-ছাড়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি বায়ুপ্রবাহকে প্রভাবিত করছে। ফলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়-তুফান সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের জীবনে এদের ভূমিকা এবং প্রভাব কম নয়। বিজ্ঞানের যে-শাখায় আবহমণ্ডলের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে তাকেই আবহবিজ্ঞান বলা হয়। আবহবিজ্ঞানকে ইংরেজিতে আমরা বলি Meteorology।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কি আছে?

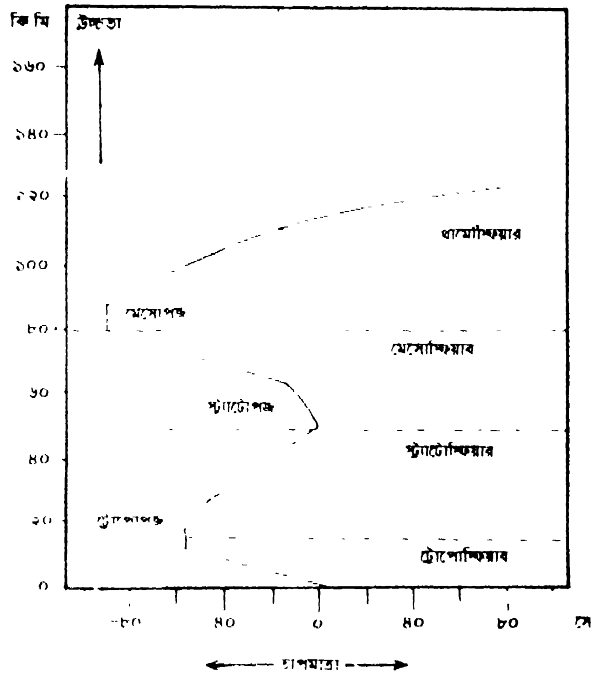
মায়ের ভালবাসা যেমন শিশুকে ঘিরে রাখে, তেমনি আবহমণ্ডল আমাদের বরাবরের জন্য ঘিরে রেখেছে। আবহমণ্ডলে কি আছে, নিশ্চয়ই তা আমাদের জানতে ইচ্ছে করে। আবহমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অবস্থিতি সব উচ্চতায় সমান নয়। এর প্রথম 25 কিলোমিটার পর্যন্ত নাইট্রোজেন 78.08%, অক্সিজেন 20.94%, আরগন 0.93%, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রায় 0.03%, নিওন 0.0018%, হিলিয়াম 0.0005%, ওজোন 0.00006%, হাইড্রোজেন 0.00005% এবং ক্রিপটন, জেনন ও মিথেন গ্যাস অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় আছে। 25 কিলোমিটার ছাড়িয়ে যদি ওপরে ওঠা

ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে কত ওপরে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ সব চেয়ে বেশি?

যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, ওজোন গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেছে। কিন্তু 35 কিলোমিটার ওপরে ওজোনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এছাড়া আবহমণ্ডলে ধূলিকণা, ধোঁয়া ও বিভিন্ন লবণের অতি ক্ষুদ্র কণার মত নানা পদার্থও থাকে। যে-সব কণারা ভূ-পৃষ্ঠ ছেড়ে বেশি ওপরে যায় না, তারা সাধারণত ওপরে ওঠার কয়েক দিনের মধ্যেই বৃষ্টির জলের সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কণাগুলি 15-20 কিমি পর্যন্ত উঠে গেলে, সেগুলি বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং আবহমণ্ডলে এই কণাগুলি 1 থেকে 3 বৎসর পর্যন্ত থাকতে পারে। পরে অবশ্য এগুলি বৃষ্টির জলের সঙ্গে নেমে আসে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে ক'টা ভাগে ভাগ করা যায়?

একটা মানুষের শরীরকে যেমন তার পা, পেট, বুক, গলা ও মাথা হিসেবে নীচ থেকে ওপরে ভাগ করা যায়, তেমনি পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে শুরু করে ক্রমাগত ওপরে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। এগুলি হল, ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere), স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere), মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere) ও থার্মোস্ফিয়ার (Thermosphere)। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আমরা যদি ক্রমাগত ওপরে উঠতে থাকি তাহলে প্রথমে আমরা কি লক্ষ্য করবো? দেখবো যে, প্রথমে তাপমাত্রা একটা বিশেষ হারে কমে যেতে থাকবে। প্রায় 15-16 কিমি উচ্চতায় এই তাপমাত্রা আরো কমে দাঁড়ায় –55 ডিগরি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এর উপরে প্রায় 5-7 কিমি উচ্চতায়, অর্থাৎ 21-22 কিমি পর্যন্ত, তাপমাত্রা স্থির থাকে—তার কোনো পরিবর্তন নেই। একে বলা হয় ট্রোপোপজ (Tropopause)। তারপর আবার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। যে-অঞ্চল থেকে তাপমাত্রা আবার ক্রমশ বাড়তে থাকে, তাকে



স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বলা হয়। প্রায় 50 কিমি উচ্চতায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সমাপ্তি; এর পর উচ্চতা বাড়লে কি হবে, তাপমাত্রা কিছু দূর পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। এই স্তরকে বলা হয় স্ট্র্যাটোপজ (Stratopause)। 50 কিমি থেকে প্রায় 55 কিমি পর্যন্ত স্ট্র্যাটোপজের বিস্তৃতি এবং স্ট্র্যাটোপজের তাপমাত্রা মাত্র –5 ডিগরি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এর উপরে তাপমাত্রা আবার কমতে থাকে এবং প্রায় 80 কিমি পর্যন্ত কমে গিয়ে তাপমাত্রা দাঁড়ায় –95 ডিগরি সেলসিয়াসের মত। এই স্তরের নাম মেসোস্ফিয়ার। তারপর প্রায় 10 কিমি উচ্চতাবিশিষ্ট মেসোপজ (Mesopause)। এখানে তাপমাত্রা প্রায় –95 ডিগরি সেলসিয়াস। প্রায় 90 কিমি উচ্চতার পর থার্মোস্ফিয়ার (Thermosphere) শুরু

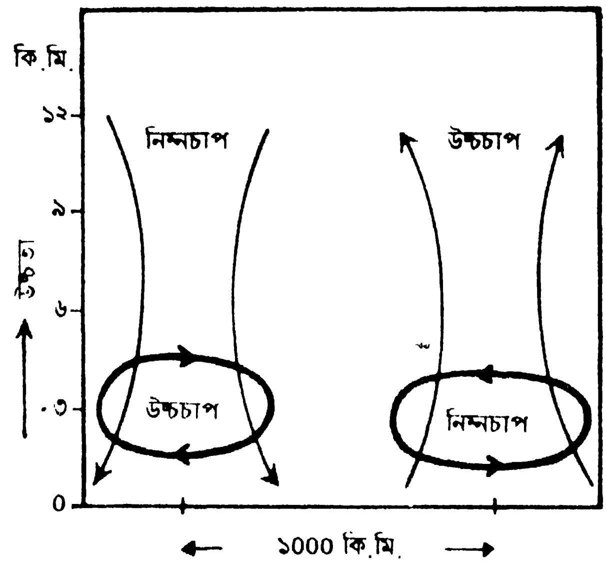
হয়। এখানে তাপমাত্রা আবার ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং বেড়েই চলে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডল যেখানে শেষ সেখানে কি আছে?

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সব চেয়ে উপরের স্তরটির নাম থার্মোস্ফিয়ার। থার্মোস্ফিয়ারের নীচের দিকে আছে নাইট্রোজেন অণু এবং অক্সিজেনের পরমাণু। থার্মোস্ফিয়ার শুরু হওয়ার পরে উপরের দিকে উঠতে উঠতে 200 কিমির মত উচ্চতায় যা রয়েছে তার বেশির ভাগই পারমাণবিক অক্সিজেন ও কম মাত্রায় নাইট্রোজেন। এই স্তরে অক্সিজেন পরমাণুগুলি অতিবেগুনি সৌররশ্মি শুষে নেয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অতিবেগুনি সৌররশ্মির মধ্যে যে-শক্তি ছিল, তা আবহমণ্ডলে পরিশোধিত হয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলেই তাপমাত্রা বেড়ে যায়। 350 কিমি উচ্চতায় তাপমাত্রা প্রায় 1000 ডিগরি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে। থার্মোস্ফিয়ারের ওপরে আছে এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere)। তারও ওপরে রয়েছে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার (Magnetosphere)। পৃথিবীর অভ্যন্তরে আকরিক লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি উত্তপ্ত তরল ধাতু থাকাব ফলে এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বা চৌম্বকক্ষেত্রের উৎপত্তি। এইভাবে যতই ওপরে ওঠা যায়, ততই লক্ষ্য করা যায় যে, আবহমণ্ডল পাতলা হয়ে যাচ্ছে এবং উচ্চ শক্তি-বিশিষ্ট তেজস্কণার আঘাতে আয়নকণা (Ion) সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্য থেকে মাঝে মাঝেই এই রকম তেজস্কণা বেরোয়। তা ছাড়া মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic ray) ভিতরেও এগুলি বর্তমান। এই তেজস্কণাগুলি প্রায় আলোর গতিতে এসে যখন আবহমণ্ডলের গ্যাস-কণিকাগুলিকে আঘাত করে তখন গ্যাসের পরমাণুর কিছু কিছু ইলেকট্রন ওই আঘাতে ঠিকরে বেরিয়ে যায়। ফলে ওই অঞ্চলে মুক্ত ইলেকট্রনের জন্য ঋণাত্মক তড়িৎকণা এবং পরমাণুর বাকি অংশের জন্য ধনাত্মক তড়িৎকণা প্রভূত পরিমাণে সৃষ্টি হয়। এই তড়িৎকণাগুলির প্রভাবে মৃদু আলোকও বিচ্ছুরিত হয়। পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বকক্ষেত্র থাকার ফলে এই তড়িৎকণাগুলি মেরু প্রদেশে ভিড় করে এবং এর প্রভাবে মেরুজ্যোতি বা অরোরা বোরিয়েলিসের (Aurora Borealis) উদ্ভব। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে এইভাবে উদ্ভূত আয়নকণাগুলি দু'টি স্তরে পৃথিবীকে ঘিরে আছে। এর নাম ভ্যান অ্যালেন বেল্ট (Van Allen Belt)। এর উচ্চতা 3000 এবং 16000 কিমির মত।

পৃথিবীর এক এক জায়গায় বায়ুর চাপ কি এক এক রকমের?

রক্তের চাপ মাপার যন্ত্রে যেমন রক্তের চাপ মাপা যায়, তেমনি বায়ুর চাপ মাপারও যন্ত্র আছে। যে-যন্ত্রে বায়ুর চাপ মাপা হয়, তার নাম ব্যারোমিটার (Barometer)। ব্যারোমিটার ব্যবহার ক'রে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বায়ুর

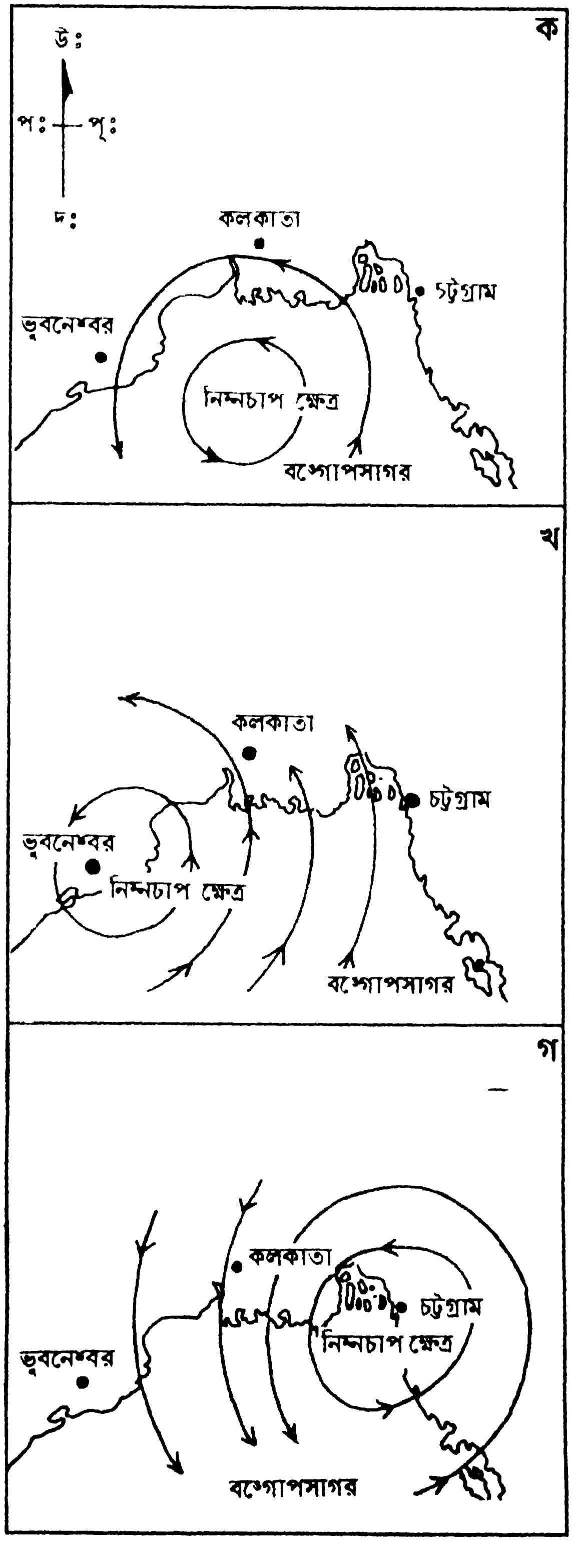


চাপ নির্ণয় করা হয়। একই সময়ে নানা জায়গার বায়ুর চাপ নির্ধারণ ক'রে ওই চাপগুলিকে সমুদ্র-পৃষ্ঠের চাপে রূপান্তরিত করা হয়। অর্থাৎ কলকাতার বায়ুর চাপ যা পাচ্ছি, সেটা কলকাতার উচ্চতায়। কিন্তু কলকাতা তো আর সমুদ্র-পৃষ্ঠে অবস্থিত নয়, কলকাতার উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5-6 মিটার ওপরে। সুতরাং ওই 5-6 মিটার বায়ুস্তরের চাপ কলকাতার বায়ুর চাপের সঙ্গে যোগ করলে আমরা কলকাতার সমুদ্র-পৃষ্ঠের চাপ পাবো। এইভাবে সব জায়গার বায়ুর চাপকেই সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুর চাপে রূপান্তরিত করা হয়। তারপরে সব চাপগুলিকে একটি মানচিত্রে প্রতিটি স্থানের ওপর লেখা হয়। এখন ওই মানচিত্রটি ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কোনো অঞ্চলে বায়ুর চাপ

পারিপার্শ্বিকের চেয়ে বেশি, আবার কোনো অঞ্চলে কম। যে-অঞ্চলে বায়ুর চাপ বেশি, তাকে বলা হয় উচ্চচাপ অঞ্চল। আর যে-অঞ্চলে কম তার নাম নিম্নচাপ অঞ্চল। এরা কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে নেই। উঁচু জায়গার জল যেমন নীচু জায়গায় গড়িয়ে যায়, তেমনি উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ুপ্রবাহ প্রতিনিয়ত নিম্নচাপ অঞ্চলে ধাবিত হয়। একটা পাত্রে জল গরম করলে, পাত্রের নীচের জল তাপ পেয়ে আয়তনে বেড়ে অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে ওপরে ওঠে। আর ওপরের স্তরের জল নীচে নেমে আসে। কিছুক্ষণ পরে ওই জলও আবার ওপরে উঠে ওপরের জলকে নীচে পাঠিয়ে দেয়। একে বলে পরিচলন প্রক্রিয়া। বায়ুমণ্ডলেও এই রকম পরিচলন প্রক্রিয়া কাজ করে এবং নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ুস্রোত নীচ থেকে ওপরে ওঠে। আর উচ্চচাপ অঞ্চলে বায়ুস্রোত ওপর থেকে নীচে নামে। এইভাবেই বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ কি সরাসরি যায়?

হাতের ভরা কলসি থেকে যখন মেঝেতে বসানো আধ-ভরা কলসিতে জল ঢালা হয়, তখন সে-জল যেমন সরাসরি যায়, তেমনি অনেকের ধারণা, উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে সোজা পথে সরাসরি বাতাস প্রবাহিত হয়। কিন্তু না, এই বায়ু সোজা পথে প্রবাহিত হয় না। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ুপ্রবাহের পথ এক রকম। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে সেই পথ গেছে আবার উল্টো দিকে। উত্তর গোলার্ধে যদি এই বায়ুপ্রবাহের হিসেব নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, এই বায়ুপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটা যে-দিকে ঘোরে, তার উল্টো দিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ নিম্নচাপ অভিমুখে যায়। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। সেখানে উচ্চচাপ থেকে বায়ুপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। আবার উচ্চচাপ থেকে বায়ুপ্রবাহ বেরিয়ে আসার মুখে, উত্তর গোলার্ধে ওই বায়ুপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে বেরোয়। এ-সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে এর উল্টো রকমের ব্যাপার ঘটে। সেখানে উচ্চচাপ থেকে বায়ুপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে আসে। এটা মনে রাখবো কেমন ক'রে? তার একটা সহজ



নিয়ম আছে। নিয়মটির নাম বাইস-ব্যালট সূত্র (Buys-Ballot Law)। এই সূত্র অনুযায়ী কেউ যদি উত্তর গোলার্ধে বায়ুপ্রবাহের দিকে পিছন করে দাঁড়ায়, অর্থাৎ হাওয়া এসে তার পিঠে লাগে, তাহলে ওই লোকটির বাঁ হাতের দিকে নিম্নচাপ থাকবে। এর সাহায্যে বর্ষাকালে বাতাস দেখে সহজে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া চলে।

বর্ষাকালে বাতাস দেখে কী ভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব?

বর্ষাকালে বাতাস দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়ার ব্যাপারটা দক্ষিণ-বঙ্গে, যেমন চব্বিশ-পরগণা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা বা মেদিনীপুর জেলাতেই বিশেষ করে খাটে। ধরা যাক, কলকাতারই কথা। যদি কলকাতায় বর্ষাকালে পূর্ব দিক থেকে মাঝে মাঝে ঝাপ্‌টার সঙ্গে হাওয়া বয় আর তার সঙ্গে যোগ হয় থেকে থেকে পশলা বৃষ্টি, তা হলে বাইস-ব্যালট সূত্র প্রয়োগ ক'রে, অর্থাৎ পুবে হাওয়ার দিকে পিছন ক'রে দাঁড়ালে, আমাদের বাঁ হাত নির্দেশ করবে দক্ষিণ দিককে। সুতরাং বুঝতে হবে যে, নিম্নচাপ-ক্ষেত্র আছে কলকাতার দক্ষিণ দিকে। এ-সময়েই সমুদ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাহলে ওই নিম্নচাপ-ক্ষেত্রটি নিশ্চয়ই বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে আছে—এ-রকম আন্দাজ করা ভুল হবে না। আর নিম্নচাপ-অঞ্চল যেখানে আছে, বৃষ্টিপাত সেখানেই হয়ে থাকে। এখন নিম্নচাপ-ক্ষেত্রটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাবে, আর তার সঙ্গে সরতে থাকবে বৃষ্টিপাতের অঞ্চলটি। কোনদিকে সেটি সরে চলেছে, তাও কিন্তু ওই কলকাতার বাতাস দেখেই বোঝা সম্ভব। চিত্র ক-তে নিম্নচাপ-ক্ষেত্রটি ঠিক কলকাতার দক্ষিণে আছে, আর কলকাতার পূর্ব দিক থেকে হাওয়া বইছে। ধরা যাক, পরদিন ওই নিম্নচাপ-ক্ষেত্রটি উড়িষ্যা উপকূল অতিক্রম করছে। এই অবস্থায় কলকাতার বাতাস পূর্ব দিক থেকে ঘুরে গিয়ে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব থেকে বইবে, এবং শেষে দক্ষিণ দিক থেকে বইতে থাকবে (চিত্র খ)। আবার ওই নিম্নচাপ-ক্ষেত্রটি যদি উড়িষ্যা উপকূলে না সরে গিয়ে বাংলাদেশে চট্টগ্রামের দিকে সরে যেত, তাহলে কলকাতার বাতাস পূর্ব দিক থেকে সরে গিয়ে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বইতো। তারপর ক্রমশ সেটা আরো সরে গিয়ে উত্তর দিক থেকে আসতো। (চিত্র গ)।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যায় ততই দেখা যায় যে, তাপমাত্রা কমে আসছে। অথচ আমরা যখন ওপরে উঠি, তখন সকল তাপের উৎস সূর্যের দিকেই তো এগোই। তাহলে তাপমাত্রা না বেড়ে কমে কেন?

সূর্য থেকে আলোকরশ্মির সঙ্গে যে-তাপরশ্মি বিকিরিত হয় সেটা ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বাড়ায়। বাতাসের মধ্য দিয়ে যখন তাপরশ্মি আসে, তখন বাতাস কিন্তু গরম হয় না; কারণ বাতাস তাপের পরিবাহী নয়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরই শুধু উত্তপ্ত হয়। এই উত্তপ্ত বায়ুস্তর আয়তনে প্রসারিত আর সেই সঙ্গে হালকা হয়ে ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে। বায়ুর ওপরের স্তরে চাপ কম। ফলে



ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ আয়তনে আরো বাড়ে এবং তার তাপমাত্রা আরো কমে যায়। এইভাবে যতই ওপরে ওঠা যায় তাপমাত্রা ততই কমে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রোপোপজে পৌঁছে দেখা যায় যে, উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা আর কমছে না; অথচ ট্রোপোপজের ওপরে বায়ুস্তরের তাপমাত্রা আবার বাড়ে। এই বায়ুস্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এখানে ওজোন গ্যাস তৈরি হচ্ছে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তাপের উদ্ভব ঘটছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ কোনোমতে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করলেও আর উঠতে পারে না। কারণ ওই বায়ুপ্রবাহ তখন আশেপাশের বায়ুর চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে ভারি হয়ে ওঠে; ফলে ওই বায়ুপ্রবাহ আবার ট্রোপোস্ফিয়ারে ফিরে আসে। সুতরাং বলা যায়,

ট্রোপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য পাঁচিল আছে; তাতে এদিককার হাওয়া ওদিকে যেতে পারে না।

তাহলে বোঝা গেল যে, আবহমণ্ডলের নীচের তলা অর্থাৎ ট্রোপোস্ফিয়ার, নীচের থেকে (ভূ-পৃষ্ঠ) এবং ওপর থেকে (স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার) উত্তাপ পাচ্ছে। ফলে ওপরে উঠতে শুরু করলে ঠাণ্ডা বোধ হয়, কিন্তু আবার বেশ খানিকটা উঠে গেলে বায়ুর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে।

যতটা জলীয় বাষ্প ওপরে ওঠে ততটাই কি বৃষ্টি হয়?

যে-কলসির জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে গেল, তার সবটাই যে বৃষ্টি হয়ে আবার কলসির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তা নয়। বৃষ্টির জলের কিছু অংশ সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়। তার মানে কিছু বৃষ্টির ফোঁটা মেঘ থেকে ঝরে প'ড়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছোবার আগেই আবার বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়। বাকি অংশ ভূ-পৃষ্ঠ ও গাছপালার ওপর ঝরে পড়ে। গাছপালার এই জলের প্রয়োজন আছে। কারণ এই জল উদ্ভিদের বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে। কিছু জল ভূ-ত্বককে সম্পৃক্ত করে মাটি ভিজিয়ে দেয়। মাটি সম্পূর্ণ ভিজে গেলে বাকি জল নীচে নামতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পাথরের স্তরে আটকে গিয়ে, জল আর বেশি নীচে নামতে না পেরে অন্তঃসলিলা প্রবাহের (Run off) আকারে মাটির মধ্যে প্রবাহিত হয়। সেই প্রবাহগুলি অবশেষে ঝর্ণা বা নদীর আকারে ক্রমশ একত্রিত হয়ে বড় নদীর আকার ধারণ ক'রে সমুদ্রে এসে পড়ে। এইভাবে জল ও জলীয় বাষ্প চক্রাকারে ঘুরে চলে। ফলে যে-কলসির জল জলীয় বাষ্প হয়ে আকাশে উঠল, বৃষ্টি হয়ে তা যে আবার পুরোটাই কলসির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, তা নয়।

মেঘ কত রকমের হয়?

আকাশে মেঘের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, সব মেঘ এক রকমের নয়। এক এক মেঘের এক এক চেহারা। একটি পরিবারের এক একটি ছেলেমেয়ে অনেক সময় এক এক রকমের হয়—কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ দেখা যায়, রোগাও নয়, মোটাও নয়; সে-রকম আবার কারো রঙ ফরসা, কারো ময়লা, কারো বা না ফরসা বলা যায়, না ময়লা। আমাদের এই ধরনের চেহারার মত মেঘকেও আকৃতি অনুযায়ী কয়েক ভাগে ভাগ করা চলে।

কোদালে কুড়ুলে মেঘ কোন মেঘ?

কিন্তু শুধু আকৃতি ধ'রে ভাগই সব কথা নয়। যদি একদল ছেলেকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কোন জেলা থেকে এসেছে, তাহলে দেখা যাবে কেউ কাছের জেলার, কেউ দূরের, বা খুব কাছেও নয়, দূরেও নয়, এমন এক জেলায় কারো বাড়ি—তাহলেও এদের যেমন তিন ভাগে ভাগ করা চলে, তেমনি উচ্চতা অনুযায়ী মেঘকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন, নিম্ন-মেঘ, মধ্য-মেঘ ও উচ্চ-মেঘ। নিম্ন-মেঘ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3000 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত থাকে। মধ্য মেঘের অবস্থান 3000 মিটার থেকে 6000 মিটার পর্যন্ত, আর তার ওপরে থাকে উচ্চ-মেঘ। মেঘ যখন ভূ-পৃষ্ঠেই তৈরি হয়, তখন সেটা কুয়াশা।

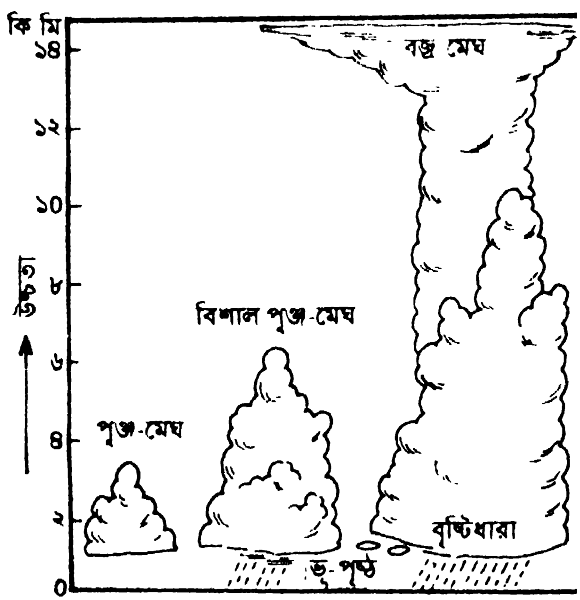
আকৃতি অনুযায়ী মেঘকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, পুঞ্জ-মেঘ (Cumulus), স্তর-মেঘ (Stratus),

উর্ণা মেঘ কোন উচ্চতায় তৈরি হয়?

উর্ণা-মেঘ (Cirrus), আর এই তিন রকম মেঘের সমষ্টিকে বলা হয় নিশ্বাস (Nimbus)। পুঞ্জ-মেঘ যখন ছোট ছোট হংসবলাকার মত ভেসে বেড়ায়, তখন তাকে বলে 'উত্তম আবহাওয়ার পুঞ্জ-মেঘ' (Fair weather cumulus)। আবার এই মেঘ যখন ফুলকপির আকারে মাথা চাড়া দিয়ে মধ্য-স্তরে পৌঁছোয়, তখন তার নাম বিশাল পুঞ্জ-মেঘ (Large cumulus)। কখনো কখনো এই মেঘ আরো বাড়তে থাকে, ফলে মেঘের মাথা উচ্চ-স্তরে উঠে প্রায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছোবার উপক্রম করে। কিন্তু ট্রোপোস্ফিয়ারের হাওয়া কখনোই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যেতে পারে না। তাই তখন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের কাছে এসে হাওয়াটা আর ওপর দিকে না গিয়ে ওই স্তরেই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। মেঘের আকৃতিটা তখন কামারের নেহাই-এর মত দেখায়। এই মেঘ থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, মাঝে মাঝে শিলা-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতও হয়ে থাকে। একে বলে বজ্র-মেঘ

(Thunder cloud বা cumulo-nimbus)। পুঞ্জ-মেঘ যদি মধ্য-স্তরে তৈরি হয়, তখন তাকে বলা হয় 'কোদালে কুড়ুলে মেঘ' (Alto-cumulus)। আর পুঞ্জ-মেঘ যখন উচ্চ-স্তরে জন্ম নেয়, তখন তাকে বলে ঊর্ণা-পুঞ্জ মেঘ (Cirro-cumulus)।

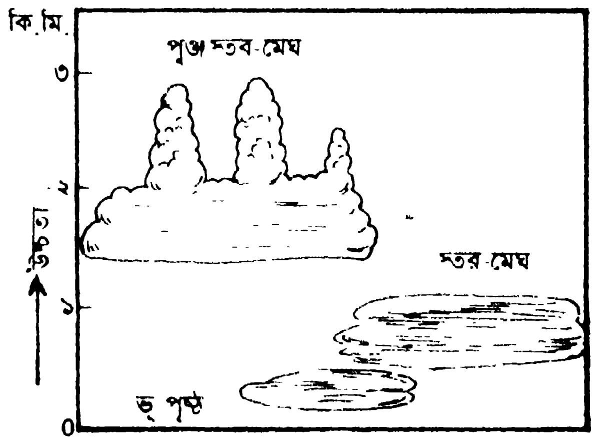
স্তর-মেঘ যখন ভূ-পৃষ্ঠে থাকে, তখন তা কুয়াশা। শীতের ভোরে অনেক সময় দেখা যায় যে, সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। দিনের আলো ভাল করে ফুটে উঠতে পারছে না, বায়ুমণ্ডলে একটা ভিজে ভিজে ভাব। হঠাৎ আকাশ ভর্তি মেঘের সামিয়ানাতে একটা ফুটো হয়ে গিয়ে এক ঝলক সূর্যালোক দেখা দিল। ক্রমে ক্রমে জমাট মেঘ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে লাগলো। মেঘগুলো দেখা যাবে খুবই নীচু, হাওয়ার সঙ্গে শাঁ শাঁ করে ছুটে চলেছে। ওই টুকরো মেঘগুলির কোনো বিশেষ আকৃতি দেখা যাবে না। এর নাম নিম্ন স্তর-মেঘ। মাঝে মাঝে আকাশে নিম্ন স্তর-মেঘ ও পুঞ্জ-মেঘের সংমিশ্রণ দেখা যায়, একে বলে পুঞ্জ স্তর-মেঘ (Strato-cumulus)। এগুলি সবই নিম্ন-মেঘ। স্তর-মেঘ যদি 3000 মিটার থেকে 6000 মিটার পর্যন্ত অবস্থান করে, তবে এর নাম মধ্য স্তর-মেঘ (Alto-Stratus)। এই মেঘ প্রায় সারা আকাশে ছড়িয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে সূর্য বা চন্দ্রের অবস্থান বোঝা যায়, কিন্তু সূর্য বা চন্দ্রের গোল পরিধি এর ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে না। মধ্য স্তর-মেঘের বিস্তৃতি সাধারণত 1 থেকে 2 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। এই মেঘ যদি



কোনো কারণে আরো ঘন বিস্তৃত হয়, তাহলে তা থেকে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টি টিপটিপে বৃষ্টি, পশলা বৃষ্টি নয়। স্তর-মেঘ যখন উচ্চ-স্তরে গঠিত হয়, তখন তাকে উচ্চ স্তর-মেঘ (Cirro-Stratus) বলা হয়। এই মেঘও প্রায় সারা আকাশে ছড়িয়ে থাকে। উচ্চ স্তর-মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্য ও চন্দ্রের কিনারা বেশ ভালভাবে বোঝা যায়।

এবার ঊর্ণা-মেঘ। ঊর্ণা-মেঘ দেখতে মাকড়সার পাতলা জাল বা ঘোড়ার লেজের মত। এই মেঘ তৈরি হয় প্রায় 7500 মিটার থেকে ৪000 মিটারের মধ্যে।

নিম্বাস-মেঘ কি রকম মেঘ? নিম্বাস-মেঘ সব রকম মেঘের সমাহার। যখন মধ্য স্তর-মেঘ প্রচুর জলসঞ্চয় ক'রে অত্যন্ত ঘন হয়, তখন ভারি হয়ে সেটা অনেক সময় 2000 মিটার উচ্চতায় নেমে আসে। তখন এই মেঘের নীচের দিকটা থাকে 2000 মিটারের কাছাকাছি আর মাথাটা থাকে



4 থেকে 5 কিলোমিটার উচ্চতায়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দেখলে এই মেঘ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। 'নীল নব ঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাই রে,'—যে-মেঘ দেখে লেখা, তার মধ্যে অনেক সময়েই লুকিয়ে থাকে বজ্র-মেঘ। যদি আকাশে নিম্বাস-মেঘ থাকে আর ঘুমন্ত কাউকে হঠাৎ জাগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করা হয়, 'আকাশ দেখে আন্দাজ করো তো, কটা বেজেছে?'—তার পক্ষে সঠিক সময় বলা কঠিন। এই মেঘে সকাল দুপুরেও সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এই বিশেষ ধরনের মেঘের নাম নিম্বোস্ট্র্যাটাস (Nimbo-stratus)।

সব মেঘই কি জলকণা দিয়ে তৈরি হয়?

আমাদের ধারণা মেঘ মানেই তা জলকণা দিয়ে তৈরি।

বিন্দু বিন্দু বারিকণা দিয়ে সাগর গড়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু সব মেঘই জলকণা দিয়ে তৈরি, এমন ধারণাটা ঠিক নয়। আমরা জানি মাটি ছাড়িয়ে যতই ওপরে ওঠা যায়, ততই তাপমাত্রা কমে আসে। এইভাবে ওপরে উঠতে উঠতে একটা উচ্চতায় এসে আমরা হিমাঙ্কে পৌঁছোই। আমাদের দেশে সাধারণত গ্রীষ্মকালে 4500 মিটার থেকে 5000 মিটারের মধ্যে হিমাঙ্ক-স্তর থাকে। আর শীতকালে এটা নেমে আসে 3600 মিটার থেকে 4000 মিটারের মধ্যে। নিম্ন-মেঘ সাধারণত হিমাঙ্ক-স্তরের ওপরে মাথা তোলে না। সেইজন্য তার সবটাই জলকণা দিয়ে তৈরি। পুঞ্জ-মেঘ যখন হিমাঙ্ক-স্তরের ওপরে মাথা তোলে বা মধ্য স্তর-মেঘ যদি হিমাঙ্ক-স্তরের ওপরে তৈরি হয়, তখন মনে হয়, মেঘের জলকণাগুলি বুঝি জমে বরফ হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে তা হয় না। সেটা জলই থাকে। হিমাঙ্কের চেয়ে ঠাণ্ডা, অথচ জল! কথাটা অদ্ভুত! এই সব মেঘ যে-ধরনের জলকণা দিয়ে গঠিত, তার তাপমাত্রা –10 ডিগরি সেলসিয়াস

গ্রীষ্মকালে কোন উচ্চতায় হিমাঙ্ক-স্তর থাকে?

থেকে –30 ডিগরি সেলসিয়াস, এমন কি –40 ডিগরি সেলসিয়াস পর্যন্তও হয়। ফলে এগুলি প্রকৃতপক্ষে অতিশীতল জলকণা। এই জলকণাগুলি সামান্য আঘাতেই কিন্তু হিমকণায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন শুধু তাদের আণবিক গঠনের প্রকারভেদ ঘটে। সুতরাং নিম্ন-মেঘ জলকণার দ্বারা গঠিত হলে কি হবে, মধ্য-মেঘে শুধু যে জলকণাই থাকে, তা নয়, কিছু অতি শীতল জলকণাও থাকে। আর উচ্চ-মেঘ সাধারণত তৈরি হয় হিমকণা দিয়েই।

কোনো মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে কিনা, তা কি সেই মেঘের আকৃতি দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়?

আমাদের দেশে সাধারণত বর্ষাকালেই বেশি বৃষ্টি হয়। সারা বছরের গড় বৃষ্টিপাতের 75 থেকে 80 শতাংশ আমরা পেয়ে থাকি বর্ষাকালেই। এই সময়ে যে-বৃষ্টিপাত হয়, তা বিশাল পুঞ্জ-মেঘ, বজ্র-মেঘ, মধ্যস্তর-মেঘ আর নিম্বোস্ট্র্যাটাস মেঘ থেকেই সাধারণত হয়ে থাকে। সুতরাং যদি আকাশে ঘন কালো পুঞ্জ-মেঘের আধিক্য দেখা যায়, বা ঘন কালো স্তর-মেঘ থাকে, তাহলে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, বুঝতে হবে। আবার এই সময় যদি পূর্ব দিক থেকে হাওয়া বয়, তবে বাইস-ব্যালট সূত্র প্রয়োগ করে বোঝা

বর্ষাকালে 'পুবে হাওয়া বয়' অবস্থায় কি বৃষ্টিপাত হতে পারে?

যায় যে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ-ক্ষেত্র রয়েছে। এমন অবস্থায় বেশ জোরের সঙ্গে বলা চলে, বৃষ্টি হবেই। যখন বর্ষাকাল নয়, তখন যে বৃষ্টি হয় না, তা নয়। তখন আকাশে খুব একটা মেঘের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। এমন ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত হয় সন্ধ্যার দিকে বজ্র-মেঘের বর্ষণ থেকে। এই বজ্র-মেঘগুলির উৎপত্তিস্থল হল বিহারের মালভূমি অঞ্চল— রাঁচি, হাজারিবাগের চারপাশে। ওই জায়গায় মেঘগুলি তৈরি হয়ে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলির দিকে এগোয়। সুতরাং এ-সব জায়গায় বজ্র-মেঘগুলি সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকেই হানা দেয়। তাই যদি বিকেলের দিকে বা সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিমে মেঘ দেখা যায়, তাহলে সেই দিগন্তের কোলের ক্ষুদ্র মেঘটি কিছুক্ষণ পরেই ঝড়ের তাণ্ডবলীলা শুরু করতে পারে।

মধ্য পুঞ্জ-মেঘ, উচ্চ পুঞ্জ-মেঘ, উচ্চ স্তর-মেঘ, পুঞ্জ স্তর-মেঘ ও সাধারণ স্তর-মেঘ বৃষ্টি দেয় না। এক আধ সময়, এই সব মেঘ থেকে অবশ্য ইল্‌শে গুড়ির মত বৃষ্টি হয়ে থাকে।

বৃষ্টিপাতের সময়ে দেখা যায় যে, কখনো বৃষ্টি হচ্ছে গুঁড়িগুঁড়ি, কখনো ঝিরঝিরে বা টিপটিপ টানা বৃষ্টি, আবার কখনো বা দমকে দমকে পশলা বৃষ্টি। বৃষ্টিপাতের এই রকমফেরের কারণ কি?

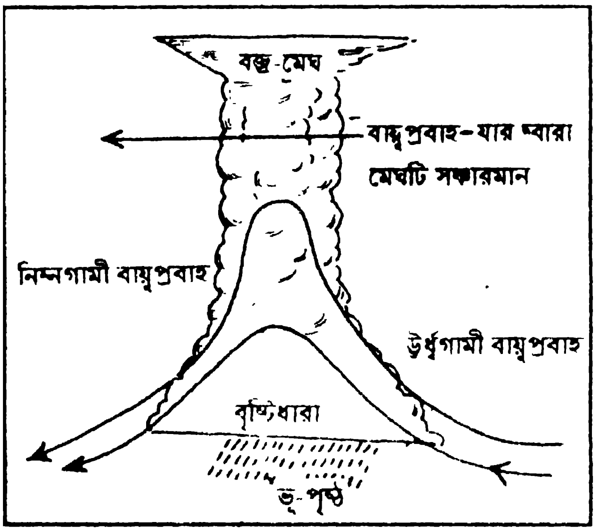
পাতলা, নিম্ন স্তর বা উচ্চ স্তর-মেঘ থেকে বেশির ভাগ সময় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হয়। যখন সারা আকাশ পাতলা উচ্চ স্তর-মেঘে ঢাকা, তখনই এ-রকম বৃষ্টিপাত নজরে আসে। অবশ্য কুয়াশা ভেঙে, শীতের একটু বেলায় কুয়াশাটা যখন স্তর মেঘে পরিণত হয়ে আস্তে আস্তে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরে ওঠে, তখনও অনেক সময়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে। এক টানা টিপটিপে বৃষ্টি হয় মধ্য স্তর-মেঘ

থেকে। এই মধ্য স্তর-মেঘের ঘনত্ব (ওপরে-নীচে) যত বাড়বে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলি ততই বড় হবে। ফলে টিপটিপে বৃষ্টি এক টানা ঝিরঝিরে কিংবা এক টানা ঝমঝমে বৃষ্টিতে

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাত কোন মেঘ থেকে হয়?

পরিণত হবে। দমকে দমকে পশলা বৃষ্টি হয় বিশাল পুঞ্জ-মেঘ ও বজ্র-মেঘ থেকে। এই সব মেঘের ভেতর পরিচলন প্রক্রিয়ার ফলে নীচ থেকে গরম হাওয়া মেঘের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ওপরে ওঠে এবং মেঘের অপর এক দিক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা নীচে নামে।

মেঘের যে অঞ্চলে ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ থাকে, এমন হতে পারে যে, সেখানে বৃষ্টি হল না; আর যদিও বা হয়, তা হবে খুব হালকা ধরনের। আর যে-অঞ্চলে নিম্নগামী



বায়ুস্রোত, মেঘের সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হবে ভারি ধরনের। কিন্তু এই মেঘ মোটেই স্থির নেই। বায়ুপ্রবাহ তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের একটি বিশেষ স্থানে পাতের হারের তারতম্য ঘটে থাকে।

জলীয় বাষ্প থেকে কি ভাবে মেঘের উৎপত্তি হয়?

জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ হয়, এ-কথা ঠিক। কিন্তু এই মেঘ হয় কেমন ক'রে? জলীয় বাষ্প যখন সাগর, হ্রদ, নদী, খাল-বিল থেকে ওপরে ওঠে, তখন সেটা চারধারের বায়ুস্তরের চেয়ে হালকা হয়ে যায়। ফলে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়েই ওপর দিকে উঠতে থাকে। যতই ওপরে ওঠা, ততই আরো ঠাণ্ডা হওয়া। সুতরাং ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ ক্রমশ শীতল হয়ে আসে আর ঘনীভবনের ফলে সেটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। যদি সংশ্লিষ্ট বায়ুমণ্ডল নির্মল হয়, অর্থাৎ সেখানে যদি ধূলিকণা বা কোনো প্রকার রাসায়নিক পদার্থের ক্ষুদ্র কণা, কিংবা লবণের ক্ষুদ্র কণা বা আর অন্যান্য কোনো কণা না থাকে, তাহলে বাতাসের আর্দ্রতা 320% না হলে 10^{-7} সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের জলকণা তৈরি হবে না। 10^{-5} সেন্টিমিটারের মত আরো বড় ব্যাসার্ধের জলকণা সৃষ্টি করতে গেলে বাতাসের আর্দ্রতা অন্তত 110% হওয়া চাই। কিন্তু এত বেশি আর্দ্রতা সাধারণত বাতাসে সৃষ্টি হয় না। অথচ আর্দ্রতা এর চেয়ে কম হলে জলীয় বাষ্প দ্রবীভূত হবেই না। তাহলে মেঘ হচ্ছে কেমন করে? আসলে বাতাসে বর্তমান ধূলিকণা ও অন্যান্য ভাসমান পদার্থই মেঘ সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে। দেখা যায় যে, বাতাসে যদি লবণের ক্ষুদ্র কণা প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহলে 78% আর্দ্রতাতেই মেঘ তৈরি হয়। সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলে এই লবণ কণাগুলি সব সময়ই বর্তমান। জলীয় বাষ্পকণাগুলি দ্রবীভূত হবার সময়ে এই ক্ষুদ্র লবণ কণাগুলির ওপর ভর ক'রে জলকণা সৃষ্টি করে। মহাসাগরীয় বাতাসে প্রতি লিটারে এই রকম লবণকণা ও

মহাসাগরীয় বাতাসে লবণের কণা কী রকম?

অন্যান্য রাসায়নিক কণার সংখ্যা 10 লক্ষের মত; আর স্থলভাগে এর সঙ্গে ধূলিকণা ও কল-কারখানা থেকে নির্গত অন্যান্য কণা যুক্ত হয়ে এই কণাগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি লিটারে প্রায় 50 থেকে 60 লক্ষের মত। মেঘ আর কিছুই নয়, এই জলকণাগুলির সমষ্টি মাত্র।

এইভাবে তো মেঘ সৃষ্টি হল, কিন্তু মেঘের বৃদ্ধি হয় কি ভাবে? বাষ্পীভবন ক্রমাগত হয়ে গেলে জলকণাগুলির ওপর আরো জল জমতে শুরু করে, তখন জলকণাগুলি আয়তনে বাড়তে থাকে। বৃদ্ধির হার প্রথমে খুব বেশি থাকে, কিন্তু ক্রমশ তা কমে আসে। খালি পেটে যে-লোক আছে, সে যেমন খাবার পেলে প্রথমে গোগ্রাসে গিলতে থাকে, কিন্তু পরে তার খাবার তাগিদ কমে আসে এ অনেকটা সে-রকম

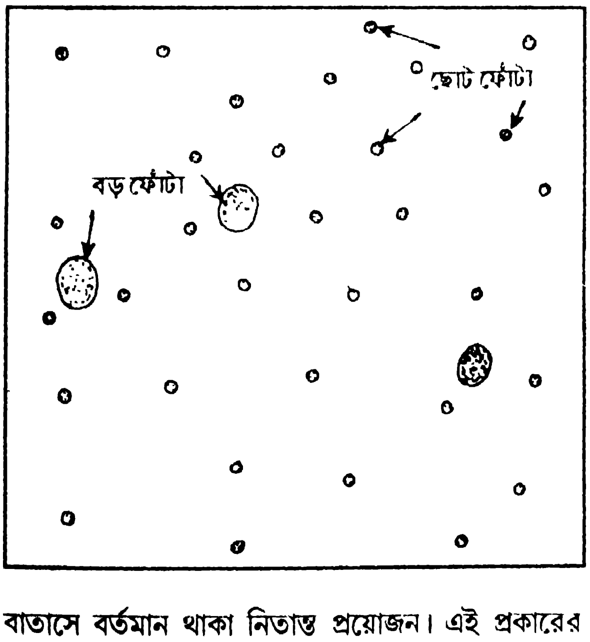
আর কি! কিন্তু জলকণার ব্যাসার্ধ বাড়তে আরম্ভ করলেই যে বৃষ্টি হবে, তা নয়। জলকণাগুলির ব্যাসার্ধ আরো অনেক বাড়লে তবেই সেটা বৃষ্টির আকারে মাটিতে ঝরে পড়বে। তা না হলে ওই ক্ষুদ্র জলকণাগুলি আবার মেঘ থেকেই বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। নয়তো নীচে ঝরে পড়তে পড়তেই

ক্ষুদ্র জলকণা কতটুকু নীচে পড়েই বাষ্প হয়ে যায়?

বাষ্পে পরিণত হবে। দেখা গেছে যে, 0.1 মিলিমিটার ব্যাসার্ধের জলকণা মাত্র 150 মিটার নীচে পড়তে পড়তেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। সে-বৃষ্টি আর মাটি পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

মেঘ থেকে কী ভাবে বৃষ্টিপাত হয়?

আমরা দেখেছি, জলকণার ব্যাসার্ধ যত ছোট হবে, ততই বাষ্পের দ্রবীভবন হওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। বড় ফোঁটা তৈরি করতে গেলে লবণ, ধূলিকণা বা ওই ধরনের কোনো ক্ষুদ্র দ্রবীকরণ কণা (Condensation nuclei)



বাতাসে বর্তমান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রকারের দ্রবীকরণ কণার ওপর জলের বিন্দু তৈরি হতে বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা 100%-এর কম হলেও চলে। এইভাবে জলবিন্দু সৃষ্টি হয়ে সেগুলি ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহের মুখে পড়ে অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলে এসে হিমাঙ্ক-স্তরের ওপরে উঠলে, কিছু জলবিন্দু অতিশীতল হয়ে যায়, আর কিছু জলবিন্দু বরফের কুচিতে পরিণত হয়। সেখানে অতিশীতল জলবিন্দুগুলি খুব শীঘ্র বাষ্পীভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওই অঞ্চলে পাশাপাশি যে হিমকণাগুলি আছে, তার ওপরে জমা হয়ে যায় এবং সেগুলি আকারে বাড়ে। এই ধরনের বিশাল হিমকণার সংখ্যা খুবই কম। প্রতি লিটার বায়ুতে যদি 50 লক্ষ দ্রবীভবন কণা থাকে, তাহলে বিশাল হিমকণার সংখ্যা মাত্র 10 থেকে 100টি। বিশাল হিমকণাগুলি যে-সব দ্রবীভবন কণার ওপর গঠিত হয়, সেগুলি সাধারণত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বা উল্কাবৃষ্টির ছাই থেকে তৈরি। অবশ্য কিছু কিছু বিশেষ প্রকারের ধূলিকণাও দ্রবীভবন কণা গঠনে সাহায্য করে। এই বিশাল হিমকণাগুলি যখন নিজের ভারে নীচে নামতে থাকে তখন ছোট ছোট জলবিন্দুগুলি এর গায়ে লেগে বড় বড় ফোঁটা তৈরি করে। যখনই জলবিন্দুর ব্যাসার্ধ 1 মিলিমিটার বা তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তখনই ওই জলবিন্দুগুলি বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে। সমস্ত ব্যাপারটা 'বার্জেরন-ফিণ্ডেইসেন (Bergeron-Findeisen) তত্ত্ব' নামে খ্যাত। তাহলে বোঝা গেল, এইভাবে বৃষ্টি হতে গেলে মেঘের উচ্চতা হিমাঙ্ক-স্তরের ওপরে যাওয়া চাই। তা না হলে হিমকণা ও অতিশীতল জলকণা সৃষ্টি হতে পারে না।

কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বিশেষ ক'রে মৌসুমী অঞ্চলে, যে-সব মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটে, তার অনেকগুলিই হিমাঙ্ক-স্তরের কিছু নীচেই থাকে। এই মেঘে তাহলে বৃষ্টি হচ্ছে কি

বৃষ্টি হওয়ার জন্যে জলবিন্দুর ব্যাসার্ধ কত হওয়া দরকার?

ভাবে? মৌসুমী অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর জলীয় বাষ্প বর্তমান থাকে। ফলে ধূলিকণা, লবণকণা ও অন্যান্য দ্রবীভবন কণার ওপর সহজেই ক্ষুদ্র জলকণার সৃষ্টি হতে পারে। জলীয় বাষ্পের জোগান অব্যাহত হওয়ার জন্য এই ক্ষুদ্র জলবিন্দুগুলি অচিরেই বড় ফোঁটায় পরিণত হয়। আর এই বড় ফোঁটাগুলি যখন ছোট ছোট ফোঁটাগুলির মধ্য দিয়ে ঝরতে থাকে, তখন ওই ছোট ফোঁটাগুলি বড় ফোঁটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো বড় ফোঁটা তৈরি করে। এ-ভাবে জলবিন্দুগুলির ব্যাস ক্রমশই বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন

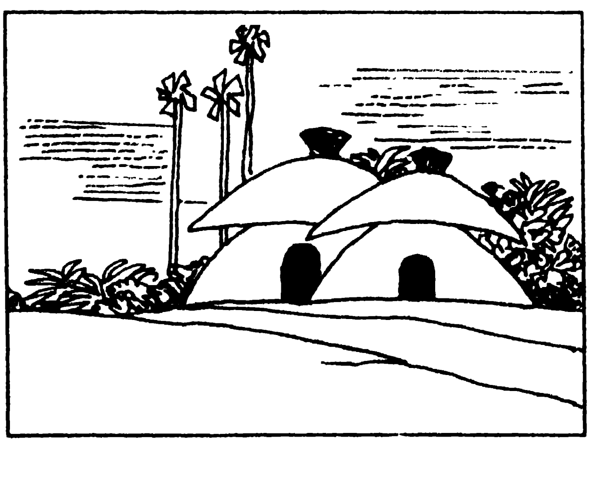
এগুলির ব্যাসার্ধ ১ মিলিমিটার বা তার চেয়ে বেশি হয়, তখনই এরা বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে। এ-ভাবে যে-বৃষ্টি হয়, তার সৃষ্টির এই ব্যাখ্যাকে বলা হয় 'বিন্দু-সংযুক্তি তত্ত্ব' (Coalescence Theory of rainfall)। আমাদের দেশে বর্ষাকালে গাঢ়, কৃষ্ণবর্ণ পুঞ্জমেঘ থেকে ক্ষণে ক্ষণে যে-বৃষ্টি হয় (Passing showers), সে-বৃষ্টি অনেক সময়ই এই ভাবে 'বিন্দু-সংযুক্তি'র দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে।

নদী, হ্রদ, সাগর ও মহাসাগর থেকে জলীয় বাষ্প তো সব সময়ই উঠছে। তবে কখনো দেখা যায় যে, আকাশে মেঘের প্রাচুর্য, আবার কখনো বা নীল আকাশ। এমন কেন হয়?

মেঘ সৃষ্টি হয় বাষ্পীভবন হয়ে—যত ওপরে ওঠা যায়, ততই ঠাণ্ডা। সেখানে দ্রবীভবন কণার ওপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু তৈরির ফলে মেঘ সৃষ্টি। মেঘ থেকে বার্জেরন প্রক্রিয়ায় বা বিন্দু-সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় বৃষ্টি হয়। কিন্তু বাষ্পীভবন হওয়ার পর যদি ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোত থাকে

সাইক্লোন-ঝড় অঞ্চলে প্রচুর মেঘ হয় কেন?

তবেই সেই বাষ্প দ্রুত মেঘে পরিণত হয়ে বৃষ্টি দেবে। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয়ে পরিচলন প্রক্রিয়ায় ঊর্ধ্বগামী হয়। কিছু দূর ঘুরে এসে তবেই সেই বায়ু নিম্নগামী হয়। সুতরাং যদি ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোত বেশি হয়, তাহলে মেঘ সৃষ্টি হবে। আর ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোত খুব বেশি হলেই সেই মেঘে বৃষ্টি নামবে। কিন্তু এই ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোত সৃষ্টি হয় কি ভাবে, আর কি ভাবেই বা সেটা



বেড়ে ওঠে? আমরা জানি, নিম্নচাপ-ক্ষেত্রের দিকে যখন বায়ুপ্রবাহ এগোয়, তখন সেটা সরাসরি না এসে ঘুরতে ঘুরতে আসে। উত্তর গোলার্ধের হাওয়া ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। হাওয়া যখন চক্রাকারে ঘোরে, তখন ওপর দিকে তার একটা গতির সঞ্চার হয়। ফলে নিম্নচাপ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সময়ে ওই ঘূর্ণায়মান বায়ুস্রোত ঊর্ধ্বগামী হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। নিম্নচাপ যতই গভীর হবে ঘূর্ণায়মান বায়ুস্রোতের গতিবেগ ততই বেড়ে যাবে। এই কারণেই নিম্নচাপ-ক্ষেত্রে ও সাইক্লোন-ঝড় অঞ্চলে প্রচুর মেঘ জন্মায় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং যখন আশেপাশে কোথাও নিম্নচাপ-ক্ষেত্র নেই, তখন সাধারণত মেঘ সৃষ্টি হয় না; যদিও বা সামান্য মেঘ হয়, তা থেকে বৃষ্টি-বাদল কিছুই হবে না।

শুধু কি নিম্নচাপ-ক্ষেত্র নিকটে থাকলেই আশেপাশে বৃষ্টি হবে?

নিম্নচাপ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে বুঝতে গেলে আগে বায়ুর চাপ কি এবং তা কি ভাবে মাপা হয়, তা বোঝা দরকার। আমাদের মাথার ওপর বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে আবহমণ্ডল। প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারের ওপর এই বায়ুমণ্ডলের ওজনই হল বায়ুর চাপ। একটি ব্যারোমিটার যন্ত্রে পারদস্তম্ভ যে উচ্চতায় ওঠে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে সেই স্তম্ভের ওজন বায়ুর চাপের সমান। এই পারদস্তম্ভের ওজন হল, স্তম্ভের উচ্চতা × পারদের ঘনত্ব × পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ, যাকে বলা যায় মাধ্যাকর্ষণের টান বা আকর্ষণ। সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার যেমন দূরত্বের একক, তেমনি বায়ুর চাপের একক হল ডাইন প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার (Dynes/sq.cm.)। ভূ-পৃষ্ঠে সমুদ্রতলে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারের ওপর এই চাপ সাধারণ অবস্থায় থাকে 1.013200×10^6 ডাইন। এখন 10^6 ডাইনকে যদি নতুন নাম দিয়ে বলা হয় এক বার (Bar) তাহলে সাধারণ অবস্থায় বায়ুর চাপ দাঁড়ালো 1.0132 বার। এক বারের হাজার ভাগের এক ভাগের নাম মিলিবার (Milibar)। বায়ুর চাপ সাধারণত প্রকাশ করা হয় এই মিলিবার এককে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় এই চাপ দাঁড়ালো 1013.2 মিলিবার।

নিম্নচাপ ক্ষেত্র যখন সৃষ্টি হয়, তখন সেই অঞ্চলের বায়ুর

চাপ আশেপাশের বায়ুর চাপ থেকে 2-4 মিলিবারের মত কম থাকে। যদি বায়ুর চাপ আরো কমে 4-6 মিলিবারের

সাইক্লোন-ঝড়ের চারদিকে বাতাসের বেগ কী রকম?

তফাত ঘটায়, তবে সেই নিম্নচাপ-ক্ষেত্রকে ডিপ্রেসান (Depression) বলে। ডিপ্রেসান গভীর হলে সেই অঞ্চলের চাপ আশেপাশের বায়ুর চাপের চেয়ে 6-8 মিলিবার কম হয়। যদি বায়ুর চাপ আরো কমে নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে 8 মিলিবারের চেয়েও কম হয়, তখন সেটাকে বলা হয় সাইক্লোন-ঝড় (Cyclonic Storm)। সাইক্লোন-ঝড়ের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর চারদিকে বায়ুর গতিবেগ হবে 33 নট্ (Krot) বা তার চেয়ে বেশি। বায়ুর গতিবেগ সাধারণত নট্ এককে প্রকাশ করা হয়। 1 নট্ প্রতি ঘণ্টায়

আমাদের দেশে শীতকালে বৃষ্টি হয় কি ক'রে?

1.15 মাইল গতিবেগ। ডিপ্রেসান ও গভীর ডিপ্রেসান অঞ্চলের চারপাশে বায়ুর গতিবেগ হয় 18 থেকে 32 নট্। এই ধরনের নিম্নচাপ-ক্ষেত্র, ডিপ্রেসান, গভীর ডিপ্রেসান ও সাইক্লোন-ঝড় নিরক্ষীয় অঞ্চলেই শুধু হয়। নাতিশীতোষ্ণ বা মেরু অঞ্চলে যে-ডিপ্রেসান বা সাইক্লোন-ঝড় দেখা যায়, তার আকৃতি ও প্রকৃতি নিরক্ষীয় নিম্নচাপ-ক্ষেত্রের চেয়ে বহু দিক থেকেই আলাদা। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের নিম্নচাপ ও ডিপ্রেসান ভূমধ্যসাগর এলাকায় সৃষ্টি হয়ে পূর্ব দিকে ধাবিত হতে থাকে। শীতকালে এই নিম্নচাপ ও ডিপ্রেসানগুলি পশ্চিম দিক থেকে পাকিস্তান বা আফগানিস্তান পার হয়ে ভারতের উত্তর অংশের ওপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে আসাম বা অরুণাচল অতিক্রম করে আরো পূর্ব দিকে সরে যায়। পশ্চিম দিক থেকে এসে এগুলি হানা দেয় বলে এদের পশ্চিমী-বিক্ষোভ (Western disturbance) বলে। এই ধরনের বিক্ষোভের জন্যই আমাদের দেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। এ-ছাড়া আর এক ধরনের বৃষ্টির সঙ্গেও আমাদের পরিচয় আছে; সেটা হল বজ্রবৃষ্টি (Thunderstorm)। সাধারণত গ্রীষ্মকালে বজ্র-মেঘ সৃষ্টি হয়। এই মেঘগুলি গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে অনেক সময়ে ছোটনাগপুরের মালভূমি বা এর সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে—যেমন বর্ধমান, বীরভূম বা মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম দিকে—সর্বপ্রথম গঠিত হয়। তারপর এগুলি ক্রমশ পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলে, আর একই সঙ্গে আকারে ও উচ্চতায় বাড়ে। এই মেঘ থেকে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে এর নাম 'কালবৈশাখী'। এগুলি সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসে হানা দেয় বলে ইংরেজিতে এদের Nor'westers বলে।

বজ্রবৃষ্টি কেন হয়?

গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যকিরণে ভূ-পৃষ্ঠ যখন উত্তপ্ত হয়, তখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুরাশি আয়তনে বেড়ে হালকা হয়ে যায়। হালকা হওয়ার ফলে ওই বায়ুরাশি ঊর্ধ্বগামী হয়। যদি সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে বা অন্য কোনো কারণে ওই বায়ুস্তরে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকে তবে ওই বায়ুপ্রবাহ ওপরে উঠে মেঘের সৃষ্টি করে। যদি ভূ-পৃষ্ঠে উত্তাপজনিত তাপমাত্রা বেশি হয়, তাহলে বায়ুস্তর আয়তনে বেশি বেড়ে আরো হালকা হয়ে পড়ে, আর তখন সেটা দ্রুতবেগে ওপরে উঠতেই থাকে। বায়ুস্তর ওপরে উঠে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। তখন তার মধ্যে যে-জলীয় বাষ্প ধরা আছে, সেটা মেঘে পরিণত হয়। এইভাবে প্রথমে পুঞ্জ-মেঘ, পরে বিশাল পুঞ্জ-মেঘ আর শেষ পর্যন্ত বজ্র-মেঘ সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প যত বেশি থাকবে, বজ্র-মেঘ পরিমাণে তত বেশি তৈরি হবে আর বজ্র-বৃষ্টির সম্ভাবনাও তত বাড়বে। বজ্র-মেঘ সাধারণত 1500 মিটার বা 2000 মিটার থেকে শুরু হয়ে 9000 মিটার থেকে 10,000 মিটার পর্যন্ত মাথা

শিলাবৃষ্টি কেন হয়?

তোলে। অবশ্য 14 বা 15 কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতার বজ্র-মেঘের সংখ্যাও কম নয়। বজ্র-মেঘ যখন সৃষ্টি হয়, তখন এই মেঘের ভেতর ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোতের প্রাধান্য দেখা যায়। যখন বজ্র-মেঘের গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন মেঘের এক পাশ থেকে বায়ুস্রোত এই মেঘের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে এবং মেঘের ভেতর এক পাশে ঊর্ধ্বগামী ও অপর পাশে নিম্নগামী বায়ুস্রোত সৃষ্টি হয়।

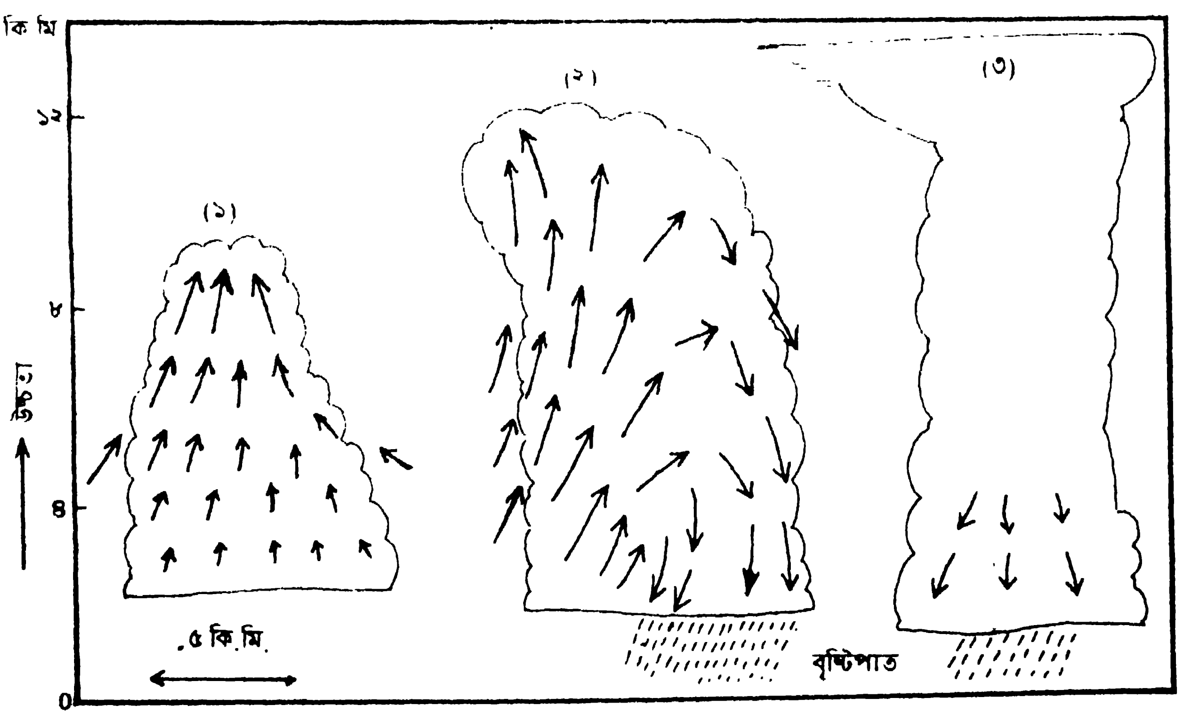
তাহলে মেঘের এক দিক দিয়ে হাওয়া উঠেছে, অপর দিক দিয়ে হাওয়াটা ঘুরে এসে নামছে। এইভাবে ক্রমাগত ওঠা-নামার ফলে মেঘের ভেতর যে-বিশাল হিমকণাগুলি তৈরি হচ্ছে, সেগুলি বায়ুতাড়িত হয়ে বারবার মেঘের ভেতর ওঠানামা ক'রে আয়তনে আরো বাড়ে। শেষ পর্যন্ত এগুলো এত ভারি হয়ে যায় যে, ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ এদের আর ধরে রাখতে পারে না। তখনই এগুলি শিলাবৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে। মেঘের যে-অঞ্চলে নিম্নগামী বায়ুপ্রবাহ বর্তমান, সে-দিকে বৃষ্টিধারাও অন্য দিকের চেয়ে বেশি। যদি এই বজ্র-বৃষ্টি ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে হয়, তখন বায়ুমণ্ডলের নীচের দিকে তাপমাত্রা খুব একটা বাড়েনি বলে মেঘ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই শিলাখণ্ডগুলি শিলার আকারেই মাটিতে এসে পড়ে। আর আমরা তখন শিলাবৃষ্টি পাই। কিন্তু এপ্রিল বা তার পরেও মেঘের মধ্যে প্রচুর শিলাখণ্ড বর্তমান থাকলেও সেইগুলি উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে ভূতলে পড়বার সময় গলে জল হয়ে যায়। তখন আর আমরা শিলাবৃষ্টি পাই না, শুধুই বজ্র-বৃষ্টি হয়ে থাকে। বজ্রমেঘের পূর্ণাঙ্গ অবস্থার পর সেটা ওপর দিকে আরো বাড়ে কিন্তু যখন ট্রোপোপজে এই মেঘের মাথা ঠেকে যায়, তখন আর ওপরে উঠতে পারে না। তাই মেঘের মাথা তখন চারপাশে ছাতার মত ছড়িয়ে পড়ে। পারমাণবিক বা

এপ্রিল মাস বা তারপর আর শিলাবৃষ্টি হয় না কেন?

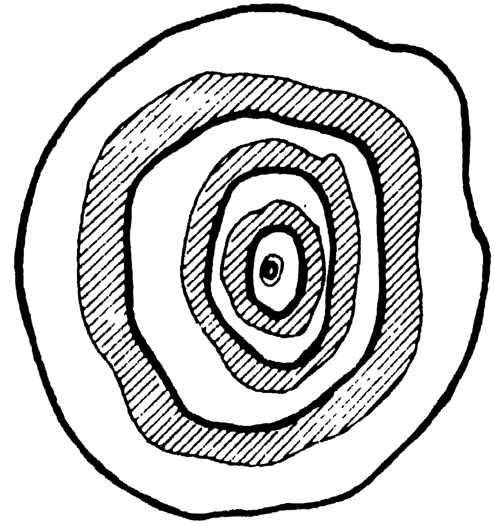
হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের সময়েও অগ্নিগোলক থেকে ব্যাঙের ছাতার মত (Mushroom) মেঘ তৈরি হয়ে ট্রোপোপজের নীচে ছড়িয়ে পড়ে। বজ্র-মেঘের অন্তিম অবস্থায় ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ আর থাকে না বললেই চলে। তখন মেঘের ভেতর শুধু নিম্নগামী বায়ুস্রোত বর্তমান, আর মেঘের নীচে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। ছবিতে এই তিন অবস্থার বজ্র-মেঘের আকারই দেখানো হয়েছে।

শিলাবৃষ্টির সময়ে শিলাখণ্ডগুলি কি সরাসরি নেমে আসে?

শিলাবৃষ্টির সময়ে শিলাখণ্ডগুলি সরাসরি নেমে আসে না। তা ওপরে নীচে বারবার ওঠা-নামা করে। একটা শিলাখণ্ডকে যদি তার ব্যাস বরাবর চিরে দু'টুকরো করা



যায়, তাহলে তার ভেতর কতকগুলি সমকেন্দ্রিক চক্র (কেন্দ্র যাদের এক) নজরে আসে। এই চক্রগুলি পরপর দেখলে বোঝা যায়, একটি চক্র স্বচ্ছ বরফ আর পরেরটি অস্বচ্ছ বরফ দিয়ে তৈরি। মেঘ সৃষ্টির পর যখন বিশাল হিমকণাটি মেঘের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে নীচে পড়ে, তখন অস্বচ্ছ বরফের আস্তরণ তৈরি হয়। আবার ঊর্ধ্বগামী



শিলাখন্ড

বায়ুস্রোতে তাড়িত হয়ে যখন ওই শিলাখণ্ড অতি প্রচণ্ড গতিতে বহু ঊর্ধ্বে চলে যায়, তখন তার গায়ে স্বচ্ছ বরফের আবরণ তৈরি হয়। এইভাবে ক্রমশ তার আয়তন ও ওজন বাড়ে, আর শেষ পর্যন্ত সেটা মাটিতে এসে আছড়ে পড়ে।

কালবৈশাখী ও বজ্র-বৃষ্টি কি একই ভাবে তৈরি হয়?

কালবৈশাখী ও বজ্র-বৃষ্টি এই দু'য়ের সঙ্গেই ঝড় ও বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক থাকলে কি হবে, বজ্র-বৃষ্টি যে-ভাবে তৈরি হয়, কালবৈশাখী কিন্তু সে-ভাবে তৈরি হয় না। বজ্র-বৃষ্টি যে-কোনো ঋতুতেই হতে পারে। কালবৈশাখীর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সাধারণত মার্চ মাসের শেষ থেকে মে মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কালবৈশাখীর সময়। কালবৈশাখী বললেই মনে হয়, সারাদিন প্রচণ্ড গরম, মেঘমুক্ত আকাশ, বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা, ঘাম হচ্ছে। হঠাৎ বিকেলে বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম কোণে ছোট্ট একটা কালো মেঘের আবির্ভাব। হু হু ক'রে সেই মেঘে দিগন্ত ছেয়ে গেল। সহসা একরাশ ধুলো উঠলো, সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। পরক্ষণেই প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব ও তারপরই মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রের নিনাদ।

মার্চ থেকে মে মাসের গোড়া পর্যন্ত বিহারের মালভূমি অঞ্চলে মাঝে মাঝে নিম্নচাপ-ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। তখন বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ এই নিম্নচাপ-ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যায়। বিহারের শুষ্ক বায়ুস্রোত ও বঙ্গোপসাগর থেকে ধাবিত আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ— এই দুইয়ের সংঘাতে ধানবাদ, আসানসোল অঞ্চলে সর্বপ্রথম একটি দু'টি বজ্র-মেঘের সৃষ্টি হয়, আর সেগুলি তীব্রগতিতে মাথা তুলতে থাকে। এই মেঘগুলি থেকে নিঃসৃত শীতল ঝড়ের ঝাপটা (Cold down draft) সামনের দিকে আঘাত করে। ফলে মেঘটা যেদিকে এগোচ্ছে, সেইদিকে, অর্থাৎ বর্ধমান বিভাগের কোনো কোনো অঞ্চলে, বঙ্গোপসাগর থেকে আসা আর্দ্র বায়ুস্তর ওই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা খেয়ে ওপরে উঠে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জায়গায় নতুন করে বজ্র-মেঘ সৃষ্টি হয়ে পড়ে। সবচেয়ে প্রথমে যে একটি দু'টি মেঘ তৈরি হয়েছিল, তাদের যদি 'জননী' (Mother thunderstorm) আখ্যা দেওয়া হয়, তবে সামনের দিকে নতুন সৃষ্ট বজ্র-মেঘগুলি হল 'কন্যা' (Daughter thunderstorm)। এইভাবে সামনের দিকে ক্রমশ অনেকগুলি বজ্র-মেঘ সৃষ্টি হয়ে একটা রেখা বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগোয়। রাডার (RADAR) যন্ত্রে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে, কালবৈশাখী ঝড়ের মেঘের ওই রেখাটি (Line squall cloud) ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে এগোচ্ছে। এই রেখার দৈর্ঘ্য 50 থেকে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে, আর এর বিস্তৃতি 15 থেকে 20 কিলোমিটারের মত হয়। এই রেখাটি যে-অঞ্চলের ওপর দিয়ে ঝাপটা দিয়ে যায়, সেইখানে কালবৈশাখীর তাণ্ডবলীলা চলে। সাধারণত একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই ধরনের ঝড় হয়। ক্রমশ বঙ্গোপসাগরের কাছে এসে পড়লেই এই ঝড় কিন্তু নিস্তেজ হয়ে যায় আর কালবৈশাখীর প্রকোপও থেমে আসে। সমুদ্রের ওপরে কালবৈশাখী হয় না।

কালবৈশাখীর বৃষ্টি সাধারণত কতক্ষণ চলে?

কালবৈশাখীর মেঘের বিস্তৃতি 15-20 কিলোমিটার।

মেঘগুলি সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় 25-30 কিলোমিটার গতিতে এগোয়। সুতরাং কোনো স্থান অতিক্রম করতে এই

একটা জায়গা পার হওয়ার জন্যে কালবৈশাখীর মেঘের কতক্ষণ সময় লাগে?

মেঘগুলির আধ-ঘণ্টা থেকে বড় জোর এক ঘণ্টা মত সময় লাগে। বৃষ্টিও ততক্ষণ হওয়ার কথা। কিন্তু বজ্র-মেঘের সঙ্গে মধ্যস্তর-মেঘও বর্তমান থাকে, আর সেই মেঘ থেকেও অনেক সময় বৃষ্টি হয়। এইজন্যে কোনো কোনো সময়ে এক ঘণ্টার বেশিও বৃষ্টি হতে পারে।

কালবৈশাখীর বৃষ্টির সময়ে মেঘ ডেকে বৃষ্টি হয়, কিন্তু বর্ষাকালের বৃষ্টিতে খুব কম সময়ই মেঘগর্জন শোনা যায়। এর কারণ কি?

কালবৈশাখী ঝড়ের বজ্র-মেঘের উচ্চতা খুব বেশি হয়, প্রায় 12-14 কিলোমিটার পর্যন্ত এই ধরনের মেঘ মাথা তোলে। মেঘ যত উঁচু হবে, ততই তার মধ্যে বিদ্যুতের চমক বাড়বে। বর্ষাকালের বজ্র-মেঘগুলি কিন্তু আকারে খাটো। এগুলি সাধারণত 9 কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে। এদের মধ্যে সেইজন্য বিদ্যুতের চমক অপেক্ষাকৃত কম। মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালে সেই অঞ্চলের হাওয়া গরম হয়ে আয়তনে বেড়ে একটা স্পন্দন সৃষ্টি করে। এই স্পন্দন একবার বাড়ে, আবার কমে, আবার বাড়ে, এইভাবে চলে। ক্রমে এই স্পন্দন নিস্তেজ হয়ে যায়। যতক্ষণ সংশ্লিষ্ট বায়ুস্তর কাঁপে ততক্ষণ মেঘ গর্জনও চলে, শেষে ধীরে ধীরে কমে গিয়ে আওয়াজ থেমে যায়। সুতরাং কালবৈশাখীতে বিদ্যুৎ বেশি চমক দেয় বলে ওই সমস্ত মেঘও বেশি ডাকে।

কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব-লীলা কি শুধু বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গেরই বৈশিষ্ট্য?

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণে সমুদ্র থাকায়, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা শুকনো গরম হাওয়া আর বঙ্গোপসাগরের ভিজে হাওয়ার মধ্যে একটা সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ওই ভিজে হাওয়া ওই শুকনো হাওয়ার ওপরে উঠে মেঘ সৃষ্টি করতে পারে। ভারতের অন্য জায়গায় ঠিক এমনটি হয় না। সুতরাং কালবৈশাখী শুধু আমাদের দুই বাংলারই বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

ঝড়ের শক্তির উৎস কোথায়?

ঝড়ের শক্তি প্রচণ্ড। বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলে, ঘর-বাড়ি ভেঙে-চুরে তছনছ করে দেয়। সামুদ্রিক সাইক্লোন-ঝড় জাহাজও উল্টে দিতে পারে। কোথা থেকে ঝড় এত শক্তি পায়? ঝড়ের মেঘ হয় বিরাট আকারের। এই মেঘ তৈরি করতে অনেকখানি জলীয় বাষ্প দ্রবীভূত হওয়া দরকার। প্রতি গ্রাম জলীয় বাষ্প জমে জল হলে প্রায় 540 ক্যালরি (Calorie) তাপ নির্গত হয়। ক্যালরি হল তাপের একক। এক গ্রাম ভরের জলীয় বাষ্প যদি একই তাপমাত্রা বজায় রেখে শুধু বাষ্পাকার থেকে জলকণায় পরিবর্তিত হয়, তখন তা থেকে কিছু তাপ বেরিয়ে আসে। এরই পরিমাণ হল প্রতি গ্রামে 540 ক্যালরি। এই যে তাপ, যা তাপমাত্রার কোনো হেরফের না ঘটিয়ে শুধু বাষ্প থেকে জলকণায় রূপান্তরের ফলে সৃষ্টি হয়, এর নাম লীন তাপ (Latent heat)। এখন যত বড় আকারের মেঘ তৈরি হবে, লীন তাপও তত বেশি নির্গত হবে। আমরা জানি শক্তির রূপান্তর ঘটে। ফলে লীন তাপের তাপশক্তি রূপান্তরিত হয়ে যায় ঝড়ের হাওয়ার গতিশক্তিতে।

অনেক সময় দেখা যায়, কোনো কোনো বজ্র-বৃষ্টিতে দারুণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়। বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়, বড় বড় গাছ সমূলে উৎপাটিত হয়, ভারি ভারি জিনিস উড়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। এই ঝড় কেন হয়?

শীতের শেষে ও বর্ষার ঠিক আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে আবহমণ্ডলে অনেক সময়ে ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। সে-সময়ে যদি কোনো কারণে আর্দ্রতার আধিক্য ঘটে তাহলে টোর্নেডো (Tornado) মেঘের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের মেঘের নীচে হাতির শুঁড়ের মত একটা সরু অংশ নেমে এসে ভূমি স্পর্শ করে এবং নীচ থেকে সব কিছু শোষণ ক'রে ওপরে তোলে। এই শুঁড়ের সামনে গাছ-

পালা, বাড়ি-ঘর, গরু-বাছুর যাই পড়ুক না কেন, তাকেই সে শুষে নিয়ে ওপরে তুলে অনেক দূরে আছড়ে ফেলবে। এর নাম টোর্নেডো ঝড়। পশ্চিমবাংলার তুলনায় বাংলাদেশে এই ঝড়ের প্রকোপ বেশি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই টোর্নেডো ঝড় অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। টোর্নেডো বেশি হতে গেলে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন-স্তরে প্রচুর জলীয় বাষ্পের যোগান চাই; এইজন্য বাংলাদেশেই টোর্নেডো এত বেশি হয়। টোর্নেডো ঝড়ের সময় বায়ুপ্রবাহ প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে থাকে। হাতির শুঁড়ের মত যে-অংশটা, তার নাম 'ফানেল' মেঘ (Funnel cloud), সেটা ঘুরতে ঘুরতে সামনে এগোয়। এই ঘূর্ণায়মান বায়ুর গতিবেগ ঘণ্টায় 400 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই ঝড়ের ফলে এমনও দেখা গেছে যে, কাঠের তীক্ষ্ণ টুকরো প্রচণ্ড গতিতে এসে লোহার থামের গায়ে গেঁথে গেছে।

এই টোর্নেডো ঝড়ের যা বর্ণনা পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে, ঝড়ের সময় যখন ফানেল মেঘ নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে যায়, তখন প্রচণ্ড গর্জন হয়, মনে হয় যেন রেলগাড়ির এঞ্জিন চলছে! ফানেল মেঘ যেখানে মাটি স্পর্শ

টোর্নেডো ঝড় কাকে বলে?

করে সেই জায়গাটায় ধুলো-বালি, খড়-কুটো, গাছপালার টুকরো জড়ো হওয়ার ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। বৃষ্টিপাত খুব একটা বেশি হয় না। তবে টোর্নেডো চলে যাবার পরে বৃষ্টি বাড়তে পরে। ক্ষয়-ক্ষতি যা হয় তার বিস্তৃতি কিন্তু খুবই কম, 200 থেকে 500 মিটারের মত। তবে লম্বায় এই অঞ্চলটা 15 থেকে 20 কিলোমিটারের মত হয়। টোর্নেডের সময় ফানেল মেঘ যেখান দিয়ে চলে, সেই অঞ্চলের বায়ুর চাপ ভীষণ কমে যায়। এর কারণ ফানেলটা নীচ থেকে হাওয়া ক্রমাগত শুষে নেয়। ফলে ওই অঞ্চলের ঘর-বাড়ি বিস্ফোরিত হয়ে ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে। সুতরাং যদি দেখা যায় যে, কোনো অঞ্চলে টোর্নেডোর ফানেল মেঘ এগিয়ে আসছে, তখন ঘর-বাড়ির সব জানালা দরজা খুলে রাখা উচিত; না হলেই বাইরের তুলনায় ভেতরের চাপ বেশি হবে আর সেইজন্যে বাড়ি-ঘর সব বোমার মত ফেটে যাবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে টোর্নেডো ঝড়ের প্রকোপ আমাদের তুলনায় বেশি, সেখানে অবশ্য টোর্নেডোর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভূ-গর্ভস্থ আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা হয়। ফানেল মেঘ আসছে দেখলেই লোকে ওই 'আশ্রয়স্থল'গুলিতে চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

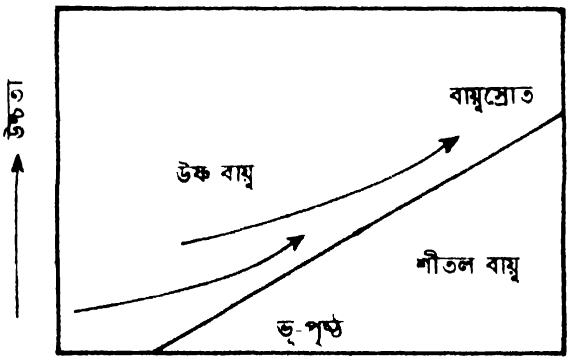
কখনো দেখা যায় যে, এক-আধ পশলা বৃষ্টি হয়েই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, আবার মাঝে মাঝে তিন চার দিন বা তারও বেশি দিন ধরে অবিশ্রাম বৃষ্টি হচ্ছে। এর কারণ কি?

সৌর কিরণে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হলে সেখান থেকে বায়ুস্তর লঘু হয়ে ওপরে উঠে যায়। ওই বায়ুস্তরে যদি জলীয় বাষ্প বেশি থাকে, তাহলে ওই বায়ু ওপরে উঠে বজ্র-মেঘ তৈরি করতে পারে। বজ্র-মেঘ থেকে মেঘ-গর্জনের সঙ্গে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়। কালবৈশাখী এবং সাধারণ বজ্র-বৃষ্টি এই ধরনের হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বজ্র-মেঘের বিলুপ্তি ঘটে এবং আর নতুন মেঘের উদ্ভব হয় না বলেই এক-আধ পশলা বৃষ্টি দিয়েই আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে অনেক সময়ে নিম্নচাপ-ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে এক দিক থেকে অপর দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়। শীতকালে এই নিম্নচাপ-ক্ষেত্রগুলি উত্তর-পশ্চিম দিকে কাশ্মীর বা পাঞ্জাব রাজ্য অতিক্রম করে ক্রমশ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে হিমালয়ের কোল বরাবর চলে। তারপরে আসাম ও অরুণাচল রাজ্য অতিক্রম ক'রে আরো পূর্ব দিকে সরে যায়। চলার পথে এই নিম্নচাপ-ক্ষেত্রগুলি আমাদের দেশে শীতকালীন বৃষ্টি দেয়। পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে সরে যায় বলে এগুলিকে 'পশ্চিমী বিক্ষোভ' বলে। আবার আর এক ধরনের নিম্নচাপ-ক্ষেত্র নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রে, যেমন—বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের ওপর সৃষ্টি হয়। তারপর অনেক সময় তা আরো ঘনীভূত হয়ে ডিপ্রেশান বা সাইক্লোন-ঝড়ের আকারে তটভূমি অতিক্রম ক'রে মূল ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করেও ঝড়-বৃষ্টি দেয়। নিম্নচাপ-ক্ষেত্রজনিত বৃষ্টিপাত সাধারণত কয়েক দিন ধরে চলে। নিম্নচাপ-ক্ষেত্র, তা পশ্চিমী বিক্ষোভই হোক বা নিরক্ষীয় অঞ্চলের সামুদ্রিক ঝড়-তুফানই হোক, সাধারণভাবে আবহাওয়া প্রণালী (Weather system) নামে পরিচিত। সুতরাং আবহাওয়া প্রণালী বর্তমান থাকলে বৃষ্টিপাত বাড়ে এবং একাধিক দিন ধ'রে বৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি সৌর তাপের ফলে বজ্র-মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি দেয়, তবে সেই বৃষ্টি এক থেকে তিন ঘণ্টার বেশি

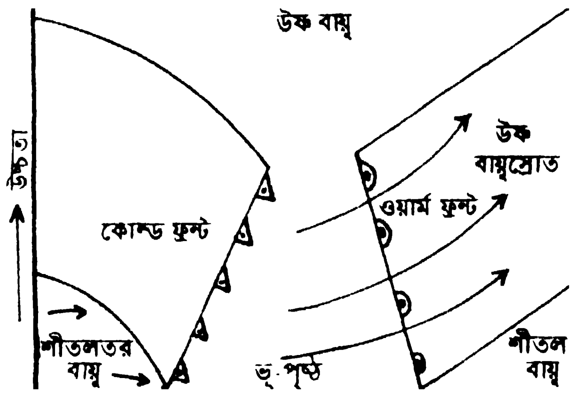
সাধারণত হয় না। এই আবহাওয়া প্রণালীগুলি যতই প্রবল আকারের হবে, এদের দ্বারা সৃষ্ট বৃষ্টিপাত ততই প্রবল হবে এবং বেশি দিন ধ'রে চলবে।

পশ্চিমী বিক্ষোভ এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের ওপর সৃষ্ট নিম্নচাপ কি একই ধরনের?

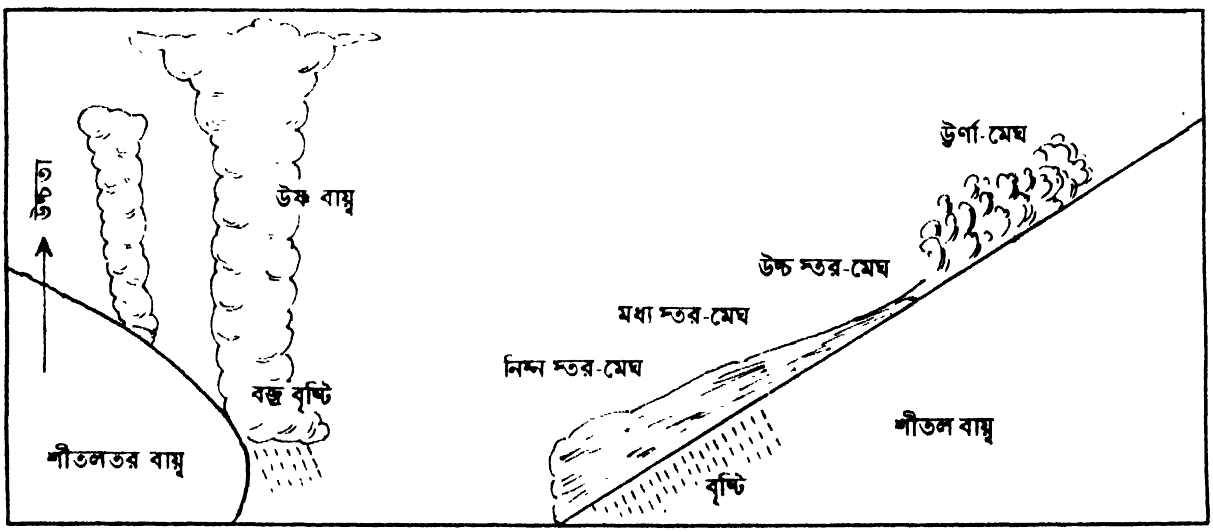
পশ্চিমী বিক্ষোভ আর নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের ওপরের নিম্নচাপ—নিম্নচাপ-ক্ষেত্র সৃষ্টির এই দু'টি কারণ কিন্তু একই ধরনের নয়। এদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আলাদা এবং উৎপত্তির কারণও এক নয়। অতলান্তিক মহাসাগর বা

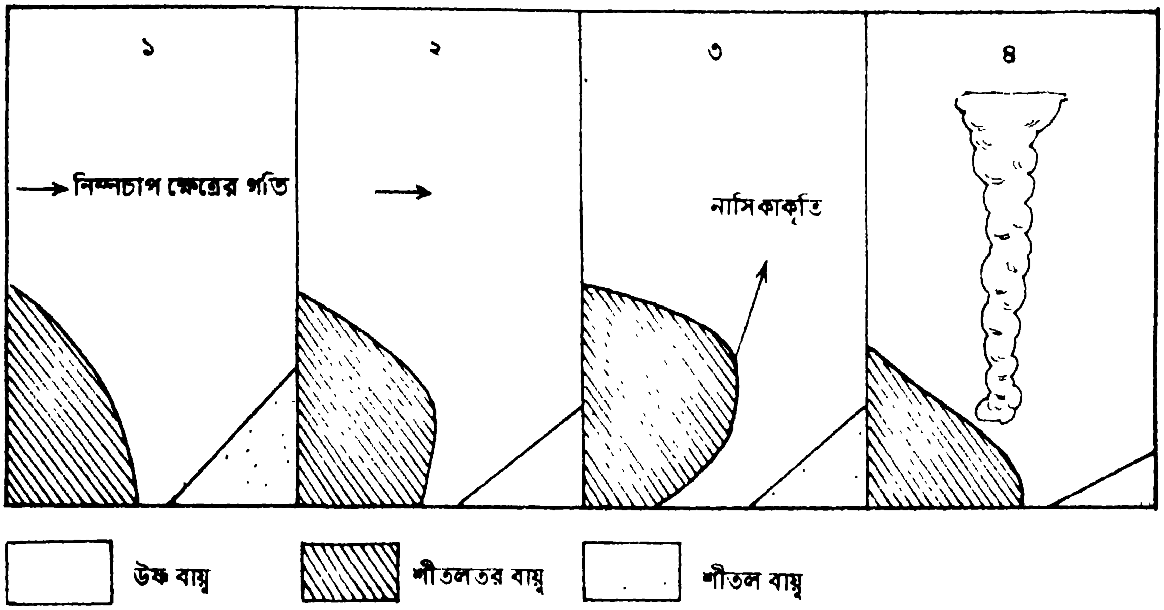


ভূমধ্যসাগরে শীতকালে যে-ঝড়-তুফান সৃষ্টি হয়, সেগুলি ক্রমশ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায়। এগুলি নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাইরে সৃষ্টি হয় বলে, এদের নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাইরের ডিপ্রেশান (Extra-tropical depression) বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাইরে যদি উষ্ণ ও শীতল এই দুই ধরনের বায়ুপ্রবাহের সংঘাত হয়, তাহলে শীতল বায়ু উষ্ণ বায়ুর ভিতরে কীলক (Wedge) আকারে প্রবেশ করে এবং অপেক্ষাকৃত হালকা উষ্ণ বায়ুস্রোত শীতল বায়ুর গা বেয়ে উঠে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। ফলে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ভূমির ওপরে, যেখানে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর ওপর



উঠতে শুরু করেছে, সেই জায়গাটিকে উষ্ণ রণাঙ্গন (Warm front) বলে। আর যেখানে শীতলতর বায়ু উষ্ণ বায়ুকে ঠেলে দিচ্ছে, সেখানটিকে শীতল রণাঙ্গন (Cold front) বলা হয়ে থাকে। উষ্ণ রণাঙ্গনে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুস্তরের ওপর ঠেলে উঠে যথাক্রমে ঊর্ণা-মেঘ, উচ্চ-স্তর, মধ্য-স্তর ও নিম্ন-স্তর মেঘ সৃষ্টি করে। মধ্য ও নিম্নস্তর মেঘগুলি থেকে বৃষ্টিপাত হয়। শীতল রণাঙ্গনে শীতলতর বায়ু, উষ্ণ বায়ুস্তরকে ঠেলে সরাচ্ছে। সেখানে ভূমির





বন্ধুরতার জন্য শীতলতর বায়ু-স্তর উষ্ণ বায়ুর সঙ্গে যে-কোণ উৎপন্ন করে, তার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ভাবে বাড়তে বাড়তে শীতলতর বায়ুস্তর নাসিকাকৃতি ধারণ করে আর শেষ পর্যন্ত শীতলতর বায়ু-স্তর পিছলে পড়ে হঠাৎ নীচের উষ্ণ বায়ুস্তরকে উর্ধ্বগামী করে।

চিত্রে এই অবস্থানগুলি দেখানো হল। এইভাবে উষ্ণ রণাঙ্গনে বরাবর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত ঘটে, আর শীতল রণাঙ্গনে বজ্র-বৃষ্টি হয়। কোনো স্থানে উষ্ণ রণাঙ্গন চলে যাবার পর সেখানে কিছুক্ষণ আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে; কিন্তু তারপরই সেখানে শীতল রণাঙ্গন এসে প'ড়ে বজ্র-বৃষ্টি দেয়। দু' এক পশলা বজ্র-বৃষ্টির পর আবহাওয়া ভাল হয়ে যায় এবং শীতলতর বায়ুর প্রভাবে সেখানে খুব শীত পড়ে। আমাদের দেশে শীতকালীন বৃষ্টি এইভাবে ঘটে। এ-রকম রণাঙ্গন জনিত বৃষ্টি দু'তিন দিন ধরে চলে।

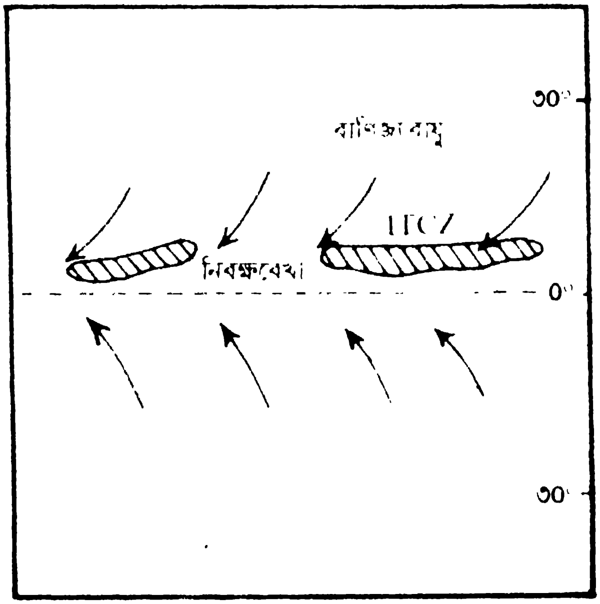
নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের ওপর যে নিম্নচাপ-ক্ষেত্র তৈরি হয়ে বৃষ্টি দেয়, তা-ও কি উষ্ণ ও শীতল বাতাসের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট হয়?

না, নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রে এ-রকম নিম্নচাপ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় অন্যভাবে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাইরে উষ্ণ ও শীতল রণাঙ্গন দু'পাশে রেখে নিম্নচাপ-ক্ষেত্র তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের বায়ুর সংঘাতে। এর জন্য দরকার উষ্ণ, শীতল ও শীতলতর বায়ুপ্রবাহ। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ কিন্তু তাদের তাপমাত্রার হিসেবে ওই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে না। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল বা মেরু অঞ্চলের থেকে উষ্ণমণ্ডলে বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য ঘূর্ণনের প্রভাব বেশি। এইজন্যে এখানে উষ্ণ বায়ু ও শীতল বায়ু পাশাপাশি আলাদা আলাদা থাকতে পারে না; তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এখানে বৃষ্টিপাত হয় অন্যভাবে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিম্নচাপ-ক্ষেত্র কি ভাবে তৈরি হয়?

উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন বিশেষ করে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ, দু'দিক থেকেই আসা বাণিজ্য বায়ুপ্রবাহ দু'টির (Trade winds) মধ্যে সংঘাত হয়; ফলে নিরক্ষরেখার সামান্য উত্তরে, প্রায় পাঁচ থেকে দশ ডিগরি উত্তর অক্ষাংশের কাছে লম্বা একটি অঞ্চল জুড়ে ঘন মেঘের সৃষ্টি হয়। এর নাম আন্তঃনিরক্ষীয় সংঘর্ষ অঞ্চল (Inter-tropical convergence zone বা I.T.C.Z.)। এই I.T.C.Z. অঞ্চল মাঝে মাঝে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন সেখানে নিম্নচাপ-ক্ষেত্র তৈরি হয়। যদি অবস্থা অনুকূল থাকে তাহলে নিম্নচাপ-ক্ষেত্র আরো গভীর হয়ে ডিপ্রেসান, গভীর ডিপ্রেসান ও সাইক্লোন-ঝড়ে পরিণত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই সব নিম্নচাপ-ক্ষেত্রগুলি

পূর্ব দিক থেকে ক্রমশ পশ্চিম দিকে সরে যায়। একই সঙ্গে এদের মেরু-অভিমুখেও একটা গতি থাকে। ফলে উত্তর গোলার্ধে নিরক্ষীয় নিম্নচাপগুলি উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে



যায়। বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ-ক্ষেত্র বা ডিপ্রেসান তৈরি হয় সেগুলি উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে সাধারণত অন্ধ্র, উড়িষ্যা বা পশ্চিম বাংলার তটভূমি অতিক্রম করে। চলার পথে এগুলি বৃষ্টি দিতে দিতে যায়। সমুদ্র থেকে ডাঙায় উঠে এগুলি উত্তর-পশ্চিম দিকে চলার সময়ে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য অতিক্রম ক'রে সেখানে বৃষ্টি দেয়। তারপর নিম্নচাপ-ক্ষেত্রগুলি আরো এগিয়ে গিয়ে পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও বেশ ভাল বৃষ্টিপাত ঘটায়। এইভাবে সারা দেশে বর্ষার বৃষ্টি হয়ে থাকে। বর্ষাকালের শেষের দিকে নিম্নচাপ-ক্ষেত্রগুলি বঙ্গোপসাগরে আরো দক্ষিণ দিকে সৃষ্টি হয়। তখন এগুলি বেশির ভাগ সময় উড়িষ্যা উপকূল অতিক্রম না ক'রে অন্ধ্র উপকূলের দিকে যায়। তখন ভারি বৃষ্টিপাত হয় অন্ধ্রপ্রদেশে। একই ভাবে আরব সাগরেও নিম্নচাপ-ক্ষেত্র ও ডিপ্রেসান তৈরি হয়, যদিও বঙ্গোপসাগরের তুলনায় আরব সাগরে এদের সংখ্যা খুবই কম।

বর্ষাকালের সব বৃষ্টিই কি নিম্নচাপ-ক্ষেত্র থেকে হয়?

বর্ষাকালের বৃষ্টি যে সবই নিম্নচাপ-ক্ষেত্র থেকে হবে, এর কোনো ঠিক নেই। অন্যভাবেও এ-বৃষ্টি হতে পারে। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ বর্ষাকালের বৃষ্টিপাতকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ যখন পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে এগিয়ে যায়, তখন এই হাওয়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে ওঠে। ফলে মেঘ সৃষ্টি হয় আর বৃষ্টিপাত ঘটে। একে বলে Orographic rain।

সাইক্লোন ঝড় কোথায় বেশি হয়—বঙ্গোপসাগরে না আরব সাগরে?

যদি সাইক্লোন ঝড়ের তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যায়, আরব সাগরের তুলনায় প্রতি বছর অনেক বেশি সাইক্লোন ঝড় সৃষ্টি হয় বঙ্গোপসাগরে। এর অন্যতম কারণ, বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা (Sea surface temperature বা SST) আরব সাগরের চেয়ে বেশি। দেখা গেছে যে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যদি 27 ডিগরি সেলসিয়াস বা তার চেয়ে বেশি হয়, তবেই সাইক্লোন ঝড়ের সৃষ্টি হতে পারে।

এ ছাড়া আরো একটা কারণে বঙ্গোপসাগরে অপেক্ষাকৃত বেশি সাইক্লোন ঝড় হয়। সাইক্লোন একটা অত্যন্ত গভীর নিম্নচাপ অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আগে আমরা বলেছি যে, উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ অঞ্চলের চারপাশে বায়ুর গতি থাকে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে। এখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক

সমুদ্র-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কত হলে সাইক্লোন ঝড় তৈরি হয়?

থেকে এসে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-ভাগে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে ঘুরে, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে আবার প্রবেশ করে। এটাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিপথ। এই রকম ঘড়ির কাঁটার উল্টোমুখে ঘোরার ফলে বঙ্গোপসাগরে সহজেই নিম্নচাপ-ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে যেটা আরব সাগরে পারে না।

সাইক্লোন-ঝড়ের 'চোখ' বা eye of a cyclone বলে একটা কথা শোনা যায়। এটা কি?

সাইক্লোন-ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে বায়ুর চাপ সবচেয়ে

কম, সেখানে কিন্তু মেঘ থাকে না। ওই স্থানটি মেঘমুক্ত এবং সেখানে বায়ুর গতি মৃদুমন্দ। এই স্থানটিকেই সাইক্লোনের 'চোখ' বলা হয়। এই চোখের ঠিক বাইরেই কিন্তু বায়ুর গতি প্রচণ্ড! মেঘও সেখানে প্রচুর এবং সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ফলে ওপর থেকে দেখলে মনে হয় যে, একটা বিশাল জায়গায় মেঘের প্রাচুর্য, বৃষ্টির প্রাবল্য ও ঝড়ের প্রাদুর্ভাব। অথচ তারই ভেতরে একটা গোলাকার ক্ষুদ্র স্থানে মেঘ, বৃষ্টি বা ঝড় কিছুই নেই! সেখানে নির্মল আকাশ। যেন

সাইক্লোনের চোখ কত বড়?

সমগ্র ব্যাপারটা একটা একচক্ষু দানবের হুটোপাটি। এই কারণেই ওই নির্মল, মেঘমুক্ত স্থানটিকে 'চোখ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই মেঘমুক্ত অঞ্চলের, অর্থাৎ সাইক্লোনের 'চোখের' ব্যাস সাধারণত 20 থেকে 30 কিলোমিটার হয়ে থাকে।

সাইক্লোন-ঝড়কে লোকে এত ভয় করে কেন?

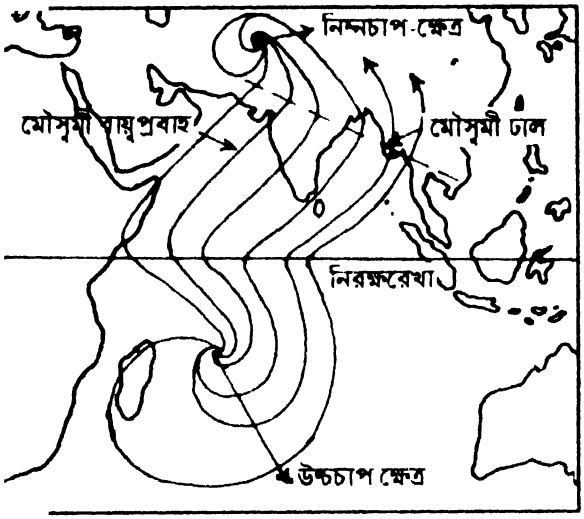
সাইক্লোন-ঝড়কে ভয় করে না, এমন বোধহয় কেউ নেই। সাইক্লোন ঝড়কে আমরা ভয় করি তিনটি কারণে। প্রথমত, এখানে নিম্নচাপ অত্যন্ত গভীর বলে বায়ুর গতিবেগ খুবই তীব্র। সেইজন্য যে-অঞ্চলে সাইক্লোন ঝড় সমুদ্র থেকে এসে আছড়ে পড়ে, সেখানে প্রচণ্ড ঝড় হয়। ফলে কাঁচাবাড়ি, গাছপালা, টেলিগ্রাফ ও ইলেকট্রিকের খুঁটি উপড়ে প'ড়ে অনেক ক্ষতিসাধন করে। ঝড়ের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুরু হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি। এই অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে কাছাকাছি নদী-নালাগুলো জলপ্লাবিত হয়ে পড়ে এবং বন্যার সৃষ্টি করে। তৃতীয় কারণটিই বোধহয় সবচেয়ে মারাত্মক। এটি হল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। সাইক্লোন ঝড় যখন সমুদ্র থেকে এগিয়ে এসে স্থলভাগ অতিক্রম করে, তখন যে-অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র থেকে বইছে, সেই দিক থেকে সমুদ্রের জল বায়ুতাড়িত হয়ে ধীরে ধীরে স্থলের ওপর এগিয়ে আসে। একেই বলে জলোচ্ছ্বাস (Tidal wave)। এই জলোচ্ছ্বাসের গভীরতা সাধারণত তিন থেকে পাঁচ মিটার হয়; তবে অন্ধ্রপ্রদেশে 'চিরালা' সাইক্লোন ও 1970 সালে বাংলাদেশে সাইক্লোনের সময় জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা অনেক বেশি হয়েছিল। সুতরাং ঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস, এই তিন কারণে অনেক প্রাণহানি ঘটে। 1886-এ অধুনা বাংলাদেশে বাখরগঞ্জে সাইক্লোনে, জলোচ্ছ্বাস ও তৎপরবর্তী কলেরা মহামারীর জন্য প্রায় তিন লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। সুতরাং সাইক্লোন ঝড় যে কি ভীষণ বিপজ্জনক, তা সহজেই অনুমেয়!



1940-এর সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত বোম্বাই বন্দরের একটি স্টিমার

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তিস্থল কোথায়?

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ গোলার্ধে উৎপন্ন হয়। মালাগাসির (পূর্বতন ম্যাডাগাসকার) পূর্বে, ভারত মহাসাগরে ম্যাকাসার দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন ভারত-মহাসাগরের দক্ষিণাংশে শীতকাল এবং তখন সেখানে একটি উচ্চচাপ-ক্ষেত্র তৈরি হয়। ম্যাকাসার দ্বীপপুঞ্জের কাছে এই উচ্চচাপ ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। এখান থেকেই বায়ুপ্রবাহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিক্ষিপ্ত বায়ুপ্রবাহের একাংশ উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বিষুবরেখা অতিক্রম করে এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে মোড় ঘুরে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষে এই বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এসে ভারতের পশ্চিম উপকূল অতিক্রম করে। সেইজন্য এই বায়ুপ্রবাহকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বলে। ভারতের গ্রীষ্মকালে পাকিস্তানে



একটি নিম্নচাপ-ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং বায়ুপ্রবাহ এই নিম্নচাপের দিকে অগ্রসর হয়। এই দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ একটি বিশেষ অঞ্চলে ঘুরে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে গিয়ে নিম্নচাপ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এই শেষ ঘোরার ব্যাপারটা ঘটে বঙ্গোপসাগরের উত্তর অংশে সাধারণত 17-23 ডিগরি অক্ষরেখা বরাবর। এই অঞ্চলের নাম মৌসুমী ঢাল বা মনসুন ট্রাফ (Monsoon trough)।

মনসুন ট্রাফের বৈশিষ্ট্য কি?

মৌসুমী ঢাল বা মনসুন ট্রাফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর ওপরে বায়ুপ্রবাহের আবর্ত সৃষ্টি হয়; এই কারণে কিছু পরিমাণ মৌসুমী বায়ু ওপরে উঠে যায়। মৌসুমী বায়ু মহাসাগরে উৎপন্ন হয় বলে এই বায়ুপ্রবাহে আর্দ্রতার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। ফলে এই বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়ে প্রচুর মেঘ সৃষ্টি করে ও বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেইজন্য মনসুন ট্রাফের আশেপাশের অঞ্চলে তুলনামূলক ভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। মনসুন ট্রাফের যে অংশ বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে, সেই অঞ্চলেই সাধারণত নিম্নচাপ ক্ষেত্র, ডিপ্রেসান ও সাইক্লোন-ঝড় সৃষ্টি হয়। এই মনসুন ট্রাফ এক জায়গায় স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অক্ষাংশ বরাবর এর ওঠা-নামা চলে। যখন উত্তর দিকে উঠতে উঠতে মনসুন ট্রাফটি হিমালয়ের পাদদেশে এসে পড়ে, তখন বিহারের সমতলভূমি, উত্তরবঙ্গ, উত্তর আসাম, অরুণাচল এবং হিমালয়ের পাদদেশে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। এই অবস্থায় কিন্তু মূল ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বৃষ্টিপাত খুবই কমে যায়। এই সময়ে মৌসুমী বৃষ্টিপাতে যেন একটা ছেদ আসে, তাই একে মৌসুমী ছেদ (Break in monsoon) বলে। সুতরাং মনসুন ট্রাফ কোথায় আছে এটা জানা থাকলে প্রবল বৃষ্টিপাত কোন অঞ্চলে হবে, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত কি শুধু ভারতবর্ষেই হয়, না পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও হয়ে থাকে?

মৌসুমী বায়ু এই কথাটার আক্ষরিক অর্থ হল, এই বায়ু ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বছরে দু'বার দিক পরিবর্তন করে। কয়েক মাস দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বয়, আবার কয়েক মাস বয় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। বায়ুপ্রবাহের এই রকম দিক পরিবর্তন যেখানে যেখানে হয়, সেই অঞ্চলগুলিকেই মৌসুমী অঞ্চল বলে। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, মালয়েসিয়া, চীনদেশের দক্ষিণাংশ, নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া, আরবদেশের দক্ষিণাংশ, পূর্ব আফ্রিকা ও সিয়েরা লিওঁ এই প্রকার মৌসুমী অঞ্চল। এই সব দেশে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে বৃষ্টিপাত হয়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ কি ভাবে দেওয়া হয়?

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে এটা জানিয়ে রাখা দরকার যে, সাধারণত আবহাওয়ার পূর্বাভাষ তিন প্রকার। প্রথম, স্বল্পকালীন পূর্বাভাষ (Short range forecast) যার মেয়াদ 48 ঘণ্টা। দ্বিতীয়, মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাষ (Medium range forecast), যা এক সপ্তাহের জন্য দেওয়া হয়, আর তৃতীয় হল দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাষ (Long range forecast), যা সাধারণত ছয় বা আট মাস আগে দেওয়া হয়ে থাকে। এ-ছাড়া প্রতিটি বিমানবন্দরে বিমান যাত্রার পূর্বক্ষণে ওই বিমান যে-পথে যাত্রা করবে, সেই পথের বিভিন্ন স্তরে কি রকম আবহাওয়া থাকতে পারে তারও একটা পূর্বাভাষ বিমান চালককে জানানো হয়। এই পূর্বাভাষের মেয়াদ কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এর নাম aviation

weather forecast। এ-সবের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে আরো বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া হয়ে থাকে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিতে হলে প্রথমেই চাই আবহাওয়ার মানচিত্র (Weather map)। সারা পৃথিবীতে অসংখ্য আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Observatory) আছে। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আবহাওয়ার অবস্থা টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার বা বেতারের মাধ্যমে মূল কেন্দ্রে পাঠানো হয়ে থাকে। সেখানে ওই তথ্যগুলি একটি মানচিত্রে সাংকেতিক ভাবে অঙ্কিত করা হয়। এবার যে-সব জায়গার বায়ুর চাপ সমান, তাদের একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করা হয়। এই রেখাকে বলে সমচাপ রেখা। এই সমচাপ রেখা টেনে উচ্চ-চাপ অঞ্চল ও নিম্ন-চাপ অঞ্চলকে পরস্পরের থেকে আলাদা করা হয়। নিম্ন-চাপ অঞ্চলে যে সমচাপ-রেখা (Isobar) তার মান সবচেয়ে কম। নিম্ন-চাপ অঞ্চলকে ঘিরে ক্রমশ আরো সমচাপ রেখা টানা হয়। তাদের মানও ক্রমশ বাড়ে। এইভাবে সম-তাপরেখা (Isotherm) ও সম-বৃষ্টিরেখা (Isohyete) ইত্যাদির সাহায্যে ওই মানচিত্রটিকে সম্যক বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষিত মানচিত্রটি থেকে নিকটবর্তী অঞ্চলে কোনো নিম্নচাপ-ক্ষেত্র আছে কি নেই, বা কোনো প্রকার আবহাওয়া প্রণালী ওই মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে কিনা, তা বোঝা যায়। যদি তা দেখা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা দরকার সেই আবহাওয়া প্রণালী বা নিম্নচাপ-ক্ষেত্র গত দু'তিন দিন ধরে কোনদিকে সরে যাচ্ছে। এইভাবে একটা ধারণা করা হয় যে, আগামী এক বা দু'দিনে কোনদিকে ওই

কুয়াশা কখন হয়?

আবহাওয়া প্রণালী সরে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ দেওয়া হয় সেই দিকেই। আবহাওয়া প্রণালীটি যতই প্রবল হবে, বৃষ্টিপাতও তত বেশি হবে বলে আশঙ্কা করা হয়। আর সমচাপরেখাগুলি যতই ঘন সন্নিবিষ্ট বা নিম্নচাপ-ক্ষেত্রটি যতই গভীর হবে বায়ুর গতিবেগ ততই বেশি হবে, ধরে নেওয়া হয়। এর কারণ হল, উপরোক্ত অবস্থায় চারপাশ থেকে বায়ুপ্রবাহ প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে ওই গভীর নিম্নচাপ-ক্ষেত্রটি ভরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। তা ছাড়া শীতের রাত্রে যদি বোঝা যায় যে, সমুদ্রবায়ু তীরবর্তী অঞ্চলে ভোররাত্রে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে ধারণা করা হয় যে, ভোরবেলা, যখন তাপমাত্রা সর্বনিম্ন হবে, তখন ওই সমুদ্রবায়ু-বাহিত জলীয় বাষ্প ধূলিকণার ওপর দ্রবীভূত হয়ে কুয়াশা সৃষ্টি করতে পারে। এই কুয়াশার পূর্বাভাষ বিমানচালনার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি সংবাদ। কারণ কুয়াশার প্রাদুর্ভাবে বিমানচালনার অসুবিধে হতে পারে। এইভাবেই ঝড়-বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতির পূর্বাভাষ দেওয়া হয়ে থাকে।

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে কি কি যন্ত্র থাকে, আর সেগুলি থেকে কি ভাবে আবহাওয়ার তথ্য সংগৃহীত হয়?

আবহাওয়ার তথ্য সংগৃহীত হয় দু'ভাবে। কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্যে কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। যেমন, আকাশের অবস্থা—কতটা মেঘ আছে, কি কি ধরনের মেঘ এবং প্রত্যেকটি কত পরিমাণে আছে, ওই সব মেঘের আনুমানিক উচ্চতা কত, কত দূরের বাড়ি বা গাছপালা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে (এ-থেকে কুয়াশা বা ধোঁয়াশার খবর মেলে), বর্তমান আবহাওয়া কেমন, অর্থাৎ ঝড়-বৃষ্টি বা বজ্র-বৃষ্টি এ-সব কিছু হচ্ছে কিনা বা অদূরে দেখা যাচ্ছে কিনা; ইত্যাদি। আবহাওয়ার অন্যান্য তথ্য যান্ত্রিক উপায়ে পাওয়া যায়; যেমন, বায়ুর চাপ, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বায়ুর তাপমাত্রা, দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, বায়ুর গতির দিক ও বেগ, বৃষ্টিপাত হয়ে থাকলে তার পরিমাণ, বাতাসের আর্দ্রতা ইত্যাদি। এই সব তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যারোমিটার, ড্রাই ও ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটার, চরম-অবম থার্মোমিটার (Maximum and Minimum thermometers), বায়ুর গতিবেগ নিরূপণ যন্ত্র (Wind vane and anemometer), বৃষ্টিমাপক যন্ত্র (Rain gauge) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই তথ্যগুলি সবই ভূ-পৃষ্ঠের ওপর আবহাওয়ার অবস্থা কেমন যাচ্ছে তারই খবর। কিন্তু আবহবিদেরা ক্রমশ দেখলেন যে, এ-ছাড়াও ট্রোপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তরের বায়ুর গতিবেগ, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা—এই তথ্যগুলিও পূর্বাভাষের পক্ষে খুবই মূল্যবান। ওপরের স্তরে (Upper air) কি ঘটছে, সেটা ভূ-পৃষ্ঠের আবহাওয়া কেমন থাকবে তার ওপর প্রভাব ফেলে। সেইজন্য আধুনিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে এই সব প্রয়োজনীয় মাপজোখেরও ব্যবস্থা থাকে।

একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন যন্ত্রগুলি কি ভাবে সাজানো থাকে?

যে-ঘরে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত তার ভেতরে থাকে ব্যারোমিটার যন্ত্র। ওই ঘরের ছাতের ওপর বায়ুগতিমাপক যন্ত্রগুলি (Wind vane and anemometer) অবস্থিত। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সামনে একটি কাঁটাতার ঘেরা ছোট মাঠের মধ্যে থার্মোমিটারগুলি একটি খড়খড়িযুক্ত বাক্সের ভেতর রাখা হয়। ওই বাক্সটির নাম Stevenson Screen। চারটি কাঠের খুঁটির ওপর এই বাক্সটি থাকে। খড়খড়ি দেওয়ার কারণ থার্মোমিটারগুলির পাশ দিয়ে যাতে বায়ু স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হতে পারে। ওই মাঠের ভেতরই একটি ছোট নীচু বেদীর ওপর বৃষ্টিমাপক যন্ত্রটি বসানো হয়।

ওপরের স্তরের বায়ুর গতিবেগ কি ভাবে মাপা হয়?

আকাশে ওপরের স্তরের বায়ুর গতিবেগ মাপার জন্যে একটি রবারের বেলুনের ভেতর হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করিয়ে ওই বেলুনটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বেলুনটি তখন একটি নির্দিষ্ট গতিতে ওপরে উঠতে থাকে। বেলুনটির ওঠার সময়ে ভূ-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে থিওডোলাইট (Theodolite) নামে দূরবিনের মত একটা যন্ত্র নিয়ে বেলুনটির প্রতি মিনিটের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। অবস্থান বলতে বোঝায়, ওই বেলুনটি দিক্‌চক্রবাল থেকে কত ডিগরি ওপরে আছে এবং বেলুনটি উত্তর দিক থেকে কত ডিগরি কোণ করে রয়েছে। এই দু'টি কোণের পরিমাণ প্রতি মিনিটে জানতে পারলে এবং কি গতিতে বেলুনটি ওপরে উঠছে তা জানা থাকলে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে বায়ুর বিভিন্ন স্তরের গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে পরিচলন স্রোত থাকলে বেলুনটি একটি নির্দিষ্ট গতিতে উঠতে পারে না; মাঝে মাঝে তার গতিবেগের হারের পরিবর্তন হয়। যখন ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোতে বেলুনটি পড়ে তখন সেটি জোরে ওঠে, তা না হলে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে। দুপুরের দিকে বায়ুমণ্ডলে পরিচলন স্রোত থাকবেই। তাহলে তখন কি হবে? যদি পরিচলন স্রোত থাকে, তাহলে বেলুনটির তলায় একটি লেজ জুড়ে দেওয়া হয় আর থিওডোলাইট দিয়ে ওই লেজটির কৌণিক পরিমাণ (Angular width) প্রতি মিনিটে দেখা হয়। ওই তথ্যের সাহায্যে পরিচলন স্রোতে বেলুনটি পড়লেও, বায়ুর বিভিন্ন স্তরের গতিবেগ নির্ণয় করতে কোনো অসুবিধে হয় না।

আকাশে যদি নীচু মেঘ থাকে বা বৃষ্টিপাত হয়, তখনও কি বেলুনের সাহায্যে বায়ুর গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভব?

আকাশে যদি নীচু মেঘ থাকে বা বৃষ্টি হয়, তখন আর হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি সাধারণ বেলুনে কাজ চলে না। আকাশে ওঠার দু'তিন মিনিটের মধ্যেই এই বেলুন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে ঊর্ধ্বাকাশের তথ্য বিশেষ কিছুই মেলে না। এই অসুবিধে দূর করার জন্য Radio-sonde বেলুন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বেলুনটি খুব বৃহৎ আকারের এবং হাইড্রোজেন গ্যাসপূর্ণ। এর তলায় Radio-sonde যন্ত্রটি বাঁধা হয়। Radio-sonde যন্ত্রটির মধ্যে আছে একটি অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার এবং দু'টি বিভিন্ন ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি এক বিশেষ ধরনের ড্রাই ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটার। এর ভেতর বেতার কম্পন যন্ত্রও (Oscillator) থাকে। বেলুনটি যখন ওপরে উঠতে থাকে, তখন ওই যন্ত্রগুলির সঙ্গে মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপিত হয় এবং বেতার যন্ত্র মারফৎ বেতার সংকেত প্রেরিত হয়। ওই সংকেত ভূ-পৃষ্ঠে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ধরা পড়ে এবং ওপরের বিভিন্ন স্তরের বায়ুর গতিবেগ, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা এর সাহায্যে সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। ফলে বেলুনটি দৃষ্টির গোচরে না থাকলেও বায়ুর ওপরের স্তরগুলির গতিবেগ নির্ণয় করতে কোনো অসুবিধে হয় না।

কালবৈশাখীর মেঘ যদি অনেক দূরে থাকে, তাহলে জনসাধারণ কি ভাবে সতর্ক হবে?

কালবৈশাখীর মেঘ অনেক দূরে থাকলেও জনসাধারণকে কিন্তু সতর্ক করা সম্ভব। আবহাওয়া নিরূপণ করার জন্য রাডার নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, এর সাহায্যে বহু দূরে যদি ঝড়ের মেঘ থাকে, তা সে কালবৈশাখীরই হোক বা সাইক্লোন-ঝড়েরই হোক, সে মেঘের অবস্থান রাডার যন্ত্রে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হবে।

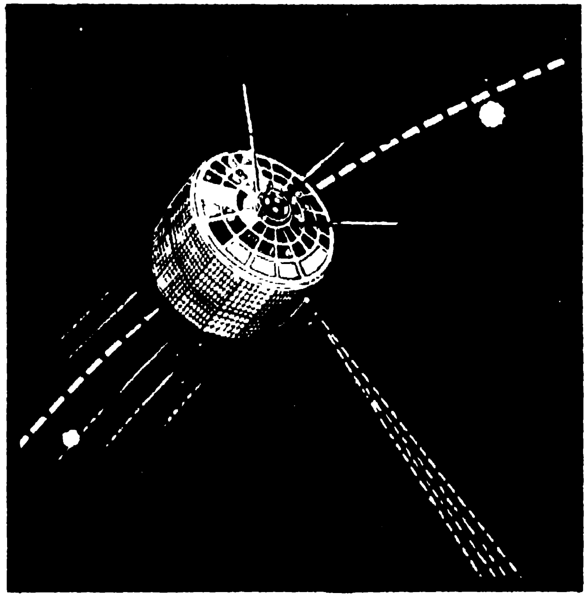
রাডার যন্ত্র থেকে 3 সেন্টিমিটার থেকে 10 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ গিয়ে ঝড়ের মেঘের ওপর আঘাত করে। সাধারণত ঝড়ের মেঘেরই ভেতরে বৃষ্টির ফোঁটা সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাডার যন্ত্রের ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গগুলি ওই জলের ফোঁটাগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। সমস্ত ব্যাপারটাকে শব্দের প্রতিধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা যায়। শব্দের প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে কত সময় লাগলো, তা থেকে যেমন প্রতিফলকের দূরত্ব বের করা যায়, তেমনি এই ফিরে আসা বেতার-তরঙ্গ থেকেও মেঘের দূরত্ব ও মেঘের আকার সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব। এইভাবে ঝড়ের মেঘ সৃষ্টির পর সেটা কোনদিকে, কত গতিতে এগোচ্ছে, তা রাডার যন্ত্রের সাহায্যে বোঝা যায় ও সেইমত বিপদ-সংকেত দিয়ে জনসাধারণকে অনেক আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়।

আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাষ কি ভাবে দেওয়া হয়?

সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে যে-বৃষ্টিপাত, তার জন্যেই আমাদের দেশে আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাষ দেওয়া হয়ে থাকে। এই পূর্বাভাষ আট থেকে দশ মাস আগে দেওয়া সম্ভব। কোনো স্থানে বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্যে সেখানে জলীয় বাষ্প আসা প্রয়োজন। জলীয় বাষ্পের ওজন সম-আয়তনের শুষ্ক বায়ুর চেয়ে হাল্কা। সুতরাং জলীয় বাষ্পের আধিক্য ঘটলে সেখানকার বায়ুর চাপ অবশ্যই কমবে। বায়ু চলাচল কোনো দেশের গণ্ডী মেনে চলে না। সুতরাং এক জায়গায় বায়ুর চাপ বেড়ে যাবে। পৃথিবীর নানা স্থানের বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের হিসেব সংগ্রহ ক'রে আবহাওয়াবিদেরা স্থির করেন যে, একটা বিশেষ অঞ্চলে,—যেমন ভারতবর্ষে বা ভারতের কোনো অংশে—আগামী বর্ষার মরশুমে কতটা বৃষ্টিপাত ঘটতে পারে। দেখা গেছে যে, বসন্তকালে বা গ্রীষ্মের গোড়ায় যদি হিমালয়ে তুষারপাতের আধিক্য ঘটে তাহলে সেই বছর বর্ষাকালে বৃষ্টি আশানুরূপ হয় না। দক্ষিণ গোলার্ধের আবহাওয়ার ওপরেও ভারতের আবহাওয়া অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাষে রাশিবিজ্ঞানের (Statistics) প্রয়োগ করা হয় এবং গাণিতিক পদ্ধতিতে পূর্বাভাষ স্থির করা হয়।

আজকাল দূরদর্শনে INSAT উপগ্রহ থেকে পাঠানো ছবি দেখানো হয়। এই ছবিগুলো থেকে আবহাওয়ার অবস্থা আমরা কি ভাবে বুঝতে পারি?

1960 সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম আবহাওয়া নিরূপক কৃত্রিম উপগ্রহ (Weather Satellite) মহাকাশে



আবহাওয়া উপগ্রহ

উৎক্ষেপণ করেছিল। এই উপগ্রহ উত্তর দক্ষিণে বা দক্ষিণ উত্তরে যেত এবং দুই মেরুর ওপর দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেত। এগুলির উচ্চতা ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে 600 থেকে 1600 কিলোমিটারের মত এবং পৃথিবীর চারদিকে এক পাক ঘুরতে সময় লাগতো প্রায় 100 থেকে 110 মিনিট। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি নীচের দিকে শক্তিশালী ক্যামেরা-যুক্ত এবং প্রতি দু'মিনিট অন্তর তা ছবি তুলতে থাকে। ওই ছবিগুলিকে বেতার-তরঙ্গে পরিণত ক'রে কৃত্রিম উপগ্রহ ভূ-পৃষ্ঠের চিত্রটিকে বেতারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। ভূ-পৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণ কক্ষে গ্রাহক-যন্ত্রে ওই বেতার-তরঙ্গ আবার চিত্রে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার নাম APT বা Automatic Picture Transmission unit। এই ধরনের মেরু-প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম উপগ্রহগুলি কোনো একটি স্থানের ওপর দিয়ে দিনে দু'বার চলে যায়। একবার সকালে আর একবার রাতে। দিনের ছবিটি

সূর্যালোকে ওঠে এবং রাতে অবলোহিত (Infra-red) আলোকের সাহায্যে ছবিগুলি তোলা হয়। রাতের বেলা এই আলো তাপরশ্মিরূপে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্গত হয়।

INSAT উপগ্রহের ব্যাপার কিন্তু অন্য রকম। এই উপগ্রহ পৃথিবীর ওপর নিরক্ষীয় অঞ্চলে কোনো বিশেষ দ্রাঘিমার ওপর অবস্থান করে। আমাদের দেশের INSAT/1B উপগ্রহটি বিষুবরেখার ওপর 74 ডিগরি পূর্ব দ্রাঘিমার ওপর অবস্থিত। এই উপগ্রহের উচ্চতা 38000 কিলোমিটার এবং এটি পৃথিবীর সঙ্গে সমান তালে পাক খেয়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদের মনে হয় যেন এটি ভূ-পৃষ্ঠের ওপর একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। এই ধরনের উপগ্রহগুলি ভূ-পৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির (Geostationary)। সেইজন্যই এদের বলা হয় ভূসমলয় উপগ্রহ। অনেক উপরে থাকার জন্য এই উপগ্রহ একটা বিরাট অঞ্চলের ছবি তুলতে পারে। তা ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেতার-সংকেত পাঠিয়ে যখন খুশি এই ছবি পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে যখন সাইক্লোন ঝড় সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে তটভূমির দিকে অগ্রসর হয়, তখন কোথায় এই ঝড়টি আছড়ে পড়বে, এটি জানা বিশেষ দরকার। কারণ সেই অঞ্চলের লোকজনকে প্রচণ্ড ঝড় ও সম্ভাব্য জলোচ্ছ্বাসের জন্যে সতর্ক করা একান্ত প্রয়োজন। এই সময়ে INSAT উপগ্রহ থেকে পাঠানো ছবিগুলি অমূল্য সম্পদ।

বায়ুর তাপমাত্রা বেশি হলেই কি বেশি অস্বস্তি বোধ হয়?

বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে তো গরম কমা-বাড়া নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। তবে শুধু তাপমাত্রাই এর মাপকাঠি নয়। আমরা সবাই জানি যে, দিল্লি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম পড়ে। তখন তাপমাত্রার হিসেবে দিল্লির স্থান কলকাতার ওপরে। যদি তখন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপ 40 ডিগরি সেলসিয়াস হয়, তাহলে দিল্লির তাপ 42 থেকে 45 ডিগরি সেলসিয়াসে প্রায়ই পৌঁছে যায়। অথচ তাপবোধ ব্যাপারটা কলকাতাতেই বেশি।

গরমে কলকাতার লোকেরই বেশি কষ্ট হয়। এর কারণ কি? আসলে কলকাতায় জলীয় বাষ্পের আধিক্য আছে। এই শহরটা সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত কাছে বলে এখানকার বাতাসে দিল্লির তুলনায় বেশি জলীয় বাষ্প থাকে। সুতরাং বায়ুর আর্দ্রতা বেশি থাকার জন্যে আমাদের গায়ের ঘাম শুকোতে চায় না, তাই কষ্ট হয়। তাহলে শুধু বায়ুর তাপমাত্রাই আমাদের স্বাচ্ছন্দের মাপকাঠি নয়; বায়ুর আর্দ্রতাও সমানভাবে বিবেচনা করা দরকার। দেখা গেছে যে, বায়ুর

কোন আবহাওয়া সবচেয়ে মনোরম?

তাপমাত্রা যদি 22 থেকে 27 ডিগরি সেলসিয়াসের মত হয়, আর বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি শতকরা 20 থেকে 70 ভাগ থাকে, তাহলে যে-আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে, তা অতি মনোরম। কিন্তু তাপমাত্রা যদি 35 থেকে 44 ডিগরি সেলসিয়াসে পৌঁছোয় আর বায়ুর আর্দ্রতা যদি শতকবা 50 ভাগ বা তার বেশি হয়ে পড়ে, তাহলে অত্যন্ত অস্বস্তিকর গরম বোধ হয়। তাপমাত্রা আরো বেড়ে যদি 45 ডিগরি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়, আর আর্দ্রতা যদি শতকরা 60 ভাগ অতিক্রম করে, তবে যে-আবহাওয়া তৈরি হবে তাতে কাজকর্ম করাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। তখন সর্দিগর্মিতে লোকের প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

উষ্ণতা বোধের জন্য বায়ুর তাপমাত্রাই একমাত্র দায়ী নয়। শৈত্যবোধের বেলাতেও কি ঠিক তাই?

বায়ুর তাপমাত্রা কম হলেই যে সেখানে বেশি ঠাণ্ডা লাগবে তার কোনো মানে নেই। ঠাণ্ডা কেমন বোধ হবে সেটা নির্ভর করে হাওয়া কত জোরে বইছে তার ওপরে। শীতকালে যখন ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বয়, তখন আমাদের শরীরের তাপ এই প্রবহমান শীতল বায়ুস্রোত বহন করে নিয়ে যায়। ফলে, হাওয়া যত জোরে বয়, আমাদের শরীরও ততই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে আমাদের বেশি শীত লাগে। এই ব্যাপারটাকে 'বায়ুজনিত শৈত্যবোধ' (Wind chill effect) বলে।

পৃথিবীর জলবায়ু বহু যুগ আগে কেমন ছিল?

বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, প্রতিদিন আবহাওয়া কোনো একটি বিশেষ জায়গায় কেমন থাকছে, তার ওপর ভিত্তি করেই ওই জায়গার জলবায়ু কেমন, তা

স্থির করা হয়। বহু যুগ আগে জলবায়ু কেমন ছিল জানতে গেলে প্রথমেই আলোচনা করা দরকার যে, বহু যুগ আগেকার জলবায়ুর অবস্থাটা ঠিক করা হয় কি ক'রে। পৃথিবীর অনেক জায়গায়, বিশেষ ক'রে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম দিকে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে, এক ধরনের পাইন গাছ আছে যার বয়স প্রায় 9000 বছরের কাছাকাছি। যে-বছর বৃষ্টি বেশি পায়, এই ধরনের গাছ সে-বছর বেশি বাড়ে, আবার খরার বছরে এর বৃদ্ধি কম। যদি এই গাছ একটা কাটা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, গাছের গুঁড়ির কাছে অনেকগুলি চক্র রয়েছে। এই চক্রের প্রতিটি বৃত্ত এক বছরে গাছ কতটা বেড়েছে, তার ইঙ্গিত। সুতরাং ওই পাইন গাছের গুঁড়ির ভেতর যে-চক্রগুলি দেখা যায় সেগুলির প্রত্যেকটির প্রসার মেপে একটা ধারণা পাওয়া যাবে যে, প্রতি বছর বৃষ্টিপাত কেমন হয়েছিল। ফলে ওই স্থানের জলবায়ুর একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। তবে এইজন্যে একটা গাছকে একেবারে কেটে না ফেললেও চলে। একটা যন্ত্র দিয়ে গাছ ফুটো ক'রে ওই ছিদ্রের ভেতর যতটা কাঠ ধরে ততটা খুবলে বের করে এনে, সেটাকে বিশ্লেষণ করলেই বিগত কয়েক হাজার বছরের জলবায়ুর খবর মেলে। এই যে বিজ্ঞান, এর নাম Dendro-climatology। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। আর একটা উপায়েও বিগত যুগের জলবায়ুর অবস্থা নিরূপণ করা যায়। সেটা হল মিশরের নীলনদের বন্যার হিসেব। প্রাচীন মিশরীয় পুঁথিপত্রে এই নীলনদের বন্যার প্রতি বছরের খবর মেলে। এগুলি বিশ্লেষণ ক'রেও চার-পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর দেশে কি রকম বৃষ্টিপাত ঘটতো তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

যাই হোক, প্রাচীন যুগে বৃষ্টিপাতের প্রকারভেদ যে ঘটেছে, তা বোঝা যায়। বিগত হাজার ছয়েক বছরের তাপমাত্রা সম্বন্ধে যে গবেষণা চলেছে, তাতে দেখা গেছে যে, আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তাপমাত্রা এখনকার চেয়ে প্রায় আড়াই ডিগরি সেলসিয়াস বেশি ছিল। আর নীলনদের অববাহিকা অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ছিল এখনকার চেয়ে বেশি। আজ থেকে পিছিয়ে গেলে দেখতে পাবো, এক হাজার থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে নীলনদের অববাহিকার বৃষ্টিপাত সামান্য কমে গিয়ে আবার খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ে, ইউরোপ মহাদেশ ছিল এখনকার চেয়ে ঠাণ্ডা। এরপর ইউরোপের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছিল বটে, তবে 1550 থেকে 1800 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল ক্ষুদ্র তুষার যুগ (Little ice age)। তখন পৃথিবীর তাপমাত্রা, বিশেষ ক'রে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা, এখনকার চেয়ে প্রায় এক ডিগরি সেলসিয়াস কমে যায়।

পৃথিবীর জলবায়ু কি এখনও পাল্টাচ্ছে?

পৃথিবীর জলবায়ু যে এখনও পরিবর্তনশীল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে আলাস্কার হিমবাহ প্রায় 3 কিলোমিটার উত্তর দিকে পিছিয়ে গেছে। পেরুতে পাহাড়ের উপর তুষার-রেখা Snow-line প্রায় 8000 মিটার ওপরে উঠে গেছে। সাইবেরিয়ার চিরতুষারময় স্থানগুলির দক্ষিণের রেখা প্রায় 100 মিটার পিছিয়েছে। উত্তর মেরুর কাছে সুমেরু মহাসাগরে (Arctic ocean) কড্ মাছের ঝাঁক তাদের খাদ্য অনুসন্ধান করতে

বর্তমান যুগের সবচেয়ে উষ্ণ বছর ছিল কোনটি?

প্রায় [illegible] ডিগরি অক্ষরেখা বেশি উত্তরে যাচ্ছে। এই সব তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির মুখে ছিল। কিন্তু একেবারে সম্প্রতি এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে, যাতে মনে হয় যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা যা বাড়ার তা বেড়ে আবার কমতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে যে, 1934 সালের তাপমাত্রাই বর্তমান যুগের চরম তাপমাত্রা

পৃথিবীর তাপমাত্রা কি এখন কমছে?

ছিল। ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা যে-সব ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে দেখা যায় যে, মেরু অঞ্চলের সাগরে ইতস্তত ভাসমান হিমশৈলের (Iceberg) সংখ্যা যদিও ঋতুভেদে কমে ও বাড়ে, তবু সাম্প্রতিক কালে কমার চেয়ে তাদের বৃদ্ধির হারই বেশি। মনে হচ্ছে, এখন পৃথিবীর

তাপমাত্রা প্রতি বছর 0.01 ডিগরি সেলসিয়াস থেকে 0.02 সেলসিয়াসের মত কমছে।

বায়ুদূষণ কি? কি ভাবে তা হয়?

বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদানগুলি হল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আরগন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও সামান্য পরিমাণে কিছু নিষ্ক্রিয় (Inert) গ্যাস। এই উপাদানগুলির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার অবস্থাকেই 'বায়ুদূষণ' বলা যায়। ধরে নেওয়া যায় যে, পৃথিবীতে যন্ত্রযুগ শুরু হওয়ার পর থেকেই বায়ুদূষণও বাড়ছে। কয়লা আবিষ্কারের আগে কাঠের সাহায্যেই রাঁধাবাড়া হত, এমন কি সেকালের ছোটখাটো শিল্পেও তাপসৃষ্টির জন্য কাঠেরই ব্যবহার চলতো। কিন্তু কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি খনিজ জীবাশ্ম জ্বালানী Fossil fuel যখন থেকে ব্যবহার করা শুরু হল, তখন থেকেই বায়ুও দূষিত হতে আরম্ভ করলো। বায়ুদূষণ বেশির ভাগ ঘটছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসের পরিমাণ বাড়ার জন্য। তবে এর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। গত একশো বছরের মধ্যে আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সাংঘাতিক রকম বেড়ে গেছে এবং এইজন্যে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অবিরত চেষ্টা চলেছে, কি ভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা হ্রাস করা যায়।

বায়ুদূষণ কি ভাবে আমাদের ক্ষতিসাধন করে?

বায়ুদূষণ-জনিত কিছু কিছু গ্যাস, যেমন কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ক্ষতিসাধন করে। শিল্পে যথোপযুক্ত পরিশোধক ব্যবস্থা (Purification plant) অবলম্বন করলে এই সাংঘাতিক গ্যাসগুলির হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারি। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসজনিত ক্ষতি কিন্তু আরো বেশি ভয়াবহ এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারি; সেইজন্য এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ ঠিক ভূ-পৃষ্ঠের ওপরেই অবস্থিত থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রতরঙ্গ-বিশিষ্ট আলোক, যা সূর্যরশ্মির সঙ্গে আসে, সরাসরি চলে আসতে সক্ষম। অর্থাৎ সূর্যালোকের কাছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস স্বচ্ছ। সূর্যালোক এসে ভূ-পৃষ্ঠকে যখন উত্তপ্ত করে, তখন ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে তাপরশ্মি বিকিরণ করে। এই তাপরশ্মি আসলে অবলোহিত রশ্মি; এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কিন্তু সূর্যালোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বড়; এই তাপরশ্মি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস-প্রাচীর ভেদ করে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে পারে না। কারণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এই তাপরশ্মির কাছে অস্বচ্ছ এবং এই আটকে থাকা তাপরশ্মির প্রভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের স্তর গরম হয়ে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। এর প্রভাবে পৃথিবীর মোট তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। পরিভাষায় এই ঘটনাকে বলা হয় 'গ্রিনহাউস এফেক্ট' (Greenhouse Effect)। একটা হিসেব দেখা যায় যে, গত একশো বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা

গত একশো বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা কতটা বেড়েছে?

প্রায় এক ডিগরি সেলসিয়াস বেড়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এক ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বৃদ্ধি, এমন আর কি? হামেশাই তো এর চেয়ে অনেক বেশি তাপমাত্রা আমাদের বসবাসের অঞ্চলে বাড়ছে ও কমছে। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে, কোথাও যদি তাপমাত্রা তিনি থেকে চার ডিগরি সেলসিয়াস বাড়ে, তাহলে অন্য আর এক জায়গায় সেটা কমছে এবং এইভাবে পৃথিবীর সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় থাকছে। কিন্তু সারা পৃথিবীতে যদি এক ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে, তবে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব অনেক বেশি। পৃথিবীর কোন অঞ্চলের জলবায়ু কেমন হবে, সেখানে বৃষ্টিপাত কতটা ঘটবে—এই সব নির্ধারিত হচ্ছে এমন কতকগুলি উচ্চচাপ-ক্ষেত্র দ্বারা, যেগুলি সারা বছর মোটামুটি একই অঞ্চলে সৃষ্ট হয়। এগুলিকে বলে 'অর্ধ-স্থায়ী উচ্চচাপ-ক্ষেত্র' (Semi-permanent seats of high pressure)। পৃথিবীর তাপমাত্রার হেরফের হলে—তা সে এক ডিগরি সেলসিয়াসের মত হলেও—ওই উচ্চচাপ-ক্ষেত্রগুলি তাদের স্থান সামান্য

পরিবর্তন করবে এবং করছেও। এর প্রভাব পড়ছে জলবায়ুর ওপরে। ফলে কোনো কোনো অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ভয়াবহরূপে কমে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আফ্রিকার 'সেহেল' অঞ্চলের কথা। উত্তর-আফ্রিকার একটা বিরাট অঞ্চল 'সেহেল'—পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি থেকে পূর্বে সোমালিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জায়গাটির বৃষ্টিপাত সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। বর্তমানে ওই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বলতে গেলে লেগেই রয়েছে।

রেফ্রিজারেটারে সাধারণত ফ্রিওন (Freon) গ্যাস ব্যবহার করা হয়। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ বাড়লে আবার অন্য এক ধরনের বায়ুদূষণ হয়। ওই গ্যাস আবহমণ্ডলে ওপরে উঠে গিয়ে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারকে প্রভাবিত করে। এর ফলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন গ্যাসের পরিমাণ কমে যায়। ওজোন গ্যাস আমাদের মাথার ওপর ছাতার মত আচ্ছাদনের কাজ করছে। মহাকাশ থেকে যে সব মহাজাগতিক রশ্মি আসে সেগুলি ওজোন-স্তর শুষে নেয়। তা নাহলে ওই রশ্মি আমাদের খুবই ক্ষতি করতো। ওই রশ্মির প্রভাবে চামড়ার ও রক্তের ক্যানসার রোগও হতে পারে। সুতরাং ফ্রিওন গ্যাসের প্রভাবে বায়ুদূষণ হলে ওজোন-স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে মহাজাগতিক রশ্মির আপাতন বাড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে সমগ্র জীব-জগতের প্রভূত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা।

যদি কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তাহলে পরিণতি কি হবে?

মডেলের সাহায্যে পরীক্ষা করে বোঝা গেছে যে, সমগ্র পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি তিন ডিগরি সেলসিয়াসের মত বেড়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর জলবায়ুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তো ঘটবেই, তা ছাড়া ওই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলে জমে থাকা চিরতুষার অঞ্চলের হিমশৈল কিছু কিছু গলে গিয়ে সব ক'টি মহাসাগর ও সাগরের জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। এর ফলে সমুদ্র-তীরবর্তী নীচু এলাকাগুলি সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে যাবে। যদি আমাদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলার সব নীচু অংশ চিরকালের জন্য সমুদ্রের নীচে চলে যাবে। সুতরাং বায়ুদূষণের ফল যে কতটা ভীষণ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কতটা বাড়ছে, তার মাপজোখ কি সত্যি সত্যি কিছু করা হয়?

পৃথিবীর নানা গবেষণাগারে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে ঠিক কতটা আছে, তার অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ চলেছে। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এতই কম যে, তার মাপ নেওয়া হয় প্রতি দশ লক্ষ ভাগ বায়ুতে কত ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে, তার হিসেবে। একে বলা হয় পার্টস পার মিলিয়ন (Parts per million) বা পি পি এম (PPM)। 1860 সালে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছিল 285 পি পি এম, 1950 সালে সেটা বেড়ে হল 300 পি পি এম। বর্তমান সময়ে সেই দূষণ আরো বেড়ে হয়েছে 335 পি পি এম; আর 2000 সাল নাগাদ ওই কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে হবে 360 পি পি এম-এর মত। যে-হারে এখন

> **2050 সাল নাগাদ পৃথিবীতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত হবে?**

পৃথিবীতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়ে চলছে, ওই একই হারে যদি বাড়তে থাকে তাহলে 2050 সাল নাগাদ কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে হবে 500 পি পি এম-এর কাছাকাছি। তখন পৃথিবীর তাপমাত্রা এখনকার চেয়ে দেড় ডিগরি সেলসিয়াসের মত বাড়তে পারে। এই তাপমাত্রার বৃদ্ধি যথেষ্ট দুশ্চিন্তার বিষয়। এতে পৃথিবীর সামগ্রিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে জলবায়ুর পরিবর্তনও ঘটতে পারে।

একটা ধারণা আছে যে, বনাঞ্চল যত বাড়বে, বৃষ্টিপাতও তত বেশি হবে। এই ধারণা কি ঠিক?

যেখানে বন আছে, সেখানে তীব্র সূর্যালোক গাছপালা ভেদ ক'রে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়তে পারে না। সেইজন্য সেখানকার বায়ুতে আর্দ্রতা বেশি থাকে। এর ফলে ওই অঞ্চলে মেঘ সৃষ্টি হতে সাহায্য করে। তা ছাড়া বড় বড় ঘন গাছপালা থাকলে বায়ুস্রোত ওই গাছপালায় ধাক্কা খেয়ে

কিছুটা ঊর্ধ্বগামী হয়েও মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘ সৃষ্টির ব্যাপার অব্যাহত থাকলে ওই মেঘগুলি অচিরেই বৃষ্টির মেঘে পরিণত হয়ে বৃষ্টি দিতে পারে। কিন্তু শহর অঞ্চলে বাড়ি, ঘর, ইঁট, কাঠ, সিমেন্ট ইত্যাদি থাকার ফলে সেখানে উষ্ণ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া শহরে ঘন বসতির জন্য লোকজনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও তাপ বেড়ে যায়। কল-কারখানা থাকলে তাপমাত্রা আরো বাড়বে। এর ফলে শহরে তাপ-দ্বীপের (Heat island) উদ্ভব ঘটে। যদি শহরের ভেতর বেশ কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা নেওয়া হয় এবং সম-তাপরেখা আঁকা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের তাপমাত্রা আশপাশের চেয়ে অনেক বেশি। এই অঞ্চলগুলিকে বলা হয় তাপ-দ্বীপ।

উত্তর কলকাতা ও উল্টোডাঙা অঞ্চলে কি তাপ-দ্বীপ আছে?

কলকাতায় উত্তর কলকাতা ও উল্টাডাঙা অঞ্চলে এই রকম তাপদ্বীপ পাওয়া গেছে। শুধু কলকাতা কেন, প্রতিটি শহরেই মোটামুটি একই অবস্থা! সুতরাং তাপদ্বীপ থাকার জন্য শহরের ওপরেও বায়ুপ্রবাহ ঊর্ধ্বগামী হয়ে মেঘ ও বৃষ্টি দেবে। কিন্তু কিছুদিন আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শহরের বৃষ্টিপাত বেশি, না আশপাশের গ্রামাঞ্চলের বৃষ্টিপাত বেশি, এটা দেখার জন্য একটা পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে যে, শহরের বৃষ্টিপাত নিকটস্থ গ্রামাঞ্চলের চেয়ে প্রায় শতকরা দশ ভাগ বেশি। সুতরাং বন থাকলেই যে বৃষ্টি বাড়বে, এ-কথা আর জোর করে বলা যাচ্ছে না। তবে বন থাকা নিশ্চয়ই দরকার। এতে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিশোধিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। তবে মেঘ বা বৃষ্টি তৈরি করতে বনাঞ্চল খুব একটা সাহায্য করে না।

যদি কোনো জায়গায় বৃষ্টি একেবারেই না হয়, তাহলে সেখানে কৃত্রিম উপায়ে কি বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়?

নীল আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটানো অসম্ভব। তবে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো যেতে পারে। আমাদের দেশেই ওই ধরনের কৃত্রিম বৃষ্টিপাত হয়েছে।

কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের জন্য চাই বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা ও আকাশে মেঘ; কিন্তু ধরা যাক, ওই মেঘের অতিক্ষুদ্র জলকণাগুলি সংযুক্ত হয়ে বড় ফোঁটা তৈরি করতে পারছে না। অথচ বড় ফোঁটা না হলে সেই ফোঁটা বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়তে পারবে না। এমন অবস্থায় বিমান থেকে ওই মেঘের ওপর কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড (Solid Carbon dioxide বা dry ice) কিংবা সাধারণ লবণ (Common salt) ছড়িয়ে দিলেই ওই কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড বা লবণের কণাগুলির ওপর জলকণাগুলি আশ্রয় নিয়ে খুব শীঘ্র বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয়ে বৃষ্টি দেয়। রুপোর আয়োডিন ঘটিত লবণ সিলভার আয়োডাইড (Silver iodide) ওই একই কাজ আরো তাড়াতাড়ি ও ভালভাবে করতে পারে। বিমান থেকে সিলভার আয়োডাইড-এর ধোঁয়া যদি ওই ধরনের মেঘের ওপর ছড়ানো হয়, তবে দেখা যায় যে, মিনিট পনেরোর মধ্যেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে বেশ মুশকিলে পড়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের প্রকোপে নিকটস্থ উদ্বাস্তু শিবিরগুলি জলমগ্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাঁকে তখন ওখানকার লোকজন সাবধান করে দিয়েছিল যে, তিনি যেন ওই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত আর না ঘটান।

এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত নিয়ে অনেক আইনগত সূক্ষ্ম তর্ক হয়ে গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তখন হামেশাই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হত। যে-অঞ্চলে ওই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটলো, তার পরের অঞ্চলে যাদের চাষের জমি, তারা তখন মামলা রুজু করে দিল এই বলে যে, তাদের প্রাপ্য বৃষ্টি অন্যে নিয়ে নিচ্ছে। যদি কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত না ঘটতো, তবে ওই বৃষ্টি অন্যের ক্ষেতে না হয়ে তাদের নিজেদের ক্ষেতে হত। এই সব ঝামেলার জন্য আজকাল খুব একটা কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয় না। এটা এখন শুধু গবেষণাগারের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো আজকাল কি একেবারেই হচ্ছে না?

আজকাল কৃত্রিম বৃষ্টিপাতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে লোকহিতকর দু'টি ব্যাপারে। একটি হল শিলাবৃষ্টি,

আর অপরটি সাইক্লোন-ঝড়। শিলাবৃষ্টির ফলে ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। শিল পড়া আম তো আমরা কেউ-ই পছন্দ করি না। সুতরাং যে মেঘে শিলাবৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা, সেই মেঘের ওপর কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড বা সাধারণ লবণ ছিটিয়ে দিয়ে যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়, তাহলে ওই শিলাখণ্ডগুলি বৃষ্টির আকারে গলে গিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে। ফলে আর ফসলের ক্ষতি হয় না।

সাইক্লোন-ঝড়ের দরুণ যে-জলোচ্ছ্বাস বা প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়, তা যে কত ভয়ানক, সে-কথা সবাই জানে। ওই সাইক্লোন যখন সমুদ্রের ওপরে তখন ওই ঝড়ের মেঘগুলির

সাইক্লোন ঝড়ের শক্তি কতটা?

ওপর সিলভার আয়োডাইডের বাষ্প ছড়ালে ওই মেঘগুলো সমুদ্রের ওপরেই প্রচুর বৃষ্টি দেবে, আর তাতে ঝড়ের বা জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপও কমবে। কিন্তু এই উপায়ে শিলাবৃষ্টির বেলায় বেশ সুফল পাওয়া গেলেও সাইক্লোন-ঝড়ের বেলায় তেমন একটা সুফল মেলেনি। এর কারণ হল, সাইক্লোন-ঝড়ের শক্তি গোটা পাঁচেক হাইড্রোজেন বোমার শক্তির সমান। সেইজন্য সিলভার আয়োডাইড দিয়ে সাময়িকভাবে মেঘ গললেও অচিরেই আবার উঁচু উঁচু মেঘের সৃষ্টি হয়। আর প্রায় 15 মিনিটের মধ্যেই ওই ঝড়ের শক্তি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে যায়। ফলে এতে বিশেষ সুবিধে হয় না। তবে বৈজ্ঞানিকেরা হাল ছাড়েন নি, তাঁরা এখনও পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আবহাওয়ার জ্ঞান কি ভাবে চাষের কাজে লাগানো যায়?

আজকাল চাষের কাজে নানা রকমে আবহাওয়ার জ্ঞানকে কাজে লাগানো হচ্ছে। বস্তুত এই ব্যাপারে আবহাওয়া বিজ্ঞানের একটা নূতন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। একে বলা হয় 'কৃষি মৌসুম-বিজ্ঞান' (Agricultural Meteorology)। এর সাহায্যে চাষের বিভিন্ন অঞ্চলে কতটা ক'রে বৃষ্টিপাত আশা করা যায়, তার মধ্যে 'নিশ্চিত বৃষ্টিপাত' (Assured rainfall) কতটা হবে, এই সব বিষয়ের একটা হিসেব করা হয়। এর সাহায্যে জানা যায়, চাষের কোন সময়ে বৃষ্টির জলের অভাব ঘটতে পারে। ফলে সেই সময়ে সেচের জলের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং ফসল নষ্ট হয় না।

মৌসুমী ঢাল তার চলার পথে মাঝে মাঝে হিমালয়ের পাদদেশে এসে পড়ে; তখন উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ঘটে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত একদম বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় দক্ষিণবঙ্গে চাষের যে কি পরিস্থিতি দাঁড়ায় তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। মাঠে ধান, অথচ বৃষ্টির দেখা নেই! এই অবস্থা কখন হয়, কতদিন থাকে, এ-সব তথ্য আগে থেকে জানা থাকলে তবেই সতর্ক হওয়া যায়। তখন সেচের জলের বিকল্প ব্যবস্থা ক'রে এই পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচা সম্ভব।

চাষের জমিতে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই পোকা-মাকড়গুলি একটা বিশেষ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় জন্মলাভ করে। মাজরা পোকা ও শোষক পোকা আমাদের ফসলের অনেক ক্ষতি করে। আবহবিদ্ যখনই আবহাওয়ার মানচিত্র বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে পারেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই কোনো কোনো জায়গায় ওই ধরনের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উদ্ভব হতে পারে, তখনই তিনি ওই সব স্থানে সতর্কবার্তা পাঠান। ফলে সেখানকার চাষীরা ওষুধ প্রয়োগ ক'রে ওই প্রকারের পোকা-মাকড় যাতে ধ্বংস হয়, তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

পঙ্গপালের ঝাঁক এক দেশ থেকে আর এক দেশে উড়ে এসে সবুজ শস্যক্ষেত্রকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তছনছ করে দেয়। রাডার যন্ত্রে এই পঙ্গপালের ঝাঁককে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় ও তারা কোনদিক থেকে কোনদিকে যাচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। যে-সব দেশে ওই পঙ্গপালের ডিম ফুটে পঙ্গপাল জন্মায়, সেই দেশ থেকে বায়ুপ্রবাহ যখন আমাদের দেশের দিকে প্রবাহিত হয়, তখনই পঙ্গপালের আক্রমণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। আবহাওয়ার মানচিত্রে এই বায়ুপ্রবাহ বোঝা যায় এবং সেই মত সতর্ক বার্তা জানানো চলে।

বিমান চালনার জন্য কী ভাবে আবহবিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব?

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন বেগে বায়ু বইছে। ধরা যাক, একটি বিমান কলকাতা থেকে

দিল্লি যাচ্ছে। এখন মনে করা যাক, বায়ুমণ্ডলের 6 কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বইছে। কিন্তু এই স্তরের ঠিক ওপরে হাওয়া বয়ে চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। তাহলে 6 কিলোমিটারের নীচ দিয়ে ওই বিমান চললে সেটা বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিকে হবে, আর তাতে জ্বালানি বেশি খরচ হবে। কিন্তু 6 কিলোমিটারের ওপর দিয়ে ওই বিমান চললে সেটা সাহায্যকারী বায়ুপ্রবাহ পাবে। তাতে জ্বালানি কম লাগবে আর ওই জ্বালানির ওজনের বদলে মাল বা প্যাসেঞ্জার নেওয়া চলবে। ফলে প্রথমত জ্বালানির খরচ বাঁচবে; দ্বিতীয়ত মাল বা প্যাসেঞ্জারের ভাড়া বাবদ আরো বেশি টাকা পাওয়া যাবে। এতে বিমান-সংস্থার লাভ বাড়বে।

বিমানের যাত্রাপথে ঝড়-বৃষ্টি, সাইক্লোন-ঝড় প্রভৃতি থাকতে পারে। বিমান যাত্রার পূর্বে বিমান চালককে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া হয়, যাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে ওই সব ঝড়-বৃষ্টি কাটিয়ে, বিমানটিকে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে নিয়ে যেতে পারেন।

কোনো বিমান বিমান-বন্দরে ওঠা-নামার সময়ে সর্বদা ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহের উল্টোমুখে দৌড় করানো হয়। উল্টো দিক থেকে বায়ুপ্রবাহ এলে সেটা বিমানের দৌড়ে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে; ফলে অল্প দূরত্বের মধ্যেই বিমানটি উঠতে বা নামতে পারে। বিমানটি যাত্রা শুরু করার মুখে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে নামার ঠিক আগে, আবহবিজ্ঞানী বেতার টেলিফোন মারফৎ ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে জরুরি খবরটি বিমান-চালককে জানিয়ে দেন।

কোনো নতুন কল-কারখানা বা নতুন শহর পত্তনের আগে সেই জায়গার আবহাওয়ার তথ্য কেন প্রয়োজন হয়?

একটা নতুন শিল্প-নগরী বা কোনো পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনের আগে ওই সব জায়গার বায়ুর গতিবেগ জানা একান্ত প্রয়োজন। দক্ষিণবঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ সাধারণত হয় দক্ষিণ দিক থেকে, নয়তো উত্তর দিক থেকে। সুতরাং এখানে বাড়ি তৈরি করবার সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যে, বাড়িটা যেন দক্ষিণমুখী থাকে। দিল্লি বা উত্তরপ্রদেশে বায়ু প্রবাহিত হয় সাধারণত পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। সেইজন্য এ-দেশের বাড়ি-ঘর পূর্বমুখী হবে। যদি ঠাণ্ডার দেশে বাড়ি তৈরি হয়, তবে নীচু ছাত হলেও চলে; কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঠিক তার উল্টো। এখানকার বাড়িগুলো উঁচু উঁচু না হলে হাওয়া চলাচল করতে পারবে না। বাসিন্দাদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে এই সব ব্যাপারগুলো চিন্তা করতে হয়।

পর্যটন কেন্দ্র এমন জায়গায় করতে হবে, যেখানে রোদ-ঝলমল দিনের সংখ্যাই সারা বছরে বেশি। এখানকার আবহাওয়া হওয়া চাই মনোরম, আর বৃষ্টিপাত এমন হবে যে তা যেন পর্যটকদের বিরক্তির কারণ না হয়। এই সব তথ্যগুলি একমাত্র ওই স্থানের জলবায়ুর অবস্থা সম্যকভাবে খুঁটিয়ে দেখলে তবেই জানা যাবে।

স্থানীয় পূর্বাভাষ যা প্রচার করা হয়, তা সাধারণত কত দূর পর্যন্ত প্রযোজ্য?

কোনো অঞ্চলের স্থানীয় পূর্বাভাষ, সেই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল থেকে 30 কিলোমিটারের মধ্যে যত জায়গা আছে, তার ওপরে প্রযোজ্য। তার মানে যদি কলকাতার স্থানীয় পূর্বাভাষে বলা হয় যে, বজ্র-বৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু মধ্যমগ্রাম বা সোনারপুর অঞ্চলে সত্যি সত্যিই বজ্র-বৃষ্টি হয় তাহলেও বুঝতে হবে যে, পূর্বাভাষ সঠিক হল।

শহরে শীত কি কমছে?

জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শহরাঞ্চলে ক্রমেই জনবসতি বাড়ছে। ফলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তাপ বায়ুমণ্ডলকে গরম করছে। তা ছাড়া রান্নাবান্নার জন্য তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে জীবিকা-নির্বাহের জন্য কাছাকাছি জায়গায় কল-কারখানা বসেছে। এই সব নানা কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশই বাড়ছে। গত একশো বছরের হিসেবে দেখা যায় যে, কলকাতা অঞ্চলের তাপ প্রায় আধ ডিগরি সেলসিয়াসের মত বেড়েছে।

খবরের কাগজে পড়া যায় যে, ডি ভি সি-র বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে, যে-সব এলাকায় সম্প্রতি বৃষ্টি হয়ে গেছে, এমন সব এলাকা বন্যার কবলে পড়ে। এমন কেন হয়?

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ-ক্ষেত্র যখন স্থলভাগে

প্রবেশ ক'রে ভিতরে এগিয়ে যায়, তখন যাত্রাপথে সে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। যদি একটি নিম্নচাপ-ক্ষেত্র সমুদ্র থেকে এগিয়ে ক্রমশ নদী-বাঁধের দিকে এগিয়ে যায়, তখন নদী-বাঁধের ওপর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ফলে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন জল না ছাড়লে বাঁধের ক্ষতি হতে পারে। হয়তো জলের প্রচণ্ড চাপে বাঁধ ভেঙে সব জল হু হু ক'রে বেরিয়ে সামনের অঞ্চল জলপ্লাবিত ক'রে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। সুতরাং জল ছাড়তেই হয়। কিন্তু ওই জল যে-পথ দিয়ে যাবে, সেখানে খানিক আগেই প্রবল বর্ষণ হয়ে গেছে বা তখনও হচ্ছে। বর্ষণের ফলে ওই অঞ্চলের নদী-নালাগুলি আগে থেকেই পূর্ণ ছিল, এখন বাঁধের জল ছাড়ার ফলে ওই জল দু'কূল ছাপিয়ে বন্যার আকারে দেখা দেয়।

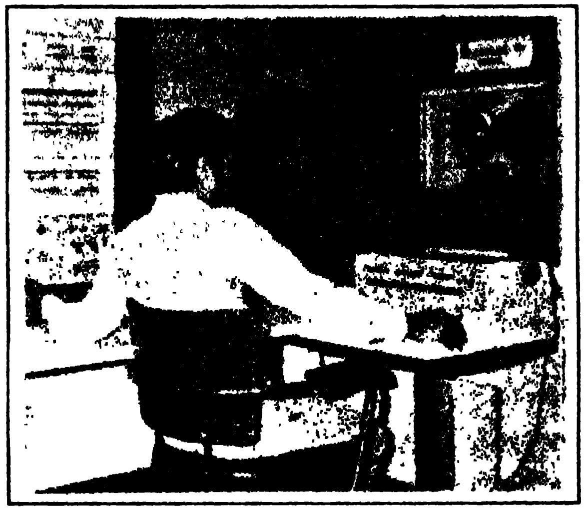
এই পরিস্থিতি এড়াতে গেলে নিম্নচাপ-ক্ষেত্রগুলি তীর অতিক্রম ক'রে বাঁধের দিকে যাবে কি যাবে না, তার সঠিক পূর্বাভাষ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদি পূর্বাভাষ থেকে বোঝা যায় যে, আগামী তিন-চার দিন পরে ওই নিম্ন চাপ-ক্ষেত্র নদীর বাঁধের ওপরে বা কাছে এসে প্রবল বৃষ্টি দিতে পারে, তখন নিম্নাঞ্চলে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার আগেই কিছু জল ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ বৃষ্টিপাত-জনিত বাঁধের জলবৃদ্ধির সংস্থান রাখতে হয়।

এই ধরনের পূর্বাভাষের সাহায্যে নদী-বাঁধ নিয়ন্ত্রণকে বলে বাঁধ নিয়ন্ত্রণ (Reservoir operation)। এই কাজে আজকাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটার প্রয়োগ করা হয়।

আবহবিজ্ঞানের জন্য কোনো ক্ষেত্রে কি কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে?

আবহবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রেই এখন কম্পিউটারের প্রয়োগ চলেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও সাইক্লোন-ঝড়ে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা নির্ণয়, সাইক্লোন-ঝড় ঠিক কোন দিকে গিয়ে আছড়ে পড়বে, তার পূর্বাভাষের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বা মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাষ নির্ধারণ, সাইক্লোন-ঝড়ের আকৃতি (Structure) নির্ধারণ প্রভৃতির জন্যে নানা সমস্যায় এখন প্রায়ই কম্পিউটার প্রয়োগ করা হচ্ছে।

1922 সালে রিচার্ডসন নামে একজন আবহবিদ্ সর্বপ্রথম কতকগুলি গাণিতিক সমাধানের দ্বারা আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেবার চেষ্টা করেন। তখনও ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং রিচার্ডসন হস্তচালিত ক্যালকুলেটর দিয়ে কঠিন অধ্যবসায় দেখিয়ে ওই সমাধানগুলি করেন এবং



আবহাওয়ার পূর্বাভাষে কম্পিউটারের ব্যবহার

তার সাহায্যে পূর্বাভাষ দেবার চেষ্টা চালান। কিন্তু সাবেক কালের এই ক্যালকুলেটর চালাতে এত বেশি সময় লাগতো যে, এই পূর্বাভাষ কোনো কাজে লাগানো যেত না। ফলে তৎকালীন আবহাওয়াবিদ্‌গণ এইভাবে পূর্বাভায দেওয়া ক্রমশ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রুতগতি কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে কঠিন গাণিতিক সমাধান অত্যন্ত সহজে ও অল্প সময়ে বের করা সম্ভব হল। তখন রিচার্ডসনের তথ্যগুলি আবার প্রয়োগ করা হতে লাগলো। বলা বাহুল্য, মূল পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে আধুনিক, দ্রুতগতি কম্পিউটার প্রয়োগে খুব চমকপ্রদ পূর্বাভাষ মিলতে লাগলো। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেবার এই নতুন পদ্ধতিকে বলা হয় Numerical Weather Prediction (NWP)। আজকাল আবহাওয়ার মডেল তৈরি ক'রে তার সাহায্যে আবহাওয়ার অনেক নতুন নতুন তথ্য সঠিক ভাবে বোঝা যাচ্ছে।

আবহবিজ্ঞানের জ্ঞান কী কাজে লাগানো যায়?

আবহবিজ্ঞানের জ্ঞান আমরা যে নানাভাবে প্রাত্যহিক কাজে লাগাতে পারি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমত,

সারা দিনের আবহাওয়া কেমন যাবে, তারই ওপরে আমাদের সারা দিনের কাজ নির্ভর করবে। যদি বিকেলে বা সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেদিন বিকেলের দিকে কোথাও বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা না রাখাই ভাল। যদি কোনো দিন সারাক্ষণ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ থাকে তবে সেদিন বেশি কাপড়-চোপড় কাচা যুক্তিসঙ্গত হবে না, কারণ ওই কাপড় তখন শুকনো মুশকিল। বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকলে আমরা সঙ্গে ছাতা বা বর্ষাতি নিয়ে বেরোবো।

চাষবাসের জন্য আবহাওয়ার জ্ঞান তো রীতিমতো দরকারি। কোন জায়গায় কি ফসল চাষ হবে, তা নির্ভর করে সেখানকার বৃষ্টিপাতের ওপরে। মহারাষ্ট্রে আমরা ধানচাষের পরিকল্পনা করবো না; কারণ সেখানে যা বৃষ্টিপাত হয় তা ধানচাষের প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের চেয়ে কম। ওখানে কিন্তু জোয়ার ও বাজরা সহজেই উৎপাদন করা যেতে পারে। চাষের কোন পর্যায়ে জলের বেশি প্রয়োজন তা কৃষিবিদ্ স্থির করবেন। আবহবিজ্ঞানী দেখবেন যে, ওই সম্ভাবনা কতটা। যদি বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে নলকূপ বা খালের জল নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

শীতপ্রধান দেশে ঘর কতটা গরম করতে হবে, তাও স্থির করা হয় আবহাওয়ার পূর্বাভাষ থেকে। যদি খুব শীত পড়বে বলে মনে হয়, তবে ঘরটিকে বেশি গরম রাখতে হবে।

কোনো বিশেষ ধরনের খেলাধুলো, যেমন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কিংবা ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচের দিন স্থির করার আগে আবহাওয়াবিদ্ পূর্বাভাষ দেবেন যে, ওই দিনগুলিতে ভাল আবহাওয়া থাকবে; কারণ ওই সময়ে ঝড়-বৃষ্টি হলে সব খেলাধুলোই পণ্ড হয়ে যাবে। কোথাও বেড়াতে যাবার আগে দেখতে হবে, যেখানে যাচ্ছি সেখানকার আবহাওয়া ভাল থাকবে তো, সেখানে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কেমন হতে পারে তার হিসেব করে, সেই মত কাপড়-জামা সঙ্গে নিতে হবে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রেও আবহাওয়ার জ্ঞান দরকার হয়। কোনো শল্য চিকিৎসার সময় শল্য চিকিৎসক এমন সময়ে 'অপারেশন' করতে চান, যখন আবহাওয়া শুকনো থাকবে। কারণ তাহলে ক্ষতস্থানটি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে উঠবে। এই ভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে আবহ-বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান আমরা কাজে লাগাতে পারি।

পরিবেশ বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের যে শাখাটি আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তা গড়ে উঠেছে আমাদের পরিবেশকে অবলম্বন করেই। পরিবেশ শুধু আমাদের আঙিনা নিয়ে নয়, পরিবেশে থাকবে পরিমণ্ডলের খবরাখবর—চারপাশের জল, বাতাস, তাপমাত্রা, সেই সঙ্গে পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ আর গাছপালার বিবরণ। বাঁচতে গেলে নিজেকে সুস্থ রাখা দরকার। কিন্তু নিজেকে সুস্থ রাখার জন্যে পরিবেশকে সুন্দর রাখা চাই। যে বাতাসে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাই তা হবে বিশুদ্ধ। যে জল আমরা আঁজলা ভরে পান করি, তাও দূষিত হওয়া চলবে না। তাকে হতে হবে পানযোগ্য। চারপাশের পরিবেশ থাকবে শান্ত, স্নিগ্ধ। শুধু মনকে খুশি করলে তার কাজ ফুরোবে না, চোখও তাতে তৃপ্ত হবে।



জনবিস্ফোরণে চারপাশের যে কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের চোখে পড়ে, তাতে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সে দায়িত্বকে আমরা যদি এড়িয়ে চলি তাহলে ভবিষ্যতে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো কে জানে? পরিবেশ বিজ্ঞানকে ইংরেজিতে বলে Ecology।

পরিবেশ বলতে কী বুঝি?

প্রত্যেকটি উদ্ভিদ এবং প্রাণী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকে। এদের চারপাশের অজৈব এবং জৈব পরিমণ্ডলকে এক কথায় পরিবেশ (Environment) বলে। পরিবেশ শুধু নিজের সীমানার মধ্যে উঠোনের খবরটুকু নয়, পরিবেশের মধ্যে পরিমণ্ডলের একটা ছবি থাকে। জল, বাতাস, বাসস্থানকে ঘিরে চারপাশের তাপমাত্রা, বাতাস কতটা আর্দ্র—এ সব খবর চাই। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে অঞ্চলের গাছপালা, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গের কথাও জানতে হবে—এইসব মিলিয়ে আমাদের অর্থাৎ মানুষের পরিবেশ তৈরি। আপাতদৃষ্টিতে পরিবেশের এইসব উপাদানকে যেমন বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্কবিহীন বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। অজৈব ও জৈব এবং এই দু' ধরনের উপাদানের মধ্যে প্রত্যেকটি অংশ একে অপরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তবে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল এবং সব সময়ে তা সহজে বোঝা যায় না। 'ইকোলজিকাল ব্যালান্স' বা পরিবেশের ভারসাম্যটি এই সম্পর্কের ওপরই নির্ভর করে। এইজন্য পরিবেশে যে কোনো উপাদানের অভাব ঘটলে পরিবেশের ভারসাম্যটি ভেঙ্গে যায় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। মানুষও এই নিয়মের বাইরে নয়, উন্নত মানের পরিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর নির্ভর করছে তার অস্তিত্ব।

খরা হয় কেন?

বৃষ্টিপাতের অভাবে অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম বৃষ্টিপাতের ফলেই খরা হয়। কোনো অঞ্চলে স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাতের চেয়ে 25 শতাংশ কম বৃষ্টি হলে সেখানে খরা হয়েছে বলে ধরা হয়। বহুদিন ধরে এই অবস্থা চলতে থাকলে মাটি থেকে জলীয় অংশ বেরিয়ে যায়, পুকুর, ঝিল, হ্রদ এবং নদীনালাও শুকিয়ে যায়। এর ফলে মাটি ফেটে গিয়ে আরো জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হতে সাহায্য করে। বছরে 750 মিমি-এর কম বৃষ্টি হলে খরার আশঙ্কা প্রবল হয়। যেসব অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে, সেগুলিকে খরাপ্রবণ (Draught prone) অঞ্চল নামে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের প্রায় 35 শতাংশ এর মধ্যে পড়ে। আরো 14.5 শতাংশ জায়গায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে 750 থেকে 1000 মিমি। এই সব জায়গায় অল্পমাত্রায় খরার আশঙ্কা থেকে যায়।

বৃষ্টির জলের স্বাদ কি ভিনিগারের মত হয়?

বৃষ্টির জল এমনিতে সামান্য অম্ল বা অ্যাসিড প্রকৃতির। বৃষ্টির জলে কার্বনিক অ্যাসিড থাকাই এর কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দ্রুত শিল্পায়ণের ফলে বৃষ্টির অম্লভাব পাঁচ থেকে তিরিশ গুণ বেড়ে গেছে। কয়লা-পেট্রোলিয়ামের মত জ্বালানি পোড়ালে তার থেকে সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড বেরিয়ে আসে। মোটর গাড়ির পরিত্যক্ত ধোঁয়া এবং ধাতু ঢালাই কারখানা থেকেও বেরোয় এই দুটি গ্যাসীয় পদার্থ। বাতাসের মধ্যে থাকা জলীয় বাষ্পে অক্সাইডগুলি গুলে গিয়ে তৈরি করে সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড। বৃষ্টির জলের মধ্যে এই দুটি অ্যাসিড থাকায় অম্লভাব অনেক গুণ বেড়ে যায়। অ্যাসিড দুটির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে বৃষ্টির জলের স্বাদও যায় বদলে, কখনও তা বেশ টকটক লেমন জুসের মত আবার কখনও বা বেশ কড়া টক—মনে হয় একেবারে যেন ভিনিগারের স্বাদ। 1974 সালে স্কটল্যাণ্ডের একটি জায়গা 'পিটলোক্রি' (Pitlochry) -তে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী অ্যাসিড বৃষ্টি হয়েছিল। ওই বৃষ্টির জলের অম্লতা ছিল ভিনিগারের মত।

বৃষ্টির জলে কি কি অ্যাসিড থাকে?

অ্যাসিড বৃষ্টি কতটা মারাত্মক?

মাটির ওপরে অ্যাসিড বৃষ্টি হলে সেখান থেকে ক্যাডমিয়াম (Cadmium) এবং পারদের (Mercury) মত ভারী ধাতু বিমোচিত হয়। বৃষ্টির জলের সঙ্গে ওই সব ধাতব পদার্থ ধুয়ে বেরিয়ে এসে নদী-নালা ও হ্রদের মধ্যে পড়ে। জলচর প্রাণীর ওপরে এর মারাত্মক কুফল লক্ষ্য করা গেছে। বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ইটালি, আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় এইরকম শতাধিক হ্রদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানকার জল বেশ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অম্ল প্রকৃতির। এই হ্রদগুলির জলে ক্যাডমিয়াম আর পারদ ছাড়া পাওয়া গেছে সীসা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা এবং নিকেল। এর প্রত্যেকটিই যথেষ্ট পরিমাণে থাকলে মাছ, শামুক, কাঁকড়া-চিংড়ির মত জলচর প্রাণী আর বেঁচে থাকতে পারে না। জলের অম্লপ্রকৃতিও সেই সঙ্গে জলচর জীবের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। জলের প্রকৃতি অতিরিক্ত অম্ল হয়ে গেলে জীবনের কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

[illegible] কোন ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়?

ভারতের জলসম্পদের কতটা কাজে লাগে?

পৃথিবীর যে ক'টি দেশে মোটামুটি ভাল বৃষ্টিপাত হয়, ভারত তার মধ্যে অন্যতম। একেবারে অংকের হিসেবে ভারতের 46.5 শতাংশ অঞ্চলে বছরে গড়পড়তা 1000 মিমি-এর বেশি বৃষ্টি হয় এবং 18.5 শতাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে 750 থেকে 1000 মিমি। বৃষ্টি এবং হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গের বরফ গলা জলের কতটা কাজে লাগে? সমীক্ষা করে দেখা গেছে, এর মাত্র এক-দশমাংশ কাজে লাগে। বাকি নয় ভাগের মধ্যে কিছুটা জলীয় বাষ্প হয়ে ফিরে যায় আর কিছুটা নদীনালার পথ ধরে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। মোট কতটা জল ভারত প্রত্যেক বছর পায়, তার হিসেবও পাওয়া গেছে। বৃষ্টিপাত থেকে 40 কোটি হেক্টার মিটার এবং হিমালয় থেকে তুষার গলে আরো 2 কোটি হেক্টার মিটার জল সমতলভূমিতে এসে পড়ে। এর মধ্যে 7 কোটি হেমি জল সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়। বাকি পঁয়ত্রিশ কোটি হেমি জলের মধ্যে 16.5 কোটি হেমি জল মাটির ওপর তলে থেকে যায়, 5 কোটি হেমি জল চুঁইয়ে মাটির গভীর স্তরে চলে যায় এবং 13.5 কোটি হেমি জল পুকুর, ঝিল, হ্রদ আর নদীতে গিয়ে পড়ে। এই জলসম্পদের মধ্যে 1.3 কোটি হেমি জল মাটির বিভিন্ন তল থেকে বের ক'রে এবং ভূপৃষ্ঠের ওপরে বিভিন্ন জলাশয় থেকে 2.5 কোটি হেমি জল আমরা ব্যবহার ক'রে থাকি।

অরণ্য ধ্বংস হলে কি বৃষ্টি কমে?

বনভূমি উচ্ছেদ করলে কি বৃষ্টিপাত কমে? বনভূমির সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। আমাদের দেশে এক সময়ে বনভূমি কম ছিল না। ছোটনাগপুরের কথা ধরা যাক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই শতকের প্রথম দু' দশকে ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে ছিল বিস্তীর্ণ বনভূমি। 1920 থেকে 1943 সালের মধ্যে ওই বনাঞ্চলের অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। ফল কি হল? ছোটনাগপুরে যে গরমকালে প্রায় প্রতিদিন বিকালের দিকে বৃষ্টি হত, বনাঞ্চল কমার সঙ্গে তাল রেখে গরমের বিকেলগুলো হয়ে ওঠে শুকনো খটখটে। আগে ছোটনাগপুর অঞ্চলে ছিল অনেক চা-বাগান। বিকেল-সন্ধ্যার বৃষ্টি চা গাছের পক্ষে খুব ভাল। বৃষ্টি কমে আসায় এবং শেষে একেবারে বন্ধ হওয়ায় চা বাগানগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে বনাঞ্চলের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক নিয়ে সত্তরের দশকে সমীক্ষা চলে। এতেও দেখা গেছে, যেসব দ্বীপে বনভূমির আয়তন ও ঘনত্ব বেশি, বৃষ্টি সেখানেই বেশি। সাম্প্রতিক গবেষণায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং তার সঙ্গে অরণ্য সংহারের অনুপাত নিয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

1. বনভূমি কমলে একটি অঞ্চলে বর্ষণমুখর দিনের সংখ্যা কমে যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে না।

2. এর ফলে বৃষ্টির বেগ (Intensity) বেড়ে যায়, যার জন্য ভূমিক্ষয় এবং মাটি ধোওয়া জলের প্রবাহও বেড়ে যায়।

3. বৃষ্টিপাতের ধরন অনেকটাই বদলে যায়, ঋতুক্রম কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়; কখনও একটানা মুষলধারায় বৃষ্টি ঝরে আবার কখনো-বা বহুদিন বৃষ্টি হয় না।

4. বছরে শুকনো দিনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

বনভূমি কি ভূমিক্ষয় বন্ধ করে?

ভূমি ক্ষয় হয় ঠিকই আর বনভূমি একাধিক উপায়ে সেই

ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমত, বনের গাছপালা সূর্যের আলোকে সরাসরি মাটির স্তরের ওপরে পড়তে দেয় না। এর ফলে মাটি থেকে জল বাষ্পীভূত হতে পারে না। বড় বড় গাছের শেকড়ও মাটির গভীর স্তরে প্রবেশ করে মাটির কণিকাগুলিকে শক্তভাবে একসঙ্গে ধরে রাখতে সাহায্য করে। গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতার ভূমিকাও কিছু কম নয়। বনাঞ্চলে মাটির ওপরে জমে থাকা পচা পাতার স্তূপ বৃষ্টির জল শুষে নেয়। পরে তা মাটির বিভিন্ন স্তরে চুঁইয়ে যায়। এমন কি প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও তার সবটুকু

ভারত থেকে প্রতি বছর কতটা মাটি নষ্ট হয়?

বনাঞ্চলেই থেকে যায়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন, বনভূমি সাময়িকভাবে বর্ষার জলের সবটাই মাটির মধ্যে রেখে দিতে পারে আর অর্ধেক পরিমাণ জল এখানেই থেকে যায় বহুদিন। কিন্তু বন জঙ্গল কেটে ফেললে অবস্থাটা আর আগের মত থাকে না। বনজঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছে এমন অঞ্চলে অন্ততপক্ষে 10 থেকে 20 শতাংশ বৃষ্টির জল বেরিয়ে যায়। এতে মাটির জমাট ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। ওপরের স্তরের মাটি ফেটে গিয়ে নীচের স্তর থেকে আরো জল বাষ্পীভূত হতে সাহায্য করে। এর পরে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ভূমিক্ষয় প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রত্যেক বছর ভারতে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ 534 কোটি টনের কাছাকাছি। এই বিপুল পরিমাণ মাটি যায় কোথায়? বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটি এসে পড়ে নদীতে, খানিকটা গিয়ে জমে বাঁধে আর জলাধারে। এর ফলে নদীর জল পরিবহণ ক্ষমতা কমে, বাঁধ-জলাধারের জলধারণ ক্ষমতাও হ্রাস পায়। এরপর প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা হওয়াই স্বাভাবিক। পাহাড়ী এলাকায় অরণ্য ধ্বংস এবং ভূমিক্ষয়ের জন্য ধস নামে।

ভূমিক্ষয় বন্ধ করতে পাহাড়ী এলাকায় পাইন-বার্চ-ম্যাপল এবং সমতলভূমিতে শাল সেগুন-চাঁপার মত গাছ লাগানো হচ্ছে। সমুদ্রতীরে লাগানো হচ্ছে ক্যাসুরিনা (ঝাউ), আর ছাগলখুরির (আইপোমিয়া) মত লতা।

মরুভূমি কি বাড়ছে?

পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আজ মরুভূমির করলে। মানচিত্রের ওপরে এক নজর বুলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে মহাদেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ইউরোপই ব্যতিক্রম। ইউরোপে কোনো মরুভূমি নেই, বাকি সব মহাদেশেই রয়েছে ছোট বড়, বিখ্যাত বা অল্পখ্যাত মরুভূমি। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে, মরুভূমিগুলি চারপাশে ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। সবচেয়ে কুখ্যাত মরুভূমি সাহারার কথাই ধরা যাক। প্রত্যেক বছর কমপক্ষে 15 লক্ষ হেক্টার জমি চলে যাচ্ছে সাহারার গ্রাসে। এর মানে ঘণ্টায় 170 হেক্টার - এই বেগে বেড়ে চলেছে সাহারা। আফ্রিকার সুদান অঞ্চলে মরুভূমির বৃদ্ধি অবশ্য কিছুটা কম। 1954 থেকে 1975 - এই 17 বছরে সুদানের মরুভূমি দক্ষিণে এগিয়েছে 100 কিলোমিটার। দিনে 16 মিটারের কিছু বেশি—সুদান মরু অঞ্চলের অগ্রগতির হার এইরকম। এই সমস্যা শুধু আফ্রিকার নয়, সমস্যাটি অন্য অঞ্চলেও দেখা গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত এবং পরিবেশ সচেতন দেশেরও 10 শতাংশ অংশে মরুভূমি ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, বাকি 20 শতাংশ অঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে মরুভূমি ছড়িয়ে পড়ার আশংকা।

মরুভূমি প্রসারিত হওয়ার কারণ কী? অনুসন্ধানে জানা গেছে বৃষ্টিপাতের অভাবেই এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। মরুভূমিতে যে একেবারে বৃষ্টি হয় না, এমন নয়। বছরে একটার অঞ্চলে বৃষ্টি হয় 100 মিমিরও কম। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে সাধারণভাবে মরুভূমি ছাড়া কিছু অঞ্চলকে অর্ধমরু (Semi-desert) এবং কিছু অঞ্চলকে মরুপ্রায় (Arid) অঞ্চলে ভাগ করা হয়। অর্ধমরু অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 250 মিমি-এর কম আর মরুপ্রায় অঞ্চলে 600 মিমি-এর কম। মরুভূমি প্রথমে অর্ধমরু, পরে আস্তে আস্তে মরুপ্রায় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে শুধুমাত্র বৃষ্টির অভাবেই যে নতুন মরুভূমির সৃষ্টি হয় অথবা প্রকৃত মরুভূমিগুলি চারপাশে আয়তনে বেড়ে

গবাদি পশু বেশি চরলে কি মরুভূমির সৃষ্টি হয়?

যায়, এমন ধারণা ঠিক নয়। রাজস্থান-গুজরাটে মরুভূমি সৃষ্টিতে মানুষেরও কিছু ভূমিকা ছিল। হাজার দেড়েক বছর আগে এই অঞ্চলেও ছিল ছোট-বড় গাছ আর গুল্মঝোপ, একটু শুকনো অঞ্চলেই এরা জন্মায়। তারপর ক্রমাগত ওই

অঞ্চলে ছাগল-ভেড়া চরানোর জন্য পরিবেশের অবনতি ঘটতে থাকে। উট যেমন কাঁটা-ঝোপের ডগাগুলো শুধু খায়, ছাগল-ভেড়ার খাবার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। এরা ঘাস শেকড় সমেত খেয়ে ফেলে। উট চরে যাবার পর ঘাসের শেকড় মাটিতে থেকে যায় বলে বর্ষার ছিটেফোঁটা বৃষ্টির ছোঁয়ায় গোড়া থেকে নতুন ডালপালা, পাতা গজাতে পারে। ছাগল-ভেড়া চরে যাবার পরে সেটুকুরও সম্ভাবনা থাকে না। মাটির ওপর থেকে গাছপালার আবরণ সরে গিয়ে একদিকে যেমন জলের বাষ্পীভবন বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে উর্বরতাও ক্রমশ কমতে থাকে। এক্ষেত্রে বৃষ্টির অভাবে নয় বরং মরুভূমি সৃষ্টি হবার পরে আবহাওয়া আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। রাজস্থান-গুজরাটে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল।

ছাগল-ভেড়া এবং অন্য গবাদি পশু চরতে না দিলে কি মরুভূমি আবার শ্যামল হয়ে উঠবে? এই প্রশ্নের জবাবও পাওয়া গেছে। 1969 সালে ইজরায়েল ও সৌদি আরবের মধ্যে বিস্তৃত নেগেভ সিমাই (Negev-simai) মরুভূমিতে বেড়া দেওয়া হয়েছিল। সৌদি আরবের দিকটাতে উট আর ছাগল-ভেড়া চরানো বন্ধ হয়নি। বেদুইনরা সেখানে চাষ-বাসও করে যাচ্ছিল যথারীতি। অন্যদিকে ইজরায়েল মরু অঞ্চলের স্বাভাবিক গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সেদিকে চাষও হয়নি, গৃহপালিত জীবজন্তুকে চরতেও দেওয়া হয়নি। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে দুই এলাকার মধ্যে বিস্তর তফাত দেখা গেল। সৌদি আরবের দিকে মরুভূমি আরো বাড়তে লাগলো, ইজরায়েলের দিকটা হয়ে উঠলো আরো বেশি সবুজ।

গাছ থেকে কি জ্বালানি তেল পাওয়া যায়?

বর্তমান যুগকে বলা হয় যন্ত্রযুগ, গতির যুগ। যন্ত্র চালাতে দরকার শক্তি। জ্বালানি তেলের দরকার শক্তি উৎপাদনে। পেট্রোলিয়ামের মত খনিজ তেলের চাহিদা এইজন্য দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। প্রয়োজন ও চাহিদা বাড়লে কি হয়, পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার তো অফুরন্ত নয়। প্রাচীন যুগের ফার্ন-পাইন আর সপুষ্পক উদ্ভিদের রেণু (Spores) এবং পরাগরেণু (Pollens) মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। বহুযুগ মাটির তলায় থাকার সময়ে তা শেষে পরিবর্তিত হয় পেট্রোলিয়ামে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, যেটুকু পেট্রোলিয়াম মাটির তলায় সঞ্চিত আছে, তাতে আর বড় জোর চল্লিশ বছর চলবে। তবে যে হারে খনিজ তেলের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছে, তাতে আরো তাড়াতাড়ি তেলের ভাঁড়ার শূন্য হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তখন

জ্বালানি তেল ফুরোলে কি সভ্যতা থেমে যাবে?

আমাদের অবস্থা কী হবে? সব শিল্পোদ্যোগ কি স্তব্ধ হয়ে যাবে, গতিহীন হয়ে পড়বে আমাদের জীবন?

পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য পেট্রোলজাত জ্বালানি ব্যবহার করার আর একটি সমস্যাও আমাদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। এইসব জ্বালানি থেকে বেরোয় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইডের মত গ্যাসীয় পদার্থ। বায়ুদূষণে এদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। এইজন্য বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই পেট্রোলিয়ামের বিকল্প কোনো উন্নত মানের জ্বালানির খোঁজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল কোনো দূষণমুক্ত জ্বালানি। অবশেষে প্রচেষ্টা সার্থক হল, এমন একটি গাছের সন্ধান পাওয়া গেল যা থেকে পাওয়া যাবে আকাঙ্ক্ষিত মানের জ্বালানি।

বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী মেলভিন ক্যালভিন (Melvin Calvin) এই বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন। ক্যালভিনের গবেষণা থেকেই জানা যায়, ইউফর্বিয়া (Euphorbia) জাতের গাছ থেকে জ্বালানি তেল পাওয়া সম্ভব। বট-অশত্থ এবং মনসা জাতীয় (Cactus) গাছের মত ইউফর্বিয়া গাছ থেকেও বেরোয় সাদা দুধের মত ল্যাটেক্স (Latex)। রাসায়নিক প্রকৃতিতে ল্যাটেক্স হল হাইড্রোকার্বন এবং জলের 'ইমালসান' (Emulsion)। ল্যাটেক্সের অপরিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ামে সালফার প্রায় থাকে না বলে তার থেকে দহনের সময়ে বেরোয় সালফার ডাই-অক্সাইড। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইডের মত সালফার ডাই-অক্সাইডও বায়ুদূষক বলে চিহ্নিত। সবদিক থেকে বিচার করে বিজ্ঞানীরা ইউফর্বিয়ার ল্যাটেক্সকে পেট্রোলিয়ামের চেয়ে উন্নত মানের জ্বালানি বলে স্বীকার করেছেন।

প্রায় 38,000 প্রজাতির গাছ থেকে ল্যাটেক্স পাওয়া যায়। এর মধ্যে ব্রাজিলে জন্মায় এমন 12 প্রজাতির

ইউফর্বিয়ার ল্যাটেক্স থেকেই জ্বালানি তেল করা যেতে পারে। গাছগুলো শুকনো, চাষবাসের অযোগ্য কিংবা পরিত্যক্ত জমিতেও ভালভাবেই বাড়ে। ক্যালভিনের হিসেবে এক একর জমিতে ইউফর্বিয়া গাছ লাগিয়ে বছরে তা থেকে 50 ব্যারেল পর্যন্ত তেল পাওয়া যেতে পারে। এতে অবশ্য খরচ যা পড়বে তাতে বর্তমানে বিশেষ লাভ হবে মনে হয় না কারণ এর দাম দাঁড়াবে প্রায় খনিজ পেট্রোলের দামের সমান। তবে বিজ্ঞানীরা বলেছেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা উন্নত মানের বীজ তৈরির মাধ্যমে ল্যাটেক্সের উৎপাদন দ্বিগুণ করে দিতে পারবেন। ইতিমধ্যে অল্প কয়েকটি ইউফর্বিয়া গাছ তাঁরা তৈরি করতে পেরেছেন। তা থেকে ল্যাটেক্সও পাওয়া গেছে অনেক বেশি। নিপ্পন অয়েল (Nippon Oil) ও সেকিসুই প্লাস্টিক্স (Sekisui Plastics)—জাপানের এই দুটি সংস্থা গাছ থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদনে উদ্যোগী হয়েছে।

ক্ষেত-খামারে কীটনাশক ব্যবহার করা কি উচিত?

ক্ষেতে ফসল থাকার বিভিন্ন পর্যায়ে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ঘটে। এতে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। ক্ষেত থেকে ফসল গুদামজাত করার পরও রেহাই নেই। গুদামজাত ফসলের বেশ কিছু অংশও পোকা-মাকড়ের আক্রমণে নষ্ট হয়। সব মিলিয়ে আমাদের দেশের বার্ষিক উৎপাদনের একটা বড় অংশই কাজে লাগে না। অনেক সময়ে পোকা-মাকড় ফসলের সবটুকু যে খেয়ে ফেলে তা নয়, কিন্তু এদের আক্রমণে ফসলের গুণগত মানের এত অবনতি হয় যে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, অন্ততপক্ষে মোট কৃষিজ উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ পোকা-মাকড় নষ্ট করে।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম হওয়ায় এদেশে জনস্ফীতি সমস্যাও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফলে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের চাহিদা সমানে বেড়ে চলেছে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করতে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া অন্য পথ নেই। চাষের উপযুক্ত জমি সীমিত, কাজেই জমিতে উচ্চ ফলনের ক্ষমতাবিশিষ্ট ফসল লাগাতে হয়। তাতে আবার পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যায়।

যদিও বর্তমানে যান্ত্রিক ও জৈব-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফসলের আক্রমণকারী পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে, কার্যকারিতার দিক থেকে বিচার করলে কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের সঠিক বিকল্প এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাতে কীটনাশক তাই ব্যবহার করতেই হয়। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে কীটনাশক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। যথেচ্ছ পরিমাণে কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

একটি বহুল প্রচলিত কীটনাশক ডি-ডি-টির কথাই ধরা যাক। ক্ষেতে ফসল বিনষ্টকারী পোকা-মাকড়কে দমন করতে কীটনাশকটি ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডি-ডি-টি যায় কোথায়? বর্ষার জলের সঙ্গে ওই কীটনাশক স্বাভাবিকভাবেই গিয়ে পড়ে পুকুর-ঝিল এবং নদীনালায়। ক্ষতির সূত্রপাত এখান থেকে। ডি-ডি-টি এমন একটি রাসায়নিক যা জীবদেহের কোষের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চিত থাকতে পারে। জলজ পরিবেশ থেকে ডি-ডি-টি প্রথমে প্রবেশ করে আণুবীক্ষণিক শ্যাওলার মধ্যে। ভাসমান শ্যাওলা, যাকে ফাইটো প্ল্যাংকটন (Phyttoplankton) বলা হয়, তার থেকেই শুরু জলজ পরিবেশের খাদ্যশৃঙ্খল (Food chain)। ডি-ডি-টি সম্পৃক্ত প্ল্যাংকটন খেয়ে সাইক্লপ্স (Cyclops), ডাফনিয়া (Daphnia), এর মত প্রাণী বা জুপ্ল্যাংকটন (Zooplanktons) বিষাক্ত হয়ে পড়ে। এদের দেহকোষে, বিশেষ করে চর্বিকোষে ডি-ডি-টি সঞ্চিত হয়, উপরন্তু কীটনাশকের পরিমাণও বেড়ে যায়। জীবন ধারণের জন্য একটি সাইক্লপ্স কিংবা ডাফনিয়াকে অবিরতএবং অনেক শ্যাওলা খেতে হয় বলেই এমনটি ঘটে। এই ছোট প্রাণীগুলি আবার মাছের খাদ্য। এইভাবে খাদ্যস্তরের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ডি-ডি-টি এসে জমে মাছের দেহে। খাদ্য ছাড়াও মাছের ফুলকার মধ্যে দিয়েও ডি-ডি-টি সরাসরি জলজ মাধ্যম থেকে মাছের শরীরে ঢুকতে পারে।

ডি-ডি-টি যুক্ত খাদ্য খেলে কী হয়? এই বিষাক্ত খাদ্যের মারাত্মক প্রভাব প্রথমে নজরে আসে এই শতকের মাঝামাঝি। মাছখেকো ঈগল, উৎক্রোশ (Osprey), গগনভেড় (Pelicans) ইত্যাদি পাখি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অনুসন্ধানে জানা গেল, ডি-

ডি-টি-যুক্ত মাছ খাবার জন্য এদের ডিম পাড়ার ক্ষমতা আর আগের মত নেই। ডিমের খোলাও পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে যাবার জন্য তা দেবার সময়ে সেগুলো ফেটে যাচ্ছে।

শুধু মাছ খেকো নয়, পতঙ্গভুক, দানাশস্যভুক কিংবা ফলভুক পাখিদের পক্ষেও ডি-ডি-টির মারাত্মক বিষাক্ত প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। অতিরিক্ত ডি-ডি-টি গাছের মধ্যে শোষিত ও সঞ্চিত থাকে। এর ফলে শষ্যদানায় কিংবা ফলেও এই কীটনাশক থেকেই যায়। গাছপালার বিভিন্ন অংশ

আমরা কী ভাবে কীটনাশকের শিকার হই?

খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করায় কীট-পতঙ্গের দেহেও ডি-ডি-টি ঢুকে পড়ে। পাখি ও অন্য জীবজন্তু এইসব বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে।

আমরাও মাছ-মাংস, ডিম-দুধ থেকে আরম্ভ করে শাকসবজি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের খাদ্য থেকে ডি-ডি-টি বিষক্রিয়ার শিকার হই। তবে এই বিষক্রিয়ার প্রকাশ একটু দেরীতে হয়ে থাকে। ডি-ডি-টি ক্যালসিয়াম বিপাকে কিছু বিপত্তি ঘটায় বলে নানা ধরনের হাড়ের অসুখ এর প্রভাবে হয়ে থাকে। তাছাড়া এজন্য বেশ কিছু রক্তনালী ও রক্ত সংবহন সম্পর্কিত অসুখও হতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।

ক্ষেতে বেশি সার দেওয়া কি ভাল?

বেশি ফসল পেতে হলে ক্ষেতে সার দিতেই হয়। অজৈব সারের মধ্যে নাইট্রোজেন এবং ফসফেট ঘটিত সারের বেশ প্রচলন আছে। ফসফেট জাতীয় সারের অতিরিক্ত ব্যবহার

বেশি সার দিলেই কি বেশি ফসল পাওয়া যায়?

কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। ক্ষেত থেকে অতিরিক্ত সার বৃষ্টির জলে ধুয়ে পুকুর-ঝিলের জলে এসে পড়ে। এর প্রভাবে শ্যাওলা ও জলজ আগাছা খুব বেড়ে যায়। গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে ফসফেট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রচুর পরিমাণে ফসফেট জলজ পরিবেশে এসে পড়লে জলজ উদ্ভিদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। শ্বাসক্রিয়ার জন্য দরকারি অক্সিজেন জলজ গাছ জল থেকেই নিয়ে থাকে। ফলে আগাছাভর্তি পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কমে যায়। অক্সিজেনের অভাবে জলজ প্রাণীরা সেখানে বাঁচতে পারে না। মাছের ফুলকার ওপরে শ্যাওলা জমে গিয়েও বিপত্তি ঘটায়। এতে শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে মাছ মরে যায়। বেশি শ্যাওলা-পানা জন্মানোর জন্য জলের রঙ যায় বদলে, কালচে সবুজ রঙের পানা পুকুরের জলে একটা পচা দুর্গন্ধ ভাসে। ক্রমশ ওই পুকুরের জল হয়ে ওঠে ব্যবহারের অযোগ্য। পচা পানা পুকুরে আবার বেশ কিছু প্রজাতির শ্যাওলা দেখা যায়, যেগুলি থেকে 'টক্‌সিন' বা আধাবিষ বেরোয়। সব মিলিয়ে ওই রকম পুকুর-ঝিল পরিবেশ দূষণ ঘটায় এবং একই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী কি পরিবেশ দূষণের ইঙ্গিত দিতে পারে?

কোনো অঞ্চলের পরিবেশ কতটা দূষিত, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আজ তা জানা যায়। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের দূষণের মাত্রা নির্ণয়ের জন্যে সেই অঞ্চলের জল ও বাতাসের নমুনা পরীক্ষা করেন। বায়ুদূষণের প্রকৃতি এবং পরিমাণ জানতে হলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড আর ভাসমান ধূলিকণার পরিমাপ করতে হয়। ঠিক তেমনই জলের নমুনাতে অ্যাসিড, অ্যালকালি (ক্ষার), ভারী ধাতু, দ্রবীভূত গ্যাসীয় পদার্থ, রোগসৃষ্টিকারী পরজীবী ডিম, লার্ভা ইত্যাদির পরিমাণ জানলে তবেই দূষণ-মাত্রা ও প্রকৃতি বোঝা যায়। এইসব পরীক্ষা জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। দূষণ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে যে দূষণ-চিত্রটি পাওয়া যায়, সেটিও তাৎক্ষণিক। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কোনো একটি অঞ্চলের পরিবেশদূষণ বাড়তে পারে কিংবা কমতেও পারে। বহুদিন ধরেই পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা তাই এমন একটা উপায় বের করতে চেষ্টা করছিলেন যাতে পরিবেশ দূষণের সামগ্রিক এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবটি বোঝা যায়। বিস্তারিত গবেষণায় জানা যায় যে, কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী পরিবেশ দূষণের মাত্রা খুব ভালভাবে নির্দেশ করতে পারে।

কোনো অঞ্চলে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বসতি গড়ে উঠতে স্বাভাবিকভাবেই বেশ সময় লাগে। ওই পরিবেশ বদলে

গেলে জীবগুলির ওপরে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেসব প্রাণীর চলাফেরা করার ক্ষমতা আছে, তারা অন্য জায়গায় চলে যায়। যাদের সে ক্ষমতা নেই তারা অবলুপ্তির পথে এগোয়। উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের (অবশ্য কিছু শ্যাওলার গমন-ক্ষমতা রয়েছে) চলাফেরা করার ক্ষমতা না থাকায় তারাও দূষিত পরিবেশে বাঁচতে পারে না। অবশ্য সব উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর দূষণ সহ্য করার ক্ষমতা এক রকমের নয়। কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী খুবই সামান্য মাত্রাতেও পরিবেশ দূষণ

কোনো কোনো উদ্ভিদ কি পরিবেশ দূষণের জৈব-নির্দেশক?

সহ্য করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই এগুলিকে পরিবেশ দূষণের জৈব নির্দেশক (Biological indicator) হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

1968 সালে ও এল গিলবার্ট (O.L. Gilbert) প্রমাণ করেন যে, মস জাতীয় গাছের (Bryophytes) বায়ুদূষণ নির্দেশ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে। এর দু-বছর পরে গিলবার্ট দেখান, বাতাসে অল্পমাত্রায় সালফার ডাই-অক্সাইড থাকলেই গাছের গায়ে লাইকেন (Lichens) জন্মায় না। লাইকেন কি? কলকাতা থেকে একটু দূরে পা বাড়ালে বড় বড় গাছের গুঁড়ি এবং মোটা ডালপালার ওপরে ধূসর রঙের যে গোল গোল ছাতার মত জিনিস দেখতে পাওয়া যায় সেটাই লাইকেন। এটি আসলে শ্যাওলা আর ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের সহাবস্থানে তৈরি। কলকাতার বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড থাকার জন্য এখানে লাইকেন দেখা যায় না।

অবশ্য মস বা লাইকেন ছাড়া আরো বেশ কিছু গাছের কথা ইতিমধ্যে জানা গেছে যারা বিভিন্ন বায়ুদূষক একেবারে সহ্য করতে পারে না। জিনিয়া (Zinnia) এবং পাইন জাতীয় গাছ সালফার ডাই-অক্সাইড, পেটুনিয়া (Petunia) ওজোন আর গ্ল্যাডিওলাস (Gladiolus) ফ্লুয়োরাইডের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল।

উদ্ভিদের মত কিছু প্রাণীরও দূষণ নির্দেশ করার ক্ষমতা আছে। যেখানে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় জৈব দূষণ ঘটেছে, এমন অপরিষ্কার জলে, লাল-রঙের সরু সুতোর মত জলজ কেঁচো জন্মায়। টিউবিফেক্স (Tubifex) নামে পরিচিত এই জাতের কেঁচো রঙিন মাছের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। পরিষ্কার জলের চেয়ে একটু অপরিষ্কার জলেই এদের দেখা যায় বেশি। টিউবিফেক্সের স্বভাব এরকম যে তারা একসঙ্গে অনেকগুলি মিলে তাল পাকিয়ে থাকে। জলে দূষণ বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে। টিউবিফেক্সের জট খুলে কেঁচোগুলি নড়াচড়া আরম্ভ করে। অক্সিজেন যত কমে, এদের নড়াচড়াও তত বেড়ে যায়।

ট্রাউট মাছ (Trout) আবার বিন্দুমাত্র জলদূষণ সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে জলে অত্যন্ত অল্পমাত্রায় ভারী ধাতু থাকলেই ট্রাউট সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শহরে পানীয় জলের মধ্যে ভারী ধাতু আছে কিনা, তা ঠিক করতে ট্রাউট মাছকে কাজে লাগানো হয়।

সমুদ্রের জলে দূষণ ঘটেছে কিনা তা বুঝিয়ে দেয় প্রবাল পলিপ (Coral Polyps) আর সমুদ্র শশা (Sea cucumbers)। সমুদ্রের জলে জৈবদূষণ ঘটলে প্রবাল পলিপ (নলের মত দেখতে) বাঁচতে পারে না। সমুদ্র শশারা কিন্তু দূষিত জলেই থাকতে ভালবাসে।

পরাগরেণু কি আমাদের ক্ষতি করে?

সন্তকালের গোড়ার দিকে অনেকেই নিয়মিত সর্দিকাশি, হাঁচি, নাক দিয়ে ক্রমাগত জল পড়ার মত উপসর্গে ভোগেন। চিকিৎসকেরা বলেন, এর কারণ 'অ্যালার্জি'। অনেকের ডিম, চিংড়ি বা কাঁকড়ার মত কিছু খাবার খেলে অ্যালার্জি হয়। সেক্ষেত্রে অ্যালার্জির কারণটি বোঝা খুব শক্ত নয়। আসলে বাইরের থেকে আসা কোনো প্রোটিন সহজে আমাদের শরীর গ্রহণ করে না। এগুলোর

ফুল থেকে কি স্বাস্থ্যহানি হতে পারে?

থেকে উৎপন্ন অ্যালার্জেন (Allergen) শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং নানা ধরনের বিপত্তি ঘটায়। চুলকানি দেখা দেয়, শরীরের কোনো জায়গা ফুলে লাল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া হাঁচি-কাশি বা শ্বাসকষ্ট সবই এর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পড়ে।

বসন্তকালে শ্বাস-সংক্রান্ত বিপত্তির কারণ অনুসন্ধান

করতে গিয়ে জানা গেছে, এর পেছনে রয়েছে ফুলের পরাগরেণু (Pollens)। আমাদের দেশে এই সময়েই অধিকাংশ গাছে ফুল ফোটে, তাই পরাগ-জনিত অ্যালার্জির প্রকোপ বসন্তকালে বেশি দেখা যায়। সূক্ষ্ম পরাগরেণু বাতাসে ভেসে আমাদের শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়ে। তখনই বিপত্তির সূত্রপাত। পরাগরেণু থেকে বেরোনো অ্যালার্জেনের প্রভাবে শ্বাসনালীর দেওয়াল সংকুচিত হয়, বেরিয়ে আসে শ্লেষ্মা বা মিউকাস (Mucus)। অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করতে আরম্ভ হয় কাশি। শ্বাসনালী কুঁচকে যাওয়ায় শ্বাসকষ্ট শুরু হয় আর নাক থেকে ঝরতে থাকে সর্দি বা মিউকাস। সব গাছের পরাগরেণুই যে এইরকম অনিষ্ট ঘটায়, তা নয়। অনিষ্টকারী গাছের মধ্যে প্রথমেই পার্থেনিয়ামের (Parthenium) নাম করতে হয়। চন্দ্রমল্লিকা জাতীয় এই ছোট গাছটিতে ছোট ছোট সাদা ফুল ফোটে। পরাগরেণু ছাড়াও এই গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশ বিষাক্ত বলে জানা গেছে।

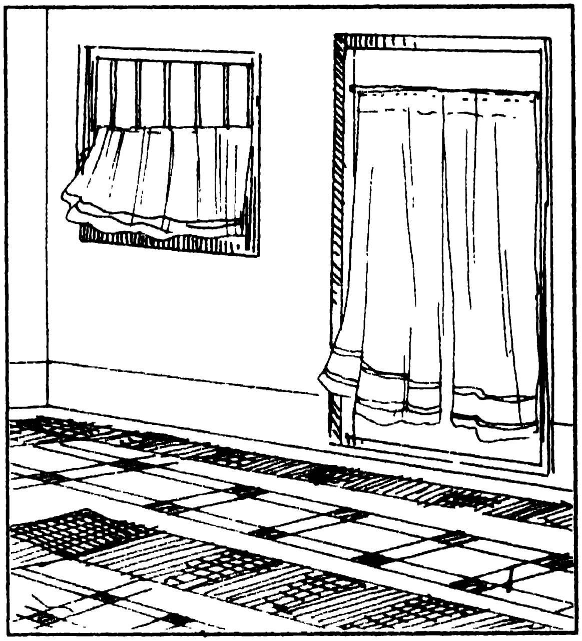
ডার্মাটাইটিসের (চর্মরোগ) মত অসুখ বাদে পার্থেনিয়ামের পরাগরেণু শ্বাসনালীতে ঢুকে হাঁপানির সৃষ্টি করে।

পার্থেনিয়াম এদেশের গাছ নয়। বিদেশ থেকে আমদানি করা শষ্যবীজের সঙ্গে এর বীজ ভারতে আসে। পরে অনুকূল পরিবেশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশীয় গাছ-গাছড়ার মধ্যে স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে ধুতরো, পেঁপে ইত্যাদি গাছের পরাগরেণু। আর একটি পরিচিত কিন্তু আসলে বিদেশি গাছ ইউক্যালিপ্টাসের নামও আসছে এই তালিকায়।

একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার। সবার প্রতিরোধ ক্ষমতা বা 'ইমিউনিটি' একরকম নয়। এইজন্য কেউ অ্যালার্জিতে বেশি ভোগেন, কেউবা ততটা নয়।

দরজা-জানালায় মোটা পর্দা ঝোলানো আর মেঝেতে কার্পেট পাতা কি ভাল?

দরজা-জানালায় সুন্দর মোটা পর্দা ঝোলালে ঘরের শোভা বাড়ে। আর মেঝেতে নকশা-কাটা কার্পেট পাততে কার না ইচ্ছে হয়? এতে গৃহসজ্জার সঙ্গে রুচিরও পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্যা হয় অন্য জায়গায়। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। সেইজন্য বাড়ি-ঘরের ভেতর বায়ু চলাচলের



উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা খুবই দরকার। মোটা পর্দা বায়ু চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অনেকে মনে করেন, পর্দাতে ধুলোবালি আটকায়, ঘর নোংরা হয় না। একদিক থেকে কথাটা ভুল নয়। কিন্তু এরও একটা খারাপ দিক আছে। মোটা পর্দাতে পশুপাখির সূক্ষ্ম লোম এবং পালক আটকে থাকতে পারে। প্রশ্বাসের সঙ্গে এগুলো শ্বাসনালী এবং ফুসফুসে ঢুকে নানা ধরনের অসুখের সৃষ্টি করে। খুব ছোট, আণুবীক্ষণিক মাকড়সা জাতীয় একটি প্রাণী আছে, এর নাম ডাস্ট মাইট' (Dust mite)। এ থাকে পর্দার ভাঁজে।

কার্পেটের ধুলো কতটা [illegible]

এগুলোও বাতাসের সঙ্গে শ্বাসনালী ও ফুসফুসে ঢুকে পড়তে পারে। ধুলো-বালি কিংবা লোম-পালকের চেয়ে ডাস্ট মাইট অনেক বেশি ক্ষতি করে। অ্যালার্জি থেকে শুরু করে হাঁপানি পর্যন্ত হতে পারে এ থেকে। ঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতার সমস্যাগুলিও একই ধরনের। নিয়মিত মেঝে থেকে কার্পেট তুলে ভালভাবে ময়লা পরিষ্কার না করলে নানা ধরনের পরজীবী ও রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। পোষা কুকুরের গায়ে ছোট লাল রঙের মাকড়সা-জাতীয় একটি পরজীবীকে দেখতে পাওয়া যায়। এর নাম 'টিক' (Tick)।

কুকুরের লোমের ফাঁকে এদের বাস আর এরা বাঁচে রক্ত খেয়ে। টিক ডিম পাড়ে ঘরের মেঝে আর দেওয়ালের ফাটলে। সেখানেই ডিম ফুটে বেরোয় টিকের বাচ্চা। অপরিণত অবস্থায় সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে টিক আবার কুকুরকে আক্রমণ করে।

আরশোলা-ইঁদুরের মত প্রাণী কতটা মারাত্মক?

ঘর-গৃহস্থালিতে যেসব প্রাণী দৈনন্দিন সমস্যার সৃষ্টি করে, তার মধ্যে আরশোলা আর ইঁদুরের কথা প্রথমেই মনে আসে। আরশোলা সর্বভুক। শাক-সবজি, রান্না করা খাবার, কাগজপত্র, সাবান—কিছুতেই এদের বড় একটা অরুচি দেখা যায় না।

থাকে এরা নোংরা-স্যাঁতসেতে জায়গায়। দিনের বেলার থেকে রাতের দিকেই এদের উৎপাত বাড়ে। নোংরা জায়গায় থাকার জন্য আরশোলার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সংক্রামক রোগের জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, কৃমি ইত্যাদি) লেগে যায়। পরে খাবার-দাবারে ওই রোগ জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। আরশোলার মলেও অনেক পরজীবী আর জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

আরশোলার দেহে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ পাওয়া যায়। পতঙ্গটির দেহ নিঃসৃত পদার্থ ওইরকম বিশ্রী গন্ধের জন্য দায়ী। খাদ্য তো বটেই বাসনপত্রেও এই বিশ্রী গন্ধ এরা ছড়িয়ে দেয়।

আরশোলা যেসব রোগের সংক্রমণ ঘটাতে সাহায্য করে তার মধ্যে আছে উদরাময় (Diarrhoea), আমাশা (Dysentery), টাইফয়েড, চর্মরোগ। কারোর কারোর ক্ষেত্রে আবার আরশোলা থেকে শ্বাসনালীর অ্যালার্জি হয় বলে জানা গেছে।

আরশোলার মত ইঁদুরেরও সর্বত্র যাতায়াত। সাধারণত দু-জাতের ইঁদুর আমাদের বাড়ির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ঘরের ভেতরে সুবিধেমত জায়গায় আস্তানা পাতে নেংটি ইঁদুর (House mouse) আর নর্দমার মধ্যে থাকে ধেড়ে ইঁদুর (Bandicoot rat)। কিছু কেটে নষ্ট করাই নেংটি ইঁদুরের স্বভাব। এদের সামনের দাঁত (Incisors) সব সময়ে বাড়ে বলে দাঁতের ওপরের প্রান্ত ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না। কাগজপত্র, কাপড়-চোপড়, শাক-সবজি, রান্না করা খাবার—সবই নেংটির দৌরাত্মে নষ্ট হয়। ঘরের মধ্যেই এরা সংসার পাতে। নেংটির মল-মূত্রেও রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে।

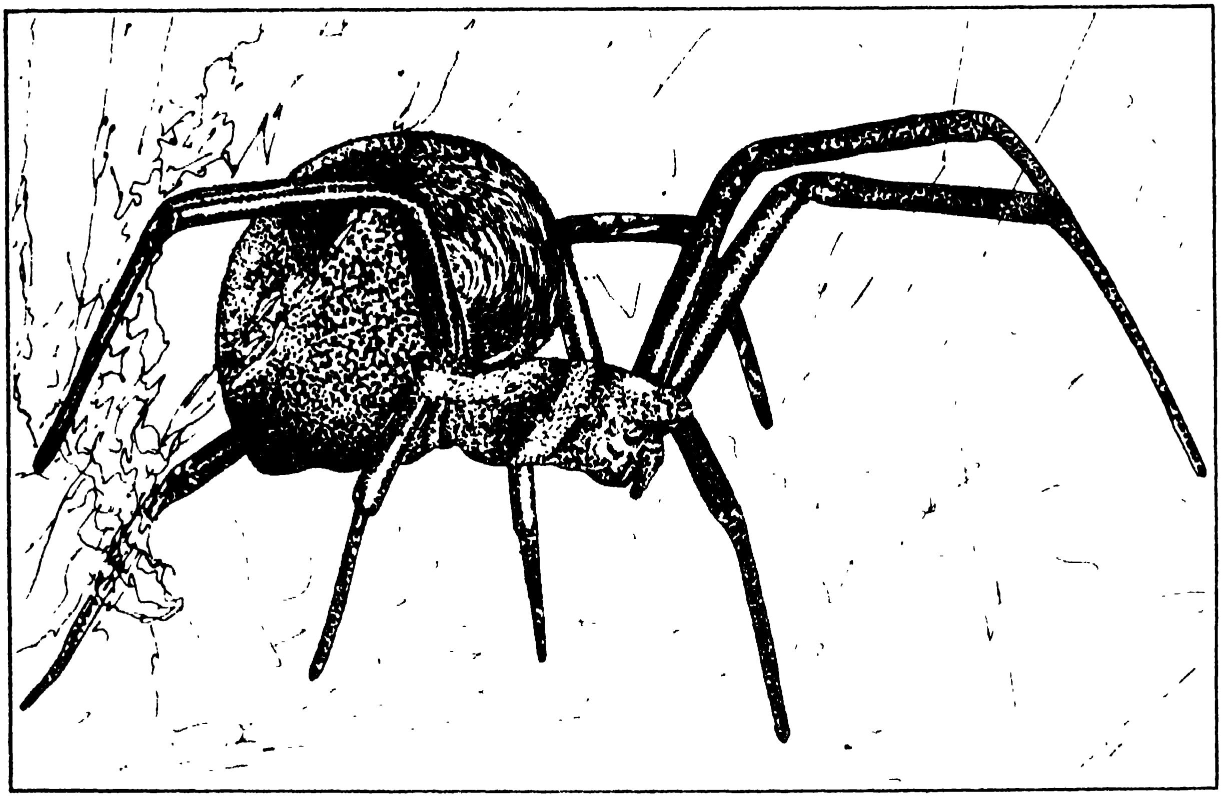
ধেড়ে ইঁদুর স্বভাবে বেশ হিংস্র। ভয় পেলে বা রেগে গেলে এরা কামড়ে দেয়। তীক্ষ্ণ দাঁতের আঘাতে ক্ষতস্থান বেশ গভীর এবং যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। নোংরা জায়গায় থাকার জন্য এদের শরীরেও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু লেগে থাকে। সেইজন্য ক্ষতস্থান অনেক সময়ে বিষিয়ে যায়। এক জাতের ধেড়ে ইঁদুর (House rat) প্লেগের (Plague) জীবাণু বহন করে।

মাকড়সার কি গরল আছে?

আমাদের ঘরের মধ্যে আবাঞ্ছিত যে কটি প্রাণীর বাস তার মধ্যে মাকড়সা একটি। ছোটখাটো প্রাণী, কিন্তু মাকড়সার গরল আছে। সাধারণত একটি মাকড়সাকে ঘরের দেওয়ালে প্রায় স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। এর নাম ঘরোয়া মাকড়সা (House spider)।

একটু লক্ষ্য করলে অনেক সময় কাছাকাছি দুটি মাকড়সাকে দেখা যাবে। এর একটা বেশ বড়, অন্যটা অনেক ছোট। বড়টি স্ত্রী-মাকড়সা, ছোটটি পুরুষ। এদের রঙ অনেকটা বালির মত। আর এক জাতের মাকড়সার ইংরেজি নামটি বেশ কৌতূহল জাগায়। সরু, লম্বা আর কালো রঙের এই মাকড়সার নাম 'ড্যাডি'স লং লেগ' (Daddy's long leg)। এর পাগুলি (মাকড়সার আটটি পা থাকে) খুব সরু আর ভীষণ লম্বা। একটু ঘুপচি মত জায়গায় এদের আস্তানা। আরও এক জাতের মাকড়সাকে বইয়ের আলমারি কিংবা পড়ার টেবিলে চোখে পড়ে। ঘোর বাদামি রঙের ছোটখাটো মাকড়সাটি অত্যন্ত চটপটে এবং চতুর শিকারী। এর নাম নেকড়ে মাকড়সা (Wolf spider)।

মাকড়সা শিকারী প্রাণী। কীট-পতঙ্গ শিকার করে এরা বাঁচে। কয়েক জাতের মাকড়সা মাছ শিকার করে। আবার আমাজন অরণ্যের বাসিন্দা একটি মাকড়সাকে পাখি শিকার করতেও দেখা গেছে। কোনো কোনো মাকড়সা পেটের তলাকার বিশেষ গ্রন্থিরসের সাহায্যে সূক্ষ্ম জাল বোনে। জালের তন্তুগুলি আঠালো। পোকা-মাকড় জালে আটকে পড়লে মাকড়সা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে



ব্ল্যাক উইডো

ফেলে। যেসব মাকড়সা জাল বোনে না, তারা সরাসরি পোকা-মাকড়ের ওপরে ক্ষিপ্রবেগে লাফিয়ে পড়ে।

সম্পূর্ণ শিকারটিকে কিন্তু মাকড়সা খেতে পারে না। এদের লালারস বিষাক্ত (Poisonous)। এই লালারস এরা ফাঁপা ও বিশেষভাবে তৈরি মুখ-উপাঙ্গের সাহায্যে শিকারের

সব জাতের মাকড়সা কি বিষাক্ত?

দেহে ঢুকিয়ে দেয়। লালারসে থাকা উৎসেচকের (Enzyme) প্রভাবে কীট-পতঙ্গের দেহের পেশী ও আন্তরযন্ত্র গলে গিয়ে একটি সান্দ্র (Viscous) তরলে পরিণত হয়। মাকড়সা ওই তরলটি চুষে খায়। কীট-পতঙ্গের দেহের খোলসটি পরিত্যক্ত হয়। মাকড়সার লালায় গরল বা বিষ আছে একথা সত্যি। তবে সাধারণত মাকড়সা মানুষকে আক্রমণ করে না। এদের বিষাক্ত লালা পোকা-মাকড় ও অন্য শিকারকে কাবু করার উপযুক্ত। তবে সব মাকড়সাই যে মানুষের পক্ষে নিরাপদ, এমনও বলা যাবে না। 'ব্ল্যাক উইডো' (Black widow) নামের এক জাতের মাকড়সা আছে। এর বিষ 'র‍্যাটল-স্নেক' (Rattle-snake) বা ঝুমঝুমি সাপের বিষের চেয়ে প্রায় 15 গুণ বেশি শক্তিশালী। কুচকুচে কালো রঙের এই মাকড়সা অবশ্য এদেশের বাসিন্দা নয়। এর নিবাস উত্তর আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে। ব্ল্যাক উইডোর তিন বিষাক্ত নিকটাত্মীয়ের নাম—'রেডব্যাক' (Redback), 'ক্যাটিপো' (Katipo) এবং 'ম্যালমিগনেট' (Malmignatte)। এদের যথাক্রমে দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি দেশগুলিতে।

জাল বুনে শিকার ধরে ব্ল্যাক উইডো। অন্য মাকড়সার মত এরা নিরীহ নয়, চট করে লুকিয়েও পড়ে না। জালের ওপর অসাবধানে পা পড়ে গেলে অথবা অন্য কোনোভাবে জালটি কেঁপে উঠলে ব্ল্যাক উইডো কামড়ায়। সেই কামড়ে কেউ কেউ মারাও যায়। সুস্থ সবল যুবক-যুবতীর চেয়ে শিশু ও বৃদ্ধের ক্ষেত্রে এই বিষের প্রতিক্রিয়া বেশি মারাত্মক বলে জানা গেছে।

ব্ল্যাক উইডোর বিষ নিউরোটকসিক (Neurotoxic) প্রকৃতির। এর প্রভাবে স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। এর উপসর্গের মধ্যে মাংসপেশীর সংকোচন, হাত-পায়ে খিল ধরা, প্রচণ্ড যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, প্রবল জ্বর এবং পক্ষাঘাত আছে।

বাড়ির মধ্যে কাঠকুটো, আবর্জনা জমিয়ে রাখার বিপদ কোথায়?

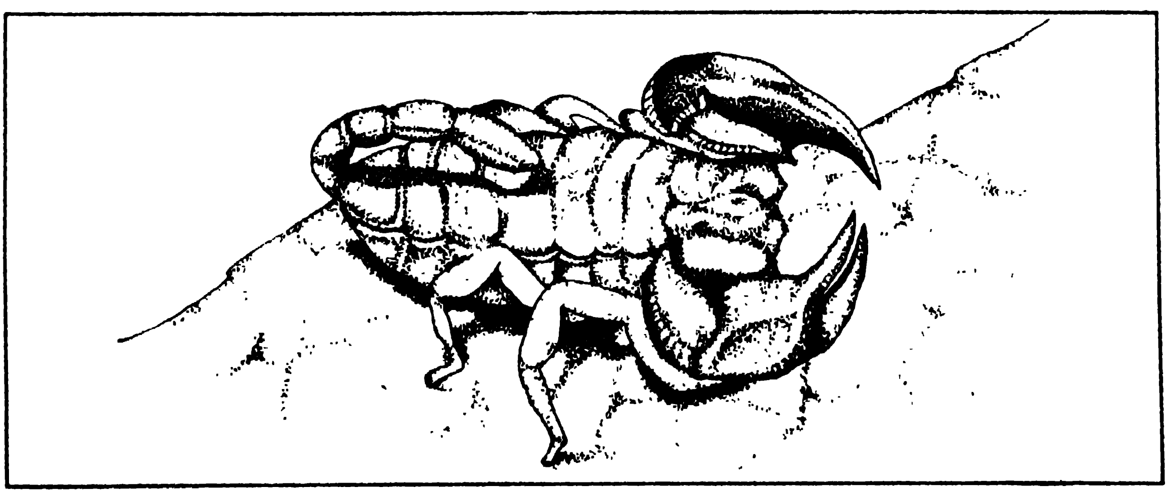
বাড়ির মধ্যে আবর্জনা জমিয়ে রাখতে কেউ চায় না। এতে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ যেমন নষ্ট হয়, তেমনি নানা রকমের স্বাস্থ্য-সমস্যারও সৃষ্টি হয়। আর শুধু বাড়ি কেন, আশপাশের লাগোয়া জমিটুকুও অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। নাহলে ছোটখাটো অসুখ-বিসুখ তো বটেই, প্রাণ নিয়েও টানাটানি হতে পারে। এইরকম অন্ধকারাচ্ছন্ন, নোংরা পরিবেশ পেলে কাঁকড়াবিছে বহাল তবিয়তে আসর জমাতে পারে।

কাঁকড়াবিছের হুল কি থাকে দেহের শেষপ্রান্তে?

কাঁকড়াবিছে মাকড়সা জাতীয় প্রাণী। এর সব কটি প্রজাতিই অল্পবিস্তর বিষাক্ত, তবে বড়গুলির চেয়ে আকারে ছোটগুলির বিষ বেশি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এদের উপদ্রব বেশি। এরাও পোকা-মাকড় শিকার করে তাদের দেহের কোষ আর কলা (Tissues) গলিত আকারে চুষে খায়। তবে কাঁকড়াবিছেরা কামড়ায় না, হুল ফোটায়। এদের মুখের দু'পাশে দুটি উপাঙ্গ দেখতে অনেকটা কাঁকড়ার দাঁড়ার মত। চিমটের ধরনে কার্যকরী উপাঙ্গ দুটি দিয়ে কাঁকড়াবিছে পোকা-মাকড়কে কিংবা সুবিধেমত অন্য শিকারকে ধরে রাখে। এদের হুলটি থাকে দেহের একেবারে শেষপ্রান্তে, যে অংশটি অনেকটা চাবুকের মত সরু লিকলিকে হয়ে গেছে। এই সরু অংশটি ওপরের দিকে উঠে ভাঁজ খেয়ে থাকে।

কাঁকড়াবিছের হুলটি শক্ত, বাঁকা আর ফাঁপা। একজোড়া বিষগ্রন্থি হুলের ভেতর দিয়ে ক্ষতস্থানে বিষ ঢেলে দেয়। আক্রমণের সময়ে পিছনের সরু অংশটি চাবুকের মতই আছড়ে পড়ে শিকারের দেহে আর হুলটি বিঁধে গিয়ে একটি সূক্ষ্ম ক্ষতের সৃষ্টি করে। গাঢ় হলুদ এবং স্বচ্ছ নিউরোটকসিন জাতীয় বিষ ক্ষতের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢোকে। কাঁকড়াবিছের বিষ কিছু সাপের বিষের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। এটির প্রভাবে স্নায়ুতন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে এবং ঠিক সময়মত চিকিৎসা না হলে শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে।

ভারতে দু'জাতের কাঁকড়বিছে দেখতে পাওয়া যায়—একটি হালকা বাদামী রঙের, অন্যটি কালো। প্রথমটিকে (Buthus) ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টিকে (Heterometrus Bengalensis) পশ্চিমবঙ্গে বেশি চোখে পড়ে। কাঁকড়াবিছে একটু শুকনো খটখটে জায়গায় থাকতে ভালবাসে।



কাঁকড়া বিছা

ইঁটের পাঁজা, পাথরের তলা বা ঝরা পাতার স্তূপের নীচে এদের আস্তানা। বাড়ির লাগোয়া জমিতে পছন্দসই জায়গা পেলে সেখানেই এরা ঘর-সংসার পাতে। স্ত্রী-কাঁকড়া বিছে একসঙ্গে অনেকগুলি বাচ্চা প্রসব করে। নিশাচর স্বভাবের কাঁকড়াবিছে প্রায়ই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং দেওয়ালে ফাটল কিংবা মেঝেতে গর্ত পেলে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এখানেই বিপদের শেষ নয়। তেমন লুকোবার জায়গা না পেলে এরা ঢুকে পড়তে পারে জুতো, ছাতা, বিছানা অথবা বাক্স-পেঁটরার মধ্যে। এর পরে হাত-পা অথবা অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাগালের মধ্যে পেলেই কাঁকড়া বিছের হুলের চাবুক নেমে আসে তার ওপরে।

কাঁকড়া বিছের বিষের প্রতিক্রিয়া শিশু, বৃদ্ধ এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের লোকের ওপরেই বেশি মারাত্মক হয়। সমীক্ষায়

বিছে কি হুল ফোটায়?

জানা গেছে, কলকাতায় কাঁকড়া বিছের হুলের আঘাত পাওয়া রোগীর মধ্যে প্রায় 15 শতাংশ মারা যায়।

কাঁকড়া বিছের বিষের উপসর্গ অনেক। হুলের আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাটি লাল হয়ে ফুলে ওঠে; সেইসঙ্গে শুরু হয় অসম্ভব জ্বালা-যন্ত্রণা। প্রচুর ঘাম বেরোয়, মুখ থেকে লালা ঝরে, বমি-বমি ভাব হয়, হাত-পায়ে (বিশেষ করে আঙুলে) খিঁচুনি ধরে, জ্বর আসে, ঢোঁক গিলতে আর কথা বলতে কষ্ট হয়, অবসাদ, আচ্ছন্ন অবস্থাও দেখা যায়। সুস্থ সবল লোকের ক্ষেত্রে এইসব উপসর্গ 2-3 ঘণ্টার মধ্যে কমতে থাকে কিন্তু শিশু বা বৃদ্ধের বেলায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে।

এই বিষাক্ত প্রাণীর সম্ভাব্য ডেরাগুলো নষ্ট করাটা খুবই দরকার। তবে হুলের আঘাত খেলে কী করতে হবে, সেটাও জানা উচিত। আঘাতের ওপরে হালকা করে বাঁধন (Ligature) দিতে হবে, ঠিক যেমন সাপে-কাটা রোগীকে দেওয়া হয়। ক্ষতস্থানে বরফ চাপিয়ে দিলে বিষ তাড়াতাড়ি রক্তে মিশতে পারে না, বিষের তীব্রতাও কমে। এর পরে কিন্তু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে রোগীকে 'অ্যান্টিভেনিন' (Antivenin) বা বিষের প্রতিষেধক দিতে হবে। নতুবা ডাক্তার ডেকে অ্যান্টিহিস্টামিন (Antihistaminic) জাতীয় ওষুধ ইনজেকশান দেওয়া দরকার।

আর একটি সরু, 20-25 সেমি লম্বা, বাদামি রঙের বিছেকে (Centipede) আমাদের বাড়ির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। নিশাচর স্বভাবের এই সন্ধিপদী প্রাণীটি একটু অন্ধকার ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে, রাতের বেলায় পোকা-মাকড়ের খোঁজে বেরোয়। কলকাতা সহ ভারতের অন্য অঞ্চলে বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরে যে বিছেটিকে দেখতে পাওয়া যায় তার নাম স্কুটিজেরা (Scutigera cleopatra)।

বিছেরা হুল ফোটায় না, কামড়ায়। এদের মুখের দু'পাশে দুটি শক্ত সূচালো এবং একটু বাঁকা উপাঙ্গ (Poison claw) আছে। বিষগ্রন্থি থাকে এই উপাঙ্গের মধ্যে। এরা কিন্তু চট করে কামড়ায় না। রাতের অন্ধকারে বিছের ওপরে পা পড়ে গেলে তবেই কামড়ের আশংকা থাকে।

বিছের বিষ তেমন মারাত্মক নয়। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো মারাত্মক বিপদ যে ঘটে যায় না, তা নয়। এই বিষ অস্বচ্ছ এবং রাসায়নিক প্রকৃতিতে অ্যাসিড। কামড়ের জায়গাটি লাল হয়ে ফুলে ওঠে, প্রচণ্ড যন্ত্রণাও হয়। যন্ত্রণা কমাতে সোডিবাইকার্ব (Sodibicarb) অথবা ম্যাগসালফের (Magsulph) সেঁক দেওয়া যায়। অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ দিয়ে এই বিষের চিকিৎসা করা হয়।

পোষা জীবজন্তু কতটা নিরাপদ?

আমাদের মধ্যে অনেকেরই জীবজন্তু পোষার শখ আছে। কুকুর-বেড়াল থেকে আরম্ভ করে রঙিন মাছ—সবই পুষে থাকেন শৌখিন মানুষ। এইসব জীবজন্তু কি বাড়িতে পোষা উচিত? আর যদিও বা এদের পোষা হয় তাহলে যথেষ্ট সাবধানতা না নিলেই বা কী ধরনের বিপদ ঘটতে পারে তা জেনে রাখা ভাল।

কুকুরের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। পোষা জন্তুর মধ্যে এই প্রাণীটির দেখা মিলবে সবচেয়ে বেশি। কুকুর থেকে যে মারাত্মক, প্রাণঘাতী রোগের সংক্রমণের ভয় থাকে, তার নাম জলাতঙ্ক (Hydrophobia)। বাড়ির পোষা কুকুরের অবশ্য সেই আশংকা থাকে না, কারণ একে নিয়মিত জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়। তবে অনেক

বদমেজাজী কুকুর হঠাৎ কাউকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। জলাতঙ্কের ভয় না থাকলেও সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে ক্ষতস্থান বিষিয়ে যেতে পারে।

লোমশ জাতের কুকুরের গায়ে টিক জাতীয় পরজীবী বেশি থাকে। এরা অনেক রোগ-জীবাণুর পোষক (Host) হিসেবে কাজ করে। এইজন্য টিকের কামড় থেকে মানুষের রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে। এক ধরনের ফিতাকৃমি (Dog tapeworm, Echinococcus) কুকুরের দেহে অন্তঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। মানুষ এদের স্বাভাবিক পোষক নয়। কৃমির দেহখণ্ডক কুকুরের মলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। ওই খণ্ডকের মধ্যেই থাকে পরিণত ডিম। তা থেকেই কৃমির সংক্রমণ হয়। খণ্ডকগুলি আণুবীক্ষণিক, সহজেই লোমের মধ্যে আটকে থাকতে পারে। নিয়মিত কুকুরের পরিচর্যা না করলে খণ্ডকগুলি থেকেই যায়। বাচ্চারা কুকুরকে আদর করার সময়ে খণ্ডকগুলি চলে আসে তাদের হাতে আর খাবারের সঙ্গে পেটে চলে গিয়ে তা নানা ধরনের বিপত্তি ঘটায়।

বেড়ালের স্বভাব এমনিতে একটু নোংরা। এরাও অনেক রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী। বিরক্ত কিংবা উত্তেজিত হলে

তোতা পাখি পোষা কতটা নিরাপদ?

বেড়াল মুখে আঁচড়ে কামড়ে বীভৎস ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। এরাও ঠিক কুকুরের মত জলাতঙ্ক রোগের সংক্রমণ ঘটায়।

তোতাপাখি (Parrots) পোষার শখ আছে অনেকেরই। এদের বর্জ্যপদার্থে (Excrete) এক ধরনের জীবাণু (Chlamydia Psittaci) থাকে। এই জীবাণুটি বাতাসে সংবাহিত হয় এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের শরীরে ঢুকে 'সিটাকোসিস' (Psittacosis) রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগের উপসর্গগুলি নিউমোনিয়ার মত; সেই সঙ্গে কাশি, জ্বর এবং প্লীহার (Spleen) অস্বাভাবিক বৃদ্ধিও দেখা যায়।

বসুন্ধরা বৈঠক (Earth summit) কী উদ্দেশ্যে এবং কবে অনুষ্ঠিত হয়?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর সব দেশে উন্নয়নের জোয়ার আসে। পরের দশকগুলিতে উন্নয়নের গতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, শেষে আটের দশকে এসে সেটা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। মোটামুটি নব্বুই সালের পর থেকে একটা বিষয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে উন্নয়নের নামে আমরা ক্রমশ ধ্বংসের দিকেই এগোচ্ছি। ইতিমধ্যেই আমরা পার্থিব পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে ফেলেছি। কয়লা-পেট্রোলিয়ামের মত খনিজ জ্বালানির ভাণ্ডারে টান পড়েছে, বাতাসে ক্রমশ বেড়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইডের মত ক্ষতিকারক

পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে কেন?

গ্যাসের পরিমাণ। পৃথিবী দিনের পর দিন উত্তপ্ত হয়ে চলেছে, পালটে যাচ্ছে আবহাওয়ার ধরন-ধারণ। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জল-মাটি-বাতাস, নদী, হ্রদ এবং সমুদ্র—সব জায়গাতেই জমা হয়েছে বিপজ্জনক দূষিত পদার্থ। ঊর্ধ্বাকাশে যে ওজোন স্তর জীবজগৎকে অতিবেগনী রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে সযত্নে রক্ষা করছে, তাতেও ধরা পড়েছে ছিদ্র (Ozone hole)। এর ফলে অতিবেগনী রশ্মি অবাধে ওইসব ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলে এসে জীবজগতের মারাত্মক ক্ষতি করবে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ও বহুমুখী চাহিদা মেটাতে গিয়ে আরো কিছু অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য অবস্থায় রাখতে হলে এর স্থলভাগের অন্তত এক-তৃতীয়াংশে বনভূমি থাকা দরকার। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখি এর বিপরীত কর্মকাণ্ড, অর্থাৎ অরণ্য ধ্বংসই করা হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রতিদিন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কম করেও কয়েক হাজার হেক্টর বনভূমি নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। এতে শুধু যে অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি চিরকালের মত হারিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, অবলুপ্ত হচ্ছে অসংখ্য অরণ্যবাসী পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বৃষ্টি বনে (Rain forest) কত বিচিত্র জৈবসম্পদ যে রয়েছে, তার সঠিক হিসেবটি আজও আমাদের জানা নেই। বছর পাঁচেক আগেও আমাজনের অরণ্য থেকে প্রায় 3500 প্রজাতির নতুন কীট-পতঙ্গ পাওয়া

গেছে। ওই অঞ্চল থেকেই সভ্যজগৎ পেয়েছে রবার, তামাক, সিঙ্কোনা, আলু, পেঁপে, ট্যাপিওকা, কোকো, আরো কত কী। একই অবস্থা আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার।

কত পশুপাখি ইতিমধ্যে অবলুপ্ত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া খুবই কঠিন। ডোডো পাখি, সাকনাল, পাহাড়ি তিতির, কুয়াশা, ভারতীয় চিতা, তাসমানিয়ার পেটে থলি-ওলা নেকড়ে (ক্যাঙারু জাতীয়) আর কোনোদিনই দেখা যাবে না প্রকৃতিতে। এদের নিদর্শন দেখতে আমরা যাব মিউজিয়ামে। মানুষের হঠকারিতা আর অপরিণামদর্শিতার সাক্ষ্য দিচ্ছে এরা। জীববিজ্ঞানী এডওয়ার্ড উইলসনের (Edward Wilson) হিসেব মত, পৃথিবীতে মানুষ আসার আগে যত জীব অবলুপ্ত হয়েছে, অরণ্য ধ্বংসের ফলে হারিয়ে গেছে তার চেয়ে অন্তত‌পক্ষে 10,000 গুণ বেশি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পরিবেশ দূষণ কমাতে না হয় যথাসম্ভব উদ্যোগ নেওয়া গেল কিন্তু পশুপাখিদের বাঁচিয়ে রাখার সার্থকতা কোথায়? সার্থকতা যে কোথায়, তার উত্তর এই মুহূর্তে না দেওয়া গেলেও একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এদের টিকিয়ে রাখার ওপর নির্ভর করছে মানুষের অস্তিত্ব। পরিবেশে ভারসাম্যটি ঠিক রাখতে সব উদ্ভিদ এবং প্রাণীরই কোনো না কোনো ভূমিকা আছে। একটি প্রজাতির জীব অবলুপ্ত হলে তার ভূমিকাটি আর কেউ নিতে পারে না। এতে সমস্ত জীবজগতের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে, মানুষ নিজেও এর ব্যতিক্রম নয়।

তাহলে কি উন্নয়ন বন্ধ করে দিতে হবে? তাই বা কীভাবে সম্ভব? জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তো খাদ্য, বস্ত্র, আবাসনের মত প্রাথমিক প্রয়োজন বাড়বেই, বাড়বে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও। তাহলে উন্নয়ন ও সংরক্ষণের (Conservation) মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষাই আমাদের বাঁচার একমাত্র পথ। যে সম্পদ এই পৃথিবীতে রয়েছে তা হয়তো মানুষের প্রয়োজন (need) মেটাতে পারে কিন্তু লোভের (greed) নিবৃত্তি করতে পারে না। দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র 20 শতাংশ মানুষ উত্তর গোলার্ধের ধনী ও উন্নত দেশের বাসিন্দা অথচ মোট সম্পদের 80 শতাংশ তারাই ভোগ করে। এই বৈষম্য দূর না করলে অন্যান্য সমস্যার সমাধান হবে না, এটাই বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

এই পরিস্থিতির বিশদ পর্যালোচনার জন্য 1992 সালের জুন মাসে ব্রেজিলের রিও ডি জেনেইরো (Rio de Janeiro) শহরে 'বসুন্ধরা বৈঠক' (Earth Summit) অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যেমন—

1. অবশিষ্ট সম্পদের যথাসম্ভব সুচিন্তিত ও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবহার।

2. উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা; উন্নত দেশের প্রযুক্তিকৌশল ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে উন্নয়নশীল দেশকে সাহায্য।

3. পেট্রোল-কয়লার মত খনিজ জ্বালানির সার্থক বিকল্প সন্ধান।

4. উন্নয়নের নামে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ।

5. জীববৈচিত্র্য (Bio diversity) সংরক্ষণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ।

কলকাতায় কি যথেষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা, পার্ক-স্কোয়ার আছে?

জোব চার্ণক 1690 সালে হুগলি নদীর পূর্বপারে কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর নামের তিনটি জনপদ মিলিয়ে যখন এই শহরের পত্তন করেন তখন এর জনসংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি-ঘরের সংখ্যা ছিল সে সময়ে নিতান্তই অল্প, তুলনায় ফাঁকা জায়গা ছিল অনেক বেশি। কলকাতা তখন ছিল সবুজ। পরে এই শহরের জনসংখ্যা যেমন দ্রুতগতিতে বেড়েছে, কলকাতার চেহারাও ক্রমশ পালটেছে। নতুন বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বাজার গড়ে তোলার তাগিদে ফাঁকা জমি ক্রমশ উধাও হয়ে গেছে। কলকাতা এখন মহানগরীর পর্যায়ভুক্ত। জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত, সমস্যাসংকুল পৃথিবীর যে কয়টি বড়, মহানগরী আছে, কলকাতা তার অন্যতম। এখানে যে যথেষ্ট পরিমাণে খোলা জায়গা পার্ক-স্কোয়ার-ময়দান নেই তা না বললেও চলে।

তবুও প্রত্যেক কলকাতাবাসীর জন্য কতটা ফাঁকা জায়গা বরাদ্দ তা দেখে নেওয়া যাক। হিসেবমত মাথাপিছু 1.86 বর্গমিটার ফাঁকা জায়গা এই শহরে আপাতত রয়েছে। অন্য বড় শহরের অবস্থা কী? লণ্ডনে মাথাপিছু 4 বর্গমিটার, প্যারিসে 5, রোমে 9 বর্গমিটার, বার্লিনে 13, ভিয়েনায় 25 আর মস্কোয় 44 বর্গমিটার।

ময়দান, ঢাকুরিয়া লেক, ইডেন উদ্যান, ছোট বড় পার্ক সব মিলিয়ে কলকাতায় রয়েছে 6.07 বর্গ কিলোমিটারের মত খোলা জায়গা। কলকাতার মোট আয়তনের হিসেবে মাত্র 4 শতাংশ এইভাবে মুক্ত, সবুজ আর আচ্ছাদনবিহীন অবস্থায় রয়েছে। ভারতের অন্য অনেক শহরই কিন্তু এই ব্যাপারে কলকাতার তুলনায় এগিয়ে। দিল্লীর 23.75%, বাঙ্গালোরের 20% আর কানপুরের 24% অঞ্চলে রয়েছে বাগান, পার্ক বা খোলা ময়দান। কলকাতাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে গেলে আরো 10 বর্গ কিলোমিটার খোলা জায়গা দরকার।

চেরনোবিলে কী ঘটেছিল?

রাশিয়ার (আগে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া) একটি ছোট জায়গা চেরনোবিল (Chernobyl)। এখানে ছিল চার ইউনিটের একটি 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন' বা শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র। এক হাজার 'মেগাওয়াট' শক্তি উৎপন্ন হত সেখানে। 1986 সালের 26 এপ্রিল চেরনোবিলের চতুর্থ ইউনিটটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে চারপাশের আবহাওয়ায় প্রচণ্ড শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়লো। এই সব পদার্থের মধ্যে ছিল স্ট্রনটিয়াম-90 (Strontium-90), আয়োডিন-131 (Iodine-131) এবং সিসিয়াম-137 (Caesium-137)।

বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিন্তু চেরনোবিলেই থেকে গেল না বরং হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ছড়িয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই এইসব মারাত্মক ক্ষতিকারক পদার্থ পাওয়া গেল পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেনে। তেজস্ক্রিয় দূষণ লক্ষ্য করা গেল সোভিয়েত রাশিয়ার অনেকগুলি জায়গায়, সেই সঙ্গে জার্মানি, গ্রিস, নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ডের আবহমণ্ডলে।

বিস্ফোরণের সময়ে চেরনোবিলে 31 জনের মৃত্যু হয়। বিপর্যয়ের স্বরূপ তখন কিন্তু সম্পূর্ণ বোঝা যায়নি। 1986 থেকে 1990 সালের মধ্যে চেরনোবিল ও আশপাশের অঞ্চলে মারা গেলেন আরো 300 মানুষ। শুধু তাই নয় বহু মানুষই দুরারোগ্য রোগের শিকার হলেন। থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ, ক্যানসার, লিউকোমিয়া রোগ যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। জন্মাতে লাগল মৃত এবং বিকলাঙ্গ শিশু। অনেক নবজাতকের মধ্যে জীনের ত্রুটিও লক্ষ্য করা গেল।

তেজস্ক্রিয়তার কুফল গাছপালা এবং অন্য জীবজন্তুর মধ্যেও ধরা পড়ল। শাক-সবজি ও ফলমূলের মধ্যে

তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কি গাছপালাতেও ছড়ায়?

আয়োডিন-131 পাওয়া গেল। সে সব ফেলে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় রইল না। ঘাসের মধ্যে থেকে আয়োডিন-131 ঢুকে গিয়েছিল গবাদি পশুর শরীরে। তেজস্ক্রিয় বিষ ক্রমশ সঞ্চারিত হয়েছিল দুধ এবং মাংসে।

প্রথমদিকে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন নিয়েই চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। কিছুদিন পরেই কিন্তু সবার দৃষ্টি সরে যায় সিসিয়ামের দিকে। আয়োডিনের তেজস্ক্রিয়তা ৪ দিন পরে আর থাকে না (Half life)। অন্যদিকে সিসিয়ামের এই ভয়াবহ ক্ষমতা থাকে 30 বছরেরও বেশি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সব মিলিয়ে চেরনোবিলের ঘটনায় যে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তার হিসেবটি চমক লাগাবার মতই। কমপক্ষে 15 বিলিয়ান মার্কিন ডলারের সম্পদ এতে নষ্ট হয়। সব মিলিয়ে চেরনোবিল-বিস্ফোরণ সমস্ত মানবজাতির কাছেই এক দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকবে।

রিসাইক্লিং বা পুনরাবর্তন কাকে বলে?

আজকাল পরিবেশের আলোচনায় 'রিসাইক্লিং' কথাটা খুব শোনা যাচ্ছে। এর অর্থ পুনরাবর্তন। কিন্তু পুনরাবর্তন কাকে বলে?

আমাদের এই পৃথিবীতে রসদের (Resources) পরিমাণ নির্দিষ্ট। জীবন ধারণের জন্য এই পরিমিত রসদের চলে নিত্য ব্যবহার। আনো, ব্যবহার করো, প্রয়োজন মেটাও, আবার প্রয়োজন শেষে তা ফেলে দাও আবর্জনা (Wastes) হিসেবে।

এতকাল মানুষ আবর্জনা নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করে নি।

কিন্তু পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে যে হারে আবর্জনা জমা হচ্ছে, তাতে আর 'ওসব কিছু নয়' বলে এড়িয়ে চলা যায় না।

বলতে কি, আমাদের চারপাশে রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আবর্জনার স্তূপ পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। নাকে রুমাল চেপে কোনোক্রমে পাশ কাটাবার মত পরিসরও নেই এমন অবস্থা। অথচ একটা কিছু করাও তো দরকার। এই সমস্যা শুধু ভারতের নয়, সব দেশের। ফলে আবর্জনার রিসাইক্লিং-এর কথা ভাবা হচ্ছে। এতে আবর্জনার একটা সদ্‌গতিও যেমন হয়, তেমনই এর থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও তৈরি করা যায়।

[illegible]

ভারতে কি পরিমাণ আবর্জনা প্রত্যেক বছর তৈরি হয়, তা জানলে অবাক লাগে। হিসেবমত একজন ভারতীয় গড়পড়তা বছরে প্রায় পৌনে এক কেজি আবর্জনা তৈরি করে থাকে। সারা দেশে এইভাবে তৈরি হতে পারে 20 কোটি 40 লক্ষ টন আবর্জনা। এর সঙ্গে প্রায় 23 কোটি 70 লক্ষ গবাদি পশুর থেকে উৎপন্ন 105 কোটি টনের মত গোবরের হিসেবও ধরতে হবে। হিসেবটি 1985 সালের। সুতরাং এর মধ্যে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিসেবটিও পালটেছে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আবর্জনা সমস্যা কি ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের? ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে কি এই সমস্যা নেই? হ্যাঁ সেখানেও এই সমস্যা আছে, বরং সেখানে এই সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। আর্থিক সচ্ছলতা এবং সেই অনুপাতে বেশি পরিমাণে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারই এর কারণ বলে ধরা যেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। এই দেশে প্রায় 14 হাজার আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়েছে। সব সমেত 14 লক্ষ 76 হাজার একর পরিমাণ জায়গায় ময়লা আর আবর্জনা ফেলা হয়। তাতেও কিন্তু জায়গা কুলোয় না, আরো কয়েক শো নতুন আবর্জনা ফেলার জায়গা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের একটি শহরে কতটা আবর্জনা জমে, তারও হিসেব-নিকেশ আছে। নিউইয়র্ক শহরেই প্রতিদিন 27 হাজার টনের মত আবর্জনা জমা হয়।

আবর্জনা পুনরাবর্তনে শুধু পরিবেশই পরিচ্ছন্ন থাকে না, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশেও এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 1982 সালে ব্রাউন এবং শ' (Brown & Shaw) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, 'যে দেশ আবর্জনা ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রের পরিত্যক্ত অংশ থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করতে পারবে না, সেই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশও স্তিমিত হয়ে পড়বে।'

অল্প কিছু উদাহরণেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বক্সাইট (Bauxite) নামের খনিজ আকর থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটি আমরা পাই। অ্যালুমিনিয়ামের ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত জিনিসপত্র থেকেও নতুন ও পুনরায় ব্যবহারযোগ্য অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। প্রথম পদ্ধতিতে যতটা শক্তি খরচ হয়, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তার 96 শতাংশই বেঁচে যায়। একইভাবে তামার পুনরাবর্তনে 90 শতাংশ, ইস্পাতের ক্ষেত্রে 47 শতাংশ এবং কাঁচের ক্ষেত্রে 8 শতাংশ শক্তির সাশ্রয় হয়। কাগজের পুনরাবর্তন আবার শক্তির সাশ্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। এতে 23 শতাংশ শক্তিরও সাশ্রয় হয় আর এক টন কাগজ (নিউজপ্রিন্ট) তৈরি করতে যে এক টনের মত কাঠ কাঁচামাল হিসেবে লাগে, তাও বাঁচে। এর অর্থ অন্তত 12টি বড় গাছের জীবন।

রিসাইক্লিং-এর ক্ষেত্রে জাপানের সাফল্য সত্যিই চমকপ্রদ। 1974 সালে ওই দেশে আবর্জনার মাত্র 16 শতাংশ পুনরাবর্তন করা হত। 1978 সালে আবর্জনার 48 শতাংশই আবার কাজে লাগানো হয়েছে। 1980 সালে জাপানে 292 মেট্রিক টন শিল্পজাত আবর্জনার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে 124 মেট্রিক টন (43%) রিসাইক্লিং করা হয়। 1981 সালে ওদেশে 43 মেট্রিক টন জঞ্জালের 65% পুড়িয়ে ছাই করা হয়, 32% দিয়ে নীচু জমি ভরাট করা হয় এবং 3% ব্যবহার করা হয় পশুখাদ্য হিসেবে আর জৈবসার তৈরি করতে।

আবর্জনা থেকে কি সম্পদ তৈরি করা যায়?

রিসাইক্লিং কি পরিমাণে দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। জাপান এবং গ্রেট বৃটেন—দুই দেশই বাইরে থেকে প্রচুর ভোগ্যপণ্য আমদানী করতো। জাপান বিগত পঁচিশ বছর ধরে আবর্জনা এবং ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত অবশিষ্টাংশের রিসাইক্লিং করে আসছে। বৃটেন অন্যদিকে রিসাইক্লিং-এ তেমন গুরুত্ব

দেয়নি। এখনও বৃটেনে আবর্জনা ও পরিত্যক্ত অবশেষের 90 শতাংশই ফেলে দেওয়া হয়। বর্তমানে জাপানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গ্রেট বৃটেনের তুলনায় বহুগুণ দৃঢ়। জাপানের দেখাদেখি জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রিসাইক্লিং-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিস্তীর্ণ বনভূমি থাকা সত্ত্বেও সুইডেনে এখন ব্যবহৃত কাগজ থেকেই 'নিউজপ্রিন্ট' তৈরি করা হয়।

বিদেশে যখন রিসাইক্লিং নিয়ে রীতিমত আন্দোলন চলছে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে আমাদের দেশে এই ব্যাপারে কিছু হয়েছে কি না? স্বীকার করা ভাল, ভারতে রিসাইক্লিং নিয়ে চিন্তা-ভাবনা খুব বেশিদিনের নয়। এর জন্য যে আর্থিক সচ্ছলতা এবং প্রযুক্তির প্রয়োজন, তাতেও আমাদের দেশ কয়েক পা পিছিয়ে। তবে এই নিয়ে যে কিছু কাজ হয় নি, এমনও নয়। বর্তমানে এদেশে আবর্জনা থেকে সম্পদ উৎপাদনের তিনটি পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে, যেমন—

1. জৈবসার (Compost) উৎপাদন—বরোদা, জয়পুর এবং অন্য কয়েকটি স্থানের আবর্জনা থেকে সবুজ জৈব সার তৈরি করা হচ্ছে।

2. শক্তি উৎপাদন—ওখলা (Okhla), কেশবপুর এবং পাদ্রোনাতে (Padrona) গোবর এবং পয়ঃপ্রণালীর ময়লা থেকে জ্বালানি গ্যাস তৈরি করা হচ্ছে; এছাড়া দিল্লিতে আবর্জনা থেকে তাপশক্তি উৎপন্ন করার কাজ শুরু হয়েছে।

3. জমি ভরাট করা—ভারতে আবর্জনাকে এই কাজেই বেশি লাগানো হয়।

গবেষণালব্ধ ফল কাজে লাগিয়ে আবর্জনা থেকে মিথেন, অ্যালকোহল, হরমোন ইত্যাদি তৈরি করার কথাও ভাবা হচ্ছে।

কলকাতার পরিবেশ কতটা স্বাস্থ্যসম্মত?

কলকাতাকে ভালবাসি আমরা সবাই। এই মহানগরী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হলে খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা বিচলিত হই। ইদানিং কলকাতা মহানগরী মুমূর্ষু—এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। যাঁরা বলছেন, তাঁদের যুক্তি হল জনস্ফীতি ও পরিবেশ দূষণের চাপে এই শহরের নাভিশ্বাস উঠেছে। অনেকে আবার এমনও বলেছেন যে, ভারতের সবচেয়ে দূষিত শহরের নাম কলকাতা।

নগর কলকাতার বয়স তিনশো বছরের কিছু বেশি। 1690 সালে এই নগর পত্তনের পর প্রথমদিকে এর বৃদ্ধি যতটা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিকল্পিত ছিল পরে ততটাই অনিয়ন্ত্রিত এবং পরিকল্পনাহীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পরে ওপার বাংলা (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে আসা উদ্বাস্তু পরিবারকে স্থান দিতে গিয়ে কলকাতা বাড়তে থাকে প্রতিনিয়ত এবং অবশ্যই অনিয়মিতভাবে।

খুব বেশিদিন নয়, এই শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত কলকাতার নাম ছিল 'প্রাসাদ নগরী', কেউ বা বলতেন 'উদ্যান-নগরী'। অথচ 1956 সালে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' বা 'হু' (WHO) কলকাতাকে বললেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা শহর'। মাত্র 40-50 বছরের মধ্যে কলকাতার পরিবেশ এত বদলে গেল কেন? কেন কলকাতা হয়ে উঠলো এত ঘিঞ্জি, এত সমস্যাজর্জরিত?

কলকাতা কি সবচেয়ে দূষিত শহর?

পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এর জন্য জনস্ফীতিকেই দায়ী করেছেন। পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে 1971 সালের মধ্যে অন্ততপক্ষে 60 লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসেন। এদের মধ্যে 20 লক্ষ মানুষই আশ্রয় নেন কলকাতা অথবা শহরতলীতে। বর্তমানে কলকাতা পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল ও ঘিঞ্জি মহানগরগুলির অন্যতম।

পরিবেশ-বিজ্ঞানের একটি স্বীকৃত সত্য হল, পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী মানুষের কর্মকাণ্ড এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব (Population density)। কলকাতার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। এখন কলকাতার দূষণমাত্রা পৃথিবীর অন্যান্য মহানগরী—লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মেকসিকো অথবা টোকিওর সঙ্গে পাল্লা দেয়।

তবে কলকাতাকে পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত বা নোংরা শহর বলা যাবে কিনা, সেই ব্যাপারে কিছু বিতর্ক রয়েছে। বায়ুদূষণের কথাই ধরা যাক। বায়ুদূষক (Air pollutants) হিসেবে চিহ্নিত পদার্থগুলি হল : 1. বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা 2. কার্বন মনোক্সাইড 3. সালফার ডাই-অক্সাইড এবং 4. নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড।

কলকাতার বাতাসে এই বায়ুদূষণের পরিমাণ কতটা,

তার খবরও পাওয়া গেছে। 'ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট' (সংক্ষেপে NEERI) ভারতের নয়টি শহরের বাতাসে দূষণমাত্রা পরীক্ষা করেন। কোন কোন বায়ুদূষকের পরিমাণ মাপা হবে আর কিভাবে বা তা করা হবে সেটা ঠিক করে দেন 'হু'।

প্রথমেই আসা যাক ভাসমান ধূলিকণার কথায়। 'হু'-র দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, প্রতি বর্গমিটার বাতাসে 150 মিলিগ্রামের বেশি ধূলিকণা থাকলে তা বায়ুদূষণের আওতায় পড়বে। ভারতের প্রত্যেকটি বড় শহরের বাতাসেই ধূলিকণার পরিমাণ এই মাত্রার ওপরে। এমন-কি মাদ্রাজের মত পরিচ্ছন্ন শহরেও ধূলিকণা রয়েছে প্রতি বর্গমিটারে 155 মিলিগ্রাম। আর কলকাতা, দিল্লি এবং কানপুর তো ধূলি-ধূসরিত। ধূলিকণা অবশ্য ভারতের অন্য শহরের তুলনায় কলকাতার বাতাসেই বেশি। এই শহরের বাতাসে প্রত্যেক বর্গমিটারে ভেসে বেড়াচ্ছে 522 মিলিগ্রাম ধূলিকণা। কাছাকাছি রয়েছে দিল্লি—433 মিলিগ্রাম এবং কানপুর—432 মিলিগ্রাম।

কলকাতার মাটির চরিত্র, বায়ুর গতি এবং আবহাওয়ার অন্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই কলকাতার বাতাসে এত ধুলো—এটাই বিজ্ঞানীদের অভিমত।

অন্য বায়ুদূষকের ক্ষেত্রে কিন্তু কলকাতার অবস্থা ততটা খারাপ নয়। সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কলকাতার তুলনায় বোম্বাই শহরে বেশি। তেমনই দিল্লির বাতাসে রয়েছে বেশি পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড। বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে তৈল শোধনাগার এবং দিল্লিতে গড়ে ওঠা অসংখ্য ছোট-বড় কল-কারখানাকেই এর জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করেছেন পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা।

শুধু তো বায়ুদূষণ নয়, জল ও শব্দদূষণের কথাও এই প্রসঙ্গে চলে আসছে। এই শতকে ষাটের দশকেই 'হু' সর্তক করে দেয় যে, গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত সব উন্নতিশীল দেশেই জলদূষণ অনেক বেশি। ভারতেও এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, অ্যাসিড, ক্ষার থেকে শুরু করে সংক্রামক রোগের জীবাণু, পরজীবীর সিস্ট (Cysts) এবং ডিম—সবই দূষিত জলের মধ্যে পাওয়া যায়। কলকাতার জলেও আমাশা, উদরাময় (Diarrhoea) এবং ন্যাবা (Jaundice) অথবা হেপাটাইটিসের (Hepatitis) জীবাণু পাওয়া গেছে। পানীয় জলের সঙ্গে নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জল মিশে যাবার জন্যই এই সংক্রমণ ঘটে। তবে, দিল্লি, বাঙ্গালোর কিংবা হায়দ্রাবাদেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

স্বীকার করতেই হয়, কলকাতায় শব্দদূষণ মাত্রা (Noise Pollution) ভারতের অন্য বড় শহরের তুলনায় বেশি। দিনের কর্মব্যস্ত সময়টুকুতে দিল্লির শব্দদূষণ মাত্রা পৌঁছোয় 60 ডেসিবেলের কাছাকাছি (Decibels or dB ; শব্দের কম্পাংক মাপার একক)। বোম্বাইতে ওই মাত্রা 70 ডেসিবেলের সীমা ছোঁয় আর কলকাতায় কমবেশি 80 ডেসিবেল। তুলনায় মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর এমন-কি হায়দ্রাবাদও শান্ত। দক্ষিণের এই শহরগুলিতে শব্দদূষণ মাত্রা থাকে 60-65 ডেসিবেলের মধ্যে।

কলকাতা কেন এত কোলাহলমুখর?

চিকিৎসকদের মতে কলকাতার শব্দদূষণ মাত্রা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কলকাতাবাসীদের শারীরিক এবং মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন।

কলকাতা এত কোলাহল মুখর কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা দুটি কারণের কথা বলেছেন। প্রথমত, এই শহরে মোট রাস্তার পরিমাণ মাত্র ছয় শতাংশ। পৃথিবীর অন্য জনবহুল শহরের মোট রাস্তার পরিমাণ অন্ততপক্ষে 30 শতাংশ। একে তো রাস্তার অপ্রতুলতা, তারপর ফুটপাথ ও রাস্তার একাংশ জুড়ে বিকিকিনি চলায় কলকাতায় ট্রাফিক জ্যাম প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর সঙ্গে যানবাহনের বিপুল সংখ্যাটাও খেয়াল রাখতে হবে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে মোট যত মোটর গাড়ি আছে, তার 90 শতাংশই কলকাতার রাস্তায় চলাচল করে। বাস-ট্রাম, রিকসা আর ঠেলাগাড়ি—সব মিলিয়ে সংখ্যাটি 70 হাজার। এর সঙ্গে আছে 15 হাজার অটোরিকশা।

সরু, আঁকাবাঁকা, জনাকীর্ণ রাস্তায় যানবাহন আটকে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে হর্নের আর্তনাদ শব্দদূষণের প্রধান কারণ। এর সঙ্গে মিছিল, জনসভা অথবা পুজো কিংবা উৎসবের সময়ে বাজানো মাইক্রোফোন-লাউডস্পিকার,

শহরের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোটখাটো কল-কারখানাও বেশ খানিকটা দায়ী।

সব দিক বিচার করে কলকাতাকে ভারতের সবচেয়ে দূষিত-নোংরা শহর বলে চিহ্নিত করা উচিত হবে না। তবে জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত, সমস্যাজর্জর মহানগর বলতেই হবে।

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ কতটা নির্মল?

ঊনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতায় বেড়াতে আসা ইংরেজ ভ্রমণার্থীরা এই শহরের পরিবেশকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও মনোরম বলে রায় দিয়েছেন। ফ্যানি পার্কস্ তো এখানকার সবুজের সমারোহ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন কলকাতা ছিল খোলামেলা, সাজানো গোছানো, সুন্দর। কোনো কোনো ইংরেজ রাজপুরুষ তো স্বীকার করেছেন, সেই সময়কার কলকাতা সৌন্দর্যে টেক্কা দিত খোদ লণ্ডনকে। এখনও কি কলকাতা সে গর্ব করতে পারে? না, অবশ্যই নয়। সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হয়, এই শহরের পরিবেশ এখন আর ততটা নির্মল, স্বাস্থ্যসম্মত নেই।

বায়ু, জল এবং শব্দ— এই তিনটি প্রধান দূষণ বর্তমানে কলকাতার পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। এর সঙ্গে আবার কোনো অঞ্চলে রয়েছে জীবজন্তু এবং মানুষের পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থ (Waste products) থেকে বেরোনো দুর্গন্ধ। অপ্রতুল এবং নিয়মিত সংস্কারের অভাবে জীর্ণ অথবা বাতিল পয়ঃপ্রণালীর জন্যই এই অবস্থা। পরিবেশের গুণগত মান আর একটি শর্তের ওপরও নির্ভর করে। সেই শর্তটি হল জনবসতির ঘনত্ব। কলকাতা কত জনবহুল তা পরিসংখ্যানই বলে দেয়। উত্তর কলকাতার চারটি ওয়ার্ডে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করেন এক লক্ষ 75 হাজার মানুষ। উত্তর ও মধ্য কলকাতা এবং বড়বাজার অঞ্চলের আরো 35টি ওয়ার্ডের গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 80,000। উত্তর কলকাতার জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বলে জানা গেছে। তুলনায় দক্ষিণ কলকাতা এবং লাগোয়া শহরতলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশ কম।

কত মানুষ থাকেন কলকাতায়? জানা গেছে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষের ঠিকানা এই শহর। এর সঙ্গে রুজি-রোজগারের জন্য প্রত্যেকদিন মফঃস্বল থেকে কলকাতায় আসেন প্রায় 70 লক্ষ মানুষ।

বিভিন্ন ধরনের দূষণমাত্রা, জনবসতির ঘনত্ব, যানবাহন চলাচলের অনুপাত, খোলামেলা জায়গা (পার্ক, স্কোয়ার ইত্যাদি), কল-কারখানার প্রকৃতি ও সংখ্যা—সব কিছুর ওপরে নির্ভর করে বলে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশে বেশ তারতম্য দেখা যায়। কোনো অঞ্চলের পরিবেশ যেমন তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন ও বসবাসের পক্ষে যথেষ্ট ভাল, তেমনি অপর কিছু অঞ্চলের পরিবেশ আবার ঘিঞ্জি ও দূষিত।

পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা কলকাতার অঞ্চলগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে আলিপুর, নিউ-আলিপুর, সল্টলেক এবং লেকটাউন। এখানে পরিবেশ-দূষণের মাত্রা খুবই কম। কল-কারখানা না থাকায় এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট গাছপালা থাকার জন্য পরিবেশ নির্মল ও স্বাস্থ্যসম্মত।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে লেক গার্ডেন্স ও বালিগঞ্জ অঞ্চল। এখানকার পরিবেশের গুণগত মানও যথেষ্ট ভাল।

উত্তর কলকাতার জনসংখ্যার ঘনত্ব কি পৃথিবীর সর্বাধিক?

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত অঞ্চলগুলি হল এণ্টালি, পার্ক সার্কাস, মানিকতলা, ভি-আই-পি রোড ও গড়িয়া। এখানকার পরিবেশ একেবারে দূষণমুক্ত নয়, তবে দূষণমাত্রা মোটের ওপর সহ্যসীমার মধ্যে।

চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে এসপ্লানেড, বি-বা-দী বাগ, কসবা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, তারাতলা এবং হাইড রোড। এখানে পরিবেশ দূষণের মাত্রা যথেষ্ট। এসপ্লানেড এবং বি-বা-দী বাগ অঞ্চলের পরিবেশ কিন্তু দিন-রাতের সব সময়ে একই রকম থাকে না। দিনের কর্মব্যস্ত সময়ে এই অঞ্চলে বায়ু ও শব্দদূষণ বেড়ে যায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। অতিরিক্ত যানবাহন চলাচলই এর জন্য দায়ী। তারাতলা-হাইড রোডে রয়েছে ছোট-বড় অনেক কারখানা। দূষণের জন্য এই কারখানাগুলিকেই দায়ী করা হয়।

পঞ্চম শ্রেণীতে রয়েছে দমদম, কাশীপুর, শ্যামবাজার, বাগবাজার, শোভাবাজার, ভবানীপুর, বেহালা, টালিগঞ্জ,

খিদিরপুর ও ওয়াটগঞ্জ। এইসব অঞ্চলে দূষণমাত্রা সহ্যসীমার বেশ খানিকটা ওপরে।

ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত অঞ্চলে দূষণমাত্রা মাত্রাতিরিক্ত এবং উদ্বেগজনক। এই শ্রেণীতে পড়ছে শিয়ালদহ, বড়বাজার, বেলেঘাটা, ট্যাংরা, গার্ডেনরীচ ও পাহাড়পুর।

ভূপালে কী মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

কল-কারখানা থেকে বেরোনো কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড যে বায়ুদূষণ ঘটায় এবং তার থেকে নানা ধরনের রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়, একথা আমরা সবাই জানি। বায়ুদূষণ থেকে সরাসরি জীবনহানির ঘটনায় কিন্তু চমকে উঠতে হয়। এমনই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন ভূপালের (মধ্যপ্রদেশ) অধিবাসীরা। 1984 সালের 2 ডিসেম্বর মাঝরাতে ঘটা ওই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন দু' লক্ষ মানুষ।

ভূপাল শহরে অবস্থিত 'ইউনিয়ন কার্বাইড' নামের বিখ্যাত কোম্পানিটি এই ঘটনার জন্য দায়ী। ইউনিয়ন কার্বাইডের একটি 'পেস্টিসাইড্স' (Pesticides) বিভাগ রয়েছে যার কাজ কীটনাশক পদার্থ তৈরি করা। কীটনাশক তৈরিতে 'মিথাইল-আইসো-সায়ানেট' (Methyl-iso-cyanate), সংক্ষেপে 'মিক' (MIC) বলে, ব্যবহার করা হয়। মিক অত্যন্ত বিষাক্ত এক ধরনের গ্যাসীয় পদার্থ। এটি জলে খুব সহজেই শোষিত হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে মিক শরীরে ঢুকলে ফুসফুসের ভিতরের অ্যালভিয়োলাসগুলি (Alveolus —সূক্ষ্ম বায়ুথলি) ফুলে যায়। এর ফলে ফুসফুসের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। মিকের প্রভাবে চোখে ছানিও (Cataract) পড়ে।

দুর্ঘটনার রাতে ইউনিয়ন কার্বাইডের পেস্টিসাইড বিভাগ থেকে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য মিক গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসে। এর ফল হয় মারাত্মক। মারা পড়েন কমপক্ষে পাঁচ হাজার মানুষ। আরো প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভূপালবাসী প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি এবং সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের নানা অসুখ দেখা যায় তাঁদের মধ্যে। বেশ কিছু মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধও হয়ে যায়।

মিকের ক্ষতিকারক প্রভাব কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। ডিসেম্বরের মাস কয়েক পরে যেসব শিশু ভূমিষ্ঠ হল, তাদের মধ্যে বেঁচেছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। 1350টি শিশুর মধ্যে 16টি শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাল এবং 60টি জন্মাল অপুষ্ট দেহ নিয়ে। চিকিৎসকেরা ওইসব শিশুর মধ্যে খুঁজে পেলেন অনেকগুলি জন্মগত (Congenital) ত্রুটি, যার মধ্যে আছে হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক গঠন, হাত-পায়ের অস্বাভাবিকতা এবং ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি।

শুধু যে ভূপালের বাতাসই বিষময় হয়ে গিয়েছিল তা নয়, সেখানকার জলেও পড়েছিল মিকের সর্বনাশা প্রভাব। বিজ্ঞানীরা সেখানকার জলে খুঁজে পেলেন থায়োসায়ানেট (Thiocyanate)। এই দূষিত জল ব্যবহার করার জন্য থাইরয়েড গ্রন্থির (Thyroid Gland) কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলেও একাধিক অসুখ-বিসুখের আশংকা থাকে।

মিক-এর প্রভাব পড়েছিল সেখানকার গাছপালার ওপরেও। ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার চারপাশে মোটামুটি সাড়ে তিন বর্গ কিলোমিটারের মধ্যেকার গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সেই সময় থেকে একবছর ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে জন্মানো শাকসবজি, আম, পেঁপে, তেঁতুল, কুল ইত্যাদি ফল খাওয়া হয়নি।

বায়ুদূষণ কতটা ক্ষতিকারক?

খাবার এবং জলের মত বাতাস আমাদের বেঁচে থাকার জন্য দরকার। সত্যি বলতে কি দরকার আরো বেশি করে। একজন পূর্ণবয়স্ক স্বাস্থ্যবান মানুষ প্রতিদিন গড়ে বাইশ হাজার বার শ্বাস-প্রশ্বাস চালান। এর জন্যে তাঁর প্রয়োজন হয় 16 কেজি বাতাস। এই বাতাস অবশ্যই নির্মল ও দূষণমুক্ত হওয়া দরকার। নইলে জীবনদায়ী বাতাসের ভূমিকা বদলে গিয়ে নানা বিপত্তি তো ঘটতেই পারে, এমন কি মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

বায়ুদূষকের মধ্যে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণার কথাই ধরা যাক। এগুলির আয়তন সাধারণত 5 মাইক্রনের (1 মাইক্রন = 1/1000 মিলিমিটার) কম। প্রশ্বাসের সঙ্গে এই সূক্ষ্মকণা ঢুকে শ্বাসনালী ও ফুসফুসের বিভিন্ন অসুখ সৃষ্টি করে। অভ্র, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনির কাছাকাছি বাতাসে যেসব সূক্ষ্মকণা ভাসে সেগুলির প্রভাবে ফুসফুসের এক বিশেষ রোগ 'সিলিকোসিসের' (Silicosis) সূত্রপাত ঘটে। এছাড়া

মস্তিষ্ক ও যকৃতেরও ক্ষতি হয়। অ্যাসবেস্টস (Asbestos) কারখানার কাছাকাছি বাতাসে ওড়ে সূক্ষ্ম অ্যাসবেস্টস তন্তু। ফুসফুসের ক্যান্সার ঘটায় এই তন্তু।

সালফার ডাই-অক্সাইড বাতাসে জারিত (Oxidised) হয়ে তৈরি করে সালফার ট্রাই-অক্সাইড। এই দুটি গ্যাসই জলে গুলে গিয়ে তৈরি করে সালফিউরাস (Sulphurous) এবং সালফিউরিক (Sulphuric) অ্যাসিড। এই বিষাক্ত পদার্থগুলির প্রভাবে চোখ-নাক জ্বালা করা, চোখ দিয়ে জল পড়া, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের অসুখ, ব্রংকাইটিস (Bronchitis), হাঁপানি (Asthma) হয়।

কার্বন মনোক্সাইড সরাসরি রক্তের হিমোগ্লোবিনের (Haemoglobin) সঙ্গে যুক্ত হয়। হিমোগ্লোবিনের কাজ অক্সিজেন পরিবহণ। কার্বন মনোক্সাইড হিমোগ্লোবিনকে অকেজো করে দেয়। এর ফলে অক্সিজেনের অভাবে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কার্বন মনোক্সাইড স্নায়ুতন্ত্রটিকেও অবশ করে ফেলে।

নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide) এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বাতাসে অল্প পরিমাণে (15 পিপিএম; 1 পি-পিএম = দশ লক্ষ ভাগের একভাগ) থাকলে নাক এবং চোখ জ্বালা করে, চোখ থেকে জলও পড়ে। আবার নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বেশি (25 পিপিএম) থাকলে শ্বাসকষ্ট হয়।

আর একটি বিষাক্ত পদার্থ হাইড্রোজেন ফ্লুয়োরাইড (Hydrogen fluoride)। এটি মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফ্লুয়োরাইড হাড়ের মধ্যে জমা হয়। এর জন্য দেহের ওজন যেমন কমে, হাড়গুলিও ভঙ্গুর হয়ে যায়।

শহরাঞ্চলে আর একটি বায়ুদূষক দেখতে পাওয়া যায়। যানবাহনের থেকে পরিত্যক্ত কালো ধোঁয়ায় সূক্ষ্ম অজৈব সীসার চূর্ণ থাকে। শরীরের মধ্যে ঢুকে এটি বহু বিপত্তির সৃষ্টি করে। পাকস্থলী সমেত সম্পূর্ণ পরিপাকতন্ত্র, যকৃত ও বৃক্কের (Kidney) ক্ষতি হয়। শিশুদের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রটিরও অনিষ্ট করে।

বায়ুদূষণ কতটা সর্বনাশা হতে পারে?

বায়ুদূষণ যে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। মানুষ ছাড়া অন্য জীবজন্তু এবং গাছপালাও বায়ুদূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বায়ুদূষকের মধ্যে সালফার ডাই ও ট্রাই-অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড গাছপালার বিশেষ অনিষ্ট করে।

এমনিতে বায়ুদূষণের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ফুসফুস, শ্বাসনালী এবং চোখ-নাকের অসুখ সৃষ্টি হয়। সময়বিশেষে হৃৎপিণ্ড, যকৃত ও বৃক্কের কাজকর্মেরও ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু এর জন্য সরাসরি মৃত্যু ঘটা কিছুটা আশ্চর্যের বটে। এমন এক অস্বাভাবিক দুর্যোগ ঘটেছিল 1930 সালের ডিসেম্বরে বেলজিয়ামের 'মিউজ ভ্যালিতে' (Meuse Valley)। 24 কিলোমিটার লম্বা মিউজ ভ্যালিকে ঘিরে আছে 80 থেকে 120 মিটার উঁচু পাহাড়। উপত্যকাটিতে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি কল-কারখানা। ইস্পাত কারখানা, 'কোক-ওভেন', কাঁচের কারখানা, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির কারখানা, দস্তা গলানোর কারখানা, সার তৈরির কারখানা, বিদ্যুৎ তৈরির কেন্দ্র—সবই রয়েছে সেখানে।

উপত্যকাটির ভেতরে এমনিতে বায়ু চলাচলের প্রবাহ স্বচ্ছন্দ ছিল না। সব সময়েই সেখানে দূষিত বাতাস জমা হয়ে থাকতো। কল-কারখানার চিমনি থেকে বেরোনো কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড সেখানেই ঘুরপাক খেত। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতো সেখানে, উপত্যকার নীচের দিকে জমা হত গরম বাতাস, ওপরের স্তরে ঠাণ্ডা বাতাস। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে বলেন 'টেম্পারেচার ইনভারশান' (Temperature inversion)। এই ব্যতিক্রমী ঘটনায় গরম ও দূষিত বাতাস ওপরে উঠতে পারে না। এর ফলে নীচের বাতাস আরো বেশি দূষিত হয়ে পড়ে।

বায়ুদূষণ কি শুধু ভারতের সমস্যা?

মিউজ ভ্যালিতে তিনদিন ধরে অস্বাভাবিক আবহাওয়া চললো। অসম্ভব গরম আর গুমোটে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেখানকার বাসিন্দারা। গলা খুসখুস, শ্বাসকষ্ট, কাশি, বমি-বমি ভাব ইত্যাদি উপসর্গ দেখা গেল। মারা গেলেন 60 জন। মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে পাওয়া গেল সালফার ডাই ও ট্রাই-অক্সাইড। উপত্যকার বাতাসে যদিও ফ্লুয়োরাইড এবং দস্তার সূক্ষ্ম চূর্ণ পাওয়া গিয়েছিল, অল্প মাত্রায় থাকার

জন্য সেগুলি তত ক্ষতি করতে পারেনি।

মিউজ ভ্যালিতে বায়ুদূষণের জন্য এমন সর্বনাশা দুর্যোগের ঘটনা ঘটে প্রথম। তবে এটাই একমাত্র নজির নয়। একই ধরনের দুর্যোগের খবর পাওয়া গেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডোনোরা (Donora ; পেনসিলভানিয়ার অন্তর্ভুক্ত) থেকে 1948 সালে, লণ্ডন থেকে 1952 সালে, মেক্সিকোর পোজা রিকা (Poza Rica) থেকে 1950 সালে এবং টোকিও থেকে 1970 সালে।

জেনোরাতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল চারদিন। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পাঁচ হাজার অধিবাসী, মারা গিয়েছিলেন কুড়িজন। পোজা রিকায় 1950 সালের 24 নভেম্বর একটি তৈল শোধনাগার থেকে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড (Hydrogen sulphide) গ্যাস বেরিয়ে আসে। মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে ওই গ্যাসের প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন 320 জন, তার মধ্যে মারা যান 22 জন।

টোকিওতে দুর্ঘটনাটি ঘটে 1970 সালের 18 জুন। বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যাবার জন্য সেদিন টোকিওর আকাশে বিছিয়ে ছিল এক বিশেষ ধরনের ধোঁয়াশা। এর ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে 45টি শিশু। উপসর্গের মধ্যে ছিল চোখ-নাক জ্বালা করা ও শ্বাসকষ্ট। দু-এক দিনের মধ্যেই টোকিওর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছয় হাজার মানুষের অসুস্থতার খবর পাওয়া যায়।

বায়ুদূষণ সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করেছিল লণ্ডনে। 1952 সালে 5 থেকে 9 ডিসেম্বর লণ্ডন শহরের ওপরে জমা হয়েছিল কালো কুচকুচে কুয়াশার চাদর। অতিরিক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড বাতাসে জমা হওয়ার জন্যই ওইরকম কুয়াশার সৃষ্টি। ডিসেম্বরের ওই পাঁচদিনে মারা গিয়েছিলেন চার হাজার মানুষ।

বাড়ির মধ্যে পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?

বর্তমানে বাড়ির বাইরের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেছেন। বাড়ির মধ্যে পরিবেশকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার ওপরে কিন্তু তেমন জোর দেওয়া হয়নি। অথচ আমরা দিনের অনেকটা সময়ই বাড়ির মধ্যে কাটাই।

বাড়ির মধ্যে পরিবেশ তিনটি কারণে দূষিত হতে পারে। প্রথমত, রান্নার জন্য ব্যবহার করা জ্বালানি থেকে বেরোনো নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, কার্বন মনো ও ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ঝুল, সূক্ষ্ম কার্বন কণা ইত্যাদি রান্নাঘর এবং চারিপাশে জমা হয়। এখনও যাঁরা জ্বালানি হিসেবে কাঠ, কয়লা এবং ঘুঁটে ব্যবহার করেন, তাঁদের বাড়িতেই এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। লক্ষ্ণৌয়ের 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টক্সিকোলজি রিসার্চ সেণ্টার' (Industrial Toxicology Research Centre) এই বিষয়টি

বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরে বায়ুদূষণ কতটা?

নিয়ে বিশদ সমীক্ষা চালান। সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, কম আয়ের পরিবারগুলির রান্নাঘরে বায়ুদূষণের পরিমাণ বাইরের থেকে অনেকগুণ বেশি। আমাদের দেশে মহিলারা দিনের প্রায় 80 শতাংশ সময় বাড়ির ভেতরে কাটান এবং 4 থেকে 6 ঘণ্টা কাটান রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

বাড়ি ও অফিস তৈরির সময়ে কিছু ইমারতী সাজ-সরঞ্জাম ও তৈজসপত্র ব্যবহারের ফলেও পরিবেশ-দূষণ ঘটে। কয়েক ধরনের বোর্ড (Particle Board) এবং প্লাইউড (Plywood) তৈরিতে ফরম্যালডিহাইড (Formaldehyde) ব্যবহার করা হয়। তাপনিরোধক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড (Urea formaldehyde)। গরমের দিনে ফরম্যালডিহাইডের বাষ্প চুঁইয়ে বেরোতে থাকে। ঘরের মধ্যে থাকা অন্য বায়ুদূষকের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওই বাষ্প বিপত্তি ঘটায়। মাথাধরা, গা বমি-বমি করা, চোখ দিয়ে জল পড়া, শ্বাসনালী ও চামড়ায় জ্বালাজ্বালা ভাব, উদরাময় এবং হৃৎপিণ্ডের অসুখ—সব উপসর্গই দেখা গেছে এই মিশ্রিত বাষ্পের প্রতিক্রিয়ায়।

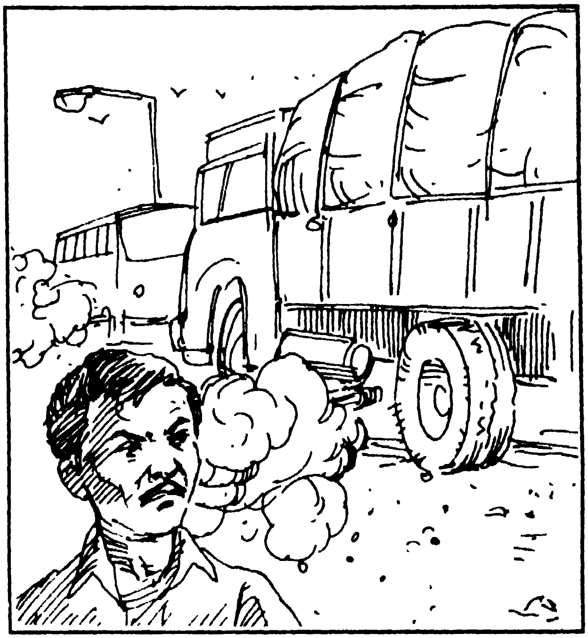
বাড়ির পরিবেশ বাইরে থেকে বাতাসে ভেসে আসা সূক্ষ্ম পরাগরেণুর জন্য দূষিত হতে পারে। এর প্রতিক্রিয়ায় হাঁপানি হতে দেখা যায়। বাড়ির মধ্যে বায়ুচলাচলের ভাল বন্দোবস্ত না থাকলে দূষণ স্বাভাবিকভাবেই বহুগুণ বেড়ে যায়।

দূষণমুক্ত পরিষ্কার বাতাস কাকে বলবো?

বাতাসে দূষক পদার্থ (Pollutants) না থাকলে তাকে

পরিষ্কার বলা যেতে পারে। মানুষের বসতি যেখানে আছে, সেখানকার বাতাসে কম-বেশি দূষণ দেখা যায়। কল-কারখানা বেশি থাকলে কোনো অঞ্চলে দূষণের মাত্রাও সেই অনুপাতে বেড়ে চলে। জানা গেছে, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বা অ্যান্টার্কটিকায় বায়ুদূষণ একেবারেই নেই।

পরিষ্কার বাতাসে কোন কোন গ্যাস কী পরিমাণে পাওয়া যাবে? হিসেবমত নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে 78.09 শতাংশ, অক্সিজেন 20.94 শতাংশ, আর্গন (Argon ; একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস) 0.93 শতাংশ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড 0.032 শতাংশ। এছাড়াও আছে নিওন (Neon) 18 পিপিএম (1 পিপিএম দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ), হিলিয়াম (Helium) 5.2 পিপিএম, মিথেন 1.3 পিপিএম, ক্রিপ্টন (Krypton) 1 পিপিএম, হাইড্রোজেন 0.5 পিপিএম, নাইট্রাস অক্সাইড 0.25 পিপিএম, কার্বন মনোক্সাইড 0.1 পিপিএম, ওজোন 0.02 পিপিএম, সালফার ডাই-অক্সাইড 0.001 পিপিএম, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড 0.001 পিপিএম।



যানবাহন থেকে বেরোনো কালো ধোঁয়া কতটা মারাত্মক?

বাস-মিনিবাস এবং লরি থেকে যে কালো ধোঁয়ার রাশি বেরোয়, তাতে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। পেট্রোল-ডিজেল পোড়া এই ধোঁয়ায় কী আছে? কতটাই বা ক্ষতি করে এই ধোঁয়া?

হিসেব অনুযায়ী ভারতে রয়েছে প্রায় সাড়ে সাতাশ লক্ষ যানবাহন এবং কুড়ি লক্ষ পেট্রোলচালিত মোটর বাইক, স্কুটার। প্রত্যেকদিন 800 থেকে 1000 টনের মত বায়ুদূষক ভারতের বড় শহরের বাতাসে যুক্ত হচ্ছে। বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে, যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় কার্বন মনোক্সাইডের মোট পরিমাণের অন্তত 70 শতাংশ, হাইড্রোকার্বনের 50 শতাংশ, সব ধরনের অক্সাইডের (সালফার ও নাইট্রোজেনের) 30 থেকে 40 শতাংশ এবং ভাসমান কণার 30 শতাংশ পরিবেশে উন্মুক্ত হয়। শুধুমাত্র দিল্লির রাস্তায় চলাচল করে সাড়ে আট লক্ষ যানবাহন আর কলকাতায় সাত লক্ষ। এর ফলস্বরূপ প্রত্যেকদিন দিল্লির পরিবেশে জমা হচ্ছে 325 টনের মত দূষক পদার্থ। কলকাতায় প্রত্যেকদিন পেট্রোল-ডিজেলের ধোঁয়ায় বেরোনো বায়ুদূষকগুলির হিসেবও জানা গেছে। মোটামুটিভাবে 99.84 টন কার্বন মনোক্সাইড, 59.81 টন হাইড্রোকার্বন, 50.55 টন নাইট্রোজেনের অক্সাইড, 3.78 টন সালফার ডাই-অক্সাইড এবং 3.64 টন ভাসমান ধূলিকণা পরিবেশকে দূষিত করে যাচ্ছে। বোম্বাই শহরে বছরে জমা হচ্ছে এক লক্ষ সাত হাজার টন কার্বন মনোক্সাইড এবং সাঁইত্রিশ হাজার টন হাইড্রোকার্বন।

[illegible]

এক হাজার লিটার পেট্রোল পুড়ে তার থেকে কতটা দূষিত পদার্থ বেরোয়? বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন এর থেকে 350 কেজি কার্বন মনোক্সাইড, 0.6 কেজি সালফার ডাই-অক্সাইড, 0.1 কেজি সীসা এবং 1.5 কেজি সূক্ষ্ম ভাসমান ধূলিকণার সৃষ্টি হয়। বাস, মিনিবাস এবং লরির মত যানবাহন পেট্রোলের বদলে ডিজেলে চলে। ডিজেলের পোড়া ধোঁয়ায় ক্ষতিকারক পদার্থের পরিমাণ পেট্রোলের ধোঁয়ার থেকে বেশ কয়েক গুণ বেশি। দু' এবং তিন চাকার গাড়িতে আবার পেট্রোল এবং মবিলের একটি মিশ্রণ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই জ্বালানিটি পুরোপুরি দাহিত হয় না। ফলে এক ধরনের নীলচে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যেও দূষক পদার্থ থাকে যথেষ্ট বেশি।

'ক্লোরোফ্লুয়োরো-কার্বন্‌স' (Chlorofluorocarbons) বা সি-এফ-সি (CFCs) নামে এক ধরনের গ্যাসীয় পদার্থ। এই পদার্থটি রেফ্রিজারেটার এবং এয়ার কুলার থেকে নির্গত হয়।

কাঠ, কয়লা কিংবা পেট্রোল-ডিজেলের মত জ্বালানি থেকে এবং জীবজন্তুর শরীর থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনেকটা অংশই সালোক-সংশ্লেষের সময়ে গাছপালা কাজে লাগিয়ে দেয়। হিসেব করে দেখা গেছে, শুধুমাত্র খনিজ জ্বালানি থেকেই প্রতি বছর 2.5×10^{11} টন কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবেশে যুক্ত হয়। অথচ এই বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড কাজে লাগাবার মত বনভূমি ক্রমশই কমছে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, নিরক্ষীয় আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া- পৃথিবীর সব অঞ্চলেই বনভূমি কমছে, প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। এই শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ভারতের অন্তত 20 শতাংশ বনভূমি ছিল, বর্তমানে খুব বেশি হলে 10 শতাংশ। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন প্রয়োজন 33 শতাংশ বনভূমি।

বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড কতটা বেড়েছে? হিসেব-মত গত তিরিশ বছরে অন্ততপক্ষে বারোগুণ বেড়েছে এর পরিমাণ। দ্বিগুণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়লে দেখা গেছে তাপমাত্রা 1.2 ডিগরি সেলসিয়াস বেড়ে যায়। কিন্তু এর সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তৈরি জলীয় বাষ্প আরো 0.7 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবেশে প্রায় একশো বছর অপরিবর্তিত থেকে যায়। কাজেই এর বিপদ সহজেই বোঝা যায়। মিথেন সেই তুলনায় অনেক কম স্থায়ী; মাত্র দশ বছর এটি অপরিবর্তিত থাকে। তাপশোষণ ক্ষমতা কিন্তু মিথেনের অনেক বেশি। কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় এটি প্রায় তিরিশ গুণ বেশি তাপশোষণের ক্ষমতা রাখে। পচা দূষিত জলা, ধানক্ষেত আর জীবজন্তুর মলমূত্র থেকে মিথেন উৎপন্ন হয়। এছাড়া তৈলকূপ, কয়লাখনি ও উইটিবি থেকে এবং জমি ভরাট করার সময়েও কিছুটা মিথেন তৈরি হয়।

নাইট্রাস অক্সাইডের তাপশোষণ ক্ষমতাও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্ষমতার তুলনায় বেশি। তবে এটি মাত্র 5 শতাংশ দূষণের জন্য দায়ী। সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং মাটির স্তর থেকেই নাইট্রাস অক্সাইড বেরোয় বলে জানা গেছে। তার সঙ্গে নাইট্রোজেন সারও (Fertilizers) কিছু ভূমিকা নেয়।

1990 সালে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে কোনটি কত পরিমাণে তাপ শোষণ করে, তার একটা সমীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে, কার্বন ডাই-অক্সাইড 61 শতাংশ, মিথেন 22 শতাংশ, ক্লোরোফ্লুয়োরোকার্বন 12 শতাংশ এবং নাইট্রাস অক্সাইড 5 শতাংশ তাপ শোষণের জন্য দায়ী।

আবহবিদ্‌ ও পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, প্রত্যেক শতকেই পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বেড়েছে। মোটামুটি 0.3 থেকে 0.6 ডিগরি সেলসিয়াসের মধ্যেই এতদিন এই উষ্ণতার বৃদ্ধিহার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মানুষের সৃষ্টিছাড়া কাজকর্মে যে হারে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে, তাতে তাঁদের আশংকা 2040 সালে পৃথিবীর তাপমাত্রা অন্তত 2 ডিগরি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে।

পৃথিবী উত্তপ্ত হলে কী ঘটবে? আবহবিদ্‌দের আশংকা, গোটা আবহচিত্রটাই আমূল পালটে যাবে। খরা দেখা দেবে পৃথিবী জুড়ে। এখন যেসব অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, বৃষ্টির অভাবে সেখানে দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ। বনজঙ্গল কমতে থাকবে, লুপ্ত হবে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। বৃষ্টিপাতের কোনো নিয়ম শৃঙ্খলাও থাকবে না। যেখানে-সেখানে এবং যে-কোনো সময়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে। গলে যাবে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ। ফলে প্রায় ২০ ফুট বেড়ে যাবে সমুদ্রের জলের সীমা, আর ডুবে যাবে সমুদ্রোপকূলের সব শহর, জনপদ।

ওজোন স্তর (Ozone layer) কি আমাদের রক্ষাকবচ?

ওজোন অক্সিজেনের পরিবর্তিত রূপ। এর অণুতে অক্সিজেন অণুর মত দুটি পরমাণুর বদলে তিনটি পরমাণু থাকে। পরিবেশে এই গ্যাসটি থাকে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে। সমুদ্রপৃষ্ঠে এর পরিমাণ থাকে 0.5 পিপিএম। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন ঋতুতে ওজোনের পরিমাণ 0.002 থেকে 0.07 পিপিএম হতে পারে। শীতকালের চেয়ে গরমকালেই পরিবেশে এর পরিমাণ কিছুটা বেড়ে যায়।

ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ওজোনের ঘনত্ব অতি নগণ্য হলেও ভূপৃষ্ঠ থেকে 25 কিলোমিটার ওপরে এর ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য। আসলে 10 কিলোমিটার উচ্চতা থেকেই খুব হালকা নীল রঙের ওজোন পরিমাণে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, 20 থেকে 25 কিলোমিটার উচ্চতায় এই ঘনত্ব হয় সর্বোচ্চ। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের (Stratosphere) সবচেয়ে নীচে অবস্থিত এই স্তরটিকে অনেক সময়ে ওজোনোস্ফিয়ার (Ozonosphere) বলা হয়।

ওজোন তৈরি হয় নাইট্রোজেন অথবা সালফার ডাই-অক্সাইড থেকে। অতিবেগনি রশ্মির (Ultraviolet rays) উপস্থিতি ওজোন তৈরির জন্য দরকার। খুব অল্প পরিমাণে থাকায় ওজোন কোনো বিপত্তি ঘটাতে পারে না। এর পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু নানা সমস্যার সূত্রপাত হয়। 0.3 পিপিএম পরিমাণ ওজোন পরিবেশে থাকলে নাক ও গলার মধ্যে অস্বস্তি শুরু হয়, পরিমাণ 1 থেকে 3 পিপিএম হলে এর প্রভাবে অবসাদ ও ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে এবং পরিমাণ 9 পিপিএমে এসে পৌঁছোলে ফুসফুসে শ্লেষ্মা ও দেহরস জমতে শুরু করে।

ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বেশি পরিমাণে থাকলে যে ওজোন জনজীবনে এত বিপর্যয় ঘটায়, সেই ওজোনই আবার আমাদের (বরং বলা ভাল সম্পূর্ণ জীবজগৎকে) রক্ষা করে। সূর্য থেকে আসা অতিবেগনি রশ্মির অধিকাংশই এই ওজোন-স্তর শুষে নেয়। যদি ওই রশ্মির সবটুকু ভূপৃষ্ঠে

[illegible]

এসে পৌঁছোত, তাহলে কী হত? এই প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি অ্যান্টার্কটিকার (দক্ষিণ মেরু) ওপরে ওজোন-স্তরে বিপর্যয় দেখা গেছে। ওই অঞ্চলের ওজোনোস্ফিয়ারে ওজোনের পরিমাণ অন্তত 40 শতাংশ কমে গেছে। ক্লোরোফ্লুয়োরোকার্বন এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন অত্যাধুনিক বিমান ও রকেট থেকে নির্গত গ্যাসীয় পদার্থগুলিকে এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে।

অবশ্য শুধু অ্যান্টার্কটিকা নয়, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার আকাশেও ওজোন-স্তরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। এর ফলে ওইসব দেশের অধিবাসীদের, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের, ত্বকের ক্যানসার (Skin cancer) এবং চোখের ছানি (Cataract) বেড়ে গেছে অন্তত পক্ষে 15 শতাংশ। কৃষ্ণাঙ্গদের চামড়ায় অতিরিক্ত কালচে-বাদামী রঞ্জক পদার্থ মেলানিন (Melanin) থাকে। এই রঞ্জকটিই অতিবেগনি রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে তাদের রক্ষা করে।

শব্দ (Noise) কি পরিবেশকে দূষিত করে?

প্রতিদিন অনবরত আমরা কত না বিচিত্র শব্দ-সম্ভারের সম্মুখীন হচ্ছি। যানবাহন, মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার অথবা কল-কারখানা থেকে বেরোচ্ছে শব্দরাশি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ঝরা পাতার মর্মরধ্বনি আছে কিংবা পাখির গানের কল-কাকলি। এর মধ্যে কোনো ধরনের শব্দে আমাদের কান, শরীর-মন জুড়িয়ে যায় আবার কোনো কোনো উচ্চগ্রামের শব্দে আমাদের বিরক্তি আসে আর অবসাদ দেখা দেয়। এই অপ্রয়োজনীয় উচ্চগ্রামের শব্দতরঙ্গকে কোলাহল (Noise) বলা যেতে পারে। মানুষ এবং অন্য জীবজন্তুর ওপরে কোলাহল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই একেও এক ধরনের পরিবেশ-দূষণ বলা হয়।

অন্য ধরনের দূষণের সঙ্গে শব্দদূষণের কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। শব্দ এক রকমের শক্তিবিশেষ। কোনো কিছুর কম্পন ছাড়া শব্দ সৃষ্টি হয় না। বাতাসের মধ্যে দিয়ে শব্দতরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। অন্য-দূষকের তুলনায় শব্দের স্থায়িত্ব খুবই কম। পরে পরিবেশে এর অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

শব্দ সাধারণত যে এককে মাপা হয়, তাকে বলা হয় 'ডেসিবেল' (Decibel)। স্যার আলফ্রেড বেল প্রবর্তিত শব্দ মাপার একক 'বেলের' এক-দশমাংশ এটি। সোজা কথায় বলতে গেলে দুটো শব্দের মধ্যে অন্তত এক ডেসিবেলের তফাত না থাকলে আমাদের কান তার পার্থক্যটুকু ধরতে পারে না। শব্দের তীব্রতা 10 ডেসিবেল বাড়লে সেটা দ্বিগুণ জোরে শোনাবে।

কত ডেসিবেল মাত্রার শব্দে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি? পরীক্ষায় দেখা গেছে, 50 থেকে 55 ডেসিবেল শব্দ আমাদের সহ্যসীমার মধ্যে। কত ডেসিবেল শব্দে আমাদের

অস্বস্তির শুরু হয়? এই প্রশ্নের কিন্তু এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দেখা গেছে, কিছু মানুষ 85 ডেসিবেল শব্দেই অস্থির হয়ে পড়েন আবার কেউ বা 115 ডেসিবেল পর্যন্ত বেমালুম সহ্য করে যান। তবে 120 ডেসিবেলের বেশি মাত্রার শব্দে কেউই আর স্থির থাকতে পারেন না। 1-10 ডেসিবেল শব্দকে শ্রুতিগ্রাহ্য (Audible), 11-30 ডেসিবেলকে খুব শান্ত, 31-50 ডেসিবেলকে শান্ত, 51-75 ডেসিবেলকে শব্দমুখর (Loud), 76-100 ডেসিবেলকে কোলাহল (Noisy), 101-125 ডেসিবেলকে অত্যন্ত কোলাহল প্রবণ (Very noisy) এবং 126-এর বেশি হলে যন্ত্রণাদায়ক (Painful) বলা হয়।

শব্দদূষণ কী ভাবে আমাদের ক্ষতি করে?

শব্দ মাত্রেই যে আমাদের দেহমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তা নয়। শব্দ কোন মাত্রায় অর্থাৎ কত ডেসিবেলের এবং কতক্ষণ তা সহ্য করতে হচ্ছে, তার ওপরে শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতি নির্ভর করে।

শব্দ থেকে শারীরিক ও মানসিক বিপত্তির হিসেবে যাবার আগে বিভিন্ন জায়গায় কী পরিমাণে শব্দ সৃষ্টি হয়, সেটা দেখে নেওয়া যাক। জানা গেছে, শান্ত বাগানে এবং রাত্রে ঘরের মধ্যে শব্দ হয় 30 ডেসিবেল, দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে 45 ডেসিবেল, বাজারের মধ্যে 60 ডেসিবেল, মেট্রোরেলের মধ্যে 75 ডেসিবেল, জেট প্লেনের মধ্যে 85 ডেসিবেল, লোহা ইস্পাতের কারখানার মধ্যে 100 ডেসিবেল এবং জেট ইঞ্জিনের কাছাকাছি 130-140 ডেসিবেল।

গবেষকরা জানিয়েছেন, শব্দের তীব্রতা দিনের বেলায় 45 ডেসিবেল এবং রাত্রিবেলায় 35 ডেসিবেলের মধ্যে থাকলে, বেশির ভাগ লোকের কাছেই তা আরামদায়ক মনে হয়। হাসপাতাল এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আবাসের কাছাকাছি শব্দের তীব্রতা এই সীমার মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। জনবসতির কাছাকাছি আর একটু উচ্চগ্রামের শব্দ পর্যন্ত সহ্যসীমার মধ্যে আসতে পারে। দিনের বেলায় এর তীব্রতা 45 ডেসিবেল এবং রাতে 55 ডেসিবেল পর্যন্ত মানুষ সহ্য করতে পারে। অফিস-কাছারিতে ওই সীমারেখা অবশ্য আর একটু ঊর্ধ্বমুখী হয়ে 60 ডেসিবেলের কাছাকাছি এবং শিল্পাঞ্চলে 65 ডেসিবেলে পৌঁছতে পারে। কিন্তু আট-নয় ঘণ্টা কাজ করার পর বাড়ি ফিরে মানুষের স্নায়ু এবং শরীরের বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির (Endocrine glands) সুস্থতা বজায় রাখতে বিশ্রামের জায়গায় মনোরম ও অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশ থাকা দরকার।

ভারতের মহানগরগুলিতে শব্দদূষণের সাম্প্রতিক চিত্রটি কেমন? 'ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট', 'সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইন্সটিটিউট' (Central Road Research Institute or CRRI) ইত্যাদি সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী চিত্রটি খুব সুখকর নয়। দিল্লিতে জনবসতি এলাকায় শব্দ হয় 60 ডেসিবেল, বোম্বাইতে 70-75 ডেসিবেল আর কলকাতায় 80 ডেসিবেল। মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর এবং হায়দ্রাবাদে শব্দ হয় 65 ডেসিবেলের কাছাকাছি।

সহ্যসীমার (Tolerance limit) ওপরে শব্দ আমাদের শরীর মনে কী ধরনের বিপত্তি আনে, সেটা এবার দেখা যাক। উচ্চ কম্পনাঙ্কের শব্দ প্রধানত আমাদের রক্ত সংবহনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, এবং সংবেদ অঙ্গের (Sense organs) ওপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শব্দের তীব্রতা 100 ডেসিবেলের কাছাকাছি গেলেই নাড়ির গতি

কত জোর শব্দ আমরা সহ্য করতে পারি?

(Pulse rate) বেড়ে যায়, 110 ডেসিবেলের ওপরে গেলে ত্বকের সূক্ষ্ম সংবেদকোষগুলির (Receptor cells) কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে এবং 120 ডেসিবেলে কানে তালা লেগে যায় ও কারো কারো ক্ষেত্রে কানে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। শব্দতরঙ্গের তীব্রতা যদি 130-135 ডেসিবেলে পৌঁছোয় তাহলে অবসাদ এবং গা বমি-বমির মত উপসর্গ দেখা দেয়। একই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয় এবং স্পর্শানুভূতিও (Touch sensation) লোপ পেতে পারে। গবেষকরা দেখেছেন, অধিকাংশ মানুষই 140 ডেসিবেলের বেশি মাত্রার শব্দে অস্থির হয়ে পড়েন; কানে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে এবং বেশিক্ষণ ওই অবস্থায় থাকলে মানসিক ভারসাম্য (Mental balance) হারানোর আশংকাও থাকে। আর যদি শব্দদূষণের মাত্রা আরো বাড়ে? জানা গেছে 160 ডেসিবেলে মস্তিষ্ক সমেত স্নায়ুতন্ত্রটি জখম হয়ে যায় এবং

শব্দের তীব্রতা 190 ডেসিবেলে পৌঁছোলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে সেটা আর কোনোদিনই সারে না।

শব্দদূষণের কুফল সম্পর্কে আমাদের দেশে বিশেষ ও বিশদ গবেষণা হয়নি। এখন পর্যন্ত যে কটি গবেষণা ও সমীক্ষার ফল জানা গেছে, সেগুলি বিদেশের মাটিতে করা। রাশিয়ার যেসব কারখানার শ্রমিকদের দীর্ঘদিন শব্দদূষণ সহ্য করতে হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের (Hypertension) প্রবণতা অন্তত দ্বিগুণ এবং পাকস্থলীর ক্ষত বা পেপটিক আলসার (Peptic ulcer) হবার আশঙ্কা অন্তত চারগুণ বেশি বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিউ ইয়র্কের নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্যামুয়েল রোজেন (Samuel

শব্দদূষণের জন্য কি স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়?

Rosen) জানিয়েছেন, আফ্রিকার কোনো 75 বছর বয়স্ক অধিবাসীর তুলনায় যে কোনো 25 বছরের আমেরিকান যুবক-যুবতী কানে কম শোনে। কারণ হিসেবে ডাঃ রোজেন বলেছেন, অতিরিক্ত শব্দদূষণের জন্যই আমেরিকায় বধিরতা বাড়ছে। আমাদের দেশেও দেওয়ালির রাতে কত মানুষ যে কানের পর্দা ফেটে বধির হয়ে যান, তার ইয়ত্তা নেই।

শব্দদূষণ যে মানসিক ভারসাম্যেও আঘাত হানে, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। ইংরেজ মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ কন হেরিজ (Cohn Heridge) দেখেছেন, হিথ্রো বিমান বন্দরের কাছাকাছি লণ্ডনবাসীদের মধ্যে মানসিক রোগ বেশি হয়। ডাঃ হেরিজ শব্দদূষণকেই এর জন্য দায়ী করেছেন।

খুব বেশি এবং উচ্চগ্রামের শব্দ না হ'য়ে যদি একটু কম মাত্রার শব্দদূষণ দীর্ঘক্ষণ সহ্য করতে হয়, তাহলেও কিন্তু কিছু বিপত্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়। পালাম (দিল্লির) বিমান বন্দরের কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসীদের কথাই ধরা যাক। প্রায় 50 শতাংশ মানুষের অভিযোগ, বিমান বন্দর থেকে ভেসে আসা আওয়াজে তাঁরা রাত্রে ভাল ঘুমোতে পারেন না। এবং 22 শতাংশ মোটেই ঘুমোতে পারেন না। এর ফলে সকালে তাঁরা ক্লান্তি এবং অবসাদ অনুভব করেন। এঁদের স্মৃতিশক্তি এবং কর্মক্ষমতা ক্রমশই কমতে থাকে।

শব্দদূষণের কুফল কিন্তু এখানেই থেমে থাকে না। মাতৃগর্ভে থাকা শিশুদের পক্ষেও হঠাৎ তীব্র আওয়াজ (100 থেকে 110 ডেসিবেল) মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এতে শিশুর হৃদ্‌স্পন্দন হার (Heart beat) অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যায়। স্নায়ুতন্ত্রের গঠনেও অস্বাভাবিকতা দেখা যেতে পারে।

কেমন জল পান করবো?

জল আমাদের খেতেই হয়। জল ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। জীবকোষের মধ্যে থাকা যে প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ধারক বলা হয়, তার 90 শতাংশ জল। জল না পেলে যেমন জীবনহানির আশংকা থাকে, দূষিত জল পান করলেও তেমনই প্রাণ নিয়ে টানাটানির ভয় থাকে। কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস (Hepatitis) আন্ত্রিক বা সিগেলোসিস—এগুলি সবই জলবাহিত রোগ। দূষিত জলের মধ্যে থাকা এই সব রোগের জীবাণুই মহামারী ঘটিয়ে থাকে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, কেমন জল পান করা উচিত?

সত্যি বলতে কি, পানীয় জলের হাহাকার পৃথিবী জুড়েই। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জলের সমস্যা প্রকট। আমাদের ভারতও আছে এর মধ্যে। পানীয় জল অবশ্যই বিশুদ্ধ ও দূষক বর্জিত হওয়া দরকার। সব দিক থেকে পাতিত জল (Distilled water) বিশুদ্ধ কিন্তু সেই জল বিস্বাদ আর তা পান করার কথাও চিন্তা করা যায়

[illegible]

না। যে জল আমরা সাধারণত পান করে থাকি তাতে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে কিছু রাসায়নিক পদার্থ এবং জীবাণু মিশে থাকে। এই কারণেই যেসব অঞ্চলে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জল ফুটিয়ে, ঠাণ্ডা করে তবে তা পান করার কথা বলা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation) বা 'হু' পানীয় জলের গুণগত বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত, তা ঠিক করে দিয়েছেন। ওই সংস্থার বিশেষজ্ঞদের মতে পানীয় জলে দশ কোটি ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পর্যন্ত আর্সেনিক

(Arsenic), ক্রোমিয়াম (Cromium) এবং সায়ানাইড (Cyanide) থাকতে পারে। ফেনল (Phenol) ও পারদের পরিমাণ দশ কোটি ভাগে 5 ভাগ এবং সীসা এক কোটি ভাগে এক ভাগ পর্যন্ত থাকতে পারে। অন্য কিছু পদার্থ আর একটু বেশি থাকলেও তেমন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এর মধ্যে পড়ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium Carbonate) দশ লক্ষ ভাগে ছয়শো ভাগ, ম্যাগনেশিয়াম (Magnesium) দেড়শো ভাগ, লোহা এক ভাগ, তামা দেড় ভাগ এবং মাঙ্গানিজ (Manganese) কুড়ি লক্ষ ভাগে এক ভাগ। দশ লক্ষ ভাগ পানীয় জলে ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ এক হাজার ভাগ, সালফেটের ক্ষেত্রে চারশো ভাগ এবং ফ্লুয়োরাইডের (Fluorides) ক্ষেত্রে দেড় ভাগ; নাইট্রেট ও দস্তা (Zinc) থাকতে পারে পঁয়তাল্লিশ ও দেড় ভাগ পর্যন্ত।

'হু'-এর বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পানীয় জলে কোনো ধরনের জীবাণু না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আর যদি কোনো প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া এর মধ্যে থেকে যায়, তাহলে প্রতি একশো মিলিলিটার জলে যেন তার সংখ্যা দশের বেশি না হয়।

জল কী ভাবে দূষিত হয়?

জলে অনেক ধরনের দূষক পদার্থই (Pollutants) থাকা সম্ভব। এর মধ্যে অজৈব দূষকগুলি আর্সেনিক, পারদ, সীসা, দস্তার মত ধাতব পদার্থ অথবা অ্যাসিড বা ক্ষার জাতীয় (Alkalies) পদার্থ হতে পারে। জৈব দূষকের মধ্যে আছে জীবজন্তুর মলমূত্র, মৃতদেহ, পচা পাতা ইত্যাদি।

জানা গেছে, প্রধানত চারভাবে জলদূষণ ঘটে। প্রথমত, ঘর-গৃহস্থালী (Domestic) থেকে নির্গত আবর্জনায় কিছু মাত্রায় দূষণ ঘটে থাকে। এর মধ্যে জৈব ও অজৈব—এই দু' ধরনের দূষক পদার্থই থাকতে পারে। কাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত 'ডিটারজেন্ট' (Detergent) পাউডার এর মধ্যে একটি পদার্থ। এর প্রভাবে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় জলদূষণ ঘটে থাকে।

জলদূষণের দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বড় উৎস হল শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ (Industrial effluents)। ভারতের 15টি বড় নদ-নদীর সব কটিই অ্যাসিড, ক্ষার ও বিভিন্ন ভারী ধাতুর মত দূষক পদার্থে পরিপূর্ণ। এর সঙ্গে কাগজ, দুগ্ধ শিল্প (Dairy) এবং ঘর-গৃহস্থালী থেকে নির্গত জৈব আবর্জনাও দেখা যায়। কল-কারখানার কাছাকাছি নদী, খাল-বিল কিংবা হ্রদের জলে পাওয়া গেছে তামা, দস্তা, সীসা, পারদ, ডিটারজেন্ট, পেট্রোলিয়ামের উপজাত পদার্থ, ফেনল, কার্বনেট, আর্সেনিক, সায়ানাইড, ক্লোরিন, অ্যালকোহল, বিভিন্ন অ্যাসিড এবং ক্ষার। মাদ্রাজে শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে কুউম নদী (The Cooum)। এই নদীর এক লিটার জলে পাওয়া গেছে 1313 মিলিগ্রাম নিকেল, 900 মিলিগ্রাম লোহা, 275 মিলিগ্রাম সীসা এবং 32 মিলিগ্রাম দস্তা। ফসফেট, সালফেট, সিলিকেট এবং নাইট্রেটের মাত্রাও কুউমের জলে অত্যধিক।

জলদূষণের তৃতীয় উৎস ক্ষেত-খামার থেকে নির্গত সেচের জল। এতে থাকে মাটি, ক্ষেত-খামারে ব্যবহৃত সার ও কীট-নাশক (Insecticides) এবং খামারে প্রতিপালিত জীবজন্তুর বর্জ্য পদার্থ (Excreta)।

চতুর্থ কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ জলদূষণের উৎস হল সমুদ্র ও নদীর জলযান। স্টিমার, মোটরবোট এবং জাহাজ থেকে নির্গত আবর্জনার সঙ্গে থাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তেল। বর্তমানে ভারতে আছে দেড় কোটির মত ছোট-বড় জলযান। এগুলি থেকে কত দূষিত পদার্থ নদী ও সমুদ্রে পড়ছে? হিসেব করে দেখা গেছে, কুড়ি লক্ষ জনসংখ্যা-বিশিষ্ট একটি শহর থেকে যতটা পরিমাণ দূষক বেরোতে পারে, ঠিক ততটাই।

জলদূষণের বিপদ কোথায়?

বিশদ আলোচনার দরকার নেই, জলদূষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা থেকেই যায়। অ্যাসিড এবং ক্ষার জলে মিশলে সেগুলির প্রভাবে জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী মারা পড়ে। বিহারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত শোন নদীর (Sone) জলে ক্লোরিনের পরিমাণ অসম্ভব বেশি। উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুরে গড়ে ওঠা একাধিক কল-কারখানাই এর জন্য দায়ী। শোনে এই অতিরিক্ত ক্লোরিনের প্রভাবে মাছও মরে অগুণতি। অনেক সময়ে দূষক পদার্থ সরাসরি জলচর প্রাণীকে মারে না কিন্তু তাদের যকৃত, বৃক্ক (Kidneys) এবং স্নায়ুতন্ত্রটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

জলে যেসব ভারী ধাতু পাওয়া যায় সেগুলির প্রত্যেকটিই ক্ষতিকারক। পারদ শরীরে ঢুকলে বুক-পিঠে ব্যথা, মাথাধরা, উদরাময় (Diarrhoea) এবং রক্তকোষ ফেটে (Haemolysis) যাবার মত উপসর্গের সৃস্টি করে। সীসার প্রভাবে দেখা দেয় রক্তাল্পতা (Anemia), বমি-বমি ভাব, তড়কা (Convulsion); যকৃত এবং বৃক্কও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[illegible]

আর্সেনিক সৃষ্টি করে ফুসফুসের ক্যানসার, চামড়ায় ক্ষত, পাকস্থলী ও অন্ত্রে ক্ষত (Ulcer), রক্তচলাচলে ব্যাঘাত, মানসিক ব্যাধি এবং বৃক্কের ক্ষতি। ক্যাডমিয়ামের (Cadmium) জন্য দেখা দেয় উদরাময়, রক্তাল্পতা, হাড়ের ব্যাধি, যকৃত, বৃক্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি। তামার প্রভাবে রক্তচাপ বাড়ে, ঘন ঘন জ্বর হয়, ইউরেমিয়াও (Uremia) দেখা দেয়। বেরিয়াম (Barium) আবার বমি, উদরাময়, পেটে ব্যথা, এমন কি পক্ষাঘাতেরও কারণ। দস্তা বৃক্কটিকে নষ্ট করে আর মাংসপেশিতে সংকোচন ঘটায়। সেলেনিয়াম যকৃত, বৃক্ক ও প্লীহার (Spleen) ক্ষতি করে, অন্ধত্বও হতে পারে। তা ছাড়া সময়বিশেষে মৃত্যুও ঘটায়।

দূষিত জলে একাধিক ব্যাকটেরিয়াও থাকে। এগুলি থেকে কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস অথবা আন্ত্রিকের মত রোগ ছড়ায়। এইসব অসুখ যে মাঝে মাঝেই মহামারীর চেহারা নেয়, তার পিছনেও জলদূষণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

জলদূষণ পরোক্ষভাবেও কিছু স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয়। জমা জলে মশা ডিম পাড়ে এবং তাদের লার্ভা ও পিউপা (Pupa) বা মূককীট জলের মধ্যেই জন্মায়। ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিবার (Yellow fever) বা পীতজ্বর, এনকেফালাইটিস (Encephalitis) ইত্যাদি রোগের জীবাণু বিভিন্ন জাতের মশাই বহন করে থাকে।

গঙ্গার জল কতটা বিশুদ্ধ?

আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের ধারণা, গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণা-কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র-গোদাবরীর মত নদ-নদীর জল পবিত্র ও বিশুদ্ধ। পুজো-আর্চা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই নদীর জল (বিশেষত গঙ্গার জল) না হলে চলে না। এককালে এই নদীগুলির জল সত্যিই নির্মল ও পানযোগ্য ছিল। মুঘল বাদশাহ আকবর গঙ্গার জলই ছেঁকে নিয়ে পান করতেন—এই তথ্য পাওয়া গেছে ইতিহাসের পাতায়। এখনও কি ভারতের নদ-নদীর জল সেই রকম বিশুদ্ধ আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়, মোটেই না। এই নদ-নদীর জল পান করা তো দূরের কথা, এতে স্নান করলেও অসুখ-বিসুখের আশংকা থাকে। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত 15টি নদ-নদীর জল নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছিল। দেখা গেছে, সবকটি নদ-নদীর জলই মাত্রাতিরিক্ত দূষণ-জর্জরিত। গঙ্গা-যমুনা থেকে শুরু করে কাবেরী-গোদাবরী পর্যন্ত কোনো নদীর অবস্থাই ভাল নয়।

সমীক্ষার অন্তর্গত 15টি নদ-নদীর মধ্যে দামোদর নদকে সবচেয়ে বেশি দূষিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরেই আসছে বরোদার কাছে প্রবাহিত মিনি-মাহীর (Mini-Mahi) নাম। মাদ্রাজের কুউম (Cooum) নদীর জল এখন এত দূষিত হয়ে গেছে যে, সেখানে বহু খোঁজাখুঁজি করেও মাছ অথবা অন্য জলচর জীবের সন্ধান পাওয়া যায় না।

গঙ্গার অবস্থা কি? হরিদ্বার থেকে কলকাতা, এই দীর্ঘপথে গঙ্গায় বিপুল পরিমাণে যত বিচিত্র ধরনের আবর্জনা এসে পড়ে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এর জলে কল-কারখানা থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ, জীবজন্তুর মৃতদেহ, পয়ঃপ্রণালীর (Sewage) ময়লা, শ্মশান ঘাট থেকে ছুঁড়ে ফেলা আধপোড়া মৃতদেহ, কীটনাশক—সবই পাওয়া যায়। গঙ্গার তীরে রয়েছে 312টি ছোট-বড় শিল্প। এর সবগুলিই দিনরাত গঙ্গায় উজাড় করে দেয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। তীরবর্তী 27টি শহর থেকেও প্রতিদিন প্রায় 90 কোটি লিটারেরও বেশি ময়লা জল পয়ঃপ্রণালীগুলির মধ্যে দিয়ে গঙ্গায় পড়ে। সমীক্ষায় জানা গেছে, গঙ্গার দূষণ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন 25 কোটি মানুষ।

সমুদ্র কীভাবে দূষিত হচ্ছে?

ভূপৃষ্ঠের প্রায় 71 শতাংশ সমুদ্রের অধিকারে। মোটামুটি 1.37×10^{30} লিটার জল আছে সমুদ্রে। বহুদিন ধরেই মানুষ সমুদ্রকে যত কিছু আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে

বেছে নিয়েছিল। সব দেশই নিজের ভূখণ্ডটুকু পরিষ্কার রাখতে আবর্জনার স্তূপকে সমুদ্রে জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতো। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের অন্য অঞ্চলের মত সমুদ্রও হয়ে উঠেছে দূষিত। হিসেবমত প্রত্যেক বছর বিভিন্ন নদ-নদী থেকে 2×10^{14} মেট্রিক টন জল সমুদ্রে মেশে। এই জলরাশির সঙ্গে সমুদ্রে এসে পড়ে 4.05×10^{11} মেট্রিক টন দ্রবীভূত দূষিত পদার্থ।

এই দূষিত পদার্থগুলির মধ্যে আছে আবর্জনা, পয়ঃপ্রণালীর ময়লা, ক্ষেত-খামার থেকে আসা বর্জ্য পদার্থ (Wastes), কীটনাশক, ভারী ধাতু, পেট্রোলিয়াম এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Radioactive materials)। ইদানীং আবার সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসপত্র। এই পদার্থগুলির মধ্যে সবকটিই কমবেশি ক্ষতিকারক।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে স্ট্রনসিয়াম (Strontium), সেসিয়াম (Cesium) এবং অন্য কিছু রাসায়নিকও পাওয়া যায়। যেটুকু তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়, তার মোট পরিমাণ বেশ কমই থাকে। বড় জোর এর ঘনত্ব 0.1 শতাংশে পৌঁছোয় বলে তেমন ব্যাপক ক্ষতির কথা জানা যায়নি। তবে সমুদ্রগর্ভে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ফেলে দেবার ঝোঁকটি যদি থেকেই যায়, সেক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে সামুদ্রিক জীবের ওপরে তার প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ হবে। বর্তমানে তেজস্ক্রিয় জীববিজ্ঞানে (Radiation Biology) একটি পরীক্ষিত সত্য হল, তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে জীবকোষের আমূল পরিবর্তন। এতে জীবকোষের মধ্যে 'ক্রোমোজোম' (Chromosome) ও জীনের (Gene) মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। কখনও বা বংশগতির জন্য প্রয়োজনীয় এই বস্তুগুলি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ তখন স্বাভাবিকভাবেই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে সামুদ্রিক জীবের কোনো প্রজাতি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হতে পারে অথবা 'মিউটেশানের' (Mutation) ফলে বদলে যেতে পারে।

সমুদ্রদূষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসপত্র এবং পেট্রোলিয়াম। প্লাস্টিকের কথাই ধরা যাক। সমুদ্রগামী জলযান থেকে প্রতিদিন অসংখ্য প্লাস্টিকের মোড়ক আর থলি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। পৃথিবীতে প্রায় 280 প্রজাতির সামুদ্রিক পাখি আছে, যাদের খাদ্য সামুদ্রিক মাছ ও অন্য প্রাণী। এদের মধ্যে অন্তত 40 প্রজাতির পাখি ভুলক্রমে প্লাস্টিকের মোড়ক খেয়ে ফেলে। পাখির পাকস্থলীতে প্লাস্টিক হজম হয় না বরং তা একাধিক বিপত্তির সৃষ্টি করে। পাকস্থলীর ভেতরে জায়গা যেমন এর জন্য কমে যায়, তেমনি হজমেরও ব্যাঘাত ঘটে, পাকস্থলীর দেওয়ালে ক্ষত (Ulcer) হতে দেখা যায়।

এক ধরনের প্লাস্টিক তৈরির সময়ে 'পি-সি-বি' (PCB) নামের একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণ প্লাস্টিকের থেকেও বেশি ক্ষতিকারক। রাসায়নিক পদার্থটির প্রভাবে সামুদ্রিক পাখির ডিমের খোলা পাতলা হয়ে যায়। ফলে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে পারে না, তা দেবার সময়েই ডিমগুলি ফেটে যায়। এছাড়া 'পি-সি-বি' সামুদ্রিক জীবের দেহকলাগুলিকেও ধ্বংস করে।

সামুদ্রিক কাছিমের খাদ্য জেলিফিশ (Jelly Fish)। অনেক সময়ে কাছিম ভুল করে জেলিফিশের বদলে প্লাস্টিকের মোড়কও খেয়ে ফেলে এবং পাখিদের মত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

সমুদ্রে খনিজ তেল পড়লে কি হয়?

সমুদ্রদূষণের সবচেয়ে বড় কারণ পেট্রোল ও পেট্রোল-উপজাত পদার্থ। অনেক সময়ে তেলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়ে। তখন সমুদ্রে ছড়িয়ে যায় হাজার হাজার লিটার পেট্রোল। কখনও বা জাহাজ থেকে পেট্রোলজাত পদার্থ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। যে ভাবেই সমুদ্রে তেল পড়ুক, এতে সমুদ্রের পরিবেশটি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। তেল যেহেতু জলের সঙ্গে মেশে না, একটি পাতলা তেলের আস্তরণ জলের ওপরতলে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাবে সামুদ্রিক পরিবেশতন্ত্রের (Marine Ecosystem) উৎপাদক ফাইটোপ্লাংকটন (Phytoplankton) বা শেওলার দল মরে যায়। সূর্যের আলোতে এই কোটি কোটি আণুবীক্ষণিক শেওলার দলই সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাবার তৈরি করে থাকে। ছোট-বড়, সব সামুদ্রিক প্রাণীই তাদের খাবার পায় এই শেওলা থেকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। ফাইটোপ্লাংকটন ধ্বংস হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় সমুদ্রের খাদ্য শৃঙ্খল (Food chain)। এর ফলে আণুবীক্ষণিক প্রাণী (জু-প্লাংকটন বলা হয়) থেকে শুরু করে অগণিত প্রজাতির মাছ, চিংড়ি-কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক, অক্টোপাস অথবা তিমি

বা শুশুকের মত বিশালকায় প্রাণীর মৃত্যুও ঘনিয়ে আসে।

সমুদ্রের ওপরে তেলের স্তর সূর্যের আলোকে গভীরে প্রবেশ করতে দেয় না। প্রবালের (Corals) মত কিছু সামুদ্রিক প্রাণী আবার আলো ছাড়া বাঁচে না। তাই তেলদূষণে প্রবালপুঞ্জের বিপদও ঘনিয়ে আসে। এক কথায় বিস্তীর্ণ সমুদ্রর বিভিন্ন অঞ্চলে যে অসংখ্য এবং বিচিত্র প্রাণীর বাস, তাদের সবকটিই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

সামুদ্রিক পাখিও নিস্তার পায় না। পাখিরা সমুদ্রের জলে থাকে না বটে, কিন্তু পানকৌড়ি, গগনভেড় (Pelican),

সামুদ্রিক খাবার কি সব সময়ে নিরাপদ?

পাফিন (Puffin), গাংচিলের (Sea gulls) মত পাখিরা সামুদ্রিক মাছ এবং অন্য প্রাণী খেয়েই বাঁচে। মাছ ধরতে জলে ডুব দিলেই এদের ডানা আর গায়ের পালকে তেল (পেট্রোল) লেগে যায়। তেল তো আর জলের মত শুকিয়ে যাবে না, কাজেই তেলের আস্তরে পাখিদের পালক আর ডানা ভিজে জবজবে হয়ে থাকে। পাখিটি ওড়ার ক্ষমতা হারায়। ফলে দীর্ঘদিন অভুক্ত থেকে আর ডাঙ্গায় ফিরতে না পেরে শেষে পাখির দল মারাই পড়ে। ভেসে আসে তাদের তেল চুপচুপে মৃতদেহ সমুদ্রের তীরে। কত পাখি এভাবে মারা পড়ে? পক্ষীতাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন, প্রতি বছর 50 হাজার থেকে আড়াই লক্ষ পাখি এভাবেই মারা পড়ে।

কতটা তেল প্রতি বছর সমুদ্রে পড়ে? এর সঠিক হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ কোনো তৈলবাহী জাহাজ কখন বা কোথায় দুর্ঘটনায় অথবা ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়বে, তা আগে থেকে বলা মুশকিল। তবে 1984 সালে 'বোম্বাই পোর্ট অথোরিটি (Bombay Port Authority) সমুদ্রোপকূল (ইন্দ্র ডক) থেকে 90 হাজার লিটার তেল সংগ্রহ করেছিলেন। বড় ধরনের 'অয়েল ট্যাঙ্কারের' বিপর্যয়ে এই পরিমাণ বহুগুণ বাড়তে পারে।

তেলদূষণের বিপদ এখানেই কেটে যায় না। সমুদ্র থেকে তেলের আস্তর সরাতে যে সব ডিটারজেন্ট (Detergent) ব্যবহার করা হয়, তার জন্যও পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে। 'টোরি ক্যানিয়ন' (Torrey Canyon) বিপর্যয়ে যে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়, তার জন্য অসংখ্য সামুদ্রিক জীব মারা পড়েছিল। তেলদূষণের জন্য আর একটি অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ হাইড্রো-কার্বন বেঞ্জপাইরিন (Hydrocarbon Benzpyrene) সমুদ্রে জমা হয়। এর প্রভাবে জীবদেহে ক্যানসার হতে পারে।

সমুদ্রদূষণ থেকে মানুষও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুখ্যাত 'মিনিমাটা অসুখের' (Minimata Disease) কথাটা ধরা যাক। 1953 সালে জাপানের অধিবাসীদের মধ্যে এই অসুখটি দেখা যায়। হাত-পায়ের পক্ষাঘাত, দৃষ্টি এবং শ্রবণক্ষমতা হারানো ইত্যাদি উপসর্গে 23 জন চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গেলেন; 17 জনের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে তাঁরা শেষ পর্যন্ত আর বাঁচেন নি। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল যে তাঁরা সকলে সামুদ্রিক কাঁকড়া, অক্টোপাস-স্কুইড (Squid) আর মাছ খেয়েছিলেন। সামুদ্রিক প্রাণীগুলিতে পাওয়া গেল পারদ। সমুদ্রতীরের শিল্পাঞ্চল থেকে পারদ এসে মিশেছিল সমুদ্রের জলে। পরে ওই পারদই এসে জমে সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে আর 'বিষাক্ত' মাছ-কাঁকড়া খাবার জন্যই ওই বিপত্তি।

গাছ কি পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে?

গাছ যে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়, একথা আমরা সকলেই জানি। বনভূমি পরিবেশকে ঠাণ্ডা রাখে আর বৃষ্টিপাতের সহায়ক হিসেবে কাজ করে, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। পরিবেশকে ধুলোবিহীন এবং পরিচ্ছন্ন রাখতেও যে গাছের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, সেটা অবশ্য আমাদের জানা নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দূষণ গবেষণাগারের' (Pollution Research Laboratory)

[illegible]

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, কিছু গাছ পরিবেশ থেকে ভাসমান ধূলিকণা সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে পরিবেশ থাকে পরিচ্ছন্ন ও ধুলোবিহীন। কলকাতার মত শহরে যেখানে বাতাসে ভেসে থাকা সূক্ষ্ম ধূলিকণা একটি উল্লেখযোগ্য বায়ুদূষক, সেখানে এর প্রয়োজনীয়তা সহজে বোঝা যায়।

যে সব গাছের বাতাস থেকে ধূলিকণা ছেঁকে নেবার

ক্ষমতা আছে তার মধ্যে রয়েছে অশ্বত্থ, পাকুড়, বট, অর্জুন, আম, দেবদারু, শাল এবং সেগুন। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এই গাছগুলির পাতা বেশ বড়, চওড়া আর সরল (Simple), মানে খণ্ডিত নয়। অন্যদিকে ছোট এবং খণ্ডিত বা যৌগিক (Compound) পাতার গাছের, যেমন কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, তেঁতুল, নিম ইত্যাদির ধুলো ছাঁকার ক্ষমতা খুবই কম। তুলনায় পাইন আর অর্কিডের কিছু ভূমিকা আছে।

বিদেশে ম্যাপলের মত খুব চওড়া পাতার গাছের শব্দদূষণ প্রতিরোধ ক্ষমতার কথাও প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে অবশ্য এই ধরনের গবেষণা এখনও হয়নি।

কেন হারিয়ে যাচ্ছে কলকাতার পশুপাখি?

কলকাতার পশুপাখি? অনেকেই কপাল কুঁচকোবেন, এই ঘিঞ্জি শহরে তেমন খোলামেলা জায়গা বা প্রাকৃতিক পরিবেশ কোথায় যে পশুপাখি থাকবে? সত্যিই তো কলকাতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, শহরতলী চলে আসছে শহরের চৌহদ্দির মধ্যে, বাড়ছে ওপর দিকেও। বহুতল অট্টালিকার ভীড়ে আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। প্রকৃতির স্পর্শই যে শহর থেকে মুছে যেতে বসেছে, সেখানে যে জীবজন্তু বা কীট-পতঙ্গের দেখা পাওয়া মোটেই সহজ হবে না, তাতে আর আশ্চর্য কি?

পশুপাখি কিংবা কীট-পতঙ্গ—সব প্রাণীরই চাই খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান এবং অনুকূল পরিবেশ। সব প্রাণী তো একই ধরনের খাবার খায় না। কেউ শাকাশী, কেউ মাংসাশী, কেউ বা ফলভুক আবার কোনো প্রাণীর খাদ্য কীট-পতঙ্গ। আবার শুধু খাবার আর জল হলেই চলবে না, জীবজন্তুদের পছন্দসই বাসা বাঁধার আর সেই সঙ্গে বিশ্রামের জায়গাটুকুও দরকার। সত্যি বলতে কি, বর্তমানে এই শহরে এই তিন প্রয়োজনীয় বস্তুর কোনোটাই অঢেল পরিমাণে নেই।

বানর-হনুমান কিংবা বাদুড়ের (Flying fox or Indian Fruit bat) কথাই ধরা যাক। এরা ফলভুক, বানর-হনুমান অবশ্য কিছু পরিমাণে কচিপাতা আর ফুলের কুঁড়িও খেয়ে থাকে। বাদুড়ের খাদ্য পাকা কলা, পেয়ারা, পেঁপে, ডুমুরের মত রসালো ফল। কলকাতার মধ্যে এইসব গাছ কি যথেষ্ট সংখ্যায় আছে? তাছাড়া এদের বিশ্রামের জন্যও দরকার গাছপালায় ঢাকা শান্ত পরিবেশ। তাও কিন্তু এই ইঁট-কাঠ, ভীড়-কোলাহলে ঠাসা শহরে নেই।

এদের কথা ছেড়ে দিলেও কাঠবেড়ালির (Squirrel) কিংবা ভাম (Toddy Cat) আর নেউলের (Common Mongoose) মত প্রাণীও এখন বিরলদর্শন। অথচ পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও এদের প্রায়ই দেখা যেত। কারণ সেই একই—খাবার নেই, লুকোবার এবং বাসা বাঁধার জায়গারও অভাব।

তিনশো বছরের কিছু বেশি বয়স হল এই শহরের। একেবারে গোড়ার দিকের, অর্থাৎ কলকাতার শৈশবের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। তখন তো এই শহরের অনেক অংশেই জলা-জঙ্গল। সেখানে যে কত ধরনের বিচিত্র সব প্রাণীর আস্তানা ছিল, সেটা এখন গবেষণার বিষয় হতে পারে। সেই সময়কার প্রাণীসম্ভারের বিস্তৃত এবং বিশদ তালিকাও দেওয়া অসম্ভব।

উনিশ শতকের শেষের দিকেও কিন্তু এই শহরের প্রাণী-বৈচিত্র্য উল্লেখ করার মত ছিল। 1875 সালে আলিপুরের চিড়িয়াখানাটি (বা পশুশালাটি) তৈরি হয়। তখন অবশ্য আলিপুর অঞ্চলকে ঠিক শহরের চৌহদ্দির মধ্যে ধরা হত না, এর পরিচয় ছিল উপকণ্ঠ হিসেবেই। 1892 সালে চিড়িয়াখানার প্রথম সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীরামব্রহ্ম সান্যালের লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটিতে চিড়িয়াখানার জীবজন্তুদের খাদ্য, আচার-ব্যবহার, অসুখ-বিসুখ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীসান্যাল চিড়িয়াখানার প্রসঙ্গে লিখেছেন যে জংলি বেড়াল (Jungle Cat), বাঘডাঁশ (Fishing Cat), ভাম, গন্ধগোকুল (Large Indian Civet), নেউল, শেয়াল (Jackal), মেঠো খরগোশ (Hare), হনুমানের (Langur or Hanuman Monkey) মত প্রাণীকে চিড়িয়াখানার চত্বরে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। এখন এদের কটাকেই বা আমরা চিনি? চেনার কথাও নয়, বহুদিন আগে থেকেই এরা ক্রমশ কলকাতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

পক্ষীপ্রেমিকদের কল্যাণে কলকাতায় পাখিদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া গেছে। উনিশ শতকের ষাটের দশকে ইংরেজ পক্ষীপ্রেমিক এডওয়ার্ড ব্লিথ (Edward Blyth) কলকাতা এবং শহরতলীতে 274 প্রজাতির পাখি দেখেছিলেন (ভারতে প্রায় 1200 প্রজাতির পাখির বাস)।

কলকাতার পাখির প্রথম ও বিশ্বাসযোগ্য তালিকা ওইটাই। প্রায় একশো বছর পরে 1969 সালে 'জুলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (Zoological Survey of India) বা ভারতের প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থার পক্ষী বিশেষজ্ঞ ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাসের অধীনে একদল গবেষক কলকাতার পাখির একটি তালিকা তৈরি করেন। এই তালিকায় ছিল 230 টি পাখি। অঙ্কের হিসেবেই দেখা যাচ্ছে, একশো বছরে কলকাতার গণ্ডি ছেড়ে দূরে চলে গেছে 44 প্রজাতির পাখি। কলকাতার পাখির

পাখিরা কি কলকাতা ছাড়ছে?

সাম্প্রতিক তালিকাটি 1984 সালের। তালিকাটি তৈরি করেছেন একটি প্রকৃতিপ্রেমিক সংস্থা 'প্রকৃতি সংসদ'-এর সভ্যরা। এই তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে 208টি পাখির নাম। তাহলে দু'-দশকের মধ্যে আরো 22 প্রজাতির পাখি কলকাতা ছাড়লো।

বড় হাড়গিলের (Adjutant stork) কথাই ধরা যাক। মাংসাশী এই পাখিটি কলকাতা ছেড়েছে অন্তত 75 বছর আগে। অথচ কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতীক ছিল হাড়গিলে। এইভাবেই কলকাতা থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে বুনো রাজহাঁস (Greylag Goose), কালো ঈগল (Black Eagle), জলার তিতির (Swamp Patridge), লালবুক মার্গেনসারের (Red breasted Mergenser) মত আরো কত পাখি।

মাত্র তিরিশ বছর আগেও সল্টলেক অঞ্চলে শামুকখোল (Open billed stork), খুন্তে বক (Spoon bill), দিগ্‌হাঁস (Pintail), চকা-চকী (Brahmini Duck), খুন্তে হাঁস (Shoveller), নাকটা (Comb Duck), বামুনিয়া হাঁস (Tufted Duck), নীলশির (Mallard), ভুতি হাঁস (Pochard), রাঙ্গামুড়ি (Red crested Pochard) এবং পটিদার রাজহাঁসের (Bar-headed Goose) মত পাখিকে দেখা যেত। এখন সল্টলেকে গড়ে উঠেছে উপনগরী। সেখানে বিস্তীর্ণ জলাভূমির চিহ্নই নেই, পাখির দল থাকবে কোথায়? খাবেই বা কি?

স্তন্যপায়ী এবং পাখির মত অন্য প্রাণী, যেমন সরীসৃপ (গিরগিটি, সাপ, কচ্ছপ), উভচর (ব্যাঙ জাতীয় প্রাণী), মাছ এবং পোকা-মাকড়ও কলকাতায় আর তেমন চোখে পড়ে না।

পুরনো কলকাতায় গিরগিটি (Garden lizard), কাঁকলাশ (Skink) আর খোলামেলা জায়গায় দু-একটা গোসাপ (Monitor lizard) মাঝে মাঝে দেখা যেত। পুকুরের কচ্ছপ বা কাঠাও (Pond turtle) ছিল সুলভদর্শন। সাপের মধ্যেও দেখা যেত পুঁয়ে (Blindworm), ঘরচিতি (Wolf snake), ঢোঁড়ার (Checkered keel-back) মত কিছু নির্বিষ প্রজাতিকে। কুনো ব্যাঙ ছাড়াও ছিল সোনা ব্যাঙ (Bull frog), পুকুরের সবুজ ব্যাঙ (Green pond Frog), গেছো ব্যাঙ (Tree frog)।

মাছও কিছু কম ছিল না। রুই কাতলার মত বড় মাছ নয়, চাঁদা (Glass fish), পুঁটি (Punti), খলসে (Indian goramy), চ্যাঙ (Snake headed fish), বেলে (Gobid fish) অথবা মাঠ-কৈ -এর (Mud-skipper) মত ছোট মাছের কথাই আসছে।

রঙ-বেরঙের প্রজাপতির ঝাঁকই বা কোথায় গেল? সেইসঙ্গে ফড়িং (Grass hopper), জলফড়িং (Dragon fly), ভীমরুল (Hornet), বোলতার (Wasp) দল? এখন কলকাতায় উইচিংড়ির (Cricket) ডাকও বিশেষ শোনা যায় না।

পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের খাদ্যের অভাব ও বাসস্থান সংকোচনের সঙ্গে পরিবেশ দূষণকেও এইজন্য দায়ী করেছেন। বর্তমানে কলকাতার বাতাস, জল আর শব্দদূষণের মাত্রা এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে এখানকার প্রাণী চলে যাচ্ছে শহর ছেড়ে বহুদূরে।

ইলিশ মাছ কমে যাচ্ছে কেন?

কথায় বলে গঙ্গার ইলিশ, কেউ বলেন পদ্মার ইলিশ। কেউ আবার আরো নিখুঁতভাবে বলেন কোলাঘাটের কিংবা উলুবেড়িয়ার ইলিশ। অনেকের মতে, এক এক জায়গার ইলিশের স্বাদ এক একরকম। ইলিশ মাছ কিন্তু আসলে সামুদ্রিক মাছ, কাজেই গঙ্গা-পদ্মা কোনো নদীরই নিজস্ব মাছ নয়।

তবে ইলিশ মাছের সঙ্গে নদীর নাম জুড়লো কী করে? ইলিশ পরিযায়ী (Migratory) মাছ। সমুদ্রের নোনা জলে এরা থাকে কিন্তু ডিম পাড়ার জন্য এদের দরকার পরিষ্কার মিঠে জল (Fresh water)। বর্ষার সময়ে এইজন্যই ইলিশ

মাছেরা ঝাঁক বেঁধে মোহানার মধ্যে দিয়ে নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। ডিম পাড়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তাদের চাই। সেখানে জলে মোটেই নোনতা ভাব থাকবে না। জল হওয়া চাই পরিষ্কার, দূষণমুক্ত আর অক্সিজেনের পরিমাণও হওয়া চাই যথেষ্ট। এইরকম পরিবেশের খোঁজে ইলিশের ঝাঁককে কয়েক হাজার কিলোমিটারও যেতে হয়।

ইলিশ মাছের স্বাদ এবং বিশেষ গন্ধ আসে তার চর্বি থেকে। সমুদ্রবিহারী ইলিশ মাছের শরীরে তেমন চর্বি থাকে না। পরিযানের সময়ে এরা নানা ধরনের খাবার খায়। এদের দেহে চর্বিও জমতে থাকে। পরিযানের পথেই বেশ কিছু মাছ ধরা পড়ে। যে জায়গা থেকে মাছ ধরা হল, তার নামটিও ইলিশের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। আমরাও ইলিশকে ডাকতে লাগলাম গঙ্গার ইলিশ, পদ্মার ইলিশ অথবা বাংলাদেশের ইলিশ নামে।

ডিম ছাড়তে যাবার পথে যে ইলিশ পাওয়া গেল তার সঙ্গে ফিরতি পথে, অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে ফিরে আসার পথে ধরা মাছের স্বাদে অনেক তফাত। এর কারণ ডিম ছাড়ার সময়ে ইলিশের প্রচুর শক্তিক্ষয় হয়। দেহের সঞ্চিত চর্বি জৈব জারণে (Biological Oxidation) প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। এইজন্য সমুদ্রে ফিরে যাবার সময়ে ইলিশের শরীরে আর ততটা চর্বি থাকে না। এর ফলে স্বাদ-গন্ধের বিশেষত্বও অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়।

ইলিশ মাছের বিশেষ স্বাদ-গন্ধের কারণ কি?

মোহানা থেকে অনেক দূরে নদীর জলে ইলিশের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। ছোট বাচ্চারাও ঝাঁক বেঁধে সমুদ্রের দিকে আসতে থাকে। শীতের শেষে এগুলিই বাজারে ওঠে 'খোকা-ইলিশ' নামে। সমুদ্রের জলে বাচ্চাগুলি খেয়ে দেয়ে বড় এবং পরিণত হয়। তারপর আসে ডিম পাড়ার পালা, সমুদ্র ছেড়ে উজান ঠেলে তারাও একদিন বেরিয়ে পড়ে পরিষ্কার স্বচ্ছ, মিষ্টি জলের খোঁজে।

ডিম ছাড়তেই ইলিশের ঝাঁকের সমুদ্র ছেড়ে নদীতে আসা। নদীর জল যদি দূষিত হয়ে যায় তাহলে কি হবে? ইলিশের ঝাঁক অন্যদিকে চলে যাবে। হুগলি-মাতলা নদী ছেড়ে যে ইলিশের ঝাঁক এখন পদ্মার দিকে বেশি যাচ্ছে, তার কারণ এটাই। এমনিতে হুগলি-মাতলায় ক্রমাগত পলিমাটি জমে নাব্যতা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের নোনা জল ঢুকছে মোহানা ছাড়িয়ে অনেকটা ভেতরে। তার ওপর শিল্পজাত বিভিন্ন দূষণেও এখন এর জল পরিপূর্ণ। এইসব কারণেই ইলিশ এখন হুগলি-মাতলায় ঢুকছে খুব কম। বাজারেও তাই রুপোর পাতের মত ঝকঝকে আর চওড়া পেটির ইলিশ মাছের আকাল।

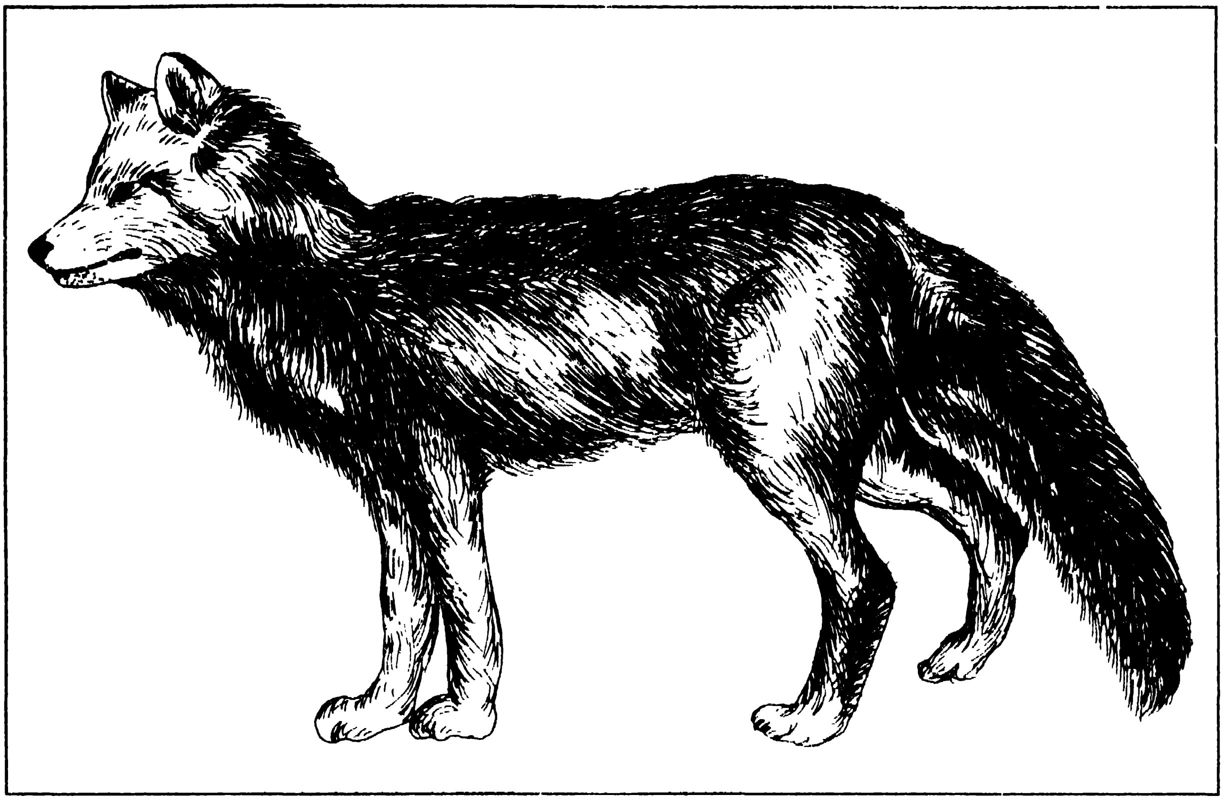
পরিবেশের বন্ধু-প্রাণী কারা?

সম্প্রতি পৃথিবী জুড়েই পরিবেশ-সচেতনতা বাড়ছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে পরিবেশকে সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরি। এই কাজে বিন্দুমাত্র অবহেলা করার সময় আর নেই, নাহলে অন্য উদ্ভিদ-প্রাণীর সঙ্গে আমরা, অর্থাৎ মানবপ্রজাতিও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

পরিবেশের সব প্রাণী, উদ্ভিদ, এমন কি অজৈব বস্তুর মধ্যে একটি অতি জটিল এবং গূঢ় সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের সবটুকু যে ইতিমধ্যেই বুঝতে পারা গেছে, এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু পরিষ্কার, যে সব জীব বা জড়বস্তুকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করছি, পরিবেশের ভারসাম্যটি (Ecological Balance) বজায় রাখতে তারও কিছু ভূমিকা আছে। কিছু পশুপাখিকে অবশ্য ইতিমধ্যেই 'পরিবেশের বন্ধু' বলে চিহ্নিত করা গেছে।

শেয়াল আর হায়েনার (Hyena) কথাই প্রথমে ধরা যাক। দুটি জন্তুই উচ্ছিষ্টভোজী (Scavanger)। শেয়ালের খাদ্য পচা-গলা মাংস আর বাঘ-সিংহের মত বড় শিকারি প্রাণীর উচ্ছিষ্ট। এর সঙ্গে অবশ্য শেয়াল খরগোশ আর ছোটখাটো পাখিও শিকার করে থাকে। হায়েনা সেদিক থেকে পুরোপুরি উচ্ছিষ্টভোজী। শক্তিশালী চোয়াল আর চওড়া পেষকদাঁতে (Molars) হায়েনা জীবজন্তুর মোটা হাড়গোড়ও স্বচ্ছন্দে গুঁড়িয়ে ফেলে।

পাখিদের মধ্যে শকুন (Vultures) এবং হাড়গিলেও একই কাজ করে থাকে। এরা ঝাড়ুদারের কাজটি ক'রে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। শহরাঞ্চলে কাক এবং জংলি পরিবেশে ডোম-কাককে (Raven) একই কারণে



পরিবেশের বন্ধু বলা যেতে পারে।

কৃষিবিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেন, ইঁদুরের মত ক্ষতিকারক প্রাণী আর দুটি নেই। বিভিন্ন জাতের ইঁদুর শষ্যক্ষেত্রে এবং গুদামে বিপুল পরিমাণে ফসল নষ্ট করে। ধানক্ষেতে এক ধরনের গর্তবাসী ইঁদুরের (যার নাম 'মোল র‍্যাট') কথাই ধরা যাক। এরা ধানের শীষ কেটে নিয়ে গর্তে জমিয়ে রাখে। কি পরিমাণে ধান এরা জমায়, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একটা বড় ক্ষেতের ইঁদুরের গর্ত থেকে যত ধান পাওয়া যায়, তাতে একটা বড় পরিবারের দুবেলা দুমুঠো ভাত হয়ে যায়। সমীক্ষায় জানা গেছে যে, ভারতে এক বছরে যত শষ্যদানা ইঁদুরে নষ্ট করে, তাতে পশ্চিমবঙ্গে এক বছরে 'র‍্যাশন' দেওয়া যায়। এরা বাচ্চাও দেয় অনেকগুলি। গবেষণায় জানা গেছে, একজোড়া ধেড়ে ইঁদুর (Bandicoot Rat) থেকে ৪৪৪টি ইঁদুরের জন্ম হতে পারে। এই বিপুল সংখ্যক ইঁদুর কি পরিমাণে ফসল নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

শুধু ক্ষেত-খামার বা গুদামে ফসল নষ্ট করাই নয়, ইঁদুর আসবাবপত্র, দরকারি কাগজ, কাপড়-চোপড় সবই কেটে নষ্ট করে। এদের সামনের দুজোড়া দাঁত ক্রমাগত বাড়ে, কাজেই শক্ত কিছু জিনিস কেটে দাঁতগুলিকে (কৃন্তক দাঁত) ক্ষইয়ে ফেলতে হয়। প্লেগ (Plague), এক ধরনের টাইফাস (Murine Typhus) ইত্যাদি রোগের জীবাণু ছড়িয়েও ইঁদুর জনস্বাস্থ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি করে।

এমন ক্ষতিকারক প্রাণী ইঁদুরের দুটি স্বাভাবিক শত্রু হল পেঁচা আর সাপ। একটি লক্ষ্মীপেঁচা (Barn owl) প্রত্যেক

একটা লক্ষ্মী-পেঁচা রোজ কটা ইঁদুর শিকার করে?

রাতে 10-12টি ইঁদুর শিকার করে। কেউটে-গোখরো (Cobra) থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষধর এবং নির্বিষ সাপই ইঁদুর খেতে পছন্দ করে। তবে এই ব্যাপারে ঢেমনা সাপের (Rat snake) খুবই সুখ্যাতি। একটু ভেবে দেখলে পেঁচা আর সাপকেও পরিবেশের বন্ধু-প্রাণীই বলতে হয়, কারণ

এরা না থাকলে ইঁদুর মারতে আমাদের 'রোডেন্টিসাইড্‌স' (Rodenticides) নামক বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করতে হত। এতে পরিবেশ দূষণ বাড়তো।

একই কারণে ব্যাঙকেও (Frogs and Toads) এখন পরিবেশের বন্ধু-প্রাণী বলা হচ্ছে। আশির দশকের আগে সোনা ব্যাঙ (Bull Frog), পুকুরের সবুজ ব্যাঙ (Green Pond Frog) আর জল ব্যাঙ বা কটকটি ব্যাঙের (Skipping Frog) পা (পিছনের দুটি পা) বিদেশে রপ্তানি করা হত। ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাঙের মাংসের চাহিদা প্রচুর। এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদেশি মুদ্রাও আসতো। এখন কিন্তু ব্যাঙ ধরা, মারা এবং বিদেশে রপ্তানি করা নিসিদ্ধ। কেন—এই প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

প্রাণিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, একটি কুনো ব্যাঙ (Common Toad) প্রত্যেক রাতে 150টি পোকা-মাকড় খায়। একটি সোনা ব্যাঙ হিসেবমত নয় কিলোগ্রাম ওজনের পোকা-মাকড় খেয়ে থাকে। যে কীট-পতঙ্গগুলি এরা খায়, তার অধিকাংশই ফসলের শত্রু। সোনা ব্যাঙ এক ধরনের কাঁকড়াও (Land Crab) খেয়ে থাকে। এই জাতের কাঁকড়া জমির আল আর বাঁধে গর্ত করে জমির সেচে এবং মাছ চাষের অনিষ্ট করে। এমনিতে আমাদের প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা খরচ করে বাইরে থেকে কীটনাশক কিনতে হয়। তারপর কীটনাশকের ব্যবহারে পরিবেশও দূষিত হয়। কাজেই ব্যাঙ পোকা-মাকড় ধ্বংস করে আমাদের উপকারই করে। গিরগিটিও (Garden Lizard) একই উপকার করে থাকে।

কেঁচো আর মাইট (Mites) উপকার করে একটু অন্যভাবে। কেঁচো মাটির মধ্যে গর্ত করে তাতে বায়ুচলাচলে সাহায্য করে। মাইট পচা পাতার স্তূপকে জৈব সারে পরিবর্তিত করে।

এইরকম আরো অনেক ছোট বড় প্রাণীই আমাদের চারপাশে রয়েছে যারা প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করে যাচ্ছে। বর্তমানে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এদের সংরক্ষিত করে এবং সংখ্যা বাড়িয়ে পরিবেশের গুণগত মানটি উন্নত করার চেষ্টা করছেন।

শীতকালে কি পরিবেশদূষণ বাড়ে?

বাতাসের তাপমাত্রা উচ্চতা (Altitude) বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। প্রতি 300 মিটার (1000 ফুট) উচ্চতা বাড়লে পরিচ্ছন্ন ও শুকনো বাতাসের তাপমাত্রা কমে 1.8° সেলসিয়াস। আমরা সকলেই জানি, বাতাস গরম হ'লে হালকা হয়ে যায়। এমনিতে গরম বাতাস ওপরে উঠে যায়, নীচে থাকে ঠাণ্ডা বাতাসের স্তর। কিন্তু কোনো কারণে এর উল্টো অবস্থা হলে কি হবে? তখন একটা অদ্ভুত অবস্থা দেখা যাবে—নীচে থাকবে গরম বাতাস আর ওপরে ঠাণ্ডা বাতাস। এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে বিপরীত তাপক্রম বা 'টেমপারেচার ইনভারসান' (Temperature Inversion) বলা হয়।

এই ব্যতিক্রমী প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে বায়ুদূষণের নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। এই সময়ে বাতাসের ওপর-নীচে চলাচল প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। এর ফলে নীচের স্তরে জমা বায়ুদূষক আর ওপরের স্তরে ঠেলে উঠতে পারে না। নীচের দূষিত বাতাসের স্তরেও বায়ুচলাচল ঘটে অত্যন্ত সীমিত মাত্রায়। এইজন্য নীচের স্তরের মধ্যে দূষকগুলি খুব বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি স্তরে এই কারণে

শীতকালে কেন ধোঁয়া নীচে বেশিক্ষণ পাক খায়?

বায়ুদূষণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বায়ুদূষকগুলি ওপর স্তরে উঠতে কিংবা চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে তো পারেই না, উল্টে আরো বেশি পরিমাণে দূষকপদার্থ এসে জমা হতে থাকে।

জানা গেছে, শরৎকাল এবং শীতকালেই টেম্পারেচার ইনভারসান বেশি হয়ে থাকে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, শীতকালে কয়লার উনুন থেকে বেরোনো ধোঁয়ার কুণ্ডলী খুব আস্তে আস্তে পাক খাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাক খেতে খেতে তারপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী অত্যন্ত ধীরগতিতে ওপরদিকে উঠছে। গরমকালে কিন্তু উনুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী এত স্পষ্ট হয় না, মিলিয়েও যায় খুব তাড়াতাড়ি।

ধোঁয়ার কুণ্ডলীর বেলায় যা স্পষ্ট দেখা যায়, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড এবং

অন্য বায়ুদূষকের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটলেও তা স্পষ্ট দেখা যায় না। এর ফলে নীচের বায়ুস্তরটি কিছুটা অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে এবং সূর্যের আলোর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে। মাটি যথেষ্ট গরম হতে পারে না, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি জমে থাকা জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে হালকা কুয়াশার (Fog) চাদর তৈরি করে।

লম্বা, সরু আর গভীর উপত্যকাতে (Valleys) টেম্পারেচার ইনভারসান অন্য জায়গার তুলনায় বেশি দেখা যায়। উঁচু পাহাড় বায়ু চলাচলে বাধা দেয় বলেই এমনটি ঘটে।

জলাভূমি কি বুজিয়ে ফেলা উচিত?

পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের মতে পাহাড়-পর্বত, নদনদী, বনভূমি, মরুভূমি কিংবা সমুদ্রের মত জলাভূমিরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এইসব ভৌগোলিক অঞ্চলের অবস্থান, অনুপাত এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরই নির্ভর করছে পরিবেশের স্থিতিশীলতা। এর মধ্যে যে কোনো একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা অবক্ষয় পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। বনভূমির কথাই ধরা যাক। বন-জঙ্গল কমে গেলে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণও বাড়বে। এর ফলে বাড়বে পৃথিবীর তাপমাত্রা, যার প্রভাবে আবহাওয়াটাও আমূল বদলে যাবার আশংকা রয়েছে। ঠিক তেমনই পাহাড়-পর্বত না থাকলে জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত মৌসুমী বায়ু বৃষ্টি ঝরাবে না।

জলাভূমি যে পরিবেশের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, একথা বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেন। তবে জলাভূমি থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা হয়েছে, ততটা এদেশে হয়নি। তবুও দু-একটি উল্লেখ করার মত তথ্য আমাদের হাতে আছে। গুয়াহাটির কাছে ডিপর বিল (Deepor Beel) জলাভূমিটি ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। ওই অঞ্চলে (আসামে) প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং ব্রহ্মপুত্র সংলগ্ন এলাকায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। গুয়াহাটি থেকে বৃষ্টির জল এসে পড়তো ডিপর বিলে, তারপরে সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্রে। অন্য শাখানদী আর খালগুলিতে বর্ষার সময়ে জল প্রায়ই বিপদসীমার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, কাজেই সেগুলি আর অতিরিক্ত জল বহন করতে পারে না। ডিপর বিল এবং সংলগ্ন জলাভূমির পূর্বদিক ঘেঁষে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে (National Highway, NH-37) জাতীয় সড়ক। এর সঙ্গে আবার একটি রেলপথও তৈরি করা হয়েছে ওই অঞ্চলে। জলাভূমিটি যে এর ফলে বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা বিশদে না বললেও চলে। এইরকম অবিবেচনার কাজে প্রতিক্রিয়া কি হল? গুয়াহাটি এবং তার চারপাশের অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ আরো বেড়ে গেল।

আমাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত— সল্ট লেক। পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল এই লবণ হ্রদ। পুরাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, এককালে কলকাতা নগরীর (তখনও অবশ্য কলকাতা নগরী হয়ে ওঠে নি, সামান্য এক জনপদ ছিল) পূর্ব প্রান্ত বরাবর বয়ে যেত বিদ্যাধরী নদী। বিদ্যাধরী জলরাশি বয়ে নিয়ে যেত বঙ্গোপসাগরে। লবণহ্রদ সেই বিদ্যাধরীর এক টুকরো অবশেষ, বাকিটা আজ মজে গিয়েছে।

একশো বছর আগেও লবণহ্রদ ছিল স্বমহিমায়। তখনকার লবণহ্রদ এবং তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশে জৈব-বৈচিত্র্যও (Bio-diversity) ছিল অফুরন্ত। কলকাতার বাজারে লবণহ্রদ থেকে আসতো অনেক ছোটখাটো মাছ—পুটি, ট্যাংরা, ন্যাদস, চাঁদা, খলসে,

সল্ট লেক বুজিয়ে কি কলকাতার ভাল হয়েছে?

মৌরলা আরো কত কি। এছাড়াও শীতের সময়ে ওই অঞ্চলে ভীড় জমাতো অসংখ্য জলচর এবং স্থলচর পাখির ঝাঁক। এদের মধ্যে ছিল গগনভেড়, খুন্তে বক, ভুতি হাঁস, চকাচকী, পটিদার রাজহাঁস, গাঙচিল (Brown headed and Black headed Gull), শালাং (Grey headed lapwing), কাদাখোঁচা (Snipes), সাপমার চিল (Crested Serpent eagle), ছোঁয়া চিল (Marsh Harrier), চাতক (Pied Crested Cuckoo), হলদে খঞ্জন (Yellow Wagtail), সাদা খঞ্জন (White Wagtail), ফিতে বুলবুল (Paradise Flycatcher), আবাবিল (Swallow) ইত্যাদি 29 জাতের পাখি।

শুধু মাছ আর পাখি নয়, লবণহ্রদ অঞ্চলে অন্য ধরনের প্রাণী, যেমন উভচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী কিংবা

পতঙ্গেরও আস্তানা ছিল। তবে সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া একরকম দুঃসাধ্য কাজ। এইসব প্রাণী গেল কোথায়? এক কথায় বলা যেতে পারে, লবণহ্রদের পরিবেশ থেকে যতই প্রকৃতির চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে, এরাও ততই দূরে, আরো দূরে চলে গেছে।

বহুদিন ধরেই লবণহ্রদ আস্তে আস্তে বুজে আসছিল। কলকাতা থেকে নর্দমার নোংরা জল আর আবর্জনা এসে পড়তো ওই জলাভূমিতে। তবু এতে লবণহ্রদ পুরোপুরি বুজে যেতে বেশ সময় লাগতো। এরই মধ্যে কলকাতা শহরে জনস্ফীতি এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্বাভাবিকভাবেই আবাসন সমস্যা হয়ে উঠতে থাকে আরো জটিল, প্রয়োজন হয় নতুন জায়গা। লবণহ্রদেও এক সময়ে গড়ে ওঠে উপনগরী।

এতে কলকাতার সামগ্রিক পরিবেশের ওপর কি কিছু প্রভাব পড়লো? প্রভাব অবশ্যই পড়লো যদিও সেটা বোঝা গেল কিছুদিন পরে। কলকাতা থেকে নর্দমার নোংরা জল, যাতে প্রচুর পরিমাণে কাদা-মাটি, পাঁক আর ঘর-গৃহস্থালীর আবর্জনা মিশে থাকে, বাইরে বেরোতে পারলো না। এমনিতে কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা ছিল সঙ্গীণ। আগের তুলনায় অনেক বেশি জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা সেগুলির ছিল না। এর ফলে বর্ষাকালে কলকাতায় জল জমতে থাকে। লবণহ্রদ বুজিয়ে দেবার পরে এই শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়লো।

জনবহুল শহরে খোলামেলা, গাছ-গাছালি ভর্তি জায়গা কমই থাকে। শহরের আশপাশে জলাভূমি থাকলে আবহাওয়া যেমন একদিকে ঠাণ্ডা থাকে, অন্যদিকে দমবন্ধ গুমোট ভাবটাও কেটে যায়।

ভারতে মোট কত জলাভূমি আছে? 1993 সালে ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তর এক সমীক্ষা করে। হিসেবমত আমাদের দেশে 41 লক্ষ হেক্টার জলাভূমি আছে। এর সঙ্গে প্রায় 6740 বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে ম্যানগ্রোভ (Mangroves) বনাঞ্চলে ভর্তি সমুদ্রোপকূলবর্তী জলাভূমি।

সমীক্ষায় আরো জানা গেছে যে প্রধানত চারটি সমস্যায় ভারতের জলাভূমিগুলি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এগুলি হল ঃ

ক. **সংকোচন ঃ** জলাভূমির চারপাশে জনবসতি থাকায় এবং সেগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্য জলাভূমির পরিমাণ ক্রমশই কমে যাচ্ছে। জলাভূমি বুজিয়ে সেখানে গড়ে উঠেছে ক্ষেত-খামার অথবা ঘরবাড়ি।

খ. **পলি জমা ঃ** বনজঙ্গল কেটে ফেলার জন্য এবং অন্যান্য কারণে ভূমিক্ষয়ের হার বেড়ে গেছে। বৃষ্টির জলে ধুয়ে পলিমাটি এসে জমছে জলাভূমিতে। এর ফলে জলাভূমি ক্রমশই বুজে আসছে। জানা গেছে, এক কোটি তিরিশ লক্ষ টনের মত পলিমাটি প্রতি বছর চিল্কা হ্রদে (উড়িষ্যা) এসে জমে।

গ. **আগাছার উপদ্রব ঃ** হিমালয়ের অনেক উচ্চতায় কয়েকটি জলাভূমি ছাড়া অন্য সব জলাভূমিতে কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা, গুঁড়িপানার মত আগাছার উপদ্রব একটি প্রধান সমস্যা।

ঘ. **দূষণ ঃ** ঘর-গৃহস্থালী থেকে আসা পয়ঃপ্রণালীর ময়লা আবর্জনা এবং ডিটারজেন্টের প্রভাবে জলাভূমি দূষিত হয়ে পড়ে। চারপাশের ক্ষেত-খামার থেকে নির্গত সার ও কীটনাশক পদার্থ জলাভূমিকে আরো দূষিত করে।

বর্তমানে সরকারের উদ্যোগে জলাভূমির সমস্যাগুলিকে দূর করে তার মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে সেগুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ, জম্মু ও কাশ্মীরের উলার (Wular) হ্রদ, পঞ্জাবের হারিক (Harike) ও কাঞ্জলি (Kanjli) হ্রদ এবং মধ্যপ্রদেশের ভোজ (Bhoj) হ্রদের চারপাশে অরণ্যসৃজন করা হয়েছে। এর ফলে পরিবেশও যেমন পরিচ্ছন্ন থাকবে, বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখিও তেমনই খুঁজে পাবে তাদের পছন্দের বাসস্থান। জলচর পরিযায়ী পাখিদের জন্য চিল্কা হ্রদ, সাঁতরাগাছি, বেসব্রিজের মত কিছু জলাভূমিকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। জলাভূমিকে পরিষ্কার করে মাছচাষের কাজেও লাগানো হচ্ছে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য জনস্ফীতি কতটা দায়ী?

কাউকে যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করা হয়, পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন কত বলুন তো? তিনি কী উত্তর দেবেন? এই প্রশ্নের চটজলদি উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত, আর যদিও বা তিনি কোনো উত্তর দেন, তা নির্ভুল হবে না। কারণ প্রায় প্রতি

মুহূর্তেই এই পৃথিবীর আলো দেখছে একটি মানবশিশু। বলতে কি কোনোরকমে বিশ্বের জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা একে স্পষ্টভাবেই বলছেন জনবিস্ফোরণ (Population explosion)।

পুরাজীবতত্ত্ববিদ্ বা প্যালিওন্টোলজিস্ট এবং নৃতত্ত্ববিদরা (Anthropologists) একমত যে আবির্ভাবের সময়ে পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম, বড়জোর লাখ কয়েক। আর এখন? প্রায় সাড়ে ছ'শো কোটি। আধুনিক যুগের মানুষ বা 'হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স' (Homo sapiens sapiens) আবির্ভূত হয় তুষার যুগে (Ice age), সোজা কথায় আজ থেকে আনুমানিক দশ লক্ষ বছর আগে। বিবর্তনের ইতিহাসে সময়টা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। বর্তমানে মানুষের সঙ্গে অনেক প্রাচীন যুগের পশুপাখি টিকে আছে, যেগুলি অনেক আগেই এই পৃথিবীতে এসেছে। কই, সেইসব প্রাণীর বেলায় তো এমন সৃষ্টিছাড়া ও লাগামছাড়া সংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি। কেন, এই প্রশ্ন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

পশুপাখি কী ভাবে নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে?

জানা গেছে অন্য পশুপাখি প্রাকৃতিক নিয়মেই নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। কোনো জায়গায় একটি প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা কত হবে, তা নির্ভর করে প্রধানত দু'টি শর্তের ওপরে। 1. খাদ্য ও জলের সরবরাহ এবং 2. বাসযোগ্য বাসস্থানের (Habitable space) পরিমাণের ওপর।

সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী সীলের (Seals) কথাই ধরা যাক। এরা সমুদ্রবিহারী হলেও ঘর-সংসার পাতে বরফ-জমাট ডাঙ্গায়। চিংড়ি-কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক আর নানা ধরনের মাছ খেয়ে বাঁচে এরা। ঘর বাঁধার সময়ে প্রতি বছর ঝাঁকে ঝাঁকে সীল উঠে আসে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু (অ্যান্টার্কটিকা) সংলগ্ন অঞ্চলে। কিন্তু ঘরবাঁধা এবং সন্তানের জন্মদানের আগে এরা বুঝে নেয়, সেই বছর সমুদ্রের ওই অঞ্চলে খাবার মিলবে কিনা। আর বাচ্চাদের ঘুরে-ফিরে বেড়াবার মত যথেষ্ট পরিসর রেখেই সীলেরা তাদের সংসার পাতে। যদি কোনো বছর যথেষ্ট খাবার না মেলে অথবা আবহাওয়ার তারতম্যে বরফের পাটাতন (Platform) ঠিকমতো তৈরি না হয়, তাহলে কী হবে? সীলেরা সেই বছর আর ঘর বাঁধে না। এর ফলে সংখ্যাও বাড়তে পারে না।

এমন উদাহরণ আরও আছে। অত্যন্ত পরিচিত পাখি শালিখেও (Common Myna) খাদ্যাভাবে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা দেখা গেছে। শুধু কি তাই? অনেক প্রাণী আবার আত্মহননের মাধ্যমে নিজেদের সংখ্যা সীমিত রাখে। ইঁদুর জাতীয় প্রাণী লেমিং-এর (Lemming) কথা তো এখন অনেকেরই জানা। দেশ এদের নরওয়েতে। ইঁদুর জাতীয় হওয়ায় লেমিং-এর জন্মহার অত্যন্ত বেশি। প্রতি নয়-দশ বছরে এদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে এমন দাঁড়ায় যে খাদ্য এবং পরিসরের অভাবে এই প্রজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে। এই গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের মোকাবিলা এরা করে এক অদ্ভুত উপায়ে। অসংখ্য লেমিং দলবেঁধে সমুদ্রের দিকে যেতে শুরু করে এবং শেষে সমুদ্রের বুকেই ঘটে তাদের সলিল সমাধি। কিছু লেমিং অবশ্য এমন অদ্ভুত পরিযাণে (Migration) অংশ নেয় না। এদের সন্তান-সন্ততি টিকিয়ে রাখে লেমিং-এর অস্তিত্ব।

সংখ্যাধিক্যের জন্য পশুপাখিরা যে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের আচার-ব্যবহার যে বদলেও যেতে পারে, এমন প্রমাণও রয়েছে ভূরি ভূরি। জলচর পাখি কানঠুটি বা ফ্লেমিংগো (Flemingo) থাকে দলবেঁধে। ভারত এবং আফ্রিকার হ্রদ ও জলাভূমিতে মাছ এবং অন্য জলজ প্রাণী খেয়ে বাঁচে এরা। দেখা গেছে, একটি দলের সদস্য-সংখ্যা খুব কম হ'লে সেটি বেশি শিকার ধরতে পারে না। তুলনায় মাঝারি আকারের দল বেশি মাছ ধরতে পারে। কিন্তু দলটি যদি খুব বড় হয়ে যায়, তাহলে শিকার ধরার ক্ষমতা ক্রমাগত কমতেই থাকে। ভারতের বনভূমিতে চরে বেড়ানো চিতল হরিণেও (Spotted Deer) প্রায় একই ধরনের ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। এদের এক-একটি দলের সদস্য সংখ্যা 5 থেকে 30 পর্যন্ত হতে পারে। যথেষ্ট খাদ্য এবং পরিসর পেলে চিতলের দল বড় হয়, না হলে এগুলির অভাবে ছোট।

পশুপাখির কথা ছেড়ে আবার মানুষের কথায় ফিরে আসা যাক।

না বললেও চলে অন্য সব তৃতীয় বিশ্বের দেশের মত

ভারতও বিপুল জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত। ভারতের জনসংখ্যা কত? 1994 সালের জানুয়ারি মাসে ছিল নব্বুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি। এর সঙ্গে আবার প্রতি ঘন্টায় জন্মাচ্ছে তিন হাজার শিশু। হিসেব মত এই হারে জনসংখ্যা বাড়লে 2,000 সালে এ দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে একশো কোটিতে। বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 16

কী হারে বাড়ছে ভারতের জনসংখ্যা?

শতাংশের বাস ভারতে। অথচ সম্পদ সেই তুলনায় সীমিত। স্থলজ সম্পদের (Land resources) অতি নগণ্য অংশ, মাত্র 2.3 শতাংশ এবং বনজ সম্পদের (Forest resources) মাত্র 1.7 শতাংশ ভারতের ভাগে পড়ছে। বাকি থাকে সামুদ্রিক সম্পদের (Marine resources) কথা। আশাবাদীরা আশার কথা শুনিয়েছেন, সমুদ্র অতুল ঐশ্বর্যের ভান্ডার। মূল্যবান ধাতু, খনিজ তেল, অগুনতি খাদ্যোপযোগী মাছ, কাঁকড়া-চিংড়ি-ঝিনুক, ভেষজ উদ্ভিদ (শ্যাওলা জাতীয়)—কী নেই সেখানে? খুবই সত্যি কথা, কিন্তু এইসব সম্পদ আহরণ করতে যে ধরনের উন্নত প্রযুক্তিকৌশল দরকার, আর তার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা আমাদের দেশে নেই। অদূর ভবিষ্যতেও যে এইসব সমস্যার সমাধান হবে, তেমন সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল নয়।

অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে কোনো দেশের কী ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে, তা ভারতে খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা গেছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, জনস্ফীতির জন্য পরিবেশের অবনতি ঘটে এবং একই সঙ্গে আর্থসামাজিক (Socio-economic) উন্নয়ন বিঘ্নিত হয়।

প্রথমে পরিবেশের কথাই ধরা যাক। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করছেন যে, পরিবেশের গুণগত মান বর্তমানে নিম্নগামী। শুধু তাই নয়, এর মানটি এত দ্রুতহারে নেমে যাচ্ছে যে কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবী আর মানুষের বাসোপযোগী থাকবে কিনা, তাতেও সন্দেহ করা হচ্ছে। অথচ আঠারো শতকের শেষ ভাগেও কিংবা উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এমন কথা কেউ চিন্তাও করেন নি। কেন আমরা এই সর্বনাশা পথে নিরন্তর এগিয়ে চলেছি? এই প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু জনবিস্ফোরণকেই কারণ বলে মনে হচ্ছে।

মানুষ যতদিন প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলেছিল, ততদিন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু ঊর্ধমুখী জনসংখ্যার চাপে এবং কিছুটা জীবনধারণ পদ্ধতি (Life style) বদলে ফেলার জন্য মানুষকে উৎপাদন, কৃষিজ (Agricultural) এবং ভোগ্যপণ্য দুটিই বাড়াতে হয়েছে। এর জন্য এই শতাব্দীতে শিল্পায়নের (Industrialisation) এত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। আসল সমস্যা এইখানে। মানুষের সার্বিক বিকাশের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করা যায় না। আবার বিভিন্ন শিল্পের উপজাত পদার্থ পরিবেশের গুণগত মানটিকে ক্রমশই অস্বাস্থ্যকর ও বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছে। বায়ু, জল, সমুদ্র—এই গ্রহের সব অংশই আজ দূষণ জর্জরিত।

জনস্ফীতির ফলে শুধু ভৌত পরিবেশই (Physical environment) দূষিত হয় না, জৈব পরিবেশের ওপরও এর প্রভাব যথেষ্ট অনিষ্টকারী। 1961 সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জে ক্রিস্টিয়ান (J Christian) এবং তাঁর সহকর্মীরা ইঁদুরের ওপরে একটি পরীক্ষা করেন। তাঁরা দেখান যে একটি খাঁচায় ইঁদুরের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে প্রাণীগুলির মধ্যে মারামারি, কামড়াকামড়ি এবং অন্য ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। খাঁচাতে ইঁদুরের সংখ্যা

জনস্ফীতি কি অপরাধ প্রবণতা বাড়ায়?

বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে বিজ্ঞানীরা বেশি খাদ্য ও জল সরবরাহ করেছিলেন। সুতরাং ইঁদুরদের অস্বাভাবিক আচরণের পিছনে শুধু জনস্ফীতির চাপ (Population Pressure) ছাড়া আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। মানুষের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, অপরাধ প্রবণতা এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা (Mental imbalance) পৃথিবীর জনবহুল নগরগুলিতেই তুলনামূলকভাবে বেশি।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে জনস্ফীতি যে এক প্রধান অন্তরায়, তাও প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে জন্মহার সবচেয়ে বেশি, কেরালায় সবচেয়ে কম। পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের স্থান এই ব্যাপারে মাঝামাঝি জায়গায়। এইসব রাজ্যে আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতি কেমন? অর্থনীতিবিদ্ ও

সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই উন্নয়নধারা পরিমাপের জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি, যেমন স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়-বরাদ্দ, শিশুমৃত্যুর হার, শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ এবং সাক্ষরতার হার (Literacy rate) ঠিক করেছেন। ভারতের এই রাজ্যগুলির অবস্থা কেমন? নীচের সারণিতে চোখ বোলালেই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

রাজ্যের নাম	স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ (টাকায়)	শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ (টাকায়)	সাক্ষরতার হার (শতাংশে)
বিহার	15.0	91	37.0	38.5
উত্তরপ্রদেশ	19.1	118	42.1	41.7
কর্ণাটক	23.2	80	65.4	56.0
মহারাষ্ট্র	44.7	59	79.6	63.1
পশ্চিমবঙ্গ	25.[illegible]	77	68.0	57.7
কেরালা	29.3	22	103.0	90.6

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় উন্নত দেশগুলিতে জন্মহার অনেক কম। সেই দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোও অনেক বেশি মজবুত। জনসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলির আর্থসামাজিক বিকাশ সেই তুলনায় অত্যন্ত শ্লথগতিতে হচ্ছে। সুতরাং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেই হবে।

পানীয় জলে আর্সেনিক আসছে কীভাবে?

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে পানীয় জলের সঙ্গে আর্সেনিক (Arsenic, As) মিশে গিয়ে এক ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই জল নিয়মিত পান করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে চলেছেন অগণিত মানুষ। জলদূষণ শুধু বাংলার কেন, আসমুদ্র হিমাচলে ভারতের এক প্রধান সমস্যা। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু'-এর (WHO) অভিমত অনুযায়ী সমস্যাটি সব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির। জলদূষণের সমস্যাটি ছিল, কিন্তু আর্সেনিকের মত সাংঘাতিক বিষাক্ত রাসায়নিক তাতে যুক্ত হওয়ার ঘটনা অতি সাম্প্রতিক।

বলতে কি, জলদূষণ সংক্রান্ত অসুখ-বিসুখের কথা কোনো নতুন খবর নয়। বেশ পুরনো নথিপত্রেও এর প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যাবে। কিন্তু নলকূপের জলে আর্সেনিক-ঘটিত রাসায়নিক যৌগ পদার্থ (Arsenic compounds) মিশে যাবার কথা আমরা শুনছি একেবারে হালফিল। কেন আর কোথা থেকেই বা আসছে এই বিষাক্ত পদার্থ? এখানেই নানা মুনির নানা মত। কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না ঠিক কীভাবে মাটির তলার আর্সেনিক যৌগ জলের সঙ্গে মিশছে। অথচ এই তথ্য না জানতে পারলে এই সমস্যার প্রতিবিধান করাও সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম (Cadmium; Cd), ক্রোমিয়াম (Chromium; Cr), তামা (Copper, Cu), সীসা (Lead, Pb), পারদ (Mercury, Hg) ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুকে ভারী ধাতুর (Heavy metals) পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অন্যান্য মৌলিক পদার্থ ও ধাতুর তুলনায় এগুলির ঘনত্ব বেশি। অত্যন্ত অনিষ্টকারী এইসব পদার্থ প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে ঢুকে মারাত্মক বিষক্রিয়া ঘটায়।

মাটির তলায় আর্সেনিক আসে কোথা থেকে?

এই সব অনিষ্টকারী (Hazardous) পদার্থ মাটির তলায় জমে কি করে? জানা গেছে এর উৎস এক নয়, একাধিক। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যে গলিত লাভা জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসে তার মধ্যে থাকে এইসব পদার্থ। আগ্নেয়শিলা (Igneous rocks) যখন জমাট বাঁধে, তার মধ্যে পদার্থগুলি জমা থাকে। স্তরীভূত বা পাললিক শিলায় (Sedimentary rocks) আবার কিছু পরিমাণ পদার্থ ওপরের প্রবহমান জলরাশি থেকে শোষিত (Absorbed) হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে মানুষেরও কিছু ভূমিকা আছে। শিল্পের উপজাত দূষিত এবং কিছু ক্ষেত্রে অনিষ্টকারী পদার্থ খাল-বিল-নদীর মধ্যে দিয়ে এসে সমুদ্রে পড়ে। এতে জলদূষণের মাত্রা যেমন বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে নীচে মাটির স্তরের মধ্যেও এগুলি সঞ্চিত হতে থাকে।

মাটির মধ্যে যে ভাবেই আসুক, এই বিষাক্ত পদার্থগুলির পরিমাণ কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়। কোনো অঞ্চলে একটি পদার্থ অনেক বেশি পরিমাণে থাকতে পারে আবার কোনো অঞ্চলে ওই পদার্থটির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হতে পারে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরেও এগুলির পরিমাণে অনেক

তফাত দেখা যায়। আর্সেনিক ভূপৃষ্ঠের ওপর স্তরেই বেশি পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত মালদহ, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা—এই তিনটি জেলাতে আর্সেনিক সংক্রামিত জল পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, ওইসব অঞ্চলে মাটির তলায় রয়েছে আর্সেনিক ঘটিত যৌগ ফেরিক আর্সেনেট (Ferric arsenate)। ঠিক কতটা নীচে, তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে মোটামুটিভাবে আশি থেকে একশো কুড়ি মিটার মাটির নীচের স্তরেই এটি সীমাবদ্ধ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন তবু থাকছে। মাটির তলার আর্সেনিক যৌগ পানীয় জলে মিশছে কী ভাবে? আগেই বা কেন এরকম ভয়ংকর ঘটনা দেখা যায় নি। এর উত্তরটা কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি। আমাদের এই দেশ নদীমাতৃক, এখানে বৃষ্টিপাতও হয় প্রচুর পরিমাণে। তবুও ভূপৃষ্ঠের ওপরে থাকা জলাশয় (Surface water) আমাদের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারে না। ভূনিম্নস্থ জলের (Underground water) ওপরও আমাদের বেশ কিছুটা নির্ভর করতে হয়। নলকূপের সাহায্যে আমরা এই মাটির তলার ভাণ্ডার থেকে জল ওপরে টেনে তুলি। আগে নলকূপের গভীরতা বেশি হত না; কারণ ওপরের স্তরে জল ছিল প্রচুর। এখন কিন্তু মাটি আর তত সরস, জলসম্পৃক্ত নেই। জলের ভাণ্ডার ক্রমশই মাটির নীচে, আরো নীচে নেমে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে এই প্রশ্ন এখন উঠছে খুব স্বাভাবিকভাবেই।

এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথম ইউক্যালিপ্টাস (Eucalyptus) ও আকাশমণির (Acacia) মত বিদেশী গাছ লাগিয়ে অরণ্যসৃজনের (Afforestation) চেষ্টা। এগুলি মরুভূমি ও মরুভূমিসদৃশ অঞ্চলের গাছ। মাটির গভীরে খুব তাড়াতাড়ি শেকড় চালিয়ে জল টেনে নেবার ক্ষমতা এদের অসাধারণ। এইজন্যই এই গাছ বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি। এর ফলে মাটির ওপরের স্তর ক্রমশ শুকনো হয়ে যাচ্ছে, জলের ভান্ডার থেকে যাচ্ছে অনেক নীচে। ইউক্যালিপ্টাস-আকাশমণির দল শেকড় চালিয়ে এই জলভাণ্ডারের নাগাল পাচ্ছে না। দ্বিতীয় কারণটির জন্য জনস্ফীতির চাপ পরোক্ষে দায়ী। প্রতিনিয়ত দেশের জনসংখ্যা বাড়ায় অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আবার চাষবাসে বীজ ও সারের সঙ্গে জল তো লাগবেই। আগে যেসব ক্ষেত-খামারে বছরে একবার কি দু'বার ফসল হত, এখন সেখানে হচ্ছে তিন-চার বার। বেশি উৎপাদনের জন্য এখন লাগানো হচ্ছে উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল গাছপালা। এগুলির জলের চাহিদা সাধারণ জাতের চেয়ে বেশি। এইসব কারণই জলস্তরের নীচে নেমে যাওয়ার জন্য কমবেশি দায়ী।

এই জল সমস্যা সমাধানের উপায় কী? প্রথম উপায়টি সবার জানা, ক্ষেত-খামারগুলিকে সেচব্যবস্থার (Irrigation system) আওতায় আনা। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে এবং ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার প্রসার করে কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে কিন্তু এই ব্যবস্থায় তো সেই ভূস্তরের ওপরে সীমাবদ্ধ জলরাশিকেই কাজে লাগানো হয়। তাতে তো সমস্যাটি পুরোপুরি মেটার কথা নয়। অগত্যা মাটির নীচে জলের সন্ধানে গভীর নলকূপ (Deep tubewell) বসানো ছাড়া উপায় কী?

গভীর নলকূপ যতক্ষণ পর্যন্ত না আর্সেনিক স্তরে (Arsenic bed) গিয়ে পৌঁছোচ্ছে, ততক্ষণ কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যখন তা ওই স্তর থেকে জল টানছে, তখনই দেখা দিচ্ছে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। শুধু যে অঞ্চলে আর্সেনিক স্তর রয়েছে, বিপদ সেখানেই কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়।

আর্সেনিক কতটা বিপজ্জনক?

কাছাকাছি জায়গাতেও জলের সঙ্গে এই বিষাক্ত যৌগের মিশে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আর্সেনিক স্তরটি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে থাকলেও ভূনিম্নস্থ জলস্তরটি অবিচ্ছিন্ন। কাজেই এই যৌগ খুব সহজে এক জায়গা থেকে জলের সঙ্গে চুঁইয়ে গিয়ে অন্য জায়গার জলে মিশতে পারে।

আর্সেনিকযুক্ত জল পান করলে কী হয়? এক কথায় বলা যেতে পারে দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলে আর্সেনিকের পরিমাণ এবং কতদিন ধরে এই জল কেউ পান করছে, তার ওপরে অবশ্য প্রতিক্রিয়াগুলির কিছুটা তারতম্য হতে পারে। হাত পায়ের চামড়া মোটা খসখসে এবং কালো হয়ে যেতে পারে, চামড়া ফেটে গিয়ে ঘাও হতে পারে। হাত-পা ফুলে যায়। ক্রমশ রোগী চলাফেরার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। পাকস্থলী এবং

অন্ত্রের (Intestine) বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত (Ulcer) সৃষ্টি হয়। যকৃৎটি শুকিয়ে অক্ষম (liver cirrhosis) হয়ে পড়ে। চামড়া ও ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। বৃক্কের (Kidney) অস্বাভাবিক ও অপূরণীয় ক্ষতি হয়। স্নায়ুতন্ত্রটি দুর্বল আর অকেজো হয়ে পড়ে। এই সব মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার শেষ পরিণতি মৃত্যু।

কলকাতার জলে এখনও পর্যন্ত আর্সেনিক দূষণ ঘটেনি। তবে এতে একেবারে নিশ্চিন্ত হবারও কিছু নেই। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যদি কোনো বিক্ষিপ্ত আর্সেনিক স্তর থাকে তাহলে সেখান থেকে চুঁইয়ে এই শহরের ভূনিম্নস্থ জলভান্ডারটি দূষিত হতে পারে। আরো এক আশঙ্কার কথা, কলকাতার বাতাসে ভাসমান ধূলিকণায় (Particulate matter) একাধিক ধাতুচূর্ণের সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী 1992 সালে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল—শ্যামবাজার, বি-বা-দী বাগ, গড়িয়াহাট ও যাদবপুর থেকে বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা এর মধ্যে লোহা, তামা, সীসা, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট এবং ক্যাডমিয়ামের সঙ্গে সূক্ষ্ম আর্সেনিক চূর্ণও পান। জানা যায় যে, শ্যামবাজার এবং গড়িয়াহাটের বাতাসেই এর পরিমাণ তুলনায় বেশি। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর অন্য জনবহুল শহরের বাতাস কতটা এই বিষাক্ত পদার্থ ধারণ করছে তা জানতে ইচ্ছে করে। সেই খবরও পাওয়া গেছে। আর্সেনিক চূর্ণ ভাসছে বার্লিন এবং পোল্যান্ডের কটোউইস (Katowice) শহরের বাতাসে। মুম্বাই, ব্রাসেলস্ (বেলজিয়াম), রিও-ডি জেনেইরো (ব্রাজিল) এবং নিউইয়র্কের (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) বাতাসে এর চিহ্ন নেই। আশংকার কথা, কলকাতার বাতাসে যতটা আর্সেনিক কণা রয়েছে, তার পরিমাণ বার্লিনের তুলনায় দ্বিগুণ এবং কটোউইসের তিনগুণ।

বাতাসের ভাসমান আর্সেনিক কণা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে নামবে তো সেই ভূপৃষ্ঠে। কাজেই পুকুর-ঝিল, নদীর জলে ওই বিষাক্ত পদার্থ মেশার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। যেসব অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণ ইতিমধ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সেখানে অনেকে এই দূষিত জল ফুটিয়ে পান করছেন। জল ফোটালে জীবাণু মরে যাবে কিন্তু ধাতব যৌগ তো নষ্ট হবে না, তলানি (Sediment) হিসেবে পাত্রের তলায় জমবে। এই তলানিটা ফেলব কোথায়? যেখানেই ফেলি না কেন, তা আবার গিয়ে মিশবে জলাশয়ে। তারপর শাক-সবজির মধ্যে দিয়ে আবার ফিরে আসবে আমাদের শরীরে।

সমস্যা যখন আছে, তখন তার সমাধানও নিশ্চয় আছে। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে কয়েকটি কর্মসূচি ঠিক করে নিয়েছেন। প্রথম কাজ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্সেনিক স্তরটির সন্ধান। পরবর্তী পর্যায়ে ওইসব অঞ্চলে গভীর নলকূপ বসানো বন্ধ না করলেই নয় এবং এখন যে নলকূপগুলি আছে সেগুলি পরিত্যক্ত ঘোষণা করাও জরুরি হয়ে উঠছে। অবশ্য তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তাও চলছে। আর্সেনিক-যুক্ত অঞ্চলগুলিতে যতদূর সম্ভব জলাশয়ের জল শোধন করে ব্যবহার করা ছাড়া এখন আর উপায় নেই। শহরাঞ্চলের বাতাস দূষণমুক্ত রাখার জন্যও কার্যকরী বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়াও একান্ত প্রয়োজন।

সমস্যা গুরুতর—বিপদ গুরুতর। এখন আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার উপায় নেই।

উদ্ভিদবিজ্ঞান



সৃষ্টির পরে মানুষের আবির্ভাবের সময় গাছপালাই ছিল তার প্রথম সহচর। আদিম কালে অরণ্য ঘেরা পরিবেশে বাকল তাকে আচ্ছাদন দিয়েছে, শরীর গরম রাখার জন্য আগুন দিয়েছে কাঠ। আর ফল-মূল তো আছেই তার খাদ্য হিসেবে। তা ছাড়া এই গাছ মানুষের আশ্রয়স্থলও বটে। মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদের এই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের যে-শাখাটি গড়ে ওঠে তা হল উদ্ভিদ বিজ্ঞান। আমাদের চারপাশে ফুল-ফল ধরে, এমন সব গাছপালাই শুধু যে আধুনিক উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তা নয়, এর সঙ্গে রয়েছে জলজ শৈবাল, ব্যাঙের ছাতার মত ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়ার মত অতি সূক্ষ্ম অণুজীব। উদ্ভিদ বিজ্ঞান শব্দটি গ্রিক শব্দ 'বটানে' (Botane) অর্থাৎ গুল্ম থেকে এসেছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ইংরেজি নাম সেইজন্যেই Botany।

পাতা কেন ঝরে পড়ে?

যে কোনো গাছের পাতা একটু পুরনো হলেই ঝরে যায়। ঝরবার আগে পাতার রঙ সবুজ থেকে হালকা হলুদ বা ফ্যাকাশে হয়ে আসে। সাধারণত বীরুৎ জাতীয় গাছের পাতা এ-ভাবেই ঝরে। যে-জায়গায় বিশেষ ঋতু পরিবর্তন ঘটে না সেই জায়গায় বৃক্ষ জাতীয় গাছের পাতাও দু' তিন বছর অন্তর অন্তর শুকিয়ে ঝরে পড়ে। গাছে সব সময়েই সবুজ পাতা থাকে বলে এ-ব্যাপারটা তেমন নজরে আসে না। এ-ধরনের গাছ চিরহরিৎ বৃক্ষ। যেখানে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়ারও বেশ পার্থক্য দেখা যায়, সেখানে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব বৃক্ষের উপরেও লক্ষ্য করার মত। এই ধরনের বৃক্ষে বছরে একবার ক'রে কোনো পাতাই থাকে না। এদের পর্ণমোচী বৃক্ষ বলে।

কাছাকাছি কোনো অশ্বত্থ গাছ থাকলে নজরে আসবে যে, শীতকালে গাছের সব পাতাই হলদে হয়ে ঝরে গেছে। গাছ তখন শুধু শাখাযুক্ত। আবার বসন্তের আরম্ভে কচি পাতা গজাতে শুরু করে। এই ধরনের গাছের পাতা ঝরে বছরের কেবল একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে।

শীতকালে গাছের সব কাজ খুবই ধীর গতিতে চলে। ব্যাঙ যেমন শীতে ঘুম দেয় এই সব গাছও তেমনি শীতকালে অনেকটা ঘুমিয়ে কাটায়। পাতা ঝরার আগে গাছ বেশ কিছু খাবার জমিয়ে রাখে পুরো শীতটা কাটাবার জন্যে। খাবারে যাতে আর কেউ ভাগ না বসাতে পারে তাই সে তার সব পাতা খসিয়ে ফেলে। আর এই পাতা খসাবার প্রস্তুতি চলে হেমন্তকাল থেকেই।

ঝরে পড়ার আগেই পাতা থেকে খাবার-দাবার, হর্মোন সব চলে যায় ভিতরের অংশে। পাতার বোঁটা যেখানে ডালের সঙ্গে লেগে থাকে সেই জায়গায় ভিতর দিকে একটা স্তর তৈরি হয়, যাকে ছেদ স্তর বলে। এই স্তরের দু'টো অংশ—একটা বাইরের স্তর আর একটা ভিতরের স্তর। বাইরের স্তরে পাতা কাণ্ড থেকে খুলে যায় আর পাতা খসে পড়লে কাণ্ডের ভিতরে যাতে কোনো ক্ষত না দেখা দেয়, সেইজন্যে ভিতরের স্তর তৈরি হয়। ছেদ স্তরের কোষগুলি পলকা হয়ে গেলেই পাতার নিজের ভারে অথবা হাওয়ার দোলায় পাতা ডাল থেকে খসে পড়ে।

গাছ বাকল ছাড়ে কেন?

যে-সব গাছ খুবই বড়, তাদের বৃক্ষ বলে। বৃক্ষ জাতীয় গাছের গুঁড়ি থাকে। এই ধরনের গাছ যেমন লম্বায় বাড়ে, তেমনি মোটাও হয়। মোটা হলে এক সময়ে গাছের বাইরের দিক থেকে মোটা ছালের মত অংশ আলগা হয়ে খুলে পড়ে। এটাই বাকল, ইংরেজিতে Cork। বাকল খুলে পড়ে যাওয়াকেই গাছের বাকল ছাড়া বলে। বড় বড় গাছ ক্রমশ মোটা হয়। আর ক'য়েক বছর অন্তরই বাকল ছাড়তে থাকে। এই বাকল থেকেই বোতলের ছিপি তৈরি হয়।

কিন্তু গাছ বাকল ছাড়ে কেন?

গাছের বাকল না ছেড়ে কোনো উপায় থাকে না। প্রস্থে বাড়তে হলেই গাছকে বাকল ছাড়তে হবে।

দ্বিবীজ-পত্রী বৃক্ষ জাতীয় গাছ লম্বায় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থেও বেড়ে যায়। এটা এক রকমের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। প্রস্থে না বাড়লে লম্বা কাণ্ড ডালপালার ভারে কিংবা ঝড়ের দোলায় ভেঙে যেতে পারে। কাণ্ড যাতে শক্ত থাকে এবং সহজেই ভেঙ্গে না যায় সেইজন্যেই গাছ প্রস্থে বেড়ে ওঠে।

কাণ্ডের এই প্রস্থে বেড়ে ওঠা নতুন নতুন কোষ

বোতলের ছিপি বা কর্ক পাওয়া যায় কোথা থেকে?

সংযোজনের মাধ্যমেই ঘটে। কাণ্ড যখন প্রস্থে বাড়তে থাকে তখন কাণ্ডের পরিধিতে অর্থাৎ বাইরের দিকে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এর ফলে কাণ্ডের বাইরের দিককার কোষগুলি যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেইজন্যে পরিধির দিকে মাঝে মাঝেই কিছু কিছু নতুন কোষ তৈরি হয়। এই সব কোষ শক্ত দেওয়ালের মত পরিধির দিকে অনেকগুলি চক্রে সাজানো থাকে। চক্রের দেওয়াল এত বেশি শক্ত যে, ভিতর থেকে কোনো খাবারই চক্রের বাইরের কোষগুলিতে পৌঁছোতে পারে না। খাবার ও জল না পাবার জন্যে পরিধির দেওয়ালের বাইরের সব কোষই মারা যায়। তারপর ধীরে ধীরে তা শুকিয়ে আসে। পুরো শুকিয়ে গেলে কোষ স্তরগুলো এক স্তর বাকল হয়ে গাছ থেকে খসে পড়ে। এই ভাবে যতই কাণ্ড প্রস্থে বাড়তে থাকে ততই নতুন নতুন

বাকলের স্তর তৈরি হয় আর তা গাছ থেকে খসে পড়ে।

গাছে কেন ফুল ধরে?

বীজ থেকে চারা হয়, চারা থেকে কচি গাছ জন্মায়, কচি গাছ এক সময়ে বড় হয়ে ওঠে, ফুল-ফল ধরে, তারপর আবার তা শুকিয়ে মরে। ছোট ছোট গাছ ফুল-ফল দিয়ে এক বছরের ভিতরেই নিজেদের জীবন সম্পূর্ণ করে। মাঝারি এবং বড় গাছ বেঁচে থাকে অনেক বছর। এ-সবে প্রত্যেক বছরই ফুল ফোটে, ফল ধরে। যত দিন গাছে ফুল ধরে তত দিন গাছ এমনিই বাড়তে থাকে। এই সময়ে গাছে ডাল-পালা গজায়, পাতা, কুঁড়ি তৈরি হয়। তখন গাছ লম্বাতেও বেড়ে চলে। গাছের কাণ্ডের আগায় যে মুকুল থাকে, তাকে অগ্র মুকুল বা শীর্ষ মুকুল বলে, সেই মুকুলই গাছকে লম্বায় বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে। গাছের পাতা যেখানে কাণ্ডের সঙ্গে মিলেছে সেখানেও এক ধরনের মুকুল আছে, এই মুকুল কাক্ষিক মুকুল। কাক্ষিক মুকুল থেকেই শাখা বা ডাল তৈরি হয়। এ-ভাবেই গাছ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে।

বছরের কোনো একটা সময়ে কিংবা সারা বছর ধরেই কোনো কোনো কাক্ষিক মুকুল বা অনেক সময়ে অগ্র মুকুল বাড়তে পারে না। মুকুল যে বাড়তে পারে না তাই নয়, ওই মুকুল থেকে ফুল তৈরি হয়। তাই একে বলে পুষ্প মুকুল। আর যে-মুকুল থেকে শাখা তৈরি হয় তা হল অঙ্গজ মুকুল।

অঙ্গজ মুকুল পুষ্প মুকুলে পরিণত হলেই গাছে ফুল ধরবে, না হলে কখনোই নয়। কিন্তু কি ভাবে এই অঙ্গজ মুকুল পুষ্প মুকুলে পরিবর্তিত হয়?

গাছের বৃদ্ধি অঙ্গজ মুকুলের সাহায্যে হলেও ভিতরের ব্যাপারটার মূলে রয়েছে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। এ হল হর্মোন। এর প্রভাবেই মুকুল থেকে শাখা তৈরি হয়।

> **গাছকে কে লম্বায় বাড়তে সাহায্য করে?**

অঙ্গজ মুকুল যখন পুষ্প মুকুলে পরিবর্তিত হয় তখন সাধারণত আলো এবং তাপমাত্রার প্রভাবে একটা আলাদা ধরনের হর্মোন গাছে তৈরি হতে থাকে। এই হর্মোন বেশি তৈরি হলে মুকুলে সঞ্চিত হয় আর তখনই সেই অঙ্গজ মুকুল পুষ্প মুকুলে পরিণত হয়। পুষ্প মুকুল একবার তৈরি হলে হর্মোনের কাজ দ্রুত হতে থাকে, ফলে পুষ্প মুকুল থেকে ফুল হয়। আসলে পুষ্প মুকুল তৈরির জন্য যে হর্মোন গাছে জমে তার প্রভাবে প্রথমে অঙ্গজ মুকুলের গঠনের পরিবর্তন ঘটে। আর তার ফলেই অঙ্গজ মুকুল থেকে পুষ্প মুকুল তৈরি হয়। পুষ্প মুকুল থেকে ফুল তৈরির ঘটনাও হর্মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

গাছ থাকলে বৃষ্টি বেশি হয় কেন?

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, গাছ লাগাও, গাছকে বাঁচাও, নিজেও বাঁচো। গাছের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্পর্কের জন্যেই এমন আওয়াজ। তার মানে এই নয় যে, যেখানে বন-জঙ্গল থাকবে না সেখানে বৃষ্টিপাত হবে না। কিংবা বৃষ্টিপাত শুধুই বন-জঙ্গল যেখানে আছে সেখানেই হবে, আশেপাশে নয়।

মৌসুমী বায়ু থেকে যে বৃষ্টিপাত হয় তা হয় অনেকটা জায়গা জুড়ে, সেখানে গাছপালার ভূমিকা নগণ্য। কিন্তু যে-বৃষ্টিপাত স্থানীয় বৃষ্টিপাত হিসেবে অল্প জায়গাতেই সীমাবদ্ধ

> **মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে গাছপালার সম্পর্ক কতটা?**

থাকে তাই কেবল মাত্র গাছের দ্বারা প্রভাবিত হয়। গাছ বেশি থাকলে স্থানীয় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বাড়ে, সমীক্ষায় দেখা গেছে।

কিন্তু গাছ থাকলে স্থানীয় বৃষ্টি কেন হয়? সাধারণভাবে বলতে গেলে বাতাসে জলের ভাগ অনেকটা বেশি হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত হবে। শুকনো বাতাস বা মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না।

যে-এলাকায় খুব বেশি গাছ রয়েছে অর্থাৎ যেখানে খুব বেশি বন-জঙ্গল, সেখানকার গাছপালা মাটি থেকে একসঙ্গে অনেকটা জল শুষে নেয়। সেই জল গাছের পাতা থেকে দিনের বেলায় বাষ্পমোচনের মাধ্যমে বেরিয়ে উপরে উঠতে থাকে। জঙ্গলে অনেক গাছ থাকায় অনেকটা বাষ্প

একসঙ্গে আকাশে উঠে যায় আর বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। এই জলীয় বাষ্প যখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, তখনই বৃষ্টি হয়ে নীচে নামতে থাকে। একসঙ্গে অনেকটা জলীয় বাষ্প এক জায়গায় থেকে যায় বলেই সেখানে স্থানীয় বৃষ্টিপাত ঘটে।

সব গাছে সব সময়ে ফুল ধরে না কেন?

সপুষ্পক উদ্ভিদেই সাধারণত ফুল ধরে। কোনো কোনো গাছে সারা বছরই ফুল ফোটে, আবার কোনো গাছে বছরে একবার মাত্র ফুল দেখা দেয়। জবা গাছে সারা বছরই ফুল ধরে, কিন্তু শিউলি ফোটে কেবল শরৎকালে, আর আম গাছে মুকুল ধরে শুধু বসন্তকালে। বেশির ভাগ গাছেই বছরের কোনো এক ঋতুতেই কেবল ফুল ফোটে। কোন গাছে কখন ফুল ফুটবে, সে ব্যাপারটা কে ঠিক ক'রে দেয়? আর কেনই বা এমন ব্যাপার ঘটে থাকে?

গাছে ফুল ধরার ব্যাপারটা এমন নিয়মমাফিক যে, কোনো গাছে ফুল ধরা দেখেই তখন কি ঋতু চলছে তা সহজেই বলে দেওয়া যায়। শিউলি গাছে ফুল ধরলেই বলে দেওয়া যায় যে, এখন শরৎকাল। এ নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু কেন এমন হয়?

ফুল ধরবার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানতে পেরেছেন যে, দিনের আলো এবং তাপমাত্রাই গাছের ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। কোনো কোনো গাছে বেশি দিনের আলো ও উচ্চ তাপমাত্রা পেলেই ফুল ফুটতে শুরু করে। দিনের আলো বেশি পায় বলে এদের দীর্ঘ দিনের গাছ বলে। গ্রীষ্মকালে দিন বড় থাকে

দিনের আলোর সঙ্গে কি ফুল ফোটার সম্পর্ক আছে?

এবং তখন তাপমাত্রাও বেশি। এর প্রভাবে এই জাতীয় গাছের পাতায় এক ধরনের হর্মোন তৈরি হয়। সেই হর্মোন পুষ্প মুকুল গঠন করতে সাহায্য করে। এইসব গাছে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে ফুল ফুটতে শুরু করে শরৎকালে। শিউলি গাছ এর একটা দৃষ্টান্ত।

আবার কতকগুলি গাছ আছে যাদের ফুল ধরবার জন্য কম আলো আর কম তাপমাত্রা দরকার। এদের বলা হয় হ্রস্ব দিনের গাছ। শীতকালে দিন ছোট এবং তাপমাত্রাও কম থাকে। ছোট দিন এবং কম তাপমাত্রার প্রভাবে এই জাতীয় গাছের পাতায় ফুল ফোটানোর জন্যে হর্মোন তৈরি হয়। এই হর্মোনের প্রভাবেই বসন্তকালে এইসব গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। আম গাছ এই ধরনের গাছ।

জবা গাছে সারা বছরই ফুল ধরে, তাই জবা গাছকে দিনের আলো নিরপেক্ষ গাছ বলে। দিনের আলো বেশি বা কমে এদের উপরে একই ধরনের প্রভাব পড়ে। আলোর প্রভাবে ফুল ফোটানোর জন্য যে হর্মোন গাছের পাতায় তৈরি হয় তার নাম 'ফ্লোরিজেন'।

সব ফুল থেকেই ফল হয় না কেন?

আমরা জানি প্রকৃতির নিয়মে ফুল থেকেই ফল হয়। সব নিয়মেরই যেমন ব্যতিক্রম থাকে তেমনি প্রকৃতির নিয়মেরও ব্যতিক্রম রয়েছে। অনেক গাছেই ফুল ধরলেও তা থেকে ফল হয় না। আমাদের খুবই পরিচিত গাছ জবা। জবা গাছে ফুল ধরলেও তা থেকে ফল হয় না।

সপুষ্পক গাছ ফুল এবং ফল তৈরি করে নিজের বংশ বৃদ্ধি করবার জন্যে। ফুল থেকে ফল হয়, ফলের ভিতরে

কোন গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে দিলেই নতুন গাছের জন্ম হয়?

বীজ হয়। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন গাছ তৈরি করে। আর এ-ভাবেই সপুষ্পক গাছেরা নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে যায়।

যে-গাছে ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না, সেই গাছের ডালপালা থেকে নতুন গাছ তৈরি করা যায়। এদের বেলায় ডাল বা শাখা মাটিতে পুঁতে দিলেই নতুন গাছের জন্ম হয়।

সব ফুল থেকে কেন ফল হয় না জানতে হলে ফুল থেকে কি ক'রে ফল হয় আগে তা জানা দরকার। ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বেরিয়ে গর্ভমুণ্ডে এসে পড়ে। গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণু অঙ্কুরিত হলে পরাগরেণু থেকে একটা লম্বা পরাগনালী বেরিয়ে গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়ে নামতে

নামতে একেবারে গর্ভাশয়ের ভিতরে এসে পৌঁছোয়। পরাগনালীতে পুরুষ কোষ বা শুক্রাণু থাকে আর গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বকে আছে স্ত্রীকোষ বা ডিম্বাণু। পরাগনালীর শুক্রাণু এবং ডিম্বকের ডিম্বাণু মিলিত হলেই ডিম্বক থেকে বীজ এবং ডিম্বাশয় থেকে ফল তৈরি হয়।

এই পুরো ব্যাপারটার যে কোনো একটা জায়গায় বাধা পড়লে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে আর মিলতে পারে না। সেইজন্যে ফলও তৈরি হয় না। অনেক সময়ে গর্ভমুণ্ডের শুষ্কতার জন্য পরাগরেণু অঙ্কুরিতই হয় না। আবার পরাগনালী কখনো এত ছোট হয় যে তা ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারে না। তা ছাড়া এমনও হতে পারে পরাগরেণু ডিম্বাণুর আগেই পরিণত হল। বা ডিম্বাণু পরিণত হল পরাগরেণুর আগে। এই রকমের নানা ধরনের কারণের জন্যে ফুল হলেও গাছে ফল হতে পারে না।

একবীজ-পত্রী গাছের জোড় কলম তৈরি হয় না কেন?

গাছের বংশ বৃদ্ধির জন্যেই গাছে ফুল হয়, ফুল থেকে আবার ফল। ফলে যে-বীজ থাকে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়েই নতুন গাছ তৈরি হয়। এ-ভাবেই সাধারণত ফুলের গাছ নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, একেই গাছের বংশবৃদ্ধি বলে। প্রকৃতিতে দেখা গেছে সব ফুলের গাছেই ফল ধরে না। সাধারণত যে সব ফুল দেখতে সুন্দর তাদের বেলায় ফল তৈরি হয় না। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা এর দৃষ্টান্ত। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা অবশ্য নয়।

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে ভাল ফুল কিংবা ভাল ফলের দিকেই নজর দিয়েছে। খারাপ ফুল বা খারাপ ফলের গাছ থেকে ভাল ফুল বা ফল কি ক'রে তৈরি করা যায় তারও উপায় মানুষ বের করেছে। এই উপায়ের একটা হল জোড় কলম তৈরি করা। জোড় কলমে একটা ভাল ফুল বা ফলের গাছের ডাল কেটে অন্য খারাপ ফুল বা ফলের গাছের কাটা ডালের অংশে জোড়া লাগিয়ে বেঁধে দিতে হয়। কিছুদিন পরে দেখা যায়, দু'টো অংশই জুড়ে গিয়ে একটা হয়ে গেছে। গাছটা ভাল জাতের না হলেও জোড়া ডাল থেকে যে-ফুল বা ফল হবে তা সবই ভাল জাতের হতে থাকবে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, দ্বি-বীজপত্রী গাছেই (যেমন, আম, জাম গাছ) জোড় কলম তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু এক-বীজপত্রী গাছে (যেমন ধান, গম, ভুট্টা গাছ) নয়। এ-ব্যাপারটা কেন হয়? কেন এক-বীজপত্রী গাছে জোড় কলম তৈরি করা যায় না জানতে হলে দ্বি-বীজপত্রী এবং এক-বীজপত্রী কাণ্ডের ভিতরের গঠন জানা দরকার।

দ্বি-বীজপত্রী গাছের কাণ্ডের ভিতরে কতগুলি নলের মত কোষ থাকে। এগুলো এক সঙ্গে মিলে একটা কলা তৈরি করে। এর নাম নালিকা বাণ্ডিল। নালিকা বাণ্ডিল কাণ্ডের ভিতরে একটা চক্রে সাজানো। নালিকা বাণ্ডিলের ভিতরে এক ধরনের ভাজক কলা আছে, এদের ক্যাম্বিয়াম বলে। ক্যাম্বিয়াম কলাও একটা চক্রে সাজানো থাকে। ক্যাম্বিয়ামের কোষ বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ তৈরি করতে পারে।

> **ধান গাছে কলম তৈরি**
> **করা যায় কি?**

এক-বীজপত্রী গাছের কাণ্ডের ভিতরে নালিকা বাণ্ডিলগুলো ছড়ানো এবং তাতে কোনো ক্যাম্বিয়ামও থাকে না। ক্যাম্বিয়াম না থাকায় কোনো নতুন কোষও তৈরি হয় না।

দ্বি-বীজপত্রী গাছের জোড় কলম তৈরির সময়ে দু'টো গাছের কাটা অংশের নালিকা বাণ্ডিল এবং ক্যাম্বিয়াম কাছাকাছি থাকে। ক্যাম্বিয়াম কোষগুলি বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ তৈরি করে। এর ফলেই জোড় কলমের কাটা অংশ দু'টো জুড়ে যায়।

কিন্তু এক-বীজপত্রী গাছের কাণ্ডে ক্যাম্বিয়াম না থাকায় কোনো নতুন কোষ তৈরি হয় না। আর তা না হলে জোড় কলমের কাটা অংশ দু'টো জুড়বেও না। ফলে এক-বীজপত্রী গাছে জোড় কলম তৈরি করা সম্ভব নয়।

লতানে গাছের বাড় কেন বেশি হয়?

লাউ, কুমড়ো, সীম, শশা যে কোনো গাছ লাগালেই দেখা যাবে যে, তা তরতর করে বেড়ে উঠছে। গাছগুলো অল্প জায়গায় যাতে ভাল ক'রে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পারে তার জন্যে চাষীরা বাঁশ দিয়ে মাচাও তৈরি ক'রে দেয়।

বাঁশের মাচার তলা দিয়ে গাছের ফল ঝুলতে থাকে। এই সব গাছ কোনো কিছুকে আশ্রয় ক'রে লতিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। খুবই কম সময়ের মধ্যে এই ধরনের গাছ এত বেশি ছড়িয়ে পড়ে যে, ভাবলে অবাক হতে হয়। কিন্তু একই সময়ে লাগানো আম, জাম কিংবা বট গাছের এত বেশি বাড় হয় না। অথচ লতানে গাছের এত দ্রুত বেড়ে ওঠার কারণ কি?

বিজ্ঞানীরা আর পাঁচটা গাছের বৃদ্ধির গতির সঙ্গে লতানে গাছের বৃদ্ধির গতির হারের তুলনামূলক আলোচনা ক'রেই কতকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

লতানে গাছের ডালপালা, পাতা-মূল পরীক্ষা করলে একটা জিনিস সহজেই ধরা পড়ে যে, লতানে গাছের শিকড় বেশি বড় হয় না। এর শিকড় মাটির তলায় অল্প একটু গিয়েই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এক টানেই শিকড় শুদ্ধ গাছটাকে তুলে ফেলা সম্ভব। অথচ জবা, ধুতরো, আম কিংবা জাম গাছের শিকড় ধরে জোরে টানলেও ওই সব গাছ তোলা যায় না। এদের শিকড় খুবই বড় এবং মাটির গভীরে ঢুকে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ শিকড় তৈরি করতে কিংবা শিকড়ের পুষ্টি জোগাড় করতে যে-পরিমাণ খাবার লতানে গাছের দরকার অন্য গাছে প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি। লতানে গাছে শিকড়ের জন্যে কম খাবার লাগে বলে খাবারের বেশির ভাগটাই গাছের অন্যান্য বৃদ্ধির কাজে লাগতে পারে।

এই গাছের কাণ্ডও অন্যান্য গাছের কাণ্ডের তুলনায় সরু হয়। সরু কাণ্ডে কাণ্ড তৈরির বস্তু কম লাগে বলে সেই

লতানে গাছের কাণ্ড সরু কেন?

বস্তু কাণ্ডটিকে লম্বায় বেশি বাড়াতে পারে। এই কারণেই লতানে গাছের কাণ্ড সরু হলেও লম্বায় অন্যান্য গাছের কাণ্ডের চাইতে অনেকগুণ বড়।

লতানে গাছের মধ্যেও লাউ, কুমড়োর মত যাদের পাতা কম, তারা আয়তনে বড় হয় আর পাতা বেশি হলে সীমের মত আয়তনে ছোট হয়। অন্যান্য গাছের সব পাতার মিলিত আয়তন যত, লতানে গাছের সব পাতার মিলিত আয়তনও ততটাই। পুরো একটা আম গাছের পাতার আয়তন যা হবে একটা কুমড়ো গাছের পাতার আয়তনও ঠিক ততটাই। পাতার মিলিত আয়তন এক হবার জন্যে আম গাছ যতটা খাদ্য তৈরি করতে পারে কুমড়ো গাছও ততটাই খাবার তৈরি ক'রে থাকে। খাবার একই তৈরি হলেও আম গাছের কাণ্ড, শাখা, মূল তৈরি এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আম গাছে বেশি ব্যয় হয়, তাই আম গাছের লম্বায় বৃদ্ধির হার কম। কুমড়ো গাছে অন্যান্য ব্যাপারে খাদ্য কম ব্যয় হয় বলে বাকি খাবার কুমড়ো গাছ লম্বা হওয়ার জন্যে ব্যয় করে। এই কারণেই লতানে গাছের বাড় বেশি হয়ে থাকে।

পাতা কেন চ্যাপ্টা হয়?

যে-কোনো গাছকে চিনতে হলে তার পাতাগুলোকে ভাল ক'রে লক্ষ্য করা দরকার। পাতা দেখেই গাছ চেনা সব চাইতে সহজ। কোনো গাছের পাতাই অন্য কোনো গাছের পাতার সঙ্গে মেলে না। পাতা না থাকলে আম, জাম, অশ্বত্থ

পাতা কেন লম্বা হয়?

সব গাছই একরকম মনে হয়। কিন্তু আম পাতা, জাম পাতা এবং অশ্বত্থ পাতা দেখলেই আমরা তাদের চিনতে পারি।

সপুষ্পক গাছে পাতা কাণ্ডের বা শাখার পর্ব থেকে বের হয়। পাতায় সাধারণত বোঁটা এবং ফলক থাকে। অনেক পাতায় ফলক থাকলেও বোঁটা নেই। ফলক কিন্তু সব পাতাতেই আছে। পাতায় ফলকের চেহারা ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রায় সব ফলকই চ্যাপ্টা এবং প্রসারিত হয়। কিন্তু ঝাউ গাছের পাতা কিংবা পাইন গাছের পাতা চ্যাপ্টা নয়। এদের পাতা ছুঁচের মত সরু এবং লম্বা। তবে বেশির ভাগ গাছের পাতাই কেন চ্যাপ্টা আর প্রসারিত?

পাতার ফলকের চেহারাটা কেমন হবে তা নির্ভর করে পাতাকে কি ধরনের কাজ করতে হবে তার উপরে। পাতার প্রধানত দু'টো কাজ—সূর্যের আলো গ্রহণ করা এবং শরীরের বেশি জল বাষ্পাকারে বের ক'রে দেওয়া।

গাছ পাতা দিয়েই প্রধানত সূর্যের আলো নিয়ে থাকে। এই আলো নিয়ে সে তার নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে। সূর্যের আলো বেশি ক'রে নিতে পারলে খাবারও বেশি তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু আলো কম পেলে তৈরি খাবারের পরিমাণও কমে যাবে। পাতা বেশি ক'রে যাতে

সূর্যের আলো পায় তার জন্যেই পাতা প্রসারিত হয়। কিন্তু তা কতটা প্রসারিত হবে সেটা নির্ভর করবে গাছের খাবারের প্রয়োজন অনুযায়ী।

আবার সূর্যের আলো পেয়ে পাতার সব কোষই যাতে খাবার তৈরি করতে পারে পাতা চ্যাপ্টাও হয় সেইজন্যেই। পাতা চ্যাপ্টা না হয়ে মোটা এবং গোল হলে ভিতরের কোষগুলোয় কোনো আলো পৌঁছতে পারতো না আর ওই কোষগুলোর পক্ষে খাবার তৈরি করাও সম্ভব হত না। ফলে পাতায় কোষ অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতো। তাই যাতে সব কোষই খাবার তৈরি করতে পারে আর সমান আলো পায়, এইজন্যই পাতা চ্যাপ্টা।

পাতা থেকে জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। এই জল সূর্যের তাপ নিয়েই বাষ্প হয়। পাতা পাতলা বলে সব কোষই সমান তাপ পায়। ফলে সব কোষেরই অতিরিক্ত জল বাষ্প হয়ে যায়। কিন্তু পাতা পুরু হলে ভিতরের কোষে সূর্যের তাপ পৌঁছতো না আর সেখানকার জলও বাষ্পীভূত হত না। ফলে জল জমে পাতার কাজও বন্ধ হয়ে যেত। এই কারণেও পাতা চ্যাপ্টা আর প্রসারিত হয়।

পাহাড়ের উঁচুতে গাছ কেন ছোট হয়ে যায়?

সাধারণত সমতলে আমাদের চারপাশে ছোট বড় অনেক গাছই আমরা দেখতে পাই। একেবারে ছোট ছোট বীরুৎ থেকে জবা, ধুতরোর মত গুল্ম এবং আম, জাম, কাঁঠালের মত বৃক্ষও আমাদের চোখে পড়ে। জবা গাছ কোনো দিনই আম গাছের মত বড় হয় না বা হবে না। তেমনি সব আম গাছ সমান উচ্চতার না হলেও মোটামুটিভাবে একই ধরনের উচ্চতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। বয়সের কম-বেশির জন্যই সাধারণত আম গাছ ছোট বড় হয়। এ-ছাড়া পুষ্টির জোগান কম-বেশি হলেও গাছের বাড় কম-বেশি হয়ে থাকে। এ-ব্যাপারটা সব গাছের বেলায়ই প্রযোজ্য। পুষ্টি ছাড়াও গাছের বৃদ্ধি আলো, হাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের উপরেও নির্ভর করে। বেশি রোদ্দুরের গাছ কম রোদ্দুরের গাছের চাইতে ছোট আর বেশি বৃষ্টিপাতের জায়গার গাছ কম বৃষ্টিপাতের জায়গার চাইতে বড় হয়। অর্থাৎ পরিবেশ গাছের বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে অনেকটা প্রভাবিত করে।

পাহাড়ে উঠলে দেখা যায় যে, গাছের ধরন-ধারণও পাল্টে যাচ্ছে। যে-গাছ সমতলে নজরে আসে পাহাড়ের উপরে উঁচুতে তা আর দেখা যায় না। আবার পাহাড়ের উপরে যতই উঁচুতে ওঠা যায় একই গাছের উচ্চতা যেন ততই কমতে থাকে। এ ব্যাপারটা রোডোডেন্ড্রন গাছের বেলায় বেশি ক'রে চোখে পড়ে। যে রোডোডেন্ড্রন গাছ মাঝ পাহাড়ে বেশ লম্বা সেই গাছই পাহাড়ের উপরে আস্তে আস্তে বেঁটে হতে থাকে। উপরের গাছ তুলে এনে নীচে লাগালে বেঁটে গাছই বেড়ে লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু কেন?

বেশি রোদ্দুরের গাছ কি কম রোদ্দুরের গাছের চেয়ে ছোট হয়?

পাহাড়ের যত উঁচুতে ওঠা যায় ততই গাছপালার সংখ্যা কমতে থাকে। কমে আসে বড় বড় গাছের সংখ্যাও। উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার গতি বেড়ে যায়, মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝড় বয়। এই ঝড়ের তোড়ে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে। তা ছাড়া যতই উপরে ওঠা যায় হাওয়ার তেজ, হাওয়ার শুষ্কতা, শীত ততই বাড়তে থাকে। ফলে গাছ থেকে বেশি ক'রে জল বেরিয়ে যেতে চায়। অথচ উপরে মাটির পরিমাণ এবং মাটিতে জলের পরিমাণও কমে আসে। জলের জোগান কম কিন্তু জল বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা বেশি। এই দু'য়ের টানা-পোড়েনে গাছের বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ জল থাকে না, তাই গাছের বাড়ও কম হয়। এ ব্যাপারটা পাহাড়ের যত উপরে ওঠা যায় ততই বেশি ঘটে বলে যতই পাহাড়ের চূড়োর দিকে এগনো যায় গাছগুলো ততই বেঁটে হতে থাকে।

বীজ কেন ঘুমোয়?

ক্লান্ত শরীর ঘুম চায়। ঘুম শরীরের ক্লান্তি মুছিয়ে দেয়। তাই মানুষকে ঘুমোতে হয়। প্রাণীরাও এক সময়ে ঘুমিয়ে নেয়। কিন্তু বীজের ঘুম? সে আবার কি? ব্যাপারটা ভাবলে অবাকই হতে হয়।

বীজের ঘুম অনেকটাই মানুষের ঘুমের মত। অবশ্য মানুষের ঘুমটাকে শুধু চোখ বন্ধ ক'রে থাকা না ভেবে শরীরের পুরো বিশ্রাম বলে ধরতে হবে।

তবে সব বীজই যে ঘুমোয় এমন নয়। অনেক বীজ

আছে যারা একেবারেই ঘুমোয় না। যেমন, ছোলা, মটর ইত্যাদি ফলের বীজ ফল থেকে বেরিয়েই অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু যে বীজ ঘুমোয় তারা ফল থেকে বেরিয়েই অঙ্কুরিত হতে পারে না। অঙ্কুরিত হতে তাদের বেশ কিছুদিন সময় লাগে। এই সময়টা কিন্তু কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্তও হয়ে থাকে। তখন খাবার-দাবার, জল, তাপমাত্রা, আলো, সব কিছু পেলেও বীজগুলি অঙ্কুরিত হয় না। বীজের এই সময়টাকেই ঘুম-কাল বা সুপ্তি-দশা বলে। এই সময় পেরিয়ে গেলে এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে বীজ নিজে নিজেই অঙ্কুরিত হয়ে পড়বে।

সব বীজ যে কেন ঘুমোয় না এ-ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা অনেকেই নীরব। তবে বীজ কেন ঘুমোয় এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নানারকমের কারণ দেখিয়েছেন। সব ক্ষেত্রেই একটা ব্যাপার জানা গেছে যে, বীজের ভিতরে এমন কোনো জিনিস তৈরি হয়, বা আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে যা বীজকে অঙ্কুরিত হতে দেয় না। এই জিনিসটি এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ, যার পরিমাণের পার্থক্যের জন্যই বীজের ঘুম-দশা কম বা বেশি হয়ে থাকে। এই যৌগের নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন 'ডরমিন'। ডরমিনের প্রভাবেই বীজ ঘুমিয়ে থাকে এবং অঙ্কুরিত হতে পারে না।

কিন্তু যখন বীজের ঘুম-দশা কেটে গিয়ে বীজ অঙ্কুরিত হয় তখন কি ডরমিন আর বীজে থাকে না? নাকি ডরমিন নষ্ট হয়ে যায় বলেই বীজের সুপ্তি-দশা কেটে যায় এবং বীজ আবার অঙ্কুরিত হতে পারে?

মটর বীজ কি একেবারেই ঘুমোয় না?

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বীজের অঙ্কুরণের জন্য এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ দরকার যার প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে। এই যৌগকে অকসিন বলে। বীজের ঘুমন্ত অবস্থায় অকসিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে। কারণ ঘুম-দশায় ডরমিন অকসিনগুলিকে বেঁধে অকেজো ক'রে ফেলে, আর তাইতেই বীজ ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম-দশা চলাকালে পরিবেশের বিভিন্ন শর্তের প্রভাবে বীজ অঙ্কুরণ হর্মোন অকসিন তৈরি হতে শুরু করে। এই হর্মোন যখন ডরমিনের চাইতে বেশি হয়ে যায় তখনই বীজের ঘুম-দশা কেটে যায় এবং বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজে ডরমিনের পরিমাণ কম থাকলে হর্মোন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে ডরমিনকে অকেজো ক'রে ফেলে এবং বীজের ঘুম-দশা তাড়াতাড়ি কেটে যায়। আবার ডরমিন বেশি থাকলে বেশি হর্মোন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বীজের সুপ্তি-দশা কাটে না। এতে সময়ও বেশি লাগে, তাই বীজের ঘুম-দশাও বেশি সময় স্থায়ী হয়।

দিনে ফোটা ফুল রঙিন হয় কেন?

ফুল দেখে ভাল লাগে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার। তবে সব ফুলই যে সুন্দর এমন নয়। অধিকাংশ ফুলই দেখতে ভাল হয় না। যে-ফুলের রঙ উজ্জ্বল বা যে-ফুল দেখতে ভাল তারাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু আমাদের কেন, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবাই ফুলের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে ছুটে আসে ফুলের স্পর্শ পাওয়ার জন্য। কিন্তু ফুল কেন সুন্দর হয়? গাছ কি আমাদের ব্যবহারের জন্যেই সুন্দর ফুল ফুটিয়ে রেখেছে, নাকি তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে?

ফুল ফোটালেই তো আর গাছের চলবে না, ফুল থেকে যাতে ফল হয় তারও বন্দোবস্ত করতে হবে। ফল না ধরালে গাছের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে না। সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে ক্রমে সেই গাছের অবলুপ্তি ঘটবে।

গাছ ফুল তৈরি করতে পারে। কিন্তু অনেক গাছেরই ফুল থেকে ফল হবার ব্যাপারটা সেই গাছের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। একটা ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হলেই ফল তৈরি হওয়ার কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। ফল হলে ফলের ভিতরেই বীজ তৈরি হয়। এই বীজ অঙ্কুরিত হয়েই জন্ম নেয় নতুন গাছ। এ-ভাবেই গাছ তার বংশ বৃদ্ধি ক'রে চলেছে।

পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরের পর্যায়ে ফুলের কোনো হাত নেই। এ-ব্যাপারে ফুলকে অনেকটাই নির্ভর করতে হয় কীট-পতঙ্গের উপরে। কীট-পতঙ্গ এক ফুল থেকে পরাগরেণু বয়ে নিয়ে যায় অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে। এ-ভাবেই পরাগরেণুর স্থানান্তরণ ঘটে। প্রকৃতিতে সব কাজেরই উদ্দেশ্য থাকে। কীট-পতঙ্গই বা বিনা স্বার্থে ফুলের পরাগরেণু বয়ে নিয়ে যাবে কেন? কিন্তু তা না হলে গাছের বংশ লোপ পাবে। তাই কীট-পতঙ্গকে কাছে টানার জন্যে

গাছ নানারকমের কৌশল অবলম্বন করে। মানুষ যেমন সাজগোজ ক'রে নিজেকে অন্যের কাছে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে, তেমনি গাছেরাও সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়ে নিজেদের সুন্দর ক'রে তোলে, যাতে কীট-পতঙ্গের কাছে তারা আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ফুলের পাপড়ির এই রঙ পাপড়ি-কোষে অ্যান্থোসায়ানিন, ক্যারোটিন জাতের নানা রকমের রঙ্গক থাকার জন্যেই হয়। ফুলের পাপড়ির যত সব বাহারে রঙ এবং গঠন সবই কীট-পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাছে টানার জন্যে, যাতে তারা এসে পরাগরেণু নিয়ে যেতে পারে। যে-রঙ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা কিন্তু পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। সে-জন্যে ফুলের পাপড়ির রঙ পতঙ্গের উপযোগী হয়ে তৈরি হয়। ফুলের গড়ন অনুযায়ী এক এক ধরনের কীট বা পতঙ্গ এক এক ধরনের ফুলে আসে। ভিন্ন ভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন পতঙ্গকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই ফুলের পাপড়ির বর্ণও ভিন্ন হয়ে থাকে। রঙিন ফুলের রঙ পতঙ্গ দিনের বেলায় ভাল দেখতে পায় বলে যে-ফুল দিনের বেলায় ফোটে তাদেরই পাপড়িগুলো রঙিন হয়ে থাকে। রাত্তিরে ফোটা ফুল সাধারণত বর্ণহীন হয়। তবে তাদের বেশির ভাগেরই গন্ধ থাকে। কারণ রঙের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গন্ধও পতঙ্গকে আকর্ষণ করে।

পরাগরেণুর স্থানান্তরের জন্যে কীট-পতঙ্গের প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনের কথা ভেবেই ফুলের পাপড়ি রঙিন হয়।

ফুল কেন পতঙ্গকে কাছে টানে?

প্রকৃতিতে সব ফুলই সুন্দর হয় না। আমরা শুধু সুন্দর ফুল দেখেই আনন্দিত হই। যে-ফুল দেখতে ভাল নয় তার দিকে ফিরেও তাকাই না। কীট-পতঙ্গও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। তারাও ফুলের শোভায় আকৃষ্ট হয়। তাই কীট-পতঙ্গকে ফুলের কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। সুন্দর ফুলের আকর্ষণ তাই সর্বজনীন।

আমাদের মত কীট-পতঙ্গও ফুলের রঙিন পাপড়ির উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হলেও ওদের আকর্ষণের কারণ আমাদের কারণ থেকে কিছুটা ভিন্ন। কীট-পতঙ্গ প্রধানত খাবারের সন্ধানে ফুলের কাছে যায়। ফুল তার বিভিন্ন অঙ্গে কীটের খাবার মজুত ক'রে রাখে। এই খাবার থাকে কতকগুলি গ্রন্থির ভিতরে। এদের মধুগ্রন্থি বলে। মধুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত মধুর লোভে কীটেরা ফুলের ভিতরে প্রবেশ করে। ফুলের মধুতে সুক্রোজ (ইক্ষু শর্করা), ফ্রুক্টোজ (ফল শর্করা), গ্লুকোজ (দ্রাক্ষা শর্করা), উদ্বায়ী তেল এবং কিছু পরিমাণ খনিজ মৌল থাকে।

মধুগ্রন্থি ছাড়াও অনেক ফুলের আতর গ্রন্থি আছে। এই আতর গ্রন্থি থেকে আতর বেরিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

কীট-পতঙ্গ কী রকম আলো পছন্দ করে?

কীট-পতঙ্গ তাদের শুঙ্গ দিয়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে ফুলের ভিতরে প্রবেশ করে। অর্থাৎ আতরের গন্ধ ছড়িয়েও ফুল কীট-পতঙ্গকে কাছে টানে।

অবশ্য খাবারের লোভ কিংবা সুগন্ধ ছড়িয়েও অনেক সময়ে কীট-পতঙ্গদের কাছে টানা যায় না। তাই পতঙ্গদের কাছে টানার জন্যে ফুলকে বেশ সাজগোজ করতে হয়। যেমন, আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন ফুলের ভিন্ন ভিন্ন গঠন। কোথাও পাপড়িগুলো ছড়ানো, কোথাও একটা পাপড়ি ধ্বজার মত বড় হয়ে হাওয়ায় দুলছে, কোথাও বা পাপড়ি আসনের মত হয়ে কীট-পতঙ্গদের বসার জায়গা ক'রে দিয়েছে। এ-ভাবেই কীট-পতঙ্গের মন ভুলনোর জন্যে ফুলের ভিতরে নানা ধরনের বন্দোবস্ত করা থাকে। কারণ পরীক্ষায় দেখা গেছে, কীট-পতঙ্গ শুধু ফুলের বর্ণেই আকৃষ্ট হয় না, ফুলের নানা ধরনের গড়নও তাদের নানাভাবে আকৃষ্ট ক'রে থাকে। ফুলের পাপড়ির বিন্যাসেও তারা আকৃষ্ট হয়। এ-ভাবেই অনেক ফুল কীট-পতঙ্গকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে।

কীট-পতঙ্গেরা সাধারণত বর্ণালীর স্বল্প দৈর্ঘ্যের আলোতে ভাল দেখতে পায়। অর্থাৎ যে-রঙ আমাদের ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করবে কীট-পতঙ্গকে সেই রঙ আকর্ষণ নাও করতে পারে। যেমন আমরা লাল কিংবা লাল মিশ্রিত রঙের দিকেই বেশি আকর্ষণ অনুভব করি। অথচ পতঙ্গেরা অতিবেগুনি রশ্মির আলোই বেশি পছন্দ ক'রে থাকে। কীট-পতঙ্গের পছন্দ অনুযায়ী ফুলের পাপড়িগুলিও রঙিন হয়। অর্থাৎ যে-রঙ থেকে অতিবেগুনি রশ্মি বের হবে সেই রঙই কীট-পতঙ্গদের বেশি আকর্ষণ করতে পারে। মধুগ্রন্থি,

আতর, ফুলের রঙিন পাপড়ি, পাপড়ির বিন্যাস এ-সব দিয়েই ফুল কীট-পতঙ্গদের কাছে টানে।

রাতে ফোটা ফুল রঙিন হয় না কেন?

প্রকৃতিতে দিনে ফোটা ফুল রঙিন হয়, আর রাত্তিরে যারা ফোটে তারা বর্ণহীন। কিন্তু রাতের ফুল সাদাই বা হয় কেন? প্রকৃতিতে প্রয়োজন ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে না। তাই সাদা ফুলের সৃষ্টিও প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে। এর পিছনেও রয়েছে উপযুক্ত কারণ।

বিবর্তনের পথে যখন প্রথম ফুল ফুটতে শুরু করে, তখন থেকেই সূর্যের আলোক-নির্ভর প্রক্রিয়ায় গাছের যাবতীয় ঘটনাগুলি ঘটে আসছে। দিনের বেলায় যে সব কীট-পতঙ্গ খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তাদের কাছে টানার জন্যেই ফুলের পাপড়িগুলি হল উজ্জ্বল এবং রঙিন।

সব ফুল দিনে ফুটলে পতঙ্গদের কাছে টানার জন্যে নিজেদের মধ্যে পড়ে যাবে কাড়াকাড়ি। পতঙ্গের তুলনায় ফুলের সংখ্যা বেশি হলে কিছু কিছু ফুল গাণিতিক নিয়মেই পতঙ্গের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে। তা ছাড়া সব পতঙ্গই তো আর খাবারের লোভে দিনের বেলায় বাইরে আসে না। বাদুড়, ঝিঁঝি পোকা, মশার মত প্রাণীরা রাত্তিরে খাবারের সন্ধানে বাইরে বেরোয়। এরা নিশাচর। রাত্তিরে খাবারের জোগাড় না থাকলে এরাও তো আর বাঁচবে না। তাই কতকটা নিজেদের ভিতরকার প্রতিযোগিতা কমাবার জন্যে এবং কতকটা নিশাচর প্রাণীদের খাবারের জোগান দেবার জন্যে কিছু কিছু ফুলকে রাত্তিরে ফুটতে হয়।

কিছু ফুল রাত্তিরে ফোটে কেন?

রাত্তিরে ফোটা ফুল অন্ধকারে কীট-পতঙ্গদের কাছে টানে। অন্ধকারে কীট-পতঙ্গ কম দেখতে পায় বলে রাত্তিরে ফোটা ফুলের পাপড়ির বর্ণ উজ্জ্বল এবং রঙীন না হয়ে সাদা হয়ে থাকে। কিন্তু কীটদের কাছে টানার জন্যে ফুলের ভিতর থেকে তীব্র গন্ধ বেরোয়। কীট-পতঙ্গ ফুলের তীব্র গন্ধ অনুসরণ ক'রে রাতের অন্ধকারেও ফুলের কাছে গিয়ে পৌঁছোয়।

ক্ষেত কেন নিড়োয়?

ধান, গম, ভুট্টা যে কোনো ক্ষেতই হোক না কেন আগাছা তাতে জন্মাবেই। হাওয়ায় বয়ে আনা গাছের বীজ থেকেই ক্ষেতে আগাছা জন্মায়। অনেক সময়ে আগাছার বীজ শস্যের বীজের সঙ্গেই চলে আসে। কিন্তু আগাছা কথার অর্থ কি? আগাছা অর্থ অপ্রয়োজনীয় গাছ। ধান ক্ষেতে গম গাছ হলে তাকেও আগাছা হিসেবে তুলে ফেলতে হবে। নিড়নো কথাটার অর্থ আগাছা তুলে ফেলা।

কিন্তু আগাছা তোলার প্রয়োজন কেন হয়? দেখা গেছে, সারি বাঁধা শস্যের মাঝে মাঝে অন্য গাছ জন্মালে শস্যের ফলন ভাল হয় না।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, খুবই কাছাকাছি যদি দু'টো গাছ জন্মায় তা হ'লে একই খাবার দু'টো গাছকে ভাগ ক'রে নিতে হয়। এতে কোনো গাছই তেমন পুষ্টি পায় না। আর ভাল পুষ্টি না হ'লে দু'টো গাছের বাড় এবং ফলনও আশানুরূপ হয় না। কাছাকাছি থাকার জন্যে দু'টো গাছের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলে, তাতে দু'টো গাছেরই ক্ষতি হয়। শস্যের ক্ষেতে আগাছা হলে শস্য গাছেরই ক্ষতি হয় বেশি। এই কারণেই অপ্রয়োজনীয় আগাছাকে তুলে ফেললে শস্যের বাড় এবং ফলন বেশি হয়ে থাকে।

এতকাল এই ধারণা ছিল বলে ধান বা গমের ক্ষেতে আগাছা তুলে ফেলা হত। কিন্তু দেখা গেছে যে, ক্ষেতে খুব বেশি আগাছা জন্মালে, আগাছা তুলে ফেললেও শস্যের ফলন ভাল হয় না। তা ছাড়া সারের পরিমাণ একই রকমের দেওয়া হলেও একই ক্ষেতে বারবার একই শস্য লাগালে আশানুরূপ ফলন হতে দেখা যায় না।

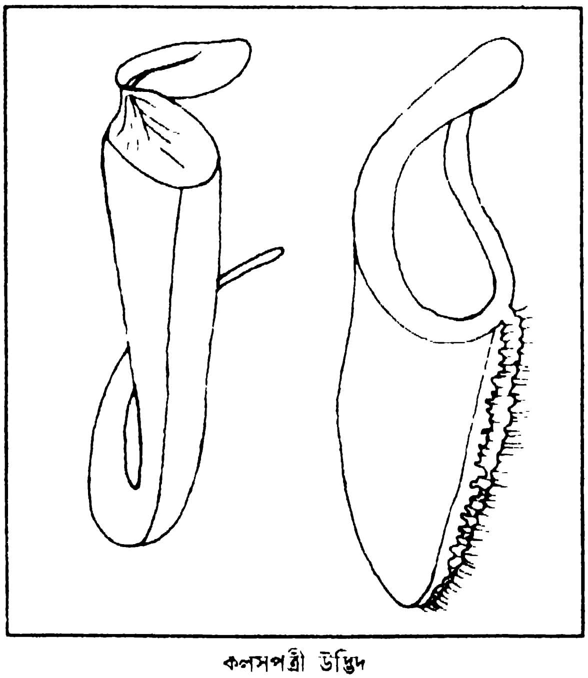
অনুসন্ধান ক'রে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, আগাছার মূল, পাতা, কাণ্ড থেকে এক ধরনের বৃদ্ধি প্রতিরোধী বস্তু বের হয়ে মাটিতে মিশে যায়। এই বস্তুই শস্যের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। বৃদ্ধি প্রতিরোধী বস্তু শুধু এক বছরের শস্যের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে না, পরবর্তী বছরের শস্যেরও ক্ষতি করে। এই ক্ষতির হাত থেকে শস্য রক্ষার জন্য আগাছা তুলে ফেলতে হয়, অর্থাৎ ক্ষেত নিড়নো দরকার।

গাছ কেন পতঙ্গভুক হয়?

সাধারণত গাছ সবুজ হয়। সবুজ গাছ সবুজ রঙ্গক ক্লোরোফিল দিয়ে সূর্যের আলো শুষে নেয়। আলোতে যে-শক্তি থাকে তাকে কাজে লাগিয়ে সবুজ গাছ মাটির জল এবং বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দিয়ে তৈরি করে নিজের শর্করা খাবার। নিজেই নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারে বলে সবুজ গাছকে স্বভোজী বলা হয়। শুধু শর্করা খাবার তৈরি করলেই চলবে না। শরীরটাকে ঠিক

কলসিপত্র গাছ কী ভাবে শিকার ধরে?

রাখবার জন্যে এবং ফুল-ফল, ডালপালা তৈরি করার জন্যে গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন যৌগ, খনিজ লবণ, জল ইত্যাদি নিয়ে থাকে। মাটি থেকে কোনো জিনিস না নিতে পারলে বা মাটিতে কোনো প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের অভাব ঘটলে গাছের তেমন বাড় হয় না—তাতে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। মাটি থেকে নাইট্রোজেন যৌগ নিয়ে গাছ নিজের প্রোটিন তৈরি করে। এই প্রোটিন থেকে প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয়। কোষের ভিতর যে অর্ধ তরল বস্তু থাকে তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। প্রোটোপ্লাজমের ভিতরেই

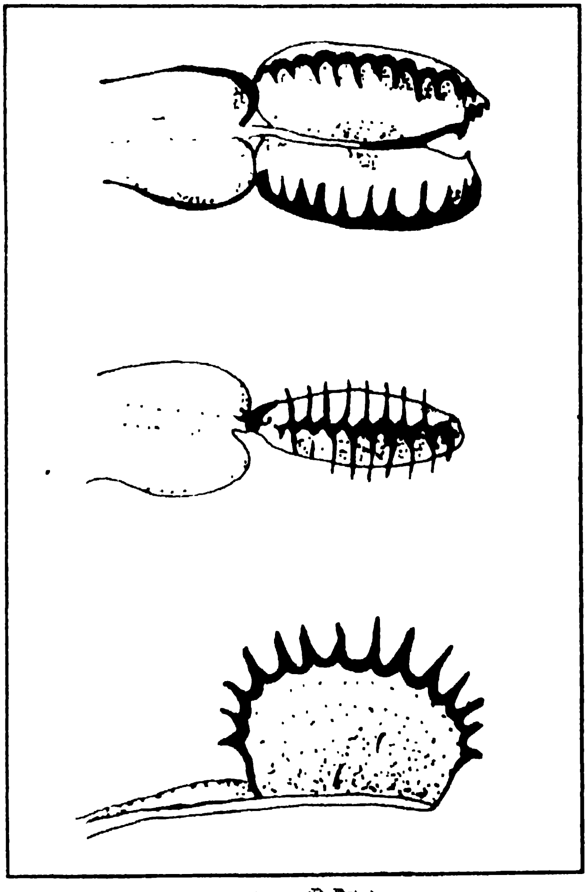


কলসপত্রী উদ্ভিদ

লুকিয়ে থাকে গাছের প্রাণ।

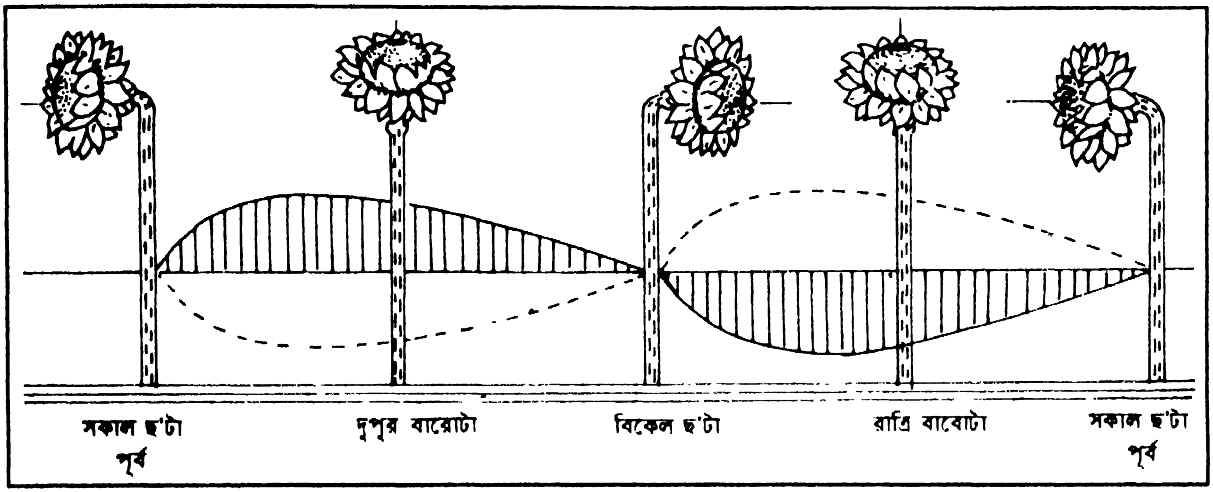
মাটি থেকে খনিজ লবণ যাতে বেশি ক'রে পেতে পারে সেইজন্যে গাছ তার শিকড় মাটির অনেকটা ভিতরে ঢুকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েও দেয়।

পতঙ্গভুক গাছ সাধারণত এমন মাটিতে জন্মায় যেখানে খনিজ লবণ খুবই কম থাকে। যেমন, পাথুরে শুকনো মাটি বা বোঁদমাটি (সবটাই জৈব বস্তু পচে তৈরি হয় এমন মাটি)। এ-ধরনের মাটিতে নাইট্রোজেনও কম থাকে। তা ছাড়া পতঙ্গভুক গাছের শিকড়ও খুব একটা বড় হয় না। ফলে



ভেনাস ফ্ল্যাই ট্র্যাপ

শিকড় মাটির খুব গভীরে যেতে পারে না এবং বেশি দূর ছড়িয়েও পড়ে না। তাই শিকড় খনিজ লবণ বা নাইট্রোজেন লবণ তেমন পায় না। এই অভাব মেটানোর জন্যে গাছগুলো একটা উপায় বের করেছে। এ জাতীয় গাছের পাতা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে নানারকমের ফাঁদ তৈরি করে। কলসপত্রী গাছে পাতা ঢাকনাওলা কলসির মত হয়।



পতঙ্গ এই কলসির ফাঁদে পড়লেই ঢাকনা বন্ধ হয়ে যায়। পতঙ্গ আর বেরোতে পারে না। কলসির গা থেকে জারক রস বেরিয়ে পতঙ্গকে মেরে ফেলে এবং পতঙ্গের দেহের প্রোটিনকে পাচিত করে। পাচিত প্রোটিন গাছ শুষে নেয় এবং নিজের প্রোটিনের অভাব পূরণ করে। নাইট্রোজেন যৌগ পাওয়ার জন্যেই গাছ পতঙ্গভুক হয়।

সূর্যমুখী সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন?

সূর্যের নাম নিয়ে ফুলের নাম রাখা হয়েছে সূর্যমুখী। সে যেন সব সময়ে সূর্যের দিকে মুখ করেই রয়েছে। একেবারে ফোটা ফুলে এ-ব্যাপার দেখা না গেলেও শীর্ষ কুঁড়িতে এটা নজরে আসে। সূর্যমুখী ফুলের কুঁড়ি ভোর না হতেই পুব দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন সে সূর্য-প্রণাম করবে। সূর্য ওঠার পরে সে সূর্যের আকাশ পথের দিকে মুখ ক'রে মুখটাকে উপর দিকে তোলে, মাঝ দুপুরে কুঁড়ি ঊর্ধ্বপানে চেয়ে থাকে। বিকেলে কুঁড়ির মুখ আবার পশ্চিম দিকে। এ-ভাবেই সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ রেখে সূর্যমুখীর কুঁড়ি পুব থেকে পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সূর্যমুখীর কুঁড়ি কেন এ-ভাবে সারাদিন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে? সূর্যমুখীর ফুলের এই ব্যবহারের ব্যাখ্যা অনেকদিন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন নি। শেষে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে এক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রাণীদের মত গাছেরও সব রকমের কাজকর্মই হর্মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গাছের অঙ্গের বৃদ্ধির জন্যেও এক ধরনের হর্মোন (অকসিন) দরকার। কুঁড়ির তলায় যে-পাতা থাকে এই হর্মোন তার ভিতরে তৈরি হয়। এবং তৈরি হওয়ার পরে তা ফুলের বোঁটায় চলে আসে। এখন যে-দিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উল্টো দিকে হর্মোন বেশি জমা হয়। এবং সেই দিকেই কোষের বৃদ্ধি হয় বেশি ক'রে। ফলে স্বাভাবিকভাবে বেশি চাপের জন্যে কুঁড়ি উল্টো দিকে মুখ ক'রে থাকে। অর্থাৎ সকাল বেলায় পূর্ব দিকে সূর্য উঠলে ফুলের ডাঁটির পশ্চিম দিকটায় বেশি বাড় হয়। ফলে কুঁড়ির মুখ তখন পূর্ব দিকে। বিকেলে ঠিক এর উল্টোটা ঘটে। পরিণত ফুলে ডাঁটির কোষগুলোও পরিণত হওয়ায় হর্মোন আর তেমন কাজ করতে পারে না। ফলে পরিণত সূর্যমুখী ফুলে এই ধরনের ব্যবহার দেখা যায় না। সূর্যমুখী কুঁড়িতেই এই ব্যাপারটা নজরে আসে।

জমিতে সারি বেঁধে গাছ লাগায় কেন?

যারা চাষ করে তারা জমিতে গাছ লাগানোর সময় সারিতে গাছ লাগিয়ে থাকে, বীজতলায় বীজ ছিটিয়ে চারা তৈরি করে। মাঠে লাঙল দিয়ে সেই চারা তুলে এনে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সারি বেঁধে চারা পোঁতে। সারি বেঁধে চারা পোঁতা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে চারা লাগানোর ভিতরে কোনো যুক্তি আছে কি নেই তাও হয়তো নিরক্ষর চাষীরা ভেবে দেখেনি। কিন্তু চাষীরা নিরক্ষর হলে হবে কি, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে মাঠে

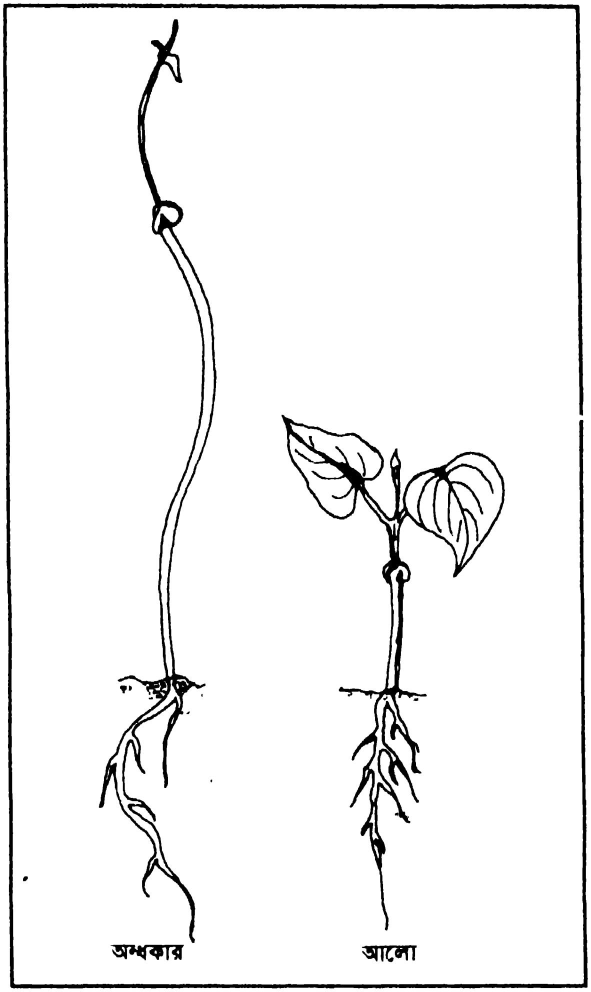
ছড়িয়ে ছিটিয়ে বীজ লাগানোর চাইতে সারি বেঁধে চারা পুঁতলে ফলন অনেক বেশি হয়। শুধু ফলনই অনেক বেশি হয় তা নয়, গাছও অনেক সবল এবং গাছের বাড়ও বেশি হয়ে থাকে। চাষীরা হাতে-কলমে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও তার ফল তারা হাতেনাতেই পেয়ে যায়।

সার বেঁধে ফসল লাগালে একই সারির প্রত্যেকটি গাছের মধ্যে যেমন একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় থাকে, তেমনি এক সারির গাছের সঙ্গে অন্য সারির গাছের একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান রাখাও সম্ভব। এই দূরত্ব বা ব্যবধান থাকলে মাটির জল ও খনিজ লবণের জন্য গাছেদের নিজেদের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা করতে হয় না। অর্থাৎ সব গাছই নিজের নিজের পুষ্টি অনুযায়ী খাদ্য পায়। এই ব্যবস্থা না থাকলে কাছাকাছি জন্মানো কিছু গাছকে খাদ্যের জন্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে হত। এতে কোনো গাছেরই নিজেদের সঠিক পুষ্টি জুটতো না। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়তো।

নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকায় গাছেরা সবাই সমানভাবে সূর্যের আলো পায়। ফলে এরা যখন কিছুটা বড় হবে তখন নীচের পাতাগুলো উপরের পাতার মতই সমান আলো পাবে। কিন্তু কাছাকাছি থাকলে নীচের পাতা বেশি আলো পেতো না। ফলে গাছের বৃদ্ধি এবং ফলনও কম হত। তাই পুষ্টি এবং আলো সমানভাবে পাওয়ার জন্যেই ক্ষেতে ফসলের গাছকে সারি বেঁধে লাগানো হয়ে থাকে।

ছায়াতে বেড়ে ওঠা গাছ বেশি লম্বা হয় কেন?

গাছের পুষ্টির জন্য রোদ দরকার হয়, এ আমরা সবাই অল্পবিস্তর জেনে এসেছি। যে-গাছ রোদ বেশি পায় সে গাছ সতেজ হয় এবং ডালপালা গজিয়ে বেশ ঝাঁকড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু সে লম্বায় খুব একটা বাড়ে না। অথচ যে গাছ রোদ পায় না সে গাছ তরতরিয়ে লম্বায় বাড়তে থাকে। অবশ্য ছায়ার গাছে ডালপালা খুব কম হয়। একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, আলোর জন্যেই এ-রকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু আলো না পেলে তো ছায়ার গাছ একেবারেই বাড়া উচিত নয়। তাহলে ছায়ার গাছ লম্বায় বাড়ছে কেমন ক'রে?



অনেক ভেবে-চিন্তে বিজ্ঞানীরা বের করেছেন যে, প্রকৃত বাড় অর্থাৎ সার্বিক বৃদ্ধি যদি ধরা যায় তবে রোদের গাছের বাড় ছায়ার গাছের তুলনায় বেশি হয়। যেমন দু'টো একই ওজনের টবের গাছকে নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, রোদের গাছের ওজন ছায়ার গাছের ওজনের চেয়ে বেশি হয়েছে। যদিও ছায়ার গাছ রোদের গাছের চেয়ে লম্বায় অনেকটা বেড়ে উঠবে। আসলে রোদের গাছের ডালপালা, পাতা হয়েছে বলে লম্বায় তার বাড় বেশি হয়নি। কিন্তু ছায়ার গাছে ডালপালা তৈরি হয়নি এবং পাতাও অনেক কম, তাই ছায়ার গাছ শুধু লম্বাতেই বেড়েছে।

ছায়ার গাছের এই লম্বায় বেশি বাড়ার কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা আরো একটা যুক্তি দেখিয়েছেন। গাছের কোষের বৃদ্ধির জন্যে জল দরকার। ছায়ার গাছে বাষ্পমোচন

(গাছের পাতা থেকে বাষ্পাকারে জল বেরিয়ে যাওয়া) কম হয় বলে গাছের ভিতরে অনেকটা জল থাকে। আর এই জলের চাপেই কোষগুলো লম্বায় বাড়ে। অর্থাৎ গাছটিকেও লম্বায় বাড়িয়ে তোলে।

বিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, গাছের পাতার কোষের ভিতরে এক ধরনের রঙ্গক থাকে। এদের ফাইটোক্রোম বলে। ফাইটো শব্দটা এসেছে গাছ এবং ক্রোম শব্দটা রঙ থেকে। অর্থাৎ ফাইটোক্রোম এক ধরনের উদ্ভিদ রঙ্গক। ছায়ার গাছ সরাসরি সূর্যের আলো পায় না। হালকা আলো তার অবলম্বন। তা থেকে গাছ যাতে বাড়তে পারে সেই রকমের বন্দোবস্ত ক'রে তোলে ফাইটোক্রোম। এই বন্দোবস্তের ফলেই কোষগুলো লম্বায় তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। ফলে সম্পূর্ণ গাছটাই লম্বায় বাড়ে।

সেদ্ধ চাল সেদ্ধ করা হয় কেন?

সেদ্ধ আর আতপ দু' রকম চালের কথা আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। সেদ্ধ চাল সম্পর্কে একটা কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাজার থেকে আনা চাল সেদ্ধ না ক'রে তো খাওয়া যায় না, তাহলে আগেভাগে চাল সেদ্ধ করার দরকার কি? তা ছাড়া সেদ্ধ চাল পুরো সেদ্ধ ক'রে বাজারে বিক্রি করলে ক্ষতি কোথায়?

ধান থেকে চাল হয়। ধানের বাইরে খোসা থাকে, খোসার ভিতরে লালচে মত ফলত্বক, তারও ভিতরে আছে বীজত্বক। ফলত্বক এবং বীজত্বক এমনভাবে জুড়ে থাকে যে তাদের একেবারেই আলাদা করা যায় না। বীজত্বকের ভিতরে একটা প্রোটিন দানার স্তর আছে। এই প্রোটিন দানার স্তরের ভিতরে বেশিটাই থাকে শস্য, শুধু তলার দিকে ছোট্ট মত ভ্রূণ। আমরা যে ভাত খাই তার সবটাই আসে চালের শস্য থেকে। চালের একদিকে ছোট্ট মতন যে খাঁজ দেখা যায় সেইখানেই ধানের ভ্রূণের অবস্থান। চাল তৈরির সময় ভ্রূণ খসে পড়ে।

ধান থেকে চাল তৈরি করতে গেলে ধানের খোসা, ফলত্বক, বীজত্বক এবং প্রোটিন স্তরগুলোকে ঢেঁকি বা কলে ছেঁটে আলাদা ক'রে ফেলতে হয়। খোসা খাবার বস্তু নয়, তাই একে বাদ দেওয়া ভাল। কিন্তু খোসার সঙ্গে সঙ্গে ফলত্বক, বীজত্বক এবং প্রোটিন স্তর বাদ গেলে চালের পুষ্টির অনেকটাই বাদ চলে যায়। এমনটা যাতে না হয় সেইজন্যেই ছাঁটার আগে ধানকে গরম জলে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হয়। একেই বলে সেদ্ধ করা। এইভাবে যে-চাল তৈরি হয় তারই নাম সেদ্ধ চাল।

সেদ্ধ চালকে প্রথমে গরম জলে ফুটিয়ে পরে রোদে শুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। গরম জলে ফোটালে চালের শ্বেতসার দানাগুলো ফুলে যায় এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর শক্ত বাঁধনে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে ছাঁটার সময়ে ওই স্তরগুলো নষ্ট হয় না। সেদ্ধ করার ফলে শস্যের বাইরের স্তরও শক্ত হয়ে গিয়ে ভিতরের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থগুলোকে বাইরে বেরোতে দেয় না। বাইরের স্তর শক্ত হবার ফলে ঢেঁকি বা কলে ছাঁটার সময় ঘর্ষণে এই স্তর ভেঙে পড়ে না। অর্থাৎ চালের পুষ্টির জিনিসগুলো অনেকটাই ভিতরে থেকে যায়—নষ্ট হয় না। সুতরাং যে চালে বাইরের স্তরগুলো ছাঁটার সময়ে খসে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা, তাদেরই সেদ্ধ ক'রে নেওয়া হয়। অর্থাৎ সাধারণত খারাপ জাতের চালই সেদ্ধ করা হয়—ভাল জাতের চাল নয়।

মাটি ছাড়া মানিপ্লান্ট মরে যায় না কেন?

বারান্দা কিংবা বসবার ঘরে কাঁচের বোতল বা শিশিতে 'মানিপ্লান্ট' সাজিয়ে রাখবার অভ্যেস অনেকেরই আছে।

'মানিপ্লান্ট' বোতলের ভিতরের জলের উপরে নির্ভর ক'রে অনেকদিন বেঁচে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য বোতলের জল পাল্টে দিতে হয়। সাদামাটা কলের জল, যাতে গাছের কোনো খাবার থাকে না, তাতে দিনের পর দিন 'মানিপ্লান্ট' কি ক'রে বেঁচে থাকে সেটা একটা গবেষণার বিষয়। শুধু বেঁচেই যে থাকে এমন নয়, গাছ ধীরে ধীরে বেড়েও ওঠে। কি ক'রে এ-ব্যাপারটা সম্ভব, তা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে বিজ্ঞানীরা এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

'মানিপ্লান্টে'র পাতাগুলো তুলনামূলকভাবে অন্যান্য গাছের পাতা থেকে কিছুটা বড়ই হয়ে থাকে। অর্থাৎ গাছের শরীরের তুলনায় পাতা আয়তনে অনেকটা বড় হয়। এ-গাছের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, এরা ঘরের মৃদু আলো



মানিপ্ল্যান্ট

এমন কি বাল্বের আলোকেও জৈব খাবার তৈরির কাজে লাগাতে পারে। আমরা জানি সবুজ পাতা বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জল থেকে আলোর সাহায্যে নিজের জৈব খাবার নিজেই তৈরি করতে পারে। মানিপ্লাণ্টও পাতার সবুজ রঙ্গক বা পিগমেণ্টের সাহায্যে

মানিপ্লান্ট কি বাল্বের আলোকেও খাবার তৈরির কাজে লাগাতে পারে?

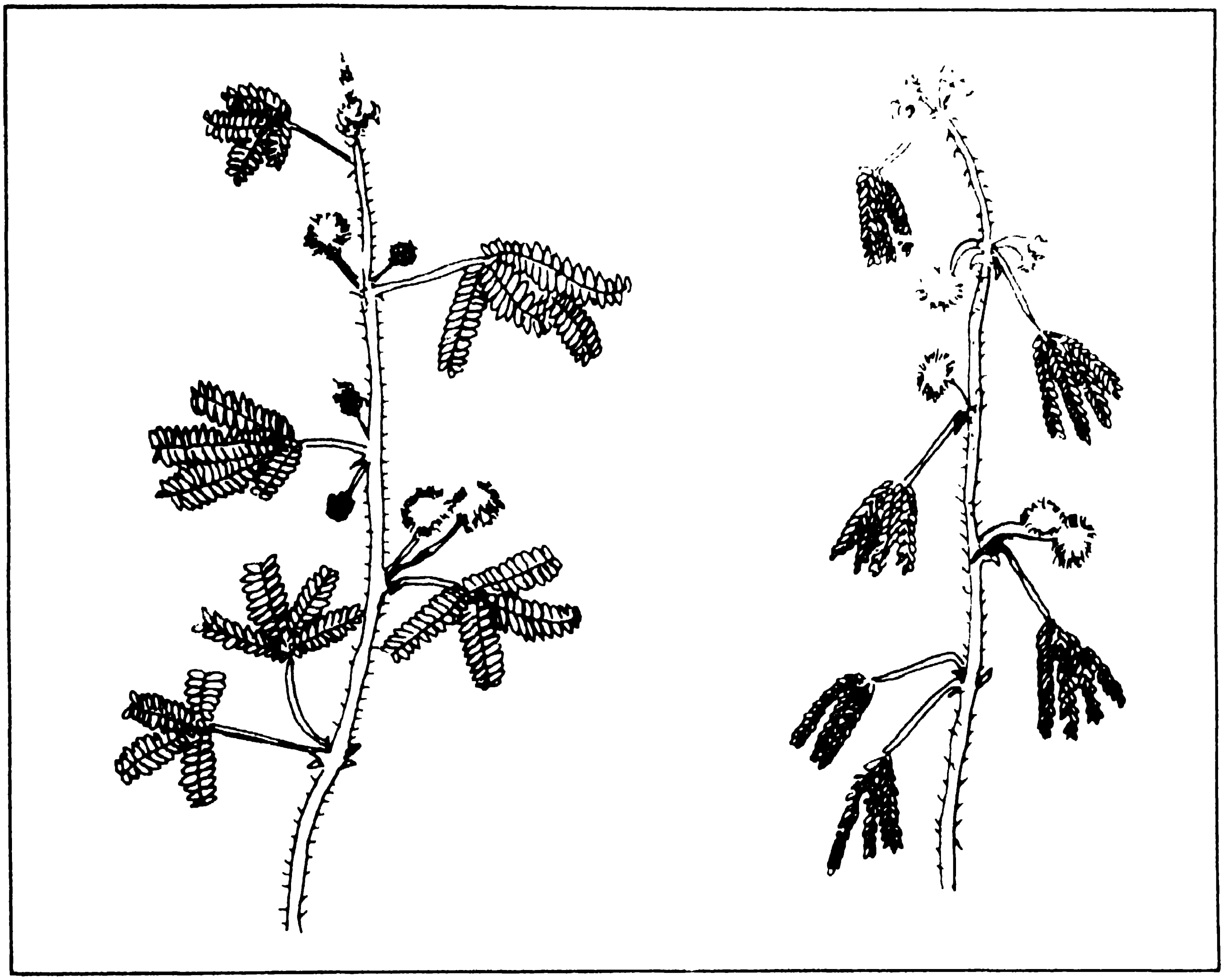
আলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জল নিয়ে নিজের খাবার তৈরি করে। আলোর সাহায্যে সংশ্লেষ বা নতুন কিছু তৈরি হয় বলে পাতার এই কাজকে সালোক-সংশ্লেষ বলে।

জৈব খাবার ছাড়াও গাছের খনিজ লবণ, নাইট্রোজেন দরকার। বাতাসে ভেসে আসা কিছু কিছু খনিজ লবণকে মানিপ্লাণ্ট যে পায় না, এমন নয়। কিন্তু এতে তার প্রয়োজন মেটে না। নাইট্রোজেন লবণ ছাড়া বাতাসের নাইট্রোজেন তো আর গাছ নিতে পারে না, তাই মানিপ্লাণ্টের পক্ষে নাইট্রোজেন পাওয়াও সম্ভব হয় না। তাহলে প্রশ্ন থাকে এ-সব জিনিস ছাড়া মানিপ্লাণ্ট বেঁচে থাকে কি ক'রে?

একটা জিনিস ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানিপ্লাণ্টের বৃদ্ধি খুবই কম। তলার একটা পাতা ঝরে গেলে তবেই উপরের একটা নতুন পাতা তৈরি হয়। যে-পাতা ঝরে পড়বে তা আস্তে আস্তে সবুজ থেকে হলুদ হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে শুকিয়ে গাছ থেকে ঝরে যায়। পাতা ঝরে পড়ার আগে পুরনো পাতার খনিজ লবণ, নাইট্রোজেন ইত্যাদি পুষ্টিকারক জিনিস পাতা থেকে বেরিয়ে কাণ্ডে চলে যায়। এই খনিজ লবণ থেকেই নতুন পাতা তার পুষ্টির যোগান পায়। অর্থাৎ মানিপ্লাণ্টের খনিজ বস্তুর ভাণ্ডার একই থেকে যায়। এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই মানিপ্লাণ্ট যতদিন বাঁচে ততদিন নিজের খনিজ বস্তুর ভাণ্ডার একই রকম রাখতে পারে।

লজ্জাবতীর পাতা ছুঁলে নুয়ে পড়ে কেন?

ছোঁয়া লাগলে লজ্জাবতী গাছের পাতা নুয়ে পড়ে এই পরীক্ষা ক'রে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু দেখিয়েছিলেন যে মানুষের মত গাছেরও অনুভূতি আছে।



লজ্জাবতী গাছ

আগুনে ছেঁকা লাগলে আমরা হাত সরিয়ে নিই, চোখে বালি পড়লে চোখে জল আসে, এ-সব যদি আমাদের অনুভূতির লক্ষণ হয় তাহলে ছুঁলে লজ্জাবতী গাছের পাতা যখন নুয়ে পড়ে তখন তাকেই বা অনুভূতির লক্ষণ নয় বলে উড়িয়ে দেব কেন?

লজ্জাবতীর ছোট ছোট পত্রকগুলো আলো পেলে খুলে যায়, অন্ধকারে বন্ধ হয়। কিন্তু হঠাৎ ছুঁলে লজ্জাবতীর পাতা নুয়ে তো পড়েই, ছোট পত্রকগুলোও বন্ধ হয়ে যায়।

লজ্জাবতীর পাতা কেন নুয়ে পড়ে, এ-ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছেন। লজ্জাবতী পাতার গোড়া একটু ফোলা থাকে। এর ভিতরে বড় বড় অনেক কোষ আছে। ওইসব কোষ যখন জল ভর্তি হয়ে ফুলে ওঠে তখন লজ্জাবতী পাতার ডাঁটাটি সোজা হয়। কিন্তু হঠাৎ পাতা ছুঁলে ওই ফোলা কোষগুলো থেকে জল বাইরে বেরিয়ে পিছন দিককার কোষে চলে যায়, ফলে কোষগুলি চুপসে পড়ে। চোপসানো কোষে জলের চাপ কম থাকে, তাই লজ্জাবতী পাতার ডাঁটাটিও আর সোজা থাকতে পারে না—সে নীচের দিকে নুয়ে পড়ে।

যে পাতাটিকে ছোঁয়া হয়, এই ব্যাপারটা শুধু যে তার মধ্যেই নজরে আসে, এমন নয়—আস্তে আস্তে তা উপর-নীচে সব পাতাতেই ছড়িয়ে যায় এবং এইভাবে সব পাতাই নুয়ে পড়ে। শুধু পাতাগুলো নুয়েই পড়ে না, পাতার ছোট ছোট পত্রকগুলোও জোড়া লেগে বন্ধ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, লজ্জাবতীর পাতা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা তড়িৎ-প্রবাহ গাছের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। 'অ্যাসিটাইল কোলিন' জাতীয়

এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে এই তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ খুবই দ্রুত এক কোষ থেকে আর এক কোষে যেতে পারে। এর প্রভাবেই পাতার গোড়ার ফোলা কোষগুলো থেকে খনিজ লবণ হঠাৎই বাইরে বেরিয়ে আসে। খনিজ লবণ বাইরে বেরিয়ে এলে তার সঙ্গে ফোলা কোষ থেকে জলও বেরোয়। আর জল বেরিয়ে এলেই ফোলা কোষগুলি চুপসে যায়। কোষ চুপসে গেলে তাদের চাপও কমে যায়, ফলে পাতার ডাঁটাটি আর সোজা থাকতে পারে না—নুয়ে পড়ে।

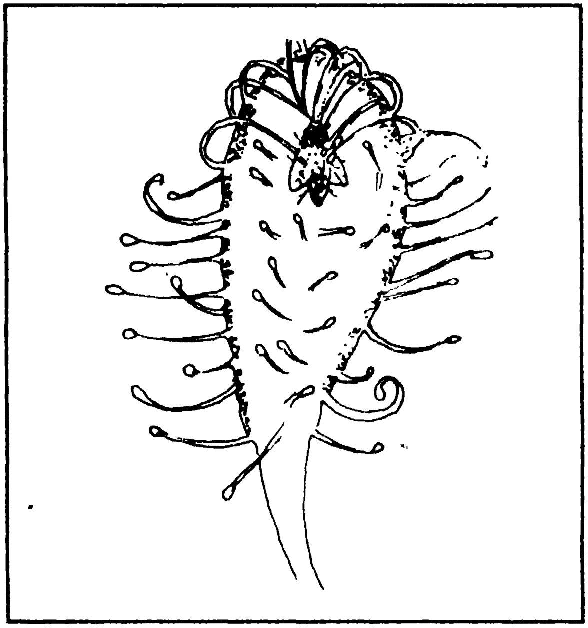
পতঙ্গভুক সূর্য-শিশির গাছ খাদ্য পেলেই কর্ষিকা বন্ধ করে কেমন ক'রে?

কিছু কিছু গাছ আছে যারা কীট-পতঙ্গ খেয়ে বাঁচে। তাদের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ্ বলে। এরা কীট-পতঙ্গ ধরবার জন্যে নিজেদের পাতাগুলোকে নানাভাবে পরিবর্তিত ক'রে ফাঁদ তৈরি ক'রে থাকে। এই ফাঁদে কোনো কীট পড়লে তার আর নিস্তার নেই। ফাঁদের মুখ বন্ধ ক'রে পতঙ্গভুক উদ্ভিদ্ কীটকে খেয়ে হজম ক'রে ফেলে।

সূর্য-শিশির এক ধরনের পতঙ্গভুক গাছ। এদের পাতা অনেকটা হাতের মত চ্যাপ্টা এবং প্রসারিত। পাতার উপর দিকের কিনারা ধরে এক সারি বড় বড় কর্ষিকা থাকে, আর পাতার ভিতর দিকে থাকে অনেক ছোট ছোট কর্ষিকা। কর্ষিকাগুলি সরু সরু শুঁড়ের মত দেখতে। আর তাদের মাথাটা একটু ফোলা।

সূর্য-শিশির এমনিতে পাতাগুলোকে ছড়িয়ে রাখে। সে-গাছ কর্ষিকার ফোলা মাথা থেকে কয়েক ফোঁটা আঠালো রস বের করে। এই রসের ফোঁটা দেখতে অনেকটা শিশিরের বিন্দুর মত। রোদ পড়লে রসের ফোঁটাগুলি চকচক করে। এই চকচকে আঠালো রসের বিন্দুগুলিকে খাবার ভেবে কীটেরা এগিয়ে আসে এবং ফোঁটার আঠায় আটকে যায়। অনেক কষ্টেও নিজেদের আর তা থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। কীট বা পোকা ধরা পড়লেই পাতাতে এক ধরনের বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের আঙুলের মত কর্ষিকাগুলিও তখন আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে বাঁকতে শুরু করে। এইভাবে বাঁকতে বাঁকতে সব কর্ষিকার মাথা যখন মাঝখানে এক জায়গায় এসে জড়ো হয় তখন পুরো পাতাটিকে একটা খাঁচার মত দেখতে লাগে। এই খাঁচায় ধরা পড়া কীট-পতঙ্গ আর বাইরে বেরোতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল, পোকা পড়লে কর্ষিকাগুলি বেঁকে যায় কেমন ক'রে? কর্ষিকায় পোকা ধরা পড়লেই অর্থাৎ পোকা কর্ষিকা ছুঁলেই কর্ষিকায় এক ধরনের বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি হয় এবং সব কর্ষিকাতেই তা ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের স্পর্শে কর্ষিকার বাইরের দিককার কোষগুলির ভিতরে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। ফলে কোষগুলিতে জল জমতে শুরু করে



সূর্য-শিশির

এবং কোষগুলো দৈর্ঘ্যে বাড়তে থাকে। কর্ষিকার বাইরের দিককার কোষগুলো লম্বায় বড় হতে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই কর্ষিকাগুলি ভিতর দিকে বাঁকতে শুরু করবে। ধীরে ধীরে বাঁকতে বাঁকতে যখন কর্ষিকার মাথাগুলি একটা আর একটাকে ছুঁয়ে ফেলবে তখনই কর্ষিকার বাইরের দিককার কোষগুলির লম্বায় বড় হওয়া বন্ধ হয়।

বাতাস ছাড়াই কোনো কোনো গাছের পাতা নড়ে কেন?

নিশ্চুপ দুপুরে, অসহ্য গরমে বাড়ির লোকেদের বলতে শোনা যায়, এ গরম আর সহ্য হয় না, বাইরে একটুও বাতাস নেই, গাছের পাতাও নড়ছে না। বাতাসেই গাছের পাতা নড়ে, এ আমরা জেনে এসেছি, কিন্তু বাতাস না

থাকলেও কেন যে গাছের পাতা নড়ে তা কি আমরা জানি?

ছোলা, চিনেবাদাম ধরনের কিছু কিছু গাছে এ-ব্যাপারটা দেখা যায়। এই সব গাছ বেশ ঝাঁকড়া এবং এতে অনেক পাতা হয়। এই সব গাছে পাতা এমনভাবে সাজানো থাকে যেন উপরের পাতা নীচের পাতাকে ঢেকে রেখেছে। দিনের বেলায় গাছের সব পাতা সমানভাবে সূর্যের আলো পায় না। ফলে গাছের বাড় তো হয়ই না, এমন কী তাতে ফুল, ফলও ধরে না।

সবুজ পাতা সূর্যের আলো নিয়ে নিজেদের খাবার তৈরি ক'রে থাকে। পাতাগুলি যদি সবাই সমান আলো না পায় তবে গাছের খাবারও পুরোটা তৈরি হবে না। ফলে গাছের বাড় তো হবেই না, গাছে ফল-ফুলও ধরবে না। ছোলা, চিনেবাদাম জাতের গাছের পাতা আলো পাওয়ার জন্য দিনের বেলায় এমনভাবে নড়াচড়া করে যাতে সব পাতাই সমান আলো পেতে পারে।

এই গাছগুলির এমন বৈশিষ্ট্য যে, এরা সূর্যের আলো এবং তাপ নিয়ে নিজেদের পাতাগুলিকে নাড়াতে পারে। আকাশে সারাদিন রোদ থাকে, কিন্তু আকাশে সূর্য সারাদিন এক জায়গায় থাকে না। গাছ কিন্তু এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই সূর্যের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো পাতায় কম আলো পড়ে আর কোনো পাতায় বেশি। সব পাতায় যাতে সমান আলো পড়ে সেইজন্যে পাতার বোঁটা নাড়িয়ে-চাড়িয়ে এই গাছগুলি সব পাতার ফলকদেরই সূর্যের দিকে তুলে ধরে। তাই সারাদিনই পাতাগুলি একটু একটু ক'রে নড়ে। সকালে যে পাতা নুয়ে থাকে বিকেলে সেই পাতাকে মোটামুটি খাড়া হতে দেখা যায়।

এই ব্যাপারটা সম্ভব হয় পাতার বোঁটার গোড়ায় অবস্থিত কতকগুলো রসালো কোষগুচ্ছের জন্য। এই কোষগুচ্ছের সব কোষ সমানভাবে রসস্ফীত হয় না। আলো এবং তাপমাত্রার প্রভাবে যখন যে দিককার কোষ রসস্ফীত হয় তখন পত্রফলক বিপরীত দিকে বেঁকে যায়।

কেমন ক'রে এটা ঘটে?

পত্রফলকে আলো পড়লে তা থেকে যে উদ্দীপনা তৈরি হয়, সেই উদ্দীপনা পাতার গোড়ার রসস্ফীত কোষে গিয়ে পৌঁছোয়। আলোর দিকের কোষগুচ্ছের চেয়ে উল্টো দিকের কোষগুচ্ছে রস বেশি জমা হতে থাকে। ফলে ওই কোষগুলি বেশি রসালো হয়ে ওঠে এবং স্ফীত হয়। রসস্ফীতি চাপের জন্যে পত্রবৃন্ত আলোর দিকে বাঁকতে থাকে। এইভাবেই ফলকের উপরে আলোর প্রভাবে পত্রফলক সূর্যের দিকে ঘুরে যাবে।

ধান গাছ জলে ডোবে না কেন?

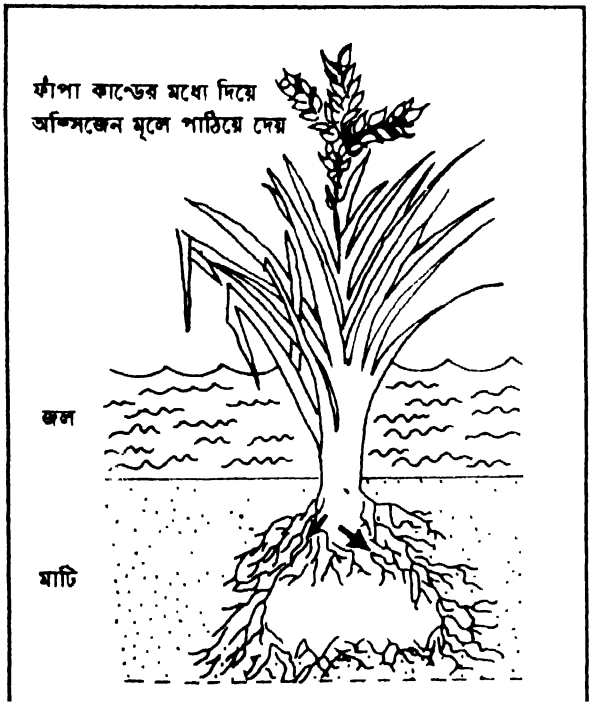
আমাদের খাবার চাল যে ধান গাছ থেকে পাই তা কিন্তু নানা ধরনের হয়ে থাকে। কোনো ধান গাছে অল্প জল লাগে, আবার কোনো ধান গাছে বেশি জলের দরকার। বেশি জলের ধান গাছ বর্ষাকালে লাগানো হয়। নীচু জমির ধান গাছ বর্ষাকালে অনেক সময় বেশি জল হলে ডুবেই যায়। ডুবে যায় অর্থে ধান গাছের সবটাই প্রায় জলের তলায় থাকে। শুধু সামান্য কয়েকটি পাতার মাথা জলের উপরে দেখা যায়। এই গাছগুলি কিন্তু বর্ষার জল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে নিজেরাও লম্বায় বাড়তে থাকে। অর্থাৎ ধান গাছের সবটা কোনো সময়েই জলের তলায় ডুবে যায় না। এই থেকেই বলা হয়, ধান গাছ জলে ডোবে না।

নীচু জমির ধান গাছ বর্ষার জলে কেন ডুবে যায় না তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। ধান গাছের কাণ্ডের ভিতরটা যে শুধু ফাঁপা তাই নয়, এদের কোষগুলোর মাঝে এত বেশি ফাঁকা জায়গা থাকে যে, গাছের ভিতর দিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি বাতাস যাতায়াত করতে পারে। অথচ ধান গাছের বাইরের দিকে সারা গায়ে একটা বায়ুরোধী আস্তরণ লাগানো আছে, যার ফলে গাছ জল থেকে কোনো গ্যাসই নিতে পারে না। ধান গাছের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, বাতাস থেকে এক অণু অক্সিজেন গ্রহণ করলে শরীর থেকে ওই এক অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই সে বের ক'রে দেয়—তার বেশি নেয়ও না, বের ক'রেও দেয় না।

বর্ষায় ডোবা ধান গাছে বাড় বেশি হয় কেন?

জলে যখন ধান গাছ থাকে তখন উপরের পাতা দিয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে নেয়। গাছ এই অক্সিজেন তাড়াতাড়ি সমস্ত শরীরে, এমন কি মূলেও, পাঠিয়ে দিয়ে নিজের সব কাজ ঠিক রাখে। এ-দিকে সারা দেহে বিশেষ

আস্তরণ থাকায় বেশি জলও শরীরে ঢুকতে পারে না। যেহেতু অক্সিজেনের চাইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে বেশি মিশতে পারে, ধান গাছের শরীর থেকে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোয় তা জলে মিশে যায়। এ-জন্যে শরীরের ভিতরে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তার ফলেই বাতাস থেকে গাছ বেশি ক'রে অক্সিজেন নিতে পারে। বেশি



জলে ডোবা ধান গাছ

অক্সিজেন পাওয়ায় গাছের বাড়ও বেশি হয়। তাই জলে আধডোবা ধান গাছ লম্বায় বেশি বাড়তে থাকে। আর লম্বায় বেশি বাড়ে বলেই জলের ধান গাছ কখনোই ডোবে না।

মটর গাছের শিকড়ে গুটি হয় কেন?

আমাদের নিরামিষ খাবারের মধ্যে ডালের ভিতরেই প্রোটিন থাকে বেশি। প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে। নাইট্রোজেন না থাকলে বা নাইট্রোজেন না পেলে প্রোটিন তৈরি করা যাবে না। প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন গ্যাস বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় বাতাসে। গাছ কিংবা প্রাণী কেউই সরাসরি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস নিতে পারে না। কারণ সে রকম কোনো ব্যবস্থাই গাছেদের নেই। কিন্তু নাইট্রোজেন নিতে না পারলে গাছ প্রোটিন তৈরিই বা করবে কি করে! গাছ যাতে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিতে পারে অন্য সব ব্যবস্থার মত প্রকৃতি দেবী সেই ব্যবস্থাটিও ক'রে রেখেছেন।

ডাল জাতীয় গাছই সাধারণত বেশি প্রোটিন তৈরি করতে পারে। যে সব গাছে বেশি প্রোটিন থাকে তাদের শিকড়ে ছোট ছোট গুটি তৈরি হয়। মটর গাছের শিকড়েও ওই রকমের ছোট গুটি দেখা যায়। এই গুটিগুলিতে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া বাস করে যাদের মধ্যে একটির নাম রাইজোবিয়াম। এরা কিন্তু বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্যাস নিতে পারে। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে এরা নাইট্রোজেন যৌগ তৈরি করে। এরা গাছের শিকড় থেকে নিজেদের খাবার পেয়ে যায়, আর বিনিময়ে বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে তৈরি এই নাইট্রোজেন যৌগ গাছকে সরবরাহ করে। গাছ এই নাইট্রোজেন যৌগ থেকেই নিজের শরীরে প্রোটিন খাবার তৈরি ক'রে নেয়। গাছের এই প্রোটিন থেকেই সব জীব নিজেদের প্রোটিন পেয়ে থাকে। নাইট্রোজেন যৌগ তৈরি করতে পারে এমন অণুজীব বাস করে বলেই মটর গাছের শিকড়ে তার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়। ব্যাকটেরিয়ার বাসস্থান হিসেবে গাছ গুটি তৈরি করে।

কিন্তু শিকড়েই বা কেন গাছ গুটি তৈরি করে? কাণ্ড কিংবা ডালেও তো গুটি তৈরি করতে পারতো। তাহলে

কোন ধরনের গাছ বেশি প্রোটিন তৈরি করতে পারে?

অনেক সহজেই ব্যাকটেরিয়া বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন পেয়ে যেত: শিকড়ে গুটি তৈরি করার কারণ, যে ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন যৌগ তৈরি করে অক্সিজেন বেশি থাকলে তারা তা তৈরি করতে পারে না। শিকড়ে অক্সিজেন কম থাকে বলেই সেখানে গুটি তৈরি হয়। তা ছাড়া গাছকে তো নাইট্রোজেন যৌগ শিকড় দিয়েই শুষে নিতে হবে। এই কারণেই শিকড়ে গুটি তৈরি হয়—কাণ্ডে কিংবা ডালে হয় না।

বাতাস থেকে গাছ কেন নাইট্রোজেন নিতে পারে না?

আমাদের মত গাছও প্রশ্বাসের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে আর নিঃশ্বাসকালে কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করে। গাছ পাতা দিয়েই এই গ্যাস নিয়ে থাকে এবং ছেড়ে দেয়। বাতাসের গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় কুড়ি শতাংশের কাছাকাছি, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একের তিন শতাংশের মত, আর নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ প্রায় আশি শতাংশ। বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হলেও অক্সিজেন কিংবা কার্বন ডাই-অক্সাইডের মত গাছ কিন্তু বাতাস থেকে সরাসরি পাতা দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস নিতে পারে না। কারণ গাছের ভিতরে অক্সিজেন বা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নেবার মত যেমন ব্যবস্থা রয়েছে নাইট্রোজেন গ্যাস নেবার মত তেমন কোনো ব্যবস্থাই নেই। তবে গাছ যে নাইট্রোজেন একেবারেই নিতে পারে না, এমন নয়। মাটিতে যে সার দেওয়া হয় সেই সারে যে নাইট্রোজেন যৌগ থাকে গাছ তা মূলরোম দিয়ে শুষে নেয়।

রাসায়নিকভাবে নাইট্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মত সক্রিয় নয়, তা নিষ্ক্রিয়। সেই কারণেই গাছ বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্যাস নিতে পারে না।

চিনেবাদাম মাটির তলায় হয় কেন?

চিনেবাদাম খেতে খেতে আমরা কেই বা ভাবি চিনেবাদাম কোথায় হয়, কি ভাবে হয়? অনেকেই আমরা চিনেবাদামের গাছ দেখিনি, তবে এটা জানি যে চিনেবাদাম অন্যান্য গাছের ফলের মত গাছের উপরে হয় না—আলু যেমন মাটির নীচে হয়, চিনেবাদামও তেমনি মাটির নীচেই হয়ে থাকে। কিন্তু চিনেবাদাম মাটির নীচেই বা হয় কেন?

চিনেবাদাম গাছ ছোটখাটো অথচ বেশ ঝাঁকড়া ধরনের। গাছের কাণ্ডের উপর দিক থেকে যে-সব ডালপালা, পাতা বেরোয় তাতেই গাছ ঝাঁকড়া মত দেখায়। কাণ্ডের নীচের দিক থেকে যে পুষ্পমঞ্জরী বেরিয়ে আসে তাতে ফুল ধরে। ফুলগুলো মাটির ঠিক উপরেই মাটিকে ছুঁয়ে থাকে। চিনেবাদাম ফুল মাটির উপর হলেও ফল কিন্তু মাটির নীচেই পাওয়া যায়।

ফুল থেকে ফল হতে গেলে পরাগধানী থেকে পরাগরেণুকে ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর পড়তে হবে। এই ব্যাপারটাকেই পরাগযোগ বলে। চিনেবাদামের ফুল কখনোই ফোটে না বলে ওই ফুলের ভিতরেই পরাগযোগ ঘটে থাকে। তাই ফুল না ফুটলেও তার ভিতরেই ফল তৈরি হতে শুরু ক'রে দেয়।

পরাগযোগের পর ফল যখন তৈরি হওয়া শুরু হয়, তখন ফুলের ডিম্বাশয়ের (অর্থাৎ ফুলের যে অংশ থেকে ফল হয়) তলার দিকে অকসিন হর্মোন বেশি পরিমাণে জমে। এর ফলে সেখানকার কোষ সংখ্যায় খুবই দ্রুত বাড়তে থাকে। কোষের সংখ্যা বাড়লে ডিম্বাশয়ের তলায় ছোট্ট একটি ডাঁটির মত অংশ তৈরি হয়। এই ডাঁটি আস্তে আস্তে লম্বায় বেড়ে ওঠে। ডাঁটিটি লম্বায় যত বাড়ে ফুলও ততই মাটির দিকে বাঁকতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মাটির ভিতরে ঢুকে পড়ে। আর অনেকটা ঢুকে পড়লে ডাঁটির বাড় থেমে যায়। এইভাবেই সব চিনেবাদাম ফুল পরাগযোগের পরেই মাটির তলায় প্রবেশ করে।

চিনেবাদামের ফুল মাটির নীচে হয় কি?

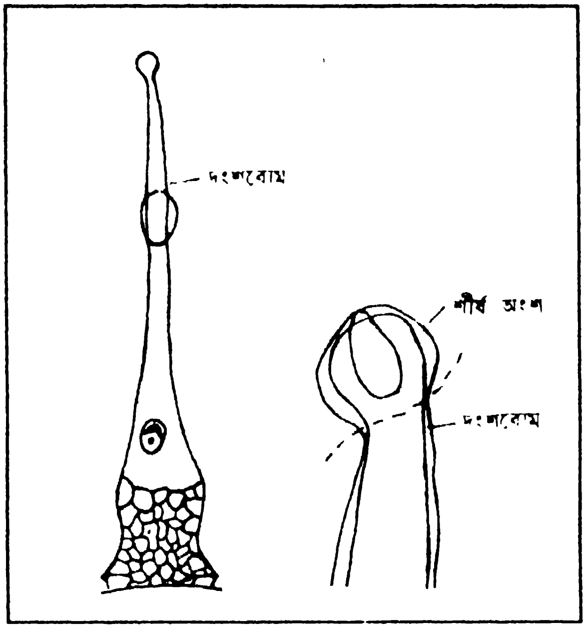
চিনেবাদাম ফল তৈরি হবার জন্যে জলের দরকার। মাটি সাধারণত ভেজা থাকে, সেই ভেজা মাটির জল শুষেই বাদাম ফল ধীরে ধীরে বড় হয়, মাটির তলায় বাদাম হওয়ার এটাও একটা কারণ। মাটি শুকনো হলে ফল আর বেশি বাড়তে পারে না। শুকনো মাটির বাদাম ছোট হয়, কিন্তু ভেজা মাটির বাদাম বড়।

বিছুটিতে গা চুলকোয় কেন?

নিজেকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণীদের অনেক রকমেরই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকে। আত্মরক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে সব চাইতে ভাল হল পালিয়ে বাঁচা।

জীবদের মধ্যে একমাত্র গাছেরই পালাবার পথ বন্ধ। গাছ নড়তে চড়তে পারে না। তাই কেউ তাকে আক্রমণ করলে জায়গায় দাঁড়িয়েই নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অনেক রকমের কৌশল গাছ অবলম্বন ক'রে থাকে।

নানা ধরনের জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় গাছ



নিজের পাতা, বাকল, ফুল, ফল ইত্যাদিতে নানা ধরনের বিষ জমিয়ে রাখে। প্রাণীরা ওই বিষের ভয়ে ওই সব গাছের ধারে কাছে ঘেঁষে না। অনেক গাছে আবার কাঁটাও থাকে। কাঁটার ভয়ে প্রাণী কেন, মানুষই অনেক গাছের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। তা ছাড়া কোনো কোনো গাছের গায়ে আবার ছোট ছোট বিষাক্ত রোম হয়। ওই বিষের ভয়ে সব প্রাণীই ওই জাতের গাছ এড়িয়ে চলে।

বিছুটি গাছেও আত্মরক্ষার জন্যে সারা গায়ে ছোট ছোট রোম থাকে। এই রোমগুলো বেশ লম্বা এবং এর মাথা শক্ত ছুঁচের মত। মানুষ বা প্রাণী বিছুটি গাছ ধরলে রোমগুলির মাথা চামড়ার ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং মাথাটা ভেঙে গিয়ে চামড়ার সঙ্গে আটকে যায়। ভাঙা মাথা থেকে এক ধরনের বিষ ধীরে ধীরে চামড়ায় ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বেঁধা জায়গাটা আস্তে আস্তে ফুলে ওঠে এবং জ্বালা করতে থাকে। জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে বিষের প্রভাবে গা চুলকোতে আরম্ভ করে। আর বিষও ধীরে ধীরে অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে জ্বালা এবং চুলকানি আরো বেড়ে ওঠে। প্রধানত বিষের প্রভাবেই বিছুটিতে গা চুলকোয়।

কাঁচা আম টক হয় কেন?

কাঁচা আম টক, কিন্তু পাকলে তা খেতে মিষ্টি হয়।

কাঁচা অবস্থায় প্রায় সব জাতের আমই খেতে টক হয়। তবে কয়েক জাতের আম আছে যেগুলো কাঁচা অবস্থায় খেতে কিছুটা কম টক লাগে।

ফল যখন তৈরি হয় তখন থেকেই আমের ভিতরে খাবার জমা হতে থাকে। এই খাবার প্রধানত শ্বেতসার হিসেবেই জমা হয়। শ্বেতসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের জৈব অম্লও ফলে এসে জমে। এই সব জৈব অম্লের কিছুটা বর্জ্যবস্তু হিসেবে জমে, আর বেশির ভাগটাই জমা হয় সংশ্লেষ বস্তু হিসেবে। প্রায় সব ফলেই ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিন সি-এর বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডের আধিক্য ফলকে টক করে। ভিটামিন-সি-এর বড়ি জিবে দিলে টকটক লাগে। এর সঙ্গে এসে জড়ো হয় আরো নানা ধরনের অ্যাসিড—যেমন সাইট্রিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ফরমিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডগুলো প্রধানত লবণ আকারে থাকে। এই অম্ল বা অ্যাসিড থাকার জন্যেই কাঁচা ফল খেতে টক লাগে।

ফল যখন পাকতে শুরু করে সেই প্রথম অবস্থায় শ্বেতসার ভেঙে গিয়ে জৈব অম্ল বা অ্যাসিডে পরিণত হয়। সেইজন্যে ফল পাকার ঠিক আগের দশায় ফলের স্বাদ সবচেয়ে বেশি টক।

ফল পাকলে খেতে মিষ্টি হয় কেন?

যে আম কিছুদিন আগে খেলেও দাঁত টকে যেত সেই আমই কিছুদিন পরে খেলে জিবে জল এনে দেয়। এমনই তার স্বাদ, এমনই তার সুবাস। কাঁচা অবস্থায় যা খেতে ভীষণ টক ছিল পাকলেই তা কি ক'রে এত মিষ্টি হয়ে ওঠে?

কাঁচা ফলে শ্বেতসার, জৈব অম্ল ও ভিটামিন থাকে। ফল পাকতে শুরু করলে শ্বেতসার ধীরে ধীরে ভেঙে যায় এবং সব শেষে নানা ধরনের শর্করায় পরিণত হয়। পাকা ফলে দ্রাক্ষা-শর্করা, ইক্ষু-শর্করার পরিমাণই বেশি। ফল পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফলের শ্বেতসার কমতে থাকে আর শর্করার পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। কাঁচা ফলের জৈব অম্লও ধীরে ধীরে শর্করায় পরিবর্তিত হয়। পাকা ফলে তাই অম্লের পরিমাণ কমে গিয়ে শর্করার পরিমাণ বেড়ে ওঠে। সেইজন্যই ফল পাকলে খেতে মিষ্টি হয়।

পেয়ারা পাকলে নরম হয় কেন?

পাকা ফলের চেয়ে কাঁচা ফল যে শক্ত হয় এ-কথা বলার দরকার হয় না। পাকা আমের চেয়ে কাঁচা আম শক্ত হলেও ততটা শক্ত নয়। কিন্তু পাকা পেয়ারার চেয়ে কাঁচা পেয়ারা অনেক বেশি শক্ত।

কিন্তু কাঁচা পেয়ারাই বা কেন এত শক্ত হয়, আর পেকে গেলে পেয়ারা কেনই বা তুলতুলে নরম হয়ে ওঠে?

আমের মত কাঁচা পেয়ারার আলাদা কোনো খোসা থাকে না। কাঁচা পেয়ারার একেবারে ভিতরে অনেক বীজ আছে। বীজের বাইরে ফল-ত্বকের সবটাই বেশ শক্ত হয়। কামড়ে চিবিয়ে খেলে শুধুই ছিবড়ে। বীজ বাদে কাঁচা পেয়ারার যে অংশ আমরা খেয়ে থাকি তা সাধারণত নরম কোষ দিয়ে তৈরি হয়। এই কোষের মাঝে মাঝে এক ধরনের শক্ত কোষ ছড়ানো থাকে। এই কোষগুলিকে প্রস্তর কোষ বা স্টোন সেল বলে। এই সব কোষ মৃত। কিন্তু এদের কোষ-প্রাচীর এত বেশি শক্ত হয় যে, কাঁচা পেয়ারার ত্বকে এগুলি থাকার জন্যে পেয়ারা খেতে শক্ত লাগে। এ-ছাড়া পেয়ারার কোষের কোষপ্রাচীর শক্ত ও পুরু হওয়ায় কাঁচা পেয়ারাকে তা আরো বেশি শক্ত ক'রে তোলে।

সব ফলের মত পেয়ারা যখন পাকতে শুরু করে তখন তার কোষ-প্রাচীরে পেকটিনেজ বলে এক ধরনের উৎসেচক তৈরি হয়। এই উৎসেচক শক্ত কোষ-প্রাচীরকে ভেঙে নরম ক'রে দেয়। কোষ-প্রাচীর পেকটিন নামে এক ধরনের শ্বেতসারের মত বস্তু দিয়ে তৈরি। উৎসেচক এই পেকটিনকে গলিয়ে নরম করে। ফলে কোষ-প্রাচীরও খুব নরম হয়ে যায় এবং কোষের সমস্ত বাঁধনই আলগা হয়ে পড়ে। কাঁচা ফলও তাই নরম হয়ে ওঠে।

পেয়ারা ফলের কোষ-প্রাচীর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর

কাঁচা পেয়ারা শক্ত হয় কেন?

কোষগুলোও উৎসেচকের প্রভাবে গলে যায়। সুতরাং ফলের শক্ত ভাবটা নষ্ট হয়ে গিয়ে ফল নরম হয়।

কোষ-প্রাচীর নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষের জটিল খাদ্যবস্তুও উৎসেচকের প্রভাবে সরল এবং তরল খাদ্যে পরিণত হয়। খাদ্য সরল হতে থাকলে ফলও নরম হয়ে পড়ে। এই সব পরিবর্তনের জন্যেই শক্ত কাঁচা পেয়ারা ধীরে ধীরে নরম হতে শুরু করে এবং শেষে একেবারেই তুলতুলে হয়ে ওঠে।

পাকা ফল রঙিন হয় কেন?

কাঁচা ফল সবুজ, কিন্তু ফল পাকলে রঙিন হয়—এ-ব্যাপারটা সবাই জানে। তবে এর যে ব্যতিক্রম নেই এমন নয়। কাঁচাকলা পাকে না, আর ডাব পাকলেও রঙিন হয় না।

ফলের রঙ তার বাইরের খোসার রঙের হয়ে থাকে। ফলের খোসা ফলত্বক বা ফুলের ডিম্বাশয় পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়। ফুলের ডিম্বাশয় বলতে ফুলের ভিতরে পেটমোটা ঘড়ার মত যে-অংশ থাকে তাকে বোঝায়। ফুল থেকে ফল তৈরির সময়ে ফলের খোসা আস্তে আস্তে সবুজ হয়ে ওঠে

কমলা লেবু কমলা রঙের কেন?

এবং এক সময় কাঁচা ফল গাঢ় সবুজ রঙ ধারণ করে। ক্লোরোফিল থাকার জন্যেই এমনটা হয়ে থাকে।

ফল যখন পাকতে শুরু করে তখন ফলের খোসার ক্লোরোফিল অণুগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হতে আরম্ভ করে। ক্লোরোফিল অণু নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের রঙ পাল্টাতে থাকে। কিন্তু ক্লোরোফিল না থাকার জন্য ফলের রঙ সত্যিকারের হালকা বা বর্ণহীন হয়ে পড়ে না। কারণ ফল পাকতে আরম্ভ করলে ফলের ত্বকে ক্যারোটিন এবং জ্যান্থোফিল রঙ্গক ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। এতে ফলের রঙ আস্তে আস্তে হলুদ এবং কমলা বর্ণের হতে শুরু করে। ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি থাকলে ফলের রঙ হলুদ হবে। এমনটি হয় পেয়ারার বেলায়। জ্যান্থোফিল রঙ্গক বেশি থাকলে ফলের রঙ কমলা বর্ণের হয়ে যায়—এমনটি আবার হয় কমলা লেবুর বেলায়। ক্যারোটিন এবং জ্যান্থোফিল রঙ্গক কাঁচা ফলের ভিতরেও থাকে, তবে কম পরিমাণে। ফল পাকতে শুরু করলে এদের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে ওঠে।

ক্যারোটিন এবং জ্যান্থোফিল ছাড়াও পাকা ফলে আর এক ধরনের নতুন রঙ্গক ফল ত্বকে তৈরি হতে শুরু করে। এই রঙ্গকের নাম লাইকোপিন। লাইকোপিন রঙ্গক কাঁচা

ফলে থাকে না। ফল পাকতে শুরু করলেই লাইকোপিন রঙ্গক তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। লাইকোপিন থাকার জন্যে ফলের রঙ লালচে হয়ে পড়ে। টম্যাটো ফলে লাইকোপিন বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল এবং লাইকোপিন রঙ্গক থাকে বলেই পাকা ফল রঙিন হয়ে ওঠে।

কাঁচা কলা পাকে না কেন?

ফুল থেকে ফল হয়, ফল পাকলে তা খাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা সব ফলই কাঁচা থেকে পাকে। কিন্তু সব ফলই পাকে কি? প্রাকৃতিক ব্যতিক্রমের মত কোনো কোনো ফল আবার পাকেও না। যেমন ডাব পাকে না, আপেল পাকে না আর কাঁচা কলাও পাকে না। কোনো কোনো ধরনের কলা পাকে না বলেই কলা দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কাঁচা কলা এবং পাকা কলা।

পাকা কলা প্রথম অবস্থায় কাঁচা থাকে, তারপরে অন্য পাঁচটা ফলের মত ধীরে ধীরে রঙ বদলে পাকতে শুরু করে। কাঁচা কলা কিন্তু সব সময়ে কাঁচাই থেকে যায়। বেশি দিন রেখে দিলে সেটা ওই চেহারাতেই হয় শুকিয়ে যায়, নতুবা রঙ কিছুটা ফিকে হয়ে শুকনো হয়। কাঁচা কলা কখনোই পাকে না।

কোনো কিছুর অভাব থেকেই যে তাদের চির-কাঁচা অবস্থা এ-কথা বিজ্ঞানীরাই প্রথম বলেছেন।

কোনো ফল পাকতে হলে তার ভিতরে কতকগুলো পরিবর্তন হওয়া দরকার। প্রথমত, এমন এক ধরনের উৎসেচক (পেকটিন) ফলের ভিতরে তৈরি হয় যা কোষ-প্রাচীর বস্তুগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে দিতে পারে। কাঁচা কলার বেলায় ওই উৎসেচক তৈরি হয় না, তাই তার পাকার প্রথম ধাপটি শুরুই হতে পারে না।

ফল পাকার জন্যে নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইথিলিন নামে একটি রাসায়নিক বস্তু তৈরি হয়। এর প্রভাবেই কাঁচা ফলে নানা ধরনের প্রাথমিক পরিবর্তন ঘটে এবং ফল পাকতে শুরু করে। কাঁচা কলায় ইথিলিন সংশ্লেষই ঘটে না। ফলে যে-সব পরিবর্তনের মাধ্যমে কাঁচা ফল পেকে ওঠে সেগুলো কাঁচাকলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। সেইজন্যেই কাঁচা কলা কখনো পাকে না।

পাকা কলায় বিচি থাকে না কেন?

যে-সব গাছে ফুল ধরে তাদেরই সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। ফুল থাকলেই গাছে ফল ধরে। ফলের ভিতরে বীজ বা বিচি থাকে। তা অঙ্কুরিত হয়ে আবার নতুন গাছ তৈরি হয়। এ-ভাবেই গাছের জীবন-চক্র চলতে থাকে। এমন অনেক গাছ আছে যাদের ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, যেমন, জবা গাছ। এই ধরনের গাছে বংশবৃদ্ধির জন্যে বীজ বা বিচি দরকার হয় না। বীজ না তৈরি হওয়ায় এরা অঙ্গজ বিস্তার পদ্ধতিতেই নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে। অঙ্গজ বিস্তার হল গাছের এমন এক ব্যবস্থা যাতে গাছের কোনো একটা অঙ্গ আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন গাছ তৈরি করতে পারে—যেমন কচুরিপানা গাছ ক'রে থাকে।

কিন্তু এমন কিছু কিছু গাছ আছে যাদের ফুল হয়, ফলও হয়, কিন্তু ফলে কোনো বীজ তৈরি হয় না। সেইজন্যে তারাও অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। কলাও এমন ধরনেরই একটি গাছ।

কিন্তু কেন এমন হয়?

কলাগাছ অনেকটা বড় হওয়ার পরে উপরের পাতার ভিতর থেকে মোচা বেরোয়। কলার মোচা কলা ফুলের মঞ্জরী। মোচা লম্বা হতে শুরু করলেই ফুল ঢাকা পাতা খুলে যায় আর কলা ফুল বেরিয়ে পড়ে। মোচার গোড়ার দিককার সব ফুলই স্ত্রী বা মেয়ে ফুল। এই ফুল থেকেই কলা হয়। সামনের দিককার ফুল সবই পুরুষ ফুল। এরা ফুল ঢাকা পাতার ভিতরেই থাকে। এই ফুল থেকে কলা হয় না। সাধারণত গাছের ফুলের ভিতরে পুরুষ এবং স্ত্রী-অঙ্গ থাকলেই সেই ফুল থেকে ফল হবে। কিংবা স্ত্রী এবং পুরুষ ফুল আলাদা থাকলেও স্ত্রী-ফুল থেকে ফল আসবে। কলার বেলায় ফল হবার জন্যে পুরুষ ফুলের দরকার হয় না। শুধু মেয়ে ফুল থেকেই ফল হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষ ফুলের পরাগ রেণু স্ত্রী-ফুলে পড়লে তাদের মিলনেই ফল তৈরি হবে এবং ফলের ভিতরে বীজও দেখা দেবে সঙ্গে। কিন্তু কলার বেলায় পুরুষ ফুল ঢাকা থাকে, ফলে পরাগরেণু স্ত্রী-ফুলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। তাই স্ত্রী-ফুল থেকে কলার ফল তৈরি হয়, কিন্তু ফলে বীজ তৈরি হয় না। সাধারণত পুরুষ ফুলের পরাগরেণুর সঙ্গে স্ত্রী-ফুলের স্ত্রী-অঙ্গের মিলন ঘটলে স্ত্রী-অঙ্গের ডিম্বাশয়ে বৃদ্ধি-হর্মোন

অকসিনের পরিমাণ খুবই দ্রুত বাড়তে থাকে। কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হতে শুরু করে। ফলে স্ত্রী-অঙ্গের ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। কিন্তু কলা ফুলে পরাগরেণু মিলিত হতে না পারলেও ফল তৈরি সম্ভব হয় কি ক'রে?

ফল হলেই কি বীজ থাকবে?

স্ত্রী-ফুল কিছুটা বড় হলে ফুলের ভিতরে ফল তৈরি হবার হর্মোন অকসিন এত বেশি পরিমাণে জমতে আরম্ভ করে যে, পরাগরেণুর মিলন ছাড়াই স্ত্রী-ফুলের ডিম্বাশয়ের কোষ বিভাজন শুরু হয়। কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হতে থাকে। ফল পাকা পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলে। পরাগরেণুর মিলন ছাড়াই ফল তৈরির ব্যাপারটাকে বীজহীন ফল তৈরি পদ্ধতি বলে।

প্রকৃতিতে যে-সব ব্যবস্থা রয়েছে তার ফলেই কলায় বীজহীন ফল তৈরি হয়।

কলা গাছে মোচা না হলে থোড় হয় না কেন?

কলা গাছের কাণ্ড বাইরের থেকে দেখা যায় না। কাণ্ড মাটির তলাতেই শোয়ানো অবস্থায় থাকে। মাটির তলায় কলা গাছের কাণ্ড আস্তে আস্তে বাড়ে এবং মাঝে মাঝে মাটির উপরে উঠে এসে চারা কলা গাছ তৈরি করে।

চারা কলা গাছে পাতাগুলো উপর দিকে সাজানো থাকে। পাতার বোঁটা বেশ চওড়া হয় এবং নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি ক'রে একটা স্তম্ভের মত অংশ তৈরি করে। এর নাম বৃন্ত স্তম্ভ। এই স্তম্ভের মত অংশই মাটির উপরে খাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। একেই ভুল ক'রে কলা গাছের কাণ্ড বলে মনে করে অনেকে। মোচা হয়নি এমন কলা গাছ কেটে পাতা ছাড়িয়ে নিলে দেখা যাবে যে ভিতরে কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকছে না। কিন্তু কাঁদি হওয়ার পর কলা গাছ কেটে পাতা ছাড়িয়ে নিলে ভিতরটায় একটা মোটা বাঁশের মত অংশ দেখতে পাওয়া যাবে—একেই কলা গাছের থোড় বলে। অর্থাৎ যে কলা গাছে মোচা ধরেছে সেই গাছেই কেবল থোড় পাওয়া যাবে, অন্য গাছে নয়। কলা গাছের থোড় কিন্তু গাছের কাণ্ড নয়। এদের মঞ্জরী দণ্ড বলে। কিন্তু মোচা না হলে কলা গাছে থোড় হয় না কেন?

কলা গাছ অনেকটা বড় হওয়ার পরে গাছের মাটির নীচে যে কাণ্ড রয়েছে তা থেকে কলার কচি মঞ্জরী অংশ কলা গাছের স্তম্ভের ভিতর দিয়ে উপর দিকে ধীরে ধীরে উঠে আসে। মঞ্জরীর নীচেই যে মঞ্জরী দণ্ড রয়েছে তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মোচা বৃন্ত স্তম্ভের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেই তার বাড় থেমে যায়। ফল ধরার পর কলার কাঁদি যখন কেটে নামিয়ে আনা হয় তখনও কিন্তু মঞ্জরী দণ্ড কলা গাছের মাঝখানে কাণ্ডের মতই থেকে যায়। একেই আমরা থোড় বলি—যা কলার মঞ্জরী দণ্ড। তাই মঞ্জরী যতক্ষণ না তৈরি হচ্ছে কলা গাছে থোড় ততক্ষণ তৈরি হবে না। এই কারণেই মোচা না ধরলে কলা গাছে থোড় হয় না।

কলা গাছের কাণ্ড কি মাটির তলাতেই থাকে?

বোরো ধান পাকতে বেশি সময় লাগে কেন?

আমরা যে চাল খাই সেটা তিন ধরনের ধান থেকে তৈরি হয়। এদের আউস, আমন এবং বোরো ধান বলে। এদের মধ্যে বোরো ধান পাকতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে। বোরো ধান সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে বোনা হয় এবং ধান পাকতে পাকতে প্রায় বৈশাখ মাস চলে আসে। আউস, আমন ধানের চেয়ে বোরো ধান পাকতে বেশি সময় লাগে কেন? একই ধরনের জমিতে এবং একই ধরনের সার দিয়েও গাছ লাগিয়ে দেখা গেছে যে, বোরো ধান পাকার সময়ের কোনো হেরফের হয় না। তখন বিজ্ঞানীরা আবহাওয়ার কথাই ভাবতে বসলেন। তাঁরা ভেবে দেখলেন যে আমন কিংবা আউস ধানের পরিবেশের থেকে বোরো ধানের পরিবেশ অনেকটা ভিন্ন ধরনের। আউস এবং আমন ধান যখন হয় তখন পরিবেশের তাপমাত্রা অনেকটা বেশি থাকে এবং দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। কিন্তু বোরো ধান যখন লাগানো হয়, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস বা ইংরেজি ডিসেম্বর মাসে, তখন পরিবেশের তাপমাত্রা অনেকটা কম

বোরো ধান কখন বোনা হয়?

থাকে, এবং দিন ছোট ও রাত্রি বড়। বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে বড় দিন এবং ছোট রাত্রি তৈরি ক'রে এবং তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেখেছেন যে, সেই কৃত্রিম পরিবেশে বোরো ধান পাকতে আউস বা আমন ধানের মতই সময় কম লাগে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে একটানা আলো জ্বেলে দিনের পরিবেশ এবং আলো নিবিয়ে রাত্তিরের পরিবেশ তৈরি করেছেন। এই পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, কম সময়ের দিনের আলো এবং অল্প তাপমাত্রার জন্যই বোরো ধান পাকতে বেশি সময় নেয়।

কিন্তু ছোট দিন এবং স্বল্প তাপমাত্রায় বোরো ধান গাছে কি এমন ঘটে যা গাছের বৃদ্ধিকে আটকে দেয়? এ-ব্যাপারটা বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন। গাছের পাতায় অ্যামাইলেজ নামের এক ধরনের উৎসেচক থাকে যারা শ্বেতসারকে ভেঙে অন্যান্য বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করতে পারে। এই উৎসেচক পনেরো ডিগরি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় ভালই কাজ করে। কিন্তু তাপমাত্রা কম হয়ে পড়লে তার আর তেমন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। আলোর প্রভাবে দিনের বেলায় সব সময়েই সালোক-সংশ্লেষ চলে আর তার ফলেই পাতায় শ্বেতসার জমা হয়। কম তাপমাত্রায় অ্যামাইলেজ উৎসেচক নিষ্ক্রিয় থাকে বলে কোষে শ্বেতসার জমা হতে থাকলেও তাকে ভেঙে অন্য অঙ্গের বৃদ্ধির কাজে ঠিকমতো লাগাতে পারে না। এই কারণেই শীতকালে বোরো ধানের বৃদ্ধি কম হয় আর তার ফলে ধান পাকতেও বেশি সময় লাগে।

নারকোলে তিনটে চোখ থাকে কেন?

ফুল থেকে ফল হয় এ-ব্যাপারটা সবাই জানে। আর সব ফুল থেকেই যে ফল হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন জবা গাছে কোনো ফলই হয় না। ফুল থেকে ফল হয় মানে এই নয় যে ফুলের সব অংশ মিলেই ফল হবে। ফল সাধারণত ফুলের গর্ভকেশর থেকেই তৈরি হয়। আরো নির্দিষ্ট ক'রে বললে বলা যাবে, গর্ভকেশরের তলার দিকে যে ফোলা অংশ থাকে, যাকে গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় বলে, সেই গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় পরিবর্তিত হয়েই ফল তৈরি হয়। ফুলের ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় একটা গর্ভকেশর থেকেও তৈরি হতে পারে, আবার অনেকগুলো গর্ভকেশরের গর্ভাশয় মিলে একটা গর্ভাশয় তৈরি হওয়াও সম্ভব। নারকোলে তিনটে গর্ভকেশর থাকে। এই গর্ভকেশরের গর্ভাশয়ে তিনটে প্রকোষ্ঠ বর্তমান। প্রতি প্রকোষ্ঠে একটা ক'রে ডিম্বক আছে। এর মধ্যে একটি ডিম্বক থেকেই বীজ হয়। বাকি দুটো প্রকোষ্ঠ ডিম্বক সমেত নষ্ট হয়ে যায়। পরিণত নারকোলে তাই একটাই বীজ থাকে এবং একটাই প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়।

নারকোলে পুরুষ ফুলের পরাগরেণুর সঙ্গে স্ত্রী-ফুলের ডিম্বাশয়ের একটি ডিম্বকের মিলন ঘটে, ফলে একটি বীজ তৈরি হয়। এই মিলনের ফলে ডিম্বাশয় এত দ্রুত বাড়তে থাকে যে, অন্য দু'টো প্রকোষ্ঠের ডিম্বাশয় দু'টো নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রকোষ্ঠ দু'টোরও বিলুপ্তি ঘটে। ফলে একটি মাত্র বীজ নিয়ে একটি প্রকোষ্ঠ বাড়তে থাকে এবং ফল তৈরি হয়। এইভাবে একটি মাত্র বীজযুক্ত এক প্রকোষ্ঠের ফল তৈরি হলেও, ফলের মাথায় তিনটে গর্ভকেশরের চিহ্ন থেকে যায়। এই চিহ্নগুলো ফলের অন্তস্ত্বকে তিনটে চোখের মত কাছাকাছি অবস্থান করে। ভিতরে একটি বীজ এবং একটি প্রকোষ্ঠ দেখে মনে হতে পারে যে নারকোলে একটি গর্ভকেশর থাকে। কিন্তু একটি গর্ভকেশর পরবর্তিত হয়ে ফল তৈরি হলেও তিনটে গর্ভকেশরের অবস্থান তিনটে চোখ দেখেই বুঝতে পারা যায়। তাই নারকোলের তিনটে চোখ থাকে।

ডাবে কেন জল থাকে?

দু'টো রুটি আর এক গেলাস জল যদি পেতে চাও তাহলে ডাব খাও। ডাব সম্বন্ধে এমন একটা কথাই প্রচলিত আছে। অর্থাৎ ডাবের জল খাবার পরে দু'ভাগে কাটা ডাবের ভিতরে যে শাঁস থাকে তাও খেতে ভাল লাগে।

ডাবে জল থাকে কেন বা ডাবে জল আসে কোথা থেকে?

ডাবের জল বাইরে থেকে আসতে পারে না। তাহলে ডাবের জল হয় কি ক'রে?

ডাবে জল বেশি থাকলেও নারকোলে জল অনেকটা কমে যায়। শুকনো নারকোলে জল একেবারেই থাকে না। ডাবের জল কমার সঙ্গে সঙ্গে নারকোলের শাঁস বেশ পুরু আর শুকনো হয়। তাহলে কি ডাবের জল থেকেই আস্তে

আস্তে নারকোলের শাঁস তৈরি হয় আর নারকোলের শাঁস বা শস্য অংশই ডাবে জলের মত থাকে?

ধান, গম ইত্যাদি ফলে ভ্রূণের খাবার শস্য আলাদা ক'রে বীজের ভিতরেই থাকে। কিন্তু ধানের শস্য চাল বেশ শক্ত, কারণ এই শস্য অংশ অনেকগুলো কোষ দিয়ে তৈরি হয়েছে। শস্যের কোষগুলো একটা আদি কোষ থেকে কোষ বিভাজন

নারকোলের শাঁস কোথা থেকে আসে?

পদ্ধতিতে তৈরি হয়। অর্থাৎ একটা কোষ থেকে দু'টো, দু'টো থেকে চারটে, এই ভাবেই কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। একটা কোষ থেকে যখন দু'টো কোষ তৈরি হয় তখন প্রথমে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস দু'টোর মাঝখানে শক্ত ও পুরু কোষ প্রাচীর তৈরি হয় ...লেই দু'টো কোষের সৃষ্টি। ডাবের বেলায় নিউক্লিয়াসগুলো শুধুই বিভাজিত হতে থাকে, কোনো কোষ-প্রাচীর তৈরি হয় না। ফলে অসংখ্য নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের তরল নিয়ে ডাবের শস্য তৈরি হয়। একেই ডাবের জল বলে। ডাব থেকে নারকোল হওয়ার সময়ে নিউক্লিয়াসের মাঝে মাঝে কোষ-প্রাচীর তৈরি হওয়ার জন্যই ডাবের শাঁস বা শস্য তৈরি হয়।

তাল গাছে শাখা হয় না কেন?

গাছের কাণ্ডে ডালপালা থাকবে, পাতা থাকবে, ফুল হবে, ফল ধরবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। বেশির ভাগ গাছেই কাণ্ড থেকে ছোট ছোট শাখা বেরোয়। অনেক গাছের কাণ্ড থেকে কোনো শাখাই বেরোয় না, যেমন তাল গাছ, নারকোল গাছ, খেজুর গাছ। ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গাছের ডাল বা শাখা ঠিক পাতার উপর দিকে পাতার গোড়া থেকেই বেরোচ্ছে। কাণ্ডে যে-জায়গা থেকে পাতা বেরোয় তাকে কাণ্ডের পর্ব বলে। কাণ্ডের পর্বের জায়গাটা অন্য জায়গাগুলোর তুলনায় কিছুটা ফোলা থাকে।

শাখা বা ডাল কাণ্ড থেকে অকারণে বেরোয় না। পাতার গোড়ায় কাণ্ডের পর্ব-মধ্য (দু'টো পর্বের মাঝখানের অংশ) অংশে আগে থেকেই ছোট্ট একটা কুঁড়ি বা মুকুল তৈরি হয়ে থাকে। এই মুকুল থেকে শুধুই শাখা তৈরি হয় বলে এদের অঙ্গজ মুকুল বলে। পাতার গোড়ায় থাকে বলে এদের কাক্ষিক মুকুলও বলা হয়। গাছের বেড়ে ওঠার জন্যে কাণ্ডের মাথায় এক ধরনের কোষ থাকে। এর নাম ভাজক কলা। এদের কোষগুলো সব সময়েই বিভাজিত হয়। এইসব বিভাজিত কোষ থেকেই নীচের অংশে পাতা, কুঁড়ি ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। কাণ্ডের ডগায় যে ভাজক কলা থাকে তার কোষগুলিই বিভাজিত হয়ে পাতা এবং কাক্ষিক মুকুল তৈরি হয়। যে-সব গাছে শাখা থাকে তাতে এই দু'টো অংশ আলাদাভাবে তৈরি হতে থাকে, কেউ কাউকে বাধা দেয় না।

তাল গাছে অগ্র মুকুল থেকে পাতা এবং শাখার অংশ দু'টোই আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু তাল গাছে পর্ব-মধ্য খুবই ছোট হওয়ায় পর্বগুলি খুব কাছাকাছি থাকে। ফলে পাতাও খুবই কাছাকাছি বেরোয়। তাই তাল গাছে পাতা সবই মাথার উপরে এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে, কাণ্ডের গায়ে ছড়ানো নয়। তা ছাড়াও তাল গাছের পাতার গোড়া বেশ চওড়া হয়। পত্রবৃন্ত কাণ্ডে অনেকটা অংশ ঢেকে রাখে, ফলে

তাল গাছের ঝাঁকড়া হতে বাধা কোথায়?

কাক্ষিক মুকুল চাপা পড়ে যায় আর বাড়তে পারে না। সেইজন্যে তা শুকিয়ে আসে বা নষ্ট হয়। তখন আর কোনো শাখা বা ডাল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই তালের কাণ্ড থেকে কোনো শাখাই তৈরি না হয়ে শুধু লম্বায় তা বাড়তে থাকে।

সুপুরি গাছ মোটা হয় না কেন?

আমাদের আশেপাশে যে সব গাছপালা জন্মায় তাদের ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে না-জানা অনেক জিনিসই জানতে পারা যায়। কোনো গাছ খুবই ছোট, কোনোটা বা একটু বড়। অনেক গাছে ডালপালা থাকে না, আবার অনেক গাছে ডালপালা খুব বেশি। কিছু গাছের আয়ু এক বছর বা তারও কম। বেশির ভাগ গাছ অনেক দিন বাঁচে। এদের বহু-বর্ষজীবী বলে। বহু-বর্ষজীবী গাছ অনেক বছর বাঁচে বলে এরা লম্বায় বাড়তে থাকে। শুধু লম্বায় বাড়লেই তো

হবে না, ওই লম্বা কাণ্ডকে খাড়া রাখবার জন্যে কাণ্ডটিকে প্রস্থেও বাড়তে হবে। তাই বছরে বছরেই গাছ অল্প অল্প মোটাও হয়। আম, জাম, কাঁঠাল গাছ লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থেও বাড়ে। তবে সব গাছই যে প্রস্থে বাড়ে এমন নয়। তাল, খেজুর, সুপুরি গাছ লম্বায় যত বেশি বাড়ে চওড়ায় ততটা নয়। তবে এর ভিতরে সুপুরি গাছ যেন শুধু লম্বাতেই বেড়ে চলেছে, এ আর মোটা হতে চায় না। সুপুরি গাছের বাড়কে বেশ অদ্ভুত মনে হয়। সব গাছ মোটা হয়, সুপুরি গাছ মোটা হয় না কেন?

গাছের বৃদ্ধির জন্য কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি দরকার। কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে গেলে কোষগুলোকে বিভাজিত হতে হবে। অর্থাৎ একটা কোষ বিভাজিত হয়ে দু'টো হবে, দু'টো থেকে চারটে—এ-ভাবেই কোষের সংখ্যা যে-দিকে যত বাড়তে থাকবে গাছও সেইদিকে ততটা বাড়বে।

সব গাছেরই কাণ্ডের ভিতর দিয়ে খাবার যাতায়াতের জন্য কতকগুলো নল আছে। এই নলগুলোকে নালিকা বাণ্ডিল বলে। এই নল বা পাইপ গাছের সারা শরীরে ছড়ানো থাকে। যে গাছ মোটা হয় তাদের নালিকা বাণ্ডিলের সঙ্গে এক ধরনের কোষ যুক্ত থাকে। এই কোষের নাম ক্যাম্বিয়াম। সময় হলে এই সব কোষ বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ তৈরি করে। কোষের সংখ্যা বাড়লে গাছ প্রস্থেও বাড়তে থাকে অর্থাৎ মোটা হতে শুরু করে।

সুপুরি গাছের বেলায় নালিকা বাণ্ডিলের সঙ্গে কোনো ক্যাম্বিয়াম থাকে না। ফলে নতুন কোষ তৈরি হয় না এবং কোষের সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটে না। এই কারণেই সুপুরি গাছ মোটা হতে পারে না। তবে সুপুরি গাছ ছোট অবস্থায় যা থাকে, বড় হলে তার থেকে কিছুটা মোটা হয়। সে এইটুকু মোটা হয় কোষের আয়তন বৃদ্ধির ফলে—অর্থাৎ কোষগুলো প্রথম দিকে যে মাপের থাকে, গাছ বেড়ে ওঠার সময়ে তারা আস্তে আস্তে মাপে সামান্য বড় হয়। আর এইভাবে বেড়ে ওঠার ফলে কাণ্ডও সামান্য মোটা হয়।

তাল রস গেঁজিয়ে ওঠে কেন?

তাল খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরি হয়। সে গুড় খেতে কতই না মিষ্টি লাগে।

কিন্তু গাছ থেকে রস পেড়ে বেশিক্ষণ রেখে দিলে নজরে আসে, হাঁড়ি বা কলসির রস আস্তে আস্তে ফুলে উঠছে আর রসের উপরে ফেনা জমছে। রসের এই অবস্থাকে গেঁজিয়ে ওঠা বলে। আরও বেশি সময় ওইভাবে ফেলে রাখলে রস আরো বেশি গেঁজিয়ে ওঠে আর হাঁড়ি বা কলসির পুরোটাই ফেনায় ভরে যায়। এইভাবে দু' এক দিন রস পচতে থাকলে হাঁড়ির ভিতর থেকে একটা মদ-মদ গন্ধের গ্যাস বেরিয়ে আসে। এই সময়ে হাঁড়ির মুখে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরলে ওই গ্যাস জ্বলতে দেখা যাবে।

তাল রসে কোহলের গন্ধ থাকে কেন?

কিন্তু তালের রস গেঁজিয়ে ওঠে কেন?

তালের রসে শর্করা বা চিনি থাকে। বাতাসে নানা ধরনের সূক্ষ্মজীব বা অণুজীব ভেসে বেড়ায়। এদের মধ্যে ঈস্ট নামের এক ধরনের ছত্রাকও থাকে। এই ছত্রাক ভাসতে ভাসতে তালের রসের ভিতরে পড়ে। চিনির দ্রবণ ঈস্টের প্রিয় খাবার। ঈস্ট তালের রস খেতে থাকে এবং নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। ফলে রসে অনেক ঈস্ট কোষ তৈরি হয়। এরা তালরসের চিনিকে ভেঙে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং কোহল তৈরি করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে কিছু রসকেও সঙ্গে ক'রে উপরে উঠে আসে এবং হাঁড়ির উপর দিকে ফেনা তৈরি করে। একেই রসের গেঁজিয়ে ওঠা বলে। রসের ভিতরে কোহল বেশি তৈরি হলে মদ-মদ গন্ধ হয়, কারণ মদেও কোহল থাকে। কোহল বাষ্প হয়ে হাঁড়ির বাইরে বেরিয়ে এলে আগুনের শিখায় জ্বলে ওঠে।

ইট চাপা ঘাস হলদে হয়ে যায় কেন?

ইট চাপা ঘাস হলদেটে রঙের। চারিদিকে ঘাসের সবুজ রঙের মধ্যে ইট চাপা ঘাস হলদে হয়ে যায় কেন?

ঘাসের পাতার রঙ সবুজ। পাতায় ক্লোরোফিল নামে এক ধরনের সবুজ রঙ বা রঙ্গক থাকে বলে পাতার রঙ সবুজ হয়। এই ক্লোরোফিলের সাহায্য নিয়েই পাতা নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে।

পাতার কোষের ভিতরে ক্লোরোফিল রঙ্গক ছোট ছোট

বাক্সে থাকে, এদের ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। ওই বাক্সে সবুজ ক্লোরোফিলের সঙ্গে হলদে রঙ্গক ক্যারোটিন এবং কমলা রঙ্গক জ্যান্থোফিলও থাকে। জ্যান্থোফিলের তুলনায় হলদে রঙ্গক ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি। তবে সবচেয়ে বেশি থাকে সবুজ রঙ্গক ক্লোরোফিল। তাই পাতার রঙ সবুজ হয়।

কিন্তু সব সময়ে নয়। পরিণত পাতাই দেখতে সবুজ। কচি পাতা সবুজ হয় না, আবার বুড়ো পাতা হলদে হয়ে যায়। পাতার ভিতরে ক্লোরোফিল তৈরি করার জন্যে আলোর দরকার। আলো না থাকলে ক্লোরোফিল তৈরি না হয়ে তা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। তাই কোনো টবের গাছকে বেশিদিন অন্ধকার ঘরে রেখে দিলে দেখা যায় যে, শুধু গাছের পাতাই নয়, সম্পূর্ণ গাছটাই হলদে হয়ে গেছে।

ঠিক একই ভাবে ইট চাপা ঘাসও হলদে হয়ে যায়। ইট চাপা ঘাস প্রথমে সবুজ থাকে। কিন্তু ইট চাপা অংশে সূর্যের আলো ঢুকতে পায় না বলে ওই অংশের ঘাসের পাতায় ক্লোরোফিল নতুন ক'রে তৈরি তো হয়ই না, বরং আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে পাতার সব ক্লোরোফিলই নষ্ট হয়ে যায়। পাতায় ক্লোরোফিল না থাকায় পাতা সবুজ রঙ হারিয়ে ফেলে। ক্লোরোফিল না থাকলেও পাতায় যে হলদে রঙ্গক ক্যারোটিন থাকে তার জন্যেই পাতার রঙ হলদে দেখায়। এই কারণেই ইট চাপা ঘাস হলদে হয়ে যায়।

কোনো কোনো আলু শক্ত থাকে কেন?

আমাদের রোজকার খাবারের তালিকাতে আলু থাকে। আলু নেই এ-কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু কোনো কোনো আলু এমন হয় যে, সহজেই তা সেদ্ধ হতে চায় না, কাটতে গেলে শক্ত মনে হয়। এমন আলুর ভিতরে চাকা চাকা দাগ দেখা যায়। যতই জলে সেদ্ধ করা হোক না কেন, তাকে নরম করা কঠিন।

মাঝে মাঝে অনেক আলুর মধ্যে এক একটা আলু এমন শক্ত হয় কেন?

শক্ত আলুতে রোগ আছে বলেই তারা শক্ত হয়। আলুর যখন রোগ হয় তখন তা সেই ক্ষেতের প্রায় সব আলুতেই হয়ে থাকে। অবশ্য ক্ষেতের কিছু কিছু আলুতে যে রোগ হয় না এমন নয়।

আলু গাছ হবার পরে অনেক সময়ে ফাইটোপথোরা নামের এক ধরনের ছত্রাক আলু গাছে বাসা বাঁধে। এই ছত্রাক ধীরে ধীরে আলু গাছের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। মাটির তলায় আলু যখন তৈরি হয় এই ছত্রাক সেই আলুর ভিতরেও ছড়িয়ে যায়।

ছত্রাক বাসা বাঁধলে আলুর ভিতরে ছত্রাকের মরা সুতোর মত শরীর নানাভাবে ছড়িয়ে থাকে। সেখানে ছত্রাক

শক্ত আলুর ভিতরে চাকা চাকা দাগ থাকে কেন?

চক্রাকারে সাজানো দেখা যায়। ফলে আলুর ভিতরে চাকা চাকা দাগ তৈরি হয়। আলুর কোষের ভিতরে ছত্রাকের সুতোর মত কোষগুলো ঢুকে পড়ে এবং আলুর খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। পরিবর্তে ছত্রাকের শরীর থেকে এক ধরনের পদার্থ বেরিয়ে এসে আলুর কোষগুলোকে শক্ত ক'রে তোলে। এই শক্ত কোষগুলি জলে বেশি ক'রে ফোটালেও সেদ্ধ হতে চায় না। এই ধরনের আলুই আমাদের কাছে শক্ত মনে হয়।

অঙ্কুরণকালে বীজ থেকে ভ্রূণমূল আগে বেরোয় কেন?

বীজ অঙ্কুরিত হলেই চারাগাছ তৈরি হয়। বীজের ভিতরে ছোট গাছ থাকে, একে ভ্রূণ বলে। ফলের ভিতরে বীজ তৈরির সময়ই বীজের ভিতরকার ভ্রূণ বা ছোট গাছ তৈরি হয়ে যায়। এই ভ্রূণে একটা কি দু'টো কিংবা অনেক সময়ে আরো বেশি বীজপত্র থাকে। বীজপত্রের সঙ্গে একটা ডাঁটির মত অংশে ভ্রূণের কাণ্ড এবং মূল থাকে। তাই এই ডাঁটিকে ভ্রূণাক্ষ বলে। ভ্রূণাক্ষের উপর দিকটায় থাকে ভ্রূণকাণ্ড এবং নীচের দিকে ভ্রূণমূল। বীজ তৈরির সময় থেকেই ভ্রূণকাণ্ডের চেয়ে ভ্রূণমূলটা একটু বড় মাপে তৈরি হয়। এটা যে সব সময়েই হবে তেমন নয়। এক-বীজপত্রী বীজে ভ্রূণকাণ্ড এবং ভ্রূণমূল দু'টোই সমান সমান তৈরি হয়।

সব বীজেই দেখা যায় যে, অঙ্কুরণের সময়ে বীজের ঢাকনা, যাকে বীজত্বক বলে, তা ভেদ ক'রে প্রথমেই ভ্রূণমূল বেরিয়ে আসে। বীজ থেকে ভ্রূণমূল বেরিয়ে এসেই সোজা মাটিতে ঢুকে পড়ে। ভ্রূণমূল মাটিতে ঢুকে পড়ার পরেই বীজ থেকে ভ্রূণকাণ্ড বেরোয়। এটাই নিয়ম। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

বীজের অঙ্কুরণের সময়ে হঠাৎ ভ্রূণমূলই বা কেন আগে বীজ থেকে বেরিয়ে আসে?

উদ্ভিদের সব কিছু বৃদ্ধির ব্যাপার ঘটে উদ্ভিদ দেহে তৈরি হওয়া এক ধরনের রাসায়নিক যৌগের প্রভাবে। এই রাসায়নিক যৌগকে হর্মোন বলে। উদ্ভিদের হর্মোন সাধারণত মুকুল, পাতা এবং ভাজক কলায় তৈরি হয়।

উদ্ভিদ হর্মোনের উপর আলো এবং অভিকর্ষ বলের প্রভাব রয়েছে। উদ্ভিদ হর্মোন সব সময়েই আলোকিত অংশের বিপরীত দিকে জমে। ফলে আলোকিত অংশের বিপরীত দিককার কোষগুলো হর্মোনের প্রভাবে খুবই দ্রুত বিভাজিত হয় এবং উদ্ভিদ অঙ্গ আলোকের দিকে মুখ ক'রে বাড়তে শুরু করে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবে হর্মোন সব সময়েই মাটির দিকে জমা হয়। ফলে মাটির বিপরীত দিকের অংশে হর্মোন কম থাকে। মূলের বেলায় কম হর্মোনেই অঙ্গ বেশি বর্ধিত হয়। ঠিক কাণ্ডের উল্টো ব্যাপার।

ভ্রূণমূলের নীচের দিকে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে প্রথমেই বীজের হর্মোন জমা হতে থাকে। কারণ বীজের ভিতরে তখনও আলো পৌঁছোতে পারে না। ফলে মূলের উপরের অংশের কোষগুলি খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নীচের দিকের চেয়ে উপরের দিকের বাড় বেশি হয় বলে ভ্রূণমূল তাড়াতাড়ি মাটির দিকেই বেড়ে যায়। অভিকর্ষ বলের জন্য ভ্রূণকাণ্ডের চেয়ে ভ্রূণমূলে বেশি হর্মোন সঞ্চিত হওয়ায় ভ্রূণমূলের বৃদ্ধিও ভ্রূণকাণ্ডের চেয়ে আগে হয়। মূলের আবার জলের দিকে বেড়ে ওঠার প্রবণতা আছে। মাটিতে জল থাকায় ভ্রূণমূল মাটির দিকেই বেড়ে চলে।

বেশি গরমে ছোট গাছ নেতিয়ে পড়ে কেন?

ছোট ছোট গাছের দশা গরমকালে দুপুরে যে খুব ভাল থাকে না, তা দেখলেই বোঝা যায়। সকালে দেখা তরতাজা গাছটি দুপুরের গরম বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। গাছের পাতা নেতিয়ে যায়। অনেক সময়ে গাছের উপর দিকটাও নুয়ে আসে। মনে হয়, এ-গাছ বুঝি আর বাঁচবে না। কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায় সেই গাছকেই বেশ সতেজ দেখায়। মানুষের মতই হয়তো বা ছোট গাছ গরম সহ্য করতে পারে না, তাই নেতিয়ে প'ড়েই গাছ তার ক্লান্তি প্রকাশ করে।

গরমকালে ভর দুপুরে ছোট গাছ নেতিয়ে পড়ে কেন?

গাছ মূল দিয়ে মাটি থেকে জল নেয়। সেই জল তার সারা শরীরে চলে যায় এবং গাছকে সতেজ রাখে। গাছের কোষগুলি জলে ভরা বলেই গাছের সব অঙ্গ টানটান থাকে এবং গাছকে সতেজ দেখায়।

মাটি থেকে গাছ যে জলটা নেয় তার কিছুটা অংশ গাছের পাতা থেকে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। সূর্যের আলো পাতায় পড়লে পাতা গরম হয়ে ওঠে। সূর্যের এই তাপ থেকে বাঁচবার জন্যে পাতা ওই তাপ দিয়ে জলকে বাষ্পে পরিণত করে। ফলে পাতা বেশি গরম হয় না। গাছের পাতা থেকে যে-পরিমাণ জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায় গাছ মাটি থেকে সেই পরিমাণ জল শুষে নেয়। ফলে গাছের শরীরে জলের কোনো ঘাটতি হয় না, গাছও সতেজ থাকে।

বেশি গরমে গাছের পাতাও বেশি গরম হয়ে ওঠে। পাতা ঠাণ্ডা রাখতে গাছের পাতা থেকে বেশি পরিমাণ জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। ফলে পাতায় জলের ঘাটতি ঘটে। পাতার কোষে জল কম থাকায় কোষগুলো আর টানটান থাকে না, সেইজন্য পাতাও আর সটান থাকতে পারে না। পাতা নেতিয়ে পড়ে।

'গরমে মাটিও গরম হয়ে যায়। মাটি গরম হলে তা থেকে জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে আসে, ফলে মাটিতে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। গাছও তখন মাটি থেকে বেশি জল নিতে পারে না। ফলে গাছের পাতাও বেশি জল পায় না। আর তাই নেতিয়ে যাওয়া পাতা সোজা হতে পারে না। এই কারণেই গরমকালে ভরদুপুরে ছোট গাছ নেতিয়ে পড়ে।

তাল গাছ এত লম্বা হয় কেন?

তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে—অর্থাৎ তাল গাছের মত লিকলিকে লম্বা গাছ আর হয় না।

কিন্তু তাল গাছ এত লম্বা হয় কেন?

যে কোনো গাছ কতটা বাড়বে, তা নির্ভর করে গাছ নিজের জন্যে কতটা পুষ্টি সংগ্রহ করছে তার উপর। পুষ্টি কম হলে গাছ বাড়বে না, কিন্তু বেশি পুষ্টিতে গাছ বেড়ে উঠবে। গাছের পুষ্টি বেশি হলেই গাছ তা সমান ভাগে সব অঙ্গের মধ্যে ভাগ ক'রে দেয়। গাছে নতুন শাখা, নতুন

পাতা গজায়, মুকুল, ফুল-ফলে ভরে ওঠে। এর সঙ্গে সঙ্গে গাছ লম্বাতেও বাড়তে থাকে। তবে তুলনায় লম্বায় বাড়াটা কম হয়। কিন্তু গাছকে যদি শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল নতুন ক'রে আর তৈরি করতে না হয়, তাহলে সেই একই খাবার দিয়ে গাছ লম্বায় আরো বেশি বেড়ে যাবে। সেই কারণে রোদের গাছ ঝাঁকড়া হয় আর ছায়ার গাছ লম্বা।

তাল গাছেও সেই একই ব্যাপার। তাল গাছ যে খাবার তৈরি করে তা দিয়ে ডালপালা, পাতা, ফুল-ফল তৈরি করলে, লম্বায় বেশি বাড়তে পারতো না। আম, জাম, কাঁঠাল গাছের মত ঝাঁকড়া হয়ে উঠতো। কিন্তু তাল গাছে কাক্ষিক মুকুল বাড়তে পারে না বলে কোনো শাখা তৈরি হয় না। [দ্রষ্টব্য ঃ তাল গাছে শাখা হয় না কেন?] শাখা তৈরি করার জন্যে যে পরিমাণ পুষ্টির জোগান দিতে হত, সেই পুষ্টি নিয়ে তাল গাছের অগ্রমুকুলই বেড়ে ওঠে, ফলে তাল গাছ লম্বাই হতে থাকে। পার্শ্ব বা কাক্ষিক মুকুল থেকে শাখা তৈরি করতে তাল গাছের যতটুকু হর্মোন ব্যয় হবার কথা, সেই পরিমাণ হর্মোন আরো বেশি ব্যয় ক'রে তাল গাছের অগ্রমুকুল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে তাল গাছও লম্বায় বেড়ে যায়।

বেড়ার গাছ ঘন ঘন ছাঁটা হয় কেন?

পার্কে, বাড়ির বাগানে কিংবা বাড়ির সীমানা ধরে নানা ধরনের গাছ লাগানো হয়। এই গাছ অনেকটা বেড়ার মত কাজ করে। প্রথম দিকে এই সব গাছ ছাড়া ছাড়া থাকলেও কিছুদিন পরেই বেশ ঘন ঝোপের আকার নেয়। এই ধরনের গাছকে ঝোপে পরিণত করতে গেলে বারেবারে গাছগুলোর মাথা ছেঁটে দিতে হয়। মাথা না ছাঁটলে এরা শুধু লম্বাতেই বাড়তে থাকবে, ফলে দু'টো গাছের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকু আর ভরাট হবে না। উপর দিক থেকে গাছ ছেঁটে দিলেই তলার দিকে শাখাগুলো বাড়তে থাকবে এবং দু'টো গাছের মাঝখানের ফাঁকটাকে ভরিয়ে তুলবে। এ-ভাবেই বেড়ার গাছ বেশ ঝাঁকড়া হয়ে ওঠে এবং একটা পাঁচিলের মত সীমানা তৈরি করে।

যে-কোনো গাছের কাণ্ড যখন লম্বায় বেড়ে ওঠে তখন তার ডগায় যে-মুকুল থাকে সেটাই শুধু বৃদ্ধি পায়। গাছের কাণ্ডের ডগায় বা অগ্রের মুকুলকে শীর্ষ বা অগ্রমুকুল বলে। অগ্র মুকুলের কোষগুলি বিভাজিত হয়ে যায় এবং পিছন দিকে পর্ব, পর্বমধ্য, পাতা এবং কাক্ষিক মুকুল তৈরি করার জন্য কোষগুলিকে আলাদা আলাদা ভাগ ক'রে দেয়। পরে এই আলাদা আলাদা কোষ থেকেই পর্ব, পর্বমধ্য, পাতা এবং কাক্ষিক মুকুল তৈরি হয়।

তৈরি হওয়ার পরে পাতার ভিতরে এক ধরনের হর্মোন সৃষ্টি হয়। ওই হর্মোন অগ্রমুকুলে চলে আসে এবং অগ্র-মুকুলকে বৃদ্ধি করার কাজে লেগে যায়। পার্শ্ব বা কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধির জন্য আর হর্মোন থাকে না, ফলে শাখাও তৈরি হয় না। এইভাবে চলতে থাকলে অগ্র মুকুলের বৃদ্ধির জন্য গাছ শুধু লম্বাতেই বাড়তে থাকবে। যদি অগ্রমুকুলকে কেটে বাদ দেওয়া যায় তবে পাতায় তৈরি হর্মোন অগ্র-মুকুলের পরিবর্তে পার্শ্ব বা কাক্ষিক মুকুলে গিয়ে কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফলে কাক্ষিক মুকুল থেকে শাখা বেরোয়। আবার শাখার অগ্রমুকুলকে কেটে বাদ দিলে প্রশাখাগুলি বাড়তে থাকে। এইভাবে বারেবারে আগার মুকুলগুলিকে ছেঁটে বাদ দিলে নীচের মুকুলগুলি বেড়ে নতুন নতুন শাখা তৈরি করবে, ফলে গাছ ঝাঁকড়া হয়ে উঠবে। এইজন্যই বেড়ার গাছকে ঘন ঘন ছাঁটা হয় যাতে বেড়ার গাছ শাখা- প্রশাখা তৈরি ক'রে বেশ ঝাঁকড়া হয়ে উঠতে পারে।

স্থলপদ্ম ফুলের পাপড়ির রঙ পালটায় কেন?

ফুলের রঙ তার পাপড়ির রঙের জন্যেই রঙিন হয়। অধিকাংশ ফুলে কুঁড়ি অবস্থাতেই পাপড়িগুলি রঙিন থাকে, ফুল ফুটলেও সেই রঙের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। জবা ফুলে এই রকমই দেখা যায়। অনেক গোলাপে কুঁড়ি অবস্থায় পাপড়ির রঙ হালকা থাকে, ফুল ফুটলে ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে পড়ে। সাধারণত শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ফুলের পাপড়ির রঙ একই রকম থাকে।

স্থলপদ্ম গাছে কুঁড়ি ফুটে ফুল হয় রাত্তিরে। খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগে পাপড়িগুলো সাদা থাকে। বেলা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজও বেড়ে যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থলপদ্ম ফুলের পাপড়িগুলি সাদা থেকে গোলাপী এবং সবশেষে টকটকে লাল রঙের হয়ে পড়ে। পাপড়ির এই রঙ সারাদিনই থাকে। সূর্য অস্ত গেলেও সেই

রঙ নষ্ট হয় না।

স্থলপদ্ম ফুলের পাপড়ির রঙ রোদের সঙ্গে সঙ্গে কেন পাল্টায়?

ফুলের পাপড়ির রঙ নানা ধরনের রঙ্গকের জন্য হয়। ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, অ্যান্থোসায়ানিন ইত্যাদি অসংখ্য রঙ্গক ফুলের পাপড়ির কোষগুলিতে জমা থাকে। এক এক ধরনের রঙ্গকের জন্যে পাপড়িগুলির রঙও এক এক ধরনের হয়। দোলের সময় বালতির জলে রঙ গুলে আমরা

সূর্য ওঠার আগে স্থলপদ্মের পাপড়ির কী রঙ থাকে?

যেমন রঙ তৈরি করি, ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধরনের রঙ্গক পাপড়ি কোষে গোলা থাকে, ফলে পাপড়িও রঙিন হয়ে ওঠে। এইসব রঙের ভিতর বিভিন্ন ধরনের অ্যান্থোসায়ানিন থাকার জন্যেই পাপড়ির রঙ প্রধানত ভিন্ন ভিন্ন হয়। [দ্রষ্টব্য ঃ ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন? (রসায়ন বিজ্ঞান)]

অনেক সময়ে একই ধরনের অ্যান্থোসায়ানিন আবার পাপড়িগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন রঙে রঙিন করে তোলে। এটা সম্ভব হয় পাপড়ি-কোষের রসের জন্যে। পাপড়ির কোষরস যদি আম্লিক হয় তাহলে পাপড়ির রঙ লাল হবে। আর পাপড়ির কোষরস যদি ক্ষারীয় হয় তাহলে পাপড়ির রঙ বেগুনি হবে। পাপড়ির রঙিন হওয়ার এই ধরনের ব্যাপার কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই খাটে না—এর নানারকম ব্যতিক্রমও দেখা গেছে।

স্থলপদ্মে পাপড়ির লাল রঙ সায়ানিন নামের এক ধরনের অ্যান্থোসায়ানিনের জন্যে হয়। গোলাপ ফুলের পাপড়ির লাল রঙও ওই একই রঙ্গক থাকার জন্যে।

রাত্তিরে ফোটে বলেই স্থলপদ্ম ফুলের পাপড়ির রঙ সাদা হয়, কারণ তখনও পর্যন্ত পাপড়ি-কোষে কোনো সায়ানিন তৈরি হয়নি। সারা রাত ধরে ধীরে ধীরে স্থলপদ্মের পাপড়ি-কোষে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু জমা হয়। এই অ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যেই দিনের বেলায় সূর্যের আলো এবং তাপ নিয়ে স্থলপদ্মের পাপড়ি-কোষ ধীরে ধীরে সায়ানিন তৈরি করতে শুরু করে। পাপড়ি-কোষে সায়ানিন রঙ্গকের ঘনত্ব যতই বাড়তে থাকে পাপড়ির রঙ ততই সাদা থেকে গোলাপী এবং সবশেষে লাল হয়ে যায়। তৈরি হওয়ার পরে পাপড়ি-কোষে সায়ানিন থেকে যায় বলেই সূর্য অস্ত গেলেও পাপড়ির রঙ আর সাদা হয় না।

বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ



আমাদের আশেপাশে হাঁটা-চলার পথের ধারে আম, জাম, কাঁঠাল, বট, অশ্বত্থ বা নিম গাছের মত অতি পরিচিত গাছ ছাড়া আরো যে কত বিচিত্র গাছ দাঁড়িয়ে আছে, বলে তা শেষ করা যায় না। মানুষের সবচেয়ে পুরনো আর নির্ভরযোগ্য বন্ধু গাছ। এইসব গাছের মধ্যে কেউ বরাবর এ-দেশের, আবার কেউ কোনো কালে এসেছে বিদেশ থেকে।

এদের নামকরণের ইতিহাস, ফুলের বাহার, ফলের বৈচিত্র্য আর চেহারায় যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তা নিয়ে আমাদের কৌতূহল কম নয়। কিন্তু এদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা আজও যে স্পষ্ট তা বলা চলে না।

চারপাশের গাছপালা সম্পর্কে এই ধরনের কৌতূহলকর নানারকমের বিচিত্র প্রশ্ন নিয়েই 'বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ'।

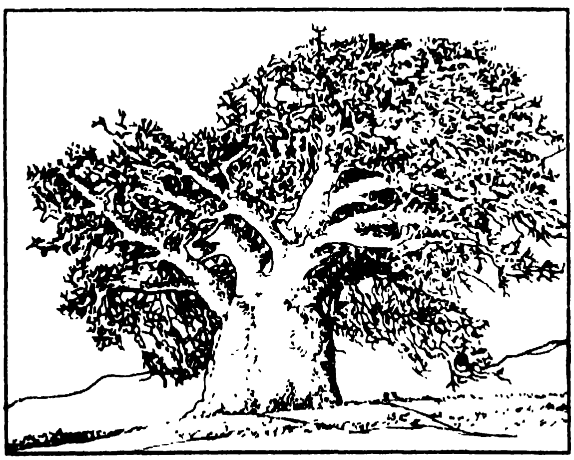
বাওবাবকে কেন বাঁদররুটির গাছ বলা হয়?

বাওবাব গাছ দেখতে বড় অদ্ভুত। এটি আমাদের দেশীয় গাছ নয়, এসেছে আফ্রিকা থেকে। বাওবাবের অনেক নাম, ইংরেজিতে বলে আফ্রিকান কালাবাস, মাঙ্কিব্রেড। মাঙ্কিব্রেড নাম থেকেই বাংলায় এ-গাছের নামকরণ হয়েছে বাঁদররুটি। এর ফল দেখতে অনেকটা ছোটখাটো লাউয়ের মত, রঙ হালকা বাদামী বা ধূসর। ফলের বাইরেটা খসখসে আবরণে

বাওবাব কোন দেশের গাছ?

ঢাকা আর ভিতরে থাকে বীচি বোঝাই শাঁস। কোথাও কোথাও এই শাঁস প্রীতিকর অম্ল স্বাদের জন্যে মানুষের খাবার টেবিলেও স্থান পেয়েছে।

কিন্তু মানুষের প্রথাসিদ্ধ খাদ্য না হলেও বাওবাব ফল বাঁদরদের বড় প্রিয় খাদ্য। সেই কারণে আফ্রিকার অঞ্চল বিশেষে এর নাম হয়েছে বাঁদররুটির গাছ। শোনা যায়, আরবদেশীয় বণিকেরা আফ্রিকা থেকে আমাদের দেশে বাওবাব গাছ আনে। এর বৈজ্ঞানিক নাম এডান সোনিয়া ডিজিটাটা লিন।



বাওবাব বা বাঁদররুটির গাছ

গাছে ফুল না থাকলে রাধাচূড়া এবং কৃষ্ণচূড়াকে চিনবো কী ক'রে?

ফুল দেখে রাধাচূড়া বা কৃষ্ণচূড়ার গাছ চেনা যায়। রাধাচূড়ার ফুল হলদে থোকা থোকা আর কৃষ্ণচূড়ার লাল। লাল আর হলুদ ফুলের রঙের তফাত থেকেই রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়াকে সহজেই চেনা সম্ভব। কিন্তু গাছে যখন ফুল থাকে না তখন এদের চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ এরা ভিন্ন জাতের হলেও গাছের আকৃতি-প্রকৃতি, পাতার রঙ অনেকটা একই ধরনের। তাই আলাদা ক'রে চেনার



গুলমোহর বা কৃষ্ণচূড়ার ফুল পাতা ও ফল

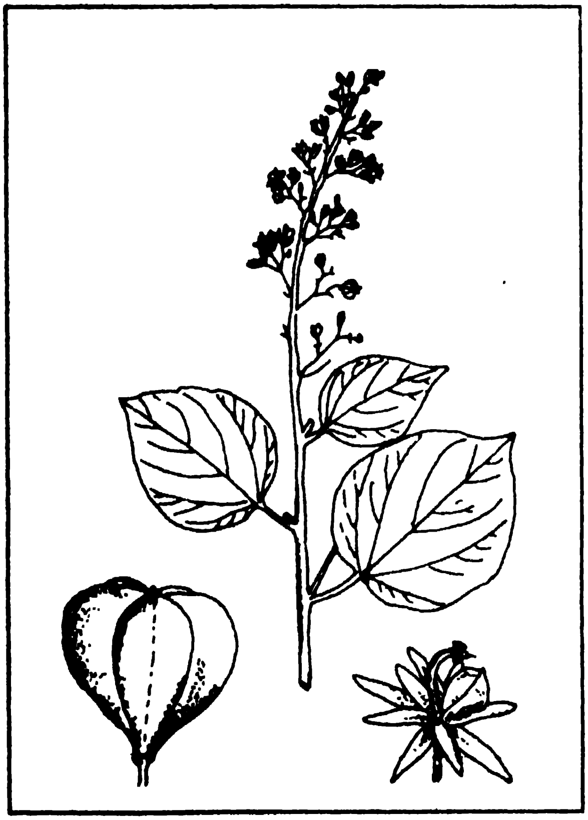
কতকগুলো উপায় মনে রাখতে হয়।

প্রথমত, এ গাছ দু'টির ফল বা শুঁটির মধ্যে প্রভেদ আছে। কৃষ্ণচূড়ার শুঁটি আকারে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ সেন্টিমিটার লম্বা, চওড়া সাত-আট সেন্টিমিটার। প্রথম অবস্থায় রঙ সবুজ, পরিণত হলে রঙ হয় বাদামী। রাধাচূড়ার শুঁটি পাঁচ থেকে দশ সেন্টিমিটার লম্বা আর আঠারো থেকে কুড়ি মিলিমিটার চওড়া হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণচূড়ার শুঁটি লম্বা ও চওড়ায় বড় কিন্তু রাধাচূড়ার শুঁটি লম্বা-চওড়া দু'টোতেই ছোট। প্রথম অবস্থা থেকেই রাধাচূড়ার শুঁটির রঙ পুরনো তামার মত মরচে বাদামী। প্রায় সারা বছরই এ-গাছ দু'টিতে শুঁটি থাকে। শুঁটির বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে এদের আলাদা ক'রে চেনা কঠিন নয়। দ্বিতীয়ত, যদিও এদের পাতা দেখতে প্রায় একই রকম, তবুও রাধাচূড়ার কচি পাতা এবং শাখা-প্রশাখার ডগার রঙ

কিছুটা তামাটে কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার পাতা আর ডগার রঙ ফিকে বা সাদাটে সবুজ। তা ছাড়া কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখার ডগার দিকে উষ্ণীষের অগ্রভাগের মত একটা ঝালোর ঝালোর ভাব আছে। রাধাচূড়ায় এটা পাওয়া যায় না। আর রাধাচূড়ার শাখার ডগায় এবং কচি পাতার উল্টো দিকে সূক্ষ্ম চুলের মত একটা রোঁয়া রোঁয়া ভাব লক্ষ্য করা যায়, কৃষ্ণচূড়ায় তা নেই। ফুল না থাকলেও এ-সব লক্ষণ দেখে দু'টি গাছকে আলাদা ক'রে চেনা যায় সহজেই।

মানুষের অতিথিপরায়ণতাকে স্মরণ ক'রে কোন গাছের নামকরণ করা হয়েছে?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডেনমার্কে 'ক্রেনহোব' নামে একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছিলেন। এই ক্রেনহোবের খ্যাতি বৃক্ষবিদ হিসেবে যেমন ছিল, তেমনই ছিল অতিথিপরায়ণ মানুষ



ক্রেনহোবিয়া হসপিটা বা বোলার পাতা, ফুল ও ফল

হিসেবে। অতিথিপরায়ণ এই বৈজ্ঞানিকের স্মরণে একটি গাছের নামকরণ করা হয়েছে। গাছটির নাম ক্রেনহোবিয়া হসপিটা।

অতিথিপরায়ণ মানুষের মতই ক্রেনহোবিয়া হসপিটাও অতিথিপরায়ণ। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, নানা জাতের পরগাছাকে এ-গাছ আশ্রয় দেয়। এটাই গাছের অতিথিপরায়ণতা।

ক্রেনহোবিয়া হসপিটা মাঝারি আকারের গাছ। গুঁড়ির রঙ ফিকে বাদামী, পাতা কিছুটা পানের মত, ইংরেজিতে যাকে বলে 'হার্টশেপ'—তাই। শাখা-প্রশাখার ডগায় থোকা থোকা ফুল হয়, ফুলের রঙ ফিকে-খয়েরি-গোলাপী। মে মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ফুল ফোটে। বেশি ফোটে অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গাছের পুরনো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজায়।

এ-গাছের ফল বা শুঁটি খুব ছোট; কাগজের ঠুলির মত ফাঁপা। চ্যাপটা ন্যাশপাতির মত এর আকৃতি।

এক সময়ে ক্রেনহোবিয়ার মাতৃভূমি ছিল আফ্রিকা, মালয় এবং অস্ট্রেলিয়া। 1798 সালে আমাদের দেশে মোলাকাস থেকে এ-গাছের চারা আনা হয়েছে। ক্রেনহোবিয়ার বাংলা নাম বোলা।

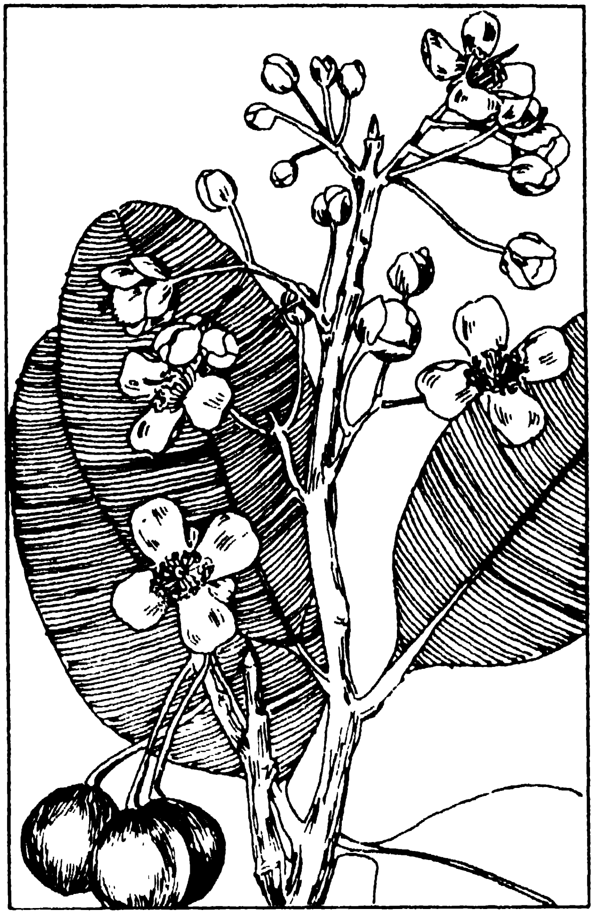
সুলতান চাঁপা কি চাঁপা গাছ?

চাঁপা আমাদের সকলের অতি পরিচিত গাছ। কিন্তু সুলতান চাঁপার সঙ্গে চাঁপা গাছের কোনো মিল নেই। না গাছের সঙ্গে, না ফুলের সঙ্গে। চাঁপা হল সংস্কৃত শব্দ। এর

কোন ঋতুতে সুলতান চাঁপা গাছে বেশি ফুল ফোটে?

বৈজ্ঞানিক নাম মাইকেলিয়া চম্পক। এই চাঁপার তুলনায় সুলতান চাঁপা সাধারণের কিছুটা অপরিচিত গাছ। এই মনোরম চিরহরিৎ গাছটির মাতৃভূমি ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলবর্তী জেলা। তা ছাড়া ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংহল, পলিনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দ্বীপপুঞ্জকেও সুলতান চাঁপার আদি নিবাস বলে মনে করা হয়।

ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে শ্বেতবর্ণের ছোট ছোট ফুলের যেন একটি সুলতানী মেজাজ আছে। এ-ফুলের গন্ধ মিষ্টি হালকা, বৈজ্ঞানিক নাম ক্যালোফাইলাম ইনোফাইলাম।



সুলতান চাঁপার পাতা, ফুল ও ফল

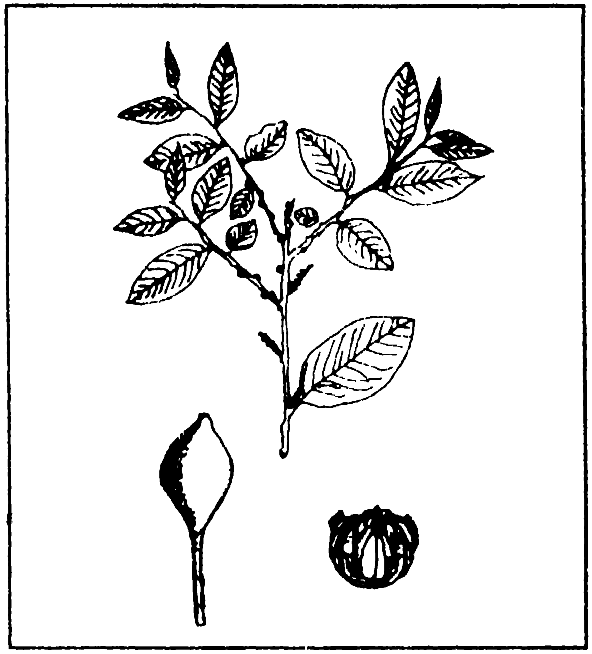
ক্যালোফাইলাম মানে সুন্দর পাতা—নামটি খুবই মানানসই। ঘন সবুজ ডিম্বাকৃতি পাতার জন্যেও এ-গাছকে সুন্দর দেখায়।

শীতের প্রথমে বিশেষ ক'রে বর্ষা ঋতুতেই সুলতান চাঁপার ফুল ফোটে। ফলের আকৃতি অনেকটা সবুজ রঙের মার্বেল গুলির মত। এ ফলের বীজ থেকে যে-তেল বেরোয়, তা নানাভাবে মানুষের কাজে লাগে।

'সুলতান চাঁপা' ছাড়াও এ-গাছের ভারতীয় ভাষায় অনেক নাম। পুন্নাগ, উণ্ডি, পিনাই, পুনাই আর ইংরেজি নাম আলেকজেন্ড্রিয়া লরেন্স।

পুত্রঞ্জীব গাছের নামকরণের পিছনে কোনো সংস্কার বা বিশ্বাস আছে কী?

পুত্রঞ্জীব সম্পূর্ণ ভারতীয় গাছ। ভারতের বিভিন্ন



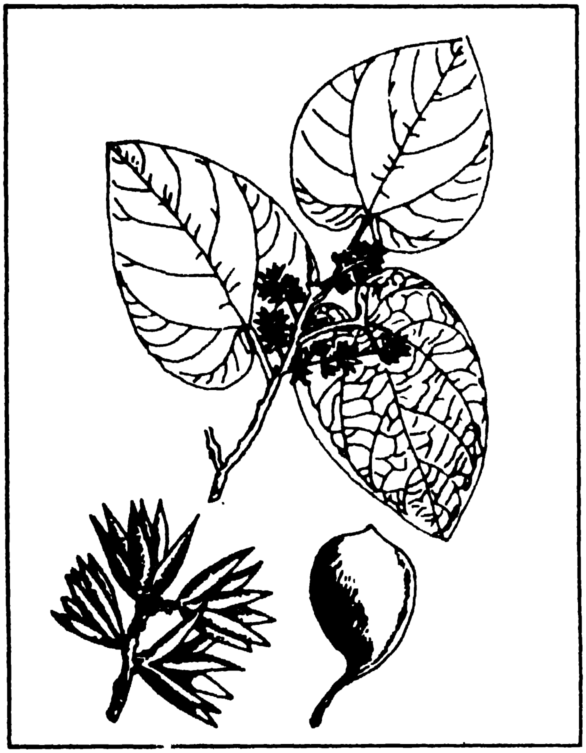
পুত্রঞ্জীব গাছের পাতা, ফুল ও ফল

প্রাদেশিক ভাষায় এই গাছের যে নাম আছে তা থেকেই মনে হয় কোনো একটা সংস্কার বা বিশ্বাস থেকেই এ-গাছের নাম হয়েছে পুত্রঞ্জীব। বাংলায় এ-গাছকে বলে জীয়সূত বা জীয়পুত আর সংস্কৃত নাম পুত্রঞ্জীব।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের বিশ্বাস যে, পুত্রঞ্জীব গাছের বীজ অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে শিশুদের জীবন রক্ষা করে। শয়তানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ফকির ও সাধুরাও এ-গাছের বীজ দিয়ে জপের মালা তৈরি করেন। অপদেবতার খারাপ দৃষ্টি থেকে শিশুদের রক্ষা করবে এই বিশ্বাসে পুত্রঞ্জীবের বীজ ফুটো ক'রে কোথাও কোথাও শিশুদের গলায় পরানো হয়। এ-জাতীয় সংস্কার থেকে গাছের নাম পুত্রঞ্জীব। আর কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিনটেন্ডেন্ট উইলিয়ম রক্সবার্গের নাম অনুসারে এ-গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হয়েছে 'পুত্রঞ্জীব রক্সবার্গি'।

কোন মহাপুরুষের নামে গাছের নামকরণ করা হয়েছে?

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের নামে ভারতের এক জাতের সুবিশাল গাছের নামকরণ করা হয়েছে। গাছের নাম বুদ্ধনারিকেল। বাংলা নাম থেকে ইংরেজিতে



বুদ্ধনারিকেল গাছের পাতা, ফুল ও ফল

এ-গাছের নাম হয়েছে Buddha's coconut। বুদ্ধনারিকেল কিন্তু মোটেই নারকোল জাতের গাছ নয়। শাখা-প্রশাখা যুক্ত বিশাল এই গাছের পাতা বড় বড় পান পাতার মত। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গাছের পুরনো পাতা ঝরে যায়। সেই সময়ে ফুল ফোটে। ফুল ছোট ছোট, পাঁচ পাপড়ির তারার মত। রঙ ফিকে সবুজ-হলুদ। ফুল শেষ হলেই পাতা ঝরা শুরু হয়। সারা বছর এ-গাছ কিছুটা ন্যাড়ান্যাড়া থাকে।

ফল খুব বড়, প্রায় চ্যাপটা গোলাকার এবং কেঠো কেঠো। বুদ্ধনারিকেলের মাতৃভূমি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, সিকিম, আসাম, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ এবং আন্দামান। এর বৈজ্ঞানিক নাম টেরিয়াগাটা অ্যালাটা।

সোনাঝুরির ফুল কি সোনালি রঙের?



সোনাঝুরির ফুল, পাতা ও ফল

রঙ আর গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে অনেক সময় ফুলের নামকরণ করা হয়। সোনাঝুরি নামের সঙ্গে ফুলের রঙের মিল আছেই, সেই সঙ্গে গড়নের মিলও লক্ষ্য করা যায়—অর্থাৎ একটা ফুলঝুরি ফুলঝুরি ভাব।

মাঝারি আকারের গাছ সোনাঝুরি। এর পাতার গড়ন কিছুটা বাঁকা চাঁদ বা কাস্তের ফলার মত। মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মাঝে মাঝেই এ-গাছে ফুল আসে। সব চেয়ে বেশি ফুল ফোটে সেপ্টেম্বর আর নভেম্বর মাসে। ফুল মিষ্টি গন্ধযুক্ত সোনালি রঙের। ঝুরির গা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে দেখলে দেখা যাবে ফুলগুলি খুব ছোট আকারের নাক-ছাবি গয়নার মত, কাছে না গেলে ফুলগুলো আলাদা আলাদাভাবে চোখেই পড়ে না। চোখে পড়ে কেবল ফুলের ঝুরি, যা দেখতে ছোট আকারের ফুলঝুরি বাজির মত।

সোনাঝুরির আর এক বাংলা নাম কী?

এর ফল দেখতে কিছুটা জিলিপির মত। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে পাকা ফল ফেটে ছোট ছোট কালো রঙের বীজ বেরিয়ে এসে সোনালি রঙের সুতোয় ঝুলতে থাকে। সোনালি সুতোয় বাঁধা ঝুলন্ত বীজের কথা ভেবে হয়তো এর

নাম রাখা হয়েছে সোনাঝুরি। বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাকাসিয়া অরিকিউলিফরমিস। আগে বাংলা নাম ছিল 'আকাশমণি', 'সোনাঝুরি' নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। মাত্র একশো বছর আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে এ-গাছ আমাদের দেশে এসেছে।

ঘণ্টাকর্ণ কোন গাছের নাম?

মাঝারি আকারের এক ধরনের বিদেশী গাছের স্বদেশী নাম রাখা হয়েছে ঘণ্টাকর্ণ। এই নামকরণ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তার আগে এ-ফুলের বাংলা নাম ছিল না। ফুলের আকৃতির কথা ভেবেই এই জাতীয় নামকরণ। গাছের বৈজ্ঞানিক নাম স্প্যাথোডিয়া ক্যাম্পানুলাটা—যার মানে হল

ঘণ্টাকর্ণ গাছের নাম কার দেওয়া?

ঘণ্টাকৃতি। ফুলের আকৃতি কিছুটা ঘণ্টার মত বলেই হয়তো



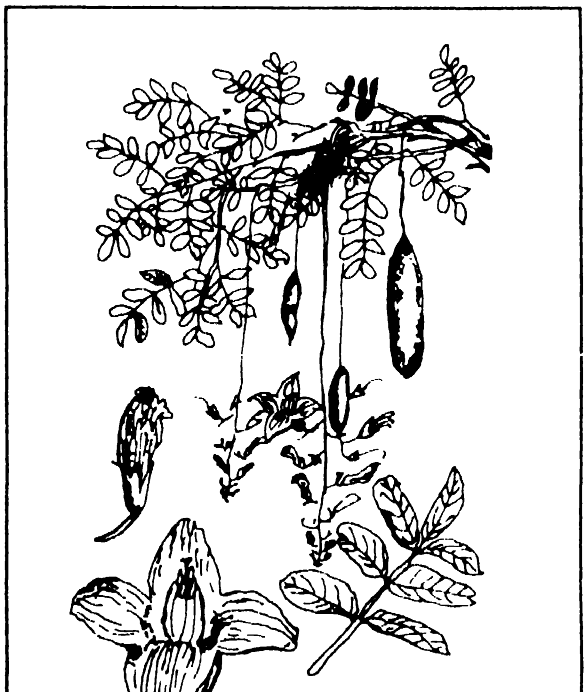
ঘণ্টাকর্ণের ফুল ও পাতা

রবীন্দ্রনাথ ঘণ্টাকর্ণ নাম দিয়েছেন।

ঘণ্টাকর্ণের ইংরেজি নাম স্কারলেট বেল। আবার কখনও একে টিউলিপ ট্রি-ও বলা হয়। এক সময়ে ঘণ্টাকর্ণের মাতৃভূমি ছিল আফ্রিকা। 1473 সালে আফ্রিকার আঙ্গোলা থেকে সিংহলে এ গাছ আনা হয়। সেখান থেকে আসে ভারতবর্ষে।

কোন গাছকে রক্তঠুঁটি বলা হয়?

রক্তঠুঁটি একটি স্বদেশী নামের বিদেশী গাছ। ফুলের রঙ আর গড়নের কথা ভেবেই এই জাতীয় নামকরণ। বাংলা নাম না থাকায় রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করেছেন। রক্তঠুঁটির বৈজ্ঞানিক নাম হল 'কাইজেলিয়া পিনাটা', একে ইংরেজিতে বলে সসেজ ট্রি।



রক্তঠুঁটির পাতা, ফুল ও ঝুলন্ত ফল

বসন্ত থেকে শুরু ক'রে সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে রক্তঠুঁটির ফুল ফোটে। ফুল বড় বিচিত্র। রঙ ও আকৃতি কিছুটা ছোট মাপের কলা-মোচার মত। চারটি পাপড়ি জোড়া লেগে কিছুটা হাতের অঞ্জলির আকার ধারণ করে। ফুলের বোঁটা

হালকা সবুজ, কিন্তু সম্পূর্ণ ফুলের রঙ ঘন খয়েরি আর পিঠের দিকটা খয়েরির উপরে হালকা সবুজের ছিটছিট।

অঞ্জলি আকৃতি ফুলের ভিতরটাই সবচেয়ে বেশি কালচে রাঙা, তাই হয়তো রক্তঠুটি নাম। ফুলগুলো ঝুলতে থাকে

রক্তঠুটি কোন দেশের গাছ?

ঠিক যেন এক একটি ঝাড়লণ্ঠন। কুঁড়ির সঙ্গে সঙ্গে গাছের শাখা থেকে নেমে আসে ফুল ঝোলানো দড়ি। সেই দড়ির দোলনায় ঝোলে রক্তঠুটি ফুল। ফল শশার মত, তাই এর ইংরেজি নাম সসেজ ট্রি। রক্তঠুটির মাতৃভূমি হল মোজাম্বিক এবং আফ্রিকার উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চল।

পলাশের সংস্কৃত নাম কিংশুক হল কেন?

পলাশ আমাদের অনেকেরই পরিচিত ফুল। এ-ফুল ছাড়া সরস্বতী পুজো হয় না বললেই চলে। কিন্তু অনেকেরই হয়তো জানা নেই পলাশের কেন কিংশুক নাম হল।

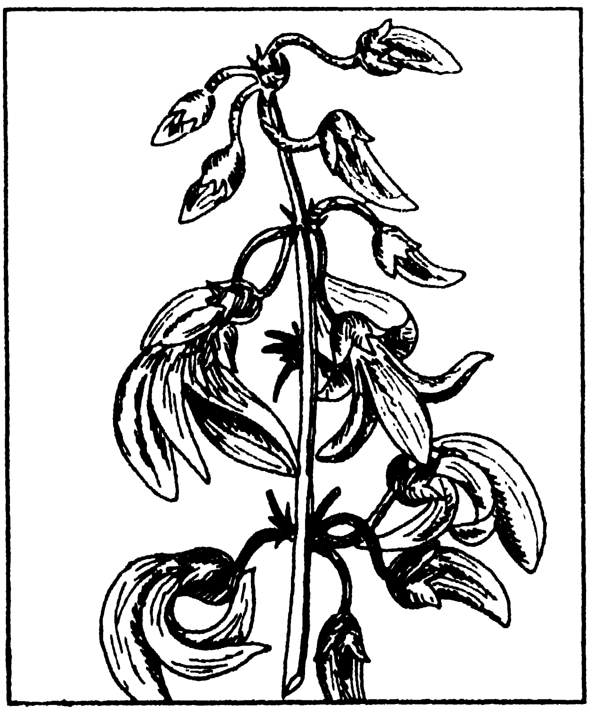
পলাশের রঙ আগুনের মত, যখন ফোটে তখন মনে হয় বনে বনে আগুন লেগেছে। তাই এর ইংরেজি নাম Flame of the forest। ফুলের আকৃতির সঙ্গে পরিচিত একটি পাখির ঠোঁটের খুব মিল আছে। পাখিটি হল শুকপাখি

পলাশের সঙ্গে কোন পাখির ঠোঁটের মিল আছে?

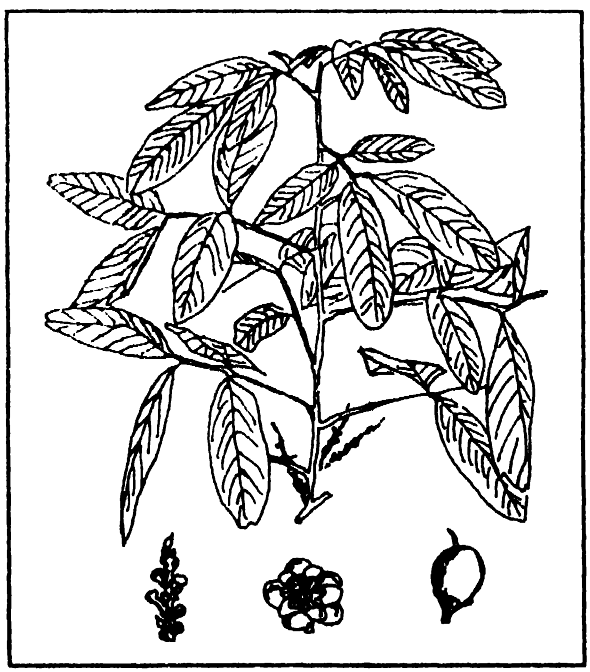
অর্থাৎ টিয়া। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ফুলের ডগার দিকটা দেখতে অবিকল টিয়া পাখির ঠোঁটের মত। তাই প্রাচীন ভারতের পুষ্প প্রেমিকগণ সংস্কৃতে প্রশ্নের আকারে এ-ফুলের নাম দিয়েছেন—'কিম্ শুক'? অর্থাৎ শুকপাখি কি? টিয়ার লাল ঠোঁটের সঙ্গে পলাশের খুব মিল আছে। বিশেষত কুঁড়ি পলাশ একেবারেই টিয়ার ঠোঁট। এ-গাছের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ। পলাশের বৈজ্ঞানিক নাম বিউটিয়া মনোস পারমা।

ভারতীয় হয়েও কোন গাছের বাংলা নাম নেই?

লেপিসেনথিস টেট্রাফোলিয়া মাঝারি আকারের গাছ। এ-গাছের মাতৃভূমি দক্ষিণ ভারত, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশ। এ-গাছের চারটি পল্লব নিয়ে হয় একটি পাতা—তাই ল্যাটিন ভাষায় বলে টেট্রাফোলিয়া। ফুল খুব ছোট, এতে পাঁচটি বৃতি আর চার পাঁচটি পাপড়ি থাকে। রঙ হালকা সাদা। ফলের

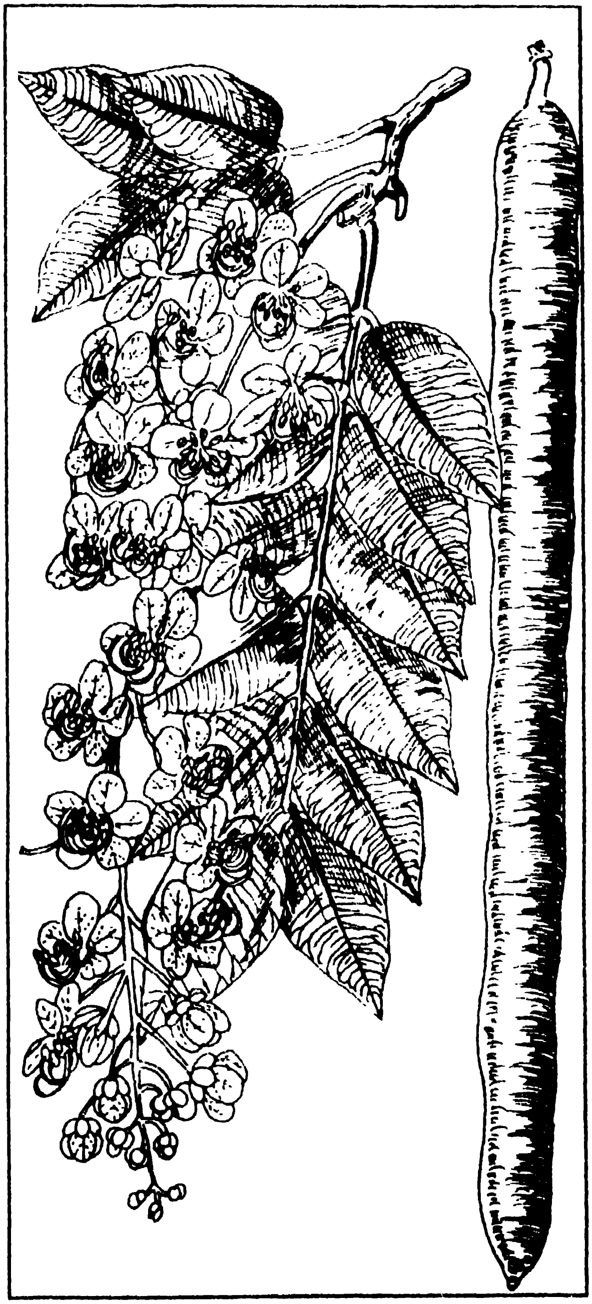


পলাশের ফুল ও কুঁড়ি



লেপিসেনথিস টেট্রাফোলিয়া গাছের পাতা, ফুল ও ফল

আকারও ছোট, রঙ ধূসর হলুদ। ফলের মধ্যে একাধিক বীজ থাকে। ফলের স্বাদ মিষ্টি। এ ফল পাখিদের প্রিয় খাদ্য। ফুল ফোটে মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে আর ফল পাকে মে মাসে। বাংলাদেশে এ-গাছ এসেছে কিছুদিন। পথ-বৃক্ষ হিসেবে এ-গাছ আদর্শ, এর বাংলা নাম নেই।



অমলতাসের পাতা, ফুল ও ফল

অমলতাসের নাম বাঁদরলাঠি হল কেন?

সুন্দর চোখ জুড়নো সোনালী ফুলের জন্যে অমলতাস সকলের মনোহরণ করেছে। তাই ভারতীয় ভাষায় এর অনেক নাম। অমলতাস, সোনালী, সোনালু, বাহাভা, কনেই, রেলু, রাখালবাঁশী, নলবাঁশী, বাঁদরলাঠি আর ইংরেজি নাম গোল্ডেন শাওয়ার, ইণ্ডিয়ান ল্যাবারনাম।

অমলতাস ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির গাছ। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে এর সব পাতা ঝরে যায়। তখন পত্রহীন গাছে সোনালী, উজ্জ্বল, হলুদ ফুল ফোটে। লম্বা নীচু হয়ে আসা থোকায় এই সব ফুলের আবির্ভাব। ফুলের মতই অমলতাসের ফল আশ্চর্য নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। গাছে যখন ফুল বা পাতা থাকে না তখনও অসংখ্য লাঠির মত অমলতাসের শুঁটি ঝুলতে দেখা যায়। ঝুলন্ত লাঠির মত এই সব শুঁটির জন্যে অমলতাসের চলতি নাম হয়েছে বাঁদরলাঠি। ফুলের মতই এই সব শুঁটি ন্যাড়া গাছের বাহার। এ-গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ক্যাসিয়া ফিসটুলা। মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ।

কোন সময়ে অমলতাসের ফুল ফোটে?

কোন গাছের ফুল ফুটলে পচা গন্ধ ছড়ায়?

ফুলের সঙ্গে সৌগন্ধের একটা সম্পর্ক আছে। তাই হাতে কোনো ফুল পেলেই আমরা তার ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের দেশে বিশাল একটি গাছ আছে যার ফুল ফুটলে তার গন্ধে ভূত পালায়। এ-গাছের নাম জংলী বাদাম। পত্রহীন অবস্থায় এ-গাছ কিছুটা শাল গাছের মত দেখতে। শাখা-প্রশাখার ডগার দিকেই এ-গাছের পাতা দেখা যায়। এক একটি পাতায় থাকে ছ' সাতটি ক'রে পল্লব। প্রায় সারা বছর গাছে ঝোলে বাদামের চৌকো-ডিম্বাকৃতি শুঁটির খোলা। প্রথমে এই সব খোলার রঙ থাকে লাল, পুরনো হলে রঙ হয় কালচে।

শীতের শেষ থেকে জংলী বাদাম গাছে পাতা ঝরা শুরু হয় আর ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে সারা গাছটাই ফুলে ফুলে ভরে যায়। ফুলের রঙ ফিকে লাল—ম্যাড়মেড়ে ধরনের। ফুল ফোটা আর ঝরা সমান তালেই চলে। ফলে গাছের



জংলী বাদামের ফুল, ফল ও পাতা

তলায় ফুলের আস্তরণ জমে ওঠে।

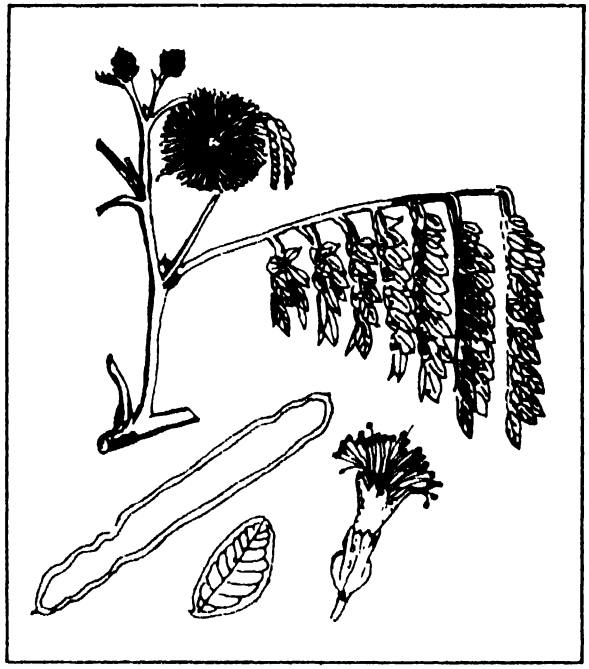
এইসব ফোটা আর ঝরা ফুলের গন্ধ কিছুটা পচা মাংসের মত দুর্গন্ধযুক্ত। ফোটা ফুল ছোট ছোট তারার মত। চার পাঁচটি শুঁটির থোকা নিয়ে এর লাল ফল হয়, যার মধ্যে থাকে বাদামের কালো কালো বীজ। এই বীজকে সাধারণ বাদামের মত ভেজে খাওয়া যায়।

জংলী বাদামের বৈজ্ঞানিক নাম স্টারকিউলিয়া ফোটিডা। ল্যাটিন ভাষায় Foetida মানে বাজে পচা গন্ধ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ফুলের গন্ধের কথা স্মরণে ক'রে এ-নাম দেওয়া।

জংলী বাদাম পশ্চিম ভারতের গাছ। তবে আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, অস্ট্রেলিয়াতেও এ-গাছ দেখা যায়।

বিলিতি শিরিষ কতটা বিলিতি?

সুবিশাল এক জাতের গাছের নাম বিলিতি শিরিষ। এ-গাছ আমাদের দেশের নয়, এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল থেকে। সেই কারণে অনেকেই বিলিতি শিরিষ না বলে একে আমেরিকান শিরিষ বলতে চান। আমেরিকান



সামানিয়া সামানকে বিলিতি শিরিষ বলে

শিরিষ খুব বেশিদিন আমাদের দেশে আসেনি কিন্তু এর বাড়ন্ত স্বভাবের জন্যে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে আর বংশবৃদ্ধি ক'রে এ-গাছ আমাদের দেশী গাছই হয়ে গেছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল সামানিয়া সামান।

সামানিয়া সামান ছাড়াও আর এক জাতের বিদেশী গাছ বিলিতি শিরিষ নাম নিয়ে বসে আছে, যার বৈজ্ঞানিক নাম গ্লিরিসিডিয়া সিপিয়াম। এ-গাছও দ্রুত বর্ধনশীল। তবে সামানিয়া সামানের মত এ-গাছ বিশাল আকৃতির

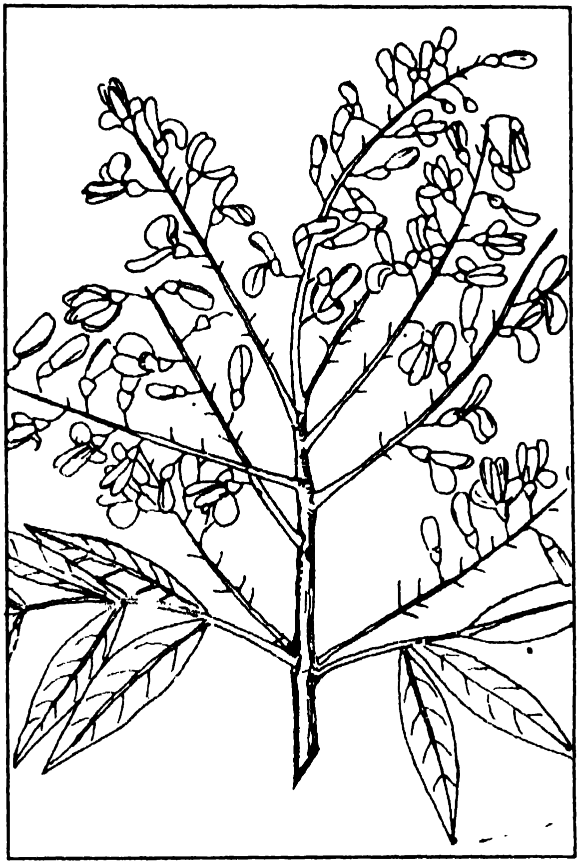
কেমন এল কোথা থেকে?

নয়—মাঝারি। এ-গাছের বাসভূমি ছিল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। আমাদের দেশে এসেছে কিছুটা ঘুরপথে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে সিংহল হয়ে 1915 সাল নাগাদ।

শীতের প্রথমে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এ-গাছে একেবারেই পাতা থাকে না, তখন সেই ন্যাড়া গাছে ফুল আসে। ফুলের রঙ হালকা গোলাপী বেগুনী।

এ-গাছ দু'টির একটিও বিলিতি নয়—এরা আমেরিকান। কিন্তু বিলিতি শিরিষ নামেই পরিচিত।

বিদেশ থেকে কোনো জিনিস এলেই আমরা তাকে বলি



গ্লিরিসিডিয়া সিপিয়ামকেও বিলিতি শিরিষ বলে

বিলিতি। প্রসংগত বলা যায় কিছুদিন আগেও টমাটোকে বলা হত বিলিতি বেগুন। বেগুন—অর্থাৎ বার্তাকু আমাদের দেশীয় সবজি। কিন্তু টমাটো এসেছে মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো থেকে।

সামানিয়া সামানের ইংরেজি নাম কেন রেন ট্রি হল?

সামানিয়া সামানের ইংরেজি নাম হল রেন ট্রি। এর কারণ কি? অনেক সময় দেখা যায় কোথাও বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই, তবু হঠাৎ মৃদু হাওয়ার কম্পনে গাছের শাখা-প্রশাখা থেকেই বৃষ্টির মত জল ঝরে পড়ছে। এই জলের রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে বৃক্ষবিজ্ঞানীরা বলেন, গাছের পাতায় বসবাসকারী অসংখ্য পতঙ্গের মূত্র অনেক সময় ধরে সঞ্চিত হতে হতে দমকা হাওয়ার কম্পনে সহসা ঝরে পড়ে। তখন মনে হয় গাছ থেকেই বুঝি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অবশ্য বৃষ্টির জলও অনেক সময় ধরে গাছের যৌগিক পত্রের ফাঁকে বন্দী হয়ে থেকে দমকা হাওয়ায় ঝরতে পারে।

জল বা জলীয় পদার্থ ধরে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে সামানিয়া সামানের পাতার। তাই এ-গাছের রেন ট্রি নাম সার্থক।

জবাফুল না হলে কালীপূজা হয় না, তবু এর ইংরেজি নাম চায়না রোজ হল কেন?

জবা আমাদের খুবই পরিচিত ফুল। এ-ফুল ছাড়া শক্তিদায়িনী রুদ্রাণী মায়ের পুজোর কথা ভাবাই যায় না।

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে জবা আমাদের দেশীয় ফুল নয়, এসেছে চীন দেশ থেকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম হিবিসকাস রোজা---যার অর্থ গোলাপ। তবে এ-গোলাপ চীনের। তাই ইংরেজিতে জবা হল চায়না রোজ। চায়না রোজ ছাড়াও জবার আরো একটা ইংরেজি নাম আছে, সেটা

জবার আর এক নাম 'সু-ফ্লাওয়ার' কেন?

হল 'সু-ফ্লাওয়ার'। জবার পাপড়ি পেষণ করলে যে-রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায় তা দিয়ে প্রাচীনকালের মানুষ জুতোয় রঙ করতো। তাই হয়তো এর 'সু-ফ্লাওয়ার' নাম হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে চীনের এই গোলাপটি আমাদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজেই আছে।

গোলাপ ফুলের মতই জবাও বিভিন্ন রকম হয়। পাঁচটি লাল পাপড়ি বিশিষ্ট জবা, ঝুমকো জবা, লঙ্কা জবা, তা ছাড়া পঞ্চমুখী জবাও দেখা যায়। রঙের বাহারেও এরা গোলাপের চেয়ে কম যায় না। গোলাপী, হলদে, ম্যাজেণ্টা, সাদা, এমন কি নীল রঙের জবাও লক্ষ্য করা যায়।

কাঠেই জারুলের খ্যাতি না ফুলে?

কথায় বলে প্রথমে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী। আর রূপগুণ দুই থাকলে তো কথাই নেই, সোনায় সোহাগা। জারুলের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে। জারুল কাঠ প্রথম শ্রেণীর না হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর তো বটেই। বন্দরের খুঁটি-খোটা, বজরা-নৌকা তৈরির কাজে, এ-কাঠ বিশেষ উপযোগী। আর ফুলের সৌন্দর্যে তো চারিদিক আলোয় আলো।



জারুলের পাতা, ফুল ও ফল

এপ্রিল-মে মাসে কচি পাতার সঙ্গে সঙ্গে আসে জারুল ফুলের মঞ্জরী। মঞ্জরীর গোড়ার ফুল আগে ফোটে, শীর্ষের ফুল ফোটে শেষে। জারুল ফুলের রং বেগুনী, ফিকে লাল,

জারুল ফুল দেখতে কী রকম?

সাদাটে। এপ্রিল থেকে জুন মাস অবধি জারুলের ফুল ফোটে।

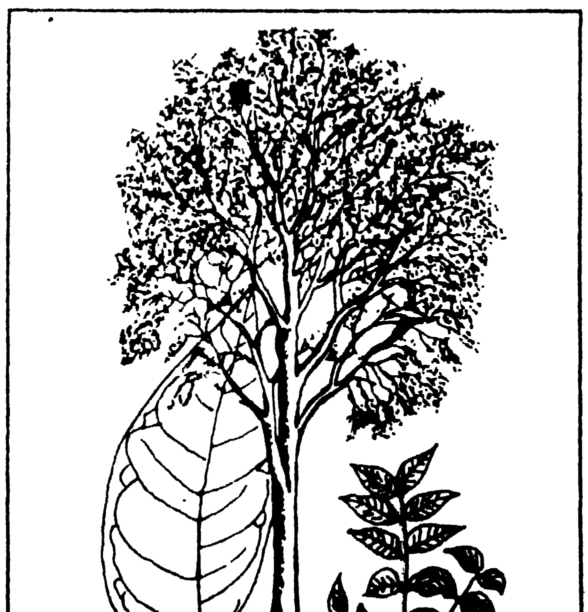
ফুলের মত জারুলের ফলও থাকে থোকায় থোকায়। এক একটি থোকায় অনেকগুলি গোলাকার ফল নজরে আসে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই ফল পেকে শুকিয়ে যায়। শুকনো ফল মাটিতে পড়ে না, গাছেই ঝোলে এবং তাতেও গাছের সৌন্দর্য বাড়ে।

জারুলের বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাগারস্ট্রোয়েমিয়া স্পিসিওসা, ইংরেজি নাম কুইন ফ্লাওয়ার, মাতৃভূমি ভারত, চীন, মালয়।

আর এক শ্রেণীর জারুল আছে যার বৈজ্ঞানিক নাম হল ল্যাগারস্ট্রোয়েমিয়া থরেলি। এটা একটু ছোট জাতের গাছ। এর ফুল ফোটে বর্ষাকালে যখন বড় জারুলের ফুল থাকে না। এর ফুল হালকা বেগুনী ও সাদা। পাতাও বড় জারুলের তুলনায় ছোট।

মেহগিনী গাছ এল কোথা থেকে?

মেহগিনীর খ্যাতি তার কাঠের জন্যে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বনেদী ঘরের সব আসবাব-পত্রই প্রায় মেহগিনী কাঠের তৈরি। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, এই মেহগিনী আমাদের দেশের গাছ নয়। এসেছে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। কিন্তু এর আদি বাসস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নয়। জামায়িকা এবং মধ্য আমেরিকায় এর আদি বাসভূমি ছিল।



মেহগিনী গাছ ও পাতা

এর বৈজ্ঞানিক নাম সুইটিনা মেহগিনী। বাংলা নাম মেহগিনী আর ইংরেজিতে বলে স্প্যানিশ মেহগিনী। মেহগিনী খুব বিশাল আকারের গাছ। লম্বায় চওড়ায় এত বড় গাছ সহসা চোখেই পড়ে না।

কেবল আসবাব-পত্র নয়, এক সময়ে মেহগিনী কাঠ জাহাজ তৈরির উপযুক্ত কাঠ বলে বিবেচিত হত। একশো বছর আগে মেহগিনী কাঠের তৈরি ইংরেজ অধিকৃত একটি স্পেনীয় জাহাজকে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, শতবর্ষ পরেও তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। মেহগিনী কাঠ এমনই টেঁকসই।

পরশপিপল কি পিপুল গাছ?

পরশপিপলের সঙ্গে গুল্ম জাতীয় পিপুল গাছের কোনো



পরশপিপলের পাতা ও ফুল

মিল বা সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে পপলার এবং পিপুল অর্থাৎ অশ্বত্থ গাছের।

পরশপিপল মাঝারি আকারের গাছ, গুঁড়ির রঙ ধূসর। ছাতার মত গোলাকার এর ঘন শাখা-প্রশাখা। ইংরেজিতে তাই এ-গাছের নাম 'আমব্রেলা ট্রি'। পাতার আকৃতি কিছুটা হৃৎপিণ্ডের মত। অশ্বত্থ পাতার সঙ্গে মিল আছে, যদিও ডগার দিকটা অতটা ছুঁচলো নয়।

ফেব্রুয়ারির শেষে বেশির ভাগ পাতা হলদে হয়ে যায় এবং ক্রমে ক্রমে ঝরে পড়তে থাকে। এর ফুল কিছুটা ফ্যানেলের মত, রঙ উজ্জ্বল হলুদ—ভিতরটা লাল। ফোটার ক'দিন পরেই ফুলগুলো ইঁট-লাল বা গোলাপী হয়ে যায়। ফল গোলাকৃতি, প্রথম অবস্থায় রঙ সবুজ, পরে বাদামী হয়ে কালোতে রূপান্তরিত হয়। সারা বছর এ-গাছে ফুল থাকে, বিশেষ ক'রে গ্রীষ্ম, বর্ষাতেই বেশি ফুল দেখা যায়।

এর বৈজ্ঞানিক নাম থেসপাসিয়া পপুলনিয়া। থেসপাসিয়া গ্রিক শব্দ, মানে 'স্বর্গীয়', আর পপুলনিয়া মানে যা পপলারের মত দেখতে। ভারতের সমুদ্র উপকূল, ব্রহ্মদেশ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব আফ্রিকায় পরশপিপল গাছ দেখা যায়।

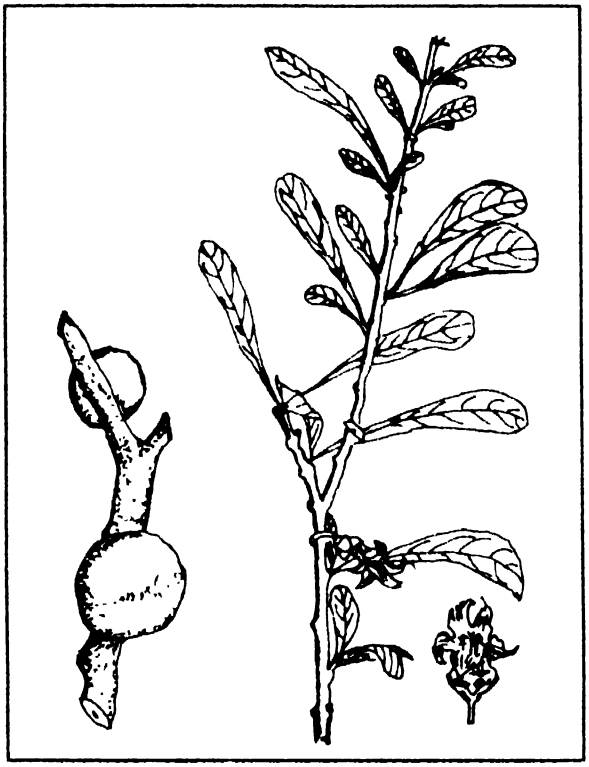
বিলিতি বেল কি সত্যি বেল গাছ?

বেল বলতেই আমাদের অতি পরিচিত বেলের কথা মনে পড়ে—যার সংস্কৃত নাম বিল্ব। কিন্তু বিলিতি বেলের সঙ্গে আমাদের সেই পরিচিত বেলের কোনো সম্পর্ক নেই, পাতাও ত্রিপত্রী নয়। বিলিতি বেলের পাতা লম্বাটে ডিম্বাকৃতি।

বিলিতি বেলের ফুল গাছের কোথায় ফোটে?

বিলিতি বেল ছোট ও মাঝারি আকারের গাছ। গাছের গুঁড়িতে ও মোটা ডালে ফুল ফোটে। ফুলগুলো আকারে ফ্যানেলের মত। রঙ ফিকে হলুদ, সাদা, সবুজ মেশানো। ফল দেখতে অনেকটা আমাদের পরিচিত বেলের মতই।

এর বৈজ্ঞানিক নাম ক্রিসেনটিয়া ক্রুজেট। একদিন মাতৃভূমি ছিল কিউবা। আমাদের দেশে এ-গাছের ফল কেউ খায় না কিংবা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করে না। কিন্তু



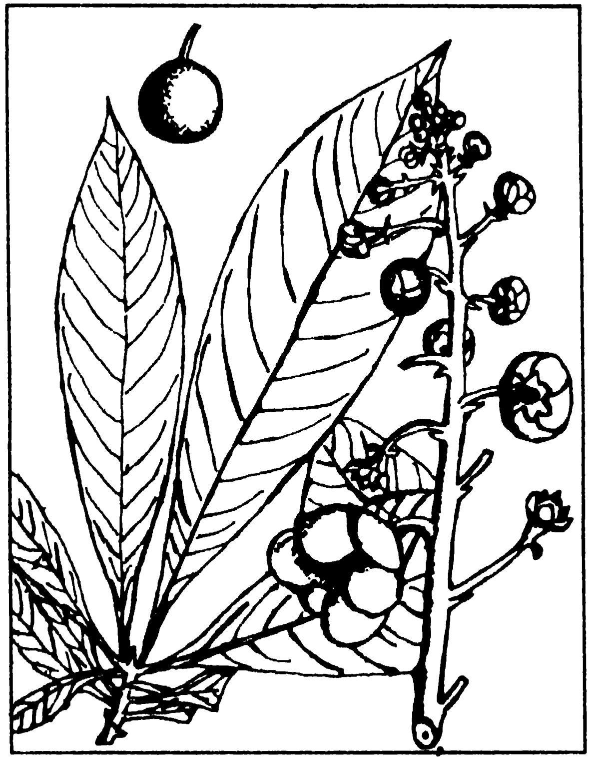
বিলিতি বেলের শাখায় ফুল, ফল ও পাতা

কিউবার মানুষ এ-গাছের ফল খায়, ফলের শক্ত খোলাকে পালিশ ক'রে গয়না ও ঘরের তৈজস পত্ররূপে ব্যবহার করে। নানা রোগ-চিকিৎসার কাজেও এই ফলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ ক'রে মাথা ধরা আর সাপ-কাটির ওষুধ তৈরিতে বিলিতি বেলের অবদান আছে।

শীতকালে এর পাতা ঝরে যায়। নতুন পাতা গজায় ফেব্রুয়ারি-মার্চে। প্রায় ন্যাড়া গাছেই ফুল ফোটা শুরু হয়। সারা গ্রীষ্মকাল ধরেই ফুল ফুটতে থাকে।

ভারতীয় গাছ না হলেও ফুলের নাম শিবলিঙ্গ হল কেন?

বড় অদ্ভুত আকৃতির এক ধরনের ফুলের নাম দেওয়া হয়েছে শিবলিঙ্গ। এটা হিন্দী নাম। বাংলায় একে বলে নাগলিঙ্গ। ইংরেজি নাম Cannon ball tree। ইংরেজি নাম যেমন হয়েছে ফলের বিশাল আকৃতির কথা ভেবে, তেমনি হয়েছে বাংলা বা হিন্দী নামকরণ ফুলের আকৃতির কথা মনে রেখে। ফুলের মতই বিচিত্র ফুল ফোটার কায়দা। গাছের গুঁড়ি বা মোটা ডালের গা থেকে প্রথমে একটা ফেকড়ি বেরোয়। পরে তার গা থেকে লম্বা বোঁটা বেরিয়ে আসে, সেই বোঁটায় থাকে ফুল। একসঙ্গে এত ফুল ফোটে যে গাছের গুঁড়ি ফুলে ফুলে ভরে যায়। ফুলের ছ'টি পাপড়িই গোলাকার। বাইরের রঙ লাল, হলদে, গোলাপী মেশানো। ভিতরটা সম্পূর্ণ গোলাপী। পুংকেশরের গড়ন কিছুটা সাপের ফণার মত। সর্পাকৃতি পুংকেশরের আড়ালে থাকে



শিবলিঙ্গ গাছের পাতা ও ফুল

ডিম্বকোষ। এ দু'টো দেখে শিবলিঙ্গ ও মাথার উপর সাপের ফণার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এই ফুল ফণাযুক্ত শিবলিঙ্গের মত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে শিবলিঙ্গ বা নাগলিঙ্গ। ফুলের গন্ধ হালকা মিষ্টি।

নাগলিঙ্গ গ্রীষ্মকালের ফুল। বর্ষায় পাকে এর কামান গোলার মত বিশাল ফল। সারা বছর মাঝে মাঝেই গাছের

[illegible]

পাতা ঝরে। এর বৈজ্ঞানিক নাম কুরুপিতা গুইনেনসিস। এক সময়ে এর মাতৃভূমি ছিল দক্ষিণ আমেরিকা। ও-দেশের আদিবাসীরা ফলের শক্ত খোলাকে বাসন-কোষন রূপে

ব্যবহার করে। কাঠ থেকেও আসবাব-পত্র তৈরি হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জলবায়ুর গুণে নাগলিঙ্গের কাঠ আসবাবপত্র তৈরির অনুপযুক্ত।

মহুয়া বনের বাইরেও কি মহুয়া গাছ দেখা যায়?

মহুয়া ফুল ও মহুয়া বন তার গন্ধের মাদকতা আর অরণ্যের রহস্য নিয়ে আমাদের গানে, সাহিত্যে অনেকটা স্থান দখল ক'রে আছে।



মহুয়ার পাতা, ফুল ও ফল

নানা কারণে আরণ্যক মানুষকে মহুয়া আকর্ষণ করেছে। আদিবাসীদের কাছে এ-বৃক্ষ হল 'কল্পবৃক্ষ'। ফুল-ফল থেকে আহার, পানীয় মেলে, জ্বালানি হিসেবে কাঠও আদৃত। কিন্তু মহুয়া গাছের সন্ধানে মধ্যভারত, ছোট নাগপুরের গভীর অরণ্যে যাবার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের গ্রাম বা শহরাঞ্চলেও মহুয়া গাছ দেখা যায়। তবে সেটা ছোট জাতের

কোন ফুল খেয়ে ভালুক মাতাল হয়?

মহুয়া গাছ। মহুয়া আছে দু'রকম। বড় মহুয়ার বৈজ্ঞানিক নাম মাধুকা ল্যাটিফোলিয়া আর ছোট মহুয়ার নাম মাধুকা লঙ্গিফোলিয়া। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছোট মহুয়ার গাছ অরণ্যের বাইরে গ্রামে-গঞ্জেও দেখতে পাওয়া যায়।

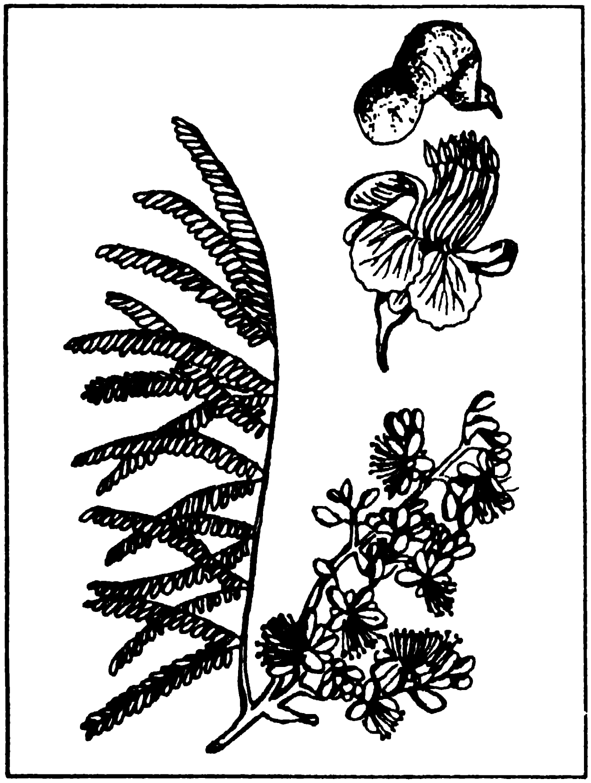
মহুয়া বেশ বড়সড় ভারতীয় গাছ। ছাই ছাই রঙের গুঁড়ি। অসংখ্য পাতায় যেন এক সবুজ ছাতা। পাতা বেশ বড়। কাঁঠাল পাতাকে কল্পনায় টেনে বোঁটার দিকটা একটু লম্বা ক'রে দিলে যে-ধরনের আকৃতি হয় মহুয়া পাতা অনেকটা সেই রকম।

মহুয়া ফুলের আট ন'টি পাপড়ি, জোড়া লেগে যেন এক একটি ছোট সাদা বল। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে পাতা থাকে না, তাই ফুলের শোভা অপূর্ব। ন্যাড়ান্যাড়া ডালে ফুল ফোটে। ফুলের গন্ধ মিষ্টি বাসি বাসি, কিছুটা গোবিন্দভোগ চালের মত। ফল ডিম্বাকৃতি সবজে, বকুল ফলের মত। এর স্থানীয় নাম কড়চা। কাঁচা অবস্থায় সবজি হিসেবে একে খাওয়া হয়। আর পাকলে এর থেকে হয় তেল।

ফুটন্ত ফুলের মেয়াদ মাত্র একটি রাত। রাতে ফুটেই তারা দিনের বেলায় ঝরে পড়ে, যাকে বলে এক রাতের রাণী। পনেরো কুড়ি দিনের মধ্যেই মহুয়ার ফুল খেলার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। মহুয়ার ফুল থেকে এক প্রকার মাদক দ্রব্য তৈরি হয়। তাই বেশি পরিমাণে মহুয়ার ফুল খেলেও নেশা হয়। দেখা যায় বনের ভালুক মহুয়ার ফুল খেয়ে অনেক সময় মাতাল হয়ে পড়েছে। ভালুক যে-মহুয়ার ফুল খায় সে অবশ্যই বড় মহুয়া, যার নাম মাধুকা ল্যাটিফোলিয়া।

রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া কি স্বদেশী গাছ?

আমরা রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া বলতে যে-গাছ দু'টিকে



আদি কৃষ্ণচূড়ার পাতা, ফুল ও ফল

বুঝি তারা কেউই স্বদেশ অর্থাৎ ভারতের গাছ নয়। রাধাচূড়ার মাতৃভূমি ছিল অস্ট্রেলিয়া আর মালয়। মাত্র দেড়শো বছর আগে রাধাচূড়া আমাদের দেশে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মলুকোস থেকে এই গাছের বীজ সংগ্রহ ক'রে কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাগানো হয়। 1814 সালের আগে এর বীজ ভারতের মাটিতে পড়েনি। কিন্তু তারপর থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রাধাচূড়া সারা ভারতের জনপ্রিয় গাছ হয়ে উঠেছে।

রাধাচূড়ার বৈজ্ঞানিক নাম পেল্টোফোরাম ইনারমা, ইংরেজি নাম 'দি রাস্‌টি শিল্ড বিয়ারর'।

রাধাচূড়ার মতই কৃষ্ণচূড়াও বিদেশী গাছ। এর জন্মস্থান মাদাগাসকার। ভারতের মাটিতে শেকড় গেড়েছে 1792 সালের কোনো এক সময়ে। মাদাগাসকারের গাছ হলেও এর বীজ আসে মরিসাস থেকে। বৈজ্ঞানিক নাম ডেলোনিক্স রেজিয়া, বাংলায় বলে কৃষ্ণচূড়া আর ইংরেজিতে নাম হয়েছে গুলমোহর।

আমাদের দেশে কৃষ্ণচূড়া নামে দু'রকম গাছ আছে। একটি হল ডেলোনিক্স রেজিয়া, অন্যটি সিজালপেনিয়া ক্যারিয়ারিয়া। দ্বিতীয় কৃষ্ণচূড়া ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগাল থেকে এসেছে। গাছ আকারে ছোট আর গায়ে কাঁটা আছে।

ফুলের রঙ হালকা গোলাপী-হলুদ অর্থাৎ আমাদের পরিচিত কৃষ্ণচূড়ার মত অতটা লাল নয়। গড়ন কৃষ্ণের মুকুট চূড়ার মত। ফলে ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই ফুল কৃষ্ণচূড়া নামে পরিচিত হয়ে যায়। অবশ্য কোথাও কোথাও এই ফুল আবার রাধাচূড়া নামেও পরিচিত।

গুলমোহর অর্থাৎ আমাদের পরিচিত কৃষ্ণচূড়া বেশ বড় গাছ। মে-জুন মাসে যখন ফুল ফোটে তখন সেই লাল আগুনের বন্যার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। ফুলের আকৃতির মধ্যে একটা ময়ূর পুচ্ছের ভাব আছে, তাই হিন্দী নাম গুলমোর অর্থাৎ ময়ূর ফুল। পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট লাল হলুদ ফুলের পঞ্চম পাপড়িটি দেখতে অবিকল কৃষ্ণের চূড়ায় গাঁথা ময়ূরপুচ্ছের মত।

রোজউড কাকে বলে?

রোজউড এক জাতের শক্ত মজবুত কাঠ। কাঠের রঙ কালচে গোলাপী। রঙের জন্যেই এর ইংরেজি নাম হয়েছে



রোজউডের পাতা, ফুল ও ফল

'ইণ্ডিয়ান রোজউড', বাংলায় আঞ্চলিক নাম সৎসায়ক।

ঘরের আসবাব-পত্র তৈরির কাজে রোজউড ব্যবহার করা হয়।

এ-গাছ বেশ বড়। এপ্রিল এবং অগাস্ট মাসে সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল হয়। গ্রীষ্মকালে গাছে নতুন পাতা গজায়। রোজউডের পাতার সঙ্গে শিশু পাতার সাদৃশ্য আছে, তবে এর পাতা আকারে আরো কিছু বড় এবং ঘন সবুজ।

রোজউড কি বিদেশী গাছ?

রোজউড দক্ষিণ ভারতের গাছ। কর্ণাটক অঞ্চলেই এ-গাছ বেশি জন্মায়। পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়ায় সামান্য হলেও এ-গাছ দেখা যায়। সেখানে রোজউডের আঞ্চলিক নাম সৎসায়ক। নেপালেও রোজউড পাওয়া যায়, সেখানে এ-গাছের নাম সতিশাল।

রোজউডের বৈজ্ঞানিক নাম হল ডালবার্জিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

লোহাকাঠ কাকে বলে?

এক জাতীয় শক্ত ভারী মজবুত লাল রঙের কাঠকে লোহাকাঠ বলে, ইংরেজি নাম আয়রন উড অফ বার্মা। ইংরেজি থেকেই বাংলা নামের উৎপত্তি।

এ-গাছ বেশ বড় আকারের হয়। এ-গাছের নিকট-আত্মীয় হল শিশু, পিয়াশাল, রোজউড, রক্তচন্দন প্রভৃতি। গ্রীষ্মকালে গাছের পাতা ঝরে যায়। ফুলের রঙ হাল্কা হলদে আর ফল দেখতে প্রায় সিমের মত।

ভারত, বর্মা হল এ-গাছের মাতৃভূমি। আমাদের দেশে ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে এ-গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শাল কাঠের বিকল্প হিসেবে লোহাকাঠ ব্যবহার করা হয়।

বনের বাতাসে কি চন্দনের গন্ধ ছাড়ে?

সুগন্ধের জন্যে চন্দন কাঠ বিখ্যাত। কিন্তু চন্দন বনের বাতাসে সেই সুগন্ধ ছড়ায় না। কারণ চন্দনের গন্ধ থাকে তার সারবান কাঠের মধ্যে। এই কাঠ কাটলে তবেই পাওয়া যায় চন্দনের গন্ধ, তার আগে নয়। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স হলে তবেই চন্দন কাঠ সারবান গন্ধযুক্ত হয়।

রক্তচন্দনের কি সুগন্ধ আছে?

চন্দন দু' রকমের, শ্বেতচন্দন আর রক্তচন্দন। শ্বেতচন্দনের গন্ধ আছে, রক্তচন্দনের গন্ধ নেই। চন্দন কাঠ বিক্রির আগে ছাল ছাড়িয়ে মাস দুই মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। জল দিয়ে এই কাঠ ঘষলে যে-সুগন্ধি অনুলেপন বেরোয় তাই চন্দন। শুভ কাজে, অঙ্গরাগের উপকরণে এর ব্যবহার আছে। শ্বেতচন্দন থেকে চন্দন তেল তৈরি হয়। রক্তচন্দন থেকে রঞ্জক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই দু' প্রকার চন্দনের ব্যবহার আছে। আমাদের দেশে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালায় চন্দন বন আছে।

পথ-বৃক্ষের কি কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত?

পথের ধারে গাছ লাগানো আমাদের দেশে একটা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই দেখি প্রাচীন কালের রাজারা জনহিতের জন্যে পথের ধারে যেমন কূপ খনন করতেন তেমনই রোপণ করতেন বৃক্ষ।

যে-কোনো গাছই কিন্তু পথের গাছ হতে পারে না। তার জন্যে নানা গুণ থাকা দরকার। প্রথমেই চাই অসংখ্য ঘন সবুজ পাতা। পাতা ঝরে গেলেও সে-গাছ বেশিদিন ন্যাড়া থাকবে না। অর্থাৎ এই গাছ সর্বদা পথিকের মাথায় সবুজ পাতার ছাতা ধরে ঘন নিবিড় ছায়া দেবে। এ-সব গাছ হবে দীর্ঘজীবী, কিন্তু বাড়বে খুব দ্রুত। শাখা-প্রশাখা থাকবে অনেক, কিন্তু সহসা ঝড়ে মাথার উপরে তারা ভেঙে পড়বে না। ঝড়ে-জলে মাটি আঁকড়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও থাকা চাই।

এর পরে চাই ফুল—নানা আকারের নানা বর্ণের। এ-সব গুণ থাকলে তবেই আদর্শ পথের গাছ হওয়া যায়। আদর্শ পথবৃক্ষ হিসেবে দেশী বিদেশী অনেক গাছেরই নাম করা যায়। এদের মধ্যে অন্যতম—বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, দেবদারু, কদম, সোনাঝুরি, জারুল, অমলতাস, মেহগিনী, বিলাতি শিরিষ, পুত্রঞ্জীব, সুলতান চাঁপা, পরশপিপল ইত্যাদি।

প্রাণিবিজ্ঞান



সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। গোড়ায় এ-সম্পর্ক মোটেই সুখকর ছিল না। কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু ক'রে নানা ধরনের শ্বাপদের ভয়ে মানুষ তখন ছিল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। আত্মরক্ষার সেই সচেতনতাই মানুষের মনে প্রাণিকুল সম্বন্ধে কৌতূহল নিয়ে আসে। একদিকে সে যেমন খাদ্য, অন্যদিকে তেমনই সে খাদকও বটে। গাছের ফল-মূল যেমন তার পেট ভরিয়েছে, বনের পশু-পক্ষীও তেমনই সে শিকার করেছে। পোষ মেনেছে জীবজন্তু। এই সব প্রাণীদের নিয়ে কৌতূহলকর বিষয়ের শেষ নেই। এদের সম্পর্কে চর্চা করতে করতেই গড়ে উঠলো বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা প্রাণিবিজ্ঞান। প্রাণিবিজ্ঞানের ইংরেজি Zoology। এটি তৈরি হয়েছে দু'টি গ্রিক শব্দ Zoon আর Logos মিলে। Zoon কথার অর্থ প্রাণী আর Logos বিজ্ঞান। এই দু'টি শব্দ মিলেই ইংরেজিতে Zoology।

গরুর বাঁট থেকে সাপ দুধ খায় কি?

সাপের আচার-আচরণ সম্পর্কে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে আছে। এর একটা হল, সাপ গরুর বাঁট থেকে দুধ খায়।

কিন্তু কথাটা কি ঠিক?

গোয়ালে সকালবেলায় প্রথম যিনি দুধ দোয়াতে গেছেন, গরুর বাঁট অনেক সময়ে শুকনো দেখে তাঁর মনে হয়েছে যে, নিশ্চয়ই সাপে দুধ খেয়ে গিয়েছে। যিনি দুধ দোয়াতে গিয়েছিলেন প্রমাণ হিসেবে তিনি গরুর পিছনের পায়ে সাপের আঁশের দাগ এবং বাঁটের কাছাকাছি ফুস্কুরির মত দাগকে সাপের দাঁত বলে মনে করেছেন।

সাপ আদৌ গরুর বাঁট থেকে দুধ খেতে পারে কিনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো ঘটনাটা বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যাবে।

প্রথম ঘটনা, গরুর পিছনের পায়ে সাপের জড়ানোর চিহ্ন। কিন্তু গরুর পিছনের পায়ে সাপের আঁশের দাগ ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা ভেবে দেখা উচিত। সাপ যখন বালি কিংবা ভেজা মাটির উপর দিয়ে চলে যায়, তখন তার আঁশের ছাপ সেখানে পড়ে। অথচ সাপুড়ের হাতের সঙ্গে

সাপ কি দুধ চুষে খেতে পারে?

যখন সাপ জড়িয়ে থাকে তখন সাপুড়ের হাতের চামড়ায় আঁশের দাগ পড়ে না। তাহলে লোমওলা গরুর পায়ের চামড়াতেই বা কি ক'রে সাপের গায়ের দাগ পড়বে? এ-ব্যাপারটা নিছক কল্পনা মাত্র। তা ছাড়া সাপ গরুর পিছনের পা দু'টো জড়িয়ে ধরলেও এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে, সাপ বাঁটের দুধ খেয়েছে। তবে বাঁটের কাছাকাছি ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ওগুলো কি সাপের দাঁতের দাগ?

সাপ বাঁট কামড়ে না ধরলে তো আর বাঁটে দাঁতের দাগ হবার কথা নয়। কিন্তু দুধ যখন চুষেই খেতে হবে, তখন সাপ খামোখা বাঁটে কামড়াতে যাবেই বা কেন?

সাপ তার খাদ্য ব্যাঙ খেতে গেলেও দাঁত দিয়ে তাকে কামড়ে ধরে না। তা ছাড়া সাপের দাঁত এমনভাবে তৈরি যাতে শুধুমাত্র ছোবল মারলেই দাঁতের দাগ হবে। মুখ ঠেকালে কিংবা জিভ দিয়ে খেলে দাঁতের দাগ বসবেই না। আর ছোবল মারলে তো গরু এমনিতেই মারা যাবে। তাই গরুর বাঁটে সাপের দাঁতের দাগ বলে যা বলা হয় তা আদৌ সাপের দাঁতের দাগ কিনা সন্দেহ।

তাহলে ওই দাগ কেমন করে হয়? দুধ দুইবার পরে অনেকে বাঁট ভাল ক'রে জল দিয়ে ধুয়ে দেয়, ধোবার পরে তেলও লাগিয়ে থাকে। গোয়ালের নানা ধরনের নোংরা থেকে বাঁটের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তার জন্যেই এই সব ব্যবস্থা। গাঁয়েতে অবশ্য অনেকেই এ-সব নিয়ম মানে না। গোয়ালঘরও পরিষ্কার রাখে না। তাই বাঁটের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে অনেক জাতের ব্যাকটেরিয়া (যেমন, ব্যাসিলাস, মাইকোব্যাকটিরিয়াম) এবং ছত্রাক (যেমন কেনডিডা, এপিডার্মোফাইটেন) বাসা বাঁধে। এই সব ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক থেকে বাঁটের কাছের চামড়ায় বিভিন্ন চর্মরোগ হয়। এই রোগে চামড়ায় ছোট ছোট ফুস্কুরি কিংবা ছিদ্র দেখা দেয়। এগুলোকেই লোকে সাপের দাঁতের দাগ বলে ভুল করে।

সাপ তাহলে গরুর পা জড়িয়ে ধরে কেন? এ-ব্যাপারটাকেও বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করেছেন। সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ ইত্যাদি খাবারের লোভে রাত্তিরে নোংরা গোয়ালে আশ্রয় নেয়। অনেক সময়ে গোয়ালে রাখা খড়কুটোতে গা গরম রাখতেও সাপ রাত্তিরে গোয়ালে ঢুকে পড়ে। মনে করা হয় যে, ইঁদুর ধরবার সময়ে নিজেদের গরুর পায়ের খুরের আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই সাপ আগেভাগে গরুর পিছনের পা দু'টোকে জড়িয়ে ধরে। অনেকের ধারণা, গরুর গা থেকে তাপ নেবার জন্যেই সাপ গরুর পা জড়িয়ে থাকে। এই ধারণা যে কতদূর সত্যি, তা বলা মুশকিল। কারণ তাপ নেবার জন্যে সাপ সামনের নিরাপদ পা কিংবা গরুর গা বাদ দিয়ে কেনই বা পিছনের পা দু'টোকে জড়িয়ে ধরবে। তা ছাড়া খড়েতেই যখন পুরো গা বেশি গরম থাকছে তখন গরুর পিছনের পা দু'টোকেই বা জড়াতে যাবে কেন—যেখানে পিছনের পায়ের খুর থেকে বিপদের আশঙ্কা বেশি! তাই মনে করা হয় যে, বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই সাপ গরুর পিছনের পা দু'টোকে প্রথমেই জড়িয়ে ধরে। অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরবার পরে গরুর পা যখন অবশ হয়ে পড়ে, তখনই সাপ পা ছেড়ে শিকারের সন্ধানে যায়।

কিন্তু সাপ যদি বাঁট থেকে দুধই না খাবে তাহলে বাঁট

শুকিয়ে যায় কেন? দুধ চুষে বা চেটে খাবার কোনো ব্যবস্থা সাপের শরীরে নেই। সাপের জিভ কাঠির মত বেলনাকার এবং জিভের সামনের দিকটাও চেরা। সুতরাং চেটে খাবার পক্ষে সাপের জিভ তৈরি নয়। তা ছাড়া কোনো তরল চুষে খেতে হলে মুখের এবং বুকের ভিতরকার চাপ হঠাৎই অনেকটা কমিয়ে ফেলতে হয়। এই হঠাৎ চাপ কমে যাবার ফলেই বাইরের তরল বায়ুমণ্ডলের চাপে গলার ভিতরে চলে আসে। মানুষের বেলায় বুক ও পেটের মাঝখানে মধ্যচ্ছদা নামে যে-পর্দা থাকে, সেই মধ্যচ্ছদা হঠাৎই নীচের দিকে নেমে গিয়ে বুকের ভিতরকার চাপটাকে অনেকটা কমিয়ে ফেলে। এর ফলেই মানুষ জিভ দিয়ে চুষে কোনো কিছু খেতে পারে। কিন্তু সাপের কোনো মধ্যচ্ছদা না থাকায়

আমরা চুষে খাই কী ক'রে?

সাপের পক্ষে বুকের চাপ হঠাৎ কমিয়ে ফেলা সম্ভব নয়, তাই সে কোনো জিনিষ চুষে খেতে পারে না। এই কারণেই সাপের পক্ষে গরুর বাঁট থেকে চুষে দুধ খাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাহলে বাঁট শুকিয়ে যায় কেন?

এই ব্যাপারটাকে প্রতিবর্ত বলে। প্রতিবর্ত হল জীবের এক ধরনের ব্যবহার যেটা অনেকটা তার নিজের অজান্তেই ঘটে যায়। যেমন, আমাদের চোখে হঠাৎ আলো পড়লে চোখের তারারন্ধ্র আপনা থেকেই ছোট হয়ে পড়ে। ভয় পেলে যেমন আমরা ঘেমে উঠি, ঠিক তেমনই সাপের ভয় থেকেই গরুর বাঁটের দুধও বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ-বন্ধ হওয়াটা সাময়িক।

গিরগিটি গায়ের রঙ পালটায় কেন?

বনে জঙ্গলে, ঝোপে ঝাড়ে, গাছের ডালে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা গিরগিটি হামেশাই আমাদের চোখে পড়ছে। গিরগিটির গায়ের রঙ নানা ধরনের হয়ে থাকে। হালকা হলুদ, মেটে বা ছাই রঙের, কিংবা গাছপালার রঙের সঙ্গে মিশে থাকা হরেক রঙের গিরগিটি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। বেশ খটখটে রোদ্দুরে পাঁচিলের উপরে মাথা তুলে শুয়ে থাকা কোনো গিরগিটিকে ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে, যেন মাঝে মাঝেই গিরগিটি নিজের গায়ের রঙ পালটে নিচ্ছে। গিরগিটির গায়ের রঙ সময়ে সময়ে এত কম পালটায় যে, ভাল ক'রে নজর না রাখলে তা বোঝাই যাবে না। আবার কখনো কোনো গিরগিটির গায়ের রঙ এত ঘন ঘন পালটে যায় যে, মনে হয়, কোনো ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিক দেখছি।

গিরগিটি মাঝে মাঝেই বা গায়ের রঙ পালটায় কেন? একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে দেখা গেছে যে, বনে জঙ্গলে যে-সব গিরগিটি থাকে, তাদের গায়ের রঙ অনেকটা পরিবেশের মতই হয়ে যায়। অর্থাৎ যে-জঙ্গলে গিরগিটি থাকবে সেই জঙ্গলের গাছের পাতা কিংবা ডালের রঙের মতই গিরগিটির গায়ের রঙ তৈরি হয়। শত্রু যাতে পরিবেশ থেকে আলাদা ক'রে তাকে চিনতে না পারে সেইজন্যেই গায়ের রঙের এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। এ-ব্যাপারে একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য করলে

রান্নাঘরের টিকটিকির রঙ শোবার ঘরের টিকটিকির চেয়ে ময়লা কেন?

দেখা যাবে, বাড়ির শোবার ঘরের টিকটিকির চেয়ে রান্নাঘরের টিকটিকির গায়ের রঙ অনেক বেশি ময়লা হয়ে থাকে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে গায়ের রঙ পালটানোর ব্যাপারটা গিরগিটি টিকটিকি ছাড়াও আরো অনেক জীবের বেলায় দেখা যায়। কিন্তু রোদ্দুরে শোওয়া অবস্থায় গিরগিটির গায়ের রঙ ক্ষণে ক্ষণে পালটানোর ব্যাপারটা যে কেন ঘটে, তা ভাববার ব্যাপার।

গিরগিটির স্বাভাবিক গায়ের রঙ চামড়ার কোষে মেলানিন নামের এক ধরনের রঙ্গক থাকে বলে হয়। চামড়ার যে কোষগুলিতে মেলানিন থাকে তাদের মেলানোফোর বলে। মেলানোফোর কোষগুলো চামড়ায় ছড়ানো থাকে। চামড়ায় যদি মেলানোফোর কোষের সংখ্যা খুব বেশি থাকে এবং কোষে মেলানিন কণার সংখ্যাও বেশি হয়, তা হলে চামড়ার রঙ কালো হবে। আর চামড়ায় মেলানোফোর এবং মেলানিন যদি কম থাকে তাহলে চামড়ার রঙ হালকা হবে এবং গায়ের রঙ হালকা দেখাবে।

গিরগিটির চামড়ার মেলানোফোর কোষে মেলানিন কণাগুলো যখন কোষের ভিতরে ছড়ানো থাকে তখন

গিরগিটির গায়ের রঙ গাঢ় হয়। আর মেলানিন কণাগুলো যখন একসঙ্গে জড়ো হয়ে থাকে তখনই গায়ের রঙ ফিকে হয়ে পড়ে। মেলানোফোর কোষে মেলানিন কণাগুলোর ছড়িয়ে পড়া এবং জড়ো হওয়ার কারণই বা কি? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এটা দু'টো হরমোনের প্রভাবে ঘটে থাকে। গিরগিটির মস্তিষ্কে আমাদের মতই একটা অনাল গ্রন্থি থাকে। একে পিট্যুইটারি গ্রন্থি বলে। এই পিট্যুইটারি গ্রন্থিতে তিনটে ভাগ থাকে। এই ভাগ তিনটের মাঝের যে ভাগটা থাকে তা থেকে ইণ্টারমিডিন হরমোনের প্রভাবে মেলানোফোর কোষে মেলানিন কণাগুলো সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে গায়ের রঙ গাঢ় হয়। অর্থাৎ ইণ্টারমিডিন হরমোন বেশি ক্ষরিত হলে গায়ের রঙ গাঢ় হবে।

গিরগিটির বৃক্কের উপরে এক ধরনের গ্রন্থি থাকে, এদের অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি বলে। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রেনালিন নামে এক রকমের হরমোন বের হয়। এই হরমোন রক্তের ভিতর দিয়ে যখন চামড়ায় এসে পৌঁছোয় তখন এর প্রভাবেই মেলানোফোর কোষে মেলানিন কণাগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়ে। মেলানিন কণাগুলো এক জায়গায় জড়ো হলেই গায়ের রঙ হালকা

গায়ের রঙ ফরসা হয় কেন?

হয়ে পড়বে। অর্থাৎ অ্যাড্রেনালিন হরমোনের প্রভাবেই গিরগিটির গায়ের রঙ হালকা হবে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, গিরগিটির বেলায় এই দু'টো হরমোনের ক্ষরণ আলোর প্রভাবেই ঘটে থাকে। দিনের বেলায় সূর্যের আলো যখন গিরগিটির চোখের ভিতরে এসে পড়ে তখনই আলোর প্রভাবে ওই হরমোন দু'টো গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে তাদের নিজেদের কাজ শুরু ক'রে দেয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, গায়ের রঙ গাঢ় থাকলে গিরগিটির শরীর থেকে তাপ কম বেরোতে পারে; ফলে শরীর বেশ গরম থাকে। অর্থাৎ শরীরে তাপ ধরে রাখবার জন্যেই গিরগিটি তার গায়ের রঙ গাঢ় ক'রে ফেলে।

আবার গায়ের রঙ হালকা হলে গিরগিটি শরীর থেকে তাপ বাইরে বের করে দেয়। সুতরাং গা বেশি গরম হলেই গিরগিটি গায়ের রঙ হালকা ক'রে দেয়, যাতে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়।

আলোর প্রভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী ইণ্টারমিডিন ও অ্যাড্রেনালিন হরমোন কম বেশি বের ক'রে গিরগিটি তার গায়ের রঙ পালটাতে থাকে। এইভাবেই গায়ের রঙ পালটে পালটে গিরগিটি তার শরীরে তাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় ঠিক রাখে।

মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে আসে কেন?

সকালবেলা পাঁউরুটিতে মধু মাখিয়ে খেতে খেতে কখনও কি আমাদের মনে হয়েছে যে, প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার ফুলের মধু থেকে তৈরি হয় মাত্র পাঁচশো গ্রাম খাবার মধু? এই পাঁচশো গ্রাম মধু তৈরি করতে পঞ্চাশ হাজার কর্মী-মৌমাছি ব্যস্ত। প্রতিটি কর্মী-মৌমাছিকে এর জন্যে পঁচাত্তর বার যাতায়াত করতে হয়েছে। তা ছাড়া মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে কত লোক যে মৌমাছির কামড়ে মারা গেছে তা বলে শেষ করা যায় না।

মৌচাক ভাঙার আগেই ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি মৌ-চোরদের ঘিরে ধরে। তখন মৌ-চোরদের পক্ষে মৌমাছির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

মৌমাছি যখন আক্রমণ করে তখন তারা ঝাঁক বেঁধে আসে কেন?

মৌমাছিরা সাধারণত বাসা বেঁধে থাকতে ভালবাসে। মৌমাছিদের বাসাকে মৌচাক বলে। একটি চাকে অসংখ্য মৌমাছি বাস করে। এদের মধ্যে কর্মী-মৌমাছিরাই মধু সংগ্রহ করে। কিছু কিছু কর্মী-মৌমাছি আবার মৌচাকের আশেপাশে উড়ে বেড়ায়। এরা মৌচাককে শত্রুর হাত থেকে

পাঁচশো গ্রাম মধু তৈরি করার জন্যে কত মৌমাছি দরকার?

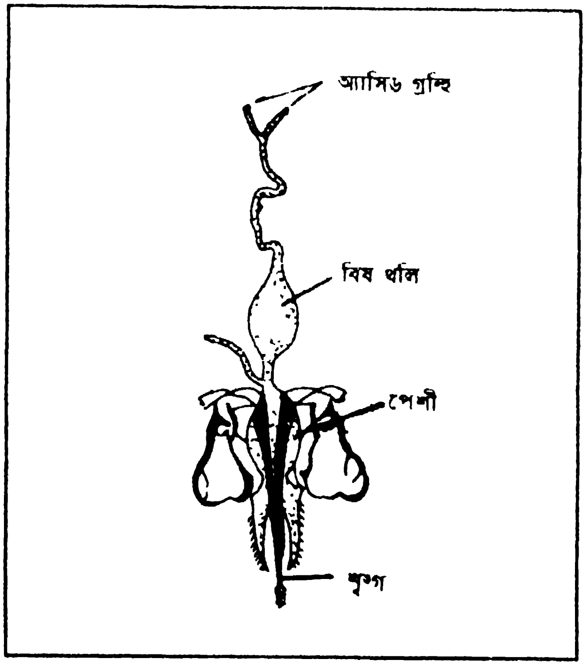
রক্ষা করবার জন্যে পাহারা দেয়। অনেক সময় এরা উড়তে উড়তে মৌচাক থেকে বেশ খানিকটা দূরেও চলে যায়।

স্বাভাবিক কারণেই কোনো লোক দেখলে কর্মী-মৌমাছি তাকে শত্রু মনে ক'রে তেড়ে আসে এবং শত্রু পালিয়ে যাবার আগেই মৌমাছি তার গায়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। মৌমাছির পেরেকের মত হুল চামড়ার ভিতরে ঢুকে যায়।

হুলের গায়ের পিছনেই থাকে বিষভরা ছোট থলি। একবার হুল ফোটালে সে হুল আর সে বের ক'রে নিয়ে আসতে পারে না। টানাটানিতে হুলের সঙ্গে বিষের থলিও মৌমাছির শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। হুল এবং বিষের থলি ছেড়ে আক্রমণকারী কর্মী-মৌমাছি ফিরে চলে যায়। এ-দিকে বিষের থলির সঙ্গে যে-পেশী থাকে তার সঙ্কোচনে থলি থেকে বিষ বেরিয়ে লোকটির চামড়ার ভিতরে ঢুকে পড়ে। মৌমাছির বিষে হিস্টামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড,

মৌমাছি কামড়ালে আমাদের চামড়া ফুলে ওঠে কেন?

ফস্ফোলাইপেজ-এর মত উৎসেচক থাকে। এর সঙ্গে 'মেলিট্রিন' নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থও পাওয়া যায়। মেলিট্রিন থাকবার জন্যেই মৌমাছির কামড়ে চামড়া



ফুলে ওঠে এবং জ্বালা ধরে।

মৌমাছির বিষের থলি থেকে যে শুধু বিষ বেরোয়, তা নয়। বিষের সঙ্গে এক ধরনের আতরের মত জিনিস শরীরে ঢুকে পড়ে। এই আতরের মত জিনিসকে 'ফেরোমোন' বলে। হাওয়া লাগলেই ফেরোমোন বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকে। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফেরোমোনের গন্ধ গিয়ে পৌঁছোয় কাছাকাছি মৌচাকে। সেই গন্ধ পেয়ে মৌচাক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বেরিয়ে এসে মৌ-চোরের দিকে ধেয়ে যায়। না পালালে মৌ-চোরের তখন আর বাঁচার কোনো পথ থাকে না।

সাপ ফুঁসোয় কেন?

সাপ সম্বন্ধে যাদের অল্প-বিস্তর ধারণা রয়েছে, তারা সবাই জানে যে, সাপ সাধারণত মানুষকে এড়িয়ে যেতে চায়। তবে রেগে গেলে কিংবা উত্তেজিত হলে বা শত্রুর সামনাসামনি হলে সাপ ফুঁসিয়ে ওঠে। যে-সাপ ফণা ধরে তারাই কিন্তু বেশি ফুঁসোয়।

সাপের এই ফুঁসিয়ে ওঠার কারণ কি?

ফোঁস-ফোঁসানি কাকে বলে তা আমরা জানি। খুব তাড়াতাড়ি নাক দিয়ে হাওয়া নেওয়া এবং বের ক'রে দেওয়ার ফলে যে শব্দ তৈরি হয় তাকেই ফোঁস ফোঁসানি বলে। খানিকটা জোরে দৌড়োবার পর আমাদেরও নাক দিয়ে খুব দ্রুত হাওয়া ঢুকতে এবং বেরোতে থাকে বলে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের চাইতে নাকে একটু বেশিই শব্দ হয়—অনেকটা ছোটখাটো ফোঁস-ফোঁসানির মত।

সব বাচ্চা সাপেরই দু'টো ক'রে সমান আকারের ফুসফুস থাকে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাপ দৈর্ঘ্যেও বেড়ে ওঠে। কিন্তু শরীর দৈর্ঘ্যে বাড়লেও সেই অনুপাতে সাপের ফুসফুস দু'টো বাড়তে পারে না। কারণ শরীরের ভিতরে দু'টো লম্বা ফুসফুস রাখবার জায়গার অভাব হয়। এইজন্যেই সাপ লম্বায় যখন বেড়ে ওঠে তখন কেবল একটা ফুসফুসই সেই অনুপাতে লম্বায় বাড়ে। জায়গার অভাবে অন্য ফুসফুসটা বাড়তে পারে না বলে সেই ফুসফুসটা খুবই ছোট থেকে যায়। আর বড় ফুসফুসটা লম্বায় বাড়তে বাড়তে প্রায় লেজের কাছাকাছি এসে পৌঁছোয়।

মুখ থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ফুসফুসের অংশকে আসল ফুসফুস বলে। এই অংশ দেখতে অনেকটা স্পঞ্জের মত। এতে অনেক রক্তজালক থাকে। প্রকৃতপক্ষে শ্বাসকার্যের

সাপের কটা ফুসফুস থাকে?

সময়ে গ্যাসের বিনিময় হয় এই অংশেই। ফুসফুসের পিছনের বাকি অংশ অনেকটা বেলুনের মত কাজ করে। এখানে বাতাস জমা থাকে। সাপ জলে ডুব দেবার আগে

এই অংশে বাতাস ভর্তি ক'রে নেয়। ফলে জলের তলায় অনেকক্ষণ সে ডুবে থাকতে পারে।

রেগে গেলে বা উত্তেজিত হলে বাতাস থেকে একেবারে অনেকটা হাওয়া নিয়ে সম্পূর্ণ ফুসফুসটাকে ভর্তি ক'রে ফেলে। ফুসফুসে ভর্তি বাতাস থাকলে সাপের শরীরটাও বেশ ফুলে ওঠে। আবার নিঃশ্বাসের সময়ে সাপ ফুসফুস ভর্তি হাওয়াকে নাক দিয়ে বের ক'রে দেয়।

সাপের নাকের ছিদ্র এবং শ্বাসনালী সমকোণে থাকে। শ্বাসনালী দিয়েই বাইরের বাতাস ফুসফুসে ঢোকে এবং বেরোয়। নাকের ছিদ্র এবং শ্বাসনালী সমকোণে থাকায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে বাতাস এই পথে সামান্য বাধা পায়। এই বাধা পেরোবার জন্যে সাপকে খুব জোরে শ্বাস

সাপ জলের তলায় অনেকক্ষণ ডুবে থাকে কেমন ক'রে?

নিতে হয়। একসঙ্গে অনেকটা ক'রে বাতাস ফুসফুসে নেওয়া, বের ক'রে দেওয়া এবং পথের বাধা মিলে সাপের নাকের ভিতরে এমন একটা শব্দ তৈরি হয়, যাতে মনে হয়, ফুটবল ব্লাডারের কোনো ফুটো দিয়ে সজোরে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। নাক দিয়ে খুব দ্রুত হাওয়া দেওয়া-নেওয়ার জন্যেই মনে হয় সাপ যেন ফুঁসোচ্ছে।

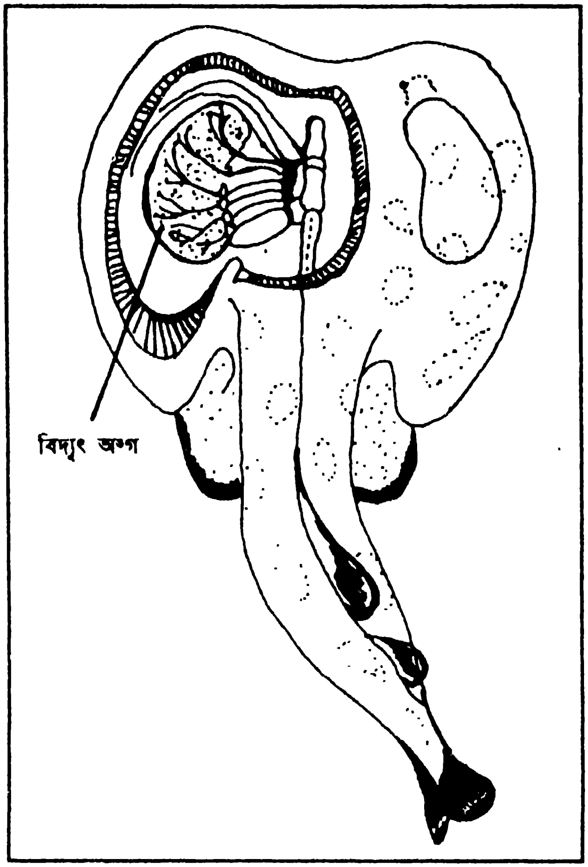
কোনো কোনো মাছ বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি করে কেন?

নিজের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রবণতা সব প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। কোনো পরিবেশে বাস করতে গেলে সবাইকে সব সময়েই আশেপাশের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বাঁচতে হয়। যুদ্ধ ক'রে বাঁচা সহজ কথা নয়। তার জন্যে চাই নানা ধরনের অস্ত্র। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রাণীদের শরীরে সে-সব অস্ত্র তৈরি হয়। মাঝে

টর্পেডো মাছ কি ক'রে নিজের চারদিকে তড়িৎক্ষেত্র তৈরি করে?

মাঝে ওই সব অস্ত্র নিজেদের খাবার ধরবার জন্যেও প্রাণীরা ব্যবহার ক'রে থাকে।

এমনই এক ধরনের অস্ত্র হল বিদ্যুৎ-প্রবাহ। টর্পেডো



টর্পেডো মাছের বিদ্যুৎ অঙ্গ

বলে এক জাতের সামুদ্রিক মাছ আছে যারা জলে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে নিজেদের শরীরে এক ধরনের বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি করতে পারে। এই বিদ্যুৎ জৈব-বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্যে টর্পেডো মাছের শরীরে এক রকমের অঙ্গ থাকে—যাদের বলে বিদ্যুৎ-অঙ্গ। এই মাছের মাথার দু'দিকের কানকোর উপরে দু'টো বিদ্যুৎ-অঙ্গ থাকে। ওই অংশে মাছের পেশী পরিবর্তিত

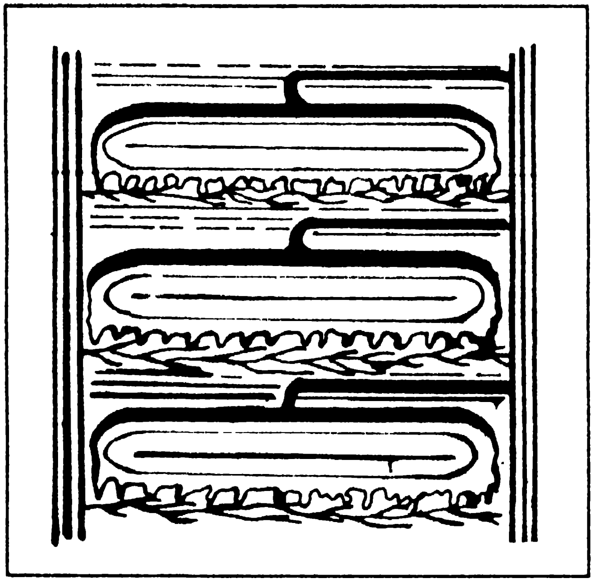
টর্পেডো মাছ কত ভোল্টের বিদ্যুৎ তৈরি করে?

হয়েই তৈরি হয় বিদ্যুৎ-অঙ্গ। বিদ্যুৎ-অঙ্গের গঠন অনেকটা মোটর গাড়ির ব্যাটারির মত। মোটর গাড়ির ব্যাটারি থেকে যেমন বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তেমনি মাছের বিদ্যুৎ-অঙ্গ থেকেও বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব।

বিদ্যুৎ-অঙ্গ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। মস্তিষ্কের

ভিতরে এর জন্যে একটা আলাদা জায়গা রয়েছে, যেখান থেকে প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা সম্ভব। টর্পেডো মাছের বিদ্যুৎ-অঙ্গ থেকে প্রায় 40-50 ভোল্টের বিদ্যুৎ তৈরি হয়। ইল মাছের বিদ্যুৎ-অঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির পরিমাণ প্রায় 370 থেকে 550 ভোল্টের মত।

কিন্তু মাছ কেন বিদ্যুৎ তৈরি করে? বিজ্ঞানীদের ধারণা বিদ্যুৎ-মাছ বিদ্যুৎ তৈরি করে মূলত আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু খাবার ধরবার জন্যেও ওরা সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার ক'রে থাকে। সাধারণত সমুদ্রের অনেকটা গভীরে যে সব মাছ থাকে তাদের চোখের দৃষ্টি রীতিমতো কম। এই সব



বিদ্যুৎ অঙ্গের গড়ন

মাছ বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি করে শুধু খাবার ধরবার জন্যেই।

মাছ বিদ্যুৎ তৈরি ক'রে নিজেদের শরীরের চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে মাছের শরীরের চারদিকে একটা বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী ঢুকলেই মাছ তা বুঝতে পারে আর খুবই সচেতন হয়ে পড়ে। এইবারে মাছ প্রাণীটির অবস্থান অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন পালটাতে থাকে। এইভাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পালটে পালটে সে প্রাণীটির সঠিক অবস্থান জেনে নেয়। প্রাণীটি শত্রু হলে মাছ অন্যান্য মাছকে এই খবর জানিয়ে দেয়।

কিন্তু প্রাণীটি যদি তার খাদ্য হয়, তাহলে মাছ তার বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে খাদ্যের একেবারে কাছে এসে পৌঁছোয়।

আত্মরক্ষার্থে শত্রুর সঠিক অবস্থান জানবার জন্যে আর খাবারের খোঁজেই বিদ্যুৎ-মাছ বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি করে।

রাত্তিরে বেড়ালের চোখ জ্বলজ্বল করে কেন?

বেড়াল আমাদের খুবই পরিচিত প্রাণী। দিনের বেলায় সে চুপচাপ। আমরা দেখেছি রাত্তিরে তার চোখ জ্বলজ্বল করে। কিন্তু রাত্তিরে বেড়ালের চোখ এ-রকম জ্বলে কেন?

দিনের বেলায় একটা বেড়ালকে লক্ষ্য করে দেখবো, সে তার চোখকে কুঁচকে ছোট ক'রে নিয়েছে। একই সঙ্গে চোখের তারারন্ধ্র সে ছোট ক'রে ফেলে যাতে চোখের ভিতরে বেশি আলো ঢুকতে না পারে। এর একটা কারণ আছে। বেড়ালের অক্ষিপটে দু'রকমের কোষ থাকে। 'কোন্' কোষ আর 'রড' কোষ। তার মধ্যে 'কোন্' কোষের চাইতে 'রড' কোষের সংখ্যাই থাকে বেশি। 'কোন্' কোষ বেশি আলোতে দেখতে সাহায্য করে, আর 'রড' কোষ কম আলোতে।

অক্ষিপট 'রড' ও 'কোন্' কোষ দিয়ে তৈরি চোখের ভিতরকার একটা পর্দা। বাইরে থেকে তারারন্ধ্র দিয়ে আলো ঢুকে অক্ষিপটে বাইরের বস্তুর ছবি তুলে ধরে, ঠিক যেমন ভাবে ক্যামেরার ছিদ্র দিয়ে আলো ঢুকে পিছনের ফিল্মে আমাদের ছবি ওঠায়।

বেড়ালের চোখে অক্ষিপটের পিছনেই একটা স্তর থাকে। এই স্তরটিকে ট্যাপেটাম লুসিডাম বলে। এক ধরনের কেলাস দিয়ে এই স্তর তৈরি। কেলাসে আলো পড়লে তা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি ভাবেই বাইরের আলো এই কেলাস স্তরে পড়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায় এবং আলো নানাদিকে প্রতিফলিত হয়।

রাত্তির মানেই যেন অন্ধকার। তবে একেবারে অন্ধকার

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বলে
কি কিছু আছে?

বলে কোনো কিছু নেই। যতই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমরা বলি, সব অন্ধকারেই অল্পবিস্তার আলো থাকে। তাই অন্ধকার যতই ঘন হোক না কেন, তা একেবারে অন্ধ ক'রে দেয় না।

বেড়ালের চোখের অক্ষিপটে 'রড' কোষের সংখ্যা বেশি

থাকার জন্য বেড়াল অন্ধকারে ভাল ক'রে দেখতে পায়। রাত্তিরের অন্ধকারে বেড়াল চোখের তারারন্ধ্রকে পুরোটা খুলে রাখে যাতে বাইরের সবটা আলোই চোখের ভিতরে ঢুকতে পারে। এই আলো তারারন্ধ্র দিয়ে ট্যাপেটাম লুসিডাম স্তরে গিয়ে পৌঁছোয়। আলোক-রশ্মি ট্যাপেটাম লুসিডাম থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখের ভিতরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোক-রশ্মি চোখের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে চোখের ভিতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে আর অক্ষিপটেও বাইরের বস্তুর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি গঠিত হয়।

প্রতিফলিত আলোয় চোখের ভিতরটা উজ্জ্বল হওয়ার জন্যেই অন্ধকারে বাইরে থেকে দেখলে বেড়ালের চোখের ভিতরটা জ্বলছে বলে মনে হয়।

কেউটে কেন ফণা ধরে?

সাপুড়েরা যে-সব সাপ খেলা দেখাবার জন্যে নিয়ে আসে তাদের সবারই যে ফণা থাকে এমন নয়। কেউটে, গোখরোর মত যে-সব সাপের ফণা আছে, সাপুড়ের লাউ-বাঁশির তালে তালে তারা ফণা দোলায়। সাপুড়ের বাঁশির সুরে কেউটে যখন মাথা উঁচু করে, তখন তাকে অনেকটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত দেখায়। সরু দেহটা ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে আবার হঠাৎই সরু হয়ে মাথায় মেশে। চওড়া অংশর সঙ্গে মাথাটি সমকোণে থাকে। কেউটের বেলায় মাথার পিছনটা, অর্থাৎ গলা চওড়া হয়ে ফণা তৈরি হয়।

সাপের মাথার পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত মেরুদণ্ড অনেকগুলো ছোট ছোট হাড় জুড়ে তৈরি হয়েছে। এদের কশেরুকা বলে। সাধারণত কশেরুকা থেকে দু'পাশে ছোট ছোট হাড় জোড়ায় জোড়ায় বের হয়, এদের পঞ্জরাস্থি বলে। পঞ্জরাস্থির সঙ্গে পেশী যুক্ত থাকে। এই পেশীদের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই সাপের দেহ সরু বা মোটা হয়। কেউটের গলার পঞ্জরাস্থিগুলি অন্যান্য পঞ্জরাস্থি থেকে লম্বায় অনেকটা বেশি বড় হয়। সাপ যখন শুয়ে থাকে তখন গলার পঞ্জরাস্থিগুলি পিছনের দিকে বেঁকে মেরুদণ্ডের সঙ্গে লেগে থাকে। কেউটে যখন ফণা তোলে তখন পঞ্জরাস্থি পেশীর সংকোচনে গলার পঞ্জরাস্থিগুলি বাইরের দিকে বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজকরা চামড়াও টানটান হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। গলার পঞ্জরাস্থিগুলি ভিতর দিকে সামান্য বাঁকানো বলে কেউটের ফণাও ধারের দিকে সামান্য বাঁকানো দেখা যায় এবং পিঠের দিকটা উঁচুমত হয়ে ওঠে। এইভাবেই কেউটে ফণা ধরে।

এ-তো গেল ফণা ধরার কথা। কিন্তু কেউটে কেন ফণা ধরে?

বিষধর সাপের দু'রকমের বিষ দাঁত থাকে। এক ধরনের

বিষধর সাপের কত রকমের বিষ দাঁত আছে?

সাপের বিষ দাঁত থাকে সোজা। এইসব সাপ কামড়ায়ও সোজাসুজি। আবার অন্য ধরনের সাপের বিষ দাঁত ভিতরের দিকে বাঁকানো। কেউটের বিষ দাঁত এই দ্বিতীয় ধরনের। কেউটের বিষ দাঁত উপরের চোয়ালের সামনের দিকে লাগানো এবং তা কাস্তের মত মুখের ভিতর দিকে বাঁকানো থাকে। এইরকম বাঁকানো বিষ দাঁত নিয়ে কেউটে কাউকে সোজা কামড়ালে দাঁতের পিছন দিকটাই চামড়াতে গিয়ে লাগবে। দাঁতের মুখ কখনোই বিঁধবে না। বাঁকানো দাঁত দিয়ে কাউকে কামড়াতে হলে দাঁতের মুখটাকে সব সময়েই নীচের দিকে রাখতে হবে। সেইজন্যে মাথাটাকে অনেকটা উপরে তুলে মুখটাকে হাঁ ক'রে মাথাটাকে হঠাৎই নীচে নামিয়ে আনতে হবে। আর তাতে যে পেশী শক্তির দরকার কেউটে ফণার পেশী থেকেই তা সংগ্রহ করে। ফণার পেশী না থাকলে চামড়া ফুটিয়ে গভীরে দাঁত বসাবার শক্তি কেউটে পেত না। সুতরাং দাঁতের বাঁকানো অবস্থার জন্যে উঁচু থেকে সজোরে আক্রমণ করবার পেশীবল সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই কেউটে ফণা ধরে।

গিরগিটি মাঝে মাঝে গলা ফুলোয় কেন?

আমাদের চারপাশে ছোট-বড় যত জীব-জন্তু আছে তার ভিতরে গিরগিটি একটি। লোক দেখলে সে মাথা নাড়ায়, গলা ফুলোয়, মাঝে মাঝে গায়ের রঙ পালটায়, গায়ের কাঁটা তোলে—এমনই তার স্বভাব। কিন্তু গিরগিটি লোক দেখলে গলা ফুলোয় কেন?

গিরগিটির শরীরের সব অংশেরই চামড়া বেশ টানটান ক'রে বিছনো থাকে। ব্যতিক্রম শুধু গলা। এদের গলার কাছে চামড়ায় অনেকগুলি ভাঁজ দেখা যায়। সেখানকার

চামড়াও বেশ খানিকটা পাতলা। সেখানে চামড়ার তলার পেশীগুলি অল্প ব্যবধানে লম্বাভাবে সাজানো থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় গলার পেশীগুলি সংকুচিত হয়ে গলার



চামড়াকে গলার সঙ্গে লেপটে রাখে। এই সময়ে সমস্ত শরীরটাকে টান টান ক'রে বিছিয়ে গিরগিটি দেওয়ালের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে।

কিন্তু কোনো মানুষ অথবা পশু দেখলে হঠাৎই গিরগিটির শরীরে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। সমস্ত শরীরটার সঙ্গে গলা ফুলে ওঠে, গলার রঙও পাল্টে ফেলে। গিরগিটি এ-ধরনের ব্যবহার হঠাৎ করে কেন?

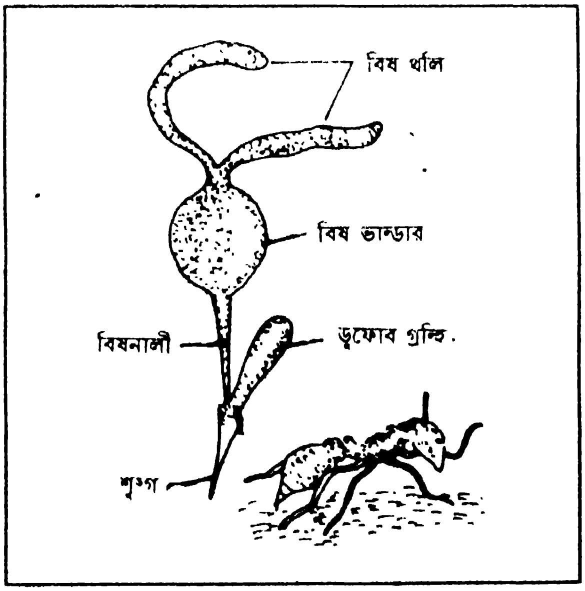
মানুষ বা জন্তু দেখলে গিরগিটি তাকে শত্রু ভেবে নেয়। তারপরে সে হঠাৎই অনেকটা বাতাস একসঙ্গে ফুসফুসে ভরে নেয়। এতে তার গলার ভিতরটাও বাতাসে ভর্তি হয়ে যায়। এরপরে গলার পেশী শিথিল হয়ে যাওয়ার ফলে আর কিছুটা বাতাসের চাপেও গলার চামড়া বেলুনের মত ফুলে ওঠে। শত্রুকে দেখে উত্তেজনা যতই বাড়তে থাকে, ততই গলার কাছটায় রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। গলার পাতলা চামড়ায় রক্ত চলাচল বাড়তেই গলার রঙ লালচে হয়ে পড়ে। এ-দিকে ফুসফুসে বেশি বাতাস ঢোকার জন্যে শরীরটাও বেশ ফুলে ওঠে। তখন পিঠের পেশীতে যে-চাপ তৈরি হয় তাতেই পেশীর সংকোচন ঘটে। আর সেইজন্যে পিঠের আঁশগুলোও দাঁড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝেই গিরগিটি বাতাস বের ক'রে গলার ফুলোটাকে কমিয়ে ফেলে, আবার বাতাস ভরে ফুলোটাকে বাড়িয়ে তোলে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এইভাবেই চলতে থাকে।

এ-সব দেখে মনে হয়, গিরগিটি হঠাৎ রেগে গেলে বা উত্তেজিত হলেই গলা ফুলোয়। অনেক বিজ্ঞানীর আবার অন্য মত। তাঁরা বলেন, গলা ফুলিয়ে গিরগিটি অন্য গিরগিটিকে আশপাশের অবস্থা জানিয়ে দেয়। অনেকে আবার মনে করেন যে, স্ত্রী গিরগিটিকে আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই পুরুষ-গিরগিটি এমন ব্যবহার ক'রে থাকে। আর স্ত্রী-গিরগিটিও পুরুষ-গিরগিটির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এই রকম গলা ফুলোয়।

পিঁপড়ে সার বেঁধে চলে কেন?

কোথাও কোনো মিষ্টি খাবার খোলা পড়ে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় যে খাবারে পিঁপড়ে ধরেছে। খালি চোখে ধারে কাছে কোনো পিঁপড়ে দেখা না গেলেও হঠাৎই খাবারে পিঁপড়ে কোত্থেকে যে এসে পড়ে, তা বোঝাই যায় না।

পিঁপড়েরা মুখে ছোট ছোট খাবারের টুকরো নিয়ে সার বেঁধে এগিয়ে চলে। সার বাঁধা পিঁপড়ের দল সরল রেখায়



না এগিয়ে চলে এঁকেবেঁকে, কখনও দেওয়ালের উপরে উঠে, কখনও বা আবার মেঝেতে নেমে এসে।

কিন্তু পিঁপড়েরা সার বেঁধে চলে কেন?

সাধারণত কর্মী-পিঁপড়েদের শরীরের পিছন দিকটায় ছুঁচের মত ছুঁচলো ছোট হুল রয়েছে। এই পিঁপড়েরা প্রধানত বন্ধ্যা স্ত্রী-পিঁপড়ে। হুল দিয়েই এরা আত্মরক্ষা করে। এই হুলের পিছনেই বিষের থলি থাকে। কর্মী-পিঁপড়ে যখন

কাউকে হুল ফোটায় তখন ওই বিষের থলি থেকেই বিষ হুল দিয়ে বেরিয়ে আসে। ওই বিষে ফরমিক অ্যাসিড থাকে বলে পিঁপড়ে কামড়ালে ভীষণ জ্বালা ধরে।

কর্মী-পিঁপড়ের বিষের থলির নীচেতেই থাকে একটা আতর গ্রন্থি। একে 'ডুফো'র গ্রন্থি বলে। আতরের থলি থেকে সময়ে সময়ে ওই আতর হুলের মাথা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসে।

পিঁপড়েদের ভিতরে কর্মী-পিঁপড়েরাই সব কাজ করে থাকে। খাবারের জোগাড়ে এদের অনেক দূরেও যেতে হয়। কিন্তু এক একজনের পক্ষে আর কতটুকুই বা খাবার আনা

পিঁপড়ে কামড়ালে জ্বালা করে কেন?

সম্ভব? তাই সবাইকে একসঙ্গে ক'রে খাবারের দিকে এগনো দরকার। আবার খাবার নিয়ে ফিরেও আসতে হবে সবাই মিলে। খাবারের খোঁজে কর্মী-পিঁপড়েরা যখন এগিয়ে যায় তখন শরীরের পিছনটা ভারি হবার জন্য তাদের হুলের মাথা মাটি স্পর্শ ক'রে থাকে। এইভাবে মাটি ছুঁয়ে যাবার সময়ে হুলের মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা আতর পড়ে। একের পর এক কর্মী-পিঁপড়ের হুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা আতর বেরনোর ফলে সারা পথটায় আতরের লম্বা রেখা তৈরি হয়। এই আতরের রেখা অন্যান্য পিঁপড়েদের পথ নির্দেশ দেয়। অন্যান্য কর্মী-পিঁপড়ে আতরের রেখা ধরে এগিয়ে চলে। খাবারের কাছে পৌঁছে খাবার নিয়ে তারা আবার ওই একই পথে আতরের গন্ধ শুঁকে ফিরে আসতে পারে। খাবারের জন্য একই পথে অনেকবার কর্মী-পিঁপড়েদের যাতায়াত করতে হয়। আতরের চিহ্ন ধরে যায় বলে পিঁপড়েদের কখনও পথভুল হয় না। এইভাবে গন্ধ শুঁকে চলার জন্যেই পিঁপড়েরা সার বেঁধে চলে।

তিমি কেন ফোয়ারা তোলে?

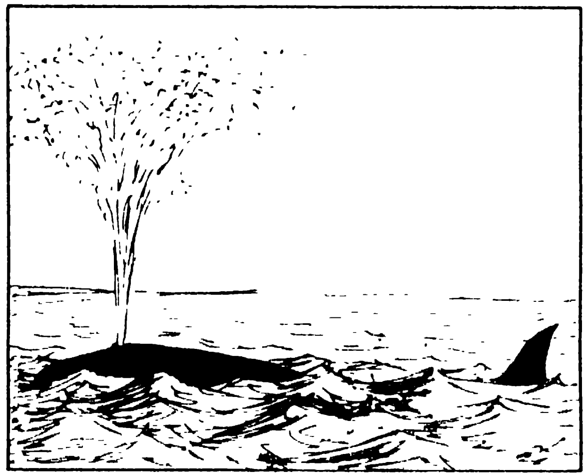
জলে যে-সব প্রাণীর বাস, তারা যে সবাই মাছ, তা নয়। চিংড়ি জলে থাকলেও মাছ নয়, তিমিও মাছের পর্যায়ে পড়ে

তিমি কি এক ধরনের মাছ?

না। এরা এক ধরনের স্তন্যপায়ী জন্তু। সাধারণত যে-সব জীব শিশু অবস্থায় মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয় তাদেরই স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। জলে থাকে বলে তিমির চেহারাটা অনেকটা মাছের মত। কিন্তু মাছ যে-রকম ফুলকা দিয়ে শ্বাসকার্য চালায় তিমি সে-রকম নয়। তিমির শরীরে আমাদেরই মত ফুসফুস রয়েছে।

জলে বাস করলেও তিমি কিন্তু মাছের মত বেশিক্ষণ জলের তলায় ডুবে থাকতে পারে না। ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ পরপরই তাকে জলের উপরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। আর সেই সময়েই জলের উপর মুখ রেখে সে ফোয়ারা তোলে। কিন্তু তিমি জলে ফোয়ারা তোলে কেন?

যে-সব প্রাণী ফুসফুস দিয়ে শ্বাসকার্য চালায় তারা কিন্তু বাতাস থেকেই অক্সিজেন নেয়। বাতাস দিয়ে তারা ফুসফুস



ভর্তি ক'রে ফেলে। ফুসফুসে বাতাস ভর্তি করতে হয় বলেই তিমি মাঝে মাঝেই জলের উপর ভেসে ওঠে। কখনও কখনও জলের উপরে সে শুধু নাকটাকে তুলে রাখে। তিমির মুখের পিছনটায়, মাথার সামনে একটা উঁচুমত জায়গা আছে। এই উঁচু জায়গার উপরেই রয়েছে তার নাকের ছিদ্র। তাই জলে ভাসবার সময়ে সমস্ত শরীরটা জলের তলায় রাখলেও তিমি নাকের ফুটোটাকে জলের উপরে তুলে রাখতে পারে। এই অবস্থায় সে বাতাসের অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। এই সময় মাঝে মাঝেই সে নাকের ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মত ক'রে অনেক উঁচুতে জল ছিটোতে থাকে। তিমির এই ধরনের জল ছিটনো দেখে অনেকেই ভাবেন যে, মুখ দিয়ে এরা যে-জলটা নেয় তাই ফোয়ারার মত ক'রে নাকের ফুটো দিয়ে বের ক'রে দেয়।

নাকের ফুটো দিয়ে ফোয়ারা বেরিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু তা মুখ দিয়ে নেওয়া জল নয়।

তিমির শরীরটা যেমন বিরাট, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তেমনি বড়। তিমির ফুসফুসও অনেক বড় হয়। সমুদ্রের তলায় অনেকক্ষণ থাকতে হয় বলে তিমি একবারে অনেকটা বাতাস নিয়ে ফুসফুস দু'টোকে ভর্তি ক'রে নেয়, তারপর জলের তলায় ডুব দেয়। জলের তলায় ডুবে থাকবার সময়ই ফুসফুস থেকে সে অক্সিজেন নিয়ে নেয় এবং ফুসফুসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের ক'রে দেয়। ফুসফুসের বাতাসে অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলে আবার নতুন ক'রে বাতাস নেবার জন্যে জলের উপরে ভেসে ওঠে। ফুসফুসের ভিতরে যে-বাতাস রয়েছে তা বের না ক'রে দিলে তো আর নতুন বাতাস নিতে পারবে না। তাই প্রথমেই ফুসফুস থেকে তিমি বাতাস বের ক'রে দেয়। নিঃশ্বাসের সময় এত বড় ফুসফুস থেকে হাওয়া খুবই জোরে বেরোতে থাকে। ফুসফুস থেকে যে-বাতাস বের হয় তাতে জলীয় বাষ্প এবং শ্লেষ্মাও পাওয়া যায়। ফুসফুসের বাতাস বেশ গরম থাকে। গরম বাতাস বেরনোর মুখে সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে বাতাসের জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হয়। এই জলই ফুসফুসের চাপে ফোয়ারা হয়ে উপর দিকে উঠতে থাকে।

সাপ কেন খোলস ছাড়ে?

ঝোপ-ঝাড়ে, বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে, কাগজের মত পাতলা, সাদা বা হালকা বাদামী রঙের, আস্ত বা ছেঁড়া, তালপাতার ভেঁপুর মত দেখতে কোনো জিনিসের গায়ে আঁশের দাগ থাকলেই বুঝতে হবে যে সাপ খোলস ছেড়েছে।

কিন্তু সাপের খোলস ছাড়ার কারণ কি?

প্রায় সব সরীসৃপের মত (সরীসৃপ হল এমন প্রাণী যারা বুকে হেঁটে চলে) সাপেরাও মরবার সময় পর্যন্ত লম্বায় বাড়তে থাকে। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাপের খোলস ছাড়তে হয় সমানে। ছোট অবস্থায় সাপ খুবই ঘন ঘন খোলস ছাড়ে। বাড়ন্ত ছেলেদের যেমন তাড়াতাড়ি জুতো বদল করতে হয়, তেমনি। কিন্তু যতই সে বড় হয় খোলস ছাড়ার সময়টাও ততই দীর্ঘ হতে থাকে। ছোট সাপ জন্মাবার দু'দিনের ভিতরই তার প্রথম খোলস ছাড়ে, দ্বিতীয় খোলস প্রায় সাত দিন পরে, আর তৃতীয় খোলস একুশ দিনের মাথায়। কিন্তু বড় সাপ আড়াই থেকে সাত মাসের ভিতরে একবার মাত্র খোলস ছাড়ে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে, সাপ যদি খোলস ছাড়তে না পারে তাহলে তার বাড় থেমে যায়, সে কেমন ঝিমিয়ে পড়ে, চোখে দেখতে পায় না, সব সময়ই বিড়ে পাকিয়ে শুয়ে থাকে। এ-সময়ে সাপ কাউকে কামড়াতেও চায় না। কিন্তু খোলস ছাড়লে সাপ যেন আবার নতুন ক'রে জীবন ফিরে পায়।

সাপের পুরো শরীর চামড়া দিয়ে ঢাকা। বাইরে থেকে সাপের চামড়ায় যে-দাগ দেখতে পাওয়া যায় ওগুলোকে আঁশ বলে। সাপের আঁশ চামড়ার ঠিক নীচেই সাজানো থাকে। আঁশের উপরে একটা পাতলা চামড়ার স্তর আছে।

সাপের গায়ের দাগ কিসের?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আঁশগুলোও বড় হতে থাকে, কিন্তু সেই অনুপাতে উপরের চামড়ার স্তর বেশি বাড়ে না। সেইজন্যে এই স্তরকে মাঝে মাঝে গা থেকে ছাড়িয়ে না ফেললে সাপও লম্বায় বাড়তে পারে না। শুধু যে বাড়তে পারে না, তা নয়, এর ফলে সাপের খাওয়া-দাওয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, চলাফেরা, সব কিছুই যেন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। এই কারণেই খোলস ছাড়ার আগে সাপ বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কোনো কাজেই সাপের উৎসাহ থাকে না। তার হিংস্রতাও যেন অনেকটা কমে যায়। খোলস ছাড়ার আগে সাপের চামড়ার রং ফ্যাকাসে, সাদাটে হয়ে যায়। আঁশের স্তর আর উপরের চামড়ার স্তরের মাঝখানে ছোট ছোট তেলের বিন্দু জমতে থাকে। এক সময়ে তেলের বিন্দু মিলে গিয়ে একটা তেলের স্তর তৈরি হয়। সাপের চোখের উপরকার চামড়াতেও এ-ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ফলে এই সময়ে সাপ চোখে ভাল দেখতে পায় না। এইভাবে আঁশের স্তর ক্রমশ উপরের চামড়ার স্তর থেকে আলাদা হয়ে পড়ে।

এখন সাপ শক্ত কোনো কিছুর উপর মুখ ঘষতে শুরু করে। ঘষতে ঘষতে মুখের কাছটায় খোলস ছিঁড়ে গেলে

খোলস না ছাড়লে সাপ নিস্তেজ হয়ে পড়ে কেন?

তারপরে সে ধীরে ধীরে খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করে, আর খোলসটিও সাপের গা থেকে খুলে উলটে

যেতে থাকে। কিন্তু কোনো কারণে খোলস থেকে সম্পূর্ণ শরীরটা যদি না বের করতে পারে তাহলে সাপ আবারও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

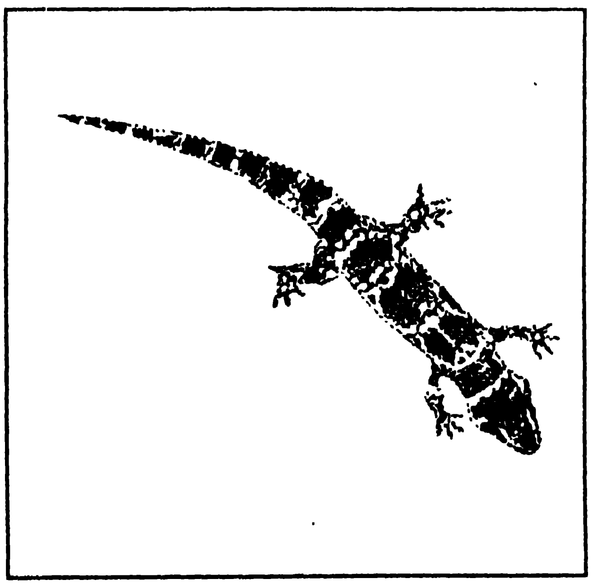
টিকটিকি দেওয়াল থেকে পড়ে যায় না কেন?

এমন কোনো বাড়ি বোধহয় নেই যেখানে টিকটিকি দেখতে পাওয়া যাবে না। ওরা স্বচ্ছন্দে দেওয়াল বেয়ে চলে, ছাদ বেয়ে চিত হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে পোকা ধরবার সময়ে জোরে দৌড়তে থাকে, কিন্তু কখনও পড়ে যায় না।

টিকটিকি দেওয়াল থেকে পড়ে যায় না কেন?

টিকটিকি চারপেয়ে জীব। এরা চলার সময় চারটে পা-কেই কাজে লাগায়। এদের সামনের এবং পিছনের পায়ে পাঁচটা ক'রে আঙুল। প্রতিটি আঙুলই ছুঁচলো এবং পিছন দিকে বাঁকানো নখ থাকে। নখের পিছনেই আঙুলের প্রান্ত অনেকটা ফোলা। এই ফোলা অংশের তলার দিকটায় অসংখ্য ছোট ছোট আঁশ আছে। আঁশগুলো প্রস্থে কয়েকটা সারিতে সাজানো। আঁশের সারির মাঝে মাঝে খুবই সূক্ষ্ম রোঁয়া থাকে। আঙুলের এই ধরনের গড়নই ঘরের মসৃণ দেওয়াল বা ছাদে তাকে চলতে সাহায্য করে।

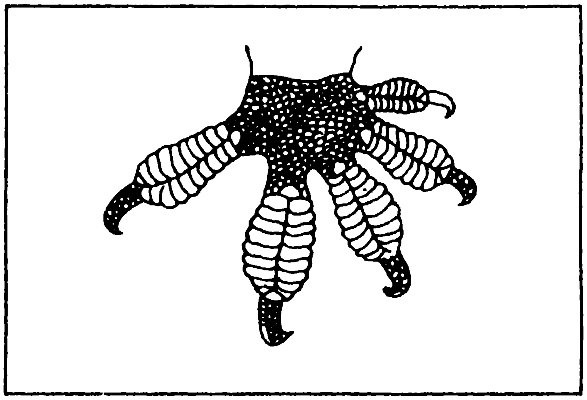
দেওয়াল বা ঘরের ছাদে চলবার সময়ে টিকটিকি কেন পড়ে যায় না, এ-ব্যাপারে দু' ধরনের মত প্রচলিত আছে।



এক দল বিজ্ঞানীর মতে, দেওয়াল অথবা ঘরের ছাদে চলবার সময়ে আঙুলের নখ এবং আঙুলের তলাকার বুরুশের মত সাজানো অতি সূক্ষ্ম রোম এদের সাহায্য করে।

টিকটিকির পায়ে ক'টা করে আঙুল আছে?

আর যে-দেওয়ালে বা চালে টিকটিকি ঘুরে বেড়ায় খালি চোখে তা মসৃণ দেখালেও আদপেই তা মসৃণ নয়। এতে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফাটল দেখা যায়। টিকটিকি চলার সময়ে সেই ফাটলে নখ বা সূক্ষ্ম রোম ঢুকিয়ে দেওয়াল আঁকড়ে ধরে। ফলে সে মাটিতে পড়ে যায় না। আর যখন সে চলে তখন সর্বক্ষণ দু'টো পা দেওয়ালের সঙ্গে লেগে থাকে। এগনোর সময়ে সামনের ডান পায়ের সঙ্গে পিছনের বাঁ পা দেওয়াল ধরে থাকে এবং সামনের বাঁ পা এবং



টিকটিকির আঙুলের তলার গড়ন

পিছনের ডান পা দেওয়াল থেকে তুলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবেই এক জোড়া পা একসঙ্গে নামিয়ে এবং এক জোড়া পা একসঙ্গে তুলে টিকটিকি চলে ফিরে বেড়ায়।

বিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় মত অনুসারে টিকটিকির আঙুলের ফোলা অংশের তলায় সার বাঁধা আঁশের মাঝে মাঝে আড়াআড়ি অনেক ফাটল আছে। টিকটিকি যখন দেওয়ালে পায়ের পেশী দিয়ে পা দু'টোকে বেশ চেপে ধরে তখন ওই ফাটলগুলো থেকে বাতাস বেরিয়ে যায়। ওই ফাটল থেকে হাওয়া বেরিয়ে গেলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার ফলেই ফাটলগুলো দেওয়ালের সঙ্গে এমনভাবে লেগে থাকে যে,

টিকটিকি সাধারণ অবস্থায় কোনোভাবেই দেওয়াল থেকে পা সরিয়ে নিতে পারে না। দেওয়াল থেকে পা ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হলে পায়েব পেশীগুলোতে সে আবার চাপ দেয়। এই মত অনুসারে ফাটলের শূন্যতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে

টিকটিকির আঙুলের তলায় কি আঁশ থাকে?

আঙুলের তলাকার অতি সূক্ষ্ম রোমের ডগা থেকে যে-আঠালো চটচটে পদার্থ বের হয় তাও টিকটিকির পা দেওয়ালে আটকে রাখতে সাহায্য করে। ফলে চলবার সময়ে টিকটিকি দেওয়াল থেকে পড়ে যায় না।

দু'টো মতের মধ্যে কোনটা যে ঠিক তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও এ-ব্যাপারে সবাই একমত যে, টিকটিকির আঙুলের তলাকার ওই ধরনের গঠনই টিকটিকিকে দেওয়াল আঁকড়ে চলতে সাহায্য করে।

ঘোড়া কেন দাঁড়িয়ে ঘুমোয়?

ঘোড়াকে আমরা সাধারণত গাড়ি টানতেই দেখি। খেলার মাঠেও তাকে দেখা যায়। কিন্তু ঘোড়া বসে আছে বা শুয়ে ঘুমোচ্ছে, এমন নজরেই আসে না। অবশ্য ঘোড়া পা ছড়িয়ে কাত হয়ে শুয়ে থাকতে পারে, কিন্তু হাঁটু মুড়ে আরাম ক'রে বসা ঘোড়ার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আর হাঁটু মুড়ে বসা সম্ভব না হলে আরাম ক'রে শুয়ে ঘুমনই বা সম্ভব হবে কেমন করে? কিন্তু ঘুমোতে তো হবেই। অগত্যা ঘোড়াকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমটা সারতে হয়।

ঘোড়া কেন দাঁড়িয়ে ঘুমোয় এর কারণ জানতে হলে সবার আগে ঘোড়ার পায়ের হাড়ের গড়ন সম্বন্ধে জানতে হবে। আমাদের হাতে এবং পায়ে ছোট-বড় অনেকগুলো হাড় থাকে। একটা হাড় আর একটা হাড়ের সঙ্গে যে-

ঘোড়া কি আমাদের মত হাঁটু ভাঁজ করতে পারে?

জায়গাটায় লেগে থাকে তাকেই বলে হাড়ের সন্ধি। এর ইংরেজি হল জয়েন্ট। এই সন্ধি অংশে হাড় ভাঁজ হতে পারে। আমাদের হাতে এই রকমের তিনটে প্রধান সন্ধি রয়েছে। এর প্রথমটা ধড়ের সঙ্গে লাগোয়া। দ্বিতীয়টা কনুই এবং তৃতীয়টা কব্জি। এর ভিতর কনুইটাকেই ভাঁজ ক'রে আমরা হাত নাড়াচাড়া বেশি করতে পারি। হাতের মত পায়েরও সন্ধি তিনটে—একটা কোমরের কাছে, হাঁটুর কাছে আর একটা এবং তৃতীয়টা একেবারে গোড়ালিতে। এর ভিতরে হাঁটুর সন্ধি ভাঁজ ক'রেই আমরা বসতে পারি। হাঁটু-সন্ধির উপর দিকে ছোট্ট একটা চাকতির মত অংশ থাকে, একে মালাইচাকি বলে। এই মালাইচাকি আমাদের হাঁটু ভাঁজ করে বসতে সাহায্য ক'রে।

আমাদের হাতের অস্থিগুলোর প্রথমটাকে বলে প্রগণ্ডাস্থি। এটার এক প্রান্ত কাঁধের অংশফলক অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর অন্য প্রান্ত বহিঃ ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সঙ্গে কনুই-সন্ধিতে যুক্ত। বহিঃ এবং অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নীচের প্রান্ত আবার কব্জিতে মণিবন্ধাস্থির সঙ্গে লাগানো আছে। এখন মণিবন্ধাস্থির সঙ্গে পাঁচটি করতলাস্থির যোগ। এই পাঁচটি করতলাস্থির সঙ্গে আঙুলের হাড়গুলো লাগানো থাকে। বুড়ো আঙুলে দু'টো এবং বাকি আঙুলগুলোতে তিনটে ক'রে হাড় থাকে।

ঘোড়ার সামনের পায়ের হাড়ের বিন্যাস অনেকটাই আমাদের হাতের মত। ঘোড়ার বেলায় আমাদের মধ্যকার আঙুলটি থাকে, বাকি আঙুলগুলো থাকে না। মধ্যকার আঙুলের হাড় ঘোড়াতে এত বেশি লম্বা হয় যে ঘোড়ার কব্জি বা মণিবন্ধ হাঁটুর কাছে এসে পড়ে। আমরা যেমন কব্জিটাকে পুরো ভাঁজ করতে পারি না, ঘোড়ার পক্ষেও তার কব্জির জায়গাটা (ঘোড়ার বেলায় কনুই) পুরো ভাঁজ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ঘোড়ার পক্ষে কনুই মুড়ে বসাও সম্ভব হয় না।

ঘোড়ার পিছনের পায়ের গড়নে গোড়ালি সন্ধি হাঁটু-সন্ধি হয়ে গেছে। এই হাঁটু-সন্ধিতে কোনো মালাইচাকিও থাকে না। এদের হাঁটুর সন্ধি শরীরের সঙ্গে যুক্ত। আমরা যেমন গোড়ালি ভাঁজ ক'রে বসতে পারি না তেমনি ঘোড়াও পিছনের পায়ের হাঁটু ভাঁজ ক'রে বসতে পারে না।

হাঁটু ভাঁজ করবার মত ক'রে হাড়ের গড়ন নেই বলেই ঘোড়াকে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে হয়।

মাছের কি জ্বর হয়?

ব্যাঙের সর্দির মত মাছেদেরও জ্বর হয় কি? ব্যাঙের

সর্দি সত্যি ক'রে নাও হতে পারে, কিন্তু মাছের যে জ্বর হয়, এ-রকম কথা অনেক বিজ্ঞানীই বলে থাকেন। আমাদের জ্বর হলে গায়ে হাত ছোঁয়ালেই তা বুঝতে পারি। এর জন্যে আমরা ডাক্তার-বদ্যি ডাকি, ওষুধ-পত্র খাই, তাতে জ্বর তাড়াতাড়ি সেরে যায়। কিন্তু হঠাৎ জ্বর এলে গায়ে চাদর ঢেকে শুয়ে পড়লে শরীরে বেশ আরাম লাগে।

আমাদের শরীরে তাপমাত্রা শীত গ্রীষ্ম বারো মাস একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় থাকে। এটা সম্ভব ক'রে তোলে আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরকার একটা গ্রন্থি, যার নাম

মাছ জলের ভেতর ওঠা-নামা করে কেন?

হাইপোথ্যালামাস। এই হাইপোথ্যালামাস থেকেই এক ধরনের রস বেরিয়ে আসে যা রক্তে মিশে আমাদের শরীরের তাপমাত্রাকে সঠিক রাখতে সাহায্য করে। তাকে বাড়তেও দেয় না, কমতেও বাধা দেয়। কিন্তু কোনো কারণে আমাদের শরীরে কোনো জীবাণু ঢুকে যদি হাইপোথ্যালামাসকে সাময়িকভাবে অকেজো ক'রে ফেলে, তা হলে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে। এইজন্যেই আমাদের জ্বর হয়। ওষুধ খেলে জীবাণু ধ্বংস হয়। হাইপোথ্যালামাস আবার চাঙ্গা হয়ে পড়ে। তাতে আমাদের জ্বরও কমে যায় এবং শরীরও সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু চাদর গায়ে দিলে অল্প সময়ের জন্য নিজেকে এমন ভাবে সামলানো যায় যে, মনে হয় শারীরিক তাপমাত্রা কিছুটা যেন নিয়ন্ত্রণ করা গেছে।

মাছ শীতল-শোণিত প্রাণী। শীতল-শোণিত কথার অর্থ এই নয় যে মাছের রক্ত সব সময়েই ঠাণ্ডা থাকে। ওই কথার অর্থ হল, এদের শরীরের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার

জীবাণুর আক্রমণেও কি মাছের জ্বর হয়?

সঙ্গে মানিয়ে চলে। পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়লে এদের শরীরেরও তাপমাত্রা বাড়বে। জল সাধারণত ঠাণ্ডা হয় বলে মাছের শরীরের তাপমাত্রাও কম থাকে।

বাতাসের মত জলেও নানা ধরনের অণুজীব রয়েছে, যেমন, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি। মাঝে মাঝে এই অণুজীবগুলি মাছের শরীরে ঢুকে প'ড়ে আশ্রয় নেয়। শরীরে বাইরের জীবাণু ঢুকলে আমাদের মত মাছেরও শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তখন শরীরের তাপমাত্রা পরিবেশের জলের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়ে পড়ে। বাতাসে যেমন সব জায়গায় তাপমাত্রা সমান হয় না, তেমনি জলেও সব জায়গায় সমান তাপমাত্রা থাকে না। গভীর জলে তাপমাত্রা কম এবং উপরের দিকে তাপমাত্রা বেশি থাকে। জীবাণুর আক্রমণে মাছের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মাছ জলের উপর দিকে উঠে আসে, ঠিক যেমন জ্বর হলে আমরা গায়ে চাদর দিয়ে শরীর এবং পরিবেশের তাপমাত্রা এক রাখবার চেষ্টা করি। মাছ উষ্ণ তাপের জলে চলে এলেই শরীর এবং পরিবেশের তাপমাত্রা সমান হয়ে পড়ে। ফলে মাছও অনেকটা আরাম পায়। এই কারণেই মাছ অনেক সময়ে জলের ভিতরে ওঠা-নামা করে।

সাপ কানে শুনতে পায় কি?

সাপুড়েদের বাঁশির সুরে সাপ মাথা দোলায়। অন্ধকারে সাপ তাড়াতে আমরা হাততালি দিয়ে পথ চলি। এ-সব দেখে আমাদের অনেকেরই এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে, সাপ সত্যিই শুনতে পায়। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? সাপ কি আদপেই শুনতে পায়?

এ-নিয়ে বিজ্ঞানীদের নানা মত রয়েছে। সাপের মাথার পিছনটায় বাইরে থেকে কোনো ছিদ্র থাকে না। মাথার ভিতরেও কানের কোনো গর্ত বা নালী নেই। এমন-কি শুনতে পাবে বলে যে কানের পর্দা ভিতরে থাকা উচিত ছিল তাও নেই। তবে মাথার ভিতরটায় আমাদের কানের স্টেপিস হাড়ের মত দেখতে একটি হাড় রয়েছে। এই হাড় উপরের চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে যুক্ত।

হাওয়ায় ভেসে আসা শব্দ-তরঙ্গ কানের পর্দায় ধাক্কা মারলেই তার স্পন্দন স্নায়ু-পথে মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। ফলে আমাদের শোনার অনুভূতি জাগে। সাপের মাথার ভিতরে কানের পর্দার মত কোনো পর্দা না থাকায় হাওয়ায় ভেসে আসা শব্দ-তরঙ্গ সাপের মস্তিষ্কে শোনার অনুভূতি জাগাতে পারে না। এর অনেক পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেছে।

একটি বড় টিনের ভিতরে কোনো সাপকে রেখে, বাইরে

থেকে বাঁশি বাজিয়ে কিংবা কাঠি দিয়ে অন্য কোনো টিন পিটিয়ে শব্দ ক'রেও দেখা গেছে যে, টিনের ভিতরকার সাপের কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যে টিনের ভিতর সাপ রয়েছে, সেই টিনে ধাক্কা দিয়ে কিংবা টিনের কাছাকাছি মাটিতে আঘাত ক'রে দেখা গেছে যে, সাপ টিন থেকে ফণা তুলে বেরিয়ে আসছে। এই পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, সাপ কানে শুনতে পায় না। তবে মাটিতে আঘাত ক'রে কোনো স্পন্দন তৈরি করলে তা সাপ সহজেই অনুভব করতে পারে এবং তার স্বপক্ষে সাড়াও দেয়। প্রমাণ

গাঁয়ের লোক লাঠি ঠুকে অন্ধকার গাঁয়ের পথ চলে কেন?

হিসেবে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, গাঁয়ের লোক ফাটা বাঁশের লাঠি মাটিতে ঠুকে ঠুকে অন্ধকারে গাঁয়ের পথে এগিয়ে চলে। লাঠি ঠুকলে মাটিতে যে-কম্পন তৈরি হয়, মাটি থেকে সাপ তা গ্রহণ করতে পারে এবং রাস্তা থেকে সরে যায়।

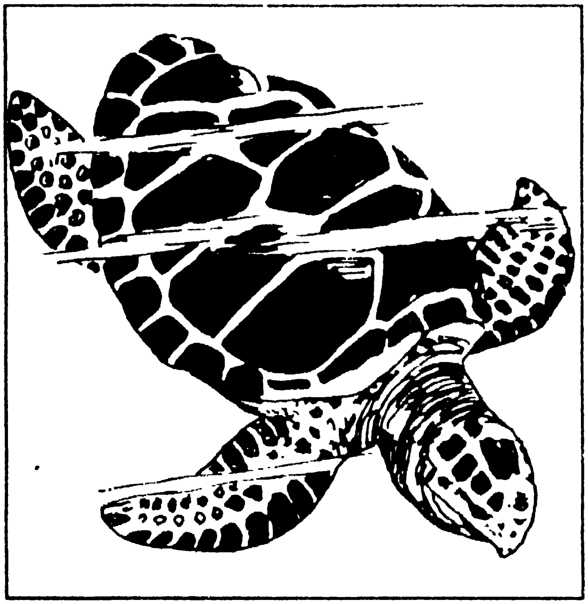
এখন প্রশ্ন হল, কি ভাবে সাপ মাটি থেকে এই কম্পন গ্রহণ করে? অনেকের ধারণা, মাটির এই স্পন্দন সাপ প্রথমে নীচের চোয়াল দিয়ে গ্রহণ ক'রে পরে তা উপরের চোয়ালে পাঠিয়ে দেয়। তারপরে উপরের চোয়াল থেকে 'স্টেপিস' অস্থির ভিতর দিয়ে সেই স্পন্দন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছোয়।

এই ধারণার বিপক্ষে বলা হয়েছে যে, পর্দা না থাকায় স্টেপিস অস্থিতে স্পন্দন পৌছনো সম্ভব নয়। তা ছাড়া ফণা তোলা অবস্থায় মাটি থেকে নীচের চোয়াল দিয়ে সাপ কি ভাবেই বা স্পন্দন গ্রহণ করবে? এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দলের মতে, শোনার মত কোনো অঙ্গ সাপের নেই। অর্থাৎ বাতাসে কোনো কম্পন তৈরি হলে তা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু মাটিতে কোনো কম্পন তৈরি হলে সাপ সমস্ত শরীর দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে। এই কম্পন গ্রহণ করার জন্যে সাপের পেটের দিকের চামড়ায় ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য সংবেদী স্নায়ুপ্রান্ত। মাটি থেকে কম্পন গ্রহণ ক'রে সাপ স্নায়ুর মাধ্যমে তা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতে খুবই দ্রুত পৌছে দেয়। অতএব সরাসরি কানে শুনতে না পেলেও সাপ চামড়া দিয়ে শোনার কাজ এইভাবেই ক'রে থাকে।

কাছিম কেন হাত-পা নাড়ে?

কাছিম জলে থাকে, আবার ডাঙাতেও সে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বেশি সময় জলেই তার বাসা। জলে সাঁতার কাটবার জন্যে কাছিমের হাত ও পায়ের আঙুলগুলো চামড়া দিয়ে জুড়ে লিপ্তপদ তৈরি করেছে। তাই কাছিমের হাত পা তাকে জলে সাঁতার কাটতে বৈঠার মত সাহায্য করে। সাঁতার কাটতে গেলে জলের ভিতর হাত-পা তো নাড়াতেই হয়, কিন্তু ডাঙায় থাকলেও কাছিম হাত পা নেড়ে মুখ বের ক'রে



সব সময়েই যেন একটা ব্যস্ততার ভাব দেখায়। চুপচাপ এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে কাছিমকে প্রায় দেখাই যায় না।

কাছিমের এই হাত-পা নাড়ার কারণ কি?

আমাদের মত কাছিমও ফুসফুস দিয়েই শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। ফুসফুস শুধু বাতাস থেকেই অক্সিজেন নিতে পারে, জলে তাই ফুসফুস অকেজো। জলে থাকার সময়ে নাকটাকে জলের উপরে রেখেই কাছিম বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয়। আর ডাঙায় থাকলে তো কোনো সমস্যাই নেই, ফুসফুস সরাসরি বাতাস পেয়ে যাচ্ছে। ফুসফুসে হাওয়া ভরতে গেলে হাপর যে-ভাবে কাজ করে সেই ভাবে ফুসফুসের আয়তনও বড় করতে হয়। হাওয়া বের ক'রে দেবার সময়ে ফুসফুসের আয়তন ছোট হয়। ফুসফুসের আয়তন বাড়িয়ে কমিয়েই

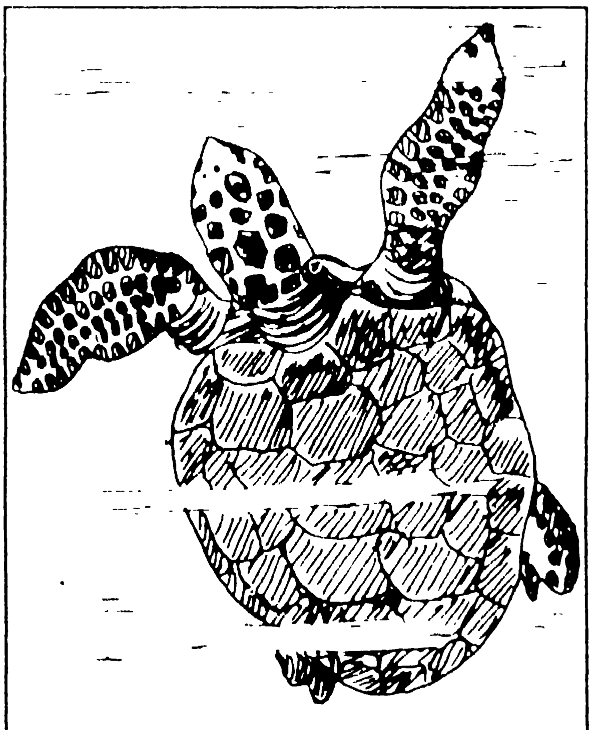
মানুষ এবং ফুসফুসওলা জন্তুরা ফুসফুসে হাওয়া ভরে আবার বের ক'রে দেয়। একেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বলে। আমরা প্রশ্বাস নেবার সময় বুকের পাঁজরগুলোকে উপরের দিকে এবং সামান্য বাইরের দিকে বের ক'রে আনি, ফলে নাকের ফুটো দিয়ে বাতাস ফুসফুসে ঢুকে পড়ে। ফুসফুস থেকে হাওয়া বের করতে হলে বুকটাকে ছোট ক'রে ফেলতে হয়। তখন পাঁজরগুলোকে নীচে এবং ভিতরের দিকে নামিয়ে আনা দরকার। তাই প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাসের সময়ে আমাদের বুক ওঠা-নামা করে।

কাছিমের বুক ও পিঠ কিন্তু আমাদের মত পাঁজর দিয়ে তৈরি নয়। এদের বুক ও পিঠ শক্ত হাড় দিয়ে ঢাকা থাকে।

কাছিম কি আমাদের মত বুক ছোট বড় করতে পারে?

তাই কাছিম বুক ছোট বড় করতে পারে না। কিন্তু তারা দিব্যি ফুসফুস দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকে। এ-জন্য কাছিমের অন্যরকম ব্যবস্থা আছে।

কাছিম তার হাত-পা-গলা সবই শরীরের ভিতরে সহজেই ঢোকাতে পারে এবং বের করতেও পারে। এইভাবে



হাত-পা-গলা বের ক'রে সে শরীরের ভিতরকার আয়তন বাড়ায় এবং হাত-পা-গলা ভিতরে ঢুকিয়ে আয়তন কমায়। এতে তার ফুসফুসের আয়তনও বাড়ে-কমে। ফুসফুসের আয়তন বাড়লে বাইরে থেকে বাতাস ঢোকে। আর ফুসফুসের আয়তন কমলে বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসে। সুতরাং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্যেই কাছিম সব সময়ে হাত-পা নাড়াচাড়া ক'রে থাকে।

বেড়াল চললে শব্দ হয় না কেন?

চলাফেরা করার সময়ে সব প্রাণীর পায়েরই অল্পবিস্তর শব্দ হয়। কিন্তু বেড়াল হেঁটে গেলে, সে চোরের মত এত চুপিসারে চলে যে, তার পায়ের কোনো শব্দই কানে আসে না। এমন-কি বেড়াল উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়লেও কোনো শব্দ শোনা যায় না। এই কারণেই গৃহস্থেরা বেড়ালকে চোরের সঙ্গে তুলনা ক'রে থাকেন।

কিন্তু বেড়াল চললে কোনো আওয়াজ হয় না কেন?

অথচ কুকুরের মত বেড়ালের পায়েও থাবা আছে, তাতে কুকুরের মত নখও থাকে। কুকুর এবং বেড়াল দু'য়েরই থাবার তলায় গদির মত অংশ আছে। চলার সময়ে এই গদি ওদের রাস্তার ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করে। তবু কুকুর দৌড়লে শব্দ হয়, কিন্তু বেড়াল দৌড়লে শব্দ হয় না কেন?

কুকুরের থাবার তলায় গদি বেশ শক্ত হয়। কুকুরের বাঁকানো নখ সব সময়েই থাবার বাইরে বেরিয়ে থাকে এবং মাটি স্পর্শ করে। কুকুর যখন দৌড়োয় তখন থাবার গদির

কুকুরের চলার সময় পায়ে কি শব্দ হয়?

ঘর্ষণের শব্দের চেয়ে নখের আঁচড়ের শব্দটাই বেশি হয়। দৌড়বার কিংবা চলার সময়ে কুকরের বাঁকানো নখ বারেবারে মাটি স্পর্শ করে। ফলে যে শব্দ হয় সেই শব্দই আমাদের কানে আসে।

কিন্তু বেড়ালের থাবার তলাকার গদি খুবই নরম হয়, অনেকটা স্পঞ্জের মত। বেড়ালের নখ যদিও কুকুরের মত বড় এবং ভিতর দিকে বাঁকানো থাকে, তবুও কুকুরের নখের মত সেই নখ বাইরে বেরিয়ে থাকে না এবং মাটিও

স্পর্শ করে না। চলবার বা দৌড়বার সময়ে বেড়াল নখের পিছনকার পেশী টেনে নখগুলোকে থাবার ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। ফলে মাটির সঙ্গে নখের ঘষা লাগবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এর সঙ্গে রয়েছে বেড়ালের থাবার তলার স্পঞ্জের মত নরম গদি। এই গদি থাকবার দরুন চলবার সময়ে বেড়ালের পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না।

সব সাপ বিষধর হয় না কেন?

সমীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে বিষধর সাপের চাইতে নির্বিষ সাপের সংখ্যাই বেশি। আমাদের এই ভারতবর্ষে দু'শো ষাট রকমের সাপের ভিতরে মাত্র পঞ্চাশ রকমের সাপ বিষধর—অর্থাৎ এদের বিষ থাকে। মূল কথা হল, বেশির ভাগ সাপই নির্বিষ।

সাধারণ মানুষ বিষধর এবং নির্বিষ সাপের তফাত ধরতে না পারলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু শুধু চেহারা দেখেই কোনটা বিষধর আর কোনটা বিষহীন সাপ, সহজেই চিনে নিতে পারেন। মোটামুটি একটা কথা বলা যায় যে, বিষধর সাপের লেজ হঠাৎই সরু হবে, আর বিষহীন সাপের লেজ ক্রমশ সরু হয়ে আসবে।

এতো না হয় গেল বিষধর আর বিষহীন সাপ চেনবার উপায়। কিন্তু সব সাপের বিষ থাকে না কেন?

আমাদের মত সাপেরও মুখের আশপাশে লালাগ্রন্থি থাকে। এই লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা খাবারকে পিছল

বিষধর আর বিষহীন সাপের চেহারার তফাত কোথায়?

করে, যাতে সহজে খাবার গেলা যায়। সব সাপেরই মুখের পাটিতে সারি সারি দাঁত আছে। নির্বিষ সাপের বেলায় মুখের সব দাঁতগুলোই সমান আকারের। সাপ খাবার কামড়ে খায় না বলে এদের কামড়ে খাবার দাঁতও আলাদা তৈরি হয় না। এ-সব সাপের সবগুলো লালাগ্রন্থি থেকে শুধু লালাই বের হয়, কোনো বিষ থাকে না। বিষ থাকে না বলে বিষথলিও নেই। ফলে বিষ ঢালবার জন্যে প্রয়োজনীয় বিষ দাঁত বা কামড় দাঁতও থাকে না। এই কারণেই এই ধরনের সাপ নির্বিষ হয়।

বিষধর সাপের চোখের পিছনকার লালাগ্রন্থি লালা তৈরি না ক'রে বিষ তৈরি করে, ফলে লালাগ্রন্থিটিও বিষথলিতে পরিণত হয়। বিষ থাকে বলেই বিষগ্রন্থি থেকে যে নালী মুখে এসে পড়েছে সেখানকার দাঁতটি বিষ ঢালার জন্যে একটু বিশেষ ধরনের হয়। এই দাঁতটিকেই বিষ দাঁত বলে। এই দাঁতগুলি অন্য দাঁতের চাইতে বড় এবং এর মাথাটা খানিকটা পিছন দিকে বাঁকানো। অনেক সাপের দাঁতের ভিতরে নালী আছে, আবার কারো নালী বিষ দাঁতের ধারে কাটা থাকে। এই পথেই বিষথলি থেকে বিষ দাঁতের সামনে গিয়ে পৌঁছোয়।

অতএব লালাগ্রন্থি থেকে শুধুই লালা নিঃসৃত হলে এবং দাঁতগুলো সব সমান হলে সেই সাপ নির্বিষ হবে। আর যে-

বিষ দাঁত কি অন্য দাঁতের চেয়ে বড়?

সব সাপের লালাগ্রন্থি বিষগ্রন্থিতে পরিণত হবে এবং যাদের বিষ দাঁত থাকবে তাদেরই আমরা বিষধর সাপ বলবো।

টিকটিকির লেজ খসে পড়ে কেন?

টিকটিকির যখন লেজ খসে, তখন তা মেঝেতে পড়েই একেবারে স্থির হয়ে যায় না। একটু নড়াচড়াও করে। তখন মনে হয়, যেন একটা জ্যান্ত জীব। খসা লেজ কি ক'রে নড়াচড়া করে ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু আরো অবাক হওয়ার ব্যাপার হল, টিকটিকির লেজ যখন খসে তখন লেজের কাটা জায়গা থেকে এক ফোঁটা রক্তও বেরোয় না। কেন এমন হয়?

টিকটিকির লেজ খসে পড়ে কেন?

মানুষের আক্রমণের জন্যে কি এমন ঘটে, না কি দু'টো টিকটিকির পরস্পরের কামড়াকামড়ির জন্যেই একটার লেজ কেটে বেরিয়ে আসে?

বিজ্ঞানীরা টিকটিকির লেজ খসা সম্পর্কে বলেছেন, টিকটিকির লেজের হাড় কতকগুলো ছোট ছোট হাড় জুড়ে তৈরি। এই ছোট ছোট হাড়কে বলা হয় কশেরুকা। কশেরুকাগুলি মিলেই তৈরি হয় মেরুদণ্ডের লেজের অংশ। টিকটিকির লেজের মাঝ বরাবর এমন কয়েকটি কশেরুকা

আছে যাদের গড়ন এমন যে, মাঝখানে একটা ফাটলের দাগ থাকে। এই ফাটলের দাগ অংশে কশেরুকা এত বেশি রকমের পলকা হয় যে, সামান্য ছোঁয়া বা সামান্য চাপেই কশেরুকাটি দু'ভাগে ভেঙে যেতে পারে। কশেরুকার ওই ফাটল অংশকে ঘিরে যে-সব রক্তনালী এবং স্নায়ুতন্ত্রী রয়েছে তারাও ওই পর্যন্ত এসেই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ ওই অংশের পিছনে রক্ত যেতে পারে না এবং কোনো সংবেদনও পৌঁছোয় না। বাইরের দিকে থেকে ওই অংশে খাঁজ তৈরি হয়। আর এই খাঁজ অংশ থেকেই লেজটি খসে পড়ে।

টিকটিকির লেজ খসলেও রক্ত পড়ে না কেন?

কিন্তু লেজ কেন বা খসে আর কি ভাবেই বা তা খসে পড়ে?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, টিকটিকির লেজ হল এক ধরনের প্রতিরক্ষা অঙ্গ। অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই টিকটিকি লেজ খসিয়ে শত্রুর দৃষ্টি খসা লেজের দিকে নিয়ে যায়। আর সেই ফাঁকে টিকটিকি পালিয়ে বাঁচে। খসা লেজ যখন পেশীর চালনায় নড়তে থাকে তখন শত্রু খসা লেজটিকেই সত্যি টিকটিকি বলে মনে করে। এই কারণেই টিকটিকি লেজ খসায়।

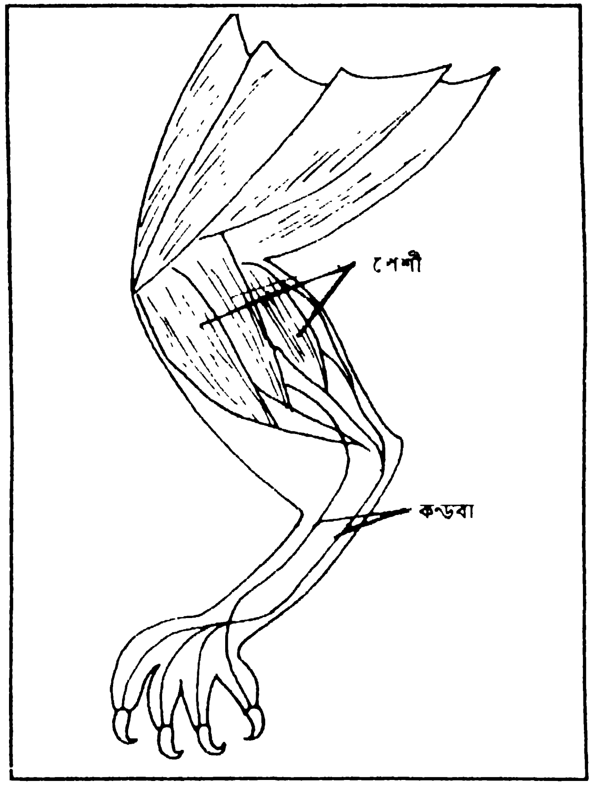
কিন্তু কি ভাবে এই লেজ খসে?

ভয় পেলে টিকটিকির লেজের পেশীতে চাপ পড়ে, ফলে ফাটল অংশে কশেরুকা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং লেজও খসে পড়ে। রক্তনালীগুলো ওই অংশে আগে থেকেই বন্ধ হয়ে যায় বলে লেজ খসে পড়লেও এক ফোঁটা রক্তপাত ঘটে না।

ঘুমন্ত পাখি ডাল থেকে পড়ে যায় না কেন?

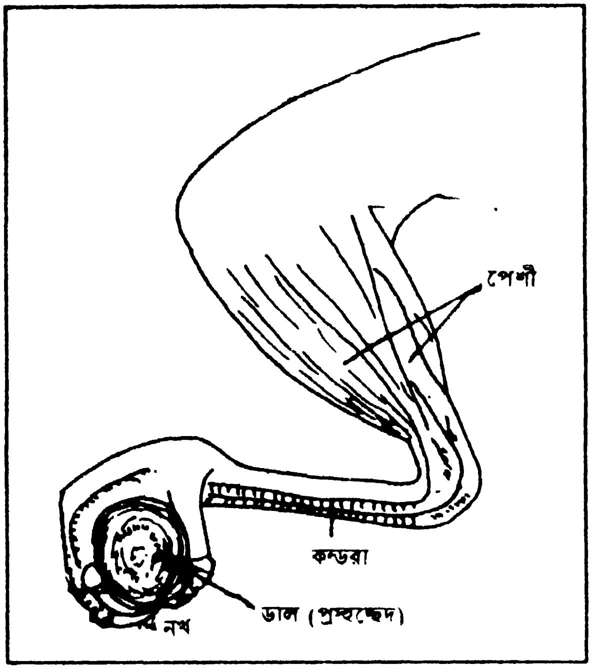
সারাদিন খাবারের খোঁজে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পাখিরা ফিরে আসে নিজেদের বাসায়। বাসা না থাকায় চড়ুই শালিখের মত পাখিরা গাছের ডালে বসে কাটায়। সেখানেই তাদের বিশ্রাম আর ঘুম। কিন্তু বিশ্রামের সময়ে বা ঘুমের ঘোরে ডাল থেকে পাখি নীচে পড়ে গেছে, এমনটি শোনা যায়নি। ঘুমন্ত অবস্থায় পাখিরা ডাল থেকে পড়ে যায় না কেন?

যে-পায়ের সাহায্যে পাখি ডাল আঁকড়ে থাকে, তাতে সাধারণত চারটে আঙুল আছে, এই আঙুলে বেশ বড় বাঁকানো নখ থাকে। এর মধ্যে তিনটে আঙুল থাকে সামনের দিকে আর একটা পিছনের দিকে। আঙুলগুলি



নাড়াচাড়া করবার জন্যে পাখির পায়ে পেশী থাকে। এই পেশীগুলি আঙুল থেকে শুরু এবং উরুতে গিয়ে শেষ হয়। পেশীর শেষ প্রান্ত থেকে এক ধরনের মোটা সুতোর মত অংশ বের হয়, এদের কণ্ডরা বলে। পেশীর কণ্ডরা বিভিন্ন আঙুলে গিয়ে পৌঁচেছে। পায়ের উরু থেকে পেশী হাঁটুর পরে পিছন দিকে ঘুরে আবার সামনের দিকে এসে পৌঁছোয়। তারপরে পেশীর কণ্ডরা সোজা নীচে নেমে সামনের তিনটে আঙুলের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর একটা পেশীর কণ্ডরা আবার পিছন দিকে এসে পিছনের আঙুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে।

পাখি যখন দাঁড়ানো অবস্থায় আছে তখন পেশীর সঙ্গে লাগানো কণ্ডরা সোজা টানটান। এই সময়ে কণ্ডরায় চাপ কম পড়ে বলে পায়ের আঙুলগুলি আলাদা আলাদা থাকে। কিন্তু ডালে বসবার সময়ে সামনের তিনটে আঙুল ডালের



সামনে এবং পিছনের আঙুলটা পিছনে রেখে পাখি ডালটিকে আঁকড়ে ধ'রে আলতোভাবে বসে। পাখি যতই পা মুড়ে বসবার চেষ্টা করে ততই কণ্ডরার টান পড়ে এবং আঙুলগুলোতেও চাপ পড়তে থাকে। তখন সামনের তিনটে আঙুল পিছন দিকে এবং পিছনের আঙুল সামনের দিকে বাঁকতে থাকে। এইভাবে আঙুলগুলো বাঁকতে বাঁকতে সাঁড়াশির মত গাছের ডালকে শক্ত ক'রে ধরে রাখে। পাখির পা যতই ভাঁজ হয়, পায়ের আঙুলগুলি ততই শক্ত ক'রে ডালকে আঁকড়ে ধরে। ঘুমের সময় পাখির শরীরের ভারে পা দু'টো বেশি ভাঁজ হয় বলে এত বেশি শক্ত ক'রে ডালকে আঁকড়ে ধরে যে তা খুলে যেতে পারে না। ফলে ঘুমন্ত পাখি ডাল থেকে পড়েও যায় না।

কুকুর জিভ দিয়ে লালা ঝরায় কেন?

রাস্তার বা বাড়ির যে কোনো কুকুরই হোক না কেন, কিছুক্ষণ দৌড়োদৌড়ি করবার পরই দেখা যায়, ওরা শুয়ে প'ড়ে জিভ বের ক'রে লালা ঝরাচ্ছে। আবার অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে লালা ঝরানো বন্ধ হয়ে যায় এবং কুকুরও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শীতকালে এই ব্যাপারটা কম নজরে এলেও গরমের দিনে লালা ঝরানো খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। তখন শুধু বসে থাকলেও কুকুরকে জিভ বের ক'রে লালা ঝরাতে দেখা যায়।

কিন্তু কুকুর এ-ভাবে কেন লালা ঝরায়?

মানুষের মত কুকুরও উষ্ণশোণিত প্রাণী। অর্থাৎ কুকুরের গা সব সময়ে মানুষের মতই গরম থাকে। শরীরের তাপমাত্রাকে নির্দিষ্ট রাখবার জন্যে মানুষের মত কুকুরের মস্তিষ্কেও হাইপোথ্যালামাস নামের একটা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র রয়েছে।

আমাদের শরীরে চামড়ার তলায় অনেক ঘর্মগ্রন্থি রয়েছে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘর্মগ্রন্থি কখনও ঘাম বের করে কখনও আবার ঘাম বন্ধ ক'রে শরীরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখতে সাহায্য করে। আমাদের জ্বর ছাড়বার সময়ে ঘাম বেরিয়ে যায় এবং জ্বরও আর থাকে না। একেই বলে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া।

কুকুরের সারা গা লোমে ঢাকা থাকে। এমনিতেই লোম শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে অর্থাৎ লোম থাকলে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। এইজন্যেই শীতকালে আমরা পশমের জামা পরি। লোম থাকা ছাড়া কুকুরের চামড়াতে কোনো ঘর্মগ্রন্থি নেই। ঘর্মগ্রন্থি না থাকায় কুকুরের শরীরের তাপ বাড়লেও কুকুর তা ঘামের সঙ্গে বের ক'রে

কুকুর কি ঘামে?

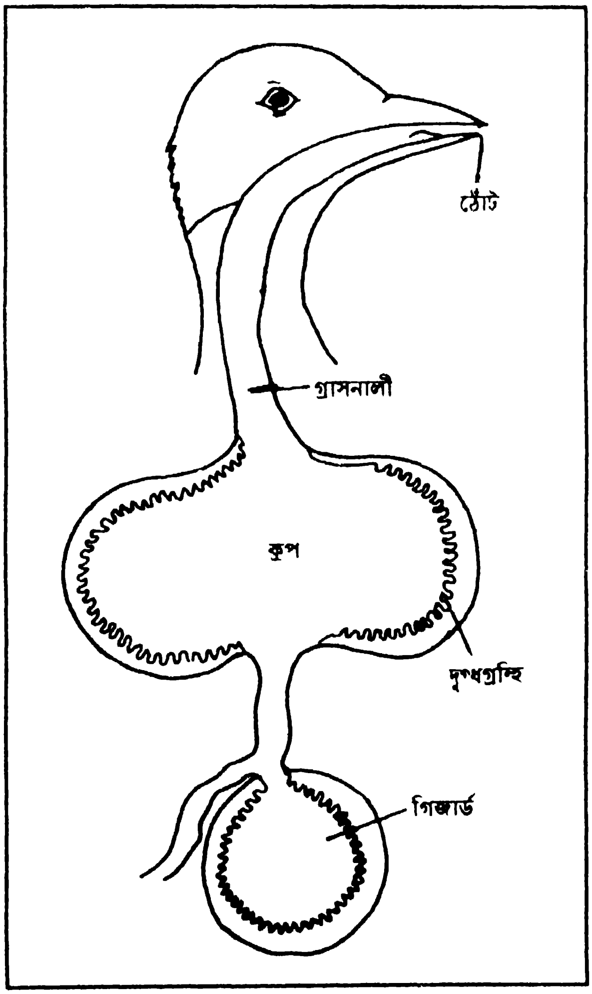
দিতে পারে না। আর তাপ না বেরোলে শরীর ঠিক না থাকারই কথা।

কুকুরের শরীরে মুখই একমাত্র জায়গা যেখানে কোনো লোম থাকে না। এই মুখের ভিতরটাই কেবল সরাসরি বাইরের বাতাসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই অবস্থায় শরীর থেকে বেশি তাপ বের ক'রে দেবার জন্যে কুকুর নিজের জিভকে কাজে লাগায়।

খুব পরিশ্রমে বা গরমে ভেতরকার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে কুকুর জিভ দিয়ে অনবরত লালা ঝরাতে থাকে। লালা গ্রন্থি থেকে লালা ঝরানোর কাজে কুকুর তার শরীরের অতিরিক্ত তাপকে ব্যয় করে। এইভাবে শরীরের তাপ ব্যয় হবার ফলে কুকুরের শরীরের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। শরীরের তাপ নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছোলেই কুকুরের লালা ঝরানো বন্ধ হয়।

মা-বাবা ছাড়া পায়রা-ছানা বাঁচে না কেন?

ডিম ফুটেই পাখির ছানা বেরিয়ে আসে। হাঁস-মুরগির বেলাতেও তাই। ডিম পাড়বার পর পাখি ডিমের উপরে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকে। একেই ডিমে তা দেওয়া বলে। নির্দিষ্ট সময় ধরে ডিমে তা দিলেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। আজকাল অবশ্য পোলট্রির হাঁস-মুরগির ডিম 'ইনকুবেটার' যন্ত্রের ভিতরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রেখে কৃত্রিম উপায়ে ছানা তৈরি হচ্ছে। পোলট্রি-ডিমের ছানা মা-বাবা থেকে আলাদা রেখে খাবার-দাবার দিয়ে ধীরে ধীরে বড় ক'রে তোলা হয়। পায়রা ছানাকে কিন্তু মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা রেখে খাবার-দাবার দিয়েও বড় ক'রে তোলা যায় না। মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা রাখলেই পায়রার ছানা মারা যায়।



পায়রার দুধ জিনিসটা কি?

মা-বাবার কাছ ছাড়া পায়রার ছানা বাঁচে না কেন?

পায়রার খাদ্যনালী গ্রাসনালীর মাঝখানটা ফুলে গিয়ে একটা থলের মত অংশ তৈরি করেছে, একে ক্রপ বলে। ক্রপে অল্প সময়ের জন্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ক্রপের দেওয়ালে অনেক গ্রন্থি থাকে। স্ত্রী-পায়রা যখন ডিম পাড়ে সেই সময়ে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পায়রার ক্রপের গ্রন্থি থেকে দইয়ের মত একরকমের রস বেরোয়, একেই পায়রার দুধ বলে। পায়রার দুধ বেশ পুষ্টিকর। এতে জল, স্নেহবস্তু, প্রোটিন, জল-অঙ্গার বা কার্বোহাইড্রেট থাকে। ছানা দ্রুত বেড়ে ওঠার উপকরণও এতে আছে।

ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবার সময়ে মা ও বাবা পায়রা পালা ক'রে ছানাদের খাওয়াতে শুরু করে। ছানা পায়রা দানা খেতেও পারে না এবং হজম করার ক্ষমতাও তার নেই। এই সময়ে মা-বাবা পায়রা ক্রপ থেকে দুধ বের ক'রে আনে। এই দুধের সঙ্গে খাবার সামান্য পরিমাণে মিলিয়ে একেবারে ছানার মুখের ভিতরে দিয়ে দেয়। ছানা এই খাবার খেয়েই আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে। পরে ভালভাবে পালক ওঠার পরে ছানা যখন উড়তে পারে তখনই সে দানা খেতে আরম্ভ করে। মা-বাবার কাছ থেকে দুধ না পেলে পায়রার ছানা বাড়তেই পারবে না এবং মারা যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, যদি মা-বাবাকে আলাদা রেখে বাচ্চাদের তৈরি খাবার, এমন কি দুধও, খাওয়ানো যায় তাহলেও পায়রার ছানাদের বাঁচানো যায় না। কারণ পায়রার দুধ বাইরে তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা রেখে তাদের ছানাদের বাঁচানো যায় না।

পায়রা কি ক'রে ঘরমুখো হয়?

পাখিদের মধ্যে পায়রাই বোধ করি সব চেয়ে ঘরকুনো। এমন গৃহপালিত পাখি আর দেখা যায় না। কোনো বাড়িতে একটানা অনেকদিন থাকলে দূরে যেখানেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক না কেন তারা ঠিক পথ চিনে সেই বাড়িতেই ফিরে আসবে। একেই পায়রার ঘরে ফেরা বলে।

কিন্তু পায়রা কি ক'রে ঘরমুখো হয়?

পায়রা কিন্তু পরিযায়ী পাখি নয়। তাই পায়রার এই ঘরমুখো স্বভাব বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। প্রথমদিকে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে, কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবার সময়ে পায়রা আশপাশের প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপরে নজর রাখে। ঘরে ফেরার সময়ে সেইগুলো দেখেই সে নিজের বাসস্থানের দিক নির্দেশ করে। পরীক্ষায় দেখা

পায়রা কি পরিযায়ী পাখি?

গেছে যে, পায়রাকে কয়েক শো মাইল দূরে ছেড়ে দিয়ে এলেও সে ঠিক পথ চিনে নিজের ঘরে ফিরে আসে। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, যাবার সময়ে পথের উপরের পাহাড়, নদী, জঙ্গল ইত্যাদি পায়রা ভাল ক'রে লক্ষ্য রাখে। ফলে ওই সব চিনেই সে বাড়িতে ফিরে আসে।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে কারণটি অন্য। পায়রার মস্তিষ্ক এবং করোটির মাঝখানে আকরিক লৌহযুক্ত ম্যাগনেটাইট বা লোডস্টোন জাতীয় বস্তু থাকে। এই বস্তুর সাহায্যে সে পৃথিবীর চৌম্বকীয় মেরুর পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সঠিক অবস্থান জানতে পারে। পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে সে নিজের পথ চিনে নেয় এবং নিজের ঘরে ফিরে আসে।

মৌমাছি ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়ায় কেন?

মৌচাক থেকে মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ে মধুর সন্ধানে। দূরে কোনো ক্ষেতে বা বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল থেকে মধু নিয়ে এসে এরা জমা ক'রে রাখে মৌচাকের ছোট ছোট কুঠুরিগুলিতে। এ-ভাবেই কোনো বাগান বা ক্ষেতের সব ফুলের মধু ফুরিয়ে গেলে এরা অন্য কোনো বাগান বা ক্ষেতের সন্ধান করতে শুরু করে। মৌমাছিরা সব সময়েই মধু সংগ্রহে ব্যস্ত। সে-কাজে কোনো বিরাম নেই। তাই কোনো ক্ষেত বা বাগানের ফুলের মধু ফুরিয়ে গেলেই তখন সবাই ছুটে চলে দিকে দিকে মধুর সন্ধানে।

কিন্তু মৌমাছিদের ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়াতে দেখা যায় কেন?

মধুর সন্ধান ক'রে ফিরে এলেই নজরে আসে যে, একটা মৌমাছি মৌচাকের সামনে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্য সময়ে এ-নাচ দেখা যায় না। নাচ দেখেই অন্য মৌমাছিরা বুঝতে পারে যে, নাচিয়ে মৌমাছি মধুর সন্ধান পেয়েছে। মৌমাছির এই নাচকেই বিজ্ঞানীরা বলেন মৌমাছির ভাষা। নাচিয়ে মৌমাছির নাচ দেখে অন্য মৌমাছিরা তার সঙ্গে যোগ দেয় এবং সবাই মিলে নাচতে থাকে। সূর্যের কৌণিক অবস্থান ও নাচের ধরনের মাধ্যমে নাচিয়ে মৌমাছি অন্যান্য মৌমাছিদের মধুর সন্ধান জানিয়ে দেয়।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, যদি নাচিয়ে মৌমাছি ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে নাচে তাহলে বুঝতে হবে যে, মধুর সন্ধান খুব কাছেই পাওয়া গেছে। তখন অন্য মৌমাছিরা নাচিয়ে মৌমাছির গা থেকে ফুলের গন্ধ শুঁকে নিয়ে মধুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

যখন নাচিয়ে মৌমাছি দু'বার পাক দিয়ে বাংলা চারের মত ঘোরে এবং পিছনটা দোলাতে থাকে তখন বুঝতে হবে

মৌমাছির ভাষা কাকে বলে?

যে, মধুর অবস্থান রয়েছে বেশ কিছুটা দূরে। কিন্তু তা কতটা দূরে, তা বোঝা যাবে তার দুলুনি লক্ষ্য ক'রে। দূরত্ব যদি কম হয় তাহলে পিছনটা দোলাবে বেশি, কিন্তু দূরত্ব যদি কম না হয়ে বেশি থাকে তা হলে পিছনটা সে কম দোলাবে।

অনেক বিজ্ঞানীর মতে, পিছন দোলানোর সময়ে মৌমাছি ঘন ঘন ডানা নাড়াতে থাকে। এই ডানা নাড়ানোর শব্দ থেকেই মধুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্য মৌমাছিরা জানতে পারে।

মৌমাছির ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়ানোর কারণ অন্য মৌমাছিদের মধুর খবর জানানো।

জলের তলায় কাছিমের দম বন্ধ হয় না কেন?

আর পাঁচটা স্থলজ প্রাণীর মতই কাছিমও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফুসফুসের সাহায্যে নিয়ে থাকে। বাইরে থেকে নাকের ফুটো দিয়ে বাতাস নিয়ে সে ফুসফুস দু'টো ভর্তি করে। আবার ফুসফুস থেকে বাতাস বাইরে বের ক'রে দেয় নাকের ফুটো দিয়েই। যে-কোনো ফুসফুসওলা স্থলজ প্রাণীকে কিছুক্ষণ

জলের তলায় রাখলেই সে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। অর্থাৎ প্রাণীটির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হবে, আর তা থেকেই তার মৃত্যু ঘটবে। মানুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

অবশ্য ব্যাঙ এবং কুমিরেরও ফুসফুস থাকে। অথচ এরাও জলের প্রাণী। কিন্তু এরা জলের প্রাণী হলে কি হবে, সব সময়ে এরা জলের তলায় থাকে না। ব্যাঙ বা কুমির কিছুক্ষণ পরপরই জলের উপরে ভেসে ওঠে, অথবা জলের উপরে নাকের ফুটো দু'টোকে ভাসিয়ে রেখে নিজে জলের তলায় ভাসতে থাকে। জলের উপরে নাকের ফুটো থাকায় ব্যাঙ ও কুমির সহজেই বাতাস নিয়ে শ্বাসকার্য চালাতে পারে।

কিন্তু আমরা জানি, কাছিম যখন ডাঙায় থাকে তখন ফুসফুস দিয়েই সে তার শ্বাসকার্য চালায়। অনেক সময়ে জলে,ভেসে থাকা অবস্থায় নাকটাকে জলের উপরে রেখে বাইরে থেকে বাতাস টানে। কিন্তু কাছিম অনেক সময়েই জলের বেশ গভীরে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে থাকে। ফুসফুস দিয়ে জল থেকে বাতাস বা অক্সিজেন গ্রহণ করা যায় না। তা ছাড়া মাছের মত কাছিমের ফুলকো নেই। সুতরাং এ রকম প্রাণীর পক্ষে অনেকক্ষণ জলের তলায় থাকলে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু কাছিমকে জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে দেখা যায় না। কেন?

কাছিমের পৌষ্টিকনালী বা খাদ্যনালীর প্রথম দিকটা, অর্থাৎ গলার পিছনটায় এবং খাদ্যনালীর শেষ অংশটায়—যেখানে মল জমা থাকে, সেই অংশ দু'টিতে ভিতরকার চামড়া খুবই পাতলা হয়। তা ছাড়া এতে রক্তনালী এত বেশি ক'রে থাকে যে, ওই অংশগুলি মাছের ফুলকোর মত লাল দেখায়। ওই অংশ দু'টির কাজও অনেকটা মাছের ফুলকোর মত। কাছিম জলে ডুবে থাকাকালীন ফুসফুসের মুখটাকে বন্ধ ক'রে রাখে, যাতে ওতে জল ঢুকতে না পারে। সেই সময়ে সে মুখ দিয়ে এবং পায়ু দিয়ে বারেবারে খাদ্যনালীতে জল ঢোকাতে থাকে। ওই জল রক্তনালী সমৃদ্ধ ত্বকের সংস্পর্শে এলে মাছের ফুলকো যে-ভাবে জল থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়, ঠিক তেমনিভাবে কাছিমের শ্বাসকার্য চলে। অর্থাৎ জলে ডুবে থাকাকালীন কাছিম এই গৌণ শ্বাস অঙ্গ দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। ফলে তার দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার কোনো কারণ ঘটে না।

বাঁশির সুরে সাপ মাথা দোলায় কেন?

সাপুড়ের বাঁশির দোলায় সাপ মাথা দোলায় এ আমরা সবাই দেখেছি। সাপুড়ের বাঁশির লাউ পেট, লম্বা তার লেজ। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে সাপুড়ে যখন বাঁশির লম্বা লেজ দোলায় ডাইনে-বাঁয়ে, তখন সাপও মাথা দোলাতে থাকে; একবার ডানদিকে, আর একবার বাঁদিকে।

কিন্তু বাঁশির তালে তালে সাপ মাথা দোলায় কেন?

সাপুড়ের বাঁশির সুরের সঙ্গে সাপের ফণা ধরার একটা যোগ আছে বলে সাধারণ মানুষে মনে করে। তা থেকেই একটা ধারণা হয়েছে যে সাপ শুনতে পায়। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সাপ কিন্তু শুনতে পায় না। বিশ্বাসীরা বলবেন, তাহলে সাপ বাঁশির শব্দে ফণা ধরে কেন, আবার মাথাই বা দোলায় কেন? সাপুড়ের লাউবাঁশির নড়াচড়ার তালে তালে সাপ যে মাথা দোলায়, এ-ব্যাপারে কোনো ভুল নেই। তাহলে? সাপের কান না থাকলেও সাপ কেন লাউবাঁশি দেখে ফণা তোলে?

যে-সব সাপ ফণা ধরে তাদের এমন বৈশিষ্ট্য যে, তারা ফণা না তুলে শত্রুকে আক্রমণ করতে পারে না। সাপুড়ের বাঁশির লম্বা লেজটিকে সাপ শত্রু মনে করে। সেইজন্যে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাপ ফণা তোলে। এটা ফণাওলা সাপের সহজাত ব্যাপার। এর সঙ্গে বাঁশির শব্দের কোনো সম্পর্কই নেই। যদি বাঁশির বদলে সামনে একটা কাঠি ধরা হত তাহলেও সাপ ওই রকমই ফণা তুলতো। তবে যে-সব সাপ ফণা তুলতে পারে না, তারা কিন্তু সাপের বাঁশি দেখেও ফণা তুলবে না।

সেইজন্যেই বাঁশির সুরের তালে সাপ মাথা দোলায়, এমন ধারণার কোনো মূল্য নেই। তার মাথা দোলাবার কারণ আলাদা। কোনো জিনিস স্থির থাকলে সাপের চোখও স্থির হয়ে পড়ে। আবার সামান্য নড়লে সাপের চোখও জিনিসটির সঙ্গে সঙ্গে নড়াচাড়া করে, ফলে তার মাথাও এ-পাশ ও-পাশ হয়। সাপুড়ে যতক্ষণ তার লাউবাঁশির লেজটি দোলায় সাপের মাথাও সেই তালে তালে দুলতে থাকে। আর লাউবাঁশির শব্দ না থেমে যদি নড়াচড়া থেমে যায় তাহলে সাপের মাথা দোলানোও থামে। বাঁশির সুর বন্ধ না হলেও তার মাথা আর দোলে না। বাঁশির সুরে সাপ যদি মাথা দোলাতো, তাহলে বাঁশিটির নড়চড়া থামানোর পরেও

সাপের মাথা দুলতো. আসলে লাউবাঁশির লেজটিকে শত্রু মনে ক'রে সাপ তার মাথাটিকে সমান তালে দোলায়—

সাপ কি কানে শুনতে পায়?

বাঁশি তাক ক'রে শুধু সুযোগের সন্ধান খোঁজে, ঠিক কখন ছোবল মারা যায়।

কাকের বাসায় কোকিল কেন ডিম পাড়ে?

পাখির ডিম পাড়ার সময় হলেই দেখা যায়, সে খড়কুটো নিয়ে নিজের বাসা তৈরি করে। পাখির স্বভাবই এই।

তাহলে কোকিল কেন নিজের বাসায় ডিম না পেড়ে হঠাৎ কাকের বাসায় ডিম পাড়তে যায়?

এ-ব্যাপারটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, অন্য পাখিদের মত কোকিলের বাসা বাঁধবার কোনো রকমের প্রবণতা দেখা যায় না। ডিমে তা দেওয়া বা ডিম ফুটে বাচ্চা হলে খাবার জোগাড় ক'রে আনা—এ তো মায়ের কাজ। কিন্তু মেয়ে কোকিলের এ-রকম কাজে আগ্রহ নেই। মেয়ে কোকিল কি ইচ্ছে ক'রেই এমনটি ক'রে থাকে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, না, তা ঠিক নয়। সব জীবেরই নানা রকমের কাজের যে- প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা শরীরের ভিতরে তৈরি হওয়া কতকগুলো হর্মোনের প্রভাবে ঘটে। এর মধ্যে আছে, পাখিদের ডিমে তা দেওয়া এবং ছানাকে খাওয়ানোর মত এক-একটি ঘটনা। পাখিদের এই সব ব্যাপারের মূলে রয়েছে প্রোল্যাকটিন নামের এক ধরনের হর্মোন। পাখির মস্তিষ্কের পিট্যুইটারি গ্রন্থি থেকেই

[illegible] কোকিলের কি [illegible] নেই?

প্রোল্যাকটিনের ক্ষরণ ঘটে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মেয়ে কোকিলের বেলায় তাদের শরীরের ওই প্রোল্যাকটিন হর্মোন ক্ষরিত হয় না। ফলে তাদের মাতৃত্বও জাগে না।

কিন্তু মাতৃত্ব না জাগলেও কোকিল ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়াও দরকার—তাই কোকিলকে কোনো উপায় বের করতে হয়। এ-ব্যাপারে কোকিলের বুদ্ধি কাকের চেয়ে অনেক বেশি। মেয়ে কোকিল ডিম পাড়ার আগে দেখে নেয়, কোন কাকের বাসায় সদ্য ডিম পাড়া হয়েছে। কোকিল দেখলেই কাক তাড়া ক'রে আসে বলে তাকে ফাঁদে ফেলতে বাবা-কোকিল কাকের বাসার সামনে ঘোরাফেরা করতে থাকে। কাক বাবা-কোকিলকে দেখে বাসার বাইরে এসে তাকে তাড়া করে। বাবা-কোকিল তখন উড়তে উড়তে কাককে বাসার অনেক দূরে নিয়ে যায়। এই সুযোগে কাকের বাসা ফাঁকা পেয়ে মা-কোকিল সেখানে ডিম পাড়ে। আর ডিম পাড়া হয়ে গেলে মা-কোকিল সংকেতে বাবা-কোকিলকে তা জানিয়ে দেয়। তখন বাবা-কোকিলের কাজ শেষ। অতএব সে খুবই দ্রুত উড়ে কাকের নাগালের বাইরে পালিয়ে যায়। আর বেচারা কাক নিজের বাসায় ফিরে আসে। কিন্তু কোকিলের ডিম কাকের ডিমের মত দেখতে হওয়ায় সে কোকিলের ডিম চিনতে পারে না। নিজের ডিম মনে ক'রে বাচ্চা না ফোটা পর্যন্ত তাতেই সে তা দিতে থাকে। [দ্রষ্টব্য ঃ কাক কি ভাবে কোকিলের চালাকির কাছে হার মানে? (বিচিত্র পক্ষিজগৎ)]

মাছ কেন হাঁপি কাটে?

যে-কোনো জলে মাছকে সামনে থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মাছ একবার মুখ হাঁ করছে আবার বন্ধ ক'রে নিচ্ছে। মাছের এ-কাজের যেন বিরাম নেই। মাছের ঠোঁট দুটো ফাঁক আর বন্ধ করার ব্যাপারটাকে হাঁপি কাটা বলে। হাঁপি কাটার সঙ্গে মাছের কানকোর নড়াচড়াও নজরে আসে। লক্ষ্য করার ব্যাপার, মাছের মুখ যখন খোলা, কানকো তখন চাপা থাকে আর মাছের মুখ বন্ধ হলেই কানকো খুলে যায়।

কিন্তু মাছের হাঁপি কাটার কারণ কি?

মাছের গলার দু'পাশেই কানকোর ঠিক তলায় কয়েক সারি চিরুনির মত দেখতে অঙ্গ আছে। এদের ফুলকা বলে। ফুলকাগুলি আলাদা আলাদা ঘরের মত অংশে সাজানো থাকে। এদের ফুলকা প্রকোষ্ঠ বলা হয়। ভিতর দিকে ছোট ছোট ছিদ্রপথে ফুলকা প্রকোষ্ঠ গলার সঙ্গে যুক্ত। এগুলি কানকোর দিকে খোলা থাকে।

ফুলকার ভিতর ছোট ছোট পাতার মত অংশ আছে। এই পাতাগুলিতে অনেক রক্তজালক থাকে বলে এদের রঙ রক্তের মত হয়। মাছের ফুলকাই হল শ্বাস-অঙ্গ। ফুলকা

দিয়েই মাছ জল থেকে অক্সিজেন গ্যাস নেয় এবং রক্ত থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলে বের ক'রে দেয়। এ-ভাবেই মাছের শ্বাসকার্য চলে।

মাছ মুখ হাঁ ক'রে গলাটাকে ফুলিয়ে মুখের ভিতর জল টেনে নেয়। এই জল যাতে পেটে না চলে যায় তার জন্যে সেই পথটিকে বন্ধ ক'রে রাখে। এরপরে মুখ বন্ধ ক'রে নেয়। আর মুখ বন্ধ করবার পরে মুখ এবং গলার পেশীর চাপে মুখ ও গলা ছোট হয়ে পড়ে। মুখ বন্ধ, পেটের দিকও বন্ধ, শুধু ফুলকার দিক খোলা। তাই জল ফুলকা ছিদ্র দিয়ে ফুলকা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। ফুলকার উপর দিয়ে জল চলে যাবার সময়ে রক্ত ও জলের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিনিময় ঘটে। জলের চাপে কানকোর পিছন দিকটা খুলে যায় আর ওই পথেই জল ফুলকা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

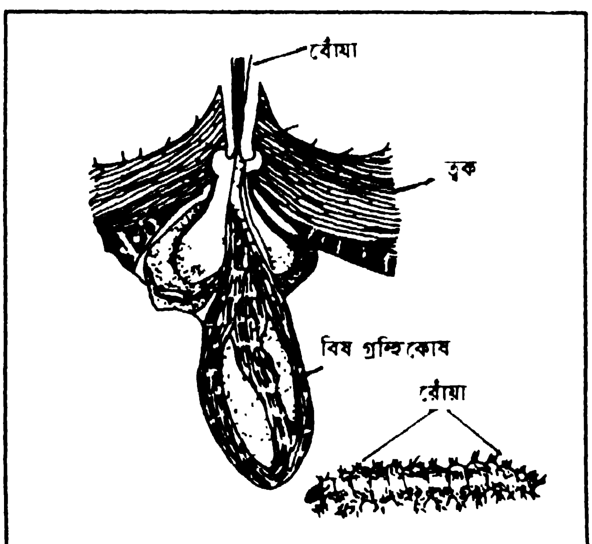
মাছ শ্বাসকার্য চালানোর জন্যই হাঁপি কেটে থাকে।

শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে জ্বালা করে কেন?

শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে আর রক্ষে নেই। যেখানে লাগবে সেখানে তো জ্বালা ধরবে, তা ছাড়া গা চুলকোতে থাকবে আর সেই চুলকুনি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে জ্বালা ধরে কেন?

শুঁয়োপোকার সারা শরীর ছোট ছোট রোঁয়ায় ঢাকা থাকে। কাঁটার মত এই রোঁয়ার ভিতরটা ফাঁপা, আর তার



ভিতরে থাকে বিষ। রোঁয়ার তলায় চামড়ার ভিতরেও বিষের থলি আছে।

শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে ওর রোঁয়াগুলো এবং রোঁয়ার সঙ্গের বিষের থলি শুঁয়োপোকার গা থেকে খুলে পড়ে এবং মানুষের গায়ে আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চামড়ায় জ্বালা ধরে, চামড়া ফুলে যায় এবং চুলকুনি আরম্ভ হয়। চুলকুনির সঙ্গে বিষের থলিতে চাপ পড়ে এবং বেশি ক'রে বিষ শরীরে ঢুকে যায়। ফলে জ্বালা এবং চুলকুনি আরো বাড়তে থাকে। তা ছাড়া চুলকুনির সঙ্গে রোঁয়াগুলোও সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সারা গায়ে তখন চুলকুনি আরম্ভ হয়, আস্তে আস্তে চামড়া ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে ওঠে। আর যতক্ষণ বিষের চিহ্ন থাকে ততক্ষণ জ্বালা করে। তারপর ধীরে ধীরে জ্বালা কমে আসে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শুঁয়োপোকার রোঁয়া এবং বিষের থলিতে হিস্টামিন জাতীয় কোনো রাসায়নিক পদার্থ থাকার জন্য রোঁয়া গায়ে লাগলে জ্বালা করে। তাঁদের আরো ধারণা যে, বিষে প্রোটিন পাচক উৎসেচক থাকার জন্যই জ্বালা এত তীব্র। এই জ্বালার তেমন কোনো ওষুধ নেই, তবে নুন, সোডা ইত্যাদি লাগালে জ্বালা কিছুটা কমে। চামড়া ঠাণ্ডা থাকে এমন কোনো লোশন লাগালেও জ্বালার উপশম হয়।

গাড়িটানা ঘোড়ার চোখ ঢাকা থাকে কেন?

পশ্চিমের অনেক শহরেই ঘোড়ায় গাড়ি টানে। এক্কা চলেছে, টাঙ্গা ছুটেছে। এক্কা বা টাঙ্গাওলার হাতে ধরা দড়ির টান সে অমান্য করে না। কিন্তু সব সময়েই দেখা যায়, এক্কা বা টাঙ্গা গাড়ি যাই হোক না কেন, ঘোড়ার চোখ দু'টো পাশের দিকে বরাবর ঢাকা থাকে। কিন্তু কেন?

ঘোড়ার চোখ দুটো মাথার দু'পাশে থাকে। অর্থাৎ ঘোড়া এক একটা চোখ দিয়ে তার এক এক পাশের জিনিস দেখে। সে বাঁ চোখ দিয়ে লক্ষ্য করে শুধু বাঁ দিকে যা আছে। ওই চোখে ডান দিকের কোনো কিছুই সে দেখতে পাবে না। তেমনি ডান চোখে তার নজরে আসে শুধুই ডান দিকের জিনিস। বাঁ দিকের সব কিছুই তার দৃষ্টির বাইরে রয়ে যাবে। অর্থাৎ ঘোড়ার পক্ষে কোনো একটা নির্দিষ্ট জিনিস একই সঙ্গে দু'চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। এ-ধরনের ব্যাপারকে একনেত্র দৃষ্টি বলে।

ঘোড়া যেমন পাশের দিকে দেখতে পায়, তেমনি পিছন দিকে যা আছে তাও তার নজরে আসে। কিন্তু সামনের কোনো কিছু দেখতে হলে ঘোড়াকে তার চোখ দু'টো একই সঙ্গে এমনভাবে সামনের দিকে ঘোরাতে হয় যাতে সেটিকে সে একই সঙ্গে দু'চোখ দিয়ে দেখতে পারে। অর্থাৎ ঘোড়ার পক্ষে সামনের কোনো কিছু দেখা বেশ কষ্টকর। বরং সহজ পাশের এবং পিছনের জিনিস দেখা। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় ঘোড়ার দৃষ্টি বারেবারে পিছন দিকে চলে যায়।

ঘোড়ায় টানা গাড়িতে লোকেরা ঘোড়ার পিছন দিকেই বসে। তাই ঘোড়ার চোখ ঢাকা না থাকলে তার নজর

[illegible]

বারেবারেই পিছনে বসা লোকগুলোর দিকে পড়তো। ফলে ঘোড়া সামনের দিকে ঠিকমত চলতে পারতো না। কিন্তু ঘোড়ার চোখ পাশ থেকে কোনো ঢাকা দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলে তার পাশে এবং পিছনে দেখার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকনার সামনের দিকটা থাকে খোলা। সেইজন্যে ঘোড়া শুধু সেই দিকেই চোখ দু'টোকে ঘুরিয়ে সামনের দিকে দেখতে পারে। আর তখন সে সামনের দিকে ঠিকমত পথ চলে।

পাখিরা পরিযাণ কেন করে?

শীতকালে কলকাতার চিড়িয়াখানায় গেলে সেখানকার হ্রদে নানা ধরনের নতুন নতুন পাখি দেখা যায়। এরা সব আগন্তুক পাখি। শীতের শুরুতে এরা আসে আবার বসন্তের শেষে গরম পড়বার আগেই উড়ে চলে যায়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, একই পাখি কয়েক বছর ধরে নির্দিষ্ট সময়ে একটি জায়গাতেই আসছে, যেমন কলকাতার চিড়িয়াখানার হ্রদে, তেমনি ভারতবর্ষের অন্যান্য হ্রদেও। যে-সব হ্রদ খুবই নিরাপদ সেখানেই এ-ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। ভরতপুরের হ্রদে পাখির আনাগোনা খুবই বেশি। দূর-দূরান্ত থেকে পাখির উড়ে আসাকে বিজ্ঞানের ভাষায় পরিযাণ বলে। পাখিরা কেন পরিযাণ করে?

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, পাখিদের পরিযাণ খুবই নিয়ম ধরে হয়। পরিযাণের সময় মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট থাকে এবং পরিযাণের পথও থাকে অপরিবর্তিত। একাধিক ধরনের পাখি আছে যারা পরিযাণের সময়ে কয়েক হাজার মাইল অতিক্রম করে। কিন্তু পাখিরা এত নিঁখুতভাবে পরিযাণ করে কি ক'রে? সঙ্গে কোনো কম্পাস নেই, অথচ এমন নিঁখুত পথ চলা, ভাবলে অবাক না হয়ে উপায় নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, যে-সব পাখি দিনের বেলায় দূর-দূরান্ত পাড়ি দেয়, তারা সূর্যের অবস্থান দেখে তাদের দিক ঠিক করে। কিন্তু যে-সব পাখি রাত্তিরে পরিযাণ করে তাদের অবলম্বন আকাশের কোনো নির্দিষ্ট নক্ষত্র। বিভিন্ন তারার অবস্থান দেখে কোনো নির্দিষ্ট তারাকে অনুসরণ ক'রে তারা পরিযাণ ক'রে থাকে। অনেকের ধারণা, পরিযায়ী পাখিরা পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে নিজেদের পরিযাণ পথ ঠিক করে। পরিযাণের আগে পৃথিবীর আবহাওয়া কী রকম থাকবে, পাখিরা তার একটা ধারণা ক'রে নেয়। আবহাওয়ার হালচাল পাখিরা আগে থেকেই বুঝতে পারে। যদি আবহাওয়া খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে তবে পরিযাণের সময় তারা কিছুটা পিছিয়ে দেয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, খাবারের স্বল্পতা, অত্যধিক শীত, ছোট মাপের দিন ইত্যাদি বাহ্যিক কারণের জন্যেই পাখিরা পরিযাণ ক'রে থাকে। পরিযাণের আগে থেকেই পাখিদের শরীরে এমন কতকগুলো পরিবর্তন ঘটতে থাকে যা পাখিদের পরিযাণের আভ্যন্তরীণ কারণ। দিন ও রাত্রির সময়ের পার্থক্য পাখিদের শরীরের পিনিয়াল গ্রন্থিকে সক্রিয় ক'রে তোলে। এর ফলে পাখির পিট্যুইটারি গ্রন্থিও সক্রিয় হয়। এরপর পাখির শরীরে চর্বি জমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে শরীরের ভিতরে অস্থিরতা ফুটে ওঠে। এই অস্থিরতার ফলেই পাখি পরিযাণ শুরু ক'রে দেয়। অর্থাৎ বাহ্যিক কারণ এবং আভ্যন্তরীণ হর্মোনের প্রভাবেই পরিযায়ী পাখি পরিযাণ শুরু করে। [দ্রষ্টব্যঃ কোনো কোনো পাখি শুধু 'শীতের অতিথি' হয়েই আমাদের দেশে আসে কেন? (বিচিত্র পক্ষিজগৎ)]

সাপের গা ঠাণ্ডা হয় কেন?

সাপের গায়ে সচরাচর হাত লাগে না। তবে রাতের অন্ধকারে গায়ের উপর দিয়ে চলে যাওয়া সাপের ছোঁয়ায় শরীরের ভিতরে যে একটা শিরশিরে ভাব এনে দেয় এ-অভিজ্ঞতা গাঁয়ের লোকের আছে। হিমশীতল কোনো কিছুর

স্পর্শ পেলেই মন বলে ওঠে এটা সাপ।

সাপের গা যে ঠাণ্ডা, তা ঠিক। কিন্তু কেন? সব জীব-জন্তুরই শরীরের ভিতরে খাদ্য অণু ভেঙে শক্তি তৈরি হয়। তা দিয়েই তারা শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখে। স্তন্যপায়ী এবং পাখিদের বেলায় তারা নিজেদের শরীরের তাপমাত্রা মোটামুটি নির্দিষ্ট রাখতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা কমলে বা বাড়লে পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী নানাভাবে শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে বা কমিয়ে শরীরকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়

সাপেরা গায়ের তাপমাত্রা কি মানুষের মত নির্দিষ্ট রাখতে পারে না?

নিয়ে আসে। শরীরের তাপ যাতে বেরিয়ে না যায় সেইজন্যে পাখিদের পালক আছে আর স্তন্যপায়ীদের রয়েছে পুরু চামড়া। মানুষের বেলায় কি হয়? আমাদের শরীরের তাপ বেড়ে গেলে চামড়ার ঘর্মগ্রন্থি থেকে কিছুটা ঘাম ঝরিয়ে তাপ বের ক'রে দেয়। ফলে শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়। আবার শরীরের তাপ কমে গেলে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যাবার পথগুলি বন্ধ ক'রে দেয়, ফলে শরীরের তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। এ-ছাড়াও শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্যে মস্তিষ্কে একটা জায়গা আছে। এর নাম হল হাইপোথ্যালামাস। এই হাইপোথ্যালামাস শরীরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখতে সাহায্য করে।

সাপের বেলায় শরীরের অনুপাতে তাপ এমনিতেই খুব কম তৈরি হয়। সাপের বিপাক ক্রিয়ার হার স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়ে অনেক কম বলেই তার শরীরে তাপ কম তৈরি হয়। ফলে তাপমাত্রা অনেকটা কমই থাকে। তা ছাড়া সাপের চামড়া থেকে সব সময়েই জল বাষ্পাকারে উবে যায়। জলকে বাষ্পে পরিণত করবার জন্যে সাপের চামড়া শরীর থেকে অনেকটা তাপ নিয়ে নেয়। সেইজন্যে তার শরীরের তাপমাত্রা আরো কমে যায়।

সাপের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হার মানুষের তুলনায় অনেক কম, কিন্তু তবুও নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিছুটা তাপ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। যার ফলে তাপমাত্রা আরো কিছুটা কমে। তা ছাড়া মানুষের হাইপোথ্যালামাস যতটা কাজের হয় সাপের হাইপোথ্যালামাস ততটা কাজের হয় না। ফলে সাপের হাইপোথ্যালামাস তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখতে তেমন কোনো সাহায্য করে না।

সেই কারণেই সাপের শরীরের তাপমাত্রা অনেকটা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। খটখটে রোদ্দুরে সাপ শরীর বিছিয়ে শুয়ে থাকে শুধু সূর্য থেকে তাপ নেবার জন্যে। এই তাপ সাপের শরীরের তাপমাত্রা অনেকটা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু বেশি তাপ আবার সাপের সহ্য হয় না। তাই অতি গরমে সাপ গর্তে কিংবা জলে থাকতে ভালবাসে। শীতকালে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যায় বলে সাপ বিড়ে পাকিয়ে থাকে, অথবা গর্তে ঢুকে গা গরম করে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে, সাপের চামড়ার নানারকমের রঙ পরিবেশ থেকে তাপ নিতে সাহায্য করে এবং শরীর থেকে তাপ বেরোতে বাধা দেয়।

সাপের শরীরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখার সুবন্দোবস্ত নেই বলেই তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

চোখ-না-ফোটা বাচ্চা ইঁদুর কি ক'রে মাকে চেনে?

ঘরের ভিতরে পুরনো জুতোর বাকসো কিংবা আবর্জনার স্তূপের ভিতর থেকে চিঁ চিঁ শব্দ শুনে আমরা বুঝতে পারি যে, ওখানে ইঁদুর বাচ্চা পেড়েছে।

ছোট ছোট বাদামী রঙের গোটা কয়েক ইঁদুরের বাচ্চা একসঙ্গে শুয়ে রয়েছে আর মাঝে মাঝে চিঁ চিঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই সময়ে ইঁদুরের বাচ্চাদের চোখ ফোটে না। বাইরের কোনো কিছুই ওদের নজরে আসে না। কিন্তু ওদের মা এলেই ওরা ঠিক বুঝতে পারে এবং খাবারের আশায় হাঁ ক'রে থাকে। চোখ বন্ধ কিন্তু মা এলে মাকে চিনতে পারছে।

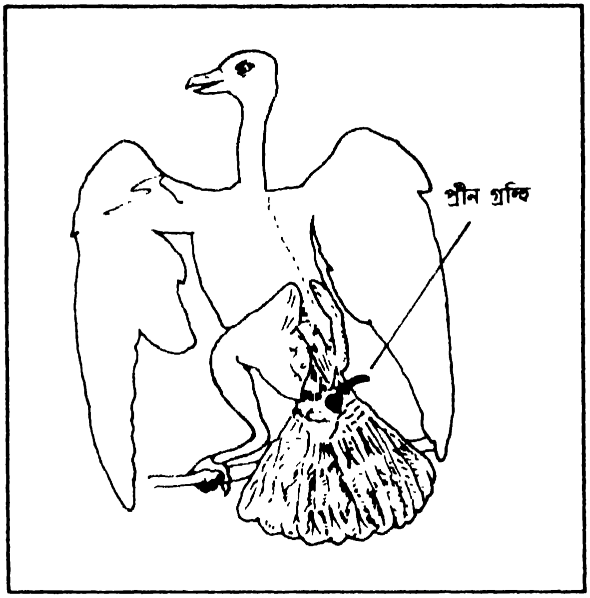
বাচ্চা ইঁদুর কি তার বাবাকে চিনতে পারে?

অথচ বাবা এলে? দেখা গেছে, বাবাকে তারা চিনতে পারে না। এটা কেন হয়?

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন যে, এটা সম্ভব হয়েছে গন্ধ শুঁকে। জীবজগতে সব প্রাণীরই, এমন-কি, মানুষেরও শরীর থেকে এক ধরনের গন্ধ বেরোয় যা ঠিক একই জাতের অন্য প্রাণী চিনতে পারে।

বাচ্চা হবার পর মা-ইঁদুরের মলে এক ধরনের গন্ধ মেশানো থাকে যা, মা-ইঁদুরের শরীরেও পাওয়া যায়। এই

গন্ধ শুঁকেই বাচ্চা ইঁদুর জানতে পারে যে, তার মা এসেছে এবং তখনই খাবারের জন্য ছটফট করতে থাকে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, বাচ্চা হবার পর মা-ইঁদুরের শরীর থেকে মলভাগে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয়। এই রাসায়নিক বস্তুকেই বিজ্ঞানীরা ফেরোমোন বলেছেন। মলের সঙ্গে এই বস্তু বেরিয়ে এসে যে-গন্ধের সৃষ্টি করে, তাই বাচ্চা ইঁদুরদের মাকে চিনতে সাহায্য ক'রে থাকে। অর্থাৎ অন্ধ বাচ্চা ইঁদুর ফেরোমোনের গন্ধ শুঁকেই নিজের মাকে চিনতে পারে।



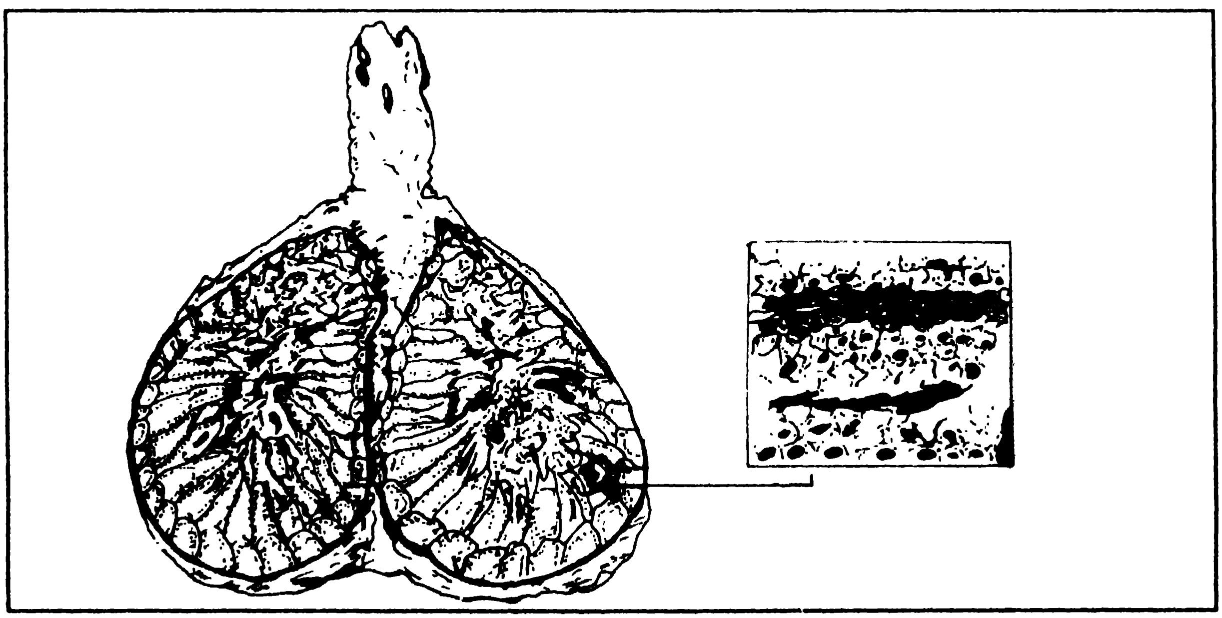
পায়রা ঠোঁট দিয়ে পালক ঘষে কেন?

পায়রার রকম-সকম বোঝাই ভার। ঘুলঘুলিতে পায়রাকে যখন লক্ষ্য করি, তখন দেখি সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। সর্বদাই মাথা নাড়ায়, এদিক-ওদিক তাকায়। আবার মাঝে মাঝে মাথা বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে পালক চুলকোয় বা পালকের উপর ঠোঁট ঘসে চলে।

পায়রাকে কেন ঠোঁট দিয়ে পালক ঘষতে দেখা যায়?

পায়রার এ-ধরনের ব্যবহার দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, পায়রা নিজেকে খুব পরিষ্কার রেখে যেন সব সময়েই সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে।

বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান ক'রে দেখেছেন যে, পায়রার এ-ধরনের ব্যবহার নিছক সেজেগুজে থাকবার জন্যে নয়। এর ভিতরে পায়রার নিজের প্রয়োজনের তাগিদও রয়েছে। সব পাখির মত পায়রাও চায় তার পালকগুলো যেন পরিষ্কার থাকে, তাতে যেন কোনো নোংরা না জমে, জীবাণু যেন বাসা না বাঁধে, কিংবা তা যেন জলে ভিজে না যায়। পালকগুলো ঝকঝকে তকতকে রাখার জন্যেই ঠোঁট দিয়ে



প্রীন গ্রন্থির লম্বচ্ছেদ

পায়রা ঘনঘন পালক চুলকোয়।

পায়রার লেজের শেষদিকে পালকের ভিতরে একটা গ্রন্থি লুকনো থাকে। একে য়ুরোপাইজিয়াল গ্রন্থি বা প্রীনগ্রন্থি বা তৈলগ্রন্থি বলে। এই তৈলগ্রন্থি থেকে এক ধরনের তেল বেরোয়। পায়রা মাঝে মাঝে লেজের পালক তুলে ওই তৈলগ্রন্থিতে ঠোঁট ডুবিয়ে কিছুটা তেল ঠোঁটে লাগিয়ে আনে। এইবারে সেই ঠোঁট দিয়ে গায়ের পালকগুলো ঘষে ঘষে

বৃষ্টির জলে পায়রার পালক ভেজে কি?

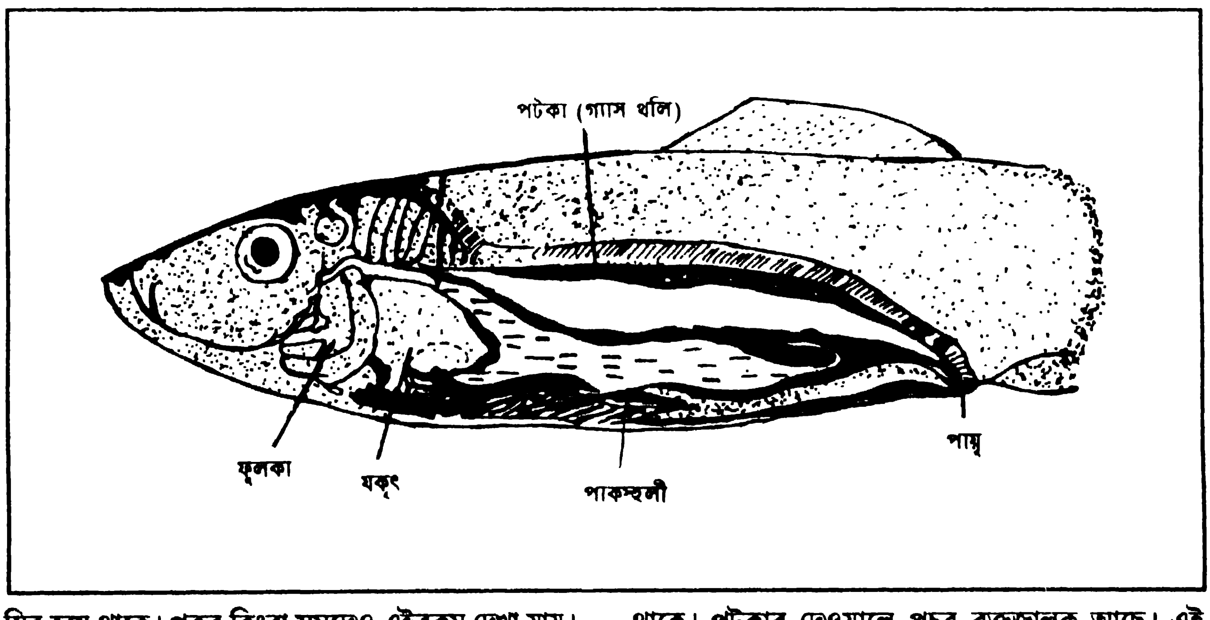
পালকে তেল লাগাতে থাকে। তেল লেগে পালকগুলো তেলতেলে হয়। ফলে বৃষ্টির জল লাগলেও পায়রার পালক ভেজে না। সে-জন্যে পায়রা বৃষ্টিতেও ডানা ছড়িয়ে উড়তে পারে। আর পালকে তেল লাগলে কোনো জীবাণুর বাসা বাঁধাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঠোঁটের ঘষায় পালকগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়।

মাছ জলে ভাসে কেমন ক'রে?

বাড়িতে অ্যাকুয়ারিয়মে নজরে আসে, মাছ কখনও জলের একেবারে নীচে আবার কখনও একেবারে উপরে দাঁড়িয়ে ভাসতে থাকে। যে-মাছ জলের বিভিন্ন তলে স্থির হয়ে ভাসতে পারে তারা কিন্তু কোনো সময়েই এক জায়গায় ভাসে না, কখনও উপরে উঠে আসে আবার কখনও নীচে নেমে যায়।

মাছ এইভাবে জলের বিভিন্ন তলে ভাসে কেমন ক'রে?

মাছ যখন জলের উপর দিকে থাকে তখন তার উপর জলের চাপ কম পড়ে আর নীচে থাকলে বেশি। অর্থাৎ জল যত গভীর হবে চাপ ততই বাড়বে। মাছ যখন একটা নির্দিষ্ট স্থানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভাসে তখন তার শরীরের ওজন শরীরের সম-আয়তন জলের ওজনের সঙ্গে সমান। কিন্তু মাছের শরীরের ওজন তো হঠাৎই বাড়বে বা কমবে না। তাহলে মাছ হঠাৎই বা জলের উপরে-নীচে ওঠা-নামা কেন করবে? এই ব্যাপারটা সমাধান করে মাছের পটকা। আমরা মোটর গাড়ির টিউবে হাওয়া ভরে তা নিয়ে জলে সহজেই ভাসতে পারি। হাওয়া কমিয়ে দিলেই বিপদ। তখনই জলে ডুবে যাবার আশঙ্কা। এখানে হাওয়া ভর্তি গাড়ির টিউব যেমন জলে ভাসতে সাহায্য করে মাছের পটকাও ঠিক তেমনি। মাছের শরীরের ভিতর খাদ্যনালীর কাছেই বেলুনের মত যে অঙ্গ রয়েছে তাকেই পটকা বলে। পটকার মাঝখানটা খাঁজের মত হয়ে পটকাকে দু'টো ভাগ করেছে। অনেক মাছে পটকা খাদ্যনালীর সঙ্গে লাগানো



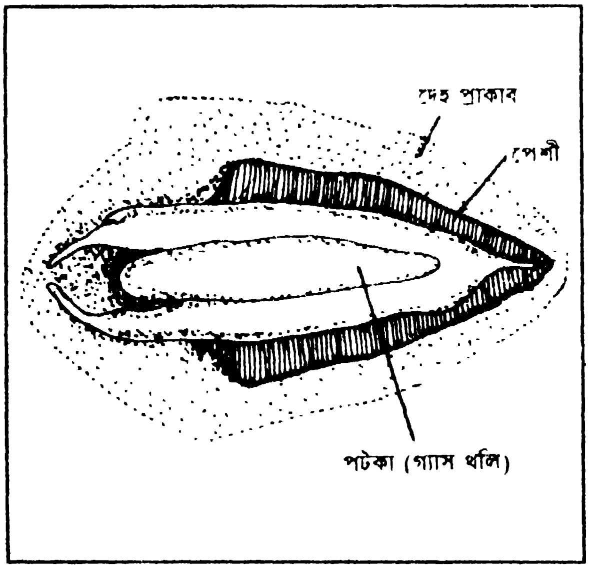
স্থির হয়ে থাকে। পুকুর কিংবা সমুদ্রেও এইরকম দেখা যায়। মাছ এক এক সময়ে জলের এক একটা তলে চুপচাপ থাকে। পটকার দেওয়ালে প্রচুর রক্তজালক আছে। এই রক্তজালক থেকে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-

অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে এসে পটকার অগ্র প্রকোষ্ঠে জমা হয়। আবার পটকার পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ থেকে রক্তজালক ওই গ্যাসগুলো শুষে নেয়। এ-ভাবেই প্রয়োজনে পটকার গ্যাস ভর্তি হয়, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে গ্যাস কমে যায়।

মাছের পটকা কি জলে ভাসতে সাহায্য করে?

পটকায় গ্যাস ভর্তি থাকলে তা ফুলে ওঠে, না হলে তা চুপসানো দেখায়।

মাছ যখন নদী বা সমুদ্রের জলের অনেক গভীরে চলে যায় তখন জলের চাপ অনেক বেশি থাকে। জলের চাপ বেশি হলে পটকাও ছোট হয়ে পড়ে। ফলে অপসারিত জলের ওজন মাছের দেহের ওজনের অনেক কম হওয়ায় মাছ জলের তলায় তলিয়ে যেতে থাকে। এই সময়ে মাছের রক্ত থেকে গ্যাস বেরিয়ে পটকাকে ফুলিয়ে দেয়। তখন



ফোলানো পটকা বেশি পরিমাণ জল অপসারিত করে, যার ফলে মাছের ওজন অপসারিত জলের ওজনের সমান হয়ে ওঠে। তখনই মাছ জলের নির্দিষ্ট স্তরে ভাসতে থাকে। আবার মাছ যখন জলের ওপর দিকে উঠে আসে, তখন জলের চাপও কমে যায়। এই সময়ে পটকা গ্যাসপূর্ণ থাকলে মাছ জলের উপরে ভেসে উঠবে। সেইজন্যে উপরে ওঠার সময়ে মাছের পটকা থেকে গ্যাস বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ মাছের রক্ত পটকা থেকে গ্যাস শুষে নেয়। পটকায় গ্যাসের পরিমাণ কমে গেলে পটকার আয়তনও ছোট হয়ে পড়ে। ফলে গভীর জলের মত একই রকম সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মাছ জলের উপরের স্তরের কোনো জায়গায় সুস্থির ভাবে ভাসতে থাকবে।

এইভাবেই পটকার গ্যাস বাড়িয়ে বা কমিয়ে মাছ জলের যে কোনো উচ্চতায় বা স্তরে স্থির হয়ে ভাসতে পারে।

গরু কেন জাবর কাটে?

গরু গোগ্রাসে খায়। কিন্তু খাবার শেষে হাঁটু ভেঙে বসে চোখ বুজে আবার আস্তে আস্তে মুখ নাড়ে। যেন সে খুব তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদ নেয়। গরুর এইভাবে খাওয়ার ধরনকেই বলে 'জাবর-কাটা' বা ভাল কথায় গিলিত চর্বন করা।

গরু খড়-ঘাসই বেশি খেয়ে থাকে। অবশ্য শাক-সব্জিও তার খাদ্য। শাকপাতায় এক ধরনের জল অঙ্গার বা কার্বোহাইড্রেট থাকে। এর নাম সেলুলোজ। আমরা শাক-সব্জির সেলুলোজ অংশ হজম করতে পারি না। তাই খাবার থেকে সেলুলোজ অংশ বাদ দিয়ে দিই, অথবা সেলুলোজ অংশ অপাচ্য হয়ে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু গরুর বেলায় তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই বলে গরু ঘাস-খড়ের সঙ্গে বেশি পরিমাণে সেলুলোজ খেয়ে ফেলে।

ব্যাকটেরিয়া কি গরুকে খাবার হজমে সাহায্য করে?

গরু যেমন সেলুলোজ খেয়ে ফেলে তেমনি গরুর পাকস্থলীতে সেলুলোজ পাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। গরু যদিও নিজে সেলুলোজ হজম করতে পারে না, তবে গরুর পাকস্থলীতে এমন কয়েক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বাস করে যারা গরুকে সেলুলোজ হজম করতে সাহায্য করে। সেলুলোজ যাতে গরুর পাকস্থলীতে ভালভাবে হজম হতে পারে সেইজন্য গরুর পাকস্থলীও একটু ভিন্নভাবে তৈরি। আমাদের পাকস্থলীতে একটাই কক্ষ, কিন্তু গরুর পাকস্থলীতে কক্ষের সংখ্যা চার। তাই গরু তাড়াতাড়ি খাবার গিলে পাকস্থলীর প্রথম কক্ষে খাবার পাঠিয়ে দেয়। সেখানে ব্যাকটেরিয়াগুলি ওই খাবারের সেলুলোজ অংশকে ভেঙে ছোট ছোট অণু তৈরি করে। এর ফলে খাবার অনেকটাই

নরম হয়ে পড়ে। এইবার গরু অল্প অল্প ক'রে এই নরম খাবারটা উগরে মুখে নিয়ে এসে আবার চিবোতে আরম্ভ করে। খাবারের এই দ্বিতীয়বার চিবনোকে জাবর কাটা বলা হয়। গরু যখন জাবর কাটে তখন সে খাবারের কণাগুলিকে আরো ছোট ছোট অংশে পরিবর্তিত ক'রে ফেলে। আর জাবর কাটা হলে সেই খাবারকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় পাকস্থলীর অন্য কক্ষে, যেখানে খাবারের বাকি অংশের পাচন ঘটবে। গরুর পক্ষে সরাসরি খাবারের সেলুলোজ অংশের পাচন ঘটানো সম্ভব হয় না। তাই গরু জাবর কাটে।

সাপ বারেবারে জিভ বের করে কেন?

সাপ শুয়েই থাকুক বা চলাফেরাই করুক বারেবারেই সাপ জিভটিকে তার মুখের বাইরে নিয়ে আসে এবং মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নেয়। মুখ হাঁ করা কিংবা বন্ধ করা যে কোনো অবস্থাতেই একই ব্যাপার চলতে থাকে। এর যেন কোনো বিরাম নেই।

সাপের জিভ সামনের দিকে চেরা কিন্তু পিছনে তা জোড়া থাকে। জিভ লেগে আছে মুখের মাঝখানে। জিভের গোড়ার দিক পাতলা আবরণী দিয়ে ঘেরা। সাপের জিভের সামনের দু'টো চেরা অংশ পেরেকের মত—দেখতে তা বেলনাকার। সাপের নীচের চোয়ালের সামনের দিকটা সামান্য চেরা। মুখ বন্ধ থাকলেও এই চেরা পথে সাপ জিভ বের করতে পারে। চলার সময়ে সাপ বারেবারেই জিভটাকে বের ক'রে আনে, আবার ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। আর মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরায়। ক্ষেপে গেলে সাপ জিভ খুবই দ্রুত বের করতে থাকে। দেখে মনে হয় যেন থুতু ছিটোচ্ছে। প্রথম প্রথম জিভের চেরা অংশ দু'টো অনেকটা তফাতে থাকে। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা কাছাকাছি এসে পড়ে। কামড়াবার আগে জিভের নড়াচড়া অনেকটা কমে আসে। আর খাবার গেলার সময়ে জিভটা বাইরেই থাকে। এ-থেকে বোঝা যায় যে, খাবার ধরা বা গেলার ব্যাপারে জিভ কিছুই করে না। তাহলে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে জিভের কাজ কি? আর সাপ বারেবারে জিভ বেরই বা করে কেন?

পরীক্ষায় জানা গেছে যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া সাপের নাকের অন্য কোনো কাজ নেই। মানুষের মত সাপের নাকে কোনো ঘ্রাণগ্রন্থি থাকে না। অর্থাৎ সাপের নাকে গন্ধ শোঁকার কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সাপ যে কোনো কিছুর গন্ধ পায় না, এমনও নয়।

চলার সময়ে মুখের সামনে বারেবারে জিভ বের করা, জিভকে এ-দিক ও-দিকে নাড়াচাড়া করার মত কাজ থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, সাপের জিভই হল সাপের ঘ্রাণ অঙ্গ। সাপের জিভের চেরা অংশ কেটে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, সাপের ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা সাপ জিভ দিয়ে বাইরে থেকে গন্ধ সৃষ্টিকারী অণুগুলোকে মুখের ভিতর নিয়ে যায়। মুখের ভিতরে টাকরায় ছোট ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রকে ঘিরে অনেক সংবেদী ঘ্রাণ-কোষ রয়েছে। সাপ জিভের ডগাটিকে ওই ছিদ্রের ভিতরে সরাসরি ঢুকিয়ে দিয়ে ঘ্রাণ সংবেদী কোষগুলোতে ঘ্রাণের অণুগুলো পৌঁছে দেয়। এইবার সংবেদী কোষগুলো থেকে ঘ্রাণের অনুভূতি স্নায়ুপথে টাকরার উপরের ছোট একটি গ্রন্থিতে পৌঁছে যায়। এই গ্রন্থিকে 'জেকবসনের অঙ্গ' বলে। এই গ্রন্থিটিও ঘ্রাণ সংবেদন গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে ঘ্রাণের উদ্দীপনা স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছোয়। ফলে সাপ নির্দিষ্ট গন্ধ পায়। এইভাবেই সাপ জিভ দিয়ে বাইরের গন্ধকে ভিতরে পৌঁছোয়। আর এর ফলেই সে চিনে নিতে পারে তার খাদ্য অথবা শত্রুকে।

সাপ কি নাক দিয়ে শোঁকে?

কুমির কাঁদে কেন?

কথায় বলে কুমিরের চোখের জল। লোক-দেখানো কান্নাকে অনেকে কুমিরের কান্নার সঙ্গে তুলনা করে। অর্থাৎ কুমিরের চোখের জল যেন শুধুই অভিনয়।

কুমিরের যে চোখের জল পড়ে না বা কুমির যে কাঁদে না, এমনটি কিন্তু নয়। কাঁদলে যেমন আমাদের অশ্রুগ্রন্থি থেকে জল বেরিয়ে আসে, কুমিরদেরও তেমনি অশ্রুগ্রন্থি থেকে অশ্রুমোচন হয়। আমাদের বেলায় এই অশ্রুগ্রন্থিরস বা চোখের জল চোখ দু'টোকে ধুইয়ে দেয়, চোখকে সব সময়ে সিক্ত বা ভেজা রাখে এবং চোখে যাতে কোনো জীবাণু বাসা করতে না পারে এমনভাবে কাজ ক'রে যায়। কুমিরের

অশ্রুও ঠিক তেমনি ওইসব কাজই ক'রে থাকে।

তবে পার্থক্য অবশ্য আছে। অশ্রুমোচনের কারণ দু'টো ক্ষেত্রে আলাদা। আমাদের চোখে কিছু পড়লে, কিংবা

খাবার ধরলেই কি কুমিরের চোখে জল আসে?

আবেগে চোখে জল আসে। কিন্তু কুমিরদের বেলায় ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্ন। কুমির খাবার ধরবার জন্য যখন হাঁ-করে, ঠিক তখনই কুমিরের চোখে জলের ফোঁটা দেখা দেয়—অর্থাৎ একদিকে চোখের জল অন্যদিকে কু-মতলব। এই সময়ে কুমিরের উপরের চোয়াল অনেকটা উপরে উঠে যায়। চোয়াল উপর দিকে উঠলে অশ্রুগ্রন্থির পেশীতে চাপ পড়ে। এই চাপেই অশ্রুগ্রন্থি থেকে জল বেরিয়ে চোখের কোণায় অশ্রুবিন্দু হয়ে জমা হয়। একেই কুমিরের কান্না বলে। অর্থাৎ খাবার ধরার জন্য হাঁ করলেই কুমিরের চোখে জল আসবে, অন্য সময়ে নয়।

কৈ কেন ডাঙায় হাঁটে ?

মাছ জলে বাস করে। জল ছাড়া মাছ বাঁচে না। কথায় বলে মাছকে জলের বাইরে রাখা আর শিশুকে মায়ের কোল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা একই ব্যাপার।

কিন্তু কৈ ডাঙায় হাঁটে কেন? আর কেমন ক'রেই বা হাঁটে?

বর্ষাকালে ধানের ক্ষেতে অনেক কৈ মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। কাছের পুকুর থেকে হেঁটে হেঁটে কৈ মাছ চলে যাচ্ছে এমন দৃশ্য বিরল নয়।

কৈ মাছ জিওল মাছ। অল্প জলেই কৈ থাকতে ভালবাসে। বর্ষাকালে পুকুর জলে ভর্তি হয়ে গেলে মাঠে-ঘাটেও অল্প অল্প জল থাকে। কৈ মাছ তখন পুকুরের বেশি জল থেকে ডাঙার কম জলে উঠে আসে। কম জলই কৈ মাছের পছন্দ। কারণ কৈ মাছের দু' রকম শ্বাস-অঙ্গ আছে। কম জলে সে ফুলকা এবং শ্বাস-অঙ্গ দু'টোর সাহায্যেই শ্বাস নিতে পারে।

ডাঙায় হাঁটার জন্যে কৈ মাছের কানকো এবং পাখনাগুলির একটু পরিবর্তন ঘটেছে। কৈ-এর কানকোর ধারে কাঁটা রয়েছে। ওর পাখনাতেও কাঁটা আছে। কৈ মাছ ডাঙায় হাঁটার জন্য প্রথমে কানকো দু'টোকে বাইরের দিকে বের ক'রে আনে। এরপর কানকোর কাঁটাওলা ধার মাটিতে ঢুকিয়ে দেয়। কানকোর উপরে ভর দিয়েই মাথাটাকে সে উপরে তুলে ধরে। ফলে শরীরটাও মাটি থেকে অনেকটা উপরে উঠে আসে। এইবারে লেজের পাখনা মাটিতে গেঁথে পেটটাকেও মাটির উপরে তুলে আনে। এরপর লেজের পাখনায় চাপ দিলে শরীরটা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এইরকম করেই কৈ মাছ ডাঙায় হাঁটে।

প্যাঁচাকে শুধু রাত্তিরেই দেখা যায় কেন?

সব পাখিই সারাদিন আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, আর ঠিক সন্ধে হলেই নিজের বাসায় ফিরে আসে।

প্যাঁচার বেলায় ব্যাপারটা একটু উল্টো রকমের। সবাই যখন বাড়ি ফেরে তখনই প্যাঁচার বেরোবার সময়। অন্ধকারেই তাকে নজরে আসে।

কিন্তু প্যাঁচাকে শুধু রাত্তিরেই দেখা যায় কেন?

অন্যান্য পাখি দিনের আলোতে যত ভাল দেখতে পায় প্যাঁচা সে রকম নয়। দিনের বেলায় এর দৃষ্টি ভাল চলে না। কারণ প্যাঁচার চোখের ভিতরকার গড়ন একটু আলাদা। আমাদের অক্ষিপটে দু' রকমের কোষ থাকে যারা আলোর অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। এদের বলা হয় 'রড' এবং 'কোন্' কোষ। রড কোষ মৃদু আলোতে ভাল কাজ করতে পারে, আর কোন্ কোষ জোরালো আলোয় ঠিকমত কাজ করতে পারে। যে-সব প্রাণীর অক্ষিপটে রড কোষ বেশি থাকে, তারা অল্প আলোয় ভাল দেখতে পায়। প্যাঁচার

প্যাঁচার শ্রবণশক্তি কি খুব তীক্ষ্ণ

অক্ষিপটে রড কোষের সংখ্যাই বেশি। তাই প্যাঁচা মৃদু আলোয় ভাল দেখে। প্যাঁচার চোখ দু'টো সামনের দিকে বসানো। কিন্তু অন্যান্য পাখিদের চোখ বসানো থাকে পাশের দিকে। প্যাঁচার চোখ সামনের দিকে থাকে বলে প্যাঁচা সব বস্তুকে ভাল ক'রে দেখতে পায়। সেইজন্যে তার চোখ দু'টোও অন্য পাখিদের চোখের থেকে অনেক বড় হয়।

শুধু চোখই যে প্যাঁচাকে অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে, তা নয়। প্যাঁচার শ্রবণশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে দূরের সামান্যতম

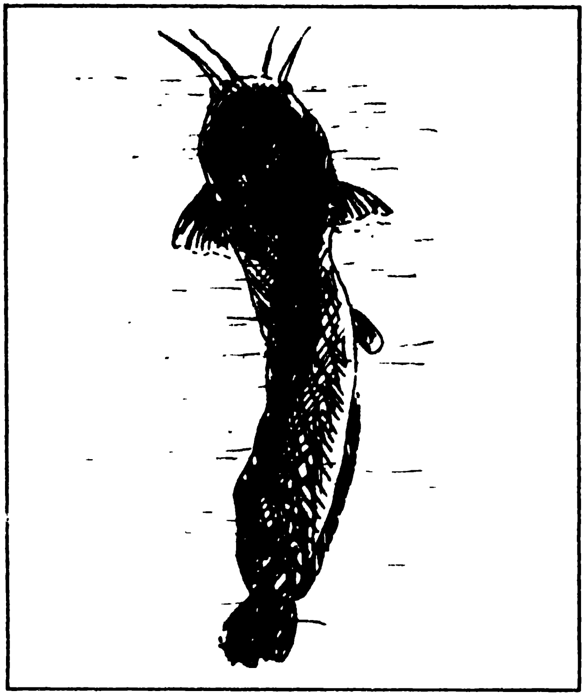
শব্দও সে শুনতে পায়। ভাল ক'রে শোনবার জন্য প্যাঁচার পালকগুলো আমাদের কানের মত বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। কিন্তু অন্য পাখিদের কান প্যাঁচার মত নয়। দিনের বেলায় শব্দ বেশি থাকে বলে কোনো কিছুর আওয়াজ আলাদা ক'রে চেনা কষ্টকর, কিন্তু রাত্তিরে সব দিক শান্ত। তখন দূরের আওয়াজও ভাল ক'রে শোনা যায়। শব্দ শুনে শিকার ধরতে হয় বলে প্যাঁচা কেবল রাত্তিরেই শিকারে বেরোয়। শিকার ধরবার সময়ে পালকের যাতে কোনো শব্দ না হয়, সেইজন্যে প্যাঁচার পালকগুলো বেশ নরম হয়। ওড়ার সময়ে ডানার শব্দ হয় না বলে রাত্তিরেও প্যাঁচা নিঃশব্দে শিকার ধরতে পারে।

প্যাঁচা একবারে বেশি দূর উড়ে যেতে পারে না। আর তার ওড়ার গতিও কম। দিনের বেলায় শিকার ধরার এই দু'টোই অসুবিধে। তা ছাড়া আত্মরক্ষার ব্যাপারটাও আছে। তখন অন্য পাখি তাড়া করলে পালিয়ে যাওয়া সহজ হয় না। কিন্তু রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে বা বাসায় বিশ্রাম করে তখন তাড়া খাবার ভয় নেই। এ-কারণেও প্যাঁচা শুধু রাত্তিরেই শিকারে বেরিয়ে থাকে। তাই প্যাঁচাকে রাত্তিরেই বেশি দেখা যায়।

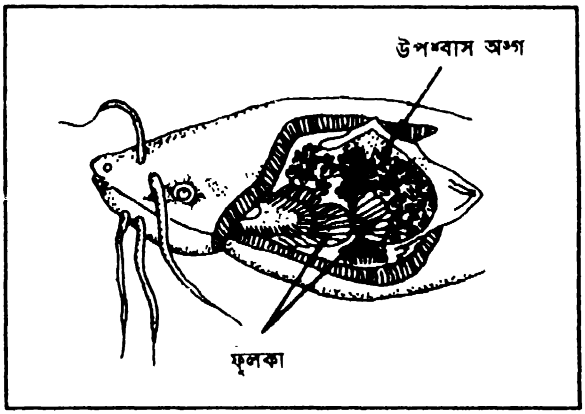
জিওল মাছ বারেবারে জলের উপরে ভেসে ওঠে কেন?

যে-সব মাছ বাড়িতে যে কোনো পাত্রে জলে রেখে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় তাদেরই জিওল মাছ বলে। কৈ, মাগুর, শিঙি জিওল মাছ। কিন্তু এই জিওল মাছ বারেবারে জলের উপরে ভেসে ওঠে কেন?

মাছ জলে থাকে। জলে বাস করবার জন্যে মাছের ফুলকা আছে, পাখনাও রয়েছে। জলে বসবাসের উপযোগী ক'রেই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি। স্থলের প্রাণীর মত শ্বাস-প্রশ্বাস না নিলে মাছও বাঁচে না। শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্যে মাছের কানকোর ভিতরে চিরুনির মত ফুলকা রয়েছে। ফুলকায় অনেক রক্তজালক থাকে বলে ফুলকাগুলো দেখতে লাল রঙের। মাছ মুখ দিয়ে জল নিয়ে কানকো দিয়ে তা বের ক'রে দেয়। মুখ থেকে কানকোর দিকে যাবার সময়ে ফুলকার উপর দিয়ে জল যায়। এই সময়ে জলের অক্সিজেন গ্যাস ফুলকা নিয়ে নেয় এবং রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুলকা দিয়ে জলে বেরিয়ে আসে। এ-ভাবেই মাছ



তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকে। [দ্রষ্টব্যঃ মাছ কেন হাঁপি কাটে?]



রুই, কাতলার মত যে-সব মাছের অনেক ফুলকা থাকে, তারা ফুলকা দিয়ে যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, তাতেই তাদের চলে যায়। কৈ, শিঙি, মাগুরের মত জিওল মাছের ফুলকার সংখ্যা অনেক কম। সেইজন্যে ফুলকা দিয়ে যে-অক্সিজেন এরা নেয়, তা এদের শরীরের অক্সিজেন গ্যাসের চাহিদা মেটাতে পারে না। ফলে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি থেকে

জিওল মাছ কি বাতাস থেকেও অক্সিজেন টানে?

যায়। এইভাবে অল্প অল্প ঘাটতি মিলে যখন অক্সিজেন গ্যাসের ঘাটতি বেশি হয়ে পড়ে তখনই জিওল মাছ জলের উপরে ভেসে ওঠে আর বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে সেই ঘাটতি পুষিয়ে নেয়।

বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নেবার জন্যেই জিওল মাছের ফুলকার লাগোয়া আলাদা শ্বাস-অঙ্গ তৈরি হয়। এই শ্বাস-অঙ্গ থাকে বলেই জিওল মাছ অনেকক্ষণ জলের বাইরে বেঁচে থাকতে পারে। জলের বাইরে থাকার সময়ে জিওল মাছ ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয় না। শ্বাস-অঙ্গ দিয়েই সে শ্বাস নিয়ে থাকে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, জিওল মাছকে জালে আটকে জলের ভিতরে রেখে দিলে, অর্থাৎ জলের উপরে আসতে না দিলে, কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।

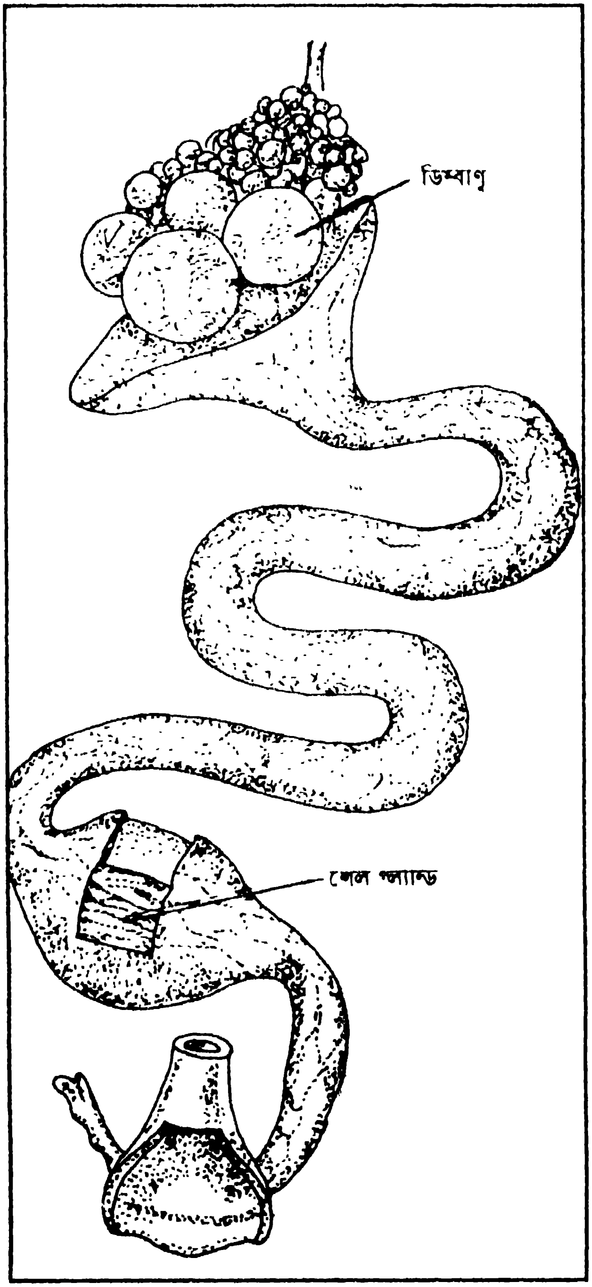
সুতরাং বাতাস থেকে সরাসরি শ্বাস নেবার জন্যেই জিওল মাছ বারেবারে জলের উপরে ভেসে ওঠে।

মুরগির ডিম দেখতে ডিম্বাকার হয় কেন?

টিকটিকির ডিম গোল, কাছিমের ডিমও গোলাকার। কিন্তু হাঁস বা মুরগির ডিম সামান্য লম্বাটে, একটা দিক একটু ভোঁতা আর অন্য দিকটা ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে এসেছে। এটাই আদর্শ ডিমের আকার, আর এ থেকেই ডিম্বাকার বা ডিম্বাকৃতি কথাটার চল। তাই কোনো জিনিসের আকার ডিমের মত হলেই আমরা তাকে ডিম্বাকার বলে থাকি।

কিন্তু টিকটিকি বা কাছিমের ডিমের মত মুরগির ডিম গোল হয় না কেন?

সব পাখির মত মুরগিও ডিম পাড়ে। মুরগির দেহের ভিতরে ডিম তৈরি হওয়ার জন্যে একটা অঙ্গ থাকে। একে ডিম্বাশয় বলে। পরিণত মুরগির ডিম্বাশয় থেকে রোজ একটা ক'রে ডিম্বাণু বেরিয়ে আসে। এই ডিম্বাণু দেহ গহ্বরে বেরিয়ে এসে সামনেই যে চোঙার মত অংশ থাকে তাতে প্রবেশ করে। এই চোঙার পিছনটায় একটা বেশ বড় নল আছে। এই নলের ভিতর দিয়ে ডিম্বাণু দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে বলে একে ডিম্বাণু-নালী বলে। ডিম্বাণু-নালী দেহের ভিতরে প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। কোথাও এ ফোলা, আবার কোথাও সরু। প্রথমদিকে ডিম্বাণু-নালী সরু থাকে। শেষে হঠাৎই স্ফীত হয়ে বড় হয়ে যায়। এই ফোলা অংশটির নাম জরায়ু, আবার জরায়ুরও পিছন দিকটা তুলনায় ফোলা কিন্তু সামনের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে একটা ছিদ্র দিয়ে একটি থলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই থলিকে অবসারণী বলে। অবসারণী পথেই মুরগির ডিম, মল, মূত্র দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে।



ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বেরিয়ে চোঙার মত অংশ বা ডিম্বচুঙিতে প্রবেশ করে। এই সময়ে ডিম্বাণুতে থাকে বেশিটাই হলদে কুসুম। ডিম্বাণু যেমন ডিম্বাণু-নালী দিয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে, অমনি ডিম্বনালীর গা থেকে অনেকটা সাদা শ্লেষ্মার মত পদার্থ ডিম্বাণুর উপরে ক্রমে ক্রমে জমে। এই শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থকে অ্যালবুমেন বলে। অ্যালবুমেন যতই জমে ডিম ততই বড় হয়। এই সময়ে ডিমের চেহারাটা যেন একটা গোল তরলের বল। ডিম্বনালী নলের মত বলে এর প্রাচীরের চাপে অর্ধতরল ডিম গোল বলের মত হয়ে যায়। এইভাবে গোল বলের মত আকৃতির অর্ধতরল ডিম নীচে নামতে নামতে জরায়ুতে এসে পৌঁছোয়। জরায়ুতে থাকবার সময়ে অর্ধতরল ডিম জরায়ুর আকার ধারণ করে। অর্থাৎ পিছন দিকটা চওড়া হয় এবং সামনে ক্রমশ সরু হয়ে আসে। এটাই ডিমের পরিণত আকৃতি। এইবার অর্ধতরল ওই ডিমের উপর জরায়ু-প্রাচীর থেকে খোলস তৈরির বস্তু জমা হতে থাকে; ফলে ধীরে ধীরে ডিমের আকৃতির মত খোলসও তৈরি হয়। খোলস তৈরির পরে ডিমের আকৃতি জরায়ুর ভিতরের আকৃতির মত হয়ে যায়। তাই ডিমকে ডিমের মত দেখতে।

ছারপোকা কামড়ালে ফুলে ওঠে কেন?

ছোট কীট ছারপোকা। কিন্তু তার প্রতাপ কত! প্রতি কামড়েই রক্তপান আর কামড়াবার পরেই সে জায়গাটার উঁচু হয়ে ফুলে ওঠা।

কিন্তু ছারপোকা কামড়ালে ফুলে ওঠে কেন?

ছারপোকার মুখ-উপাঙ্গ রক্ত চোষার জন্যে ছুঁচের মত। কামড়াবার সময়ে মুখের দু'পাশের দু'টো লালা গ্রন্থিতে যে-বিষ তৈরি হয় তাই বেরিয়ে আসে। এই বিষ জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তা ছাড়া পেশীকে তা সংকুচিত ক'রে তোলে। ছারপোকার লালা আমাদের পক্ষে ভাল না হলেও রক্ত চোষার ব্যাপারে তা ছারপোকাকে সাহায্য করে। লালা রসে এমন বস্তু থাকে যা রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। কারণ জমাট বাঁধলে সে রক্ত ছারপোকার মুখ দিয়ে ভিতরে যাবে কি ক'রে?

কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পেশী সংকোচক বস্তু, রক্ত-জমাট-বিরোধী বস্তু এবং মুখ-উপাঙ্গের ছুঁচের প্রবেশের ফলে কামড়ানোর জায়গায় চামড়া ফুলে ওঠে।

জোনাকি আলো জ্বালে কেন?

জোনাকির আলো একবার জ্বলে আবার নেভে। কিন্তু জোনাকি কোত্থেকে আলো পায়? তার আলোটা জ্বলেই বা কেন, আবার নেভেই বা কি ক'রে? তা ছাড়া তার আলো জ্বালার দরকারটাই বা কি?

জোনাকি এক ধরনের খুবই ছোট্ট পতঙ্গ। পুরুষ জোনাকির ডানা থাকে, তাই সে উড়তে পারে। মেয়ে জোনাকির কোনো ডানা নেই, সে উড়তেও পারে না। আমরা জোনাকির যে আলো দেখে থাকি তা পুরুষ জোনাকির আলো। পুরুষ জোনাকির উদর অংশ কতকগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা। এই ভাগগুলোর ষষ্ঠ এবং সপ্তম ভাগের মাঝখানে জোনাকির লণ্ঠন-যন্ত্র বা আলোক-যন্ত্রটি আছে। এটা থাকে তলার দিকে। যে-অংশ থেকে আলো বের হয় তার ঠিক উপরেই আছে আরেকটা স্তর। এই স্তর আলোকে প্রতিফলন করতে সাহায্য করে। আলোক-যন্ত্রের কোষগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে-আলো তৈরি করে তাতে কোনো উত্তাপ সৃষ্টি হয় না। তাই এ-ধরনের আলোকে ঠাণ্ডা আলো বলে। স্নায়ুর মাধ্যমে সংকেত পেয়ে আলোক-যন্ত্রের কোষে অবস্থিত লুসিফেরিন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিডাইজড্ লুসিফেরিন তৈরি হয়। এই অক্সিডাইজড্ লুসিফেরিন থেকেই আলো বেরিয়ে আসে। এই বিক্রিয়া লুসিফেরিনেজ নামের এক ধরনের উৎসেচকের সাহায্যে ঘটে থাকে।

স্ত্রী জোনাকি কি আলো জ্বালতে পারে?

জোনাকির আলোতে কি তাপ থাকে?

কিন্তু জোনাকি আলো জ্বালালেও তার আলো জ্বালার কারণটা কি?

জোনাকির শরীরে সংকেত পাঠানোর জন্য কোনো রকম ব্যবস্থা না থাকায় রাত্তিরে আলো জ্বেলে পুরুষ জোনাকি সহচরী জোনাকির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ জোনাকির

আলোর সংকেত দেখে সহচরী জোনাকি সহজেই সহচরের খোঁজ পায়।

ক্যাঙারু বাচ্চা বয়ে বেড়ায় কেন?

ক্যাঙারু আমাদের দেশের প্রাণী নয়। এরা অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। তবে সব চিড়িয়াখানাতেই ক্যাঙারু আছে। আমাদের কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও ক্যাঙারু নজরে আসে। ক্যাঙারুর পেটের কাছে একটা থলি থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায় পেটের থলে থেকে বাচ্চা ক্যাঙারু মুখ বের ক'রে আছে। ক্যাঙারুরা কিন্তু বড় না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাদের পেটের থলের ভিতর বয়ে বেড়ায়। কিন্তু এরা এ-রকম ভাবে বাচ্চা বয়ে বেড়ায় কেন?

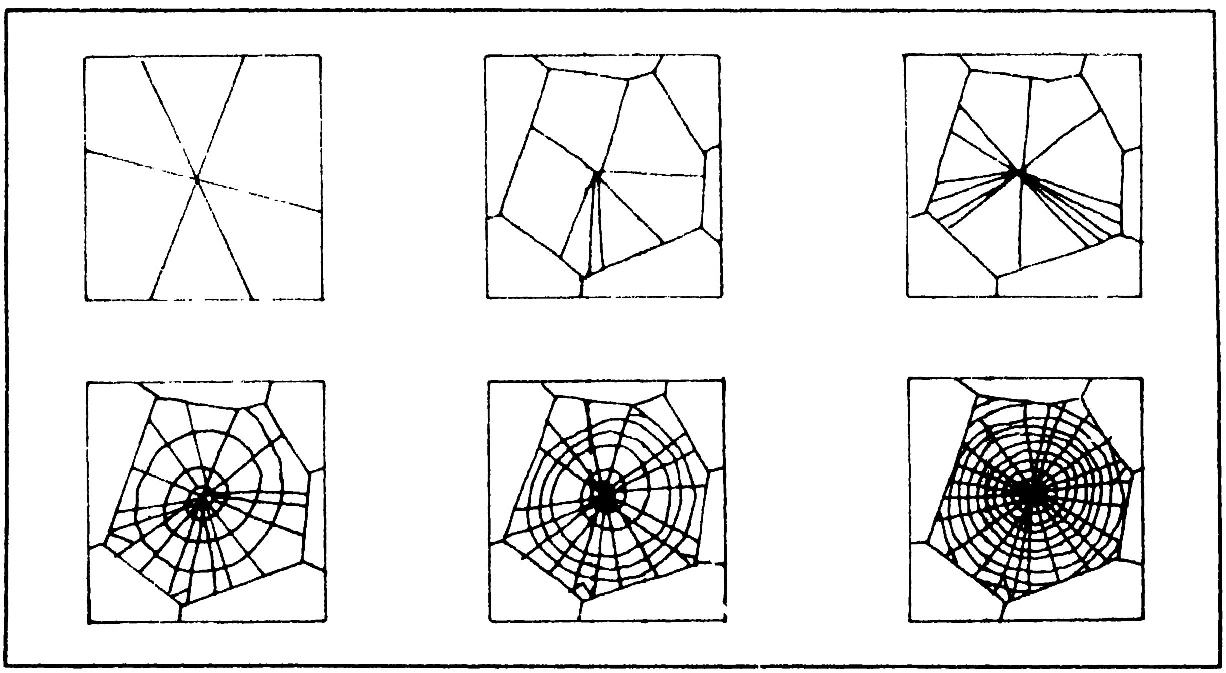
পাখির ডিম বাইরে বেরিয়ে আসার পরই তার ভিতরে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে এবং ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।

ক্যাঙারু অপরিণত বাচ্চা দিলেও তা মারা যায় না কেন?

গরু, ভেড়ার মত স্তন্যপায়ীদের ডিম এবং ডিম থেকে বাচ্চা বেরনোর ব্যাপারটা শরীরের ভিতরই ঘটে। ফলে তারা জ্যান্ত বাচ্চা দেয়। আবার প্ল্যাটিপাসের মত অনেক প্রাচীন স্তন্যপায়ী রয়েছে, যারা ডিমও পাড়ে। ক্যাঙারু ততটা প্রাচীন স্তন্যপায়ী নয়। তাই ক্যাঙারু ডিম না পাড়লেও ডিম থেকে বাচ্চা হবার পুরো ব্যাপারটা তার শরীরের ভিতরে হয় না। মাঝপথেই বাচ্চা তাদের পেট থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এমনই তাদের ব্যবস্থা যে, অপরিণত বাচ্চা বাইরে এসে মারা যায় না। ক্যাঙারুর পেটের থলিতে অপরিণত বাচ্চাগুলো আশ্রয় নেয়। সেখানেই মায়ের দুধ রয়েছে। মায়ের দুধে মুখ লাগিয়ে অন্ধ বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে, আর ওদের মুখে ফোঁটা ফোঁটা দুধ এসে পড়ে। এইভাবেই থলের এবং মায়ের শরীরের গরমে অপরিণত বাচ্চারা পরিণত হয়। বাচ্চারা একটু বড় হলে থলে থেকে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ বাইরে খেলা ক'রে আবার মায়ের থলেতে ঢুকে পড়ে। যতদিন না বাচ্চা স্বাবলম্বী হয়, ততদিন মা-ক্যাঙারু বাচ্চা বয়ে বেড়ায়।

মাকড়সা কেন জাল বোনে?

মাকড়সার জাল সকলেরই জানা। মাকড়সা খুব তাড়াতাড়ি জাল বোনে। জেলেরা জাল বোনে মাছ ধরার



মাকড়সার জাল বোনার বিভিন্ন ধাপ

জন্য, কিন্তু মাকড়সা কেন জাল বোনে?

মাকড়সার পেটের ভিতরে কয়েকটা গ্রন্থি রয়েছে। এই গ্রন্থি থেকে এক ধরনের চটচটে আঠালো রস বের হয়। এই রস মাকড়সার শরীরের পিছনে ছুঁচের মত কতগুলো নল দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু হাওয়া লাগলেই তা শুকিয়ে খুব সরু সুতো হয়ে যায়। এই সুতো দিয়েই মাকড়সা জাল তৈরি করে।

জাল তৈরির সময়ে মাকড়সা প্রথমে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে মাঝখানের একটা বিন্দু থেকে সাইকেলের স্পোকের মত সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সুতোগুলো দিয়ে একটার পর একটা চাকা তৈরি করে। এ-ভাবেই মাকড়সার জাল তৈরি হয়। জাল তৈরি হলে মাকড়সা জালের ভিতর থেকে একটা সুতো নিয়ে অনেক দূরে সুতো ধরে বসে থাকে খাদ্যের অপেক্ষায়। আসলে মাকড়সার জাল খাবার ধরার ফাঁদ। এই ফাঁদে ছোট ছোট পোকা পড়লে মাকড়সা সেই পোকা ধরে খেয়ে ফেলে।

জালে কোনো পোকা পড়লে মাকড়সার হাতে ধরা সুতোয় টান পড়ে। আর সুতোয় টান পড়লে মাকড়সা ধীরে ধীরে জালের দিকে এগোতে থাকে। জালের চটচটে আঠায় পোকার শরীর আটকে যায়। কিন্তু মাকড়সার পা থেকে এক ধরনের তেল বেরোয় যার ফলে মাকড়সা জাল ধ'রে হাঁটার সময়ে জালের সুতোয় আটকে যায় না। ধীরে ধীরে মাকড়সা পোকাটার কাছে এগিয়ে আসে এবং আরো সুতো তৈরি ক'রে পোকাটাকে জড়িয়ে ফেলে। তারপর হুল ফুটিয়ে পোকাটাকে মেরে ধীরে ধীরে পোকাটাকে খেয়ে ফেলে। এইখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শুধু মেয়ে-মাকড়সাই জাল বুনতে পারে।

পুরুষ-মাকড়সা কি জাল বুনতে পারে?

মশা মেয়েদের কেন বেশি ক'রে কামড়ায়?

মশার কামড় সবাই খেয়েছে। কিন্তু কামড়ানোর ব্যাপারে যে মশাদের ছেলে-মেয়ে ভেদ রয়েছে এ-খবর হয়তো অনেকেরই জানা নেই। আমরা জানি, যে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগ হয় তারা কিন্তু মেয়ে বা স্ত্রী-মশা। অর্থাৎ শুধুমাত্র স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা কামড়ালেই আমাদের ম্যালেরিয়া রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে—যদি সেই মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে।

পুরুষ-মশা আমাদের কামড়ায় না। কারণ রক্ত তার খাদ্য নয়। কিন্তু স্ত্রী-মশার ব্যাপার আলাদা। তার খাদ্য রক্ত।

পুরুষ-মশা কি আমাদের কামড়ায়?

ফলে স্ত্রী-মশাই শুধু আমাদের কামড়ায়। কিন্তু স্ত্রী-মশা আবার ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি কামড়ায়।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশাও ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি পছন্দ করে, ফলে বেশি করে কামড়ায়।

বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন যে, পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের ঘামের সঙ্গে কয়েক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড বেশি পরিমাণে বেরিয়ে আসে। মেয়েদের চামড়ায় ওই কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের আধিক্য স্ত্রী-মশাকে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দিকেই বেশি আকর্ষণ করে। ফলে মেয়েদের তুলনামূলকভাবে বেশি মশার কামড় খেতে হয়।

এ-ছাড়াও এক ধরনের হরমোন মেয়েদের ঘামের ভিতর দিয়ে বেশি পরিমাণে বেরিয়ে আসে। এই হরমোনের জন্যেও মশা মেয়েদের গায়ে বেশি ক'রে বসে, ফলে মেয়েরা মশার কামড়ও বেশি খায়।

পাখি ডিমে তা দেয় কেন?

সব পাখিই ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। যতদিন না পর্যন্ত ডিম ফুটে বাচ্চা হয়, ততদিন মেয়ে পাখি দিনরাত ডিমের উপরে বসে থাকে।

ডিম ফুটে বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত ডিমের উপরে বসে থাকাকে ডিমে তা দেওয়া বলে। এই ডিমে তা দেবার ব্যাপারটা পাখিদের সহজাত ব্যাপার।

কিন্তু ডিমে তা দিতে হয় কেন? ডিমের ভিতরে ভ্রূণ অপরিণত অবস্থায় থাকে। নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এই অপরিণত ভ্রূণ থেকে বাচ্চা তৈরি হতে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতার দরকার হয়। এই উষ্ণতা প্রায় চল্লিশ ডিগরি সেলসিয়াসের মত। শুধু নির্দিষ্ট তাপমাত্রা হলেই চলবে না,

নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত তা পেতে হবে। আজকাল যদিও ইনকিউবেটার যন্ত্রে ডিমগুলো রেখে নির্দিষ্ট উষ্ণতা বজায় রেখে কৃত্রিমভাবে ডিম থেকে বাচ্চা তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু

[illegible] জন্য কোন উষ্ণতার দরকার?

প্রকৃতিতে মা-পাখিকেই এই কাজটা করতে হয়।

কিন্তু ডিমে যে তা দিতে হবে, এটাই বা মা-পাখি বোঝে কি ক'রে? মানুষের মত সব মা-পাখিরও মস্তিষ্কে পিট্যুইটারি বলে একটা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি রয়েছে। এই গ্রন্থি থেকে যে-সব হরমোন বের হয়, তা ডিম তৈরি হতে সাহায্য করে। এই গ্রন্থি থেকে প্রোল্যাকটিন নামের হরমোনটি রক্তে মিশলেই মা-পাখির ভিতরে মাতৃত্ব বোধ জেগে ওঠে। সে তখন ডিমে তা দিতে শুরু করে। বাচ্চাদের খাইয়ে বড় ক'রে তোলে। অর্থাৎ ডিমে তা দেবার ব্যাপারটা পাখির মাতৃত্ব বোধ থেকে তৈরি হয়। আর এই মাতৃত্ববোধ জাগায় প্রোল্যাকটিন নামের হরমোন।

বিচিত্র পক্ষিজগৎ



পৃথিবীর বিশাল প্রাণিজগতের মধ্যে পাখি সবচেয়ে আশ্চর্য প্রাণী। পৃথিবীর বুকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর পদধ্বনি শোনা যাওয়ার অল্প পরেই প্রথম পাখির উদ্ভব। পাখি হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে, আর পারে উড়তে। তাদের চেহারা, তাদের ওড়া, তাদের বাসা বানানো—দেশান্তরে তাদের নিয়মিত যাতায়াত, তাদের স্বভাব, তাদের গান গাওয়া সবই বিচিত্র। আমাদের চারপাশে পাখির সংখ্যা কম নয়। কত সময়ে বিচিত্র রঙের ছোট-বড় কত পাখি আমরা দেখতে পাই। কৌতূহল আমাদের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আসে। পক্ষিবিদেরা সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন। এই ধরনের প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়েই ‘বিচিত্র পক্ষিজগৎ’।

বর্তমানে পৃথিবীতে কত ধরনের পাখি আছে?

এমনিতে মনে হয় পাখির বৈচিত্র্যের শেষ নেই। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত পাখিকে 27টি বর্গে বা গোত্রে (Order) ভাগ করা হয়েছে। কেউ কেউ 29টি গোত্রে ভাগ করেন। এই 27টি বর্গ বা গোত্রে 155টি বংশ (Family) আছে। প্রতিটি বংশের মধ্যে আবার নানা গণ (Genus)। সব মিলিয়ে পাখিরা 155টি বংশ আর 8,592 প্রজাতিতে (Species) বিভক্ত।

ভারতে কত পাখি আছে?

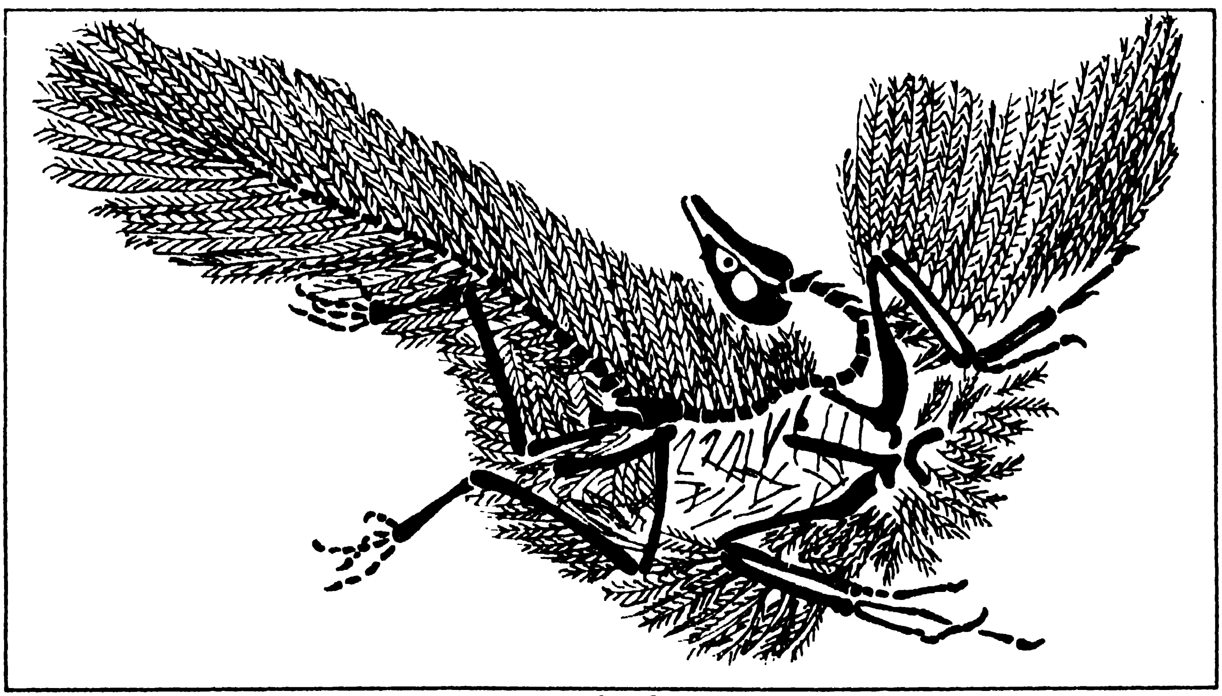
এ-দেশের আকাশে যত পাখি দেখা যায়, তাদের সংখ্যা কত? এ-দেশের পাখিরা প্রায় 70টি বংশে 1200 প্রজাতিতে বিভক্ত। 900-এর কিছু বেশি প্রজাতির পাখি স্থায়ীভাবে বাস করে, অর্থাৎ বাসা বাঁধে, সন্তান প্রতিপালন করে। বাকিদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ এসে পড়ে, কেউ পরিযাণ (Migration) ক'রে প্রতি বছর আসে, কারোর বা দেখা পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

পাখি সৃষ্টি হয় কী ভাবে এবং কবে?

টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, ডাইনোসর অর্থাৎ সরীসৃপ থেকেই পক্ষিকুলের উদ্ভব। অবশ্য পুরাজীব-তত্ত্ববিদ্‌দের মতে তার সূত্রপাত হয়েছিল আনুমানিক 15 কোটি বছর আগে। পৃথিবীর বুকে স্তন্যপায়ীর প্রথম পদধ্বনি শোনা যাবার অল্প পরেই।

প্রথম পাখি কি?

1859 সালে চার্লস ডারউইন তাঁর 'অরিজিন অফ স্পিসিস' বইতে প্রথম বললেন, পাখি এসেছে সরীসৃপ থেকে। এই মতবাদে তখনকার বিজ্ঞানীদের মধ্যে খুবই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু 1861 সালে ব্যাভেরিয়ার ল্যাঙ্গেনালথেইম অঞ্চলে একটি শ্লেট পাথরের খনি থেকে এক অদ্ভুত প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। মাথাটা গিরগিটির, চোয়ালে দাঁতের সারি, সরু লেজে অনেকগুলি চলনশীল কশেরুকা—অনেকটা সরীসৃপের কঙ্কালের মত এবং ডানার হাড়ের শেষ সীমানায় খুব সরু তিনটি নখরযুক্ত আঙুল। পরিণত প্রাণীটির যে পালক ছিল, তার চিহ্ন সেই জীবাশ্মে



আদি পাখি

সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায় এবং পাতিকাকের চেয়ে প্রাণীটি আকারে বড় ছিল না। এই জীবাশ্ম ডারউইনের মতবাদকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বললেন, জীবাশ্মের বয়স আনুমানিক 14 কোটি বছর। প্রাণীটির অস্তিত্ব ছিল মহাসরট যুগের (Jurassic) শেষ পর্বে। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিলেন আর্কিয়োপটেরিক্স অর্থাৎ আদিপক্ষী। 1877 সালে প্রথমটির দশ মাইল দূরে দ্বিতীয় জীবাশ্ম পাওয়া যায়। তৃতীয়টি পাওয়া যায় 1956 সালে এবং পরেরটি সম্প্রতি।

আদিপক্ষী সত্যিই পাখি না সরীসৃপ?

বর্তমানের বিচারে জীবটিকে পুরোপুরি পাখি বলতে যেমন বাধে তেমনি খাঁটি সরীসৃপ বলে স্বীকার করাও অসম্ভব। কারণ এই প্রাণীটি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা, এর পালক আছে যা একমাত্র পাখিরই সম্পদ।

এর জীবাশ্মের চেহারা দেখে মনে হয়, এই আদিপক্ষী সহজে উড়তে পারতো না। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে মাটির উপর দিয়ে দৌড়ে চলতো। বড় বড় পাথর, ঝোপ বা গাছে

আদিপক্ষী কি উড়তে পারতো?

চড়তো নখরযুক্ত ডানার আঙুলের সাহায্যে। খাটো ডানা আর বেশ চওড়া লম্বাটে লেজ কোনো উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপিয়ে অল্প দূর ভেসে চলার পক্ষেই উপযুক্ত। শারীরিক গঠন বিচার করলেও বেশ বোঝা যায়, এরা ভাল ক'রে ওড়ার উপযুক্ত ছিল না। লম্বা লেজ দিয়ে কেবল ভারসাম্য বজায় রাখতো। যে তিনটি প্রাণী এত বছর আগে জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে তার কারণ খুঁজতে গেলে একটি কথাই মনে হয়। খুব সম্ভবত এই হতভাগ্য তিনটি প্রাণী কোনো সরীসৃপ শত্রুর তাড়া খেয়ে জোর ক'রে উড়তে চেষ্টা ক'রে গিয়ে পড়েছে জল-কাদার ভিতরে। সেখান থেকে তারা আর উঠতে পারেনি, সমাধিস্থ হয়েছে।

সেই যুগে আরো কোনো সরীসৃপ উড়তে চেষ্টা করেছিল কি?

মহাসরট অর্থাৎ জুরাসিক যুগে আরো দু'একটি সরীসৃপ উড়তে চেষ্টা করেছে। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল টেরোনোডন, টেরোড্যাকটিল। তারা উড়েছে চামচিকে, বাদুড়ের মত চামড়ার ডানা নিয়ে। এদের অবশ্য পাখির মত খানিকটা চেহারা হয়েছিল চঞ্চুতে আর ফাঁপা হাড়ে—কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি।

পাখির দেহে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস কি?

পাখির দেহে আশ্চর্য জিনিস ওদের চোখ, যেমন তার মাংসপেশীর গঠন, তেমনই অনুভূতিগ্রাহী কোষের কাজ। এরকমটি আর কোনো প্রাণীর নেই। দৃষ্টি ও ক্ষমতা না থাকলে তারা এমন উড়তেও পারতো না। শকুন কত উঁচুতে ওড়ে। মাইলখানেক তো হবেই, সেখান থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে সে খুঁজে চলে মৃত জন্তু-জানোয়ার। শিকারী পাখি শিকরে বাজ ক্ষেতের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে দেখে, কোথায় একটা ছোট মেঠো ইঁদুর। দোয়েল গাছের ডালে বসে পাতার আড়ালে ছোট পোকা বা পোকার ডিমের সন্ধানে ব্যস্ত।

পাখি যে কেবল দূরের জিনিস আমাদের চেয়েও বহুগুণে পরিষ্কার দেখে তা নয়, কাছের বস্তুও সে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। আবার যে চোখ দিয়ে দূরে থাকা শিকরে বাজকে লক্ষ্য করছে ছোট পাখিটা, মুহূর্ত মধ্যে সেই চোখের দৃষ্টি নিয়ে আসে চঞ্চুর ইঞ্চিখানেক দূরে একটা ক্ষুদ্রতম পোকা বা পোকার ডিমের দিকে। এতে প্রমাণিত হয় এদের চোখের অদ্ভুত গঠন ও তার মাংসপেশীর কলাকৌশল। একই চোখ দিয়ে দূরবীক্ষণ ও আতস কাচের কাজ হয়। একমাত্র পেঁচা ছাড়া, যাদের চোখ আমাদের মত সামনে ও পাশাপাশি, আর সব পাখির চোখ মাথার দু'পাশে। এর ফলে প্রতিটি চোখের দৃষ্টিক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত যেমন বিস্তৃত, কাছের বেলাতেও তেমন। মাথা নিচু ক'রে শালিকটা যখন কিছুর আশায় থাকে তখন মনে হয় কিছু যেন শুনছে। কিন্তু আসলে তা নয়, সে একচোখে দেখছে ঘাসের তলায় ছোট পোকাটা কী ভাবে নড়ছে। দু'চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে যখন আনে তখনই দু'চোখ এক হয়ে কাজ করে। আবার কাদাখোঁচা জাতীয় পাখির চোখের অবস্থান ও গঠন এমন যে কাদার মধ্যে চঞ্চু ডুবিয়েও সম্পূর্ণ পিছন দিকে দেখতে পায় কোথাও শত্রু আছে কিনা।

প্যাঁচার চোখ পাশাপাশি হলেও তাদের চোখেই দূরবীনের কাজ সবচেয়ে ভাল হয়। এ ছাড়া ভাল দূরবীনের চোখ মাংসাশী শিকারী পাখিদের। বাজ বা ঈগল বহু উঁচু থেকে শিকারকে লক্ষ্য করে। শিকারের উপরে ঝড়ের গতিতে নেমে আসার সময় দূরত্ব অনুযায়ী তাদের চোখের লেন্স দ্রুত নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, যাতে লক্ষ্য বস্তু না ফসকে যায়। পানকৌড়ি বা গয়ার যখন জলের তলায় মাছের পিছনে ছোটে, তখন জলের ভিতরে স্পষ্ট দেখতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না।

পেঁচার চোখ কি অন্য পাখিদের মত নয়?

পাখির গায়ে যে পালক দেখি তা কি শুধু ওড়ার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে?

কেবলমাত্র ওড়ার জন্যেই পাখির লেজ ও ডানা সৃষ্টি হয়নি। আবহাওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্যেও তৈরি। একটি পাখির দেহে বহু রকমের পালক থাকে। মোটামুটি চারটি প্রধান ভাগে পালককে ভাগ করা হয়। প্রথম আচ্ছাদক পালক (Contour feather)। এই পালক সমস্ত শরীরকে ঘিরে ক্রমশ সরু হওয়ার আকার দিয়েছে। এর ফলে পাখি সহজেই বায়ুপ্রবাহের ঝাপটা কেটে চলতে পারে। শীতকালে একটা চড়াই পাখি তার দেহে প্রায় 3500 আচ্ছাদক পালক চড়ায়। তার শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা 40.5 ডিগরি সেলসিয়াস। এই পালকের জন্যেই তার শরীরের তাপ বাইরে যেতে পারে না। বরফ জমা দিনেও সে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকে।

চড়াইয়ের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত?

আচ্ছাদক পালকের নীচেই থাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পালক। এ হল তুলো পালক (Down plume)। এ রেশমের মত নরম। এর কাজও তাপ নিয়ন্ত্রণের। এই দুই শ্রেণীর পালকের মাঝে থাকে তৃতীয় পালক—সুতো পালক (Filo plume)। এই সুতো পালককে মনে হয় কেবল বাহারের জন্যে বুঝি, কিন্তু সম্ভবত এর কাজ সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়রূপে। চতুর্থ—ওড়ার পালক (Flight feather)। এ হল ডানা ও লেজের লম্বা শক্ত বড় পালক। এর মূলদেশ ফাঁপা, চওড়া থেকে সরু।

স্তন্যপায়ীদের যেমন হাত বা সামনের পা, পাখিদের তেমন ডানা। ডানার পালক উড়তে সাহায্য করে। আর লেজের পালক নৌকোর হালের মত গতি নিয়ন্ত্রণ ও দিক পরিবর্তনে সাহায্য করে।

সমস্ত রকমের পালক ঠিকমত রাখার জন্যে দেখা যায় সময় পেলেই পাখি পালকের বিন্যাস করছে। বেশির ভাগ পাখির লেজের গোড়ায় তৈলগ্রন্থি থাকে। সেখান থেকে চঞ্চুতে ক'রে তেল নিয়ে পালক মাজাঘষা করে। যে-সব পাখির তৈলগ্রন্থি নেই, তাদের পালক থেকে এক রকমের পাউডারের মত পদার্থ নির্গত হয়ে পরিষ্কার করে। অনেক সময়ে এই পরিষ্কারকালে ডানা বা লেজ ঝাড়লে সেই পাউডার ধুলোর মত ওড়ে।

পাখির লেজ কি নৌকোর হালের মত?

নির্মোচন বা কুরিচ খাওয়া কাকে বলে?

পাখি যতই তার পালকের বিন্যাস করুক আর যত্নে রাখার চেষ্টা করুক পালকের অবনতি ঘটবেই। অন্তত বছরে একবার সব পাখিরই পুরনো পালক পড়ে গিয়ে নতুন পালক গজায়। একেই নির্মোচন বা কুরিচ (Moult) খাওয়া বলে। এই কুরিচ আরম্ভ হয় খুব ধীরে। বেশির ভাগ পাখির ক্ষেত্রে শুরু হয় কোমর থেকে মাথায়। হাঁস বা অন্যান্য জলার পাখিদের আরম্ভ হয় ওড়ার পালক থেকে। এই সময় এদের গায়ে ব্যথা হয়, নড়াচড়া কম করে।

পাখির শরীরের হাড় কি ধরনের?

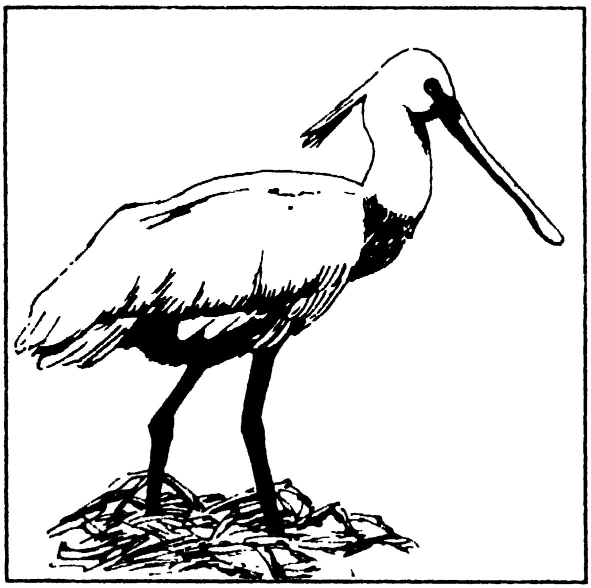
শুধু যে পাখির পালকই হালকা তা নয়, এদের শরীরের অনেকগুলি বড় বড় হাড় ঠিক বাঁশের মত ফাঁপা, সুতরাং বিলক্ষণ হালকা। পাখিকে শূন্যে বিচরণ করতে হয়, শরীরকে হালকা না করলে ভাসবে কি করে? ফাঁপা ও হালকা এইসব হাড় সেই অনুপাতে বেশ শক্ত।

সব পাখির বুকের হাড় আবার একরকম নয়। যারা উড়তে পারে তাদের বুকের হাড় চওড়া এবং ওই সব হাড়ের তলার দিকের মাঝখানটা জলিবোটের মত। ওড়বার সময়ে এদের ক্রমাগত ডানা নাড়তে হয়। এতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা তারা সংগ্রহ করে বুকের চওড়া হাড় ও তার সংলগ্ন মাংসপেশী থেকে। যে-সব পাখি উড়তে পারে না, তাদের বুকের হাড় সাধারণ নৌকোর তলদেশের মত গোলাকার।

পাখির কি ঠোঁট হয়?

পাখির ঠোঁট হয় না। স্তন্যপায়ীর ঠোঁট পাখির চঞ্চু। উপর ও নীচের চোয়াল শিঙের মত পদার্থে পরিণত হয়ে তৈরি হয়েছে। মাথার লোম আর চামড়া ছাড়িয়ে ফেললে দেখা যাবে সবটাই চঞ্চু আর চোখ।

চঞ্চুর প্রয়োজন পাখির বড় বেশি। এটিকে দিয়ে সে কোনো



চামচ বাজার

ফল বা আর কিছু খুঁটে তোলে এবং পাকা কারিগরের মত কাজ চালায়। এটি তার মস্ত বড় হাতিয়ার। হাতুড়ি, ছেনি, বাটালি, তুরপুন, কাঁচি, বাদামভাঙা কল, শিকারের অস্ত্র, বাজারের থলে—কি নয়। দেহ বিন্যাস, বাসা বানানো, বাচ্চাদের খাওয়ানো, শত্রুবধ এবং আত্মরক্ষা সব কাজই সে করে তার চঞ্চু দিয়ে। প্রত্যেক জাতের পাখিরই চঞ্চুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, ঈগল বা বাজ জাতীয় পাখির চঞ্চুতে দাঁতের মত (Festoon) আছে যা দিয়ে সে মাংস ছেঁড়ে,

গগনভেড়ের চঞ্চু কী রকম?

কাদাখোঁচা (Snipe) বা চামচ বাজারের (Spoonbill) চঞ্চু এমন যে সে তা কাদার মধ্যে ডুবিয়ে কাদা ছেঁচতে পারে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে। টিয়া-চন্দনার চঞ্চু বাদামভাঙা কল, গগনভেড়ের (Pelican) বাজারের থলে, গয়ারের (Snake bird বা Darter) মাছগাঁথা বল্লমের মত চঞ্চু দেখা যায়।

বিভিন্ন জাতের পাখির বিভিন্ন রকমের পা দেখা যায় কেন?

পাখির পা নানা বৈচিত্র্যের। কারো দৌড়োবার, কারো আঁচড়াবার, কারোর হাতের মত কোনো কিছু ধরার, কারোর বা জলের ধারে কাদার উপরে ঘুরে বেড়াবার, কারো আবার সাঁতার দেবার ব্যবস্থা আছে। জলপিপির (Jacana) পায়ের পাতা এমন যে, স্বচ্ছন্দে জলে ভাসা শালুকের পাতার উপর দিয়ে সে হেঁটে চলে। বক নরম কাদার উপর দিয়ে হাঁটে পায়ের পাতা না ডুবিয়ে। বাজ আর ঈগল পা দিয়ে

হাঁসের পায়ের পাতা কি জোড়া?

শিকারকে চেপে ধ'রে চঞ্চু দিয়ে ছিঁড়ে খায়। টিয়া-তোতা ঠিক মানুষের মত খাদ্যবস্তু তুলে মুখে দেয়। কেউ কেউ যে আবার ন্যাটা অর্থাৎ বেঁয়ো—তাও নজরে আসে। সাঁতারের জন্যে হাঁসের পায়ের পাতা যেমন জোড়া, কারণ্ডব বা ডোমকুরের (Coot) পায়ের পাতা জোড়া নয়, তা ঝালরের মত, তাতেও তাদের সাঁতারের কোনো অসুবিধে হয় না। ডুবুরি বা পানডুবিদের (Grebe) পায়ের পাতাও তাই, কিন্তু জলের তলায় এমন পাকা সাঁতারু দেখা যায় না।

বাতাসীর পা কি খুব ছোট?

কিছু পাখির পায়ের প্রধান কাজ আক্রমণ বা আত্মরক্ষা। যেমন, মুরগি ও জীবঞ্জীবদের (Pheasant) পায়ের কাঁটা।

বাতাসীর (Swift) চঞ্চু ও পা দুই-ই খুব ছোট। মুখ আর ডানা তাদের প্রধান। কারণ শূন্যেই থাকতে হয় এত বেশি সময় যে চঞ্চু আর পায়ের প্রয়োজনই হয় না, একমাত্র বাসায় ঢোকার সময় ছাড়া। হাওয়াশীল বা আবাবিল (Swallow) ও ছেপকার (Nightjar) পা-ও খুব ছোট, হাঁটতেই পারে না।

পাখির কি হাঁটু আছে?

পাখির পায়ের যে অংশটা আঙুল থেকে শুরু হয়ে লোমহীন, ভিতর দিকে বাঁকানো, সেটাকে আমরা পাখির হাঁটু বলে ভাবি—ঠিক এরপর থেকে পায়ের পালক দেখা যায়। আসলে এটা কিন্তু হাঁটু নয়। এ হল পায়ের গাঁট ও গোড়ালি। হাঁটু আরো উপরে। মুরগির ঠ্যাং খেতে গেলে যেটাকে ধরে জঙ্ঘার নরম মাংসে কামড় বসাই সেটাই হাঁটু।

কোনো কোনো পাখি শুধু 'শীতের অতিথি' হয়েই আমাদের দেশে আসে কেন?

শীতকালে আমাদের আশেপাশে একটু লক্ষ্য করলেই আমরা কয়েক ধরনের পাখিকে দেখতে পাই যাদের আর অন্য কোনো ঋতুতে দেখি না। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। অনেকে এই পাখির দলকে 'যাযাবর' বলেন। যাযাবর অর্থে যারা প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করে, এরা কিন্তু তা নয়। এক বিশিষ্ট সময়ে তারা আসে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে তারা চলে যায়। এদের বলা উচিত পরিযায়ী পাখি (Migratory birds)।

পাখির পরিযাণ (Migration) সারা পৃথিবী জুড়েই হয়। বেশির ভাগ দেখা যায়, উত্তর গোলার্ধের পাখি দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে উড়ে যায়। উত্তর আমেরি‍‍ উত্তর ইউরোপ, রাশিয়া, সাইবেরিয়া থেকে পাখি পরিযাণ করে ভারত, শ্রীলঙ্কা, বর্মা, জাভা, সুমাত্রা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এমন কি দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত। সর্বক্ষেত্রে আবার তা নয়।

পাখির পরিযাণ নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই বিস্ময়কর জীবটির বিস্ময়কর আচরণের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি।

আমাদের দেশে পরিযায়ী হয়ে কত পাখি আসে?

ভারতে পরিযায়ী হয়ে পাখি আসে 350-এর উপরে—প্রায় 400-এর কাছাকাছি। অনেকের ধারণা, কেবল শীতকালে হাঁসেরাই বুঝি পরিযায়ী হয়ে আসে। কিন্তু তা নয়, বহু জাতের ছোট-বড় সব রকমের পাখিই আসে। আসে দু'টি প্রধান পথে। এক, সিন্ধু উপত্যকার ভিতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম হিমালয় পার হয়ে; দ্বিতীয়, মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়া থেকে সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র নদ ধরে পূর্ব হিমালয়ের ভিতর দিয়ে। সাঁড়াশির মত দুই পথে এসে নেমে যায় কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। কিছু আবার শ্রীলঙ্কায় গিয়েও হাজির হয়। সম্প্রতি আর একটি পথের সন্ধান পাওয়া গেছে পর্বতারোহীদের কল্যাণে। তাঁরা দেখেছেন পাখিরা সোজাসুজি হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরগুলি পার হয়ে আসছে। এটা শর্টকাট পথ। এই পথে বহু জাতের হাঁস, জলার পাখি ও গাছের পাখিরা এসেছে। দিনে তাঁরা পাখিদের দেখেছেন আর রাতে সর্বোচ্চ স্থানে খাটানো তাঁবুতে শুয়ে শব্দ পেয়েছেন ডানার ঝাপটের এবং কাকলির। হিমালয়ের এবং কারাকোরাম পর্বতের হিমবাহের মধ্যে তাঁরা দেখেছেন মৃত পাখিদের দেহাবশেষ। এ-সব পাখি মারা পড়েছে তুষার ঝড় ও ঝঞ্ঝায়। এ-সত্ত্বেও তারা ভারতে আসে এবং ফিরে যায়। এই আসা যাওয়ার কামাই নেই। যুগ যুগ ধরে চলছে। অভ্যেসটাকে সম্ভবত তারা বহন ক'রে নিয়ে যায় জিনের (Gene) মাধ্যমে। কারণ ইনকিউবেটারে ডিম ফুটিয়েও দেখা গেছে বড় হওয়া পাখির ছানাদের ভিতরে অস্থিরতা জেগেছে, ভিতরের তাগিদে তারা পরিযায়ী হয়েছে। হয়তো আভ্যন্তরীণ কোনো ঘড়ি তাদের বলে দেয়, পরিযাণের সময় এসে গেছে।

আবার দেখা গেছে, পাখিদের মধ্যে অভিযানের প্রবৃত্তি। যারা পরিযায়ী হয়ে কখনও ভারতে আসে না, এইরকম দু'একটি পাখিকে ভারতের আকাশে বা জলায় দেখলে বিস্ময় জাগে। কেন তারা এল?

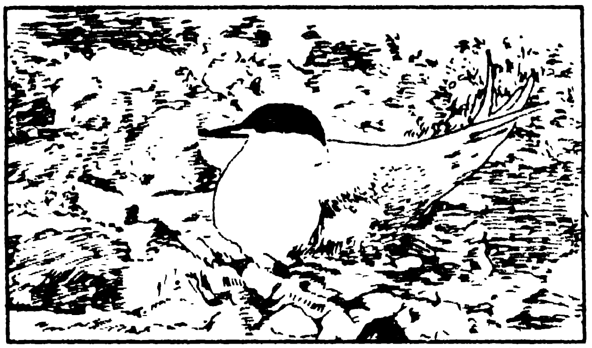
আমরা যেমন কোনো দেশ বা জায়গা পছন্দ হলে সেখানে গিয়ে বাস করি, তেমনই কিছু পাখি পরিযায়ী হয়ে এসে বসবাসও করে। তারা আর ফিরে যায় না। প্রশ্ন,

পরিযায়ী হবার আভ্যন্তরীণ তাগিদ কেন হারিয়ে ফেলে তারা?

এইসব নানা প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা যতদিন না পক্ষিবিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করছেন ততদিন আমাদের কাছে পরিযাণের ঘটনা বিস্ময়ের বস্তু হয়েই থাকবে। [দ্রষ্টব্যঃ পাখিরা পরিযাণ কেন করে? (প্রাণিবিজ্ঞান)]

পরিযাণের সময়ে সবচেয়ে বেশি দূরে পাড়ি দেয় কোন পাখি?

পরিযাণের সময়ে এক এক পাখি এক একরকম দূরত্ব পাড়ি দেয়। কিন্তু সবচেয়ে যে লম্বা পাড়ি দেয় সে হল মেরু



মেরু পানপায়রা

পানপায়রা (Arctic Tern), লম্বায় এ পাখি 35-37 সেন্টিমিটার। ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার উত্তরাংশের অর্থাৎ সুমেরু অঞ্চলের বাসিন্দা এরা। এদের চঞ্চু রক্তরাঙা এবং অন্যান্য পানপায়রা থেকে লেজ লম্বা। এরা কখনও জমির উপর দিয়ে উড়ে পরিযায়ী হয় না। সব সময়ে সমুদ্রের উপর দিয়েই ওড়ে এবং একবারও না থেমে 17-18 হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে পৌঁছোয় দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে, সুমেরু থেকে কুমেরুতে। পরিযায়ী কাল শেষ হলে আবার ফিরে আসে নিজের বাসভূমিতে। ডিম পাড়ে 1-3টি। 35-36 হাজার কিলোমিটার এরা ভ্রমণ করে এক বছরে। এরোপ্লেনে অনুসরণ ক'রে এদের পথ-পরিক্রমা আর আচার-ব্যবহার দেখা হয়েছে। কোনো কোনো সময়ে আসা-যাওয়ার পথে দু'একটা পাখি সমুদ্রে নেমেছে কিন্তু বিশ্রাম নিয়েই আবার উড়েছে।

কাক কি ভাবে কোকিলের চালাকির কাছে হার মানে?

কোকিল পরভৃত বংশীয় (Cuculidae) কাকপুষ্ট গণের (Eudynamys) এক প্রজাতি (Species)। পরভৃত বংশীয় পাখি বলে এরা নিজের বাসা বানায় না, ডিমেও তা দেয় না। সবই পরস্মৈপদী সারে। এই সময়ে এদের চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর যে কাক তাকেও একদম বোকা বানিয়ে ছাড়ে। পুরুষ কোকিল কাকের বাসার কাছে এসে এমন বিরক্তি উৎপাদন করে যে কাক বাসা ছেড়ে ওর পিছু পিছু ধাওয়া করতে বাধ্য হয়। কোকিলও এদিক ওদিক করে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই ফাঁকে স্ত্রী-কোকিল বা ছিট কোকিল এসে খালি বাসায় ডিমটি পেড়ে চলে যায়।

কাকেদের সঙ্গে তাল রেখে কোকিলদেরও প্রজনন কাল মার্চ থেকে অগাস্ট, তবে মে থেকে জুলাই মাসেই বেশি। কোকিলের ডিম হুবহু কাকের ডিমের মত দেখতে, তবে আকারে একটু ছোট। এর রঙ সবুজাভ, ধূসরের উপর লালচে—পাটকিলের ছিট ও ছোপ। কোকিলের ডিম আগে ফোটে—13 থেকে 14 দিনে, পাতিকাকের 16-17 দিনে আর দাঁড়কাকের 18-20 দিনে। আগে ফোটার জন্যে খাদ্যের বড় ভাগটা এদের জোটে বেশি। আসল ছানারা উপোস করে। এ-ছাড়াও দেখা যায় একটু বড় হয়ে বাসার বাইরে এলে বাড়তি খাবার স্ত্রী বা ছিট কোকিল এনে খাওয়ায়। এই সময়ে কোকিল ছানা কাকের ভাষায় কর্কশ গলায় 'কা-আ-আ' ডাকে। আশ্চর্য লাগে এই ছানা অবস্থায় কোকিল কাকের আনা পচা-গলা মাছ-মাংস নাড়িভুঁড়ি

পাতিকাকের ডিম আগে ফোটে না কোকিলের ডিম?

ইত্যাদি খেয়ে পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু বড় হয়ে এই ধরনের খাদ্য খায় না। পাতিকাক বা দাঁড়কাকের বাসায় ডিম পাড়া ছাড়াও কোকিল সময়ে সময়ে বেনে-বৌ ও শালিকের বাসাতেও ডিম পেড়ে থাকে।

[দ্রষ্টব্যঃ কাকের বাসায় কোকিল কেন ডিম পাড়ে? (প্রাণিবিজ্ঞান)]

পাতিকাকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি? মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে তাদের ভিতর কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে?

বায়স বংশের (Corvidae) অন্তর্ভুক্ত পাতিকাক লম্বায় প্রায় 43 সেমি। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে একই রকমের।

পাতিকাক খায় না এমন জিনিস নেই। মানুষে যা যা খায় তাতো খায়ই, আর মানুষে যা খায় না, তাও খায়। মানুষ যেখানে, পাতিকাক সেখানে। কী শহর, কী গ্রাম, কী বনজঙ্গল, মরুভূমিই বা কী। লোক বসতি থাকলেই হল।

পাতিকাক দলছাড়া বাস করে না, সে দল খুব ছোটই হোক বা বড়। কতকগুলি বড় গাছ বেছে নিয়ে এদের হাজারে হাজারে বাস করতে দেখা গিয়েছে। একেবারে রীতিমতো কাক-কলোনি।

রাত্রিবাসের গাছের তলায় চারিদিকে মরা কাক ইতস্তত পড়ে আছে দেখা যায়। এদের মৃত্যুর হার খুব বেশি। রোগেই বেশি, কিছু আবার বহেরি-বাজের (Falco pereglinus) হাতে চোট খেয়ে মরে। কারণ, বহেরি-বাজদের ওষুধ ও পথ্য হল কাকের মাংস।

স্বজাতির প্রতি পাতিকাকের ভালবাসা খুব। দলের একজন বিপদে পড়লে দলশুদ্ধ চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে এবং যতক্ষণ না সঙ্গী বিপদমুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই শান্ত হয় না। আবার দলের কেউ শাস্তির যোগ্য হলে তাকেও সহজে ছাড়ে না। মানুষের যেমন পঞ্চায়েতি, কাকেদেরও তেমন পঞ্চায়েতি সভা বসতে দেখা যায়। শ'খানেকের উপরও কাকের সভা নজরে পড়ে। সভায় কিছুক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা চলে। শেষে সকলে মিলে তাড়া করে

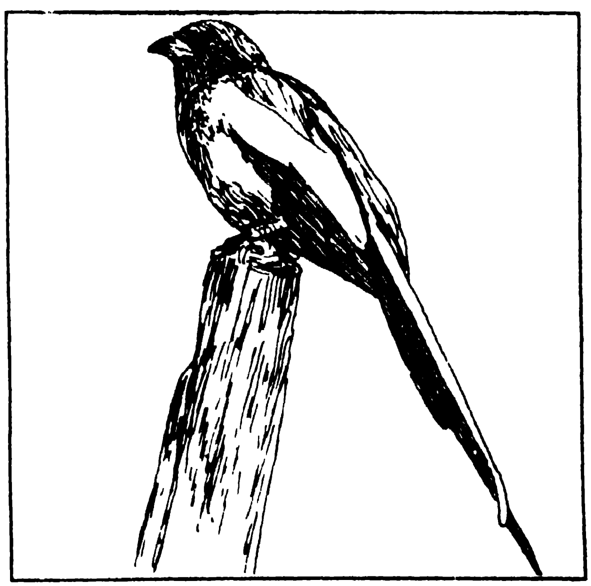
পাতিকাক কত লম্বা?

অপরাধীকে আঁচড়ে কামড়ে এমন নির্যাতন করতে থাকে যে, সময় সময় বেচারার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে পাতিকাক ভয়ানক সাহসী ও চৌর্যবৃত্তিতে পাকা। ঘরে দোরে সোজা চলে আসে। ফাঁক পেলেই চুরি করে, কিন্তু সব সময় সতর্ক। সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা দেখলেই চম্পট। কোন ফাঁকে ঝাঁ ক'রে এসে টেবিল থেকে খাবার তুলে পালাবে তা টের পাওয়ার উপায় নেই। ছোট ছেলেপুলের হাত থেকে খাবার কেড়ে খেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। বাজারে দোকানী একটু অসতর্ক হলেই চুরি করে। ময়রার দোকানও বাদ যায় না। রেলস্টেশনে খাবারের গাড়ি বা মাথায় ক'রে যারা ফিরি করে একটু অন্যমনস্ক হলেই তাদের বিক্রির খাবার এই তস্করের হাতে খোওয়া যাবে। কেবল মানুষই এদের হাতে বিব্রত হয় তা নয়, অন্যান্য পশু-পাখিও বাদ যায় না। চিল, শকুনকে বিরক্ত ক'রে ঘাড়ে পিঠে চেপে খাদ্যে ভাগ বসাতে এদের জুড়ি নেই। এরা কুকুর-মুরগির খাবার শুধু চুরি ক'রেই খায় না, তাদের পিছনেও লাগে। গরু-মহিষের পিঠে বসে ঘায়ের পোকা খেয়ে যেমন উপকার করে আবার তেমনি মাংসও ছিঁড়ে নেয়।

আয়রে পাখি লেজঝোলা। খেতে দেব চাল কলা।। খাবি দাবি কলকলাবি। খোকনকে নিয়ে খেলতে যাবি।। এটি কোন পাখি?

এই পাখিটির নাম হাঁড়িচাচা (Tree Pie)। এটি টাকাচোর বা টেঁকিলেজা (Dendrocitta Vagabunda) নামেও পরিচিত। অদ্ভুত ধাতব আওয়াজ 'কুট্টম-আলি'র (এলি) সঙ্গে মিলিয়ে কোনো কোনো জায়গায় নাম—কুটুম পাখি। ডাকটা কড়াই, পেতল বা তামার হাঁড়িতে খুন্তি বা



হাঁড়িচাচা

হাতা দিয়ে বেকায়দায় তলা চাঁছলে যে রকম একটা অদ্ভুত অস্বাচ্ছন্দ্যকর সুরের আওয়াজ বের হয় ঠিক তেমনি।

হাঁড়িচাচা স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। লম্বায় লেজ সমেত 50 সেমি। লেজটাই প্রায় 30 সেমি। দেহ বাদামী পাটকিলে। মাথা, গলা ও বুকের কিছু অংশ পাটকিলে আভাযুক্ত ফিকে কালো। লেজের 12টি পালকের মাঝের 2টি খুব বড় এবং দু'পাশেরগুলি পর পর ক্রমশ ছোট,

হাঁড়িচাচার স্ত্রী-পুরুষ কি একই রকম দেখতে?

লেজের সব পালকেরই শেষপ্রান্ত কালো। ছোট ডানা ও লেজের কয়েকটা পালক ধূসর-সাদা, বাকি কালো, বিশেষত ওড়ার পালক। কালচে স্লেট-ধূসর চঞ্চু ঈষৎ চাপা ও বাঁকা। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, পা গাঢ় স্লেট-ধূসর। পিছনের নখরযুক্ত পা-টি একটু বড়।

এর খাদ্য পোকামাকড়, টিকটিকি-গিরগিটি, ছোট সাপ, ব্যাঙ, বিছে, কেন্নো, ফলপাকুড়, ছোট বা অসুস্থ কোনো ছোট পাখি, পাখির ডিম, পাখির ছানা, অর্থাৎ প্রায় সর্বভুক। সুযোগ পেলে মরা ভক্ষণেও আপত্তি নেই। এমন কি মাঝে মাঝে চামচিকেও খেয়ে থাকে।

হাঁড়িচাচা পুরোপুরি বৃক্ষবাসী, মাটিতে নামে না বললেই হয়। গাছের ডাল ও কাণ্ডকে কাঠঠোকরার মত নখ দিয়ে আঁকড়ে লেজের সাহায্যে ভারসাম্য বজায় রেখে গাছের ছালের ভিতর থেকে ঠুকরে পোকা ধরতে এদের প্রায়ই দেখা যায়। মানুষের কাছাকাছি বাস করলেও একটু লাজুক প্রকৃতির, কাছে বড় ঘেঁষে না।

এরা যূথচারী নয়। সাধারণত জোড়ায়, সময়ে সময়ে 5-6টির ছোট দলে বিচরণ করে। উত্তর ও মধ্য ভারতে

হাঁড়িচাচা ক'টা ডিম পাড়ে?

দেখা যায়। দাঁড়কাকের মত এরাও ডেকে বাঘ এবং গুলবাঘদের অস্তিত্ব শিকারীদের জানিয়ে দেয়।

প্রজননের সময় ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাইয়ের শেষ, কখনো-সখনো অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গড়ায়। তবে মার্চের শেষ থেকে জুনের মধ্যেই বেশি বাসা বাঁধতে দেখা যায়। এরা বাসা বাঁধে মগডাল ঘেঁষে দুই ডালের মাঝে, কিন্তু সাধারণত খুব উঁচু গাছে নয়। একটু ঝোপ পাতা বেশি এমন আম বা বাবলা গাছই পছন্দ। নিম গাছেও বাসা বাঁধতে দেখা যায়। আবার ফণিমনসার ঝোপেও এদের বাসা দেখা গেছে। বাসা কখনও এলোমেলো অগোছালো, কখনও বা খুব পরিপাটি ক'রে তৈরি। বড় কাঠি ও কাঁটাগাছের সরু শুকনো ডাল হচ্ছে বাসার ভিত। তার উপর ঘাস খড়, কখনও কখনও পশম বিছনো। স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে বাসার ও সন্তান পালনের যাবতীয় কাজ বা দায়িত্ব পালন করে।

হাঁড়িচাচা সাধারণত 2 থেকে 3টি ডিম পাড়ে। কোথাও কোথাও 4-5 টি ডিম পর্যন্ত দেখা যায়। ডিম সরু এবং মুখটা একটু ছুঁচলো। মাঝে মাঝে ডিমে একটা চকচকে ভাব থাকে। রঙেও তফাত থাকে, তবে প্রতিটি খেপের ডিমের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখে। দুটি প্রধান রঙ নজরে

হাঁড়িচাচা কি যূথচারী?

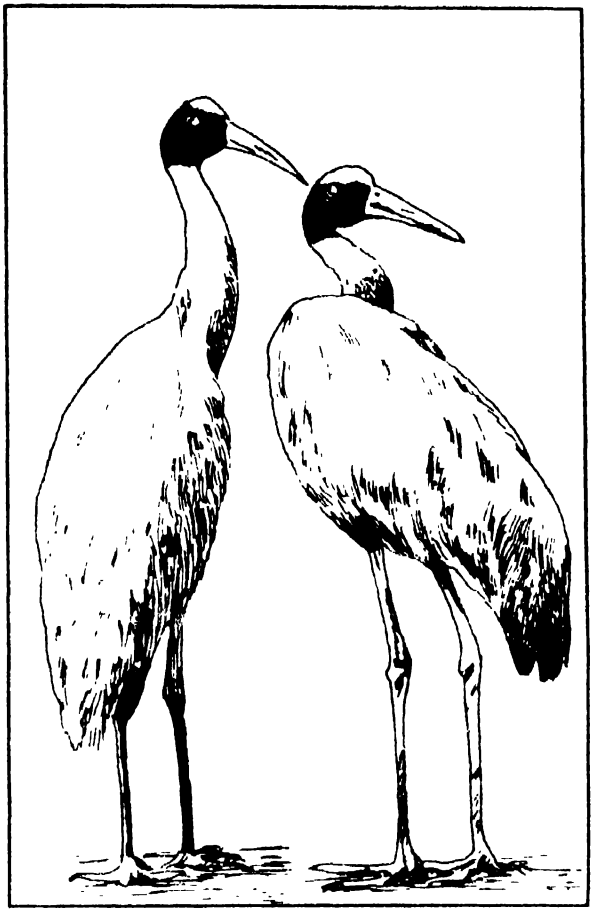
পড়ে বেশি। একটি ফিকে সবুজের উপরে গাঢ় এবং হালকা ধূসর পাটকিলের ছোপ ও দাগ। দ্বিতীয়, খুব ফিকে লাল তার উপর লাল এবং গাঢ় পাটকিলের ছোপ ও ফিকে বেগুনির দাগ।

ভারতীয় পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাখি কোনটি?

সারস (Sarus Crane) পাখিই সবচেয়ে বড়। দাঁড়ানো অবস্থায় প্রায় 1.5 মিটার। চাঁদি ছাই রঙা, ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় উন্মুক্ত মাথা ও গলার লাল চামড়ার উপর খুব সরু সরু কালো লোম, কানের উপরের পালক ছাই রঙা, গলা সাদাটে, নীচে নেমে এসে মিশেছে বাকি দেহের নীলচে ছাই ধূসরের সঙ্গে। ওড়ার বাইরের পালক কালচে-পাটকিলে, ভিতরের পালক ধূসর এবং সাদাটে। কনীনিকা কমলা, ছুঁচলো চঞ্চু যেন কোনো শিঙের উপরে মলিন

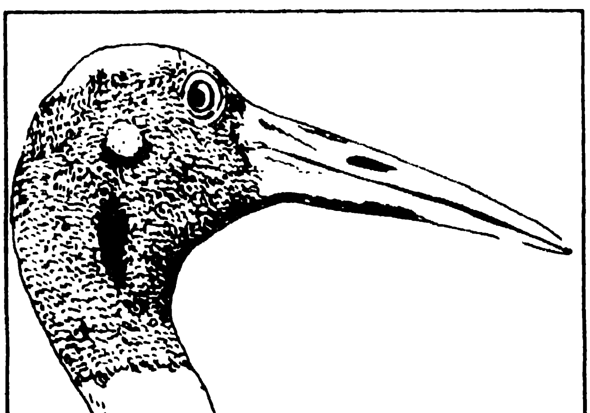
সারসের ওজন কী রকম?

সবজেটের আভাযুক্ত, ডগাটা কালো, চাঁদি ও চোখকে ঘিরে গোল চামড়া ছাই-সবুজ, লম্বা পা ও আঙুল লাল। স্ত্রী-পুরুষ



সারস

একই দেখতে, তবে স্ত্রী আকারে একটু ছোট হয়। ওজনে 6.8 কেজি থেকে ৪ কেজি।



সারস

এরপরে যে পাখিটি বড়, সেটি হল হিমালয়ের দেড়েল শকুন (Himalayan Bearded Vulture) বা লেমমারগিয়ার (Lammergier)। এদের ডানার ব্যাপ্তি পৌনে তিন মিটার থেকে তিন মিটারের কাছাকাছি।

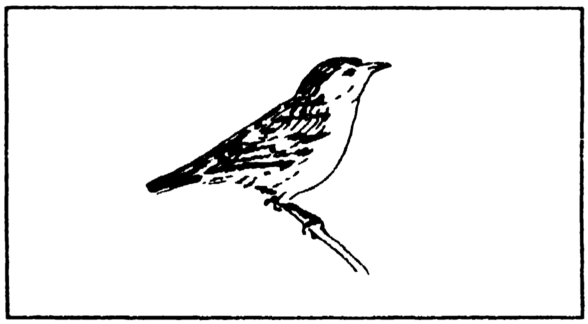
ভারতের সবচেয়ে ছোট পাখি কোনটি ?

পরাগ পাখি (Tickell's flowerpecker) লম্বায় 8 সেমি। এটি ভারতের সবচেয়ে ছোট পাখি। এরা পুষ্পান্বেষী বংশের (Dicaeidae) অন্তর্গত পুষ্পপ্রিয় গণের (Decamum) একপ্রজাতি।

স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। উপরের পালক ছাই-জলপাই, মাথার চাঁদির পালকের মাঝখান গাঢ় এবং ডানার লুকনো অংশ পাটকিলে। লেজ গাঢ় পিঙ্গল। মাথার দু'পাশ ও তলার পালক হলদের সঙ্গে লালের আভা মেশানো। কনীনিকা পাটকিলে, বাঁকানো চঞ্চু মাংস রঙের, কিন্তু একটু ফিকে ও পরের চঞ্চুর ডগা যেন শিঙের উপরে পাটকিলেব আভা যুক্ত। পা ও আঙুল সীসে রঙের, তাতে সামান্য নীলচে আভা।

এর খাদ্য পরগাছা রাস্না ও বান্দার ফল আর খুব ছোট কীট-পতঙ্গ।

পরাগ পাখিকে দেখা যায় ফলের বাগান, বনভূমি এবং



পরাগ পাখি

গ্রামের ধারে গাছ-গাছড়ার মধ্যে। এ মাটিতে নামে না। গাছের মাথায় ঘোরে বলে সহজে চোখে পড়ে না। একমাত্র এক গাছ থেকে অপর গাছে যাবার সময়ে ডানা খুলে এবং বন্ধ ক'রে ঢেউ খেলে বেশ দ্রুত উড়ে যেতে দেখা যায়। যে-সব গাছে পরগাছা রাস্না ও বান্দা জন্মায় সেখানে হয় এদের লীলাক্ষেত্র বা বিচরণভূমি।

এদের প্রজনন কাল ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। বাসা বানায়

প্রায় দুর্গা-টুনটুনির ধাঁচে ডিম্বাকৃতি, খানিকটা লম্বাটে পেয়ারা বা পিয়ার ফলের মত। 1.5 মিটার থেকে 12 মিটারের উচ্চতায় সরু ডাল থেকে লোকচক্ষুর আড়ালে ঝুলতে থাকে বাসাটা। প্রবেশগর্ত থাকে খানিকটা উপরে। বাসার মূল

পরাগ পাখির ডিম কী রকম?

উপকরণ নরম উদ্ভিদের খুব সরু সরু আঁশ। বাইরে আস্তরণ দেয় মেঠো মাকড়সার জাল, গাছের ছালের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে। ভিতরে থাকে খুব নরম সিল্কের মত আঁশ। স্ত্রী-পাখি ডিমে তা' দিতে বসে প্রবেশপথে মুখটা বের ক'রে চারিদিক দেখে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ঘর-গেরস্তালির সব কাজ করে। ডিম পাড়ে 2টি ধবধবে সাদা এবং অমসৃণ।

আমাদের দেশে সবচেয়ে সুন্দর পাখি কোনটি ?

কোনো একটি প্রজাতিকে খুঁজে বের ক'রে সর্বোচ্চ স্থানে বসানো খুবই দুরূহ। বিভিন্ন বংশের অনেক পাখিই আছে খুবই সুন্দর, বিশেষত যারা ভিজে চিরসবুজ জঙ্গলে বাস করে তাদের গায়ে অপূর্ব সুন্দর রঙের সমাবেশ দেখা যায়। এদের মধ্যে জীবঞ্জীব (pheasants) পরিবারের বেশির ভাগ পুরুষের গায়ের রঙের তুলনা হয় না। আর ছোট পাখিদের মধ্যে মৌ-টুসী (Sunbirds) পাখি, যারা চড়াই পাখি বা তার চেয়েও ছোট, তাদের রঙের বাহারও অপূর্ব। যখন উজ্জ্বল রোদের মধ্যে এক ফুল থেকে উড়ে আর এক ফুলে এসে বসে তখন উড়ন্ত অবস্থায় মনে হয় যেন জ্যান্ত মণি-মাণিক্য।

সবচেয়ে সাধারণ পাখি কোনটি ?

ভারতে সবচেয়ে সাধারণ পাখি হচ্ছে পাতিকাক (House Crow) আর চড়াইপাখি (Sparrow)। যেখানে মানুষ সেখানেই এদের দেখা মিলবে। কি পাহাড়ে, কি মরুভূমিতে সর্বত্রই এদের দেখা পাওয়া যাবে। এর পরেই নাম করতে হয় শালিক (Mynas) ও বুলবুলের। এরা মানুষের সঙ্গী।

সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য পাখি কোনগুলি ?

বোধহয় ভারতে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য পাখি হল তিনটি। প্রথম, পাহাড়ী বটের (Mountain Quail)। এর পুরুষের মুখ কালো, কেবল চোখের সামনে ও পিছনে একটা ক'রে সাদা ছোপ। কপাল এবং ভুরুতে চওড়া সাদা পটি। চাঁদি ধূসরাভ পাটকিলের উপর কালো সরু টান। উপরাংশ গাঢ় স্লেট জলপাই-পাটকিলের উপর কালো সরু টান। ডানা পাটকিলাভ এবং হালকা। নীচে চিবুক ও গলা কালো, তাকে ঘিরে সাদা টান চিবুক থেকে। লেজের তলা কালো, তার উপরে সাদা সাদা টান, বাকি অংশটা পিঠের মতন। লম্বায় 25 সেমি।

এ পাখির বাসস্থান কোথায় ঠিক জানা যায় না। খুব সম্ভবত এই পাখিটি লুপ্ত। যা কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল পশ্চিম হিমালয়ে 1600 মিটার (দেরাদুনের উপরে ঝরিপানি) এবং 2100 মিটার উচ্চতায় বানোগ, মুসৌরির পিছনে বধরাজ, নৈনিতালের কাছে শের-কা-ডাণ্ডায়। শেষ পাখিটিকে পাওয়া গিয়েছিল 1876 খ্রিস্টাব্দে শের কা ডাণ্ডায়। এ-ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়নি। 10টি মাত্র আছে পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে। এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি।

দ্বিতীয় পাখি, জংলি নাকরি (Jerdon's Courser, Doublebanded Courser)। লম্বায় এ 27 সেমি। 1900 খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্র প্রদেশের কুড্ডাপ্পায় শেষ দেখা গিয়েছিল। তারপর আবার 14 জানুয়ারি 1986 সালে কুড্ডাপ্পায় পাওয়া গেছে।

দেখতে চাঁদি ও ঘাড়ের পিছন গাঢ় পাটকিলের উপর চওড়া সাদা টান---ভুরুর উপর থেকে ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরে এসেছে। উপরের বাকি পালক লালচে বেলে-পাটকিলে। নীচে চিবুক ও গলা সাদাটে, গলার সামনে লালচে, পাটকিলে বুককে এক সাদা পটি দিয়ে ভাগ করা; বুকের তলায় আর একটি সাদা পটি, বাকি তলাটা সাদাটে। লেজ সাদা ও কালো। উড়লে ডানার তলায় একটা সাদা পটি দেখা যায়।

এর বাসস্থান ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বের জনক টি সি জার্ডনের মতে অন্ধ্রের পেন্নার, গোদাবরী উপত্যকা, নেলোর কুড্ডাপ্পা, সিরোঙ্কা, ভদ্রাচলম এবং অনন্তপুরের আশপাশে। দেখা যায় পাথুরে উঁচু নীচু জমিতে, যেখানে খুব হালকা জঙ্গল ও ঝোপ-আগাছা আছে।

তৃতীয় দুষ্প্রাপ্য পাখি, শাকনাল, ইংরেজি নাম Pink

headed Duck। লম্বায় এ পাখি 60 সেমি। পুরুষের পিঠ ও তলার অংশ কালচে-পাটকিলে, মাথায় কিছুটা ঝুঁটি, ঘাড় ও ঘাড়ের পিছন ও চঞ্চু উজ্জ্বল গোলাপী। স্ত্রী-পাখির মোটামুটি কালচে-পাটকিলে, দেহে আয়না আছে ফিকে পাটকিলে-হলুদের। আয়না কি? সাধারণত বিভিন্ন হাঁসের ডানার উপরে ডানার রঙ থেকে ভিন্ন রঙের একটা চৌকো মতন জায়গা আছে। যাদের থাকে তাদের দু'টো ডানাতেই এটা নজরে আসে। পাখির ডানায় প্রায় চৌকো এই জায়গাটাই পাখির দেহের আয়না। মাথাতেও গোলাপীর আভা, গোলাপী জায়গাটা পুরুষের চেয়ে অনেক নিষ্প্রভ এবং পুরুষদের মত সঠিকভাবে চিহ্নিত নয়।

প্রথমটি দেখা গিয়েছিল 1876 সালে এবং দ্বিতীয়টি 1900 সালে। এর মধ্যে অনেক খোঁজা হয়েছে কিন্তু দেখা পাওয়া যায়নি। এই শাকনালের ভাগ্য চরম রহস্যাবৃত। মনে করা হয় এরা অবলুপ্ত প্রজাতি। শেষ যে-নমুনাটিকে গুলি ক'রে মারা হয়েছিল তা 1935 সালে। এরপর দেখা পাওয়া গেছে বলে খবর পাওয়া যায় কিন্তু তা সবই ভুল। যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, আসলে তাঁরা দেখেছেন বড় রাঙামুড়ি বা হেরো হাঁস (রেডক্রেস্টেড পোচার্ড)।

এদের বাসস্থান হিমালয়ের তরাই এবং নেপাল থেকে আসামের ডুয়ার্সে ঘাসে ভরা জঙ্গলের বাদা, মণিপুর, বাংলাদেশ এবং বর্মা বলে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ-ছাড়া দেখা গেছে অন্ধ্রের নেলোর এবং মহারাষ্ট্রের জালনায়। শেষ যা প্রকৃত সংবাদ পাওয়া গেছে তা বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় 1935 সালে। 1956 সাল থেকে আইন ক'রে মারা বন্ধ করা হয়েছে, তবে খুব সম্ভবত এই শাকনাল লুপ্তই হয়েছে।

পাখিদের কি কোনো ভাষা আছে?

ভাষা বলতে আমরা যে-ভাবে কথা বলি, সে-ভাষায় পাখিরা কথা বলে না। তবু নিজেদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদান এবং পরস্পরকে বোঝার ক্ষমতা এদের আছে। এরা কতকগুলি শব্দ, কিছু হাবভাব দিয়ে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে। যে-সব পাখি সামাজিক তারা নিজেদের মধ্যে এইভাবে যোগাযোগ রেখে আনন্দ, ভয়, বিপদ জানায়। পাখিদের ভাষা শুধু তারা নিজেরাই বুঝতে পারে, অন্যে নয়। পাখিদের মস্তিষ্ক উন্নত নয় বলে মানুষের মত আচরণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সবচেয়ে ভাল গায়ক-পাখি কোনটি?

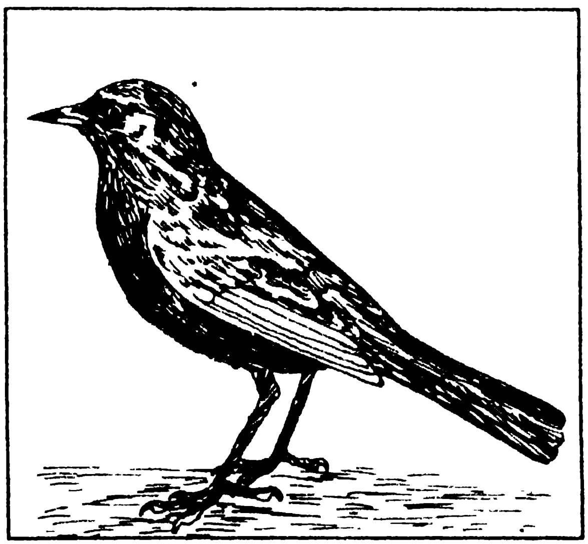
সবচেয়ে ভাল গায়ক-পাখির দিকে হাত বাড়াতে হলে প্রথমেই যে পাখিটির কথা বলতে হয়, তা হল পাহাড়ী মাসাইচা, এর ইংরেজি নাম Greywinged Blackbird. লম্বায় এ প্রায় 28 সেমি।

পুরুষের দেহ কালো, বড় ক'রে ডানার উপরে আছে পরিষ্কার ফিকে ধূসর ছাপ, পেট এবং লেজের তলায় সাদা আঁচড়। অক্ষিগোলক হলুদ, চঞ্চু কমলা।

হিমালয়ের মুরী থেকে পুবে নেপাল, সিকিম, ভুটান, অরুণাচল প্রদেশ, সেখান থেকে দক্ষিণে কাছাড় পাহাড়ে 2600 মিটার উচ্চতার মধ্যে এদের বাসা।

কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে খুব প্রিয় খাঁচার পাখি।

এর পরেই নাম করতে কস্তুরা, এর ইংরেজি নাম



কস্তুরা

Malabar Whistling Thrush। লম্বায় এ 25 সেমি। কপালটা উজ্জ্বল নীল (Cobalt blue), চাঁদি, ঘাড়, গলা এবং উপরের বুক মলিন কালো। ডানা ও লেজ নিয়ে বাকি পালক চকচকে নীলচে-কালো, ঘাড়ের উপরে উজ্জ্বল নীল। চঞ্চু, পা, আঙুল ও নখর কালো।

এর বাসস্থান পশ্চিমঘাট, মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি,

ওড়িশায় সম্বলপুর এবং তামিলনাড়ুর শেভারয় পাহাড়ে।

এ পাখি এমন শিস দেয় যেন মনে হয় রাস্তা দিয়ে কেউ শিস দিয়ে যাচ্ছে।

দোয়েল, শামা নাচে রে—শামা পাখি চিনবো কী করে?

শামা পাখি লম্বায় 25 সেমি। পুরুষদের মাথা ও পিঠ চকচকে কালো, বস্তিপ্রদেশ সাদা। লেজ মোটা থেকে সরু, বাইরের পালক প্রধানত সাদা, ওড়ার সময় পরিস্ফুট হয়

> **শামা পাখি লম্বায় কত বড়?**

ঘাড়ের পালক কালো এবং লম্বাটে। নীচে গলা ও বুক চকচকে কালো, পেট এবং লেজের তলা লালচে। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু কালো, পা, আঙুল ও নখর ফিকে মাংসল। স্ত্রী-পাখিও মোটামুটি একই রকমের।

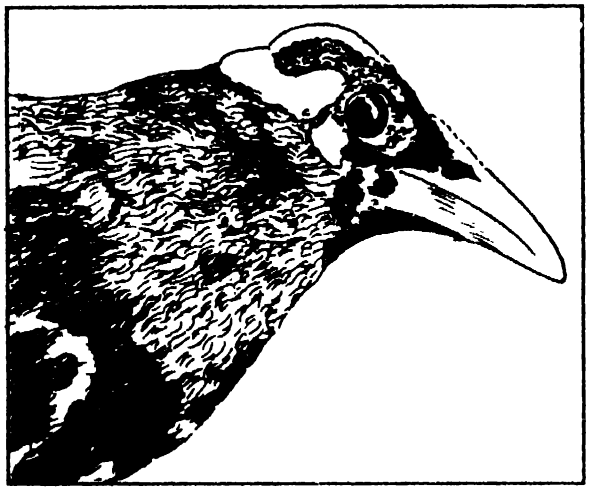
আমাদের দেশের প্রায় সব জায়গায় 1050 মিটার উচ্চতার মধ্যে এ-পাখিটি পাওয়া যায়।

সাধারণত এ-পাখি মানুষের বাসস্থান বাঁচিয়ে চলে। গাইয়ে পাখি বলে প্রচুর নাম। পরিষ্কার মিষ্টি গলা, গলায় বেশ জোরও আছে।

ভারতের কথা কইয়ে পাখিদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

ভারতীয় কথা কইয়ে পাখিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাখি পাহাড়ী ময়না, যাকে আমরা ময়না বলে চিনি। মানুষের গলার স্বর এবং কথা বলা যে কোনো টিয়া-চন্দনার চেয়ে ভাল। মানুষ একে খাঁচায় পোষে কারণ একে সহজেই পাওয়া যায়। যে কোনো আওয়াজ তুলতে এবং কথা বলায় খুবই দক্ষ। মানুষের হাসি, কান্না, হাঁচি ও কাশির অবিকল নকল এমন ভাবে করে যে তা অন্য পাখির পক্ষে অসম্ভব। খাঁচার পাখি হিসেবে সকলের কাছেই এর খুব সমাদর।

ময়নার দেহের সমস্ত পালক কুচকুচে কালো, তার উপর সবুজ ও বেগুনির আভা। কেবল ডানার বড় পালকগুলির কয়েকটি মাঝামাঝি সাদা। ডানা না মেললে সব সময়ে দেখাও যায় না। চঞ্চু কমলা-লাল। ডগায় একটু হলুদের ছোঁয়াচ। পা কমলা-হলুদ, নখর কালচে-পাটকিলে। চোখের তলা ও পিছন দিকে ঘুরে ঘাড়ের উপর পালকহীন ত্বক উজ্জ্বল হলুদ। যেগুলির গাঢ় ও উজ্জ্বল তাদের সোনাকানী



ময়না

এবং যাদের ফিকে তাদের রূপোকানী বলে।

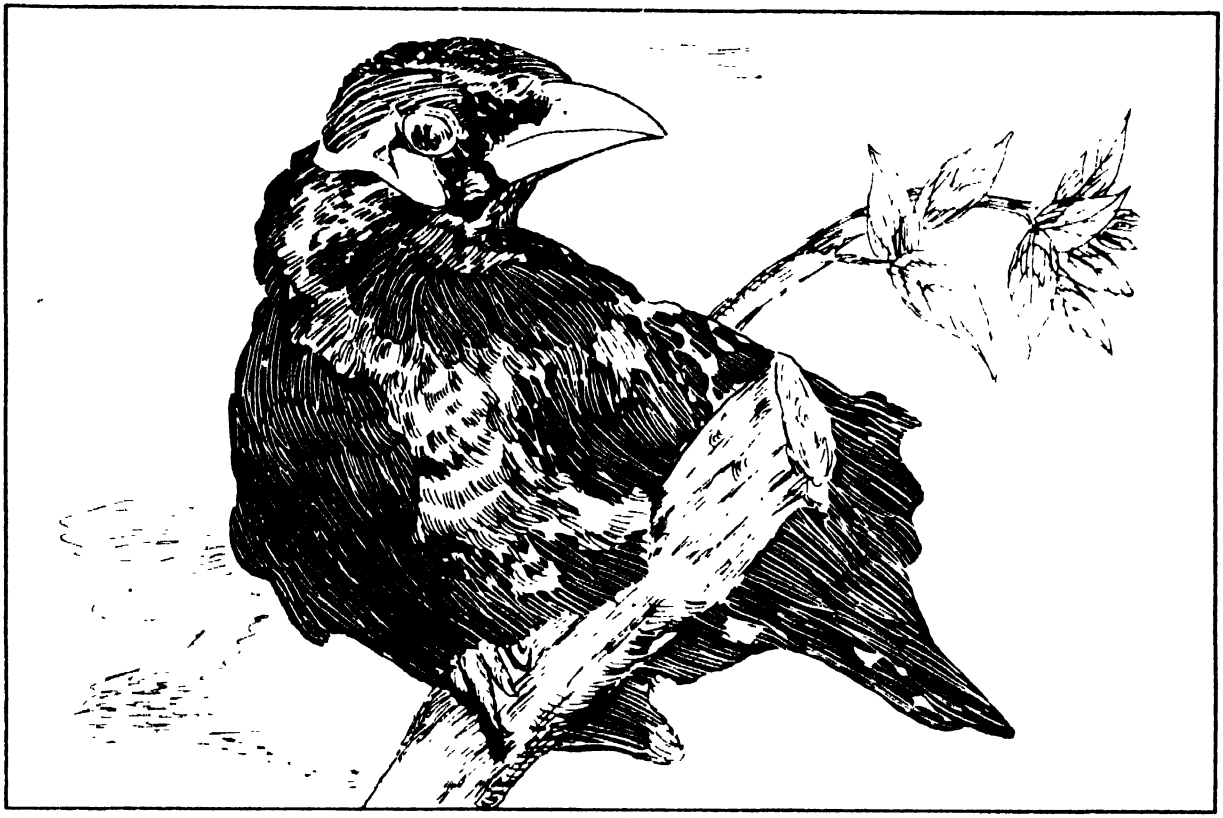
আমাদের দেশ ছাড়া শ্রীলঙ্কা, বর্মা, মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং বোর্নিওতেও এ-পাখি পাওয়া যায়।

ঘন অথবা পাতলা জঙ্গলে গাছে-গাছেই ময়না বিচরণ করে। চা কফি ইত্যাদি ক্ষেতের ধারের গাছেও দেখা যায়। প্রজননের সময় ছাড়া এরা সাধারণত ছোট বা বড় দলে ঘুরে বেড়ায়। গাছের মগডালই এদের প্রিয়, কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হলে তবেই এরা নীচের দিকের ডালে নামে অনুসন্ধানের জন্যে। মধ্যে মধ্যে মাটিতেও নামে। কিন্তু

> **ময়না কি গাছের মগডালে থাকতে ভালবাসে?**

তাদের হাঁটাটা ময়নার বংশানুযায়ী নয়, চড়াই-এর মত জোড় পায়ে লাফিয়ে চলে। এরা ওড়ে দ্রুতগতিতে এবং সোজাসুজি। ওড়ার সময়ে এদের ডানার ঝাপটে একটা ধাতব শব্দ নিঃসারিত হয়।

ময়না বাসা বাঁধে মরা ভঙ্গুর গাছে, যে গাছে মানুষের চড়া খুব বিপজ্জনক। গাছটা একটু ফাঁকা জায়গায় বা ক্ষেতের ধারে হলেই পছন্দ। মাটি থেকে 6-21 মিটার উঁচুতে গাছের কাণ্ডে গর্তের ভিতর অল্প ঘাস, পালক, পাতা ও গাছের ছালের নরম টুকরো দিয়ে আস্তরণ বিছোয়। গাছের গায়ের গর্তটি ময়না নিজেই বানায়।



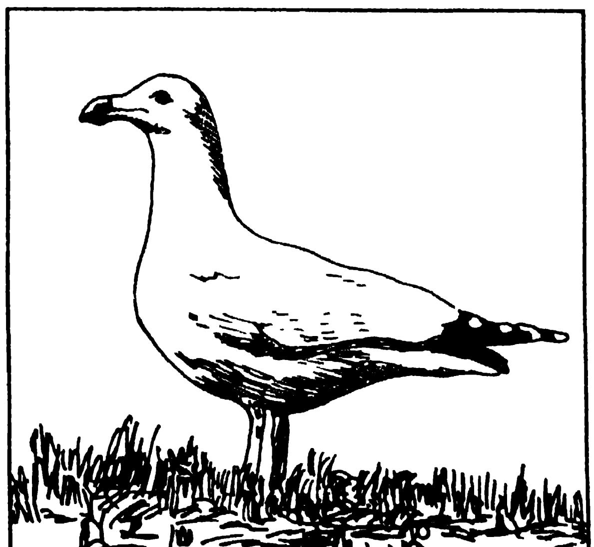
ময়না

পাখি কত বছর বাঁচে?

পাখি কত বছর বাঁচে তা নির্ভর করে সে কোন প্রজাতির পাখি, আর কোন পরিবেশে কি অবস্থায় সে আছে তার উপরে। স্বাভাবিক পরিবেশে পাখি কতদিন বাঁচে তা বলা খুবই কঠিন। বাচ্চা অবস্থায় বাসায় থাকার সময়ে পাখির গায়ে মার্কা মেরে সেটা হয়তো সম্ভব। কিন্তু বেশির ভাগ

চড়াই পাখি কতদিন বাঁচে?

বাঁচার বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের বন্দী অবস্থায় রেখে। সেটা কোনো মতেই স্বাভাবিক নয়। সাধারণত ধারণা করা হয়, যে-পাখি আকারে বড় তার আয়ুও বেশি। বন্দী অবস্থায় দেখা গেছে একটা উটপাখি 40 বছর, ডোমকাক (Raven) 69 বছর, আর একটি ডোমকাক দেখা গিয়েছিল 50 বছর বাঁচতে। চড়াই পাখিকে মাঝে মাঝে 25 বছর বেঁচে থাকতে দেখা গেছে, যদিও তাদের স্বাভাবিক আয়ু 5 থেকে 8 বছর। শকুন 52, হুতোম পেঁচা (Horned owl) 68, মরাল (Swan) 25, পায়রা 22 থেকে 35 এবং



হেরিং গাংচিল

ময়ূরকে 20 বছর বাঁচতে দেখা গেছে। বুনো পাখির ক্ষেত্রে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় দাগ মারা পদ্ধতিতে দেখা গেছে—হেরিং গাংচিল (Herring Gull) 26 বছর, বেনে বৌ 8, দিগহাঁস (Pintail) প্রায় 13, কাক (Grey Heron) প্রায় 16, কস্তুরা (Blackbird) 10, চোপ্পা বা সাদা কাষ্ঠচূড়া (Curlew) সাড়ে 31 এবং চিল পৌনে 26 বছর বাঁচে।

নীলপরী পাখি কাকে বলে? কোথায় পাওয়া যায় এবং তার বৈশিষ্ট্য কি?

নীলপরী পাখি দণ্ডচারী বর্গের অন্তর্গত নীলচ্ছবি বংশের এক প্রজাতি। ইংরেজি নাম Fairy Bluebird। ভারতে দু'টি প্রজাতিতে এদের দেখা যায়। একটিকে (Irena Puella sikkimensis) দেখা যায় হিমালয়ের নিম্নভূমিতে, সিকিম থেকে আসামের মিরি, খাসি, কাছাড় ও মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে 1200 মিটারের মধ্যে; অপরটি (Irena puella puella) ভারতের দক্ষিণে 1800 মিটারের মধ্যে পশ্চিমঘাটে কেবালা থেকে বেলগাঁও, পূর্বঘাটে অন্ধ্রের চিত্তেরি পর্বতে এবং শ্রীলঙ্কায়।

লম্বায়ও 27 সেমি। পুরুষ নীলপরীর মাথার চাঁদি, ঘাড়, উপরের সমস্ত পালক, ডানার শুরুতে কিছুটা এবং ডানার শেষ দিকে উপর থেকে নীচে গোটা কতক পালকের ঠিক মাঝখানটাতে খুব সরু ক'রে আর লেজের তলার কিছু অংশ

পুরুষ-নীলপরী ও স্ত্রী-নীলপরী কি একই রকম দেখতে?

লাজবর্দী (Ultramarine) নীলের উপর খুব ফিকে লালচে-বেগুনির (Lilac) আভা। বাকি সমস্ত অংশ কুচকুচে ভেলভেট কালো। স্ত্রী-পাখির রঙ পুরুষের নীল অংশের বদলে নিষ্প্রভ ময়ূরকণ্ঠী রঙ। ডানা ও লেজ কালচে-পাটকিলের উপর ময়ূরকণ্ঠীর আভা। উভয়ের কনীনিকা টুকটুকে লাল, চোখের পাতা ফিকে লাল, পা ও চঞ্চু কালো।

প্রজনন কাল ছাড়া অন্য সময় নীলপরী 5-6টির ছোট দলে বিচরণ করে। কখনো কখনো ত্রিশ-চল্লিশের এক ঝাঁক দেখা যায় চিরহরিৎ জঙ্গলে গাছের মাথার উপরে। রোদে তাদের ঝলসানো রূপ ফেটে পড়ে। তখনকার বর্ণচ্ছটা বিস্ময়কর। সময়ে সময়ে নীচে ঝোপঝাড়েও নামে। দুপুরের দিকে পার্বত্য স্রোতস্বতী বা ছোট নদীর পাড়ে এসে স্নান এবং জলপান করে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে চায় না, সদাই চঞ্চল। মৃদু শিসের মত নানা মিষ্টি শব্দ মুখে লেগেই আছে। তার মধ্যে একটি সুর খুব মধুর করে ডাকে—'উইট-উইট, হোয়াট্‌স ইট'। মিষ্টি সুরে 'হোয়াট্‌স ইট' ডাকটি দেয় খুব ঘন ঘন। এ-ছাড়াও মিষ্টি ক'রে ডাকে 'উইট-উইট, বি-কুইক, পিইপিট, হোয়াট্‌স ইট', আবার থেকে থেকে মিষ্টি মধুর স্বরে বলে—'হুইট-টু, হুইট-টু, হুইট'।

শীতকালে কলকাতার চিড়িয়াখানাতে কোন পরিযায়ী হাঁস সবচেয়ে বেশি দেখা যায়?

শীতকালে আলিপুরের চিড়িয়াখানার ঝিলে যে পাখি সব চেয়ে বেশি দেখা যায় তা হল মরাল। এর ইংরেজি নাম Lesser Whistling Teal, Tree Duck। লম্বায় এ 42 সেমি।

এরা সারা ভারতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। শীতে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এসে ভিড় করে। এরা রাতেই খাদ্যগ্রহণ করে, দিনের চিড়িয়াখানাটা এদের বিশ্রামের জায়গা। উড়তে উড়তে ডাকে 'সি-সিক সি-সিক' ক'রে, অনেকটা নূপুরের আওয়াজের মত। শীতকালে চিড়িয়াখানার বিলে এদের দেখে অনেকে মনে করেন এরা বুঝি হিমালয় পার হয়ে পরিযায়ী হয়ে এসেছে। কিন্তু তা নয়, এরা স্থানীয় পাখি। যারা হিমালয়ের ওপার থেকে পরিযায়ী হয়ে আসে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

দিগহাঁস কোন ধরনের হাঁস?

দিগহাঁস এক ধরনের পরিযায়ী হাঁস। এর অন্য নাম শোলঞ্চ, বড় দিগর। এর ইংরেজি নাম Pintail। লম্বায় এ-পাখি 56 থেকে 74 সেমি।

পূর্ণবয়স্কের দেহ লম্বাটে, গলা সরু, লেজের পালক সরু লম্বা আলপিনের মত। মাথা, মুখ ও গলা গাঢ় পিঙ্গল, ঘাড়ের পিছন কালো। ঘাড়ের দু'দিকে একটা সাদা পটি সরু থেকে চওড়া হয়ে নেমে বুক ও পেটের সঙ্গে মিশে গেছে।

উপরের পালক এবং দেহের দু' পাশ প্রধানত ধূসর, খুব চিকন কালো কালো টানে ছাওয়া। লেজের উপরে ও পিঠের পালকের শেষের পালকের মাঝখান কালো, ধার রূপোলি-ধূসর। গলার ধারের পালক ধাতব তামাটে-সবুজ। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চঞ্চু সীসে-ধূসর, তলার চঞ্চুর গোড়া একটু গাঢ় সীসে-ধূসর, ঝিল্লী ও নখর কালচে। ঝিল্লী কি? হাঁসের পায়ের আঙুল পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া থাকে। এই পাতলা চামড়াটাই ঝিল্লী।

এই তার আসল রূপ। কিন্তু পরিযায়ী হওয়ার সময়ে তাদের চেহারা বদলে যায়। তখন তাদের গায়ে নতুন রঙের সৃষ্টি হয়। এটা যেন তাদের বোরখা পরা রূপ। পরিয়ারীর বোরখা পরা রূপে দিগহাঁসকে আমরা দেখি পাটকিলে ও

দিগহাঁস কতটা লম্বা পাখি?

ঈষৎ পাতাভ রঙে চিত্রবিচিত্র করা, লেজটা আলপিন সরু এবং দেহে গাঢ় ছাই-ধূসরের আভা।

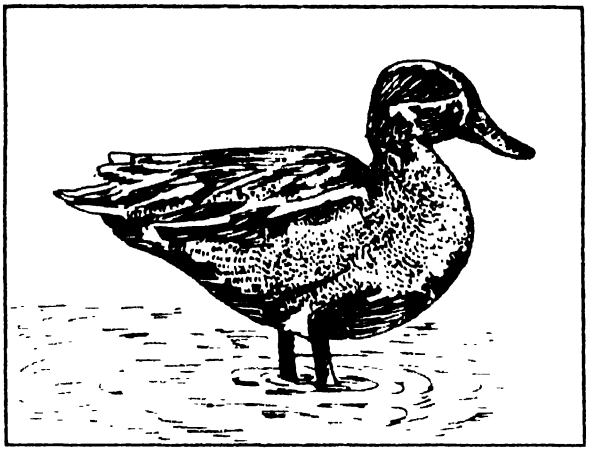
এর বাসস্থান উত্তর ইউরোপ, উত্তর এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায়। শীতে পরিযায়ী হয়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, বর্মা, শ্যামদেশ ও দক্ষিণ চীন প্রভৃতি দেশে আসে। আমরা যাদের দেখি তারা সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি ক্যাসপিয়ন সাগরীয় অঞ্চল এবং সাইবেরিয়া থেকে 5 হাজার কিমি পাড়ি দিয়ে আসে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় শীতের সময়ে দেখা যায় এ-পাখি।

মরসুমের শুরুতে স্ত্রী-হাঁস আসে বেশি। স্বভাবে সদাই শঙ্কিত ও ব্যস্ত এবং উড়ে পালাবার জন্যে প্রস্তুত। প্রয়োজনে ঘণ্টায় 104 কিমি বেগে পর্যন্ত ওড়ে।

পাতারি হাঁস কি রকমের হাঁস?

এর অন্য নাম তুলসী বিগরি, ইংরেজি নাম Common Teal। লম্বায় এ 38 সেমি। এ এক পরিযায়ী পাখি। কলকাতার চিড়িয়াখানায় আসে শীতকালে।

পুরুষের রঙ হচ্ছে ধূসর রঙের পেনসিলের টানের সঙ্গে মাথা বাদামী, চোখের উপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা চওড়া ধাতব সবুজের পটি, উপর ও নীচে খুব সরু ক'রে সাদাটে পটি। ডানা তিনরঙা, কালো, ধাতব সবুজ ও হলদেটে।


পাতারি হাঁস

কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালো, তলার চঞ্চু ফিকে এবং পাটকিলে। স্ত্রী পাখির তলার চঞ্চু হলদেটে পাটকিলে। কখনো বা একটু সবজেটের ভাব থাকে। পা ও আঙুল ফিকে নীলচে অথবা জলপাই-ধূসর থেকে সীসে-নীল।

পরিযায়ী হয়ে আসা বোরখা পরা পুরুষ-পাখিদের দেখি তাদের মাথা গাঢ় ও হালকা পাটকিলে রঙে চিত্র-বিচিত্র করা। মাথার চাঁদি ও ঘাড় কালচে-পাটকিলে, পালকগুলির ধারে খুব সরু ক'রে হলদেটে বাদামী রঙ। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসার সময় ওরা এইরকম রঙের বোরখা পরে নেয়। এই রঙ তাদের পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-পাখিদের।

এর বাসস্থান ইউরোপে আইসল্যাণ্ড থেকে শুরু ক'রে

পাতারি হাঁস কি পরিযায়ী হাঁস?

এশিয়ার চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং জাপানে। শীতে পরিযায়ী হয় উত্তর আফ্রিকা, নীলনদের উপত্যকা সোমালিল্যাণ্ড, পারস্য, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান-নিকোবর, মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ চীন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে পড়ে দিঘি, ঝিল এবং বাদায়, প্রধানত মিঠে জলে। যে-সব জলাশয়ের তলা কাদা এবং জলজ আগাছায় পূর্ণ সে-সব জায়গাই এদের পছন্দ।

এরা পুরোপুরি শাকাহারী। জলজ ঘাসের শীষ, কচি পাতা, জলজ আগাছার বীজ, স্ফীতকন্দ ও ধান এদের খাদ্য। রাতে প্রধানত খাদ্য গ্রহণ করলেও, দিনে জলে বা জলের

ধারে ছায়ায় বিশ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহও ক'রে থাকে।

পুরুষ-পাখি একটু মিষ্টি ক'রে নিম্নস্বরে ডাকে 'ক্রিট ক্রিট'। স্ত্রী-পাখি ভয় পেলে একটা প্যাঁক বা কোয়াক-এর মত আওয়াজ করে।

সাধারণত মার্চের শেষে এরা চলে যায় তাদের জন্মভূমিতে।

গৃহপালিত হাঁসের পূর্বপুরুষ কোন পাখি?

নীলশির পাখি গৃহপালিত হাঁসের পূর্বপুরুষ, ইংরেজি নাম Mallard। এ লম্বায় 61 সেমি।

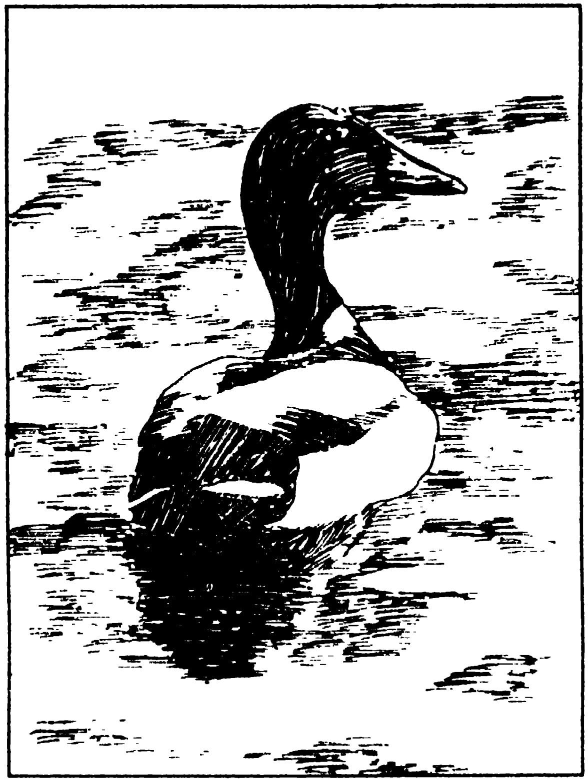
পাটকিলে আর অল্প হলদেটের উপর কালোর ছিট ও সরু সরু টান। চিবুক গলা ও ঘাড়ের উপর দিকে ঈষৎ পীতাভ, চোখের উপর দিয়ে কালো রেখা কিন্তু তা ভাঙা ভাঙা। পা, আঙুল ও নখর কালো, কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু মলিন সবজেটে-হলুদ, গোড়া হলদেটে। এই হল পরিযায়ী হওয়া বা বোরখা পরা রূপ।

পুরুষের পূর্ণরূপ হল উপর-নীচ বেশির ভাগ ধূসর, তার উপর পেনসিল টানা আঁকিবুকি লাইন কালো। মাথা, গলা ও ঘাড় ধাতব উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ, সরু কলার সাদা, তার নীচে বাদামী বুক। বস্তিপ্রদেশ, লেজের আচ্ছাদক ও

নীলশির পাখি কি কলকাতার চিড়িয়াখানায় আসে?

লেজের মাঝের উপর দিক করা দু'টি পালক কালো। ডানার মাঝে আয়নার মত জায়গা ধাতব বেগুনি-নীল, তার চারধারে সরু কালো ও সাদা পটি।

এর বাসস্থান সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর ভূ-খণ্ড থেকে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বিভিন্ন দেশে। শীতে ভারতের দিকে পরিযায়ী হয় নিম্ন সিন্ধু থেকে পূবে উত্তর প্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ থেকে আসাম; দক্ষিণে উত্তর ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং উত্তর মহারাষ্ট্রে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় শীতে এ-পাখি নজরে আসে। কাশ্মীরে কিছু নীলশির পাকাপাকিভাবে বাস করছে। কাশ্মীরে পুরুষ-পাখি প্রায় প্রথমে 'কোয়াক' জোরে ডেকে তারপর পর্দা আস্তে আস্তে নামাতে থাকে। স্ত্রী-পাখি



নীলশির

খুব দ্রুত 'টাকাটা-টাকাটা' বলে ডাকে, বিশেষত খাদ্যান্বেষণে সফলতা পেলে। ভারতে নীলশির আসে প্রধানত সাইবেরিয়া থেকে ঘণ্টায় ৪0 কিমি বেগে। স্বাভাবিক ওড়ার বেগ ঘণ্টায় 48 কিমি।

এদের খাদ্য প্রধানত জলজ আগাছার কচি ডগা, বীজ ও ধান; অল্প কিছু কবচী, ব্যাঙাচি, মাছের ছোট পোনা, পোকা ইত্যাদি।

গৃহপালিত হাঁসের পূর্বপুরুষ বলে প্রায়ই এদের চেহারার পাতিহাঁস নজরে আসে। সাধারণত 10-12, আবার 40-50-এর দলেও দেখা যায়। নিশাচর, বেশ হাঁটতে পারে। জলে ডুবে খাদ্য সংগ্রহ না করলেও আহত হলে ধরা পড়ার ভয়ে ডুব সাঁতার দিতে খুব পটু।

পীং-হাঁস কোন পাখি?

এ এক পরিযায়ী পাখি, শীতে কলকাতার চিড়িয়াখানায় দেখা যায়। এর ইংরেজি নাম Gadwall। এ-পাখি লম্বায় 51 সেমি।

এদের পূর্ণরূপ গাঢ় পাটকিলে এবং ধূসর, সাদাটে পেট এবং খুব কালো লেজ, গাঢ় এবং হালকা অর্ধ-চন্দ্রাকারের ছিট সব বুক জুড়ে। একটা চকচকে সাদা ছোপ ডানার প্রায় শেষে, তাকে ঘিরে চওড়া ক'রে কালো এবং একটি বাদামী ছোপ। এটা পরিষ্কার হয় ওড়ার সময়ে। যখন স্থির হয়ে বসে তখন বাদামী ছোপ এবং কালো-সাদা আয়নাটা দেখে ওদের চিনতে হয়।

পীং-হাঁস কি পরিযায়ী হাঁস?

শীতে পরিযায়ী হয়ে আসার সময়ে বোরখা পরা রূপে এলে এদের আমরা দেখি গাঢ় পাটকিলে দেহে ঈষৎ হলদেটে ছোপ, ডানা বাদামী। এর কমলা-হলুদ পা। ওড়ার সময় দেখা যায় ডানায় সাদা আয়না। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে। উপরের চঞ্চু গাঢ় শ্লেট-পাটকিলে, তলার চঞ্চু অনেক হালকা, তলাটা হলদেটে বা লালচে। পা ও আঙুল হলদে, পাটকিলে-হলদে থেকে মলিন কমলা; নখর কালো।

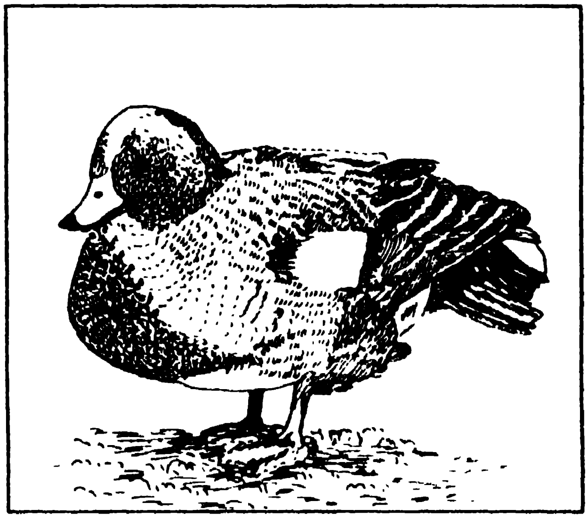
এদের বাসস্থান আইসল্যাণ্ড থেকে কামচাটকা, দক্ষিণে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানি, মধ্য রাশিয়া, কাশ্যপ সাগর, সিইস্টান, ট্রান্সবৈকালিকা। শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতে, দক্ষিণে আস্তে আস্তে কমে আসে। দেখা যায়, নলখাগড়া পূর্ণ বাদা ও ছোট বড় বিলে যেখানে লুকোবার স্থান প্রচুর। দিনে কখনও কখনও উন্মুক্ত জলাশয়ে বিশ্রাম নিতে নজরে আসে।

এর স্বভাব অনেকটা নীলশিরের মতই। এরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করে, প্রধানত উদ্ভিদভোজী, 10 থেকে 30-এর ছোট দলেই থাকতে পছন্দ করে। খাদ্যসংগ্রহ করে বাদার অল্প জলে হেঁটে, জলমগ্ন ধানক্ষেতে, কিন্তু অল্প জলে ডুব দিয়ে কাদার মধ্যে খাদ্য খোঁজে। ওড়াটা খুব দ্রুত, ওড়ার সময়ে পাখার ঝাপটে একটা শিসের মত শব্দ হয়।

ওড়ার গতি ঘণ্টায় 47 কিমি।

ছোট লালশির কী রকমের পাখি?

এ এক পরিযায়ী পাখি। ইংরেজি নাম Wigeon। লম্বায় 49 সেমি।



ছোট লালশির

পরিযায়ী হয়ে এ পাখি আসে কলকাতার চিড়িয়াখানায়। এর উপরটা লালচে-পাটকিলে, তার ওপর কালোর আঁচড়; নীচটা প্রধানত সাদা।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষের রঙ পেনসিল-ধূসর। মাথা ও গলা বাদামী বা উজ্জ্বল ছাই লাল, কপালের উপর দুধে-হলুদের ছাপ। বুক মদের রঙের মতন, লেজের আচ্ছাদন কালো, একটা বড় অনুভূমিক সাদা টান বন্ধ ডানার উপর, সরু কালো দাগের ভিতর ধাতব সবুজের আয়না এবং ছোট নীল-ধূসর চঞ্চু। ওড়ার সময়ে একটা চওড়া সাদা ছোপ দেখা যায় ডানার উপরে এবং ঈষৎ হলুদ রঙের কপাল নজরে পড়েই। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু ধূসর-নীল, ডগাটা কালো, পায়ে সীসের উপর ধূসর বা সবুজের ছাপ, নখর কালচে।

এর বাসস্থান ইউরোপ ও এশিয়ার আর্কটিক সীমানায়, আইসল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড থেকে কামচাটকায়। শীতে পরিযায়ী

ছোট লালশির কত লম্বা পাখি?

হয় ব্রিটেনে, নীল নদীর দক্ষিণ উপত্যকা, ইথিওপিয়াতে, ভারতে, দক্ষিণ চীনে এবং জাপানে। শীতকালে দেখা যায় সিন্ধু ও উত্তর ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে, আসামে, মণিপুরে এবং ওড়িশার চিল্কা হ্রদে। এ-ছাড়াও শীতে দেখা যায় নেপাল ও সেখানকার পূর্ব নেপালের উচ্চভূমির অর্থাৎ 5030 থেকে 5300 মিটার উঁচু হ্রদসমূহে। এদের নজরে

আসে স্বল্প জলে আগাছায় পূর্ণ ঝিল এবং বাদায়। সময়ে সময়ে নোনা জলের খাঁড়ি ও গরানের জলায়।

এরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েই থাকতে ভালবাসে। খাদ্যসংগ্রহ করে ঝিলের পাড়ের ঘাসের উপর থেকে, ভিজে ধান ক্ষেত থেকে বা অল্প জলে পিছনটা তুলে মাথা ডুবিয়ে। খুব দ্রুত উড়তে পারে। জল থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখলেই চটপট উঠে পড়ে এবং বন্দুকবাজদের আওতার বাইরে নিমেষে উড়ে যায়। পুরুষ ডাকে সরু শিসের মত 'হুইই্-উ', স্ত্রী একটু গুরু গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ে।

গিরিয়া হাঁস কি পরিযায়ী পাখি?

গিরিয়া হাঁস পরিযায়ী পাখি। পরিযায়ী হয়ে একে শীতকালে কলকাতার চিড়িয়াখানায় আসতে দেখা যায়। এর ইংরেজি নাম Blue Winged Teal। লম্বায় এ পাখি 41 সেমি।

পরিযায়ী হয়ে যখন আসে তার চেহারা হল মাথা পাটকিলে, চোখের উপর সাদাটে টান, সাদা গলা, একটি পরিষ্কার কালো লাইন চলে গেছে চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত। বাকি উপরের অংশ গাঢ় পাটকিলে, খোলার মত-কাটা অংশ ফিকে। ডানায় কাঁধের আচ্ছাদক ধূসরাভ পাটকিলে, দু'টি সাদা পটির ভিতর আয়না সবুজ। উপরের বুক এবং পায়ুদেশের কাছে পাটকিলে, তার উপর গাঢ় ছিট, বাকি তলাটা সাদা।

পুরুষের আসল চেহারাটায় দেখা যায় মাথা ও ঘাড় গোলাপী-পাটকিলের উপর সাদা ছিট এবং ভুরুর ওপর চওড়া সাদা টান। উপরের অংশ কালচে পাটকিলে, অর্ধ-বৃত্তাকার খোলাকাটা অংশটি অনেক হালকা। অংশফলক

গিরিয়া হাঁস কি দল বেঁধে থাকে?

লম্বাটে, বর্ণাকার চকচকে কালোর উপরে মাঝখানে চওড়া সাদা পটি। কাঁধের উপরের আচ্ছাদক নীলচে ধূসর। পাখির ডানার আয়না দু'টি সাদা পটির মাঝে সবুজ। নীচে বুকে হালকা পাটকিলে তার উপর কালো ছিট। বাকি তলাটা হালকা পাটকিলের উপর কালো ছিট। তারও নীচে সাদা এবং পায়ুদেশের কাছে লেজের আচ্ছাদক কালো। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু পাটকিলে-কালো, পা ও আঙুল গাঢ় ধূসর, নখর কালো।

সবচেয়ে সাধারণ পরিযায়ী এই হাঁস দেখা যায় সারা ভারতে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, নেপালে ও শ্রীলঙ্কায়। যে কোনো জলা জায়গায় এদের নজরে আসে, তা সে ঝিল, বাদা, গাঁয়ের পুকুর, সমুদ্রের ধারের খাঁড়ি, যাই হোক না কেন।

শীতের পরিযায়ী হয়ে আসে উত্তর ইউরোপ ও উত্তর চীন থেকে।

এরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করে। এমনি জলে ডুব দেয় না। গুলিতে আহত হলে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ডুব সাঁতার দিয়ে চলে। হেঁটে-চলেই খাদ্যসংগ্রহ করে। দেখা যায় জলাভূমি ও প্লাবিত ধানজমিতে অথবা অল্প জলে মাথা জলের তলায় রেখে পিছন উঁচু ক'রে খাদ্যসংগ্রহ করতে। ওড়ে খুব দ্রুত এবং ওড়ার সময় খুব অল্পই আঁকাবাঁকা হয়। ওড়ার সময়ে একরকমের হিসহিস আওয়াজ হয় যা অভিজ্ঞ শিকারীরা অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারে কোন হাঁস উড়ছে। এমনিতে খুব নিঃশব্দ, মুখে আওয়াজ নেই। প্রজনন ঋতুতে পুরুষের মুখে কর্কশ 'ক্রে-র-র' ডাক শোনা যায়। পরিযায়ী হবার ঠিক আগেও এই ডাক দিয়ে থাকে।

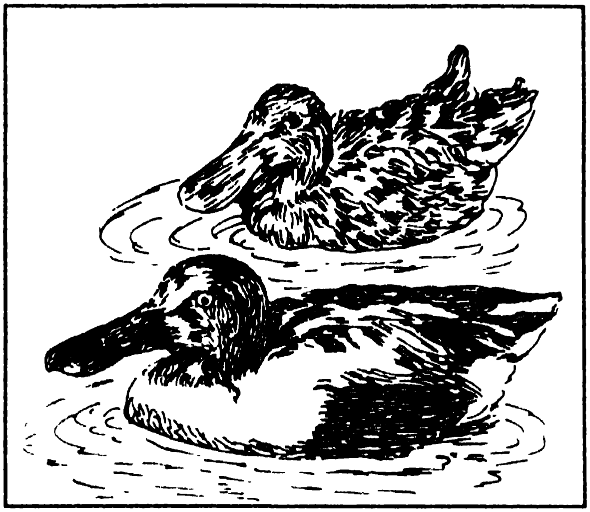
পান্তামুখী কি এ-দেশের পাখি?

পান্তামুখী এ-দেশের পাখি নয়। এ পরিযায়ী পাখি। এরা কলকাতার চিড়িয়াখানায় আসে শীতের সময়ে। এর ইংরেজি নাম Shoveller। লম্বায় 51 সেমি।

পরিযায়ী হয়ে যে আসে তার চেহারা গাঢ় পাটকিলে এবং হলদে-লালের ছোপ, কাঁধে ধূসর-নীলের ছোপ, খুব ফিকে সবুজ আয়নার উপরে ও নীচে সাদা। পা ও আঙুল কমলা, কমলা-পাটকিলে বা কমলা-লাল।

পুরুষের আসল চেহারায় দেখা যায়, মাথা ও ঘাড় চকচকে ধাতব সবুজ, ফিকে নীল ছোপ ডানার কাঁধে, তারপর উপরে-নীচে সাদা টানের মাঝে ধাতব সবুজের আয়না। বুক সাদা, বাকি তলাটা লালচে-বাদামী, দু'টো সাদা ছোপ একদম পিছনে।

সাধারণ আগন্তুক পাখিদের দেখা যায় সারা ভারতে,



পান্তামুখি

পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, নেপালে ও শ্রীলঙ্কায়। যে কোনো জলে, ঝিলে, জলাধারে, বন্যা অধ্যুষিত খানাখন্দে, গাঁয়ের পুকুরে এবং মাঝে মধ্যে নদীতে এদের নজরে আসে।

পান্তামুখী কত তাড়াতাড়ি ওড়ে?

ইউরোপে সাধারণত ব্রিটেন এবং উত্তর এশিয়ার বাসিন্দা। শীতে পরিযায়ী হয় পূর্ব আফ্রিকা, পারস্য উপসাগর, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, দক্ষিণ চীন, জাপান, হাওয়াই, নিম্ন ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো, হণ্ডুরাস ও ফ্লোরিডায়।

সাধারণত ছোট দলে বিচরণ করে গিরিয়া ও তুলসী বিগরিদের (Common Teal) সঙ্গে। খাবার সংগ্রহে সাঁতার কাটে খুব আস্তে ঘাড় ও খন্তি মার্কা চঞ্চুটিকে সামনে সোজা ক'রে রেখে—তলার চঞ্চুকে পুরো ডুবিয়ে রাখে এবং উপরের চঞ্চুকে জল থেকে একটু তুলে রাখে। অল্প জলে এঁকেবেঁকে চলে। তখন মাথাটা পুরো জলের তলায় ডুবিয়ে দিয়ে কাদার মধ্যে খাদ্য খোঁজে। ওড়ে বেশ দ্রুত। সেই সময় ডানায় একটা শব্দ হয়।

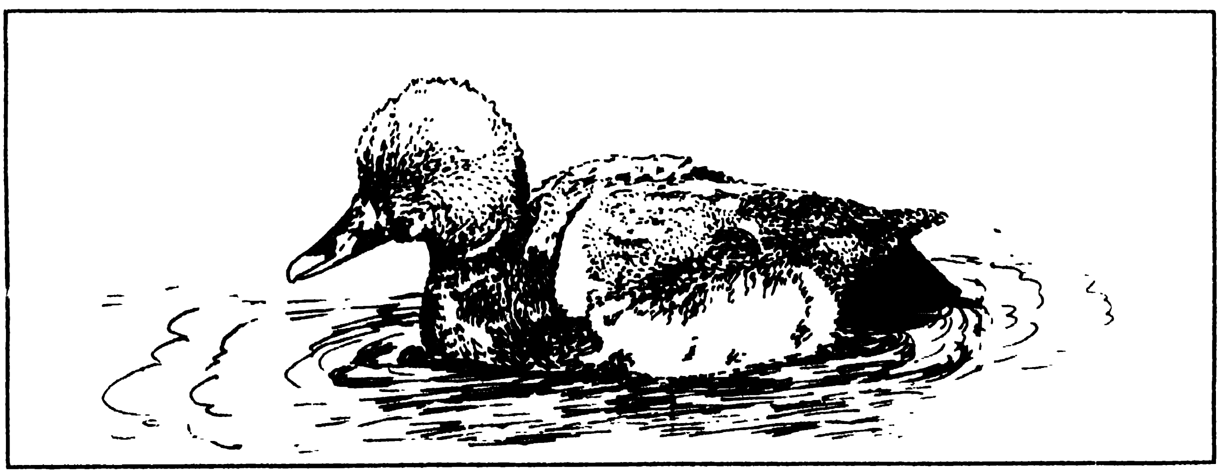
এরা বাঁচে প্রায় কুড়ি বছর, ওড়ে সাধারণত ঘণ্টায় 40 কিমি বেগে, প্রয়োজনে ঘণ্টায় ৪0 কিমি বেগেও উড়তে দেখা যায়।

বড় রাঙামুড়ি কি ধরনের পাখি?

বড় রাঙামুড়ি পরিযায়ী পাখি। পরিযায়ী হয়ে আমাদের দেশে আসে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় এ-পাখি শীতকালে নজরে আসে। পুরুষ পাখিকে বলে হেরো হাঁস, স্ত্রী-পাখি ছোবড়া হাঁস। এর ইংরেজি নাম Red Crested Pochard। লম্বায় এ 54 সেমি।

পরিযায়ী হয়ে যে পাখি আসে তার চেহারা মলিন ধোঁয়াটে পাটকিলে, মাথায় ও ঘাড়ে গাঢ় পাটকিলে। মুখটা সাদাটে বা ফিকে ধূসর। নীচে পাটকিলে বুক ছাড়া বাকিটা সাদাটে।

পুরুষের আসল চেহারা মাথায় সিল্কের মতন খোঁচা খোঁচা ঝুঁটি বাদামী ও সোনালি-কমলা, চঞ্চু উজ্জ্বল টকটকে লাল। উপরটা হালকা পাটকিলে, কাঁধে সাদার ছোপ এবং



বড় রাঙামুড়ি

ডানায় সাদা আয়না। নীচটা কালো, বুকের দু'পাশ সাদা। কনীনিকা উজ্জ্বল লাল। চঞ্চু ধূসরাভ কালো, ধার ও ডগা ফিকে গোলাপী। পা কালো, তার উপর গোলাপীর ছিট।

এর বাসস্থান দক্ষিণ ফ্রান্সে, হল্যাণ্ডে, দক্ষিণ রাশিয়ায়, পুবে কিরঘিজ স্তেপভূমি থেকে পশ্চিম সাইবেরিয়ায়। শীতে পরিযায়ী হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, সমগ্র ভারতে,

রাঙামুড়ি কি ডুব দেওয়া হাঁসের দলে?

পাকিস্তানে, বাংলা দেশে, বর্মা প্রভৃতি জায়গায়।

সাধারণত দেখা যায় উন্মুক্ত জলাশয়ে, খাদ্য সংগ্রহ করে ডুব দিয়ে। জলের তলায় বেশ কয়েক সেকেন্ড ডুব দিয়ে হঠাৎ অদ্ভুতভাবে ঝপ ক'রে ভেসে ওঠে। আবার অল্প জলে পিছন উঁচু ক'রে মাথা ডুবিয়েও খাদ্য সংগ্রহ করে। মাঝে মাঝে দেখা যায় ঝিলের পাড় ঘেঁষে চরতে। সাধারণত বেশ ভীরু ও সন্ত্রস্ত। সহজেই বিপদাশঙ্কায় উড়ে চলে যায় বন্দুকের পাল্লার বাইরে। অত্যন্ত চুপচাপ থাকে, কোনো আওয়াজই করে না।

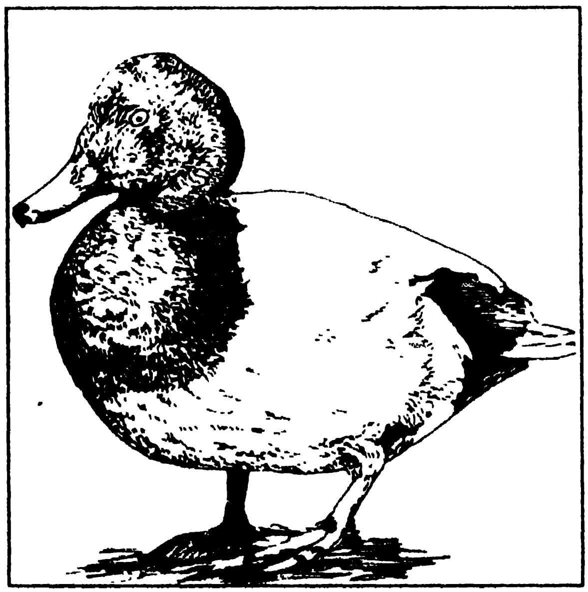
এইরকম আর একটা পরিযায়ী পাখির নাম রাঙা মুড়ি বা লালমুড়ি, ইংরেজি নাম Common Pochard। লম্বায় এ 48 সেমি।

পরিযায়ী হয়ে যে-পাখি আসে তার মাথা ফিকে লাল, উপরের পিঠ কালো, বুক পাটকিলে। কনীনিকা হলদেটে বা হলদেটে-লাল, চঞ্চুর গোড়া ও ডগা কালো, মাঝখানটা ফিকে সীসে-নীল, পা ও আঙুল স্লেট-নীল, পায়ের জাল গাঢ় এবং কালচে।

পুরুষ-পাখির আসল যে চেহারা, তাতে মাথা ও গলা বাদামী-লাল, উপরের পিঠ এবং বুক কালো, বাকি উপরের অংশ হালকা ধূসর, তার উপর কালো আঁচড়ের টান। বস্তিপ্রদেশ, লেজের উপর ও নীচের আচ্ছাদক কালো, তলার বাকি অংশ ও দু'পাশ ধূসরাভ সাদা, ডানার উপর মলিন ধূসরের আয়না।

এর বাসস্থান ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, পূর্ব রাশিয়া থেকে বৈকাল হ্রদ, দক্ষিণে হল্যাণ্ড, জার্মানি, বলকান দ্বীপপুঞ্জ, কৃষ্ণসাগর, কিরঘিজ স্তেপভূমি এবং ইয়াকন্দ্। শীতে পরিযায়ী হয় নীল নদের উপত্যকায়, সমগ্র ভারতে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, বার্মায় এবং দক্ষিণ চীনে।

ডুব দেয় এমন হাঁসেদের মধ্যে এ অন্যতম। মাঝে মাঝে 300 থেকে 400-এর দলে দেখা যায়। সাধারণত জলের তলা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রায়ই দেখা যায় বড় পুষ্করিণী বা ঝিলের মাঝে চরতে। প্রধানত রাত্রিচর। সন্ধেবেলায় খাদ্যভূমিতে ফিরে যায়, প্রত্যুষে বিশ্রামের জন্যে ফিরে আসে। জলের তলায় বেশ দ্রুত সাঁতার কাটে। মাটিতে হাঁটাটা স্বচ্ছন্দের নয়। খুব দ্রুত ডানা ঝাপটে ওড়ে। জল থেকে ওঠবার সময়ে বেশ সময় নেয়, ডানা ঝাপটে খানিকটা জলের উপর দিয়ে চলে, তবে জল ছাড়ে।



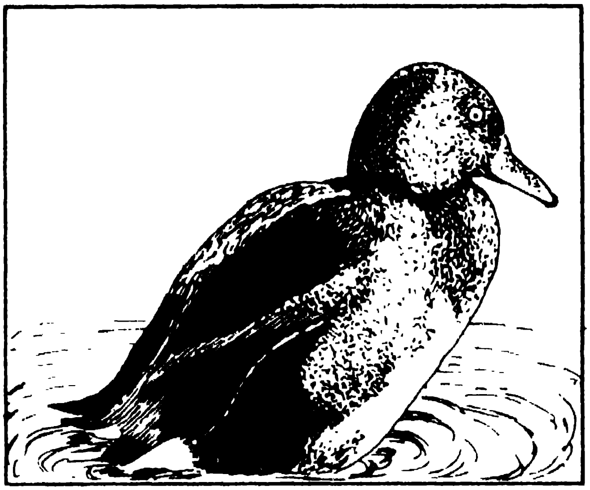
লালমুড়ি

ভূতি হাঁস কোন হাঁস?

এ একরকমের পরিযায়ী হাঁস। কলকাতার চিড়িয়াখানায় শীতকালে এ পাখি দেখা যায়। এর ইরেজি নাম White-eyed Pochard বা Ferruginous Duck। লম্বায় এ 46 সেমি। পরিযায়ী হয়ে আসার সময়ে এবং চেহারায় যা লক্ষ্য করা যায়, তা হল মাথা, গলা এবং বুক মলিন লালচে, গলার তলা বালিরঙা, পাটকিলে বোরখা। কনীনিকা সাদা, কখনও বা হলদে, চঞ্চু মলিন স্লেট রঙা বা নীলচে কালো। পা ও আঙুল মলিন গাঢ় স্লেট, তার উপর ধূসর বা সবুজের ছাপ।

পুরুষ-পাখির আসল যে চেহারা তাতে দেখা যায়, মোটামুটি পালক হল উজ্জ্বল কালচে-পাটকিলে ও লালচে-পাটকিলে, পেটের উপর বেশ বড় সাদা ডিম্বাকৃতি এক ছোপ, সাদা আয়না এবং লেজের তলার আচ্ছাদক সাদা। কাছ থেকে সাদা চোখ বেশ ভালই দেখা যায়।

এর বাসস্থান ইউরোপে এবং পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে অব উপত্যকায়, আফ্রিকায়, পারস্যে, কাশ্মীরে লাদাখেও এ



ভূতি হাঁস

পাখি পাওয়া যায়।

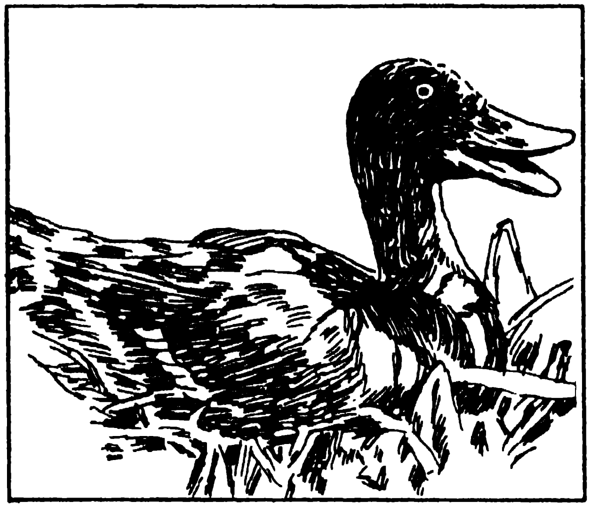
শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পাকিস্তানে, আমাদের দেশে ও বাংলাদেশে।

স্বভাবে রাঙামুড়ির মতই, পাকা ডুব সাঁতারু। জলের তলায় সাঁতার কাটতে খুবই ওস্তাদ। জলের তলা থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে বেশি। ডাকে 'কিরর্‌-কেরে, কিরর্‌'।

বামুনিয়া হাঁস কী জাতের হাঁস?

এ এক পরিযায়ী হাঁস। কলকাতার চিড়িয়াখানায় শীতকালে এ পাখি দেখা যায়।

এর ইংরেজি নাম Tufted Duck। এ লম্বায় 43 সেমি। পরিযায়ী হয়ে যে পাখি আসে, চেহারায় তার তলার অংশ ফিকে এবং পাটকিলাভ, তার উপর সাদা ছিট। চিবুক ও গলায় সাদা ছোপ ছোপ, বুকের তলার অংশে সাদা দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ছোপ। দু'পাশে ফিকে পাটকিলে, তার উপর



বামুনিয়া হাঁস

সাদাটে ছিট। কনীনিকা উজ্জ্বল হলুদ, চঞ্চু ধূসরাভ নীল, পা ও আঙুল ধূসরাভ নীল, পায়ের ঝিল্লী অর্থাৎ চামড়া দিয়ে জোড়া পায়ের আঙুল প্রায় কালো, নখর কালো।

পুরুষের আসল চেহারা কালো-সাদার মিশ্রণ। মাথা, গলা, বুক, পিঠ, লেজ এবং পায়ুদেশ সবই কুচকুচে কালো। ধবধবে সাদা দেহের দু'পাশ। ডানায় সাদা আয়না। লম্বা সরু মাথায় পেতে পড়া ঝুঁটি কালো, হলুদ চোখ।

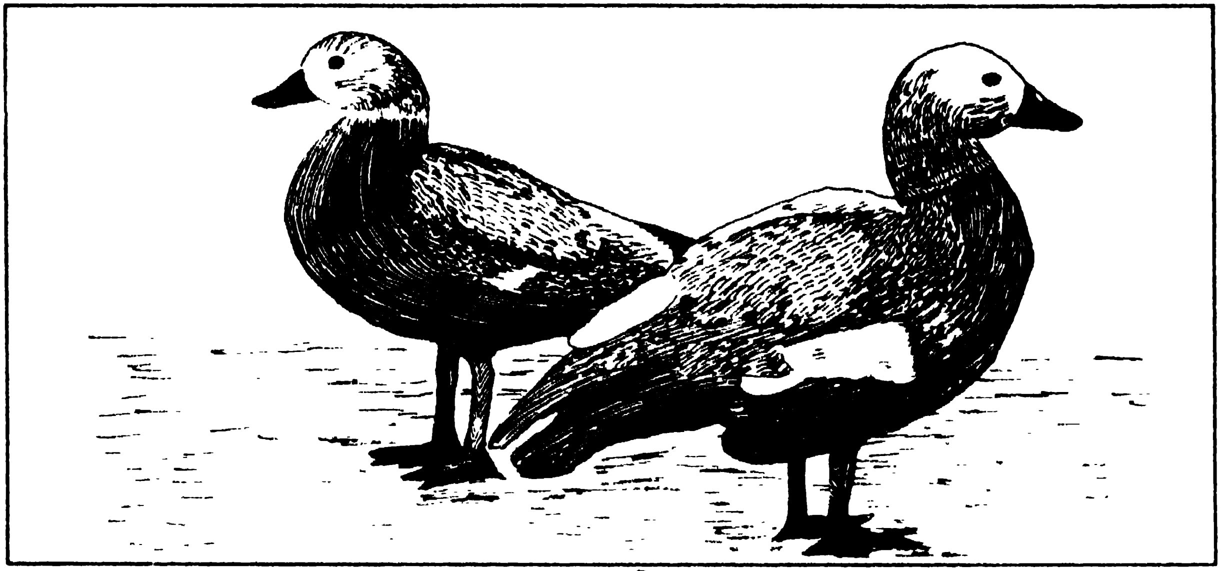
এর বাসস্থান ইউরোপ ও এশিয়ায়, আইসল্যাণ্ড ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রশান্ত মহাসাগরের কমাণ্ডার দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে মধ্য ইউরোপ, বলকান দ্বীপপুঞ্জ, কিরঘিজ স্তেপভূমি, বৈকাল হ্রদ, আমুর এবং শাখালিন। শীতে পরিযায়ী হয় দক্ষিণে নীলনদ উপত্যকায়, পারস্য উপসাগরে, সমগ্র ভারতে, দক্ষিণ চীনে ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে।

শীতে অক্টোবরের মাঝামাঝি আসে পাকিস্তানে, সমগ্র ভারতে ও বাংলাদেশে।

স্বভাবে এ লাল বিগরি বা ভূতিহাঁসের মতই। ডুব সাঁতার দিয়েই খাদ্য সংগ্রহ করে। ওড়ার সময় নীচু স্বরে একটা কার-র-র...কার-র-র' আওয়াজ তোলে।

চকা ও চকী কোন পাখি?

এরা এক জাতীয় হাঁস। এদের সংস্কৃত নাম চক্রবাক-চক্রবাকী।



চকা-চকী

চকা-চকীর ইংরেজি নাম—Ruddy Shelduck বা Brahminy Duck। লম্বায় এ 66 সেমি। পুরুষ-পাখি আসল চেহারায় কমলা-পাটকিলে বা দারুচিনি পাটকিলে। এর মাথা ও গলা অনেকটা ফিকে। একটা ধাতব সবুজ আয়না ডানার উপরে, তার সামনে একটা সাদা ছোপ, কালো ডানা ও লেজ। একটা সরু কালো আংটি গলার শেষে। এটি প্রজনন কালের পর শীতে আর থাকে না। কনীনিকা উজ্জ্বল

চকা-চকী কি এ-দেশের পাখি?

পাটকিলে, পা ও আঙুল কালো। স্ত্রী-পাখি একই রকম দেখতে, মাথাটা অনেক হালকা সাদাটে আর গলায় ওই কালো আংটি হয় না।

এর বাসস্থান দক্ষিণ স্পেন ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ, কাসপিয়ান সাগর, এশিয়ায় ট্রান্সবৈকালিকা, দক্ষিণে হিমালয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীন। এ লাদাখে বাসা বাঁধে। শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, ক্বচিৎ শ্রীলঙ্কায়। এদের দেখা যায় উন্মুক্ত হ্রদ, নদীর ধারে কাদার উপরে।

অন্যান্য হাঁসেদের অপেক্ষা এরা কম সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করে। সাধারণত দেখা যায়, হয় জোড়ায়, না হয় ছোট দলে। হাঁটে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে, চরে শুকনো নদীর পাড়ে এবং হ্রদের ঘেসো জমির পাড়ে।

ভারতের কোন পাখিকে শ্রেণী বিচারে প্রথম উল্লেখ করা হয়?

সুইডেনবাসী জীববৃত্তান্তবিদ্ ক্যারোলাস লিনিয়াস (1707-78 সাল) এই পাখির কথা প্রথম উল্লেখ করেন। লিনিয়াস সাহেব প্রথম পাখির শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে করেন বা করতে চেষ্টা করেন। তাঁর বই 'সিস্টেমা নেচারি'তে (1758, 10ম সংস্করণ) ভারতের প্রথম পাখি হিসেবে 'কাজল পাখি'র নাম উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয় পাখিটির বাসস্থান বলেন—'বেনঘালা', যদিও পাখিটি বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে। এখন থেকে দু'শো বছর আগে অতটা ঠিক করে বলা লিনিয়াসের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এ-পাখি লটুষক বংশের (Laniidae) এক প্রজাতি। এর নাম কাজল পাখি, খরকচুয়া। 'কাজল পাখি' নামটি সুসাহিত্যিক বনফুলের দেওয়া। তিনি এই গোষ্ঠীর সব পাখিরই এই নাম দিয়েছেন। 'খরকচুয়া' নামটি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কর্কশ ডাকের জন্য। এর ইংরেজি নাম Brown Shrike। লম্বায় 19 সেমি।

উপরের পালক লালচে-পাটকিলে, মাথার চাঁদি ও ঘাড়ের কাছে গাঢ়। চোখের উপর দিয়ে একটা কালো কাজল টান এসেছে কানের উপরের পালকে। এই কাজল টানের উপরে খুব সরু সাদা একটা লাইন। ডানা গাঢ়

পাটকিলে, পালকের ধারগুলো একটু লালচে। তলার পালক সাদা, ডানা এবং পেটের কাছটা একটু পরিষ্কার বেশি। বুকে এবং ধারে খুব সরু সরু কালো দাগ। লেজ লম্বা, মোটা থেকে সরু। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, উপরে চঞ্চুর ডগায় দাঁত, পা নীলচে-ধূসর, নখর পাটকিলে।

এর বাসস্থান এশিয়ার আলতাই পর্বত থেকে সাইবেরিয়া, কামচাটকা, আমুর, ট্রান্সবৈকালিকা, জাপান,

কাজল পাখি কখন ভারতে আসে?

কোরিয়া, পূর্ব চীন। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে সমগ্র ভারত, শ্রীলঙ্কা, সেলিবিস ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে।

ভারতে পরিযায়ী হয়ে যে সব পাখি আসে তার মধ্যে সবচেয়ে আগে আসা পাখির দলের মধ্যে অন্যতম। অগাস্টের শেষ থেকে আসতে শুরু করে, ফেরেও সব শেষের দলের সঙ্গে মে মাসে।

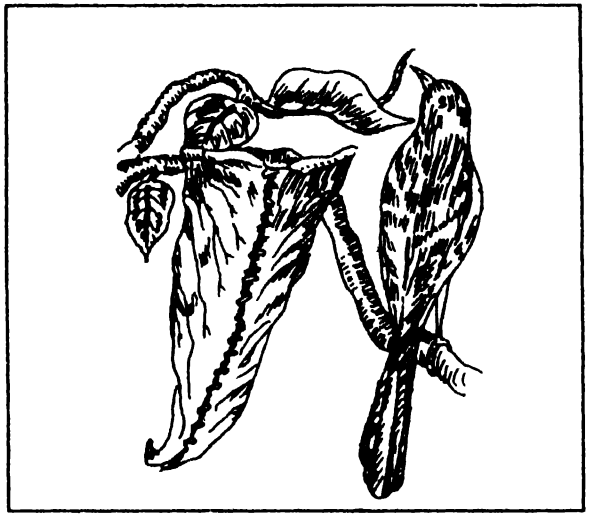
কাজল পাখিকে দেখা যাবে শীতকালে চাষজমি থেকে শুরু ক'রে অনুর্বর স্থানের ঝোপঝাড়ে, বাঁশবনে, জঙ্গলের ধারে এবং শহরের বুকে যেখানে গাছপালা আছে। একটু লাজুক প্রকৃতির। মানুষকে খুব কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না, চঞ্চলও খুব, এক দন্ড স্থির হয়ে থাকতে জানে না। একমাত্র দুপুরের গরমে পাতার আড়ালে স্থির হয়ে বসে থাকে।

'নাক-কাটা রাজারে দেখ তো কেমন সাজা রে।' রাজাকে এই সাজা দিয়ে কোন পাখি দেশ ছাড়ে?

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'-এর টুনটুনির উপর গল্পে এর উল্লেখ আছে।

টুনটুনি পাখির ইংরেজি নাম Tailor Bird। লম্বায় এ পাখি 13 সেমি।

টুনটুনি চড়াই পাখির চেয়ে ইঞ্চিখানেক ছোট। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কপাল ও মাথার চাঁদি লালচে। মাথার দু'পাশ ও বাকি অংশ ধূসর-পাটকিলে। বাকি উপরের পালক হলদেটে-সবুজ। ডানা ও লেজের লুকনো অংশ পাটকিলে। গালের দু'পাশ ও চিবুক থেকে তলার সমস্ত পালক সাদা। ঘাড়ের দু'পাশে কালো সরু টান সাদা পালকের আড়ালে লুকনো। উরু লালচে। কনীনিকা লালচে-হলুদ, লম্বা ছুঁচলো



টুনটুনি

চঞ্চু গাঢ় শিঙ রঙা, তলার চঞ্চু ফিকে গোলাপী, পায়ে খড়ের রঙ, নখর যেন শিঙের উপরে পাটকিলের আভাযুক্ত। পায়ের তলার চেহারা মাংসের রঙের মত কিন্তু সাদাটে ভাব বেশি। প্রজনন কালে লেজের মাঝের পালক অন্যান্য ঋতুর অপেক্ষা 2 ইঞ্চি বেশি লম্বা ও ছুঁচলো হয়।

এর বাসস্থান ভারতে, শ্রীলঙ্কায়, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, নেপাল থেকে পূর্ব বার্মায়, পশ্চিম ও দক্ষিণ চীনে। এরা নানা উপজাতিতে বিভক্ত। আমাদের ভারতেই 5টি উপজাতি।

টুনটুনি পাখির নাম আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই টুনটুনি দেখেছেন। এমন কি দেখলেও এই-ই টুনটুনি বলে চেনা শক্ত। অথচ ডাক অনেকেই শুনেছেন। যে কোনো বাগানেই, তা শহরের বুকেই হোক আর গাঁয়েই হোক লুকনো অবস্থায় ঝোপের আড়ালে চোখে দেখা না গেলেও টুনটুনির সজোর— টু-ইট

টুনটুনি পাখি কি চড়াই পাখির চেয়ে ছোট?

টু-ইট...টু-ইট টুইট' ডাক সকলের কানেই বেজেছে। ওইটুকু পাখির অত গলার জোর সত্যিই আশ্চর্যের। গলা ফুলিয়ে ডাকার সময় ঘাড়ের দু'পাশের কালো দাগ, যা সাদা পালকে ঢাকা থাকে, তা বেরিয়ে পড়ে। ডাকার সময় মাথা ও লেজ দুইই খাড়া ক'রে উপরে তোলে।

মানুষের খুব কাছে থাকতে টুনটুনি ভালবাসে। ভয়

ভেঙে গেলে দেখেছি গাঁয়ে বাড়ির দাওয়া বা বারান্দায় উঠে আসতে দ্বিধা করে না।

পুরুষ-পাখির ব'সে থাকাটা মজার। মাথা ঘুরিয়ে খাড়া করা লেজটাকে চঞ্চু দিয়ে যেন ধরছে এমন ভাব। ওড়াটাও বেশ অদ্ভুত। এক থেকে দু'মিটার—তার বেশি নয়। এ-ঝোপ থেকে ও ঝোপ যেতে অনেক কষ্টে ওড়ে। ওড়ার সময় লম্বা লেজটা পিঠের ওপর খাড়া থাকে। উড়ার রকম দেখলে মনে হয় লেজটা যেন ওর বালাই।

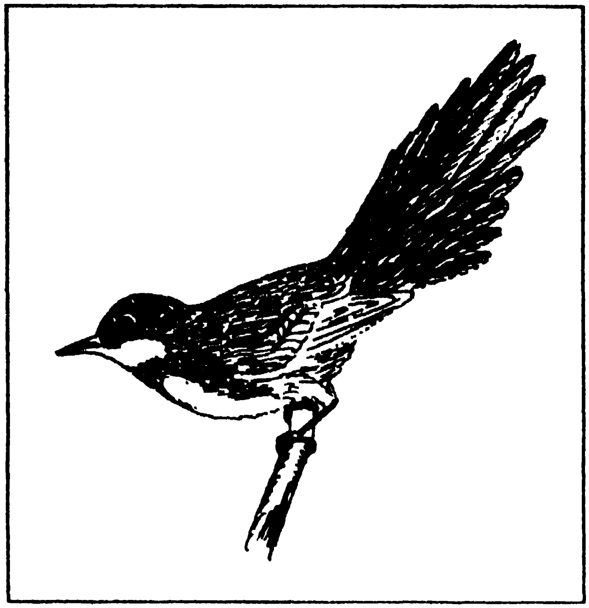
টুনটুনির সমস্ত কিছু গুণপনা তার বাসাকে ঘিরে। ওর ধাঁচে ওরই কয়েকটি জ্ঞাতিভাইরা বাসা বানায়। অবশ্য তাদের কারো কারো বাসা আরো সুন্দর। বাসাটি গভীর। তলায় ও পাশে তুলো বা পশমের লাইনিং। ঘোড়ার লোম বা চুলের লাইনিং থাকে কখনও-সখনও এবং খুব সরু ঘাসের কিছু গোড়া। ঝুলন্ত ফানেল আকারের বাসা দুই বা তিনটি পাতায় সেলাই করা। চার-পাঁচটি পাতা সেলাই করাও দেখা যায়। আবার খুব বড় মোটা একটি আমপাতা ফোঁড়

টুনটুনি পাখি কি মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে?

সেলাই ক'রে তার মধ্যে বাসা বানানো নজরে আসে। সেলাইটা গুটির সিল্ক সুতোর, পশম বা তুলোর সুতোর অথবা গাছের ছালের সরু আঁশের। সরু লম্বা চঞ্চু দিয়ে পাতার ধারে ছাঁদা ক'রে সুতো ঢুকিয়ে অন্য পাতায় আবার একটা ছাঁদা ক'রে গিঁট দিয়ে মুখে জোড়ে। প্রত্যেকটি সেলাই আলাদা এবং শক্ত ক'রে বাঁধা। দেখে মনে হয় মানুষের হাতে যেন এই সেলাই হয়েছে, এত সুন্দর পরিপাটি তার সেলাই। এ পাখির দর্জিপাখি নাম সত্যিই সার্থক।

পশ্চিমবঙ্গে দোয়েল-শামার পরেই কোনো ভাল গাইয়ে পাখি আছে কি?

হ্যাঁ, অনেক পাখিই আছে। এর মধ্যে চাক দোয়েলের নাম বলার মত। এর নাম White throated Fantail Flycatcher। লম্বায় এ 17 সেমি।



চাক দোয়েল

স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই দেখতে এক। কালো মাথার দু'পাশে কপাল থেকে চোখের উপর দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত সরু একটা সাদা লাইন। মাথায় চাঁদি থেকে কালো অংশ যত নীচের দিকে গেছে তত আস্তে আস্তে কালচে-পাটকিলে রঙে পরিণত। গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা, বাকি তলার পালক ধূসর-পাটকিলে। লেজের মাঝখানে দুটি পালক ছাড়া বাকি সব ধূসর-পাটকিলে পালকের শেষে সাদা ছোপ। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চোখের পাতা ধূসর, চঞ্চু ও পা কালো।

এর বাসস্থান পাকিস্তানে, ভারতে সিন্ধু নদের পুব দিক ধরে হিমালয়ের পাদদেশে 600 থেকে 1000 মিটার উচ্চতার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে, গুজরাট থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম এবং মধ্য মহারাষ্ট্রে, ওড়িশাতে। ভারতে এর 4টি উপজাতি।

চাক দোয়েল বাগান, ঝোপঝাড়, অল্প জঙ্গলের পাখি। লোকালয়ে বসতির কাছেও দেখা যায়। খুব সহজে পোষ মানে। জোড়েই সাধারণত বিচরণ করে। ও গাছ থেকে এ গাছে, এ পাতার আড়াল থেকে ও পাতার আড়ালে বা পাঁচিলের উপর সব সময়ে নেচে চলে অবিরাম ক্লান্তিহীন নাচ। নাচন নামটি তার শুধু শুধু হয়নি। মাঝে মাঝে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যে লুপ-ইন-দ্য-লুপ ক'রে সাবলীল ভঙ্গিমায় উড়ন্ত পোকা বা পতঙ্গ ধরে, আবার পাতার

আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। চক্রাকারে এইভাবে ডিগবাজি খাওয়ার জন্যে বোধ-হয় চক্র বা চাক দোয়েল এর নাম।

চাক দোয়েলের জীবনযাত্রা সুষম ছন্দে ও সঙ্গীতে বাঁধা। পোকা ধরতে গিয়ে দুই চঞ্চু ঠোকার যে আওয়াজ কানে আসে, সেই আওয়াজেই তার অবস্থান কোথায় তা ধরা যায়। কোনো কারণে বিরক্ত হলে বা ভয় পেলে সুরেলা গলা ছেড়ে দিয়ে 'চাক চাক' কর্কশ শব্দও করে। সাহসও এদের অসম্ভব। মানুষের উপস্থিতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। এদের নাচ, গান বা পোকা ধরা মানুষ দেখে বন্ধ হয় না।

আগ্গিন কোন পাখি? তার পরিচয় কি?

এ-পাখির উপরের সমস্ত পালক গাঢ় পিঙ্গল, কিন্তু প্রতিটি পালকের ধার লালচে এবং বালি রঙা। লেজের ঠিক মাঝখানের পালকগুলি পাটকিলে, ধার লালচে, একদম শেষের আগের পালকের ধারে একটু সাদাটে ভাব। ডানার পালকের ধার লালচে-পাটকিলে। চোখের উপর ফিকে বালি রঙা ভুরুর টান। গাল এবং কানের উপর লালচে রঙ, ধারে সরু পাটকিলের ছোপ, চিবুক ও গলা সাদা। বাকি তলার পালক ফিকে জরদ (Saffron), বুকের উপর এবং দু'পাশ একটু গাঢ়। বুকের উপর এবং ঘাড় কালো ডোরা দাগে চিত্রিত। কনীনিকা পিঙ্গল, উপরের চঞ্চু যেন শিঙের উপরে

আগ্গিন কত বড় পাখি?

পাটকিলের আভা মেশানো, তলার চঞ্চুর গোড়া হলদে। পা ফিকে দুধে আলতা।

এ পাখির ইংরেজি নাম Singing Bush Lark। লম্বায় এ 15 সেমি।

পশ্চিমবাংলা ছাড়া পাকিস্তান, কাশ্মীর, পূর্ব পাঞ্জাব, কচ্ছ, গুজরাট, পশ্চিম রাজস্থান, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রেএ-পাখি দেখা যায়।

আগ্গিনকে দেখা যায় ঝাঁক বেঁধে ঘেসোজমি, খেতের ধার এবং খোলামেলা জায়গায়। খুব শুকনো অর্থাৎ খরা, অনুর্বর বা পাথুরে জমির ধারে কাছে ঘেঁষে না। ইলীকা-গণের অন্য প্রজাতির পাখি অপেক্ষা বেশ উঁচুতে উড়তে পারে। অবশ্য ভরতপাখির (Skylark) মত যেমন খুব উঁচুতে উড়তে পারে না, তেমনই খুব মিষ্টি সুরেলা গলা হলেও তার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না।

আগ্গিন উড়ন্ত অবস্থা ছাড়াও ঝোপের ভিতর বসে গান গায়। স্বাধীন অবস্থায় মাটিতে চরতে চরতে গান গায় কম। কিন্তু খাঁচায় বন্দী হলে গানের গলা খুলে যায়। এমন কি অন্যান্য পাখির গান এবং ডাক মন্দ তোলে না।

ভরত পাখি কি? এরা কি বিদেশ থেকে আসে?

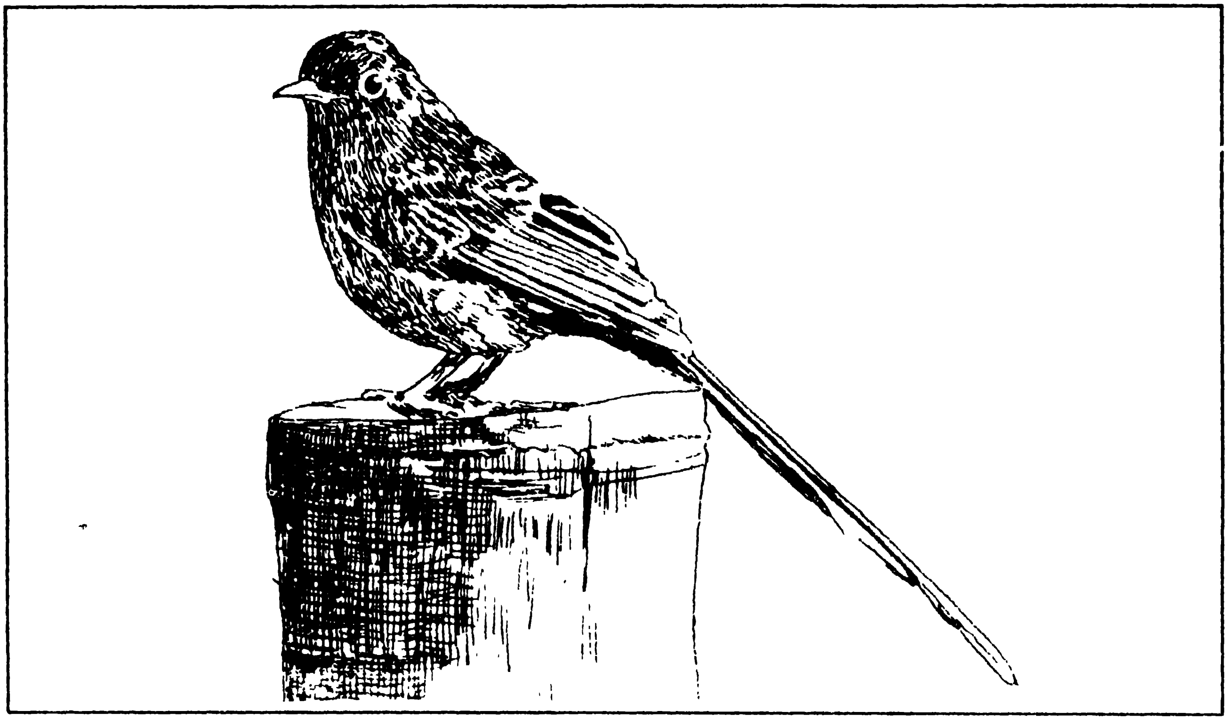
না, এরা বিদেশ থেকে আসে না। আমরা যে ভরত পাখি দেখি তারা আসল ভরত পাখির ছোট সংস্করণ। আসল ভরত পাখির বৈজ্ঞানিক নাম Alauda Arvensis। আকারেও বেশি বড় নয়, ১৮ সেমি। শীতকালে ইউরোপ থেকে পরিযায়ী হয়ে ভারতে মাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পাকিস্তান এবং যুক্তপ্রদেশ স্পর্শ করে।

এ পাখির ইংরেজি নাম Eastern Skylark, Small Skylark।

স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। মাথায় অস্পষ্ট ছোট ঝুঁটি সমেত উপরের পালক পাটকিলে। প্রতিটি পালকের মাঝের রঙ গাঢ়। ধার হলদেটে-পাটকিলে। চোখের উপর ফিকে জরদের সরু টান। ডানা গাঢ় পাটকিলে এবং প্রতিটি পালকের ধার লালচে। লেজও তাই, লেজের বাইরের দু'জোড়া পালকে ফিকে জরদের ভাবটা একটু বেশি। তলার পালক ফিকে জরদ-ধূসর, বুকের দু'পাশ লালচে। গলায় ছিট এবং বুকে পাটকিলের ছোট ছোট দাগ। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু ও পা হলদেটে-পাটকিলে। পিছনের নখর লম্বায় বেশ বড় এবং সোজা।

এর বাসস্থান ৬টি উপজাতিতে ভারতের সর্বত্র, পুবে চীন, দক্ষিণে ইন্দোচীন ও তৎসংলগ্ন স্থানসমূহ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে।

নদী বা ঝিলের পাড়ে, খোলামেলা চাষের জমি এবং গোচারণ ভূমিতে ভরত পাখিরা বিচরণ করে। মাটির রঙের সঙ্গে দেহের রঙ এমনভাবে মিশে যায় যে সহজে নজরে পড়তে চায় না। তা ছাড়া হঠাৎ এদের কাছে গিয়ে পড়লে সহজে দৌড়ে বা উড়ে পালায় না। মাটিতে বুক পেতে যতক্ষণ পারে বসে থাকে। তারপর প্রায় পায়ের গোড়া থেকে ওড়ে।



৬৮৩ পাখি

ভরত ব্যাঘ্রট গণের (Calandrella) বাগেরীর (Short-toed Lark) সঙ্গে প্রায়ই ধরা পড়ে এবং মুখরোচক খাদ্য হিসেবে বাজারে বিক্রির জন্যে আসে। দুই প্রজাতির চেহারায় পার্থক্য এত কম যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া বোঝা খুবই শক্ত।

প্রজনন কালে ভরতের পুরুষ পাখির ডাক বেশ লম্বা—একটু একঘেয়ে, অনেকক্ষণ ধরে চলে কিন্তু মিষ্টি স্বর। মাঝে মাঝে ওই ডাক বা গানের সঙ্গে অন্য পাখির ডাকও নকল করে। সাধারণত ডাক দেয় বা উড়তে উড়তে গান গায়। মাঝে মাঝে মাটিতে চরতে চরতেও গান গেয়ে ওঠে।

বন ও বন্যপ্রাণী



বনে থাকে বাঘ—না, বনে শুধু বাঘ থাকে না। বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার, বাইসন নিয়ে বনে থাকে নানা বন্যপ্রাণী। মানুষের সঙ্গে এদের আড়াআড়ি সম্পর্ক। চিড়িয়াখানায় এরা খাঁচায় বন্দী, মানুষের নাগালের বাইরে। আবার কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা আজ গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে চৌকাঠ পেরিয়ে আমাদের অন্দরে এসে উঠেছে। কুকুর প্রভুর ভক্ত, সজাগ সনিষ্ঠ প্রহরী হয়ে ঘর আগলায়। বেড়াল মিউ মিউ করে আমাদের হেঁসেলের চারপাশে ঘুরঘুর করে।

আবার এমন সব প্রাণী আছে, গৃহপালিত না হলেও লোকালয় থেকে যারা দূরে যায় না। শেয়াল, ভাম, বাঘডাঁশ বেজীর মত কোনো কোনো প্রাণীর কথা বলা চলে, গৃহস্থালীর চারপাশে যারা ঘুরে বেড়ায়। বনে যত বন্যপ্রাণী থাকে আমাদের নাগালের বাইরে, তাদের সম্পর্কেই আমাদের যত কৌতূহল। বনে চরা এই সব প্রাণীদের চমকপ্রদ নানা দিক নিয়ে 'বন ও বন্যপ্রাণী'। বন ও বন্যপ্রাণীকে ইংরেজিতে বলে Fauna।

যারা বনে থাকে তারাই কি শুধু বন্যপ্রাণী?

'বন্যপ্রাণী' কথাটির আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী বনের প্রাণীরাই শুধু বন্যপ্রাণী। লোকালয় থেকে দূরে মানুষের সংস্রব এড়িয়ে যেসব পশুপাখি বনে থাকে, সেখানেই সংসার পাতে, নিজেদের খাবার খুঁজে নেয়, তাদেরই বন্যপ্রাণী বলা হয়। বাঘ-সিংহ অথবা হাতি-গণ্ডার-বাইসনের মত পশুকে

শেয়াল-ভাম কি বন্যপ্রাণী?

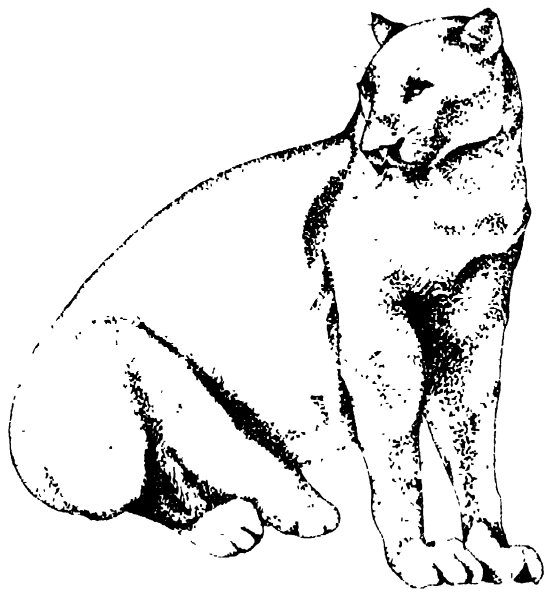
এক কথায় এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু সবাইকে নয়। শেয়াল অথবা ভাম কি? এসব প্রাণীকে তো গরু-মোষের সঙ্গে গৃহপালিত পশুর পর্যায়ে ফেলা যাবে না। অথচ শেয়াল, ভাম, বাঘডাঁশ কিংবা বেজি প্রায়শই বনের সীমানা থেকে বেরিয়ে এসে ঘর-গৃহস্থালির চারপাশে ঘুরঘুর করে। পাখির মধ্যে কাক-চিল আর ঘুঘু-শালিককে একই পর্যায়ে ফেলা যায়।

আবার এমন কিছু প্রাণী আছে, যারা মানুষের সঙ্গ ছাড়া বাঁচে না। নেড়ি কুকুরকে কখনোই লোকালয় থেকে দূরে থাকতে দেখা যাবে না। কাক আর নেংটি ইঁদুরের প্রকৃতিও একই ধরনের। তাহলে কি এরা গৃহপালিত জীব? তাই বা কী করে হয়? মানুষ তো নিজের প্রয়োজনে তাদের পূর্বপুরুষদের বন্য অবস্থায় ধরে এনে পোষ মানায়নি। জীবনযাত্রার কোনো উপকরণও এদের কাছ থেকে তারা আহরণ করে না, এদের ওপরে কোনোমতে নির্ভরশীলও নয়। বরং অবাঞ্ছিত হলেও এরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে থেকে সুবিধেটুকু আদায় করে নিচ্ছে। তাহলে এদের ফেলবো কোন শ্রেণীতে?

বিশেষজ্ঞরা সেইজন্য 'গৃহপালিত' এবং 'বন্য' এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও 'প্যারাডোমেস্টিক' (Paradomestic) বা গৃহনির্ভর জীবজন্তু নামে অপর একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেছেন। সেইসঙ্গে গৃহপালিত পশুপাখি—গরু-মোষ, ছাগল-ভেড়া-উট, কুকুর-বেড়াল এবং হাঁস-মুরগি ছাড়া অন্য সব পশুপাখিকেই বন্যপ্রাণীর মধ্যে ধরেছেন।

সাদা বাঘ আর কালো চিতার আসল দেশ কোনটি?

সাদা বাঘ আসলে নতুন কোনো প্রাণী নয়। বাঘের



কালো চিতা

গায়ের উজ্জ্বল কমলা-হলুদ রঙ আর তার উপরে লম্বালম্বি ঘোর বাদামী পটির বিন্যাস—সবটুকুকে নিয়ন্ত্রণ করে বংশাণু বা 'জিন'। এই জিনের স্বরূপও জানতে পেরেছেন অণুজীববিজ্ঞানীরা (Molecular Biologists)। ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি-এন-এ জিন হিসেবে কাজ করে। ডি-এন-এ অণুর মধ্যে গঠন বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটার জন্য জিন নিজের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারায়। এই গঠন বিন্যাসের পরিবর্তনকে মিউটেশন (Mutation) বলে। সাদা বাঘের উৎপত্তির প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য

সাদা বাঘ কি নতুন জাতের বাঘ?

এটাই। জিন মিউটেশনের জন্য এদের গায়ের স্বাভাবিক রঙ তৈরির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

শুধু বাঘ নয়, দুধ-সাদা এমন আরো পশুপাখি প্রায়ই চোখে পড়ে। সাদা ইঁদুর, সাদা খরগোশ, সাদা ময়ূর আছে। বিদেশে সাদা হাতি, সাদা ক্যাঙারু আর সাদা সিংহের খোঁজ পাওয়া গেছে। আর ঘরের কাছেই নন্দনকানন (উড়িষ্যা) থেকে সাদা কুমিরের খবরও এসেছে। এরা সবাই 'অ্যালবিনো' (Albino)। এদের দেহে রঙ্গক পদার্থ (Pigments) তৈরির জন্য দায়ী জিনগুলো মিউটেশনের ফলে

স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়েছে। রোমের মধ্যে রঙ্গক না থাকার জনাই এদের এমন দুধ-সাদা দেখায়। সাদা বাঘ কিন্তু অ্যালবিনো নয়। প্রকৃত অ্যালবিনো পশুপাখির চোখ, কান, থাবা এবং ঠোঁটের রঙ লাল, চোখ দুটি তো চুনির মত লাল টকটকে। রঙ্গক পদার্থ একেবারে তৈরি না হওয়ায় সূক্ষ্ম রক্তজালিকার মধ্যে প্রবাহিত রক্তের রঙটাই বাইরে থেকে দেখা যায়। সাদা বাঘের চোখ কিন্তু নীলাভ-সবুজ আর গায়েও খুব হালকা নীল রঙের ডোরা দাগ থাকে।

কোন দেশে যে জিনের মিউটেশন ঘটবে আর কখনই বা সেটা ঘটবে, তা কোনোক্রমেই বলা যায় না। সেইজন্য সাদা বাঘেরও কোনো নির্দিষ্ট দেশ থাকা সম্ভব নয়। প্রথম পুরুষ সাদা বাঘটিকে পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশের রেওয়া অঞ্চল থেকে। সেটির সঙ্গে সাধারণ বাঘিনীর মিলন, তারপরে তাদের মধ্যে ক্রমাগত অন্তর্মিলন ঘটিয়ে পাওয়া গেছে সব ক'টি সাদা বাঘ।

কালো চিতা বা 'ব্ল্যাক-প্যান্থারের' (Black Panther) উৎপত্তির পিছনেও রয়েছে জিনের ব্যতিক্রমী কার্যপ্রণালী।

কালো-চিতার রঙ এমন কুচকুচে কালো কেন?

এইক্ষেত্রে রঙ্গক পদার্থ তৈরির জিন অত্যধিক পরিমাণে মেলানিন (Melanin) উৎপাদন করে। কালচে বাদামী রঙের মেলানিনের পরিমাণ কম-বেশি হওয়ার জন্যই আমাদের গায়ের রঙ কালো আর ফরসা হয়। অতিরিক্ত মেলানিন থাকায় চিতাবাঘের কালো কালো বুটিদার উজ্জ্বল হলুদ চামড়ার উপরে একটা জেল্লাদার কালো রঙের প্রলেপ পড়ে যায়। প্রকৃত অর্থে কালো চিতা একটি 'মেলানিক' (Melanic) প্রাণী, কিন্তু আলাদা কোনো প্রজাতির প্রাণী নয়। সাদা বাঘের মত কালো চিতারও আলাদা কোনো দেশ নেই। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কালো চিতা তুলনায় বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

মেলানিজম্ জাগুয়ারের মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে। আকৃতি এবং স্বভাব-চরিত্রে চিতাবাঘের সঙ্গে জাগুয়ারের মিল যথেষ্ট। চিতাবাঘের বিস্তার আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে, জাগুয়ারের দেশ দক্ষিণ আমেরিকা। প্রাণিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে এই দু'টি প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। চিতাবাঘের ল্যাটিন নাম 'প্যান্থেরা পারডুস' (Panthera pardus) আর জাগুয়ারের 'প্যান্থেরা অংকা' (Panthera onca)।

'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' কতটা বাংলার?

বাঘ বা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' আদপে এদেশেরই প্রাণী নয়। সেইজন্য বাংলার নিজস্ব প্রাণী হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জীবাশ্মের (Fossil) সূত্র ধরে বাঘের উৎপত্তি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রামাণ্য তথ্য জানা গেছে। আজ

'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' কি শুধু বাংলার মধ্যেই থাকে?

থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ থেকে সত্তর লক্ষ বছর আগে 'প্লায়োসিন' (Pliocene) অধিযুগে (Epoch) বাঘের আবির্ভাব। 'প্যালিয়ন্টোলজিস্ট (Palaeontologists) বা পুরাজীববিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করেছেন। অবশ্যই বয়স নির্ধারণ পদ্ধতিতে কোনোমতে জীবাশ্মের বয়স নিখুঁতভাবে বের করা যায় না, এ গণনা আনুমানিক এবং তা লেখাও হয় লক্ষ অথবা কোটি বছরের হিসেবে।

জীবাশ্মের বয়ঃক্রম অনুযায়ী ভূস্তর এবং প্রাচীন, বর্তমানে অবলুপ্ত জীবগোষ্ঠীকে 'প্যালিয়োজোয়িক' (Palaeozoic), 'মেসোজোয়িক' (Mesozoic) এবং 'সেনোজোয়িক' (Cenozoic) — এই তিনটি অধিকল্পে (Era) ভাগ করা হয়েছে। সোজা বাংলায় এদের পুরাজীবীয়, মধ্যজীবীয় এবং নবজীবীয় বলা যেতে পারে। প্রতিটি অধিকল্পের মধ্যে আবার কয়েকটি কল্প বা পিরিয়ড আছে।

বাঘের আসল দেশ কোথায়?

সেনোজোয়িকের প্রথম কল্পটির নাম টার্সিয়ারি (Tertiary)। প্লায়োসিন এরই একটি অধিকল্প।

বাঘের আসল দেশ ছিল মধ্য এশিয়ার এক ভূখণ্ড, বর্তমানে এর নাম মাঞ্চুরিয়া। সেখান থেকেই এরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা খুলির গড়ন, আয়তন, রঙ এবং ডোরার বিন্যাস দেখে বাঘের আটটি

উপপ্রজাতি (Subspecies) নির্ধারণ করেছেন। ভারতীয় বাঘ 'প্যান্থেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস' (Panthera tigris tigris) এর মধ্যে অন্যতম। অপর সাতটি উপপ্রজাতি হল—সাইবেরিয়ান, চাইনিজ, ইণ্ডো-চাইনিজ, কাস্পিয়ান, সুমাত্রান, বালিনিজ এবং জাভান।

মাঞ্চুরিয়া থেকে কোন পথে বাঘ ভারতে আসে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায়নি। পশ্চিম হিমালয়ের খাইবার গিরিপথ কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বনাঞ্চল—এর মধ্যে যে কোনো একটি পথ দিয়ে এরা এদেশে এসে থাকবে। কোনো সন্দেহ নেই, ভারতের মধ্যে এই প্রাণীটি প্রায় সব কটি পরিবেশে নিজেকে মানানসই করে তুলেছে। কিন্তু সমগ্র এশিয়া মহাদেশে যার বিস্তার, এমন একটি শ্বাপদ প্রাণীর নামের সঙ্গে বাংলার নাম জুড়লো কীভাবে? এই নামের ইতিহাসটি কম চিত্তাকর্ষক নয়। 'রয়েল বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ানের' জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার উনিশ শতকের প্রথমদিকে একটি প্রমাণ আয়তনের বাঘ শিকার করেন। তা থেকেই 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' নামটির উৎপত্তি।

বাঘ মাত্রেই কি মানুষ-খেকো?

বাঘের নামের সঙ্গে মানুষ-খেকো অপবাদটি জড়িয়ে গেছে। মনে হয়, বাঘ মানেই যেন মানুষ-খেকো। এই ধারণার পিছনে কিন্তু তেমন প্রামাণ্য তথ্য কিংবা পরিসংখ্যান নেই। আশির দশকে জর্জ শালার (George Schaller) বাঘের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন। শালার দেখিয়েছেন যে বাঘ শিকার করে প্রধানত সম্বর, চিতল, বারশিঙ্গা, কাকর কিংবা পারাহরিণ। বুনো শুয়োরও বাঘের প্রিয় শিকার প্রাণী, তবে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শুয়োরের বাঁকা ধারালো গজদাঁতকে বাঘের ভয় খুব। বড়সড় একটি শুয়োর কাঁধের কাছে নব্বুই সেমি উঁচু (খাড়া) আর ওজনে দুশো তিরিশ কেজির মত হতে পারে। নীচের চোয়াল থেকে বেরোনো বাঁকা গজদাঁত দুটিও প্রায়শই কুড়ি থেকে পঁচিশ সেমির মত লম্বা হয়ে থাকে। অত্যন্ত বলশালী এবং গোঁয়ার বুনো শুয়োরের আক্রমণ থেকে বাঘ অনেক সময়েই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালায়। ছোটখাটো বাঘ মারাও পড়ে।

স্বাভাবিক খাদ্যে টান পড়লে বাঘ হাতি, গণ্ডার এবং বাইসনের (গাউর) মত বিশালদেহী জন্তুর বাচ্চাও শিকার করে। সুন্দরবন এলাকায় বাঘ মাছ, গোসাপ কিংবা কাঁকড়াও খেয়ে পেট ভরায়। সময় বিশেষে এদের বানর এবং হনুমানও শিকার করতে দেখা গেছে। বনের মধ্যে বাঘ কিন্তু একটি জন্তুকে মোটেই ঘাঁটায় না। তার নাম শজারু (Porcupine)। ভয় পেলে শজারু তার তীক্ষ্ণ কাঁটার সারিকে উঁচিয়ে ধরে বল্লমের মত। কাঁটার আঘাতে বাঘ মারাত্মকভাবে জখম হতে পারে, কখনো বা হৃদপিণ্ডের মধ্যে কাঁটা বিঁধে বাঘের মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

অন্য সব বন্যজন্তুর মত বাঘও মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়। বনের মধ্যে বাঘের মুখোমুখি হলে বিরক্তিসূচক গর্জন করে বাঘ গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে, এমন ঘটনার উল্লেখ করেছেন অনেকেই। মানুষকে এড়িয়ে চলাই যে প্রাণীর স্বভাব, মানুষ তার স্বাভাবিক খাদ্য হতেই পারে না।

তাহলে বাঘ মানুষ-খেকো হয় কেন? প্রখ্যাত ইংরেজ শিকারী এবং প্রকৃতিবিদ্ জিম করবেট (Jim Corbett) উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল অঞ্চলে অনেক মানুষ-খেকো বাঘ আর চিতাবাঘ শিকার করেছেন। দিনের পর দিন মানুষ-খেকো জন্তুর পিছনে ঘুরে করবেট তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বাঘের (এবং চিতাবাঘের) মানুষ-খেকো হবার পিছনে কতকগুলো কারণ দেখান। করবেটের মতে তিনটি প্রধান কারণে বাঘ মানুষ-খেকো হয়ে ওঠে।

বাঘ কেন মানুষ খায়?

1. বুড়ো, আহত এবং দুর্বল হলে: অনেক মানুষ-খেকো বাঘের দাঁত ভাঙা কিংবা বাঘটিকে রোগগ্রস্ত অবস্থায় দেখা গেছে; সামনের থাবাতেও ক্ষত (অনেক সময়ে শজারুর কাঁটা বিঁধে) নজরে এসেছে।

2. প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা মহামারী শুরু হলে উপযুক্ত সৎকার না করে মৃতদেহ পাহাড়ের খাদে ফেলে দেয় গরীব মানুষ। করবেট গাড়োয়াল অঞ্চলে এইরকম ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বাঘ সেই মৃতদেহ খাবার পরেই মানুষ-খেকো হয়ে উঠেছিল। এই মানুষ-খেকোরা কিন্তু বুড়ো বা শারীরিকভাবে অক্ষম ছিল না।

3. মানুষ-খেকো বাঘিনীর বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই মানুষ-খেকো হয়ে ওঠে। মায়ের কাছ থেকে তারা মানুষ শিকারের কায়দা-কানুনও বেশ রপ্ত করে নেয়।

হরিণ-শুয়োরের মত স্বাভাবিক শিকারপ্রাণী ধরতে গেলে বাঘকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঘ আহতও হয়। সেদিক থেকে মানুষ শিকার করার সুবিধে অনেক। ঘাড়ের পিছনে একটি শক্তসমর্থ থাবার আঘাত যথেষ্ট। তাতেই হতভাগ্য মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে।

করবেট যে সব কারণের কথা বলেছেন, গাই মাউন্টফোর্ট (Guy Mountfort), অর্জন সিং (Arjan Singh) এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও তা সমর্থন করেছেন। সুন্দরবনের মানুষ-খেকো বাঘ সম্পর্কে কিন্তু আরো কয়েকটি কারণ জানা গেছে। বিশেষজ্ঞরা একমত যে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তীব্র খাদ্যাভাব এখানকার বাঘের মানুষ-খেকো স্বভাবের জন্য দায়ী। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, সুন্দরবনের বাঘের মধ্যে অন্ততপক্ষে দশ শতাংশের মত মানুষ-খেকো। অথচ ভারতে কিংবা এশিয়ার অন্য দেশে বাঘের মুখে মানুষের প্রাণ যাবার ঘটনা কদাচিৎ শোনা যায়।

সুন্দরবনের বাঘ তৃষ্ণা মেটায় খাঁড়ির নোনাজলে। গবেষণায় জানা গেছে, এর ফলে বাঘের শরীরে কিছু অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। অনেকে এর সঙ্গে বাঘের মানুষ-খেকো হবার একটি যোগসূত্রও খুঁজে পেয়েছেন।

আর একটি ব্যাখ্যাও শোনা গেছে। বাঘ ফেরোমোন (Pheromone) নামের একটি বিশেষ তরল পদার্থ ছিটিয়ে নিজের এলাকার সীমানা চিহ্নিত করে। ফেরোমোনের রাসায়নিক বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে যে প্রত্যেকটি বাঘের ফেরোমোন ভিন্ন প্রকৃতির, ঠিক যেমন প্রত্যেকটি মানুষের 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' বা আঙ্গুলের ছাপ আলাদা। একটি বাঘ অপর বাঘের সীমানায় ঢোকার সময়েই বুঝতে পারে, এলাকাটি নিজের নয়। কোনো বাঘই নিজের এলাকায় অনুপ্রবেশকারী অপর বাঘকে সহ্য করে না, মেরে তাড়িয়ে দেয়। গাছের গোড়াতে বাঘ ফেরোমোনের যে গণ্ডি টানে, সুন্দরবনে নদীর জোয়ার-ভাঁটায় মুছে যায় সে ফেরোমোনের গণ্ডি। ফলে এখানকার বাঘও অনেক বেশি অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। একেই অনুপ্রবেশকারীদের ভয়ে সারাক্ষণ চড়া-মেজাজ, তারপর কাঠুরে, মধুয়াল এবং জেলেদের নিজের এলাকায় ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখে বাঘ তাদের আক্রমণ করে। একবার মানুষ শিকারে অভ্যস্ত হয়ে গেলে বাঘ ক্রমশই বুঝতে পারে, মানুষ মারাই সবচেয়ে সহজ আর তাতে পরিশ্রম যেমন কম লাগে, তেমনই আঘাত পাবার সম্ভাবনাও থাকে না। মানুষ-খেকো বাঘ ক্রমশই অসম্ভব চতুর হয়ে ওঠে।

বাঘ ছাড়া চিতাবাঘও মানুষ-খেকো হতে পারে। চিতাবাঘ মানুষের বসতির আশপাশেই থাকে, বাঘের মত ঘন জঙ্গলের চেয়ে একটু খোলামেলা এবং নীচু ঝোপঝাড়ওলা জঙ্গলেই এদের আস্তানা। খাদ্যের ব্যাপারে এদের বিশেষ বাছবিচার নেই। যে জন্তু-জানোয়ারকে এরা শিকার করতে পারে, তার মাংসেই পেট ভরায়। রাতের অন্ধকারে গৃহস্থের গোয়াল থেকে বাছুর, মোষের বাচ্চা, ছাগল-ভেড়া এবং গ্রাম্যপথ থেকে নেড়ি কুকুর মেরে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। মানুষের সান্নিধ্যে থাকার জন্য চিতাবাঘ মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল। কাজেই মানুষ-খেকো হলে এরা ধূর্ত এবং ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে কুখ্যাত মানুষ-খেকোটি একটি বাঘিনী— 'চম্পাবতের মানুষ-খেকো।' 1911 সালে জিম করবেট বাঘিনীটিকে মারার আগে আট বছরে নেপাল এবং কুমায়ুন অঞ্চল থেকে সেটি চারশো আটত্রিশ জন মানুষের জীবন নেয়। চিতাবাঘও কম যায় না। 1910 সালে করবেটের হাতে মরার আগে 'পানারের মানুষ-খেকো চিতাবাঘটি চারশোর কাছাকাছি মানুষ মারে।

বাঘ আর সিংহের মধ্যে কোনটা বড়?

কেশরের জন্য সিংহকে বাঘের তুলনায় বড় মনে হয়। কিন্তু সিংহীকে দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। বাঘ এবং সিংহের মধ্যে বাঘই আছে একটু এগিয়ে। সাইবেরিয়ার বাঘ গড়ে লম্বায় 3 মিটার 12 সেন্টিমিটার (10 ফুট 3 ই)। একটি পূর্ণবয়স্ক সাইবেরিয়ান বা 'আমুর' বাঘের নাকের ডগা থেকে লেজের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত মাপলে এই হিসেবটি পাওয়া যাবে। এই জাতের একটি স্বাস্থ্যবান পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘের গড় ওজন 265 কেজি। এই বাঘের ল্যাটিন নাম 'প্যান্থেরা টাইগ্রিস অল্টাইকা' (Panthera tigris altaica)।

দু'জাতের সিংহের মধ্যে আফ্রিকার সিংহ (Panthera

leo leo) বড় আর ভারি। বাঘের চেয়ে সিংহের গড় দৈর্ঘ্য কয়েক সেমি কম আর ওজনেও কিছুটা হালকা। গড়ে বাঘের কাছে পিছু হটলেও রেকর্ডে সিংহ কিন্তু এগিয়ে। রোল্যাণ্ড ওয়াণ্ড (Rowland Wand) 1969 সালে এই রকম দুটি রেকর্ডের উল্লেখ করেছেন। 3 মি 33 সেমি লম্বা একটি সিংহ শিকার করেন জি প্রুডহোম (G. Prudhome) আফ্রিকার উগাণ্ডায়।

লড়াই বাঁধলে কোনটা জিতবে—বাঘ না সিংহ?

বাঘ আর সিংহের মধ্যে বন্য অবস্থায় লড়াই বাঁধার সম্ভাবনা নেই। বাঘের তুলনায় সিংহের রাজ্যপাট অনেক বেশি বিস্তৃত। বর্তমানে আফ্রিকা এবং পশ্চিম ভারতের সাসানগির অরণ্যে সিংহের বিস্তার। কয়েক শতাব্দী আগেও কিন্তু দক্ষিণ ইউরোপ, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় সিংহ ছিল। ভারতেও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্বে বিহারের বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে এদের দেখা যেত। বাঘ একান্তভাবেই এশিয়ার প্রাণী।

প্রকৃতিতে এই দুই বলবান জন্তুর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। বাঘ গরম সহ্য করতে পারে না, বরং ঘোর শীতে এদের তেমন কষ্ট হয় না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গরমে বাঘ এই কারণেই গভীর বনাঞ্চলে ডেরা বাঁধে। গরম থেকে বাঁচতে নদী-নালার জলে গা ডুবিয়েও বসে থাকে।

সিংহের পছন্দ অল্পস্বল্প নীচু ঝোপ-ঝাড় সম্বলিত খোলামেলা জঙ্গল। বড় বড় গাছের নিবিড় বন এদের তেমন পছন্দ নয়। স্বভাব, আচার-আচরণ এবং বাসস্থানের এই পার্থক্যের জন্য বাঘ এবং সিংহ কখনোই মুখোমুখি হয় না।

তবে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে তিন-চারশো বছর আগেও বাঘ এবং সিংহ পাশাপাশি বাস করেছে। বনের মধ্যে খাদ্যের ভাগ, বাসস্থানের অধিকার, এলাকার উপর প্রভুত্ব এইসব কারণে এই দু'টি প্রাণীর মধ্যে কখনো সংঘর্ষ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি কখনো এই দুই প্রাণীর দেখা হয়ে থাকে তবে দু'টিই একে অপরকে এড়িয়ে গিয়ে থাকবে।

তাহলে কি কখনো এদের মধ্যে লড়াই হয়নি? জানা গেছে, প্রাচীনকালে রোমের অভিজাতরা ক্ষুধার্ত বাঘ এবং সিংহের লড়াই বাঁধিয়ে তামাশা দেখতেন। এই লড়াইতে কে জিততো—বাঘ না সিংহ? এর উত্তর অবশ্য পাওয়া যায়নি।

তবে বাঘ-সিংহের শারীরিক গঠন, পেশীর সংস্থান, সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং সামনের দুই থাবার আঘাত করার ক্ষমতা মেপে এবং এই সব গুণাবলীর প্রতিতুলনা ক'রে দু'টি প্রাণীর কল্পিত লড়াইয়ের সম্ভাব্য বর্ণনা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সিংহের সাহস এবং থাবার জোর বাঘের তুলনায় একটু বেশি। সেইজন্য প্রথম রাউণ্ডে সিংহই বাঘকে দেবে বেশ কয়েক ঘা। বাঘ প্রথমদিকে পিছু হটলেও তুলনায় অধিক ধূর্ত এবং সহ্যক্ষমতা বেশি বলে কিছুক্ষণ পরেই সিংহকে নাজেহাল করে তুলবে। তবে বাঘ বা সিংহ, কেউই জয়ের আনন্দ বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারবে না। দু'টোই এত বেশি জখম হবে যে শেষ পর্যন্ত কেউ আর বেঁচে ফিরবে, মনে হয় না।

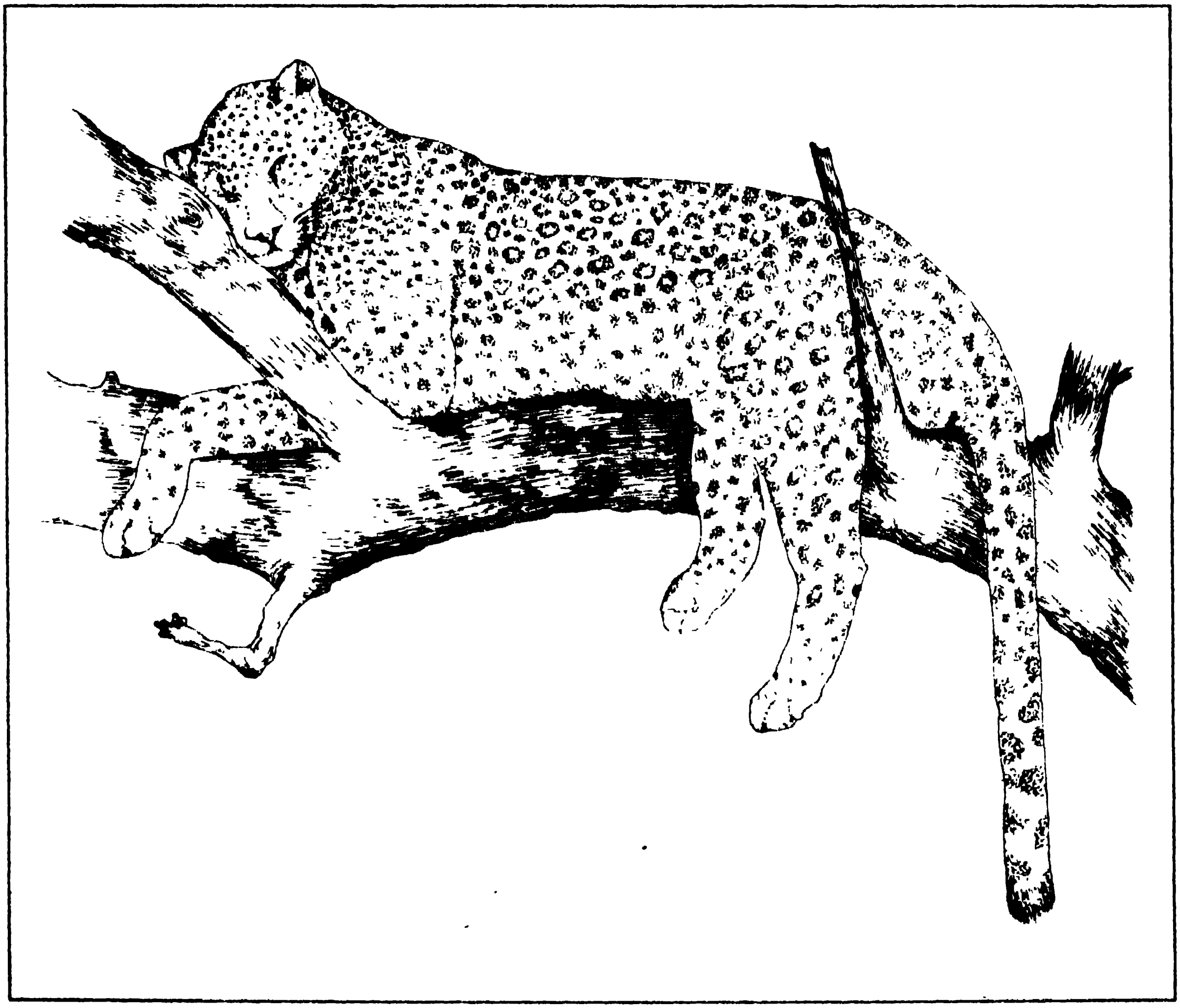
চিতা আর চিতাবাঘ কি একই প্রাণী?

না, চিতা আর চিতাবাঘ সম্পূর্ণ আলাদা জাতের দু'টি শিকারি প্রাণী। চিতাবাঘ সিংহ, বাঘ এবং জাগুয়ারের নিকট সম্পর্কিত। এদের গর্জন করার ক্ষমতা রয়েছে। পায়ের বাঁকা ধারালো নখগুলোকে এরা প্রয়োজনমত চামড়ার

চিতা কি গর্জন করতে পারে?

আবরণীর ভিতরে গুটিয়ে নিতে পারে। শিকারী চিতার (Acinonyx jubatus) গর্জন করার ক্ষমতা নেই, উত্তেজিত হলে এরা এক ধরনের কর্কশ আওয়াজ করে, যাকে বাঘ-সিংহ কিংবা চিতাবাঘের গর্জনের সঙ্গে কোনোমতে তুলনা করা যায় না। পায়ের নখগুলোও এরা থাবার ভিতরে গুটিয়ে নিতে পারে না, কারণ এদের আঙ্গুলের গোড়ায় আবরণী থাকে না।

চিতার থেকে চিতাবাঘকে আলাদা করার আরো কয়েকটি সোজা উপায় আছে। চিতার পা চারটে সরু লিকলিকে। নাকের ডগা থেকে চোখের কোল পর্যন্ত একটি চওড়া অবতল পটি চলে গিয়েছে। গায়ে হলুদ রঙের উপর নিরেট কালো বুটির নকশা। নীচু গাছে উঠতে পারলেও চিতাকে ঠিক প্রকৃত বৃক্ষচর প্রাণী বলা যাবে না। বরং এরা

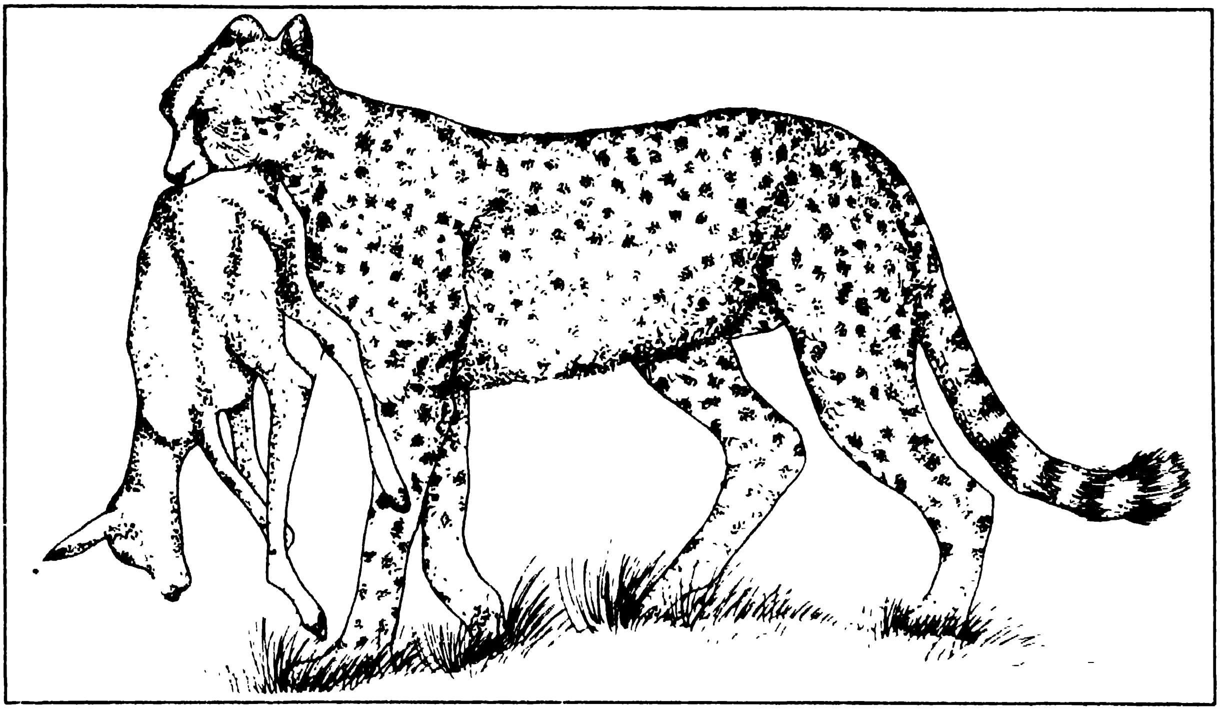


চিতাবাঘ

বেশ দৌড়বাজ। শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ে এরা ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

চিতাবাঘ 'প্যান্থেরা'গণের প্রাণী বলে বাঘ-সিংহের মত গর্জন করতে পারে। এদের স্বরযন্ত্রের (Larynx) দেওয়ালে খুব ছোট একটু হাড়ের টুকরো থাকায় শব্দের অনুরণন হয় এবং তীব্রতা বাড়ে। এদের পাগুলো দেহের সঙ্গে মানানসই এবং শক্তিশালী। বাঘ-সিংহের মত চিতাবাঘও প্রয়োজন মত থাবার ভিতরে অর্থাৎ আঙ্গুলের গোড়ায় চামড়ার আবরণীর মধ্যে নখগুলিকে গুটিয়ে নিতে পারে। খুব বেশি দৌড়োয় না চিতাবাঘ, বরং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গাছে চড়তে পারে। জঙ্গলের মধ্যে ছোট ঝোপঝাড় কিংবা উঁচু বড় বড় পাতা-ছাওয়া গাছে দিব্যি নিজেকে লুকিয়ে রাখে চিতাবাঘ। গাঢ়-হলুদ কিংবা কমলা-হলুদ উজ্জ্বল চামড়ার উপর গোল গোল চাকা চাকা দাগে এদের আত্মগোপন করার সুবিধা খুব। শিকার নাগালের মধ্যে এলে হঠাৎ তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়াই এদের অভ্যাস।

চিতা আর চিতাবাঘের শিকার ধরার কায়দাও আলাদা। চিতাবাঘ শিকারকে পিছন থেকে আক্রমণ করে সামনের থাবার জোরালো আঘাতে শিকারের ঘাড় ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করে। পিছনের পা দুটো এবং লেজ সেই সময়ে দেহের ভার বহন করে আর ভারসাম্যও রক্ষা করে। বাঁকা ধারালো নখ এরা শিকারের দেহে বিঁধিয়ে দেয় বঁড়শির মত। শক্তিশালী



শিকারী চিতা

চোয়াল আর ধারালো দাঁতের কামড়ে শিকারের ঘাড় আর কাঁধ থেকে মাংসের ফালিও কেটে নেয়।

চিতার পা কিন্তু শিকার-প্রাণীটিকে বধ করতে কোনো কাজে আসে না। এর কাজ চলাফেরায় অংশগ্রহণ আর সেই সঙ্গে দেহের ভারবহন। ঘাসঝোপ এবং গুল্মঝোপের আড়ালে চিতা শিকারের খুব কাছাকাছি চলে আসে। আফ্রিকায় উন্মুক্ত প্রান্তরে এরা গ্যাজেল (Gazzell), ডিক্-ডিক্ (Dik-Dik) ইত্যাদি ছোট আকারের অ্যান্টিলোপ

চিতা কী ভাবে শিকার ধরে?

মেরে খায়। এই তৃণভোজী প্রাণীগুলি অসম্ভব দ্রুতবেগে ছুটতে পারে। কাজেই একেবারে নাগালের মধ্যে না পেলে চিতা এদের উপরে তাক করে না। শিকার যখন চিতাকে দেখে তখন আর তার বাঁচবার উপায় থাকে না। মেরুদণ্ডটিকে ধনুকের মত হঠাৎ বাঁকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সোজা করে দেয় চিতা। লম্বা সরু চারটে পা-কে শরীরের তলায় গুটিয়ে এনে তারপর হঠাৎ ছড়িয়ে দেয়। প্রায় ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের ভঙ্গিতে এরা এক লাফে শিকারের কাছে গিয়ে পড়ে। চিতা আক্রমণ করে শিকারের গলার পাশে জুগুলার শিরা (Jugular Vein) দুটি। লম্বা ছুরির মত শ্বদন্ত (Canines) দুটি বসিয়ে দেয় শিরা দুটির উপর। শিকারের ঘাড় ভাঙ্গার ক্ষমতা নেই চিতার। পরিবর্তে গলা কামড়ে শিকারটিকে সে মাটিতে ফেলে দেবার চেষ্টাই করে।

চিতাবাঘ বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এবং আফ্রিকায় রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় বাঘ না থাকলেও চিতাবাঘ আছে।

শিকারি চিতা রয়েছে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায়। পঞ্চাশ বছর আগেও শিকারী চিতা ভারতে ছিল। ভারতের বাইরে এই প্রাণীটিকে দেখা যেত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায়। 1952 সালে দক্ষিণ ভারতের চন্দ্রগিরি অঞ্চলে শেষবারের মত ভারতের মাটিতে শিকারী চিতা দেখেন কার্ক প্যাট্রিক (Kirk Patrik)।

আফ্রিকা এবং এশিয়ার চিতা একই প্রজাতির তবে দুটি আলাদা উপপ্রজাতির (Sub-species) প্রাণী। ভারত থেকে অবলুপ্ত হলেও তুর্কমেনিয়ার 'বধিজ' (Badhyz) সংরক্ষিত অরণ্যে (Reserve forest) অল্প কিছু সংখ্যায় এবং ইরানের 'খোস ইয়েলাঘ' (Khosh Yeilagh) অঞ্চলে আনুমানিক দু'শোটির মত এশিয়ার চিতা অবশিষ্ট রয়েছে।

'লেপার্ড' আর 'প্যান্থারকে' আলাদা করবো কী ভাবে?

লেপার্ড (Leopard) আর প্যান্থারকে (Panther) আলাদা করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এরা একই জাতের প্রাণী। চিতাবাঘই ইংরেজিতে এই দুটি নামে পরিচিত। মজার কথা, বড় আয়তনের চিতাবাঘকে লেপার্ড এবং ছোটগুলোকে প্যান্থার বলার একটা রীতি প্রচলিত আছে। কালো চিতাবাঘকে কিন্তু 'ব্ল্যাক প্যান্থারই' বলা হয়। অন্য বড় শিকারী জন্তুর চেয়ে চিতাবাঘের আয়তনে তারতম্য অনেক বেশি। বড়সড় চিতাবাঘ যেখানে লম্বায় আড়াই মিটারের কাছাকাছি হতে পারে, সেখানে ছোটখাটোরা দু' মিটারের কিছু বেশি হয়ে থাকে।

গণ্ডারের শিঙের কি সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতা আছে?

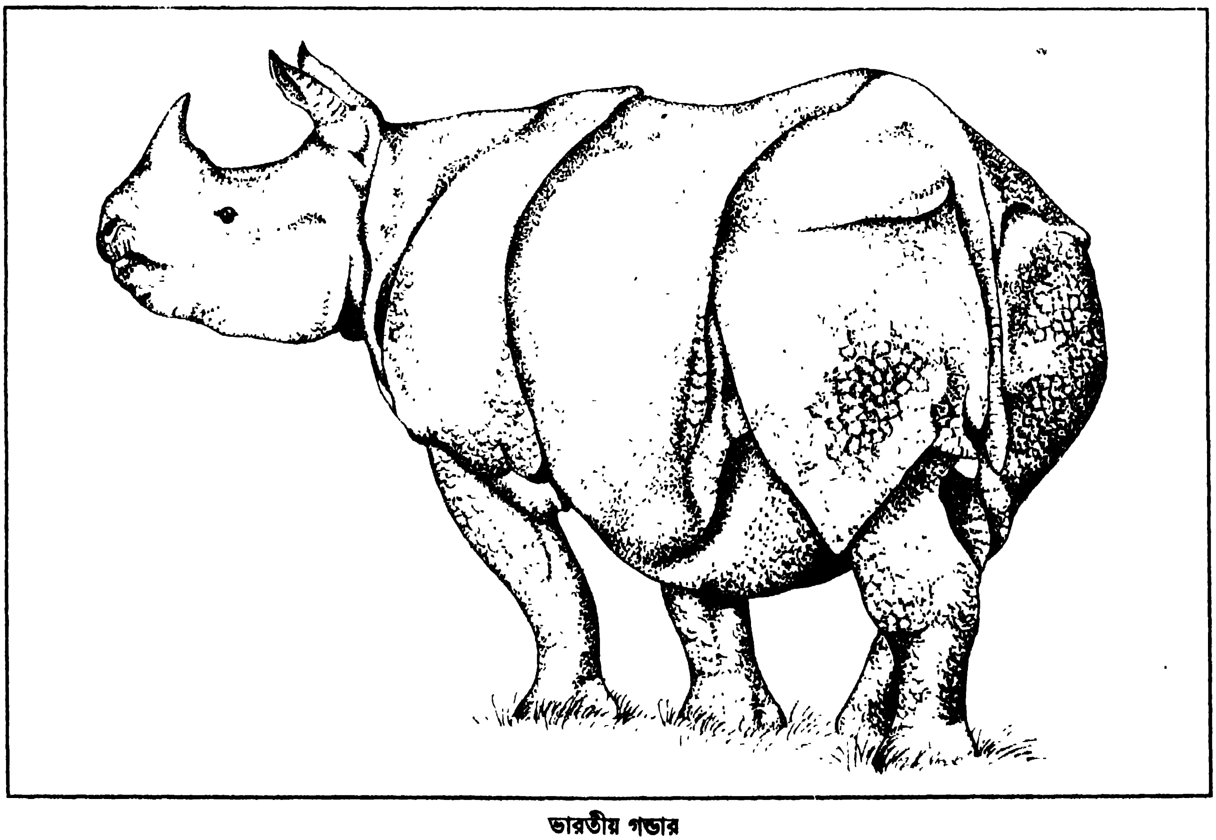
গণ্ডারের নাকের ওপরে যে শিঙ বা খড়্গ থাকে সেটি একগুচ্ছ রোম দিয়ে তৈরি। এই ধরনের শিঙকে সেইজন্য হেয়ার হর্ন (Hair horn) বলা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশেই একটি বিশ্বাস চালু আছে যে, গণ্ডারের শিঙের গুঁড়ো এবং শিঙ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তৈরি ওষুধ সেবন করলে

কি দিয়ে তৈরি গণ্ডারের শিঙ?

জ্বর থেকে শুরু করে মারাত্মক অসুখ সেরে যায়। সহজে বার্ধক্য আসে না। শিঙ এবং চামড়ার তৈরি আংটি ধারণ করলে ভূত-প্রেত, অপদেবতারা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শিঙের তৈরি পাত্রে বিষ রাখলে তাও অকেজো হয়ে যায়। শুধু শিঙ বা চামড়া নয়, গণ্ডারের রক্ত-মাংস, চর্বি, হাড় —সব কিছুই কোনো কল্পিত অলৌকিক গুণযুক্ত বলে বিশ্বাস করেন অনেকে। এসব ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে গণ্ডারের দেহাবশেষের কোনো বিশেষ গুণাবলীর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কলকাতায় কি আগে গণ্ডার ছিল?

জোব চার্নক কলকাতা শহরের পত্তনের আগে কলকাতা



ভারতীয় গণ্ডার

ছিল জলা আর জঙ্গল সমাকীর্ণ। সেই সময়ে এখানকার মাটি ছিল নোনা আর কাদা প্যাচপেচে। সুন্দরী-গরান-গেঁও-বাইন-গোলপাতার যে বনাঞ্চল এখন সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায়, তাই আকীর্ণ ছিল ওই পরিবেশে। এইরকম বনকে 'ম্যানগ্রোভ' (Mangrove) বা লবণাম্বু বনভূমি বলা হয়। ওই বনেই চরতো এক জাতের ছোট আয়তন-বিশিষ্ট গণ্ডার। গণ্ডারের যে প্রজাতিটি বর্তমানে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স আর আসামে এবং ভারতের বাইরে নেপালে

ভারতীয় গণ্ডার কি কলকাতায় ছিল?

টিকে আছে সেটিকে বলা হয় 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান ওয়ান হর্নড্ রাইনোসেরস' (The Great Indian one horned Rhinoceros)। কলকাতায় যেটি চরতো তার নাম 'জাভান রাইনোসেরস (Javan Rhinoceros)। বর্তমানে এই জাতের গণ্ডার ভারত থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বহির্ভারতে মাত্র দুটি জায়গায়—পশ্চিম জাভার 'উদজাং কুলোন' (Udjung Kulon) সংরক্ষিত অরণ্যে পঞ্চাশটির মত এবং উত্তর সুমাত্রার 'লিউসার রিজার্ভে' (Leuser Reserve) পঁচিশটির মত জাভার গণ্ডার অবশিষ্ট রয়েছে। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই বন্যপ্রাণীটি ক্রমশই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

তিন থেকে সাড়ে তিন মিটার লম্বা আর দেড় মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট গণ্ডারটিকে দেখতে প্রায় বড় একশিঙ গণ্ডারের মতই, তবে আয়তনে অনেক ছোট। শিঙ খুব ছোট, লম্বায় 20-25 সেমি। শুধু পুরুষ গণ্ডারেরই শিঙ থাকে। এদের গায়ের রঙ ধূসর। বড় গণ্ডারের মত চামড়ার উপরে গুটি থাকে না, তবে চামড়ার লম্বা ভাঁজগুলো স্পষ্ট। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে এই গণ্ডারের একটি নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

কলকাতায় মাটির নোনাভাব আস্তে আস্তে কেটে যেতে থাকে। কাদা প্যাচপেচে ভাবেরও পরিবর্তন হয়। ম্যানগ্রোভ বনও ক্রমশ দূরে সরে যায়। বন-জঙ্গল অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্যপ্রাণীরাও কলকাতার সীমানা থেকে উধাও হয়। গণ্ডারও বহুদিন হল এই অঞ্চল থেকে হারিয়ে গেছে। সুন্দরবনের আরণ্যক পরিবেশে কিন্তু এই জাতের গণ্ডার উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত টিঁকে ছিল। 1870 সালে সুন্দরবন থেকে এর শেষ নিদর্শনটি পাওয়া যায়। পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া গেছে আরো বেশ কিছুদিন পরে, 1887 সাল পর্যন্ত।

হাতি-গণ্ডার কেন কাদা মাখে?

হাতি-গণ্ডার এবং বুনো মোষের মত জন্তুরা জল খুব ভালবাসে। প্রায়ই এদের নদী-নালার মধ্যে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। গরমের দিনে তো এরা জল ছেড়ে উঠতেই চায় না। জলকাদায় গড়াগড়ি দেওয়াও এদের অভ্যাস। হাতি আবার স্নান করে উঠে শুঁড়ে ধুলোমাটি নিয়ে গায়ে ছিটিয়ে থাকে।

জলে ডুবে শরীরকে ঠাণ্ডা করলেও হাতি কাদা মাখে কেন?

আসলে এদের গায়ে পোকা-মাকড় আশ্রয় নেয়। এই বহিঃ-পরজীবীদের অধিকাংশই হাতি-গণ্ডারের চামড়ার ভাঁজে, কানের পিছনে, পেটের তলায় কিংবা অন্য জায়গা থেকে রক্ত চুষে খায়। দেহের তুলনায় ঘাড় এবং লেজ ছোট হওয়ায় পোকা-মাকড় তাড়াতে এদের বেশ অসুবিধে হয়। অথচ রক্তচোষা পোকার উপদ্রবে অস্বস্তিও হয়। সেইজন্য

জলে ডুবে শরীরকে ঠাণ্ডা করলেও হাতি কাদা মাখে কেন?

ভিজে কাদামাটি শুকিয়ে দেহের ওপরে এরা একটা আস্তরণ তৈরি করে। এর ফলে পোকা-মাকড়কে যেমন প্রতিরোধ করা যায়, অপরদিকে তেমনই চুলকানি এবং অন্যান্য অস্বস্তিরও কিঞ্চিৎ উপশম হয়। কাদার প্রলেপ অস্থায়ী। শুকিয়ে এই প্রলেপ ঝরে গেলে আবার নতুন করে কাদা মাখার দরকার হয়।

সাদা হাতি এবং সাদা গণ্ডার কি সত্যিই আছে?

জনশ্রুতি আছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশে সাদা হাতি দেখতে পাওয়া যায়। এই লোককথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অন্য জীবজন্তুর মত হাতির

বেলাতেও অ্যালবিনো জন্মাতে পারে। তবে অ্যালবিনো অর্থাৎ সাদা হাতি জন্মানোর তেমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। বুড়ো হলে হাতির শুঁড়, কপাল এবং কানে সাদা সাদা ছিটছিটে দাগ তৈরি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাগগুলো আয়তনে বাড়ে। শ্বেতী বা লিউকোডার্মার (Leucoderma) জন্যই এই দাগের সৃষ্টি। এটা কোনোভাবেই অ্যালবিনিজম্ নয়।

সাদা হাতির মত সাদা গণ্ডারও অ্যালবিনো। কিন্তু তা অত্যন্ত বিরল। আফ্রিকায় যে বিরল জাতের দুই-শিং গণ্ডার সাদা গণ্ডার বা 'হোয়াইট রাইনো' বলে পরিচিত, সেটিও আসলে মেটে-বাদামী বা ধূসর রঙের। তবে এর এমন নাম কেন? আসলে এটির চোয়াল চওড়া আর তাই এটি 'ওয়াইড মাউথ্‌ড্ রাইনো' (Wide-mouthed rhino) নামেও পরিচিত। ওলন্দাজ শিকারীদের প্রথমে এই জাতের গণ্ডারের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। ইংরেজরা এর খবর পায় তাদের থেকেই। 'ওয়াইড' শব্দটি বিকৃত উচ্চারণে দাঁড়ায় হোয়াইট। সেই থেকে সাদা রঙের না হওয়া সত্ত্বেও গণ্ডারটির নামের সঙ্গে শব্দটি জড়িয়ে গেছে।

বড় কান থাকায় হাতি কি বেশি শুনতে পায়?

হাতির দৃষ্টি ক্ষীণ, তুলনায় ঘ্রাণ এবং শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর। বড় কান, ঠিকভাবে বলতে গেলে কর্ণছত্র বা পিনা (Pinna), বাতাসে ভেসে আসা শব্দ-তরঙ্গ ধরতে সাহায্যে করে। দেহতাপের বেশ কিছুটা পিনার মধ্য দিয়েই বাইরে বেরিয়ে যায়। কান দুটিকে এরা ঘন ঘন নাড়িয়ে দেহের অতিরিক্ত তাপ ছাড়ার চেষ্টা করে। এইজন্যই গ্রীষ্মের দুপুরে এদের বেশি করে কান নাড়াতে দেখা যায়। এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় আফ্রিকায় গরম বেশি। এইজন্যই আফ্রিকার হাতির কান দুটি আরো বড়।

সব হাতির কি গজদন্ত (Tusk) থাকে?

হাতির উপরের চোয়ালের সামনের দুটি দাঁত বা কৃন্তক (Incisors) আকারে অনেক বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে। এই দুটিই গজদন্ত। হলদেটে গজদন্ত ডেনটাইন (Dentine) দিয়ে তৈরি। এর সুচলো ডগায় থাকে এনামেল (Enamel)।

এশিয়ার হাতিদের বেলায় শুধুমাত্র পুরুষ হাতির গজদাঁত বেরোয়। মেয়ে হাতির ওই দাঁত দুটি খুবই ছোট, বাইরে থেকে প্রায় দেখাই যায় না। সব পুরুষেরও আবার গজদাঁত থাকে না। গজদাঁত থাকলে হাতিকে দাঁতাল আর গজদাঁতহীন হাতিকে মাক্‌না বলা হয়। কিছু পুরুষ হাতির

হাতিদের মধ্যে কাকে বলে 'গণেশ'?

আবার একটি মাত্র গজদাঁত থাকে, এদের বলে 'গণেশ'। গবেষণায় দেখা গেছে যে গজদাঁত বেরোনোর পিছনে জিনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারত এবং নেপাল-ভুটানে দাঁতালদের সংখ্যা দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কার তুলনায় বেশি।

আফ্রিকার হাতিদের ক্ষেত্রে অবশ্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব হাতিরই গজদাঁত বেরোয়। তবে মেয়ে হাতির গজদাঁত পুরুষ হাতির তুলনায় ছোট।

হাতি কেন গুণ্ডা হয়?

হাতিদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। এদের দলে অনেকগুলো মেয়ে হাতি, কিশোর-কিশোরী আর বাচ্চা হাতি থাকে। দলের সর্দারনি হয় একটি বয়স্কা মেয়ে হাতি। অল্পবয়স্ক পুরুষ হাতির সেই দলে ঠাঁই হলেও পরিণত বয়স্ক পুরুষের সেখানে জায়গা হয় না। দল থেকে বিতারিত হয়ে একা একা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় পুরুষ হাতি। এদেরই কুখ্যাতি গুণ্ডা হাতি বলে। বন-জঙ্গলের সীমানা ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে উৎপাত করা, ঘরবাড়ি ভাঙ্গা, মানুষ মারা, ক্ষেত-খামার তছনছ করা—এদের অপকর্মের তালিকাটি কম দীর্ঘ নয়। হাতির দলের দেখা পেলে গুণ্ডাহাতি তার মধ্যে ঢুকে কিছু সদস্যাকে দল ভাঙ্গিয়ে আনার চেষ্টা করে। অন্য সমর্থ পুরুষ হাতির দেখা পেলে আবার লড়াইও বেধে যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বনের মধ্যে তাণ্ডব চালিয়ে যায় দুই প্রতিপক্ষ। যতক্ষণ না একটি হাতি পরাজয় স্বীকার করে চম্পট দেয়, লড়াই চলে ততক্ষণ। গুণ্ডা হাতির উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে বনের সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ। অনেক গুণ্ডা হাতিকে আবার মত্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এই

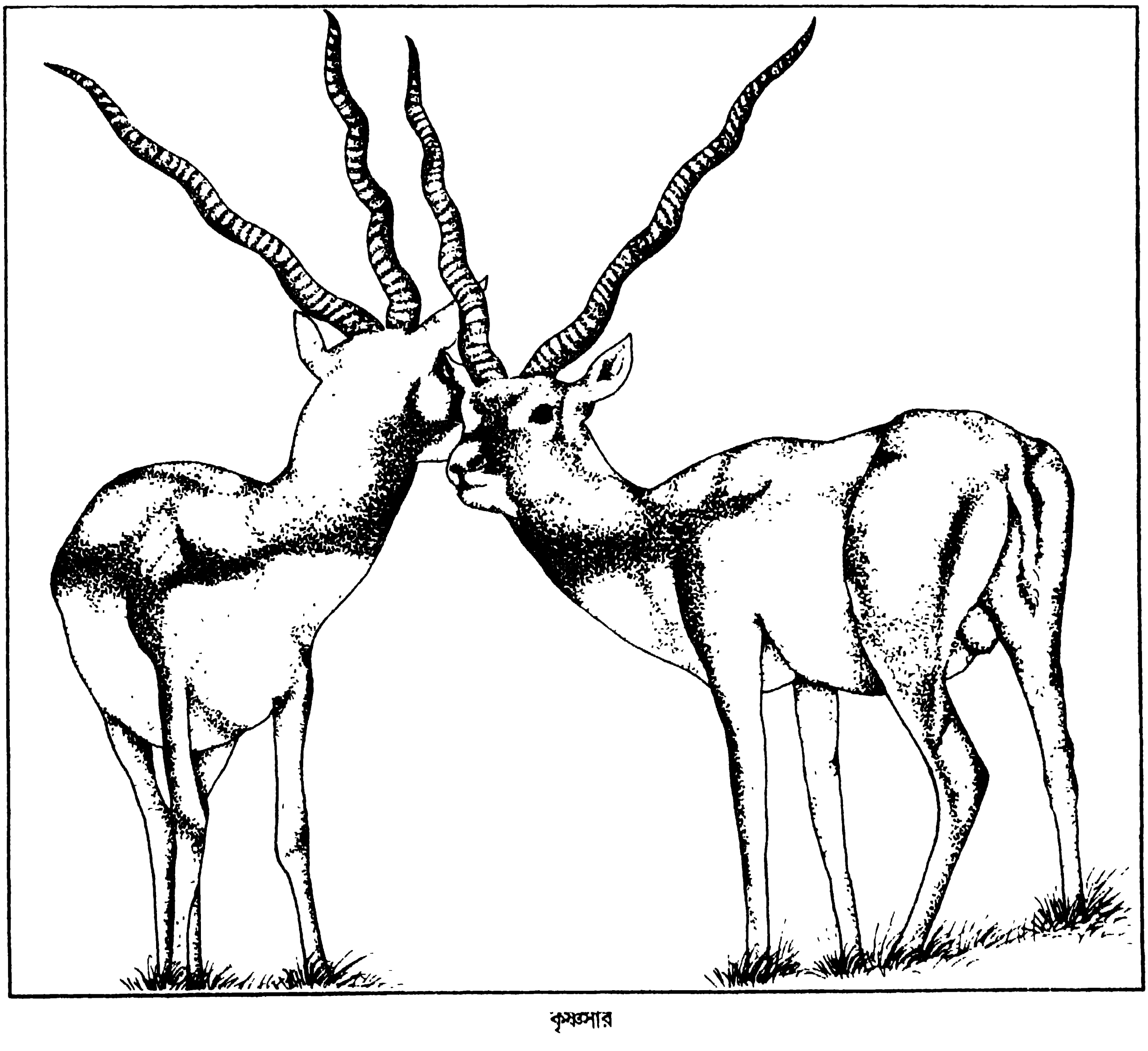
অবস্থাকে 'মস্তি' (ইংরেজিতে musth) বলে। এই সময়ে এদের কপালের একটু পিছনে কালো 'টেম্পোরাল গ্ল্যাণ্ড' (Temporal glands) দুটি বড় হয়ে ফুলে ওঠে এবং এক ধরনের তরল পদার্থ নিঃসরণ করে। গুণ্ডার অত্যাচার থেকে মানুষের প্রাণ বা আশ্রয় এবং বিষয়সম্পত্তি বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত তাকে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না।

হাতি কতদিন বাঁচে?

হাতি একশো বছর বাঁচে এমন একটা ধারণা আছে। আসলে হাতি বন্য অবস্থায় বাঁচে অনেক কম, গড় হিসেবে 55 থেকে 60 বছর। হাতির দুটি চোয়ালেই দু'পাশে দুটি করে খুব বড় আয়তনের পেষক দাঁত (Molars) থাকে। এই পেষক দাঁত বিচিত্র গড়নের। এর উপর-পিঠটা আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা। এতে খাদ্য চিবনোর সুবিধে

হাতির খোরাক কত?

হয়। হাতির খোরাক কম নয়, প্রতিদিন 20 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ৪০-90 কেজি ঘাস-পাতা, গাছের ছাল, শিকড়-কন্দ, কচি ডাল, কাঁচা-পাকা ফল খেয়ে যায় এরা। অবিরাম ঘর্ষণে পেষক দাঁতও ক্ষয়ে যায়। পুরনো অকেজো দাঁতের



কৃষ্ণসার

জায়গায় আবার পিছন থেকে নতুন দাঁত ওঠে। হাতির বয়স 55 পেরিয়ে গেলে নতুন দাঁত ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে হাতির পক্ষে আর তার স্বাভাবিক খাদ্য খাওয়া সম্ভব হয় না। দুর্বল আর শীর্ণ হাতি তখন আর দলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেও পারে না। দলছুট হাতি একা একাই ঘুরে বেড়ায়। তারপর অনাহার এবং অপুষ্টিতে মারা পড়ে।

কৃষ্ণসার কি হরিণ?

কৃষ্ণসারের ইংরেজি নাম 'ইণ্ডিয়ান ব্ল্যাক-বাক'(Indian Black buck)। এরা হরিণ নয়, অ্যান্টিলোপ (Antelope)। হরিণের সঙ্গে অ্যান্টিলোপের প্রধান পার্থক্য শিঙের গড়নে। হরিণের শিঙ শাখা-প্রশাখা সমন্বিত হয়ে থাকে, অ্যান্টিলোপের শিঙের কোনো শাখা থাকে না। অবশ্য অ্যান্টিলোপের শিঙ সোজা, বাঁকা কিংবা প্যাঁচালো—যেমন ইচ্ছে হতে পারে। তাছাড়া হরিণের শিঙ খসেও যায়, আবার

অ্যান্টিলোপেরা কি শিং খসায়?

নতুন করে গজায়। যতবার নতুন শিঙ গজায় ততই শিঙ হয়ে ওঠে আরো বেশি শাখান্বিত। অ্যান্টিলোপের শিঙ খসে না।

সবচেয়ে ছোট ভারতীয় অ্যান্টিলোপ কোনটি, সবচেয়ে বড়ই বা কোনটি?

সবচেয়ে ছোট ভারতীয় অ্যান্টিলোপটির নাম চিংকারা (Chinkara), ল্যাটিন নাম গ্যাজেলা গ্যাজেলা (Gazella gazella)। পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ চিংকারা কাঁধের কাছে 65 সেমি উঁচু এবং 23 কেজির মত ওজনবিশিষ্ট হয়ে থাকে। শিঙ লম্বায় 25-30 সেমির বেশি হয় না। স্ত্রী-প্রাণী আরো ছোট। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, মধ্যভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণানদীর কিছুটা দক্ষিণ পর্যন্ত সমতলভূমি এবং নীচু পাহাড়ী বনাঞ্চলে চিংকারা দেখতে পাওয়া যায়।

এই দেশের সবচেয়ে বড় অ্যান্টিলোপটির নাম নীলগাই (Blue bull)। ঘোড়ার মত শক্ত সমর্থ গড়নের একটি পরিণত পুরুষ নীলগাইয়ের কাঁধের কাছে উচ্চতা 140 থেকে 150 সেমি পর্যন্ত হতে পারে। স্ত্রী-নীলগাই আকারে অনেক ছোট। এদের স্ত্রী-পুরুষের রঙও আলাদা। পুরুষ নীলচে ধূসর রঙের কিন্তু স্ত্রী-নীলগাইয়ের রঙ হালকা বাদামী। এদের ঘাড়ে ছোট কেশরের মত রোমগুচ্ছ থাকে আর শুধুমাত্র পুরুষের গলায় একগুচ্ছ কর্কশ রোম ঝোলে। দেহের তুলনায় শিঙ বেশ ছোট মাপের, লম্বায় বড়জোর 20 সেমি।

নীলগাই একান্তভাবেই ভারতীয় প্রাণী। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত এর বিস্তার। আগে মাঝে মধ্যে মালদহ জেলায় দু'একটি নীলগাই দেখা যেত, বর্তমানে এরা অবলুপ্ত। এছাড়া পূর্ব ভারতে—আসাম বা তারও পূর্বে এদের কখনো দেখা যায়নি। এরা ঘন বনে থাকে না, ছোট ঝোপ-ঝাড় সম্বলিত কিছুটা উন্মুক্ত বনাঞ্চলে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। ঘাস-পাতার সঙ্গে কুল, আমলকিও খেয়ে থাকে নীলগাই।

কস্তুরী মৃগের কস্তুরী আসলে কী?

পুরুষ কস্তুরী মৃগের (Musk Deer) পেটের দিকে, প্রায় নাভির কাছাকাছি একটি ডিম্বাকার কস্তুরী গ্রন্থি (Musk gland) থাকে। চলতি কথায় এটিকে বলে পড (Pod)। একটি পরিণত পুরুষ মৃগের পড থেকে 50-60 গ্রাম কস্তুরী পাওয়া যায়। তাজা অবস্থায় পড থেকে সুগন্ধের বদলে ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ বের হয়। কিছুদিন রোদে শুকিয়ে নিলে পডটির রঙ বদলে যায়। তা দেখতে হয় লালচে বাদামী আর তা থেকে বেরিয়ে আসে কস্তুরীর বিশেষ সুগন্ধ। রাসায়নিক বিচারে আসলে এটি একটি কিটোন (Ketone), 'মাস্কটোন'(Musktone) নামে এটি পরিচিত। প্রত্যেকটি পডে মাস্কটোন থাকে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে—0.5 থেকে

কস্তুরীর সুগন্ধ কতটা তীব্র?

2 শতাংশের মধ্যে। সুগন্ধিটি এতই শক্তিশালী যে কোনো প্রসাধনে তিন হাজার ভাগের একভাগ মাত্র কস্তুরী ব্যবহার করলেই এর বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়।

হরিণের শিঙ খসে যায় কেন?

হরিণ যূথবদ্ধ প্রাণী। একটা দলে কতগুলো হরিণ

থাকবে, তা হরিণের প্রজাতি, চারণভূমি, খাদ্যের প্রাচুর্য ইত্যাদি বিভিন্ন শর্তের উপরে নির্ভর করে। একটি পূর্ণবয়স্ক, শক্তিশালী এবং বড় শাখা-প্রশাখাযুক্ত পুরুষ হরিণ দলের সর্দার নির্বাচিত হয়। সব রকমের বিপদ থেকে দলকে রক্ষা করা দলপতির কাজ। সর্দার পদের দাবীদার দু'টি পুরুষ হরিণের মধ্যে লড়াইও বাঁধে। বিজয়ী হরিণটিকে দলের অন্য সদস্যরা দলপতি হিসেবে মেনে নেয়। এই সময়ে শিঙের প্রয়োজন অস্বীকার করা চলে না।

হরিণ শিং খসায় কেন?

বিভিন্ন জাতের হরিণের এক থেকে দেড় বছর বয়সে শিঙ গজাতে শুরু করে। অবশ্য শুধু পুরুষেরই শিঙ গজায়, হরিণীর শিঙ থাকে না। চিতল হরিণের (Spotted deer ; Axis axis) পুরু, প্রতি বছর শিঙ খসিয়ে ফেলে, তবে এর কোনো নির্দিষ্ট ঋতু নেই। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এরা বছরের যে কোনো সময়ে—গ্রীষ্মে, শরতে কিংবা শীতের মাসেও শিঙ ফেলে দিতে পারে। পুরনো শিঙ ফেলে দেবার দু' চার দিনের মধ্যে নতুন শিঙ গজাতে আরম্ভ করে। নতুন শিঙ প্রথম অবস্থায় রোমশ চামড়ায় ঢাকা থাকে। পুরো শিঙটি নতুন করে তৈরি হতে প্রায় 5 মাস সময় লাগে। পুরনো শিঙের তুলনায় নতুন শিঙ আকারে বড় এবং বেশি শাখাযুক্ত হয়। এটাই প্রকৃতপক্ষে পুরনো শিঙ খসিয়ে নতুন করে শিঙ গজিয়ে নেবার আসল কারণ।

ভারতে কি 'বাইসন' আছে?

ভারতীয় বাইসন আসলে 'গাউর' (Gaur)। এর ল্যাটিন নাম বস গাউরাস (Bos gaurus)। বাইসনের চেয়ে প্রাণীটি গবাদি পশুর সঙ্গেই আত্মীয়তায় অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। যে কটি গবাদি পশু এখনও বন্য অবস্থায় আছে, গাউর তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গাউর কাঁধের কাছে উচ্চতায় 175 থেকে 180 সেমি পর্যন্ত হতে পারে। প্রায় দু' মিটার উঁচু গাউরও মাঝে-মধ্যে দেখা গেছে। এদের ওজন প্রায়ই 900 কেজিরও বেশি হয়ে থাকে। পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-গাউর একটু ছোট আকারের, এদের ওজনও কিছুটা কম।

পরিণত পুরুষ গাউরের রঙ কুচকুচে কালো কিন্তু পায়ের তলার অংশ এবং মাথার উপরে শিঙের গোড়ার দিকটা সাদা কিংবা হালকা হলুদ। শিঙ জোড়া পাঁশুটে। স্ত্রী-গাউর আর বাচ্চার রঙ লালচে বাদামী। এদের চেহারার সঙ্গে গরুর বেশ মিল আছে। কাঁধের কাছে শিরদাঁড়া বরাবর একটা উঁচু হাড়ের কাঠামো এর বৈশিষ্ট্য।

গাউর মধ্যভারত, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের পর্ণমোচী এবং মিশ্র বনাঞ্চলের বাসিন্দা। ভারতের বাইরে বার্মা ও মালয়েশিয়ায় এর বিস্তার আছে।

প্রকৃত বাইসন আছে দুটি দেশে—উত্তর আমেরিকার কয়েকটি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে এবং ইউরোপের কিছু অভয়ারণ্য ও চিড়িয়াখানায়। দুটি প্রাণীই ভারতীয় গাউর থেকে আলাদা।

সত্যিকারের বাইসন কোন দেশে থাকে?

জনশ্রুতি আছে, কোনো ইংরেজ শিকারী তাঁর বাংলোয় বসেছিলেন। জায়গাটা ছিল মধ্য ভারতের কোনো বনাঞ্চল। বাংলোর অদূরে গাউরের পালকে দেখে তিনি তাঁর চাপরাশির কাছে প্রাণীটির নাম জানতে চান। চাপরাশিটি বলে, 'সাহেব ভয়সা।' ইংরেজ সাহেবের কানে শব্দটি শোনায় 'বাইসন'।

বুনো মোষ কি গৃহপালিত মোষের থেকে আলাদা জাতের প্রাণী?

বুনো মোষ এবং গৃহপালিত মোষ একই জাতের প্রাণী। তবে গৃহপালিত মোষের তুলনায় বুনো মোষ বিশালদেহী। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মোষ কাঁধের কাছে 2 মিটার পর্যন্ত উঁচু এবং ওজনে 900 কেজি হতে পারে। এদের শিঙ জোড়াও বিশাল। জোড়ার একটি শিঙ থেকে অন্য শিঙের প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবধান পৌনে তিন মিটারের কাছাকাছি।

আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে বস্তার অঞ্চলের তৃণভূমিতে বুনো মোষের দেখা পাওয়া যাবে। ভারতের বাইরে নেপালের তরাই অঞ্চলেও কিছু বুনো মোষ আছে।

মেঠো খরগোশ আর সাদা খরগোশ কি এক জাতের প্রাণী?

বাংলায় দুটি প্রাণীকে 'খরগোশ' বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা এক জাতের প্রাণী নয়। মেঠো খরগোশ 'হেয়ার' জাতীয় (Hare) আর সাদা খরগোশ জাতে 'র‍্যাবিট' (Rabbit)। প্রাণী দু'টি একেবারেই আলাদা। মেঠো খরগোশ অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রাণী। এদের পিছনের পা দু'টি দ্রুতবেগে লাফিয়ে চলার জন্য অভিযোজিত। এদের

কোন খরগোশকে পুষি আমরা?

কান দুটিও সাদা খরগোশের চেয়ে বড়। সাদা খরগোশ গৃহপালিত, এদের বন্য অবস্থায় দেখা যায় না। অপর দিকে মেঠো খরগোশ বন্য। এদের জীবনযাপন প্রণালীতেও কিছু তফাত আছে। মেঠো খরগোশ পাথরের ফাটল কিংবা বড় গাছের শিকড়-বাকড়ের মধ্যে বাসা তৈরি করে। জন্মের সময়েই এদের বাচ্চার চোখ ফোটে; বাচ্চাগুলোর শরীরও রোমে ঢাকা থাকে। সাদা খরগোশ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সুড়ঙ্গ বাসা তৈরি করে। রোমহীন এবং অন্ধ অবস্থায় জন্মায় এদের বাচ্চা।

তৃণভোজীরা নুন চাটে কেন?

প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে নুনের দরকার। সাধারণ লবণের অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভাবে স্নায়বিক উত্তেজনা (Nerve impulse) চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। হৃৎপিণ্ডের কাজও থেমে যায়। মাংসাশী প্রাণীরা শিকারের রক্ত এবং দেহরস থেকে প্রয়োজনীয় লবণ পেয়ে যায়। তৃণভোজীদের খাদ্যে লবণ প্রায় থাকেই না। এইজন্যই তৃণভোজীরা নোনা মাটি (সল্ট - লিক) চেটেই লবণের চাহিদা মেটায়।

ভালুক কি মধু চুরি করে?

ভারতে 'ব্রাউন', 'হিমালয়ান' এবং 'শ্লথ' — এই তিন জাতের ভালুকের বাস। প্রাণিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভালুক কার্নিভোরা (Carnivora) বর্গের অন্তর্ভুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। সে দিক থেকে বিচার করলে অন্যান্য পশুপাখির মাংস খেয়ে এর জীবনধারণ করার কথা। ভালুক কিন্তু সর্বভুক স্বভাবের। কীটপতঙ্গ, ছোট বড় পশুপাখির মাংসের সঙ্গে এরা গাছের ফল, কন্দ ইত্যাদিও খায়। তিন জাতের মধ্যে শ্লথ ভালুক (Sloth bear) মধু খেতে খুবই ভালবাসে। বনের মধ্যে এদের পাহাড়ী মৌমাছি (Apis dorsata) এবং ছোট ভারতীয় মৌমাছির (Apis indica) চাকে হানা দিতে দেখা যায়। বসন্তকালের শেষদিক থেকে গরমকালে এই দুই জাতের মৌমাছির চাক মধুতে ভর্তি থাকে। বড় পাথরের তলার দিক কিংবা গাছের ডাল থেকে ঝোলে পাহাড়ী মৌমাছির চাক। ভারতীয় মৌমাছির ছোট আকারের চাক পাথরের খাঁজে অথবা গাছের কোটরের মধ্যে লুকনো

ভালুক কি গাছে চরতে পারে?

থাকে। শ্লথ ভালুক গাছে চড়তে বেশ পটু। এরা গাছে উঠে চাকগুলো মাটিতে ফেলে দেয়। মুখে ঝাঁকড়া লোম থাকায় ক্রুদ্ধ মৌমাছির ঝাঁক হুল ফুটিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। শুধু নাকের মাংসল রোমহীন ডগাটা এরা থাবা দিয়ে ঢেকে রাখে। মৌচাক থেকে মধু আর মৌমাছির ডিম খেয়ে বাচ্চা ভালুক ধীরে সুস্থে পেট ভরায়।

শেয়াল ডাকে কেন?

শেয়াল (Jackal) স্বভাবে নিশাচর ও উচ্ছিষ্টভোজী। রাতের অন্ধকারে এরা দল বেঁধে খাদ্যের খোঁজে বেরোয়। ডাকের মাধ্যমে শেয়ালের একটি দল অপর দলের সদস্যদের সঙ্গে তাদের বাসস্থান, গতিবিধি, বিপদের সম্ভাবনা—এ রকম সব প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান-প্রদান করে।

হায়েনা কি হাসে?

আমাদের অনেকের ধারণা হায়েনা হেসে থাকে। কিন্তু সত্যিই কি হায়েনা হাসে?

বন্য অবস্থায় এবং পোষা হায়েনাকে (Striped hyena) নানা ধরনের শব্দ করতে শোনা গেছে। এর মধ্যে কিছু

শব্দকে উচ্চৈঃস্বরে কান্না এবং অন্য কয়েকটি শব্দকে উচ্চরোলে হাসির মত শোনায়। প্রতিটি প্রাণীর জীবনেই নানা ধরনের শব্দ বার্তা-বিনিময়ের কাজ করে থাকে। হায়েনার এইসব শব্দের তাৎপর্য এখনও ঠিক বোঝা যায়নি।

বাঘডাঁশ আর নেকড়েবাঘ কি বাঘ জাতীয় প্রাণী?

বাঘডাঁশের ইংরেজি নাম 'ফিশিং ক্যাট' (Fishing Cat)। প্রাণীটি 'মৎস্য-শিকারী বেড়াল' নামেও পরিচিত। এই বেড়াল জাতীয় প্রাণীটি মাথা এবং শরীর মিলিয়ে লম্বায় 100 সেমি এবং লেজ লম্বায় 30 সেমির কাছাকাছি। একটি পূর্ণবয়স্ক, স্বাস্থ্যবান বাঘডাঁশের ওজন 11 থেকে 15 কেজির মত।

এদের দেহ বেশ মোটাসোটা, গড়নটি মজবুত। দেহের তুলনায় পা ছোট। এদের দেহ বড় নয় এবং ঘন রোমে ঢাকা। গায়ের রঙ পাঁশুটে এবং তার উপরে কয়েক সারি লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত ঘোর বাদামী অথবা কালো ডোরা থাকে। কয়েকক্ষেত্রে লম্বাটে ফোঁটা সার বেঁধে সাজানো। গালের রঙ কিছুটা হালকা, তাতে দুটি আড়াআড়ি বাদামী অথবা কালো পটি দেখা যায়।

বাঘডাঁশ সমতলের প্রাণী হলেও হিমালয়ের 1500 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত একে দেখা গেছে। উত্তর ভারতে বাংলা ও উত্তরপ্রদেশে এর বিস্তার, দক্ষিণ ভারতে মালাবার উপকূলের জলাভূমি ও নদীর খাঁড়ি অঞ্চলেও এর দেখা পাওয়া যায়। ঘন কিংবা খণ্ডবনে আর নদীর ধারে নলবনে এদের আস্তানা। মাছ, কাঁকড়া, শামুক আর ছোটখাটো পাখি এদের খাদ্য। তবে সুযোগ পেলে কুকুর, ছাগল, ভেড়া, বাছুর, এমনকি ছোট শিশুকেও এরা আক্রমণ করতে ছাড়ে না। স্বভাবে এরা অত্যন্ত হিংস্র।

বাঘডাঁশ কীভাবে মাছ ধরে?

মাছ ধরার জন্য জলে নামে না বাঘডাঁশ। নদী বা খাঁড়ির ধারে নলবন কিংবা অন্য ঝোপঝাড়ের মধ্যে এরা লুকিয়ে বসে থাকে। মাছের দেখা পেলে বিদ্যুৎ গতিতে থাবার আঘাতে ডাঙায় তুলে ফেলে শিকারটিকে। তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোয়াল আর দাঁতের সাহায্যে মাছটিকে মেরে ধীরে সুস্থে সেটিকে খায়।

বাঘের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও বাঘডাঁশ অন্য গোষ্ঠীর প্রাণী নয়। প্রকৃতপক্ষে বাঘ এবং বাঘডাঁশ—দুটি প্রাণীই 'ফেলিডি' (Felidae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

নেকড়ে (Wolf) কিন্তু ভিন্ন গোত্রের প্রাণী। এরা 'ক্যানিডি' (Canidae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ কুকুর, শেয়ালের সঙ্গেই নেকড়ের আত্মীয়তা বেশি। বাঘের সঙ্গে এদের মিল শুধু হিংস্র স্বভাব এবং মাংসাশী খাদ্যাভ্যাসে।

একটি পূর্ণবয়স্ক নেকড়ে মাথা আর দেহ নিয়ে এক মিটারের মত লম্বা এবং কাঁধের কাছে 75 সেমির মত উঁচু হয়ে থাকে। লেজের মাপ দাঁড়ায় 35-45 সেমির কাছাকাছি; ওজন 20 থেকে 27 কেজি পর্যন্ত। হিমালয়ের পাহাড়ী এলাকার নেকড়েরা সমতলভূমির প্রাণীদের থেকে বেশি মোটাসোটা। বাসস্থান অনুযায়ী বৈচিত্র্য দেখা যায় এদের রঙেরও। সমতল ভূমির নেকড়ের রঙ হালকা অথবা ধূসর বাদামী, পাহাড়ী অঞ্চলের নেকড়ের রঙ কিছুটা কালচে।

নেকড়ে কি ছোট শিশুকে মেরে ফেলে?

বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চলে নেকড়ে বাস করে। দল বেঁধে এরা শিকার করতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণসার, চিংকারা, মেঠো খরগোশ আর নানা জাতের পাখি এদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে। খাদ্যের অভাব হলে নেকড়ের পাল, ছাগল-ভেড়া, বাছুর এবং সুবিধেমত ছোট শিশুকেও বধ করতে ছাড়ে না। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় নেকড়ে এক পরিচিত প্রাণী। ভারতে কাশ্মীরের কিছু অংশ, লাদাক থেকে দক্ষিণে গুজরাট, রাজস্থানের ঊষর অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যের খোলামেলা অঞ্চলে এদের বাস।

বুনো শুয়োর কি বাঘকেও ভয় খায় না?

বুনো শুয়োর (Indian Wild boar) অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট ও বলশালী প্রাণী। পূর্ণবয়স্ক একটি শুয়োর কাঁধের কাছে উচ্চতায় 90 সেমি এবং ওজনে 230 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এদের মাথার গড়ন এবং ঘাড় অত্যন্ত শক্তসমর্থ ও পেশিবহুল। উপর এবং নীচের চোয়ালের শ্বদন্ত

(Canines) বাঁকা হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে। এই দু'জোড়া শ্বদন্তই বুনো শুয়োরের অস্ত্র। এর সাহায্যেই শত্রুর মোকাবিলা করে শুয়োর। একগুঁয়ে স্বভাবের এই শক্তিশালী প্রাণীটিকে বাঘও এড়িয়ে চলতে চায়। একবার রেগে গেলে কিংবা বাঘের আক্রমণে আহত হলে শুয়োরটি মরণপণ লড়াই চালিয়ে যায়। অনেক সময়েই শুয়োরের দাঁতে বাঘের লোম আর রক্ত লেগে থাকতে দেখা গেছে। একটু ছোটখাটো কিংবা দুর্বল বাঘকে মারাত্মক জখমও করে বুনো শুয়োর।

বনরুই কোন জাতের প্রাণী?

বনরুইয়ের ভাল নাম বজ্রকীট। ইংরেজিতে এর নাম প্যাঙ্গোলিন (Pangolin)। নামের মধ্যে 'রুই' কথাটি থাকলেও এটি স্তন্যপায়ী প্রাণী।

বজ্রকীট বেশ অদ্ভুতদর্শন। এর লম্বাটে দেহটি উপর-নীচে চ্যাপ্টা। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দেহের উপর দিকটা বড় বড় আঁশে ঢাকা। নীচে অবশ্য আঁশের বর্ম নেই। আঁশের মাঝে এবং নীচের দিকে কর্কশ লোমের গোছা থাকে। আঁশের বর্ম বজ্রকীটকে বিপদের সময়ে রক্ষা করে। শত্রুর দেখা পেলেই অদ্ভুত প্রাণীটি দেহটিকে পাকিয়ে কুণ্ডলীর মত করে ফেলে। এর ফলে আঁশহীন নীচের দিকটা সুরক্ষিত থাকে।

লম্বায় বজ্রকীট 60 থেকে 75 সেমির মত। লেজের মাপ আরো 45 সেমি। সব মিলিয়ে 13 সারি আঁশ ঢেকে রাখে প্রাণীটির দেহটিকে। এদের গায়ের রঙ মেটে ধূসর, নীচের দিকটা একটু হালকা।

বনরুয়ের কি দাঁত আছে?

বজ্রকীটের চোয়াল দুটি তেমন শক্তিশালী নয়। এদের দাঁত নেই। উইঢিবি ভেঙে তার মধ্যে থেকে উই পোকার ডিম, বাচ্চা এবং উইপোকাগুলোকে এরা খুব তাড়াতাড়ি লম্বা এবং আঠালো জিভের সঞ্চালনে মুখে ঢোকায়। পিঁপড়ের বাসার সন্ধানে এরা গাছেও চড়ে। বিশেষ খাদ্যাভ্যাসের জন্য বজ্রকীটের লালা গ্রন্থিগুলি আকারে অনেক বড় হয়ে গেছে। এই গ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমাণে চটচটে আঠালো লালারস বেরিয়ে আসে।

স্বভাবে এরা নিশাচর। ক্ষীণদৃষ্টির জন্য এদের চোখ খুব ছোট, কান দুটিকেও বাইরে থেকে দেখা যায় না। তবে এদের ঘ্রাণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ।

বজ্রকীটের পাগুলি ছোট কিন্তু বেশ সবল। আঙ্গুলে বড় বড় নখ আছে। সামনের পায়ের নখ দিয়ে বজ্রকীট উইঢিবি খোঁড়ে। মাটিতে বেশ বড়সড় সুড়ঙ্গ তৈরি করে। দিনের বেলাটা এই সুড়ঙ্গ বাসাতেই কাটায়। মধ্যপ্রদেশে এইরকম একটি সুড়ঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। সুড়ঙ্গটি আড়াই মিটারের মত লম্বা আর প্রায় সওয়া এক মিটার মাটির নীচে বিস্তৃত ছিল। সুড়ঙ্গটি শেষ হয়েছিল প্রায় 60 সেমি ব্যাসের একটি গোলাকার কুঠরিতে।

বন্দী অবস্থায় বজ্রকীটকে জল খেতে দেখা গেছে। জিভের দ্রুত সঞ্চালনে এরা পাত্র থেকে জল চেটে নেয়। এমনিতে এরা নির্বাক, কিন্তু উত্তেজিত হলে বেশ জোরে 'হি-স-স-স'-এর মত শব্দ করে।

সাধারণত জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে মা-বজ্রকীট একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। সদ্যোজাত বাচ্চা 45 সেমি লম্বা হয়ে থাকে। এদের আঁশগুলো জন্মের সময়ে নরম থাকে। বেশ কিছুদিন শুধু মায়ের দুধ খায় বাচ্চা। বাচ্চারা বাড়েও খুব তাড়াতাড়ি; চার মাসের মধ্যেই বাচ্চার ওজন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। মা-প্যাঙ্গোলিন বাচ্চাকে লেজের উপর বসিয়ে চলাফেরা করে। বিপদের আঁচ পেলে মা বাচ্চাকে পেটের তলায় লুকিয়ে রেখে সবশুদ্ধ কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। বন্দী অবস্থায় বজ্রকীট বাঁচে দু' বছর।

ভারতে আর এক প্রজাতির বজ্রকীটও দেখতে পাওয়া যায়। এর নাম চাইনিজ প্যাঙ্গোলিন (Chinese Pangolin)। এটি ভারতীয় প্যাঙ্গোলিনের চেয়ে ছোট; লম্বায় 50 থেকে 58 সেমি এবং লেজের মাপ 33 থেকে 38 সেমি। তবে এই প্রজাতির গায়ে 15 থেকে 18 সারি ছোট ছোট আঁশ থাকে।

ভারতীয় বজ্রকীট হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে সমতলভূমির বনাঞ্চলে দেখা যায়। চিনা বজ্রকীট তুলনায় বিরল, শুধুমাত্র আসাম এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে এর বিস্তার সীমাবদ্ধ।

শজারুর কাঁটা এবং বনরুইয়ের আঁশ আসলে কী?

শজারুর (Indian Porcupine) কাঁটা আসলে

বিশেষভাবে পরিবর্তিত রোম (Hair)। শজারুর পিঠ এবং ঘাড়ে কাঁটাগুলি চুড়োর মত সাজানো থাকে। পেটের দিকের কাঁটার তুলনায় এগুলি অনেক লম্বা; মাপে 15 থেকে 30 সেমি পর্যন্ত হতে পারে। প্রত্যেকটি কাঁটায় আবার ঘন বাদামী কিংবা কালো ও সাদা রঙের বলয় দেখা যায়। লেজের কাঁটাগুলো আলগাভাবে সাজানো থাকে বলে শজারুর চলার সময়ে খরখর শব্দ হয়। কাঁটার বর্ম শজারুর আত্মরক্ষার অস্ত্র।

বজ্রকীট বা বনরুইয়ের আঁশও পরিবর্তিত রোম। প্রাণীটির আত্মরক্ষায় এরও ভূমিকা রয়েছে।

ভারতে কি বনমানুষ আছে?

মানুষের চেহারায় বেশ মিল আছে এমন লেজবিহীন বানর জাতীয় (Primates) স্তন্যপায়ী জীবকে 'অ্যান্থ্রপয়েড এপ' (Anthropoid apes) বা মানুষসদৃশ মহাকপি বলা হয়। পৃথিবীতে এইরকম প্রাণী আছে চারটি—গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংউটান এবং উল্লুক। এদের মধ্যে গোরিলা এবং শিম্পাঞ্জি আফ্রিকার বাসিন্দা; ওরাংউটানের বাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (ইন্দোনেশিয়ায়)। উল্লুক (Hoolock Gibbon) উত্তর-পূর্ব ভারতের নিবিড় বনাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। বনমানুষ বলতে কিন্তু উল্লুককে বোঝায় না। সেদিক থেকে ওরাংউটানই বনমানুষ, কারণ স্থানীয় ভাষায় 'ওরাং' শব্দটির অর্থ বন এবং 'উটান' শব্দের অর্থ মানুষ।

'লজ্জাবতী বানর' কি সত্যিই বানর?

নামের মধ্যে 'বানর' কথাটি থাকলেও লজ্জাবতী বানর (Slow Loris) প্রকৃতপক্ষে বানর নয়, এটি 'লরিস'। প্রাণিবিজ্ঞানের বিচারে লেমুর (Lemurs) ও লরিসজাতীয় প্রাণীরা বানরের থেকে দু'ধাপ নীচের। আসাম এবং ত্রিপুরার নিবিড় মিশ্র বনাঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা শান্ত এবং নিশাচর, মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়।

মাথা আর দেহ নিয়ে লজ্জাবতী বানর 30-40 সেমি লম্বা হয়ে থাকে। লেজটি অত্যন্ত ছোট, প্রায় দেখাই যায় না। এদের সমস্ত শরীর ঘন ধূসর অথবা কালচে বাদামী লোমে



উল্লুক

ঢাকা। মাথা আর কাঁধের রঙ কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুপালি-সাদা আর পাশের দিকের রঙ লালচে অথবা পাশুটে হতে পারে। পিঠের মধ্যরেখা বরাবর একটা গাঢ় বাদামী পটি লজ্জাবতী বানরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদের মাথা গোলাকার; চোখ দুটি বড় বড়, খানিকটা পেঁচার মত। চোখের চারপাশ ঘিরে একটা সাদা বলয় থাকে। কান দুটো ছোট আর গোল।

এদের দু'পায়েই পাঁচটি করে আঙ্গুল আছে। লজ্জাবতীর সব আঙ্গুলে নখ (Nail) নেই। পায়ের দ্বিতীয় আঙ্গুলের ডগায় সুচলো নখর (Claw) থাকে। এটি লেমুর জাতীয় জীবের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

গাছের ফল, পাতার সঙ্গে পোকা-মাকড়ও খেয়ে থাকে লজ্জাবতী বানর। পাতার আড়ালে অত্যন্ত সন্তর্পণে শিকারের দিকে এগোয় এরা। হাত-পা দুটি অঙ্গের সাহায্যেই শক্তভাবে গাছের ডাল ধরতে পারে। গাছ থেকে হেঁটমুণ্ডে ঝুলে সেই অবস্থায় খাবার খেতেও দেখা গেছে এদের। একবারে এদের একটাই বাচ্চার জন্ম হয়। বাচ্চারা বেশ বড় আর স্বনির্ভর না-হওয়া পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে থাকে।

হনুমানের রঙ কি সোনার মত হয়?

হনুমান আমরা সবাই দেখেছি। এদের রঙ ধূসর, মুখ আর হাত-পায়ের চেটো কালো। এক বিরল প্রজাতির হনুমানের সমস্ত শরীর কিন্তু ঢাকা থাকে উজ্জ্বল সোনালি লোমে। প্রাণীটির ইংরেজি নাম 'গোল্ডেন লাংগুর' (Golden Langur)। 1907 সালে বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার ই ও শেবিয়ার (E.O Shebbeare) সোনালি হনুমান আবিষ্কার করেন। তবে শেবিয়ার প্রাণীটির স্বভাব-চরিত্র, জীবনযাত্রা সম্পর্কে তেমন কিছু বিশদ তথ্য দিতে পারেন নি। সোনালি হনুমান লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। ইংরেজ শিকারী ও প্রকৃতিবিদ সি জি ব্যারন (C. G. Barron) সেই কারণেই প্রাণীটিকে দেখেও চিনতে পারেন নি।

সোনালি হনুমান সম্পর্কে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সর্বসমক্ষে আনার কৃতিত্ব অন্য এক ইংরেজ প্রকৃতিবিদের, নাম ই পি গী (E P Gee)। তাঁকে সম্মান জানাতেই 1955 সালে 'জুলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র বিজ্ঞানী এইচ খাজুরিয়া প্রাণীটির ল্যাটিন নাম দেন 'প্রেসবাইটিস গী'।

ভারত ও ভুটানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, পূর্বে মানস নদী ও পশ্চিমে সঙ্কোশ নদীর মধ্যবর্তী মিশ্র পর্ণমোচী অরণ্যে সোনালি হনুমানের বাস। ভুটানের 'ব্ল্যাক মাউন্টেন' সন্নিহিত বনাঞ্চলে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

আকারে সোনালি হনুমান আমাদের পরিচিত হনুমানের চেয়ে একটু ছোট। মাথা আর দেহ মিলিয়ে লম্বায় 50 সেমি এবং লেজটি 75 সেমির মত। উজ্জ্বল সোনালি রঙের বড় বড় ঘন লোমে এদের সমস্ত শরীরটা ঢাকা; হাত-পায়ের চেটোর রঙ অবশ্য কালো। লেজের ডগায় এবং মাথার চারপাশের লোম বেশি বড়। দেহের পাশ দুটি কিছুটা লালচে।

স্বভাবে এরা শান্ত নিরীহ। ভোরবেলা এবং সন্ধের সময়ে এরা খাবার খুঁজতে বেরোয়। গাছের কচি পাতা, ফুল-ফল আর পোকা-মাকড় খেয়ে এরা পেট ভরায়। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে একটাই বাচ্চা জন্মায়। বাচ্চাদের গায়ের রঙে সোনালি আভার চেয়ে সাদার ভাবই বেশি।

জলে সাঁতার দেবার পরেও ভোঁদড়ের গা তেলা থাকে কী ভাবে?

ভোঁদড় জলেই কাটায় বেশির ভাগ সময়। জলের মধ্যে অত্যন্ত নিপুণভাবে এরা শিকারের পিছনে ধাওয়া করে। শিকার হিসেবে ধরে মাছ। তারপর দাঁতের ফাঁকে আটকে ডাঙ্গায় উঠে আসে ভোঁদড়। অনেকক্ষণ জলের মধ্যে থাকলেও এদের গা থাকে তেলা। ডাঙ্গায় উঠে দু'চার বার গা ঝাড়লেই জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কেন? এর কারণ ভোঁদড়ের গায়ে থাকে দু' ধরনের লোম—প্রথম ধরনের লোম বেশ বড়, আর দ্বিতীয় ধরনের ছোট লোম—থাকে বড় লোমগুলোর নীচে। ছোট ছোট লোম জলবিন্দুকে বিকর্ষণ করে, ঠিক 'ওয়াটার-প্রুফের' মত। জল-নিরোধক এই স্তরটি বাইরে থেকে দেখা যায় না। আসলে খুব সূক্ষ্ম বাতাসের বুদবুদ এই লোমস্তরে ধরা থাকায় এমনটি হয়। বড় বড় লোমকেই বাইরে থেকে চোখে পড়ে।

গাঙ্গেয় শুশুক কি তিমির আত্মীয়?

কলকাতার পশ্চিম পাশ ঘেঁষে প্রবাহিত হুগলি নদীতে ঘুরে বেড়ায় গাঙ্গেয় শুশুক। হ্যাঁ, এরা তিমির এক নিকট আত্মীয়। কালো রঙের এই জলচর প্রাণীর নাম গাঙ্গেয় শুশুক (Gangetic Dolphin)।

গঙ্গার শুশুকের শরীরের মাঝখানটা চওড়া, মাথা এবং লেজের কাছটা সরু। মাথার সামনে সরু চোয়াল দুটি পাখির ঠোঁটের মত অংশের সৃষ্টি করে। চোয়ালে প্রায় 60-এর মত

সুচলো দাঁত থাকে। এদের পিঠের পাখনাটি খুবই ছোট; তুলনায় বক্ষ-পাখনা দুটি বেশ বড় আর ত্রিকোণাকার। নীল সাগরের তিমি-ডলফিনের মত এদের লেজও উপর-নীচে চ্যাপ্টা হয়ে 'ফ্লুক' (Fluke)-এ পরিবর্তিত হয়েছে। ফ্লুকের আন্দোলনেই এরা সাঁতার দেয়।

নদীর ঘোলা জলে বাস করার জন্য শুশুকের চোখ দুটি খুবই ছোট হয়ে গেছে। এদের দৃষ্টিও ক্ষীণ। তিমি জাতের

তিমি কী ভাবে জলের মধ্যে ফোয়ারা ছাড়ে?

আরেক বৈশিষ্ট্য নাকের ফুটোয়, এটি পরিবর্তিত হয়ে 'ব্লো-হোল' (Blowhole) তৈরি করে। এর সাহায্যেই তিমি জলের ফোয়ারা ছাড়ে। গাঙ্গেয় শুশুকের ব্লো-হোলটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এক লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত ছিদ্রের আকার নিয়েছে।

শুশুকের খাদ্য মাছ। মাছের ঝাঁকের পিছনে ধাওয়া করে এরা, তবে এরা মোহনার কাছাকাছি নোনাজলে যায় না। এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে একটি অথবা দুটি বাচ্চা জন্মায়।

গাঙ্গেয় শুশুক গঙ্গা ছাড়া ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে নদীর জল দূষিত হওয়ায় এদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

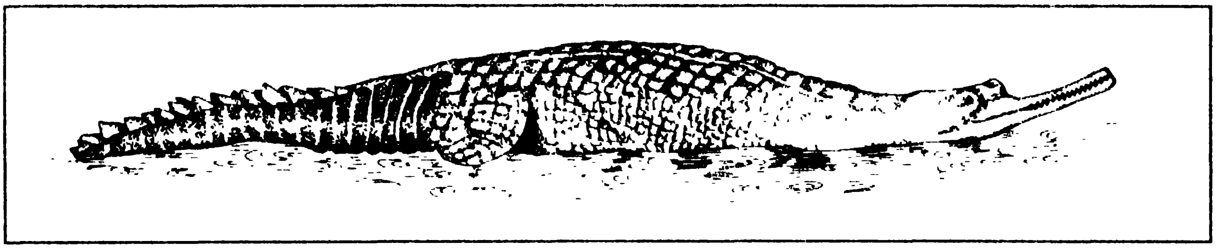
কুমির কেন পাথর খায়?

কুমির সরীসৃপ (Reptile) হলেও পাখির মত এদের পাকস্থলী পরিবর্তিত হয়ে পেষকযন্ত্র বা গিজার্ড (Gizzard) তৈরি করে। পায়রা, ঘুঘু কিংবা মুরগির মত পাখি যেমন পাথর খেয়ে থাকে, তেমনি কুমিরও পাথর খায়। তবে পাখির মত কুমিরের গিজার্ডে সঞ্চিত পাথর খাবার পিষতে সাহায্য করে না, এর কাজ একেবারেই অন্য। কুমিরের পেটের পাথর কুমিরের দেহটিকে ভারি করতে সাহায্য করে। কুমির যদি নুড়িপাথর না খায় তবে জলের উপরতলে ভেসে থাকবে কিন্তু ডুবতে পারবে না। কুমিরের বয়স, সেইসঙ্গে দেহের আয়তন বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে পাথরের আয়তনও ক্রমশ বাড়তে থাকে। পূর্ণবয়স্ক একটা কুমিরের গিজার্ড থেকে 5-6 কেজি পাথর পাওয়া যায়।

ঘড়িয়াল কি কুমির?

ঘড়িয়াল (Gharial) কুমির জাতীয় সরীসৃপ। এরা শুধু মাছ খায়। ভারতে এদের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মহানদীতে দেখা যায়; ভারতের বাইরে বর্মার ইরাবতী ও আরাকান নদীতে ঘড়িয়াল আছে। যে 19 প্রজাতির কুমির পৃথিবীতে রয়েছে, তার মধ্যে ঘড়িয়ালই বিরলতম।

লম্বা সরু চোয়াল এবং করাতের মত দাঁতের সারি দেখে ঘড়িয়ালকে সহজে চেনা যায়। নীচের চোয়ালে দাঁত থাকে প্রতি পাশে 25 টা, উপরের চোয়ালে দু'-তিনটে বেশি।



ঘড়িয়াল

লম্বায় এরা পৌনে সাত মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পরিণত পুরুষ-ঘড়িয়ালের নাকের ডগায় (সঠিকভাবে বললে তুণ্ডের সামনে) একটি উপবৃদ্ধি দেখা যায়। উপবৃদ্ধিটিকে দেখতে 'ঘড়ার' মত বলেই প্রাণীটির নাম ঘড়িয়াল।

সব জাতের কুমির কি মানুষকে আক্রমণ করে?

কুমির জাতীয় প্রাণীর বিভিন্ন নাম রয়েছে— অ্যালিগেটার, কেম্যান এবং ঘড়িয়াল। নাম যাই হোক, আসলে এরা কুমির জাতেরই প্রাণী। মানুষকে আক্রমণ করার দুর্নাম সব কুমিরেরই অল্পবিস্তর আছে। এর মধ্যে

নীলনদের কুমিরের দুর্নাম সবচেয়ে বেশি। ভারতে দেখা যায় তিন প্রজাতির কুমির—ঘড়িয়াল, জলার কুমির (Marsh Crocodile) আর মোহনার কুমির (Estuarine Crocodile)। এদের মধ্যে কুখ্যাত হল মোহনার কুমির।

কুমিরের পিঠে কি বন্দুকের গুলি লাগে?

কুমিরের পিঠের চামড়া অত্যন্ত পুরু এবং বিশেষভাবে পরিবর্তিত। এর উপরস্তর বা এপিডারমিস (Epidermis) শক্ত চৌকোনা আঁশের মত 'স্কুট' (Scute) তৈরি করে। চামড়ার ভিতরের স্তর বা ডারমিসের (Dermis) মধ্যেও ছোট ছোট হাড়ের পাত বা 'অস্টিয়োস্কুট' (Osteoscute) থাকে। এইজন্য কুমিরের পিঠের চামড়া প্রায় দুর্ভেদ্য ঢালের মতই; বন্দুকের গুলি একে ভেদ করতে পারে না।

টিকটিকি-গিরগিটি কি বিষাক্ত?

টিকটিকি-গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপকে ইংরেজিতে 'লিজার্ড' বলা হয়। এদের মধ্যে শুধু 'গিলা মনস্টার' (Gila Monster) বিষাক্ত। মাঝারি আয়তনের এই গিরগিটি মেক্সিকো-অ্যারিজোনা অঞ্চলের মরুভূমির বাসিন্দা। সাপের মত গিলারও বিষদাঁত এবং বিষগ্রন্থি আছে, তবে এগুলোর অবস্থান নীচের চোয়ালে। ভারতে কোনো বিষাক্ত গিরগিটি নেই। তক্ষক (Gecko gecko) অন্য গিরগিটির মতই নির্বিষ। খাবারে টিকটিকি পড়ে গেলে যে বিষক্রিয়ার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়, তার কারণ অন্য। টিকটিকি পতঙ্গভুক। এরা থাকেও অপরিচ্ছন্ন জায়গায়। এইজন্য প্রাণীটির শরীর থেকে রোগ-জীবাণু অনেক সময়ে খাবারে ঢুকে বিষক্রিয়া ঘটায়।

অজগর কি শিকারকে সম্মোহিত করতে পারে?

মনে হয় যেন, অজগর শিকারকে সম্মোহিত করতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, শিকারকে সম্মোহিত করার ক্ষমতা অজগর বা ময়ালের (Python molurus) নেই। পাথরের খাঁজে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে কিংবা অন্য কোনো সুবিধেজনক জায়গায় ময়াল লুকিয়ে থাকে শিকার-প্রাণীর প্রতীক্ষায়। শিকারের দেখা পেলেই বিদ্যুৎগতিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকে-পাকে জড়িয়ে ফেলে। এমনিতে ময়াল নড়াচড়া করে খুব আস্তে। কিন্তু শিকার ধরার সময়ে ময়াল এত দ্রুতগতিতে শিকারের উপরে ঝাঁপায় যে প্রাণীটি নড়াচড়ার সময় পর্যন্ত পায় না। ময়ালের তাক বিশেষ ফসকায় না; শতকরা 95 টি ক্ষেত্রেই সাফল্য আসে। এইজন্যই শিকারকে সম্মোহিত করার প্রবাদটি প্রচলিত হয়ে থাকবে।

সবচেয়ে বড় বিষাক্ত সাপ কোনটি?

শঙ্খচূড় বিষাক্ত সাপের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ইংরেজিতে এর নাম কিং কোবরা (King Cobra)। জে সি ড্যানিয়েলের (J. C. Daniel) লেখা 'দি বুক অব ইণ্ডিয়ান রেপটাইল্স' (The book of Indian Reptiles)-এ প্রায় সাড়ে পাঁচ মিটার লম্বা একটি শঙ্খচূড়ের উল্লেখ আছে। 1950 সালে সিঙ্গাপুর থেকে পাওয়া পৌনে পাঁচ মিটারেরও একটু বেশি অপর একটি শঙ্খচূড়ের কথাও জানা যায়। সাপটির ওজন ছিল 12 কেজি।

শঙ্খচূড় পার্বত্য ও সমতলভূমির নিবিড় বনে থাকে। মানুষের বসতির কাছে এদের বড় একটা দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সন্নিহিত বনে এবং উড়িষ্যা, বাংলা ও আসামে এদের বিস্তার সীমাবদ্ধ।

শঙ্খচূড় কি সাপ খায়?

দিবাচর ও হিংস্র শঙ্খচূড় অন্য সাপ খায়। ছোবল মারার সময়ে এরা দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাটির উপরে তুলতে পারে। কেউটে-গোখরোর নিকটাত্মীয় শঙ্খচূড়ের ফণা তত প্রসারিত হয় না। ফণাটিকে শাঁখের মত দেখায় বলেই এদের নাম শঙ্খচূড়।

শঙ্খচূড়ের বিষদাঁত থাকে মুখের সামনের দিকে। বিষদাঁতের সূচলো প্রান্তটি পিছনদিকে বাঁকানো। এর বিষ স্বচ্ছ ও অম্লধর্মী। প্রত্যেকবার ছোবলে একটি শঙ্খচূড় যতটা বিষ ঢালে তাতে 10 জন মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এই সাপের কামড়ে 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

সব বনই কি এক ধরনের?

বনে থাকে নানা ধরনের গাছপালা। এর মধ্যে যে সব

গাছ খুব বড়, তারা চাঁদোয়ার মত নীচের গাছকে ঢেকে রাখে। সূর্যের আলো এই চাঁদোয়া স্তরের ভিতর দিয়ে খুবই অল্প পরিমাণে মাটিতে এসে পৌঁছোয়। এর তলায় আরো দু-তিনটি গাছের স্তর থাকে। বড় গাছকে জড়িয়ে উপরে ওঠে লতানে গাছ, আবার বড় গাছের উপরে জন্মায় অর্কিড আর লোরেন্থাসের মত পরাশ্রয়ী গাছ।

কোনো অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, মাটির চরিত্র, জলবায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন শর্তের উপরে নির্ভর করে সেখানকার বনাঞ্চল। এইসব বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় বনভূমিও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ভারতের বনভূমিগুলিকে পাঁচটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—1. গ্রীষ্মমণ্ডলের বনভূমি 2. পার্বত্য অর্ধগ্রীষ্মমণ্ডলের বনভূমি 3. পার্বত্য নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি 4. পর্বত পাদদেশের পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ বনভূমি 5. পার্বত্য অঞ্চলের উন্মুক্ত বনভূমি। প্রত্যেকটি প্রধান বনাঞ্চলের আবার অনেকগুলি ভাগ আছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের বনাঞ্চলের কথাই ধরা যাক। এর মধ্যে আর্দ্র চিরহরিৎ, মিশ্রপর্ণমোচী, শুষ্ক পর্ণমোচী, উপকূলবর্তী বনভূমি ইত্যাদি সাত রকমের বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

বন-জঙ্গল থাকার দরকার কি?

পরিবেশ দূষণমুক্ত এবং বাসযোগ্য রাখতে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) অভিমত হল, পৃথিবীর স্থলভাগের অন্তত এক-তৃতীয়াংশে বনাঞ্চল থাকা দরকার। সালোক-সংশ্লেষের জন্য গাছের লাগে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পরিবেশ থেকে এই বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ টেনে নিয়ে গাছ অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। এর ফলে বায়ুদূষণ কমে। কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে তাপমাত্রা

বন কাটলে কি বৃষ্টিপাত কমে?

স্থিতিশীল রাখতেও বনাঞ্চলের ভূমিকা রয়েছে। অরণ্য সম্পদ নষ্ট হলে কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা খুব বেড়ে বা কমে যেতে পারে। অরণ্য বৃষ্টিপাত ঘটাতেও সাহায্য করে, অন্ততপক্ষে, বন-জঙ্গল থাকলে যে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং বৃষ্টিমুখর দিনের সংখ্যা বাড়ে, এমন তথ্য পাওয়া গেছে। ভূমি ও জল সংরক্ষণেও বনাঞ্চলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আগে সাহারা এবং রাজস্থানের থর মরু অঞ্চল ছিল সবুজে ঢাকা। অরণ্য ধ্বংসের ফলেই যে এইসব অঞ্চল মরুভূমির দখলে চলে গেছে, এটাই বিজ্ঞানীদের অভিমত।

অরণ্য মূল্যবান কাঠ, ভেষজ উদ্ভিদ, মধুও জোগান দেয়। অনেক শিল্প কাঁচামালের জন্য অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থানও অরণ্য।

সুন্দর বলেই কি সুন্দরবনের এমন নাম?

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক শোভা বলার মতই, কিন্তু এর নাম হয়েছে অন্য কারণে। সুন্দরবনে জন্মায় এক বিশেষ ধরনের গাছপালা, যাকে বলা হয় 'ম্যানগ্রোভ' (Mangroves)।

বঙ্গোপসাগরে হুগলি-মাতলা নদীর শাখা-উপশাখা আর অসংখ্য ছোটবড় খাঁড়ির দু'পাশে এইসব গাছ জন্মায়। কাদা-প্যাচপেচে মাটিতে এবং নোনাজলে শিকড় চালিয়ে দিব্যি বেঁচে থাকে এরা। মাটির নোনাভাব কম এমন সমতলভূমিতে এইসব গাছ বাঁচে না। এদের মধ্যে আছে গরান, গেঁও, বাইন, কেওড়া, কাঁকরা, হেঁতাল, গোলপাতা—এমনি সব বিচিত্র নামধারী গাছ-গাছড়া। আর আছে 'সুন্দরী' (Heritiera fomes) নামের ম্যানগ্রোভ। এই গাছের নামেই সুন্দরবনের নামকরণ। তবে সুন্দরী গাছ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে তত বেশি দেখা যায় না বরং বাংলাদেশের সুন্দরবনেই এই গাছ বেশি চোখে পড়ে।

বনে গাছ কাটা এবং ঘাসঝোপ পোড়ানো হয় কেন?

অদ্ভুত শোনালেও বন-জঙ্গল বাঁচাবার জন্যই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে গাছ কাটা এবং ঘাসঝোপ পোড়ানোর দরকার। বনে অনেক গাছ প্রতি বছর প্রাকৃতিক নিয়মে মরে শুকিয়ে

দাবানল কী ভাবে সৃষ্টি হয়?

যায়। বাজ পড়ে কিংবা প্রবল ঝড়ে শুকনো গাছে ক্রমাগত ঠোকাঠুকির ফলে অনেক সময়ে বনে আগুন লাগে। এই দাবানল বনের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রচুর ক্ষতি করে। বন্যপ্রাণী মারা যায়, নষ্ট হয় তাদের বাসা, ডিম আর

বাচ্চা। শুকনো ঘাস ঝোপেও প্রচণ্ড গরমের দিনে নানা কারণে আগুন লেগে যেতে পারে। অনেক সময়ে গাছের ডাল-পাতায় জমা শিশিরবিন্দু ঠিক স্বচ্ছ উভোত্তল লেন্সের মত কাজ করে এবং সূর্যের রশ্মি কেন্দ্রীভূত ক'রে নীচের ঘাসঝোপে ফেলে। তাতেই ঘটে যায় এই বিপর্যয়। সেইজন্যই মরা শুকনো গাছ কেটে ফেলা হয়। তাছাড়া পরিণত গাছ কাটলে অল্প সময়ের মধ্যেই তার গোড়া থেকে নতুন ডাল গজায়। পুরনো গাছ কেটে ফেলে তার জায়গায় নতুন গাছের চারাও পোঁতা হয়।

ঘাসঝোপ পুড়িয়ে ফেললে বর্ষায় ঘাসের গোড়া থেকে নতুন ঘাস গজায়। এতে তৃণভোজীরা প্রচুর খাবার পায়। তৃণভোজীর সংখ্যা বেড়ে ওঠার সঙ্গে মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যাও বাড়ে।

জাতীয় উদ্যান (National Parks) এবং অভয়ারণ্য (Sanctuaries) তৈরি করা হয় কেন?

জাতীয় উদ্যান প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সম্পদ এবং সেই সঙ্গে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত। ভারতে প্রায় 55টি জাতীয় উদ্যান রয়েছে।

বিরল ও দেশজ জীবজন্তুকে সম্পূর্ণ সংরক্ষণের আওতায় আনার জন্য অভয়ারণ্য তৈরি করা হয়। এটি রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের আইনবলে সৃষ্টি। প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকার কোনো অভয়ারণ্যকে বন্ধও করে দিতে পারেন। এদেশে 210টির মত অভয়ারণ্য রয়েছে।

ব্যাঘ্র-প্রকল্পে (Tiger-Project) শুধু কি বাঘ বাঁচবে?

এই শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংস্থা' বাঘ সংরক্ষণের কর্মসূচি নেয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতেই বাঘের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, সেইজন্য এদেশেই ব্যাঘ্র প্রকল্প গড়ে ওঠে। 1973 সালে প্রকল্পটি শুরুর সময়ে এর আওতায় ছিল 9টি সংরক্ষিত এলাকা। বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকার জন্য এই সংরক্ষিত এলাকার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, গাছপালা এবং পশুপাখির মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট। সুতরাং নামে 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' হলেও এর ফলে অন্য পশুপাখি, গাছপালা, প্রকৃতি ও পরিবেশের যথাযোগ্য সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। বাঘের সংখ্যা বাড়াতে গেলে একদিকে যেমন হরিণ, শুয়োরের মত তৃণভোজীর সংখ্যা বাড়াতে হবে, অন্যদিকে তৃণভোজীদের খাদ্যভাণ্ডারও বাড়ানোর দরকার। স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত এলাকাগুলোতে সব ধরনের বন্যপ্রাণীর সংখ্যাই বেড়েছে।

সম্প্রতি ভারত থেকে কি কোনো বন্যপ্রাণী অবলুপ্ত হয়েছে?

ভারত থেকে সাম্প্রতিককালে চারটি পাখি আর তিনটি স্তন্যপায়ী প্রাণী অবলুপ্ত হয়েছে। পাখিগুলির মধ্যে আছে সাকনাল (Pink-headed Duck), জার্ডনের কোরসার (Jerdon's Courser), ছোট জংলি পেঁচা (Forest Spotted Owlet) এবং পাহাড়ী তিতির (Mountain Quail)। স্তন্যপায়ীর মধ্যে আছে শিকারী চিতা, ছোট এক-শিং গণ্ডার এবং এশিয়ার দু-শিং গণ্ডার (Asiatic Two-horned Rhinoceros)।

শারীরবিজ্ঞান



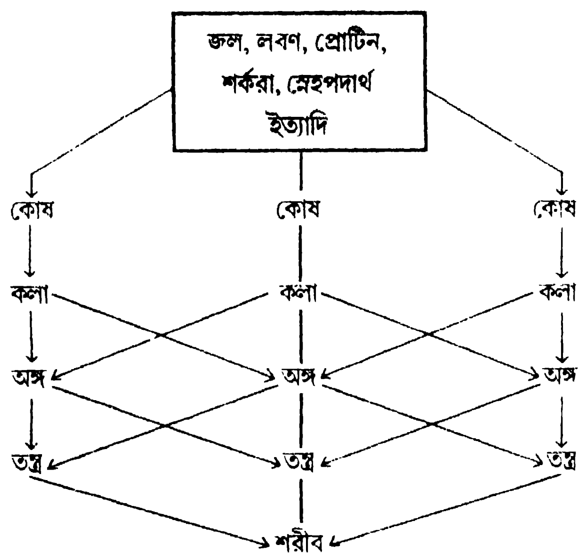
আমাদের শরীর যেন এক জটিল কারখানা। যেমন এর গঠন, তেমনি বিচিত্র এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ করার ক্ষমতা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে চিত্তাকর্ষক হাজার বিষয় থাকলেও আমাদের শরীর নিয়েই আমাদের সর্বাধিক কৌতূহল। নাগরিক সভ্যতা যেখানেই গড়ে উঠেছে, দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন শারীরবিজ্ঞান নিয়ে চর্চাও সেখানে লক্ষ্য করা গেছে। সিন্ধু সভ্যতার শেষে যে আর্য হিন্দুগণ বৈদিক সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন, তাঁদের শরীর সম্পর্কে বিশেষ ধারণা ছিল। অথর্ববেদেও আমাদের শরীর সংক্রান্ত জ্ঞান সুপরিস্ফুট। তবু আজও আমাদের শরীর নিয়ে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল যে সম্পূর্ণ মিটেছে এমন কথা বলা যায় না। এই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় বিজ্ঞানের যে বিভাগটির সৃষ্টি হয়েছে, তা হল শারীরবিজ্ঞান। শারীরবিজ্ঞানকে ইংরেজিতে বলে Physiology।

আমাদের শরীর কি দিয়ে তৈরি?

কত বিষয় সম্পর্কেই আমরা জানার চেষ্টা করি অথচ আমাদের নিজের এই শরীর সম্পর্কে আমাদের ধারণা কত অল্প। এই শরীর কি দিয়ে তৈরি, কি ভাবে তার কাজকর্ম চলে, এ-সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি।

কথায় কথায় আমরা আমাদের শরীরকে রক্ত-মাংসের শরীর বলি বটে, কিন্তু এ-উত্তর যথেষ্ট নয়। আমাদের শরীর তৈরি হয়েছে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অনেক ধরনের খনিজ লবণ দিয়ে। এই মৌলিক পদার্থগুলির নানা রকম সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে প্রাণরস (Protoplasm)।

প্রাণরসের শতকরা ৯০ ভাগ জল আর বাকি অংশগুলি হল নানা জৈব ও অজৈব পদার্থ, যেমন, শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ এবং নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)। প্রাণের সাড়া এসেছে যখন এই প্রাণরস দিয়ে তৈরি হল



কোষ। বাড়ির গঠনের একক যেমন ইট তেমনি কোষই আমাদের শরীরের গঠনের একক। ইট সাজিয়ে যেমন বাড়ি তৈরি হয় তেমনি অসংখ্য কোষ দিয়ে আমাদের শরীর তৈরি। শুধু গঠনগত নয়, কোষ শরীরের কার্যগত একক। অর্থাৎ, সমস্ত শারীরবৃত্তীয় কাজ ঘটাবার আসল কারখানা এই কোষ।

কিছু সংখ্যক কোষ যখন একই প্রজাতি থেকে উৎপন্ন হয়, মোটামুটি একই গঠনের হয় এবং একই কাজ করে তখন তাদের এক সঙ্গে বলে কলা (Tissue)। কলা আবার অনেক রকমের—দেহত্বক হল আবরণী কলা (Epithelial tissue), রক্ত, অস্থি হচ্ছে সংযোজক কলা (Connective tissue), মস্তিষ্ক, সুষুম্না কাণ্ড এরা স্নায়ু কলা (Nervous tissue) দিয়ে তৈরি। এ-ছাড়া আছে পেশী কলা (Muscular tissue)।

কিছু সংখ্যক কলা মিলে গড়ে উঠেছে এক একটি অঙ্গ, যেমন, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, বৃক্ক।

প্রাণরসের শতকরা কত ভাগ জল?

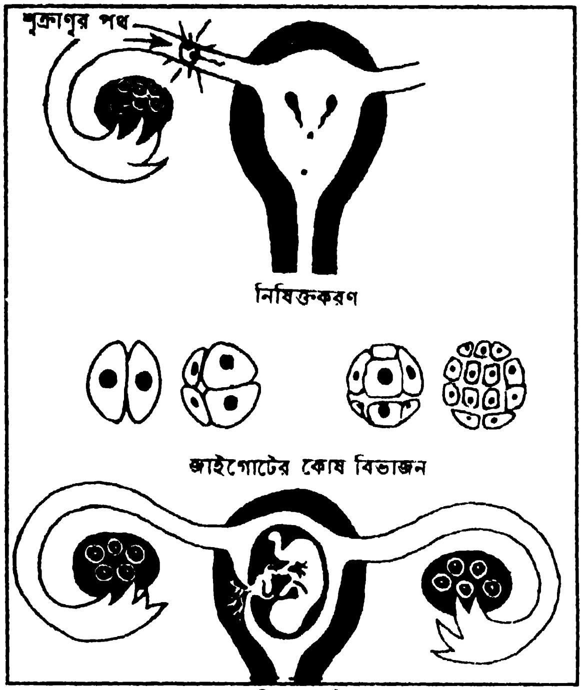
কয়েকটি অঙ্গ মিলে তৈরি হয়েছে তন্ত্র। প্রত্যেকটি তন্ত্রের সুনির্দিষ্ট কাজ আছে। যেমন, রক্ত সংবহন তন্ত্র রক্তের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের পরিবহণে সাহায্য করে, শ্বসন তন্ত্র গ্যাসের আদান-প্রদানে, পৌষ্টিক তন্ত্র পুষ্টিতে অর্থাৎ খাওয়া এবং তার হজমে সাহায্য করে। রেচন তন্ত্র শরীর থেকে অদরকারী বর্জ্য পদার্থ বের ক'রে দেয়। প্রজনন তন্ত্র আবার বংশবিস্তারে সাহায্য করে। আর পেশী-কঙ্কাল তন্ত্রের সাহায্যে আমরা চলাফেরা করি। স্নায়ুতন্ত্র শরীরের অন্য সব তন্ত্রের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

তন্ত্রগুলির কাজ যেমন আলাদা এবং সুনির্দিষ্ট তেমনি এরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই বিভিন্ন তন্ত্রের গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে আমাদের শরীর।

মানব-শিশুর জন্ম হয় কী ভাবে?

শিশুরা বরাবর প্রশ্ন করে, 'এলের আমি কোথা থেকে?'

আমাদের দেহ লক্ষ-লক্ষ কোষ দিয়ে গঠিত। এই সব কোষের সৃষ্টি হয়েছে জীবনের শুরুতে একটি মাত্র কোষ থেকে। মায়ের শরীরে একটি বিশেষ ধরনের কোষ আছে। এর নাম ডিম্বাণু, এর সঙ্গে বাবার শরীরের একটি বিশেষ কোষ শুক্রাণু মিলে তৈরি হয় ওই প্রথম কোষটি। প্রথম কোষকে বলে জাইগোট (Zygote)। এই দুই প্রজনন কোষের মিলনকে বলে নিষেক (Fertilization)।



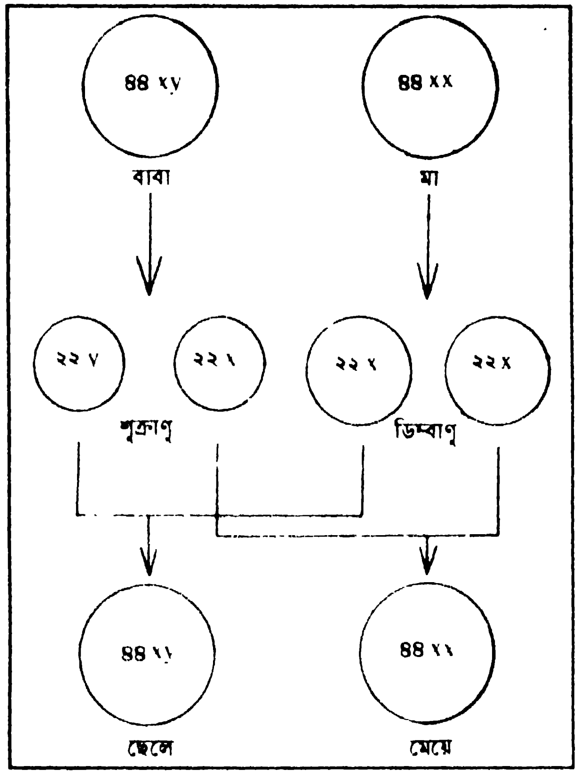
মাতৃগর্ভে শিশুর সৃষ্টি ও বৃদ্ধি

বিভাজনের মাধ্যমে প্রথম কোষটি দু'টি, চারটি, আটটি এ-ভাবে ক্রমে সংখ্যায় বেড়ে চলে। অবশেষে মাতৃগর্ভে একটি থলির মত অঙ্গ জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। একে ভ্রূণ বলা হয়। এটি মানব-শিশুতে রূপান্তরিত হতে সময় নেয় মোটামুটি ২৮০ দিন। যে পদ্ধতিতে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে নিজের পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তাকে বলে প্রসব।

১৮৭৯ সালে ডবলু ফ্লেমিং কোষের মধ্যে সূক্ষ্ম সুতোর মত এক রকম বস্তু দেখতে পান। এদের বলে ক্রোমোজোম। মানুষের দেহকোষে ৪৬টি বা ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম পাওয়া যায়। শিশুর জীবনের প্রথম কোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের ২৩টি আসে মাতৃ-প্রজনন কোষ বা ডিম্বাণু থেকে এবং অন্য ২৩টি আসে পিতৃ-প্রজনন কোষ বা শুক্রাণু থেকে। ডিম্বাণু বা শুক্রাণু মাত্র ২৩টি ক্রোমোজোমে গঠিত। শিশু জন্ম নেয় বাবা মায়ের জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যা ওই ক্রোমোজোমে ধরা থাকে।

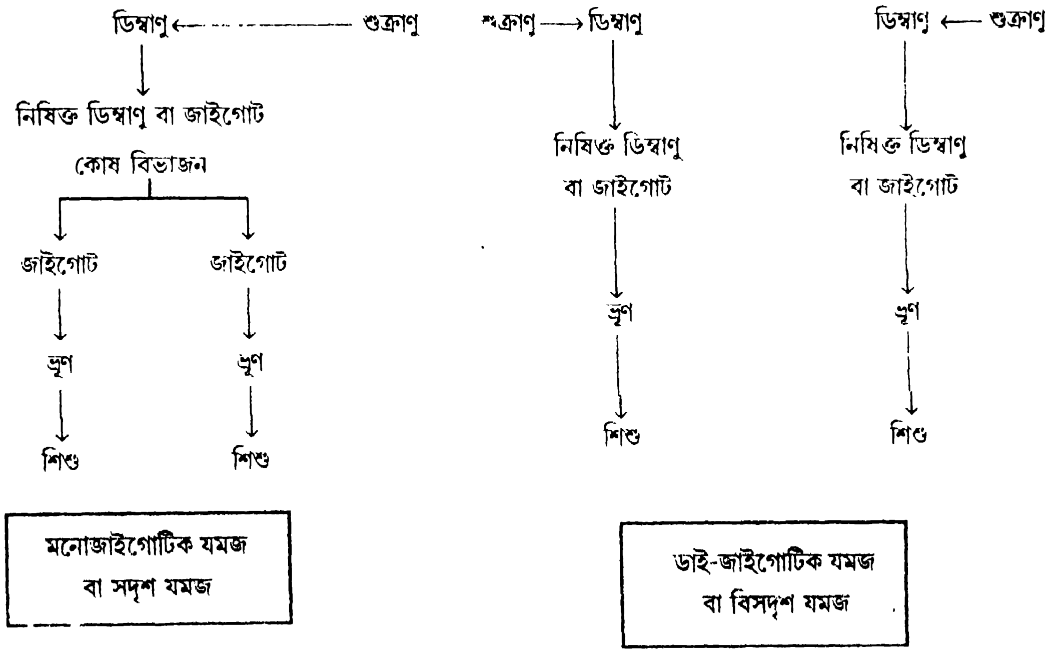
ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

ছেলেরা এক রকম, মেয়েরা আর এক রকমের। ছেলে



আর মেয়েদের মধ্যে অনেক তফাৎ কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এদের আকৃতিগত পার্থক্য দেখেন কোষে। ছেলে এবং মেয়েদের শরীরের আকৃতিতে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজে পার্থক্য এসেছে কোষের মধ্যেকার ক্রোমোজোমের পার্থক্য থেকে। কোষের নিউক্লিয়াসে সূক্ষ্ম সুতোর মত ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে জিন (Gene) নামে একটি পদার্থ, যা বংশবৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী।

মানুষের শরীরে প্রতিটি দেহকোষে যে ৪৬টি বা ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে তার মধ্যে ছেলে-মেয়ে সকলের বেলাতেই ২২ জোড়া ক্রোমোজোমের আকার আর কাজ করার ক্ষমতা এক। এদের বলে দেহ-ক্রোমোজোম (Autosome)। বাকি এক জোড়া অর্থাৎ ২৩তম জোড়া ক্রোমোজোমের জন্যই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এদের বলে যৌন ক্রোমোজোম। যৌন ক্রোমোজোম দু'ধরনের, একটি 'X' এবং অপরটি 'Y'। মেয়েদের যৌন ক্রোমোজোম জোড়াটি তৈরি হয়েছে দু'টি 'X' ক্রোমোজোম দিয়ে। তাই মেয়েদের ক্রোমোজোমের সাংকেতিক চিহ্ন 'XX'। ছেলেদের যৌন ক্রোমোজোম জোড়ায় আছে একটি 'X' এবং আর একটি 'Y', তাই পুরুষদের যৌন



ক্রোমোজোমের সাংকেতিক চিহ্ন 'XY'। এই যৌন

ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য কেন?

ক্রোমোজোম দিয়েই নির্দিষ্ট হয় ছেলে-মেয়েদের আকৃতিগত এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য।

যমজ শিশু কখন হয়?

আমরা অনেক সময়ে যমজ ছেলে-মেয়ে দেখি। কিন্তু যমজ ছেলে-মেয়ে হওয়ার কারণ কি?

একটি ডিম্বাণু একটি শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হলে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনেক সময়ে দু'টি ভ্রূণের সৃষ্টির ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'টি শিশুর জন্ম হয়ে থাকে। এদের বলা হয় যমজ (Twin) শিশু। কোনো কোনো যমজ শিশু দেখতে একই রকম, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে এরা দেখতেও সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে।

একই রকম দেখতে যমজদের বলে মনোজাইগোটিক যমজ (Monozygotic twin)। এই যমজরা একটি মাত্র নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে জন্ম নেয়। অর্থাৎ একটি ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পরে যে প্রথম কোষ বা জাইগোট তৈরি হয় তা ভ্রূণে পরিণত হওয়ার আগে বিভাজিত হয়ে দু'টি আলাদা ভ্রূণ সৃষ্টি করে। এরা মাতৃগর্ভে পাশাপাশি একই সঙ্গে দু'টি শিশুতে রূপান্তরিত হয়। এই ক্ষেত্রে কেবল মাত্র দু'টি ছেলে বা দু'টি মেয়ে যমজ হিসেবে জন্ম নেয়। এই যমজেরা একটি মাত্র জাইগোট থেকে সৃষ্টি হয় বলে এদের শুধু মাত্র যে একরকম দেখায় তা নয়, এদের চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যও একই রকমের হয়ে থাকে।

আবার সম্পূর্ণ আলাদা দেখতে যে-সব যমজ শিশু, তাদের জন্ম হয় যখন দু'টি ডিম্বাণু আলাদা ভাবে দু'টি শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে দু'টি পৃথক

যমজ শিশু কি একেবারে আলাদা দেখতে হতে পারে?

জাইগোট তৈরি হয়। তারা মাতৃগর্ভে দু'টি ভ্রূণের সৃষ্টি করে। এই ধরনের যমজদের ডাই-জাইগোটিক যমজ (Dizygotic twin) বলে। এই যমজদের ক্ষেত্রে দু'টি ছেলে বা দু'টি মেয়ে অথবা একটি ছেলে এবং একটি মেয়েও জন্ম নিতে পারে। এদের চেহারা এবং চরিত্র আলাদা হয়ে থাকে, কারণ শিশু দু'টি পৃথক জাইগোট থেকে জন্ম নিয়েছে।

ছেলে-মেয়ে বাবা-মার মত দেখতে হয় কেন?

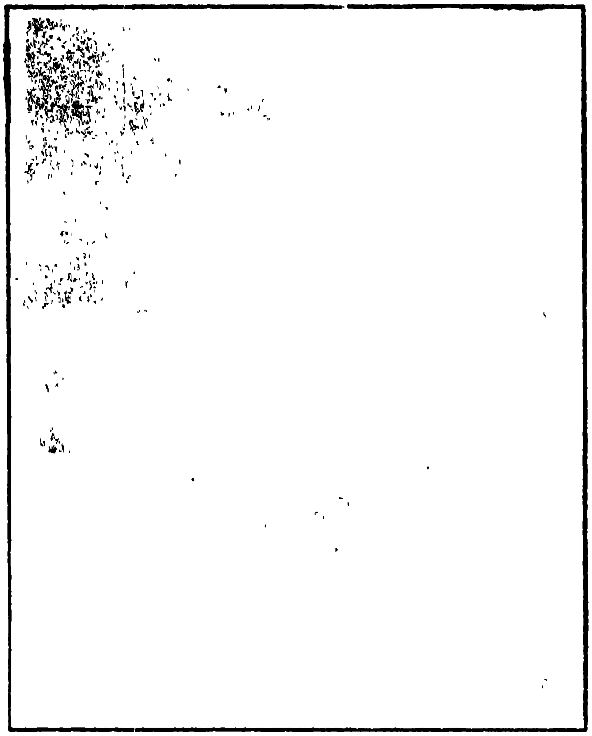
কোষের মধ্যে যে-ক্রোমোজোম আছে তার মধ্যে আবার থাকে জিন (Gene)। জিন তৈরি হয় এক ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে—এর নাম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucliec acid) বা DNA। এই জিনই বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। অন্যান্য বংশগত বৈশিষ্ট্যের মত চেহারার প্রতিচ্ছবি, গায়ের রঙ, চোখ ও চুলের রঙ, উচ্চতার পরিমাপ ইত্যাদি এই জিনের মধ্যেই বর্তমান থাকে ও বংশপরম্পরায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি একজন থেকে আর একজনের মধ্যে পৌঁছে যায়।

বাবা-মার প্রজনন কোষ দুটি যখন নিষিক্ত হয় তখন তাঁদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রোমোজোমের মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে চলে আসে কারণ সন্তানের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম তৈরি হয় বাবা ও মার ২৩টি করে ক্রোমোজোমের মিলনে। তাই সন্তানকে কখনো বাবা, আবার কখনো মায়ের মত দেখতে হয়ে থাকে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এই দেখতে হওয়া নির্ভর করে জিনের ওপর। যে জিনটির বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাকে প্রকট (Dominant) বৈশিষ্ট্যের জিন আর যেটির বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন (Recessive) বৈশিষ্ট্যের জিন বলা হয়। ছেলে বা মেয়ের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একটি বাবার ও একটি মায়ের জিন নিয়ন্ত্রণ করে। যখন বাবার জিনটির কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত (প্রকট জিন) হয় তখন তাদের দেখতে বাবার মত হয়। বাবার জিনটি যে ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় সে ক্ষেত্রে মায়ের জিনটি অপ্রকাশিত (প্রচ্ছন্ন জিন) থাকে। আবার মায়ের জিনটি প্রকট হলে বাবার জিনটি প্রচ্ছন্ন থাকে ও সন্তানকে মায়ের মত দেখতে হয়। অনেক সময়ে বাবা-মার কোষের মধ্যেকার কিছু কিছু জিন যাদের বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে তা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। তখন কিন্তু ছেলে-মেয়ে বাবা-মা কারো মতই দেখতে হয় না।

কোনো কোনো শিশু জন্মগত বিকলাঙ্গ হয় কেন?

কোনো কোনো শিশু জন্ম থেকে জড়বুদ্ধি হয় বা অনেকের জন্ম থেকে কোনো শারীরিক বিকৃতি থাকে। এমন



ডি. এন. এ-র আকৃতি

হওয়ার কারণ কি?

নানা কারণেই শিশু জন্মগত বিকলাঙ্গ (Congenital defects) হয়ে থাকে। বাবা বা মায়ের ক্রোমোজোম বা জিনের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা থাকলে শিশুকে বিকলাঙ্গ হতে দেখা যায়। এই অস্বাভাবিকতা বহু কারণে হয়ে থাকে। বাবা বা মায়ের বেশি বয়স, রোগ, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, এক্স-রশ্মি, অতি-বেগুনী রশ্মি, ওষুধ, রাসায়নিক পদার্থ বা পরিবেশ দূষণের প্রভাবে বাবা-মার প্রজনন কোষ বা ভ্রূণ কোষের কোষ বিভাজনে, ক্রোমোজোমে বা জিনে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। ফলে শিশু অনেক সময় বিকলাঙ্গ হয়।

শিশুদের মধ্যে নানা রকম জন্মগত ত্রুটি দেখা যায়, যেমন জড়বুদ্ধি (Idiot বা Mongol baby), কালা, অন্ধ, বর্ণান্ধ, হৃদ্‌রোগ। ক্রোমোজোম বা জিনের অস্বাভাবিকতার জন্যে যে সব বিকলাঙ্গ দেখা যায় তাদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়; এক, দেহ-ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা ও দুই সেক্স-ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা।

যে সব শিশু জড়বুদ্ধি তারা বিকলাঙ্গ হয় দেহ-ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার জন্য। জড়বুদ্ধি শিশুদের

দেহকোষে ২১ নম্বর ক্রোমোজোম জোড়াটি স্বাভাবিক নয়। দু'টির বদলে এদের ক্ষেত্রে তিনটি একই দেখতে ক্রোমোজেন থাকে। পঁয়ত্রিশ বছরের চেয়ে বেশি বয়স্ক

রাতকানা কি জন্মগত রোগ?

মেয়েদের সন্তান হলে অনেক সময়ে শিশু জড়বুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সমস্ত কারণে জড়বুদ্ধি শিশু জন্মায় তার মধ্যে ৪০ শতাংশ ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার জন্য। বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, রাতকানা প্রভৃতির কারণ ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা। তবে এই সব রোগ যৌন ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার জন্যেই হয়ে থাকে।

মানুষ লম্বা বা বেঁটে হয় কেন?

কেউ লম্বা হয়, কেউ বেঁটে। কিন্তু একজনকে কেন বেশ লম্বা দেখি, আর একজনকে বেঁটে?

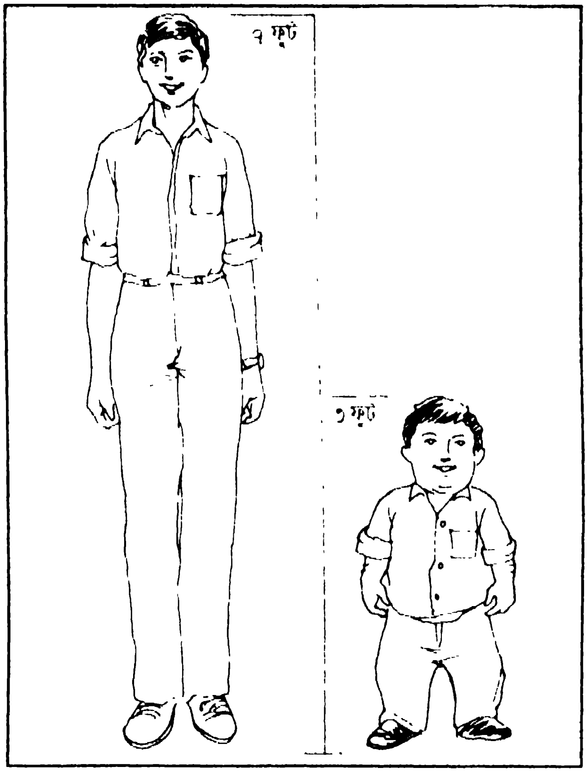
লম্বা বা বেঁটে হওয়া নির্ভর করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে, তা আসে বাবা ও মায়ের ক্রোমোজোম থেকে।

বংশগত কারণ ছাড়াও গ্রোথ হরমোনের প্রভাব লম্বা বা বেঁটে হওয়ার ওপরে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। গ্রোথ হরমোন মস্তিষ্কে অবস্থিত পিট্যুইটারি গ্রন্থি থেকে বেরোয়। অস্থি তৈরি করতে ও লম্বা অস্থির (Long bone) দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই হরমোন। অস্থি তৈরির কাজ শেষ হওয়ার আগে এই হরমোনের ক্ষরণ বেশি হলে তৈরি হয় দৈত্যাকার মানুষ (Gigantism)। অস্থি তৈরির কাজ শেষ

ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সচরাচর লম্বায় খাটো হয় কেন?

হয়ে যাওয়ার পরে এই হরমোন বেশি বেরোলে গোরিলার মত চওড়া হাড়যুক্ত মানুষের সৃষ্টি হয়। এই বৈশিষ্ট্যকে বলে অ্যাক্রোমেগালি (Acromegaly)। গ্রোথ হরমোনের ক্ষরণ খুব কম হলে তৈরি হয় বামনাকৃতি মানুষ।

সাধারণত ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা লম্বায় খাটো হয়। স্ত্রী-প্রজনন হরমোন ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) বয়ঃসন্ধির সময়ে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণের হার কমিয়ে দেয়। তাই



দৈত্যাকার ও বামন মানুষ

মেয়েরা কম লম্বা হয়। আর পুরুষ প্রজনন হরমোন অ্যান্ড্রোজেন (Androgen) লম্বা হতে সাহায্য করে নির্দিষ্ট কিছু সময় পর্যন্ত।

থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid) থেকে বেরোনো থাইরক্সিন ও ট্রাই-আয়োডো-থাইরোনিন হরমোন দু'টির ওপরেও মানুষের লম্বা বা বেঁটে হওয়া নির্ভর করে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি?

ক্রোমোজোম অথবা জিনের অস্বাভাবিকতা যে সব রোগের কারণ হিসেবে মনে করা হয় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সৃষ্টি। ক্রোমোজোম বা জিনের যে অংশটি স্বাভাবিক নয় তাকে যদি বাদ দিয়ে, নতুন ভাবে সে অংশটি দেহের বাইরে তৈরি ক'রে ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা যায় তবে হয়তো মানুষকে নানা রকম বিকলাঙ্গতা ও রোগ থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ এই বিশেষ কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে আমরা বংশগত ধারার বাহক ও প্রেরককে প্রয়োজন মত মেরামত ক'রে নিতে পারি।

ক্রোমোজোমের মেরামত করার জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয় দু'ধরনের উৎসেচক রস। আবার কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে ক্রোমোজোমের প্রয়োজনীয় অংশটি বা তার থেকে তৈরি প্রোটিন হরমোন, উৎসেচক ইত্যাদি, এই কারিগরি বিদ্যার মাধ্যমে তৈরি ক'রে নেওয়া হয়। এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহার খুব সীমিত। কারণ মানুষের দেহের লক্ষ লক্ষ কোষের ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা সারিয়ে দেওয়া আজও সম্ভব হয়নি। তবে অতি প্রয়োজনীয় কিছু হরমোন (ইনসুলিন, গ্রোথ হরমোন) টিকা প্রভৃতি তৈরি করা গেছে।

গায়ের রঙ সব মানুষের এক রকম নয় কেন?

আমাদের সবার গায়ের রঙ এক রকম নয়—কারো ফর্সা, কারো তামাটে, কারো বা কালো। আবার আমাদের মধ্যে যারা ফর্সা তাদের তুলনায় ইউরোপীয়দের গায়ের ত্বক আরো সাদা। গায়ের রঙের এ-রকম তফাত কেন হয়?

আমাদের ত্বকে দু'টি স্তর আছে। এর বাইরেরটি বহিস্ত্বক বা এপিডারমিস (Epidermis) আর ভেতরেরটিকে বলে অন্তস্ত্বক বা ডারমিস্ (Dermis)। বহিস্ত্বককে আবার কয়েকটা স্তরে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে সব চেয়ে ভেতরেরটার নাম স্ট্র্যাটাম বেসাল (Stratum basale)। এই স্তরে কতকগুলো বিশেষ ধরনের কোষ আছে, তাদের

গায়ের রং ফরসা হয় কেন?

বলে মেলানোসাইট (Melanocyte)। সাধারণত স্ট্র্যাটাম বেসালে প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ১০০০ থেকে ৩০০০ মেলানোসাইট থাকে।

মেলানোসাইটগুলোর মধ্যে আছে রঙ্গক কণা মেলানিন। গাঢ় রঙের এই কণাগুলোই ত্বকের কালো রঙের জন্য দায়ী।

যাদের ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ খুব বেশি তাদের গায়ের রঙ কালো। ত্বকে মেলানিন কম থাকলে গায়ের রঙ ফর্সা হয়। পিট্যুইটারি গ্রন্থি নিসৃত মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte stinulating hormone) নামে এক বিশেষ হরমোন মেলানিন তৈরিতে সাহেয্য করে।

ত্বকে মেলানিন কম থাকবে না বেশি থাকবে তা যেমন নির্ভর করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে, তেমন কোনো বিশেষ দেশের মানুষের গায়ের রঙের সঙ্গে সেই জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান, সূর্যের আলো সেখানে কতটা চড়া এ-সব কিছুরও সম্পর্ক আছে। যেমন ইউরোপের লোকজনের গায়ের রঙ সাদা, আমাদের প্রধানত বাদামি, আফ্রিকার মানুষদের কালো। নিগ্রোদের ত্বকে বহিস্ত্বকের ওপরের স্তরেও মেলানিন পাওয়া যায়।

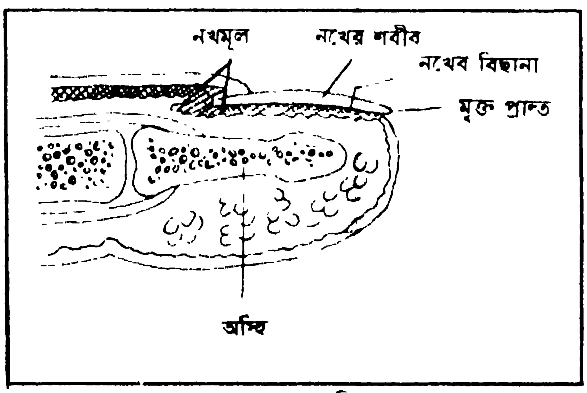
রোদে গায়ের রঙ তামাটে হয় কেন?

রোদে খুব বেশি ঘোরাঘুরি করলে গায়ের রঙ তামাটে হয়ে যায়। অনেক বিদেশী আবার ত্বকের সাদা রঙে তামাটে ভাব আনতে সূর্যস্নান করেন। এর কারণ কি?

আমাদের ত্বকে যে মেলানিন আছে তা সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বকের অন্তস্ত্বককে বাঁচায়। মেলানিন থাকে বহিস্ত্বকের ভেতরের স্তরে। রোদের হাত থেকে ত্বককে বাঁচানোর জন্যে মেলানোসাইট নামে যে কোষ মেলানিন তৈরি করে, তারা মেলানিন তৈরির হার বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া রোদের প্রভাবে এই রঙ্গক কণাদের রঙ আরো গাঢ় হয়। তাই গায়ের রং তামাটে হয়ে যায়। এই ভাবে রঙকে তামাটে করাকে বলে ট্যানিং।

নখ বা চুল কি ডগা থেকে বাড়ে?

অনেকে বলেন, চুলের ডগা কেটে ফেললে চুল ডগা থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ে। চুল বা নখ কোথা থেকে বাড়ে?



নখের আকৃতি

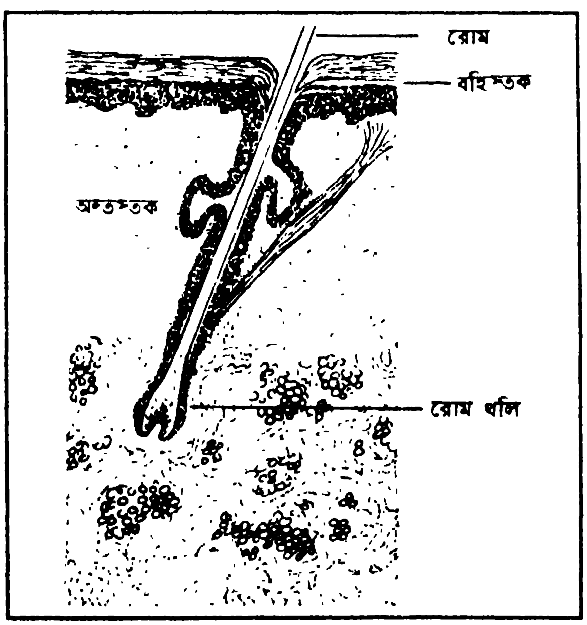
নখের বেলায় এটা লক্ষ্য করা সোজা। ভোট দেওয়ার সময়ে নখের গোড়ায় কালি দিলে সেই কালি আস্তে আস্তে উঠে আসে ওপরে। বোঝাই যায়, নখ বাড়ে গোড়া থেকে। চুলেও যদি এ-ভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ থাকতো, তাহলে বুঝতে অসুবিধে হত না যে, চুলও বাড়ে গোড়া থেকে।

কিন্তু নখ বা চুল বাড়ে কেন?

নখ বা চুল তৈরি হয় মৃত এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে। এই কোষগুলি কেরাটিন (Keretin) নামে বিশেষ এক ধরনের প্রোটিনে পূর্ণ।

নখ বহিস্তকের যে অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে বলে নেল বেড (Nail bed)। নেল বেডের কোষেরা ক্রামগত সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এর ফলেই নখের দৈর্ঘ্য বাড়ে। এখন নতুন যে-কোষগুলি তৈরি হচ্ছে তারা মৃত কোষে পরিণত হয় এবং কেরাটিনে পূর্ণ হয়ে ওপর দিকে উঠে আসে। হাতের আঙুলেব নখ আবার পায়ের আঙুলের নখের তুলনায় তাড়াতাড়ি বাড়ে। তা ছাড়া গরমে বা বেশি তাপমাত্রায় আর কম বয়সেও নখ তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে।

অন্তস্ত্বকের বা তারও নিচে অর্থাৎ অধস্ত্বকে (Subcutaneous layer) রয়েছে কেশ থলি (Hair follicle)। কেশ থলির নিচের দিকে একগুচ্ছ কোষ আছে যাদের বলে হেয়ার বাল্ব (Hair bulb)। এরাই চুল সৃষ্টি করে। এখানকার



ত্বকের রোম

কোষগুলি ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে ক্রমে বহিস্ত্বকের দিকে উঠতে থাকে। যত ওপরে ওঠে পুষ্টির অভাবে তারা মৃত হয়ে যায়। পরে কেরাটিনে পূর্ণ হয়ে শক্ত হয়ে আসে। চুলের যে-অংশটি দেহত্বকের বাইরে থাকে তাকে বলে স্যাফ্‌ট (Shaft) আর ভেতরের অংশটিকে বলে কেশমূল (Hair root)। হেয়ার বাল্বের কোষের সংখ্যা বেড়ে ওঠে বলেই চুল বড় হয়।

টাক পড়ে কেন?

কারো কারো মাথায় মসৃণ চকচকে টাক দেখা যায়। টাকটা ছেলেদের মাথাতেই বেশি নজরে আসে। তাও একটু বেশি বয়সেই। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। অনেক অল্পবয়সী ছেলের মাথায়, এমন-কি অনেক মেয়েদের মাথাতেও টাক পড়ে।

টাক কেন পড়ে তার কারণ খুব পরিষ্কার নয়। তবে বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই ছেলেদের কপালের দু'পাশের চুল পাতলা হতে শুরু করে। তারপর বয়স বাড়লে মাথায় টাক বাড়ে। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, পুরুষদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন (Androgen) নামে যে বিশেষ হরমোন আছে, তারই প্রভাবে টাক পড়ে। বয়ঃসন্ধির সময়ে এই হরমোনের ক্ষরণ বাড়তে শুরু করে।

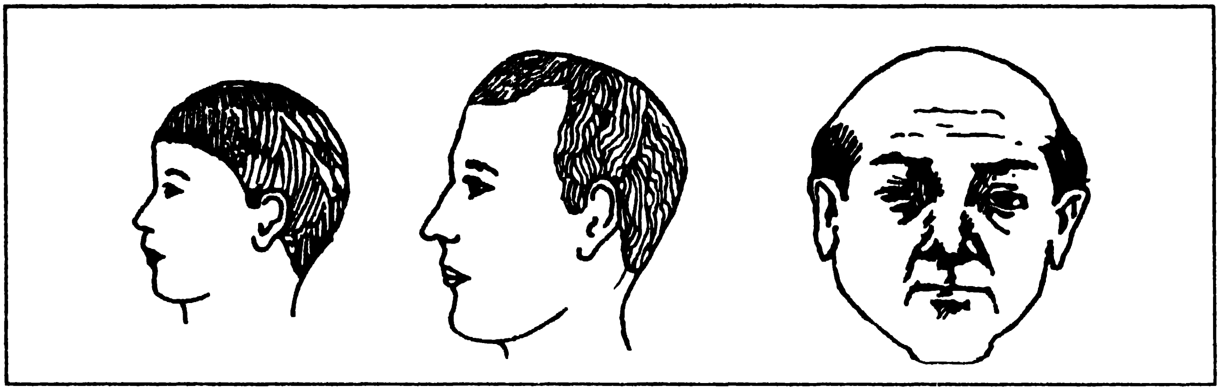
মজার ব্যাপার এই, অ্যান্ড্রোজেনই আবার ছেলেদের শরীরে বেশি লোম হওয়ার বা গোঁফ-দাড়ি বেরোনোর জন্য দায়ী। তবে বংশগত বৈশিষ্ট্যকেও টাক পড়ার কারণ বলে কেউ কেউ মনে করেন।

মেয়েদের মাথার টাকের জন্য সাধারণত তাদের শরীরে স্ত্রী-প্রজনন হরমোনের (Female sex hormone) কম ক্ষরণকে দায়ী করা হয়।

চুলের মূলে (Hair root) পুষ্টির অভাব, মাথার ত্বকে রক্ত চলাচল কম হওয়া, স্নায়ুর গোলযোগও টাক পড়ার কারণ হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন, তবে এই মতের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

চুল পাকে কেন?

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলে রুপোলি রঙের



বালক, বয়ঃসন্ধি ও বয়স্ক কালে চুলের অবস্থা

ছোঁয়া লাগে। কিন্তু কালো চুল এ-ভাবে সাদা হয় কি ক'রে?

চুলের কালো রঙের জন্যে দায়ী মেলানিন। এই মেলানিন তৈরি কতটা হবে তা নির্ভর করে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোনের (Melanocyte stimulating hormone) ওপরে। এই হরমোন তৈরি করে পিটুইটারি গ্রন্থি। বয়স বাড়লে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন কম বেরোয়। তাই মেলানিন তৈরির হার এবং পরিমাণ কমে যায়। তখন মেলানোসাইট কোষগুলি থেকে মেলানিন সরে যায়, তার জায়গা দখল করে সূক্ষ্ম বাতাসের কণা। ফলে চুল সাদা দেখায়।

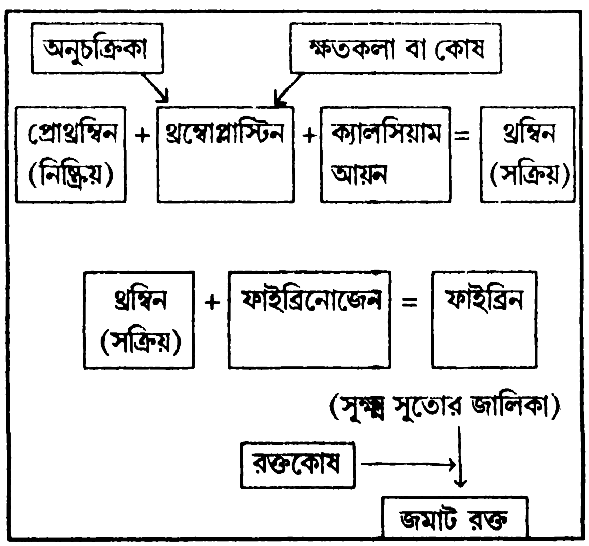
অনেকের আবার অল্প বয়সেই চুলে পাক ধরে। এর অনেক কারণ আছে। কোনো শারীরিক কারণে মেলানিন ঠিক মত তৈরি হয় না, কারো শরীরের মেলানোসাইট

তাড়াতাড়ি চুল পাকার কারণ কি?

স্টিমুলেটিং হরমোন কম বেরোয়, কারো বা বংশগত কারণে মেলানিন কম থাকে। মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম যাঁদের বেশি হয় তাঁদের শরীরে অ্যাডরেনালিন আর কর্টিকোস্টেরয়েড (Corticosteroid) নামে দু'টি হরমোন বেশি ক্ষরণ হয়। এই দু'টি হরমোন আবার মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। ফলে মেলানিন কম তৈরি হয়।

কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধে কি ভাবে?

আমাদের শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে সেই অংশ থেকে রক্ত দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ রক্তক্ষরণ (Haemorrhage) হবার পরে আবার তা নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। রক্ত যে-পদ্ধতিতে নিজে থেকে রক্তক্ষরণকে বন্ধ করে তাকে বলা হয় রক্ত-তঞ্চন বা জমাট বাঁধা (Coagulation of blood)। রক্ত-তঞ্চন একটি অতি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হয়। কোথাও যখন কেটে যায় তখন কাটা অংশের (দেহত্বক) কোষ বা কলা (Tissue) থেকে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ অণুচক্রিকা (Thrombocyte বা Platelets)। তা ভেঙেও ওই রাসায়নিক যৌগ বেরোতে থাকে। এটির নাম থ্রম্বোপ্লাস্টিন (Thromboplastin)। এই যৌগটি রক্তরসের (Plasma) ভেতরের অন্য একটি প্রোটিন যৌগ প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin)-কে থ্রম্বিনে পরিণত করে। এই থ্রম্বিন রক্তরসের আর এক প্রোটিন জাতীয় ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen)-কে ফাইব্রিনে (Fibrin) রূপান্তরিত করে। রক্ত



তঞ্চনের রাসায়নিক বিক্রিয়া সমূহে রক্তের ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতি খুব প্রয়োজনীয়।

এই যে ফাইব্রিন, এটি এক রকম অতি সূক্ষ্ম সুতোর মত পদার্থ। এটি রক্তনালীর মুখে একটি জালিকা তৈরি করে। ওই জালিকার মধ্যে রক্তকোষেরা এসে আবদ্ধ হয় আর রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

দেহের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময়ে সাধারণত রক্তকে জমাট বাঁধতে দেখা যায় না। রক্ত জমাট না বাঁধার প্রধানত দু'টি কারণ। এক, তঞ্চন বিরোধী (Anti coagulants) কিছু রাসায়নিক পদার্থ রক্ত-তঞ্চন বিক্রিয়াগুলিকে বাধা দেয়, যেমন, হেপারিন, অ্যান্টিথ্রম্বিন। দুই, রক্তনালীর ভেতরের কোষস্তর (Endothelium) সব সময়ে ক্ষতহীন ও মসৃণ থাকার ফলে অনুচক্রিকার ভাঙন বা কলার ক্ষত সৃষ্টি না হওয়ায় থ্রম্বোপ্লাস্টিনও তৈরি হয় না। তাই তঞ্চন বিক্রিয়াটি শুরু হতে পারে না।

অনেক সময়ে রক্তনালিকার মধ্যেও রক্তকে জমাট বাঁধতে দেখা যায়। রক্তনালিকার মধ্যে জমাট বাঁধা রক্তকে বলা হয় থ্রম্বাস (Thrombus), যেমন, করোনারি থ্রম্বোসিস (Coronary thrombosis) এবং সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস (Cerebral thrombosis)। নালীর ভেতরের কোষস্তরের ক্ষত সৃষ্টিই রক্তনালিকার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার প্রধান কারণ। ওই ক্ষতস্থানে অণুচক্রিকা ভেঙে গিয়ে রক্ত জমাট বাঁধার বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

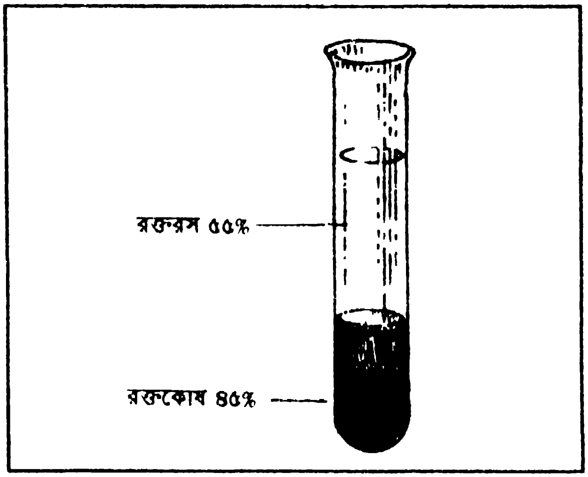
অনেকের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে রক্ত জমাট বাঁধা নজরে আসে না। সাধারণত আড়াই মিনিট ধরে রক্তক্ষরণ

রক্ত জমাট বাঁধতে সাধারণত কত সময় লাগে?

(Bleeding time) হতে দেখা যায় এবং ৩ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার (Coagulation time) কথা। যাদের রক্ত স্বাভাবিক ভাবে জমাট বাঁধে না সাধারণত তাদের শরীরে ভিটামিন K-এর অভাব বা বংশগত রোগ হিমোফিলিয়া (Haemophilia) দেখতে পাওয়া যায়।

রক্তের রঙ লাল কেন?

আমাদের হাত বা শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে সেই

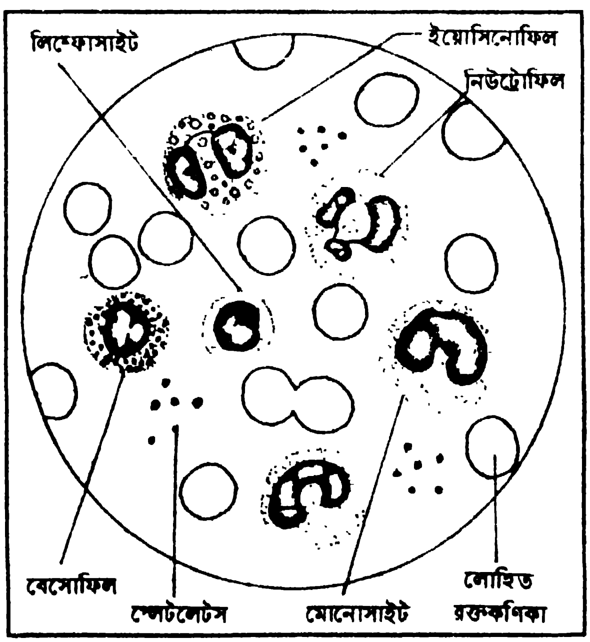


রক্তের মধ্যে রক্তরস ও রক্তকোষের পরিমাণ

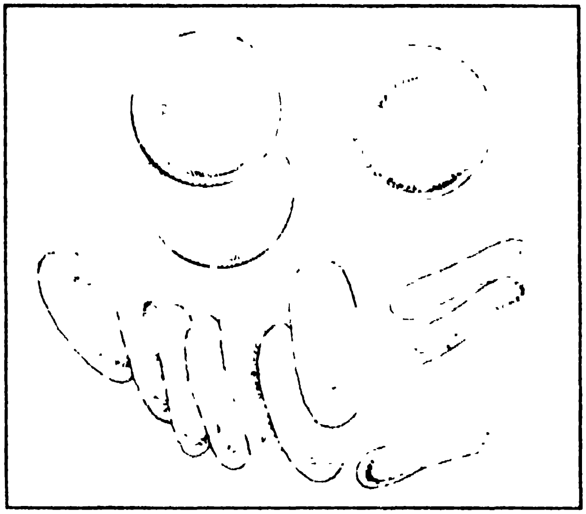
স্থান থেকে ঘন লাল রঙ-এর তরল পদার্থ বেরোয়। এই তরল পদার্থ রক্ত।

কিন্তু রক্তের রঙ লাল হয় কেন?

শরীরের মধ্যে প্রতিটি ধমনী, শিরা ও রক্তজালিকার মধ্যে দিয়ে সারাক্ষণ যে রক্ত প্রবাহিত হয় তার ৪৫ শতাংশ কোষ ও বাকি ৫৫ শতাংশ রক্তরস (Plasma)। রক্তকোষ তিন রকমের হয়—লোহিত রক্তকণিকা (Red blood corpuscle), শ্বেত রক্তকণিকা (White blood corpuscle) ও অণুচক্রিকা (Platelets)।



অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্ত যেমন দেখায়



লোহিত রক্তকণিকা

লোহিত কণিকার চেহারা হয় চাকতির মত ও দ্বিঅবতল (Biconcave)। পাশ থেকে এদের অনেকটা ব্যায়াম করার ডাম্বেলের মত দেখতে মনে হয়। কিন্তু এই কোষের মধ্যে অন্যান্য জীবিত কোষের মত কোনো নিউক্লিয়াস (Nucleus) থাকে না। তার বদলে থাকে হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin)। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু তৈরি হয় হিম (Heme) ও গ্লোবিন নামক প্রোটিন দিয়ে। হিম-এর মধ্যে থাকে একটি লোহার আয়ন যা আবদ্ধ থাকে এক জটিল অজৈব পদার্থের মধ্যে। এই লোহার আয়ন ফুসফুস থেকে অক্সিজেন অণু ধরে নিয়ে জীবন্ত কোষগুলিতে পৌঁছে দেয়। এই হিমের রঙ লাল বলেই রক্তের রঙ লাল হয়।

একটি লোহিত কণিকার আয়ু মাত্র ১২০ দিন। হিসেব ক'রে দেখা গেছে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ লক্ষ কণিকার মৃত্যু

হিমোগ্লোবিন কী?

হয় এবং সমসংখ্যক লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয় হাড়ের লাল মজ্জা থেকে। কোনো কারণে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা কমে গেলে রক্তের রঙ ফ্যাকাশে লাল হয়ে যায় এবং রক্তাল্পতা (Anaemia) জাতীয় রোগের সৃষ্টি হয়।

কালশিটে পড়ে কেন?

অনেক সময়ে শরীরের কোনো জায়গায় আঘাত লাগলে চামড়ার ওপরে কালো দাগের সৃষ্টি হয়। এই দাগকেই আমরা বলি কালশিটে (Bruise)।

কালশিটে পড়ার কারণ কি?

আঘাত লাগলে, বিশেষ ক'রে ভোঁতা জিনিসের সঙ্গে ধাক্কায় অনেক সময়ে চামড়া কাটে না কিন্তু চামড়ার নিচের রক্তজালিকা (Blood capillary) ছিঁড়ে যায়। তখন চামড়ার মধ্যে রক্ত পড়তে থাকে এবং দেহত্বক কলার মধ্যে জমা হয়ে জমাট বেঁধে যায়।

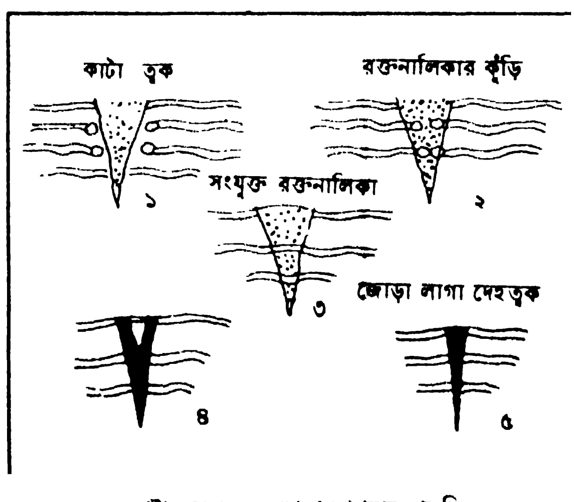
কালশিটে প্রথম অবস্থায় লাল দেখায়। পরে কালো হয়ে ক্রমশ নীল হয়ে যায়। আস্তে আস্তে এই দাগ মিলিয়ে আসে। কালশিটের রঙ পালটানোর কারণ রক্তের লোহিত কণিকায় অবস্থিত রঙ্গক কণা হিমোগ্লোবিন আস্তে আস্তে ভাঙে বা বিভাজিত হয়। হিমোগ্লোবিনই রক্তের লাল রঙের জন্য দায়ী।

রক্তজালিকা আবার জুড়ে গেলে আর হিমোগ্লোবিনের বিভাজন শেষ হলে চামড়া তার স্বাভাবিক রঙ ফিরে পায়।

অনেক সময়ে রক্তপাত দেহের অনেক গভীরে হয়ে থাকে, যেমন, পেশীর মধ্যে। তখন যে-জায়গায় আঘাত লেগেছে কালশিটে তার থেকে কিছুটা দূরে ফুটে ওঠে।

শরীরের কোথাও কেটে গেলে জোড়া লাগে কি ভাবে?

শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে রক্ত পড়ে। ছোটখাটো কাটা হলে এক সময়ে রক্ত পড়া বন্ধও হয়ে যায়।



কাটা দেহত্বকের জোড়া লাগবার পদ্ধতি

কিন্তু কাটা যদি গভীর হয়, তাহলে সে-জায়গাটা কিছুদিন ফাঁক হয়ে বা হাঁ ক'রে থাকে। পরে অবশ্য তা আবার জুড়ে যায়। কিন্তু এই যে জোড়া লাগে, এটা হয় কী ভাবে?

শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে সেখানকার সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলি বা ব্লাড ক্যাপিলারি (Blood capillary) যা আছে, তা কেটে যায়। তাই রক্ত পড়তে থাকে।

কিন্তু ছোটখাটো কাটায় রক্ত আর কতক্ষণ পড়বে?

প্রথমে রক্ত-তঞ্চনের সাহায্যে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। রক্ত তঞ্চন অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধা—তার পরে রক্তের যে-তরল অংশ পড়ে থাকে তাকে বলে সিরাম। কাটা জায়গাটি এই সিরামে আর কলারসে ভর্তি থাকে।

জোড়া লাগার সময়ে রক্তনালীর কাটা অংশগুলিতে এক রকম কুঁড়ি (Bud) তৈরি হয়। এই কুঁড়ির সংখ্যা বাড়তে থাকে আর আকারেও এরা বৃদ্ধি পায়। কাটা অংশের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এরা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যায়। তখন আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়। বহিস্ত্বকের কাটা অংশের দু'পাশের কোষগুলি ক্রমাগত সংখ্যায় বেড়ে ক্ষত অংশটিকে বন্ধ ক'রে দেয়।

রক্তের শ্বেত কণিকারা কাটা অংশের অদরকারী জিনিসগুলোকে ধ্বংস ক'রে ফেলে। কাটা জায়গায় কোষের মধ্যে কোলাজেন (Collagen) নামে এক প্রকার তন্তু বা

শরীরে কোথাও কেটে গেলে সারতে কত দিন সময় লাগে?

ফাইবার জাতীয় পদার্থ তৈরি ক'রে ক্ষত ভরে দেয়। কাটা খুব গভীর বা অনেকটা জায়গা জুড়ে হলে শক্ত কোলাজেন ফাইবার চামড়ার ওপরে একটা দাগের সৃষ্টি করে। একে ক্ষতচিহ্ন (Scar) বলে।

শরীরের কোথাও কেটে গেলে তা দিন পনেরোর মধ্যে সেরে যায়। কিন্তু কাটা জায়গায় রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ হলে, শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতি থাকলে, যার কেটেছে তার ডায়াবেটিস রোগ থাকলে বা রক্ত জমাট বাঁধার পদ্ধতিতে কোনো গোলযোগ ঘটলে ক্ষত সারতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।

রক্তচাপ কাকে বলে?

হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের (Systole) সময় রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে এসে প্রবেশ করে মহাধমনীর (Aorta) মধ্যে। রক্ত ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হবার সময়, ধমনীর গাত্রদেহে পার্শ্বচাপ (Lateral pressure) প্রয়োগ করে, কারণ ধমনীর অন্তঃ গাত্রদেশ (inner wall) রক্তপ্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করে (Resistance)। রক্তের এই পার্শ্বচাপকে বলা হয় রক্তচাপ (Blood Pressure)। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের রক্তচাপ হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের সময় 120 মি. মি. বা হৃৎপিণ্ডের সম্প্রসারণের সময় 80 মি. মি. পারদ স্তম্ভের সমান।

অনেক রুগী চলতি কথায়, রক্তচাপ বৃদ্ধি বা কমের অসুখে ভুগবার সময় বলে থাকেন, আমার রক্তচাপ হয়েছে। কথাটি ঠিক নয়। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি মানুষেরই রক্তচাপ আছে। রক্তচাপ না থাকলে মানুষের দেহের রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত। অনেক সময় ধমনী ও শিরার আকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে, রক্তপ্রবাহের বাধা বৃদ্ধি বা কম হয়ে থাকে, তখনই মানুষ বেশি বা কম রক্তচাপের (High or Low blood pressure) শিকার হয়ে থাকেন।

রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত হয় কি ভাবে?

মানুষের প্রাণশক্তির বাহক রক্ত। রক্তের সাহায্যে প্রাণ-বায়ু—অক্সিজেন ও পুষ্টি (Nutrient) পৌঁছে যায় প্রতিটি দেহকোষে। আবার সেখান থেকে দূষিত বর্জ্য পদার্থ ও কার্বন ডাই অক্সাইড রক্তের মাধ্যমে পৌঁছে যায় রেচন (excretory) অঙ্গে এবং নিঃসারিত হয়। রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত হয় রক্ত নালিকার (blood vessels) মধ্য দিয়ে। রক্ত নালিকার গঠন, ব্যাপ্তি ও বিস্তার বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও বিস্ময়কর। রক্তনালিকা দুই প্রকার—ধমনী (Artery) ও শিরা (Vein)। ধমনী দেহকোষ স্তরে পৌঁছে তৈরি করেছে অসংখ্য রক্তনল জালিকা (Blood capillary network)। আকৃতিগতভাবে এই অতি সূক্ষ্ম রক্ত নালিকার গাত্রদেহ কেবলমাত্র একটি কোষস্তর দিয়ে তৈরি। এই গাত্রদেহের মধ্য দিয়ে গ্যাসীয়, পুষ্টি ও বর্জ্য পদার্থের গ্যাসীয়, বর্জ্য পদার্থ এবং পুষ্টিরও বদল হয় রক্ত ও দেহকোষের মধ্যে। দেহকোষ থেকে দূষিত রক্ত ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডে যে রক্তনালীর মধ্য দিয়ে তার নাম শিরা।

আকৃতিগতভাবে ধমনী শিরার তুলনায় অনেক মোটা এবং পুরু কারণ ধমনীকে সহ্য করতে হয় অনেক বেশি রক্ত প্রবাহ চাপ যা তৈরি হয় হৃৎপিণ্ড নামক পাম্প যন্ত্রটিতে।

হৃৎপিণ্ড চলে কেমন করে?

বুকের কাছে কান নিয়ে গেলে যে লাব্-ডাপ্ (Lub-dup) শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, তার উৎপত্তিস্থল হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড একটি চার-প্রকোষ্ঠযুক্ত স্বয়ংক্রিয় পাম্প যন্ত্র। স্বয়ংক্রিয় অঙ্গ শব্দের অর্থ, যে অঙ্গের কার্যাবলীর উপর আমাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারি না, যেমন পারি হাত-পা নাড়তে বা কথা বলতে। হৃৎপিণ্ড তৈরি হয়েছে এক বিশেষ ধরনের মাংস পেশী দিয়ে। এই বিশেষ পেশী ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অবস্থিত দুটি স্নায়ুকুণ্ডলী অবিরাম সৃষ্টি করে চলেছে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন—অর্থাৎ সংকোচন (Systole) ও সম্প্রসারণ (Diastole)।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রতি মিনিটে 70-75 বার। শিশুদের এই স্পন্দন অনেক বেশি। ডাক্তারবাবুরা কবজির কাছে আঙুল দিয়ে নাড়ী দেখেন. আসলে নাড়ী দেখে তাঁরা বুঝবার চেষ্টা করেন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যা ও প্রকৃতিকে, কারণ অসুখ-বিসুখে, মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অনেক পরিবর্তন হয়ে থাকে।

সবাই কেন সবার রক্ত নিতে পারে না?

অনেক সময়ে কারো অসুখে বা অপারেশনের সময়ে রক্ত দেবার জন্যে প্রিয়জন এগিয়ে এলে তাঁর রক্তই যে নেওয়া হবে, তা নয়। সবার রক্তে সকলের কাজ হয় না। কারণ সবাই সবার রক্ত নিতে পারে না। এ-জন্য রক্তের দরকারে গড়ে তোলা হয়েছে ব্লাড ব্যাঙ্ক, যাতে দরকার মত রক্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সবাই সবার রক্ত নিতে পারে না কেন?

রক্ত দেওয়ার পদ্ধতিকে বলে রক্ত সঞ্চারণ (Blood transfusion)। যে রক্ত দিচ্ছে তাকে বলে দাতা আর নিতে হচ্ছে যাকে, সে গ্রহীতা। রক্ত সঞ্চারণ চিকিৎসার এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। কিন্তু দাতার সঙ্গে গ্রহীতার রক্তের 'গ্রুপ' এক হওয়া চাই। নয়তো নানা রকম বিপত্তি দেখা দেবে। তার মধ্যে প্রধান হল, রক্তের লোহিত রক্তকণিকা জমাট বাঁধা এবং তা ভেঙে যাওয়া (Haemolysis)।

রক্তের গ্রুপ কি?

রক্তের এক বিশেষ ধর্মকে ভিত্তি ক'রে রক্তকে চারটি গ্রুপ বা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে A, B, AB আর O। আমাদের লোহিত রক্ত কণিকায় এক ধরনের শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে। এটি অ্যাগ্লুটিনোজেন (Agglutinogen)। এরা আবার দু'ধরনের, A আর B। যার লোহিত রক্ত কণিকায় A থাকে তার গ্রুপ A, সে-রকম ভাবে B গ্রুপ। আবার যার দু'টোই থাকে তার AB, কিন্তু যার কোনটাই নেই তার গ্রুপ O।

আবার রক্তের প্লাজমায় থাকে অ্যাগ্লুটিনিন (Agglutinin) নামে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। যার গ্রুপ A তার রক্তে থাকে অ্যান্টি-B অ্যাগ্লুটিনিন, সে-রকম গ্রুপ B-এর রক্তে অ্যান্টি-A অ্যাগ্লুটিনিন, AB-তে কিছুই থাকে না, আর O-তে দুটোই থাকে।

রক্তের শ্রেণী বা গ্রুপ	লোহিত রক্ত কণিকায় অ্যাগ্লুটিনোজেন	প্লাজমায় অ্যাগ্লুটিনিন
A	A	অ্যান্টি-A
B	B	অ্যান্টি B
AB	A এবং B	-
O		অ্যান্টি-A এবং অ্যান্টি-B

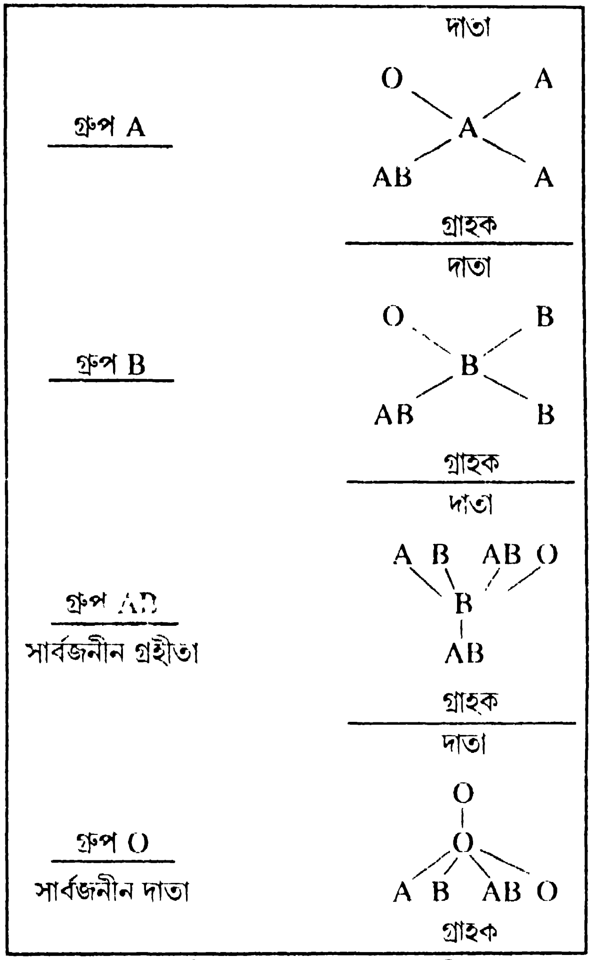
এমন রক্তের গ্রুপ A এমন কোনো লোককে যদি B গ্রুপের রক্ত দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? তখন গ্রহীতার রক্তের অ্যান্টি B অ্যাগ্লুটিনিনের সঙ্গে দাতার রক্তের B অ্যাগ্লুটিনোজেন বিক্রিয়া করবে। ফলে লোহিত রক্ত কণিকারা জমাট বাঁধবে এবং ভেঙে যাবে।

AB গ্রুপের লোকেদের রক্তে কোনো অ্যাগ্লুটিনিন না থাকায় তারা সবার রক্ত নিতে পারে। তাই তাদের সার্বজনীন গ্রহীতা (Universal recipient) বলে। আবার

কেউ কি সবাইকে রক্ত দিতে পারে?

O গ্রুপের লোকেদের রক্তে কোনো অ্যাগ্লুটিনোজেন না থাকায় তাদের পক্ষে সবাইকে রক্ত দেওয়া সম্ভব। তাই তারা সার্বজনীন দাতা (Universal donor)।

এ-ছাড়াও মানুষের শরীরে রেসাস ফ্যাক্টর (Rhesus factor) নামে একটা পদার্থ বিভিন্ন লোকের রক্তের মধ্যে



কে কাকে রক্ত দিতে পারে ও কে কার রক্ত নিতে পারে

পার্থক্য এনেছে। সংক্ষেপে একে বলে Rh ফ্যাক্টর। ৮৫ থেকে ৯৫ শতাংশের দেহে এটা থাকে। এই সব মানুষকে বলে Rh-পজিটিভ (Rh+)। কিন্তু যাদের নেই তারা Rh– নেগেটিভ (Rh–)। যদি Rh– কোনো ব্যক্তিকে Rh+ রক্ত দেওয়া যায়, তাহলে তাদের রক্তের মধ্যে অ্যান্টি Rh ফ্যাকটর তৈরি হয়। প্রথম বারে তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না কিন্তু দ্বিতীয় বারে Rh+ রক্ত দিলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। গ্রুপ যদি নেহাতই না মেলে তবে গ্রুপ O এবং Rh– রক্ত দেওয়া সব চেয়ে নিরাপদ।

রোগ-জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমাদের শরীরে কি ব্যবস্থা আছে?

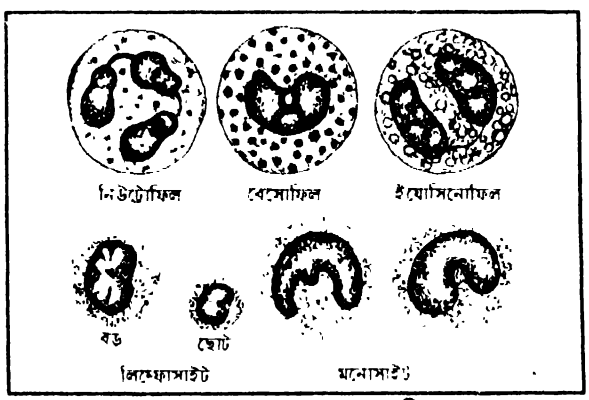
চারপাশের ধুলোবালিতে, বাতাসে, জলে রয়েছে অসংখ্য রোগ-জীবাণু আর অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ। এরা আমাদের শরীরে মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়ে। এদের হাত থেকে শরীর নিজেকে বাঁচায় কি ভাবে?

মুখ, চোখ, পাকস্থলীর মত শরীরে কয়েকটি অঙ্গ নিজেরাই নিজেদের আত্মরক্ষায় ওস্তাদ। চোখের অশ্রুগ্রন্থি (Lacrimal gland)-এর অশ্রু চোখকে ধুয়ে দেয়। এ-ভাবে ধুলোবালি দূর হয়। এ-ছাড়া অশ্রুতে আছে লাইসোজাইম (Lysozyme)। তা রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে। মুখের লালা গ্রন্থি থেকে বেরোনো লালা আর পাকস্থলীর থেকে বেরোনো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাবারের সঙ্গে রোগ-জীবাণু ঢুকলে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

এ-ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গকে বাঁচানোর জন্যে বহু সৈনিক আমাদের শরীরে আছে। প্রথমেই স্নায়ুতন্ত্র প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাহায্যে ক্ষতিকারক উদ্দীপক থেকে আমাদের বাঁচায়। রক্তের শ্বেত কণিকারা রোগ-জীবাণুর সঙ্গে লড়াই ক'রে তাদের ধ্বংস ক'রে ফেলে। যে-সব অঙ্গ রোগের সঙ্গে লড়াই করে, তারা হল যকৃৎ, প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি (Lymph node), টনসিল (Tonsil), থাইমাস (Thymus), ক্ষুদ্রান্ত্রের লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থি মজ্জা (Red bone marrow)। এই সব অঙ্গ থেকেই শ্বেত কণিকা বা রোগ-জীবাণুর সঙ্গে লড়াইয়ের উপযোগী অন্যান্য কোষ, যেমন, রেটিকুলো এণ্ডোথেলিয়াল কোষ বা ম্যাক্রোফেজ তৈরি হয়।

রক্ত কি ভাবে প্রতিরক্ষার কাজ করে?

আমাদের কখনো কখনো অসুখ করে। সে-অসুখ আবার সেরেও যায়। অসুখ সারানোর জন্যে ওষুধ খাওয়ার

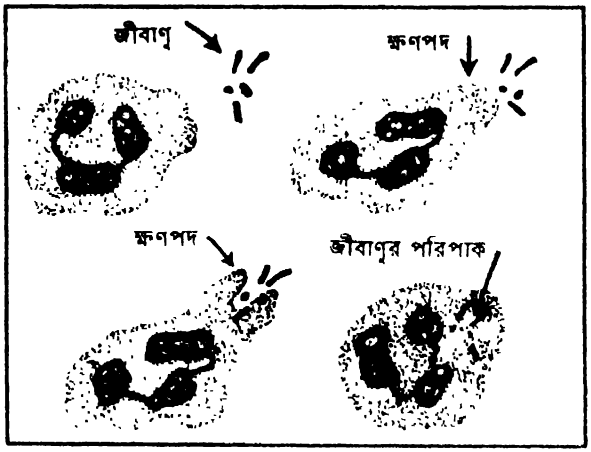


রক্তের নানা রকমের শ্বেত কণিকা

দরকার। কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতরেই রোগের সঙ্গে

লড়াই করার মত সৈনিক আছে। এদের মধ্যে প্রধান এক দল সৈনিক রক্তের শ্বেত কণিকা।

তবে এদের মধ্যে দু'টি দল দু' ভাবে রোগ-জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে। শ্বেত কণিকাদের অনেক ভাগ আছে। নিউট্রোফিল নামে এক ধরনের শ্বেত কণিকা আছে। এরা



নিউট্রোফিলের আগ্রাসন পদ্ধতি

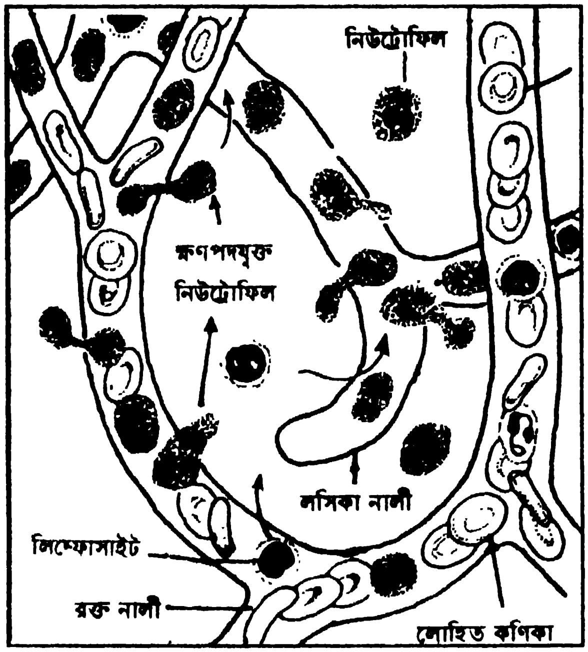
রোগ-জীবাণুকে আগ্রাসন (Phagocytosis) পদ্ধতিতে ধ্বংস করে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে তারা জীবাণুটিকে ঘিরে ধরে, পরে তাকে পরিপাক ক'রে ধ্বংস ক'রে ফেলে, অর্থাৎ স্রেফ খেয়ে নেয়।

লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) নামে আর এক ধরনের শ্বেত কণিকারা অন্য ভাবে রোগের সঙ্গে লড়াই করে। রোগ-জীবাণুর দেহ থেকে যে-বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) বেরোয় বা আমাদের শরীরের পক্ষে যে-সব বস্তু আগন্তুক (Foreign bodies) অর্থাৎ বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকেছে—তাদের বলে অ্যান্টিজেন (Antigen)। এই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে লিম্ফোসাইটরা এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় বস্তু তৈরি করে। এদের নাম অ্যান্টিবডি (Antibody)। এরা অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস ক'রে ফেলে বা তার কার্যক্ষমতা নষ্ট ক'রে দেয়।

পুঁজ কেন হয়?

কোথাও কেটে গেলে ক্ষতস্থান অনেক সময়ে পুঁজ জমা হয়। পুঁজ দেখতে আমাদের ঘেন্না করে। কিন্তু পুঁজ আসলে কি জানলে বোধ হয় আর ঘেন্না করার কারণ থাকবে না।

কোনো কাটা জায়গায় রোগ-জীবাণুর আক্রমণে ওই জায়গায় ঘা বা ক্ষত হয়। এই ক্ষতের মধ্যে যে-সাদা বা হলদেটে ঘন তরল পদার্থ থাকে তাকেই আমরা পুঁজ বলি।



জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত স্থানে রক্ত নালিকা ও লসিকা নালী থেকে শ্বেত কণিকা একইভাবে বেরিয়ে আসে (ডায়াপেডেসিস্ পদ্ধতি)

এই পুঁজ আর কিছুই নয়—মৃত শ্বেত কণিকা, মৃত বা জীবিত রোগ-জীবাণু আর ক্ষতস্থানের মৃত কলা বা টিস্যু।

শরীরের কোনো কাটা জায়গায় রোগ-জীবাণু আক্রমণ করলে সেখানে রক্তজালিকার (Blood capillary) ও লসিক জালিকার (Lymph capillary) ভেতর থেকে শ্বেত কণিকা নিউট্রোফিল বেরিয়ে আসে। এই পদ্ধতিকে ডায়াপেডেসিস্ (Diapedesis) বলে। তারা ওই রোগ-জীবাণুকে ঘিরে ফেলে এবং গ্রাস ক'রে নেয়। এই ভাবে জীবাণু ধ্বংসের

পুঁজ কখন হয়

পদ্ধতিকে বলে ফ্যাগোসাইটোসিস। আবার গিলে ফেলা জীবাণুর দেহ থেকে বেরোনো টক্সিনের প্রভাবে নিউট্রোফিলরাও মারা পড়ে। নিউট্রোফিলরা রোগ-জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য স্ববিভাজন পদ্ধতিতে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে নেয়। অর্থাৎ একটা কোষ বারবার ভাগ হয়ে বহু কোষ তৈরি করে। পুঁজে এ-জন্যে প্রচুর মৃত নিউট্রোফিল পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিষেধক টিকা কি?

আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য রকমের রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ও ভাইরাস (Virus)। আমরা এদের বলি রোগ-জীবাণু। এই জীবাণুরা মানুষের দেহে প্রবেশ করলে শুধুমাত্র রোগের সৃষ্টি করে না, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমরা বিভিন্ন রকমের রোগ প্রতিষেধক টিকা নিয়ে থাকি, যাতে রোগ না হতে পারে।

মানুষের শরীরে সবসময়েই এক প্রকারের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্তমান। এই ক্ষমতা আমরা পেয়েছি মায়ের রক্তের মাধ্যমে বা পরিবেশের রোগ-জীবাণু থেকে। স্বাভাবিক অবস্থায় যদি অতি অল্প সংখ্যক রোগ-জীবাণু (যে সংখ্যা বা মাত্রা দেহে রোগের প্রকাশ ঘটাতে অক্ষম) মানুষের শরীরে ঢুকে পড়ে তবে রক্তের লিম্ফোসাইট রক্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি করে ফেলে। একই রোগ-জীবাণু (অ্যান্টিজেন) যদি আবার শরীরে ঢুকে পড়ে তবে ওই অ্যান্টিবডি তাদের আক্রমণ ক'রে ধ্বংস ক'রে দেয়। মানুষের শরীরের এই ক্ষমতাকে বলে অনাক্রম্যতা (immunity)। প্রতিষেধক টিকা তৈরি হয়েছে আমাদের এই অনাক্রম্যতা বা অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির লড়াইকে ভিত্তি ক'রে।

প্রতিষেধক টিকা কী ভাবে রোগের আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে?

প্রতিষেধক টিকা হিসাবে সাধারণত অল্প সংখ্যক মৃত রোগ-জীবাণু, অল্প ক্ষমতার জীবিত রোগ-জীবাণু বা রোগ-জীবাণুর মধ্যকার বিষ (Toxin) নিষ্ক্রিয় ক'রে মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই টিকা অ্যান্টিজেন হিসেবে শরীরে সত্যিকারের রোগ জীবাণুর আক্রমণ হলে সেই জীবাণুকে সহজেই ধ্বংস ক'রে ফেলে অর্থাৎ প্রতিষেধক টিকা নেওয়ার ফলে মানুষের শরীরে অর্জিত অনাক্রম্যতা (Acquired immunity) ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

যখন মৃত অথবা অল্প ক্ষমতার রোগ-জীবাণু তরলে মিশিয়ে টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে ভ্যাকসিন (Vaccine) বলে, যেমন কলেরা বা বসন্ত রোগের ভ্যাকসিন। আর যখন রোগ-জীবাণুর দেহের বিষকে নিষ্ক্রিয় ক'রে টিকা হিসাবে দেওয়া হয়, তাকে বলে টক্সয়েড (Toxoid), যেমন, টিটেনাস।

খিদে পায় কেন?

অনেকক্ষণ না খেলেই খিদে পায়। তখন খাদ্য চাই, যে-খাদ্য শরীরকে জোগাবে পুষ্টি আর শক্তি। কিন্তু খিদে পায়. কি ভাবে?

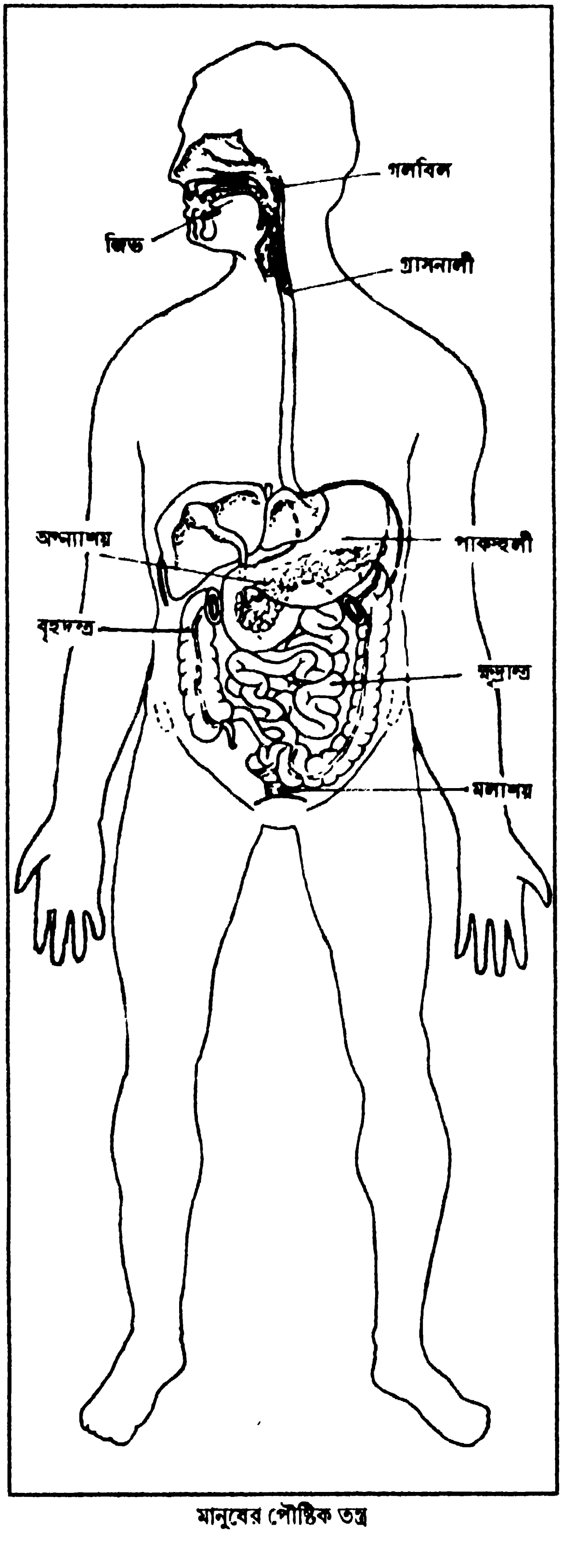
শরীরের নিজস্ব খিদে আছে। এই খিদে জন্মগত। খিদের অনুভূতি বা যে-পদ্ধতিতে শরীর এই খিদেব কথা জানিয়ে দেয় তাকেই আমরা বলি খিদে পাওয়া। আমাদের মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশের নাম হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)। এখানে আছে ভোজন-কেন্দ্র (Feeding centre) যা খিদের অনুভূতি জাগায়। ভোজন-কেন্দ্রকে পরিচালনা করে হাইপোথ্যালামাসের আর একটি অংশ যার নাম পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র (Satiety centre)। পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র ভোজন-কেন্দ্রের কাজকর্ম দেখাশুনা করে, অর্থাৎ কখন খিদে পাওয়া দরকার, কতটা খাওয়া উচিত—এই সব কাজ তার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

শরীরে খাবারের ঘাটতি দেখা দিলে রক্তে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমে যায়। রক্তে শর্করা কম থাকলে পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র ভোজন-কেন্দ্রের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ তুলে নেয়। ভোজন-কেন্দ্রের উত্তেজনা বাড়ে, আমাদেরও খিদের অনুভূতি আসে। খাবার পরে রক্তে শর্করা বেড়ে যায়। পাকস্থলীর মধ্যে খাবারের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছোলে পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র ভোজন-কেন্দ্রের ওপরে বিধি-নিষেধ চাপায়। ভোজন-কেন্দ্রের উত্তেজনা তখন কমে। আমাদের খিদেও চলে যায়।

ভোজন-কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে কে?

ভোজন-কেন্দ্র থেকে নার্ভ দিয়ে খিদের খবর পৌঁছোয় লালা-গ্রন্থি ও পাকস্থলীতে। ফলে, পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন বাড়ে। একে বলে ক্ষুধা সংকোচন (Hunger contraction)। আর লালা-গ্রন্থি ও পাকস্থলীতে পাচক রস বেশি ক'রে বেরোয়।

খিদে পাওয়া আমাদের জন্মগত অনুভূতি। শিশু বা বোধবুদ্ধিহীন মানুষও খিদে পেলে কষ্ট পায়, কান্না শুরু



মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্র

করে। আবার শরীরের চাহিদা ছাড়াও ভাল খাবার দেখলে বা তেমন গন্ধ নাকে এলে অনেক সময়ে খিদেটা চাড়া দিয়ে ওঠে। আবার কেউ যদি রোজ একই সময়ে খাবার খান, তবে তাঁর ওই সময়তেই খিদে পাবে।

বদহজম কখন হয়?

বিয়েবাড়িতে ভরপেট খেয়ে অনেক সময়ে আমাদের শরীরটা ভার লাগে, মুখে বলি বদহজম হয়েছে। বদহজম হওয়া বলতে আসলে কি বোঝায়?

আমরা যে-সব খাবার খাই তার পরিপাক বা হজম হয় পৌষ্টিক নালীতে। আমাদের এই পৌষ্টিক নালী কিন্তু লম্বায়

আমাদের পৌষ্টিক নালী লম্বায় কতটা?

কম নয়—৯.৭৫ মিটার। পৌষ্টিক নালীর প্রথম অংশ গ্রাসনালী, তার পরে পাকস্থলী, অন্ত্র এবং মলাশয়। অন্ত্রের আবার দু'টি অংশ—ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশটা পাকানো থাকে বলেই এত বড় লম্বা জিনিসটা পেটের ভেতর ধরে। এর নানা অংশের গঠন আলাদা; বিভিন্ন অংশ থেকে যে পৌষ্টিক রস বেরোয় তাদের কাজ-কর্মও কিছুটা আলাদা, কিন্তু তাদের কাজ একটি সুনির্দিষ্ট ছন্দে বাঁধা থাকে। এদের মিলিত কাজ আমাদের হজমে সাহায্য করে।

পৌষ্টিক তন্ত্রের প্রধান কাজগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—খাদ্যগ্রহণ, অর্থাৎ সোজা কথায় খাবার খাওয়া; পরিপাক, মানে খাবারের জটিল অণুকে সরল অণুতে ভাঙা; খাদ্যনালী থেকে পরিপাক হওয়া খাবার রক্তে শোষণ; পরিপাক না হওয়া অদরকারী অংশ দেহ থেকে বের ক'রে দেওয়া। এই কাজগুলির মধ্যে যে কোনো একটিতে গোলোযোগ দেখা দিলেই পৌষ্টিক তন্ত্রের মূল লক্ষ্য হজমে ব্যাঘাত ঘটে।

খাদ্যনালীর নিজস্ব গোলযোগ ছাড়াও আরো নানা কারণে বদহজম হয়। যেমন, ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অনিয়মিত ও বেশি খাওয়া এবং এর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বা হজম হওয়া শক্ত এমন খাদ্য গ্রহণও আছে। অনেক সময়ে

লালাগ্রন্থি, পাকস্থলী বা অন্ত্র থেকে বেরোনো জারক রস (Digestive juice) বা যকৃৎ থেকে বেরোনো পিত্তরসের (Bile) হার অস্বাভাবিক হয়ে যায়। জারক রসের উৎসেচক বা এনজাইম খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। আর পিত্তরস প্রধানত চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিপাকে ভূমিকা নেয়। এ-জন্য এগুলির গোলোযোগেও বদহজম হয়ে থাকে।

বমি কখন হয়?

খাওয়ার গণ্ডগোল হলে অনেক সময়ে বমি হয়ে থাকে। পাকস্থলীর ভেতরের খাবার জোর ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসাকে আমরা বলি বমি করা। পাকস্থলীতে যদি কোনো উত্তেজক বস্তু থাকে কিংবা পৌষ্টিক নালীর অন্য কোনো অংশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বা বদহজম হলে বমি হতে পারে। এ-ছাড়া দুর্গন্ধ, মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত দোলানি এ-সবও বমির কারণ হওয়া সম্ভব।

কিন্তু বমি কেন হয়?

বমি হওয়া এক ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া। পাকস্থলীতে বা পৌষ্টিক নালীর অন্যান্য অংশে বমি পাওয়ানোর মত যদি কোনো উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, তাহলে তা গিয়ে পৌঁছোয় মস্তিষ্কের বমন কেন্দ্রে। আবার যে-সব পেশীর সংকোচন বমিতে সাহায্য করে, বমন কেন্দ্র উত্তেজিত হলে তাদেরও উত্তেজিত ক'রে তোলে। বমির সাহায্যে উত্তেজক বস্তু পৌষ্টিক নালী থেকে বেরিয়ে যায়।

বমির সময়ে স্বররন্ধ্র বা গ্লটিস বন্ধ হয়ে যায়, নয়তো শ্বাসনালীতে বমি ঢুকে গিয়ে দম বন্ধ হতে যেতে পারে। বমি হবার আগে লালা বেরোনো বেড়ে যায়। ক্ষুদ্রান্তের বিপরীত গতির চলনও বেড়ে যায়। অনেক সময় ক্ষুদ্রান্তের মধ্যকার অর্ধ-পাচ্য খাবার জোর করে আবার পাকস্থলীতে ঢুকে পড়ে। তখন গা-গুলোতে শুরু করে। একে বলে গা-বমি (Nausea)। তখন পাকস্থলী মাঝের অংশ বা বডি শিথিল হয়ে পড়ে। পাকস্থলী আর গ্রাসনালীর মধ্যে যে আংটা (Sphincter) থাকে তা খুলে যায়; অন্য দিকে পাকস্থলী আর ক্ষুদ্রান্তের মাঝের আংটা বন্ধ থাকে আর পাকস্থলীর শেষ অংশ (Pylorus) সংকুচিত হয়। এতে পাকস্থলীর খাবারের ওপর চাপ পড়ে। যে-সব পেশী শ্বসনে সাহায্য করে সেই সব পেশী, সেই সঙ্গে বুক আর পেটের মাঝের পার্টিশন অর্থাৎ মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) আর পেটের পেশী সংকুচিত হয়। পাকস্থলীর ওপরে আরো চাপ পড়ে। সে-চাপ ওপর দিকে ঠেলা মারে। আর পাকস্থলীর মধ্যের খাবার জোর ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

তেষ্টা পায় কেন?

অনেকক্ষণ জল না খেলে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। একটু জলের জন্যে মনটা আনচান করে। গ্রীক উপকথায় ট্যাণ্টালাস নামে একজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল—এক গলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে জল খেতে পাবে না। এ-এক ভীষণ শাস্তি। জল না খেলে কষ্ট হয়, তেষ্টা পেতে থাকে—কিন্তু কেন এই তেষ্টা পায়?

আমাদের শরীরের ওজনের শতকরা ৭০ ভাগ জল। রক্তের মধ্যেও ৯০ শতাংশ জল থাকে। এই জল সব সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকা চাই। শরীরে বা রক্তে জলের পরিমাণ খুব বেশি বা কমে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়। শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় থাকে জলের ত্যাগ ও গ্রহণের মধ্যে সমতা রেখে। বাড়তি জল প্রস্রাব বা ঘাম হিসেবে, অথবা জলীয় বাষ্প হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আবার শরীরে যখন জলের ঘাটতি হয়, তখন সে ঘাটতি পূরণের জন্য জল খেতে হয়। অবশ্য জলীয় পদার্থ, এমন কি খাবার থেকেও শরীর কিছুটা জল সংগ্রহ করে।

রক্তে এবং কলার মাঝে যে-জলীয় পদার্থ থাকে তাতে জলের পরিমাণ খুব কমে গেলে নুন এবং অন্যান্য জৈব পদার্থের ঘনত্ব বেড়ে যায়। এর প্রভাবে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত তৃষ্ণা-কেন্দ্র (Thirst centre) উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের তেষ্টা পায়।

টক ঝাল মিষ্টির স্বাদ বুঝি কি ক'রে?

কেউ টক খেতে ভালবাসে, কেউ মিষ্টি, কেউ বা ঝাল। শরীরের জন্যে ভাল হলেও, তেতোটা আবার কেউ কেউ পছন্দ করে না। খাবারের এই সব স্বাদ আমরা জিভের সাহায্যে বুঝি। কিন্তু জিভ তা বোঝে কেমন ক'রে?

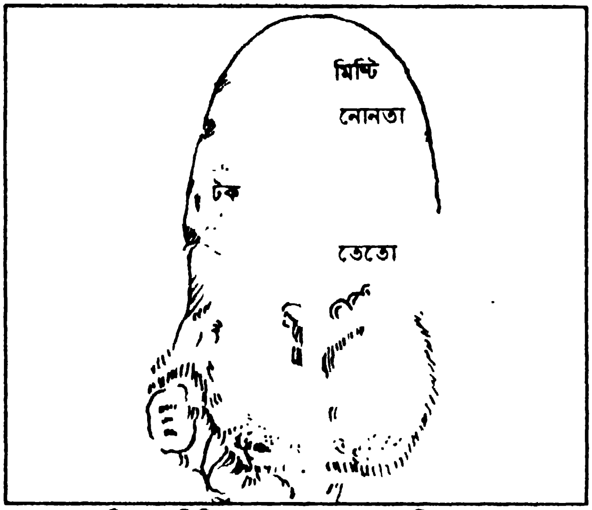
জিভ আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের একটি। জিভের মধ্যে আছে স্বাদের অনুভূতি গ্রহণের জন্যে অসংখ্য গ্রাহক।

এদের বলে স্বাদ-কুঁড়ি (Taste bud)। জিভে চার রকমের স্বাদ-কুঁড়ি আছে—মিষ্টি, টক, তেতো আর নোনতা। এ-ছাড়া অন্য যে সব স্বাদ তা বোঝার জন্যে দু'টি বা তার বেশি স্বাদ-কুঁড়ি এক সঙ্গে কাজ করে। তাদের মিশ্র উত্তেজনা ওই বিভিন্ন স্বাদের অনুভূতি এনে দেয়।

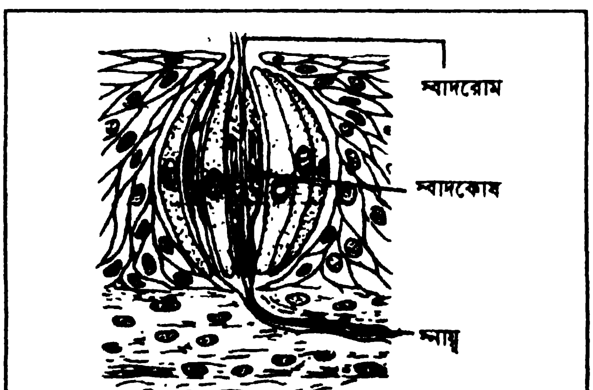
জিভের ডগার দিকে মিষ্টি এবং তার ঠিক পেছনে অর্থাৎ জিভের মাঝামাঝি জায়গায় নোনতা স্বাদ বোঝার জন্যে স্বাদ-কুঁড়ি থাকে। জিভের দু'পাশে টক আর একেবারে

ছোটরা চেটে চেটে মিষ্টি খায় কেন?

পেছনে দিকে তেতোর স্বাদ বোঝার নির্দিষ্ট স্বাদ-কুঁড়ি আছে। এইজন্যে দেখা যায়, বাচ্চা ছেলেরা মিষ্টি খায় চেটে চেটে, গালের পাশে রেখে তারিয়ে তারিয়ে আচার খেতে



জিভের বিভিন্ন অংশে স্বাদের অনুভূতির স্থান



স্বাদ-কুঁড়ি

ভালবাসে, আবার তেতো খেলে অনেকক্ষণ গলার কাছটা তেতো ভাব নিয়ে মুখ ব্যাজার ক'রে থাকে।

স্বাদ-কুঁড়ি কতটা অনুভূতি নেবে তা কয়েকটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। ওই খাবারের যে-পদার্থ স্বাদের জন্য দায়ী তা কতটা আছে, তার রাসায়নিক আকার কেমন, গ্রাহক কোষের মধ্যে ঢোকার ক্ষমতা কতটা—এ-সব কিছুই স্বাদের অনুভূতি বাড়ায় বা কমায়। যেমন টক মানেই অ্যাসিড। অ্যাসিডে কতটা হাইড্রোজেন আয়ন আছে তার ওপর তার টক স্বাদের তীব্রতা নির্ভর করে। জৈব অ্যাসিডে, যেমন, তেঁতুলের বা টারটারিক অ্যাসিডের গ্রাহক কোষের মধ্যে ঢোকার ক্ষমতা বেশি বলে, বেশি টক লাগে।

ঝাল কিন্তু কোনো রকমের স্বাদই নয়। কেবল তাপমাত্রার পরিবর্তন, স্পর্শ ও কম-বেশি ব্যথার অনুভূতির সংমিশ্রণই হল ঝাল স্বাদের কারণ। এমনিতেই আমাদের

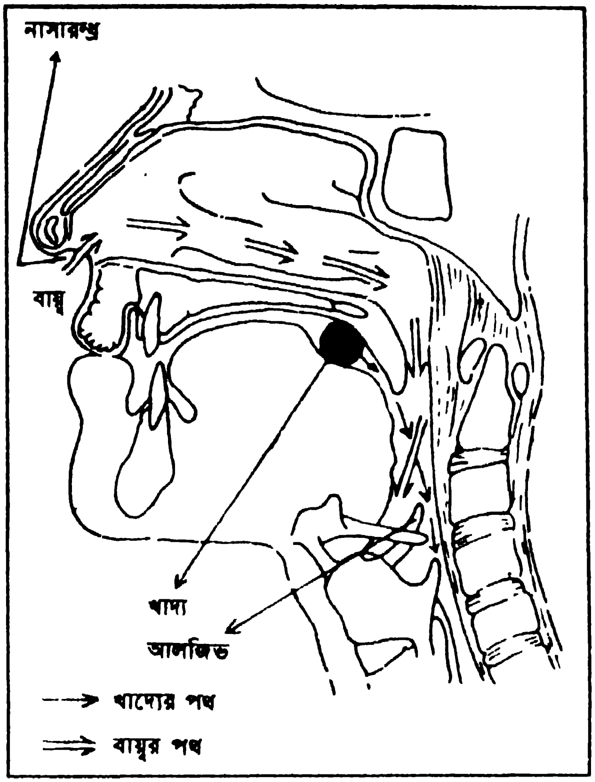
তেঁতুল বেশি টক লাগে কেন?

স্বাদ গ্রহণ এক মিশ্র অনুভূতি। জিভের স্বাদ-কুঁড়ির উত্তেজনা ছাড়াও খাবারের গন্ধ, তাপমাত্রা, স্পর্শ সব মিলেমিশে তৈরি হয় স্বাদ।

বিষম লাগে কেন?

তাড়াহুড়ো ক'রে খাওয়ার সময়ে বা একমুখ খাবার নিয়ে কথা বলতে পেলে বা হাসি পেলে অনেক সময়ে সাংঘাতিক বিষম লাগে। দম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এমনটা হওয়ার কারণ কি?

গলার মধ্যে যে পথ দিয়ে বাতাস ও খাবার একসঙ্গে প্রবেশ করে তাকে বলে গলবিল (Pharynx)। গলবিল গলার উপরের অংশ। এই অংশের পরেই বাতাস ও খাবারের যাত্রাপথ সম্পূর্ণ আলাদা। বাতাস যে ছিদ্র দিয়ে শ্বাসনালী (Trachea)-তে প্রবেশ করে তাকে বলে স্বররন্ধ্র (Glottis)। এই স্বররন্ধ্রের পিছনে শ্বাসনালীতে আছে কথা বলার বাক্স বা স্বরযন্ত্র (Larynx)। স্বররন্ধ্রটির পথে বাতাস যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে উপজিহ্বা (Epiglottis)। একে আমরা চলিত কথায় বলি আলজিভ। বাতাস শ্বাসনালীতে ঢোকার সময় রন্ধ্রপথ খুলে যায়। পরক্ষণেই বন্ধ হয়ে যায়।



প্রশ্বাস বায়ু ও খাদ্যের যাতায়াতের পথ

আবার নিঃশ্বাস ছাড়ার সময়ে ওই ছিদ্রের মুখ একই ভাবে খোলে। এই ভাবে খোলা আর বন্ধ হওয়ার কাজ চলে।

যতটা সময় গ্রাসনালীতে অর্থাৎ পৌষ্টিক নালীর একেবারে ওপরের অংশে খাবার থাকে ততক্ষণ স্বররন্ধ্র বন্ধ ক'রে রাখে আলজিভ। খাবার গেলার সময়ে কোনো বাধা পেলে ওই ছিদ্রটি ঠিক মত বন্ধ হয় না। তখন খাবারের কণা অনেক সময়ে স্বররন্ধ্রে ঢোকার চেষ্টা করে বা ঢুকে পড়ে। শ্বাসনালীতে এই অবাঞ্ছিত খাবারের উপস্থিতি স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে। তখন জোর ক'রে সেই খাবারের কণা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাহায্যে গ্রাসনালীতে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। খাবারের কণা যে-উত্তেজনার সৃষ্টি করে তার প্রভাবে আর প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফলে গ্রাসনালীর এবং স্বরযন্ত্রের পেশী জোরে সংকুচিত হয়। এতে গলার মধ্যে যে-অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটাকেই আমরা বলি বিষম লাগা।

কাশি কেন হয়?

ঠাণ্ডা লাগলে তো কাশি হয়ই, বিষম লাগলেও আমরা কাশতে থাকি। নাকে ঝাঁঝালো কিছু ঢুকে পড়লেও কাশি শুরু হয়। কাশি হওয়ার কারণ কি?

কাশি এক রকমের প্রতিবর্তী ক্রিয়া যা আমাদের ফুসফুসকে বাঁচাতে সাহায্য করে। আমাদের শ্বাসনালী বাতাস ছাড়া কোনো অবাঞ্ছিত জিনিস সহ্য করতে পারে না। ধুলো-বালি, খাবার, ঝাঁঝালো গ্যাস—এ-রকম কিছু নাকে ঢুকলেই তা ফুসফুসে ঢোকার আগে জোর ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে বের ক'রে দেওয়ার চেষ্টা চলে। ফুসফুসকে খুব সহজেই রোগ-জীবাণু বা ক্ষতিকারক গ্যাস আক্রমণ করতে পারে। তাই এই সব অবাঞ্ছিত জিনিস ঢুকলেই স্বরযন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লির উত্তেজিত স্নায়ু এই খবর পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কের মেডালা (Medulla) নামে বিশেষ অংশে। কাশি হবার ঠিক আগে স্বররন্ধ্র আলজিভ দিয়ে বন্ধ থাকে। ফলে ফুসফুসের ভেতরে বাতাস জমা হয়ে চাপের সৃষ্টি হয়। সমস্ত শ্বাস-পেশী (Respiratory muscles) সংকুচিত হয়ে ফুসফুসের মধ্যেকার বাতাসের চাপ আরো বৃদ্ধি করে। কাশির সময় আলজিভ হঠাৎ স্বররন্ধ্রের মুখ খুলে দেয়। ভিতরের বাতাস বেগে বাইরে বেরিয়ে আসে। কাশির দমকে ওই অবাঞ্ছিত জিনিস শ্বাসনালী থেকে বেরিয়ে যায়।

অনেক সময়ে রোগ-জীবাণুর আক্রমণে বা শ্বাসনালী অথবা ফুসফুসে অস্বস্তিকর জিনিসের ছোঁয়ায় ওই জায়গা থেকে শ্লেষ্মা (Mucus) বেরোয়। ওই শ্লেষ্মা শ্বাসনালী বা ফুসফুসকে সরাসরি ক্ষতিকর বস্তুর সংস্পর্শে আসতে দেয় না। শ্লেষ্মা জমা হয়েও কাশি শুরু হয় এবং শ্লেষ্মার সঙ্গে ক্ষতিকর পদার্থ শরীরের বাইরে চলে যায়।

মেয়েদের গলার স্বর মিষ্টি হয় কেন?

ছোট ছেলে আর মেয়েদের গলার স্বরে কোনো তফাত সাধারণত বোঝা যায় না। বয়ঃসন্ধির সময় থেকে ছেলেদের গলার স্বর বেশ ভারী, গম্ভীর হতে থাকে। প্রথমে গলার স্বর ভাঙে। পরে আস্তে আস্তে গভীর, গম্ভীর হয়ে যায়। মেয়েদের গলার স্বর কিন্তু বেশি পালটায় না। মিষ্টিই থাকে। কিন্তু ছেলেদের স্বর পালটায় কেন?

বয়ঃসন্ধির সময়ে ছেলেদের শরীরে এক বিশেষ ধরনের হরমোন বেরোয় যার নাম অ্যান্ড্রোজেন (Androgen)। সমস্ত পুরুষালি বৈশিষ্ট্য, যেমন, গোঁফ-দাঁড়ি বেরোনো,

গলার স্বর ভারি হওয়ার জন্য এই হরমোনই দায়ী।

আমরা কথা বলি স্বরযন্ত্রের সাহায্যে। স্বরযন্ত্রের মধ্যে আছে স্বরপর্দা (Vocal cord)। এদের কম্পনের ফলে বায়ু-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই বায়ু-তরঙ্গই শব্দ বা স্বরের সৃষ্টি করে। কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা, শব্দের এক বিশেষ ধর্মের ওপরে নির্ভরশীল। একে বলে তীক্ষ্ণতা (Pitch)। তীক্ষ্ণতা আবার নির্ভর করে শব্দের কম্পাঙ্কের ওপরে।

অ্যান্ড্রোজেন ছেলেদের স্বরযন্ত্রের আয়তন বাড়ায় এবং

বয়ঃসন্ধির সময়ে ছেলেদের গলার স্বর পালটায় কেন?

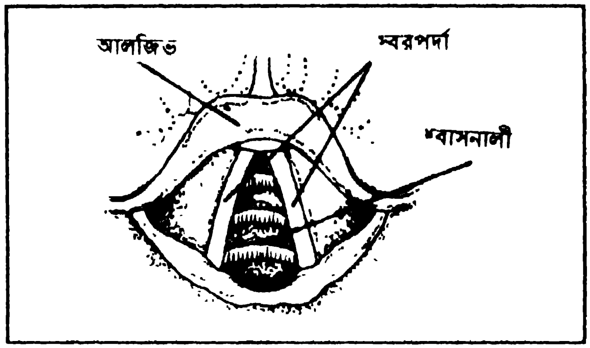
স্বরপর্দাকে অনেক পুরু আর দীর্ঘ করে। ফলে তাদের কম্পাঙ্ক অনেক কম হয়। ছেলেদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সময়ে কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে ১২০ বার, যেখানে মেয়েদের কম্পাঙ্কের সংখ্যা ২৫০। তাই মেয়েদের গলার স্বরের তীক্ষ্ণতা বেশি। আবার শব্দ কতটা জোর হবে তা নির্ভর করে যে ধর্মের ওপরে, তাকে বলে প্রাবল্য (Loudness)। এই প্রাবাল্যও কম্পাঙ্কের এবং শব্দ-তরঙ্গের বিস্তারের (Amplitude) ওপরে নির্ভর করে।

অ্যান্ড্রোজেনের প্রভাবেই ছেলেদের গলার স্বর গভীর এবং গম্ভীর শোনায়। মেয়েদের দেহে এই হরমোনের প্রভাব অনেক কম থাকায় তাদের স্বরযন্ত্রের আকার ও গঠন পালটায় না। আর কণ্ঠস্বরের কম্পাঙ্ক ছেলেদের তুলনায় বেশি হয় বলে তাদের গলা মিষ্টি শোনায়।

তোতলামি কেন হয়?

কথা বলতে গেলে অনেকের কথা আটকে যায়। অনেকের আবার কথা বলার সময়ে একটা বর্ণ বা পুরো একটা কথা বারবার বেরোতে থাকে। আমরা তাদের তোতলা বলি। কিন্তু তোতলামি কেন হয়?

কথা বলার সময়ে দু'টি পদ্ধতি আমাদের সাহায্য করে। এক, স্বরযন্ত্রের স্বরপর্দার সাহায্যে বাতাসের কম্পন ও শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি (Phonation); দুই, ঠোঁট, জিভ, মুখবিবর, তালু প্রভৃতির সাহায্যে শব্দের উচ্চারণ (Articulation)। কথা বলার জন্যে মুখের বিভিন্ন অংশ একযোগে নড়াচড়া করে।



মানুষের স্বরযন্ত্র

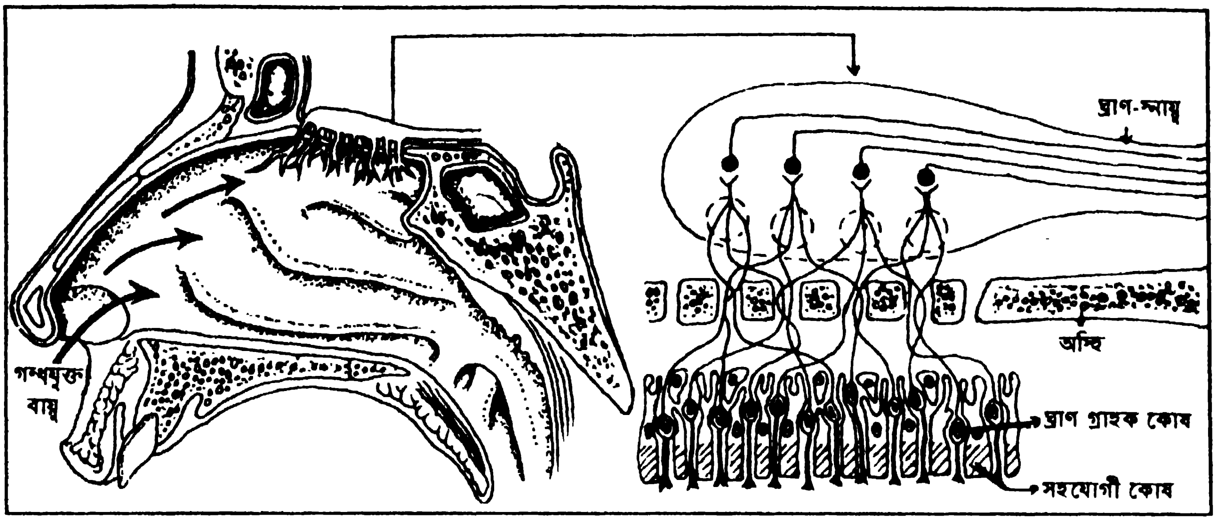
প্রধানত উচ্চারণে মুখের যে-সব পেশী সাহায্য করে তাদের সংকোচনের অস্বাভাবিকতার জন্যে তোতলামি হয়। নানা মানসিক কারণে পেশী সংকোচন অস্বাভাবিক হয়—দৃঢ়তার অভাবের জন্য তা হওয়া সম্ভব। আবার লজ্জা, ভয়, তাড়াতাড়ি কথা বলার চেষ্টা এ-সব কারণেও পেশী সংকোচন অস্বাভাবিক হতে পারে। পেশীর অস্বাভাবিক সংকোচনে শব্দের ঠিক মত উচ্চারণে বাধা পড়ে। শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য পেশীগুলোর সূক্ষ্ম নড়াচড়ার দরকার।

আবার মস্তিষ্কে যে কথা বলার কেন্দ্র (Speech centre) আছে সেখানে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা দিলেও কথা বলার পেশীগুলোর সূক্ষ্ম নড়াচড়ায় বাধা পড়তে পারে। ফলে তোতলামি দেখা দেয়।

জন্মগত কালারা বোবা হয় কেন?

জন্মেই কেউ কথা বলে না। বাচ্চারা শুধুই কাঁদে। পরে দু' একটা অর্থহীন শব্দ তাদের মুখ দিয়ে বেরোয়। তার পরে দু' একটা ভাঙা আধো আধো ভুল কথা বলে। এই ভাবেই সে আস্তে আস্তে কথা বলা শেখে।

কথা বলা শেখার ব্যাপার। এর জন্যে আগে কথা শোনা দরকার। সুতরাং স্বাভাবিক শোনার ক্ষমতা কথা বলার জন্যে খুবই দরকার। শিশু যখন কোনো শব্দ শোনে তখন সে প্রথমে তার মানে না বুঝেই পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করে। প্রথমে ভুল বলে। পরে শুনে শুনে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে। এর পরে যে কোনো শব্দ শুনে শিশু তার মানে বোঝার আর ওই শব্দ যাকে নিয়ে বা যে-জিনিসটিকে নিয়ে, তার সঙ্গে শব্দটিকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তার পরে



মানুষের ঘ্রাণ অনুভূতির স্থান ও আকৃতি

চলে শব্দটি উচ্চারণের চেষ্টা। কথা বলার সময়ে স্বরযন্ত্রের স্বরপর্দার সাহায্যে বাতাসের কম্পন আর ঠোঁট, জিভ, দাঁত-তালু প্রভৃতি মুখের বিভিন্ন অংশের মিলিত চেষ্টায় শব্দের সৃষ্টি হয়। যে-সব শিশু কালা, কোনো কথা তারা শুনতে পায় না বলে কথা তারা আর বলতেও পারে না। সুতরাং জন্মগত কালারা জন্মগত বোবা হবেই।

নানা রকম গন্ধ আমরা কি ভাবে পাই?

ফুলের গন্ধ বা সেন্টের গন্ধ আমাদের ভাল লাগে। আবর্জনার স্তূপের পাশ দিয়ে গেলে নাকে রুমাল চাপা দিই। মাংস রান্নার গন্ধ পেলেই বুঝতে পারি, তখন জিভে জল আসে। আমাদের নাক এত সব আলাদা গন্ধ বোঝে কি ভাবে?

নাক আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের একটি। নাকের মধ্যে রয়েছে গন্ধের অনুভূতি বোঝার জন্যে গ্রাহক বা রিসেপটর। এদের নাম ঘ্রাণ-গ্রাহক (Smell receptor)। গ্রাহক কোষের পাশে রয়েছে বাওম্যান গ্রন্থি (Bowman's gland)। গন্ধ-যুক্ত কোনো উদ্বায়ী অর্থাৎ সহজে বাষ্পীভূত হয়ে যায় এমন পদার্থ ওই গ্রাহক কোষগুলির সংস্পর্শে এলে বাওম্যান গ্রন্থি থেকে বেরোনো তরল, গন্ধযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থটিকে দ্রবীভূত করে। গ্রাহক কোষ ওই দ্রবীভূত পদার্থের সংস্পর্শে উত্তেজিত হয়। ওই উত্তেজনা স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে পৌঁছোয় মস্তিষ্কের ঘ্রাণ-কেন্দ্রে (Olfactory centre)। তখন অসামরা গন্ধ পাই।

আমরা প্রায় ২০০০ থেকে ৪০০০ রকমের গন্ধ আলাদা ভাবে বুঝতে পারি। কিন্তু কী ভাবে আমরা এটা বুঝি তার সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি। যদিও এই তফাত বোঝার জন্যে গ্রাহক কোষের সঙ্গে যুক্ত ঝিল্লির (Olfactory membrane) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত গন্ধযুক্ত পদার্থের রাসায়নিক গঠন, গন্ধের তীব্রতা, গন্ধযুক্ত পদার্থের গ্রাহক কোষের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা—এ-সবের পার্থক্যের জন্যেই আমরা গন্ধগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে বুঝতে পারি।

আমরা কত রকমের গন্ধ আলাদা ক'রে চিনতে পারি?

মানুষের ঘ্রাণ-শক্তি কুকুর, খরগোশ এ-রকম অনেক প্রাণীর তুলনায় খুবই দুর্বল।

হাঁচি হয় কেন?

নাকের মধ্যে কিছু ঢুকলে বা ঠাণ্ডা লাগলে আমরা হাঁচি। হাঁচি হয় কী ভাবে?

হাঁচি এক ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এই ক্রিয়া একেবারেই স্বয়ংক্রিয় এবং অনৈচ্ছিক। হাঁচির সময়ে মুখ ও নাক দিয়ে জোরে বাতাস বেরোয়। নাসারন্ধ্রের ভেতর কোনো ক্ষতিকারক বা অবাঞ্ছিত বস্তু ঢুকলে বা কোনো ঝাঁঝালো

গন্ধের প্রভাবে ঘ্রাণঝিল্লির গ্রাহক কোষগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এই উত্তেজনা পৌঁছোয় মস্তিষ্কের মেডালায় (Medulla) অবস্থিত হাঁচির স্নায়ু-কেন্দ্রে (Sneezing centre)। ওই কেন্দ্র থেকে নির্দেশ এসে পৌঁছোয় আর হাঁচির সৃষ্টি হয়। হাঁচির সময়ে প্রথমে জোরে শ্বাস নেওয়া হয়। তার পরে আলজিভ স্বররন্ধ্রের মুখ বন্ধ ক'রে দেয়। ফুসফুসের ভেতর বাতাসের চাপ বাড়ে। আর হঠাৎ আলজিভ খুলে যায়। নিঃশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে জোরে বাতাসের বেশিটাই নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে।

হাঁচির প্রধান কাজ হ'ল অবাঞ্ছিত বস্তু বা ঝাঁঝালো গন্ধের প্রভাব থেকে শ্বাসনালীকে বাঁচানো।

লজ্জায় মুখ লাল হয় কেন?

লজ্জা পেলে অনেকের মুখ লাল হয়। রেগে গেলেও অনেক সময়ে মুখ লাল হয়ে যায়। আবার বড়দের তুলনায় ছোটদের মুখ বেশি লাল হতে দেখা যায়—ছোটদের আবেগ চেপে রাখার ক্ষমতা কম বলেই এমনটা হয়। ছেলেদের

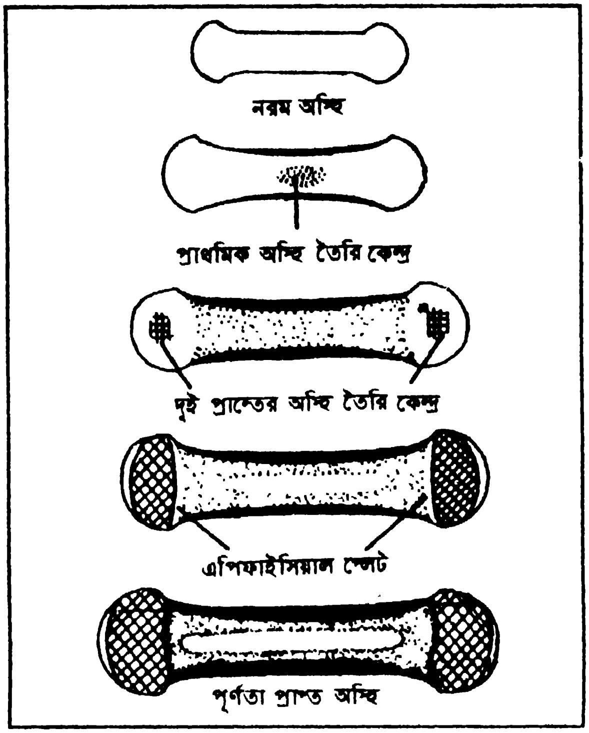
লজ্জায় কান কেন লাল হয়?

তুলনায় আবার মেয়েদের মুখও বেশি রাঙা হয়ে ওঠে। কারণ মেয়েরা সাধারণত একটু বেশি ভাবপ্রবণ। কিন্তু লজ্জায় বা রাগে মুখ রাঙা হয় কেন?

লজ্জা বা রাগের সময়ে শরীরে অ্যাডরেনালিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। এই হরমোন হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তপ্রবাহের হার, রক্তচাপ প্রভৃতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অ্যাডরেনালিন শরীরের সব জায়গায় রক্তনালীকে সংকুচিত করে, ব্যতিক্রম শুধু মুখের রক্তজালিকারা। মুখের রক্তজালিকারা প্রসারিত থাকায় গালে, কপালে, থুতনিতে, ঘাড়ে ও কানের কাছে রক্তজালিকাতে বেশি রক্ত প্রবাহিত হয়ে মুখের রঙ লাল বা গোলাপী দেখায়।

একটা বয়সের পরে আমরা আর লম্বা হই না কেন?

একটা বয়স অবধি সবাই তরতরিয়ে মাথায় বাড়ে। তার পরে এই বাড় যায় বন্ধ হয়ে। তখন ব্যায়াম করলেও আর



লম্বা হাড়ের বৃদ্ধি

লম্বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এর কারণ কি?

আমাদের লম্বা হওয়া নির্ভর করে শরীরের লম্বা অস্থির (Long bone) দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ওপর। উরুর হাড় (Femur), হাতের হাড় বা হিউমেরাস (Humerus) এ-রকম কয়েকটি লম্বা অস্থি। সাধারণত পঁচিশ বছর বয়স অবধি বেশির ভাগ লোকের লম্বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে যে কোনো সময়ে লম্বা অস্থির বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়ে বাড় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আমাদের শরীরে হাড় গঠন শুরু হয় মাতৃগর্ভে থাকার সময়েই। মাতৃগর্ভে এবং জন্মাবার পরেও বেশ কিছুদিন শরীরে শুধু নরম হাড় (Cartilage) থাকে। মাতৃগর্ভে নরম

কত বছর বয়স পর্যন্ত লম্বা হওয়া যায়?

অস্থির জায়গায় অস্থি তৈরি শুরু হয় সব চেয়ে আগে লম্বা নরম অস্থির মধ্য ভাগে। শিশু জন্মাবার পরে লম্বা নরম অস্থির দু' পাশে অস্থি তৈরি শুরু হয়। তখন দু'পাশের নরম অস্থির কোষগুলো ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই ভাবেই

লম্বা অস্থির দৈর্ঘ্যও বাড়ে।

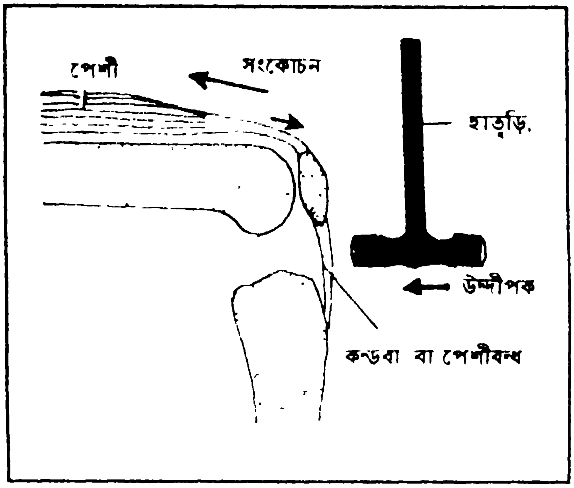
লম্বা অস্থির মাঝের আর দু'পাশের অস্থি তৈরির কেন্দ্রগুলি দু'টি নরম অস্থির স্তর দিয়ে আলাদা করা থাকে। এদের বলে এপিফাইসিয়াল প্লেট (Epiphyseal plate) বা কার্টিলেজ। এই প্লেট দু'টি যত দিন থাকে তত দিন আমরা লম্বা হই। যখন এই প্লেট দু'টির জায়গা অস্থি দখল ক'রে নেয় তখন অস্থি তৈরির কাজ শেষ হয়ে যায়। লম্বা অস্থিও আর দৈর্ঘ্যে বাড়ে না। আমাদের বাড়ও যায় বন্ধ হয়ে।

অস্থি তৈরিতে সাহায্য করে মস্তিষ্কে অবস্থিত পিট্যুইটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে বেরোনো গ্রোথ হরমোন। এ-ছাড়া গলার কাছে অবস্থিত থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন এবং প্রজনন হরমোনও আছে। গ্রোথ হরমোন বা অন্য কোনো হরমোনের গোলোযোগে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড় বন্ধ হয়ে যায়।

ডাক্তারবাবুরা অনেক সময়ে অসুস্থ মানুষের হাঁটুতে হাতুড়ি ঠোকেন কেন?

ডাক্তারবাবুরা অনেক সময়ে হাঁটুতে রবারের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত ক'রে পরীক্ষা করেন। ফলে পায়ের নিচের দিকটি সামনে সামান্য লাফিয়ে ওঠে। একে বলে হাঁটু ঝাঁকুনি (Knee jerk)। এই ঝাঁকুনি হল সব চেয়ে সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এখানে সংজ্ঞাবহ আর চেষ্টীয় স্নায়ুর মধ্যে সরাসরি যোগ থাকে। দু'টি স্নায়ুর সংযোগ স্থলকে বলে স্নায়ু-সন্ধি। এই প্রতিবর্তী পথে একটি মাত্র স্নায়ু-সন্ধি আছে। এ-জন্যে এ-ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে বলে মনোসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্স (Monosynaptic reflex)। আর যদি সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় স্নায়ুর মাঝে এক বা একাধিক স্নায়ু থাকে তবে প্রতিবর্তী পথেও একাধিক স্নায়ু-সন্ধি থাকে। এই ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে পলিসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্স (Polysynaptic reflex) বলে।

হাঁটুতে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে হাঁটুর নিচে যে পেশীবন্ধ বা কণ্ডরা (Tendon) আছে তাতে টানের সৃষ্টি হয়। এই কণ্ডরার সাহায্যেই পেশী হাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। কণ্ডরাতে টান জাতীয় উদ্দীপক গ্রহণের গ্রাহক আছে। তাতে উদ্দীপনা সৃষ্টি হলে তা সংজ্ঞাবহ স্নায়ু দিয়ে সুষুম্না কাণ্ডে পৌঁছোয়। সেখানকার নির্দেশ চেষ্টীয় স্নায়ু দিয়ে পেশীতে ফেরত আসে। পেশী সংকুচিত হওয়ায় হাঁটু ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়। একে বলে পেশী টান প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Stretch reflex)। আমাদের শরীরের প্রতিটি পেশী ও কণ্ডরার মধ্যে



হাঁটু ঝাঁকুনি পরীক্ষা করার পদ্ধতি

টান সম্পর্কিত গ্রাহক আছে। আর পেশী টান প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা দাঁড়াই, চলাফেরা করি, হাত-পা নাড়াই।

শরীরে আঘাত লাগলে ব্যথা করে কেন?

শরীরের কোথাও আঘাত লাগলে আমরা ব্যথা পাই। ব্যথা পেতে যতই খারাপ লাগুক ব্যথা পাওয়াটা কিন্তু দরকার। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ব্যথা আমাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। ব্যথা পাবো ভেবেই আমরা আঘাত

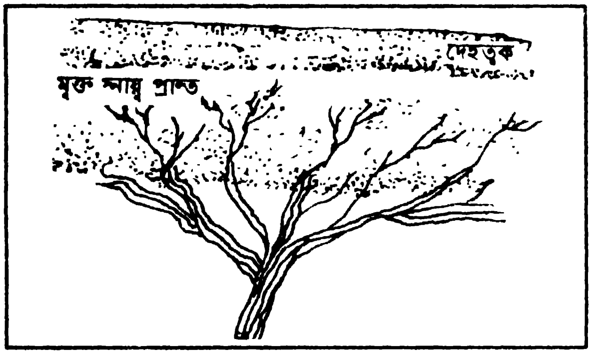
কী রকম গরম জিনিস গায়ে লাগলে যন্ত্রণা হয়?

থেকে শরীরকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যথার অনুভূতি যদি না থাকতো, তাহলে শরীরের বিভিন্ন অংশ আঘাত পেয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারতো।

বিভিন্ন রকমের উদ্দীপক বা বাইরের খবর গ্রহণের জন্যে আমাদের ত্বকে অনেক গ্রাহক আছে। এগুলি স্পর্শ, চাপ, তাপ, ব্যথা প্রভৃতির অনুভূতি গ্রহণ করে। ব্যথার অনুভূতি গ্রহণ করে যে গ্রাহক তা হল কতকগুলি স্নায়ুরই

আবরণহীন শেষ প্রান্ত বা মুক্ত স্নায়ু প্রান্ত (Free nerve ending)। যে-উদ্দীপক ব্যথার অনুভূতি জাগায় তা ক্ষতিকর, তাই তাকে ক্ষতিকর উদ্দীপক (Nociceptive stimulus) বলে।

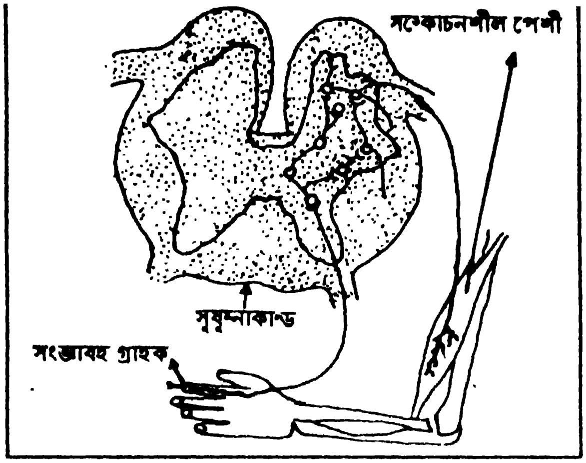
পিনের মত কোনো তীক্ষ্ণ জিনিষ বা ভোঁতা লাঠির মত কিছুর আঘাতে যে-ব্যথা, তার অনুভূতি গ্রহণ করে যান্ত্রিক ক্ষতিকারক অনুভূতির গ্রাহক যন্ত্র বা মেকানোনসিসেপটর (Mechanonociceptors)। এই ধরনের উদ্দীপককে বলে যান্ত্রিক ক্ষতিকারক উদ্দীপক (Mechanonociceptive stinulus)। আবার তাপমাত্রা ৪৫ থেকে ৫০ ডিগরি



ব্যথা, গরম ও ঠাণ্ডা অনুভূতির গ্রাহক যন্ত্র

সেলসিয়াস এমন গরম জিনিস বা ০ ডিগরি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা এমন ঠাণ্ডা জিনিস ত্বকে লাগলেও যন্ত্রণা হয় বলে এই উদ্দীপককে বলে তাপমাত্রা-জনিত ক্ষতিকর উদ্দীপক (Thermonociceptive stimulus) এবং যে-গ্রাহক এই যন্ত্রণার অনুভূতি গ্রহণ করে তার নাম তাপমাত্রা-জনিত যন্ত্রণার গ্রাহক (Thermonociceptors)। গরমে ছ্যাঁকা লাগলে বা পিনের মত তীক্ষ্ণ জিনিসের খোঁচা লাগলে প্রথমে খুব তীব্র যন্ত্রণা লাগে। এই ব্যথার অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে হয়। পরে যন্ত্রণার তীব্রতা কমে। কিন্তু কম তীব্র যন্ত্রণা অনেকক্ষণ ধরে থাকে। প্রথম অনুভূতিটিকে দ্রুত গতির যন্ত্রণা (Fast pain) আর দ্বিতীয় অনুভূতিটিকে মন্দ গতির যন্ত্রণা (Slow pain) বলে। এই দু' ধরনের যন্ত্রণার অনুভূতি আবার দুই আলাদা ধরনের স্নায়ু বয়ে নিয়ে যায়। প্রথম অনুভূতিকে বয়ে নিয়ে যায় যে-স্নায়ু তারা দ্বিতীয় দলের তুলনায় বেশি মোটা বা বেশি ব্যাসার্ধের। এদের মধ্যে দিয়ে স্নায়ু-বার্তা অনেক দ্রুত গতিতে যায়।

গ্রাহক কোষ থেকে স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে ব্যথার অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। তখন আমরা ব্যথা অনুভব করি আর



পিন ফুটলে হাত কি ভাবে সবিয়ে নেওয়া হয়

মস্তিষ্কের নির্দেশে ক্ষতিকারক উদ্দীপক থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ক'রে থাকি।

অজান্তে কোনো গরম জিনিসে হাত পড়লে তখনই হাত সরিয়ে নিই কেন?

কোনো গরম জিনিসের ওপর হঠাৎ হাত পড়লে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিই। হাত কেউ পিন ফোটালেও তাই হয়। এ-কাজ আমরা না ভেবে-চিন্তেই করি? এটা হয় কী ভাবে?

এই না ভেবে-চিন্তে হাত সরিয়ে নেওয়া স্নায়ুতন্ত্রের একপ্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action)। হাতটি সরিয়ে নিই বলে এই ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে প্রত্যাহার প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Withdrawal reflex action) বলে।

যদি কেউ পিনের খোঁচা দেয়, তাহলে কী হবে? পিনের খোঁচা বাইরের খবর বা উদ্দীপক (Stimulus)। বাইরের খবরটি গ্রহণ করবে ত্বকের গ্রাহক (Receptor)। গ্রাহক থেকে স্নায়ু-বার্তা (Nerve impulse) সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর (Sensory nerve) মাধ্যমে গিয়ে পৌঁছোয় সুষুম্নাকাণ্ডে (Spinal cord)। সেখান থেকে নির্দেশ আসে চেষ্টীয় স্নায়ু (Motor nerve) দিয়ে এফেক্টর অরগ্যান (Effector organ)-এ অর্থাৎ পেশীতে। তখনই আমরা হাতটা সরিয়ে নিই। এই পুরো পথটিকে বলে প্রতিবর্তী পথ (Reflex arc)। আমরা এই ধরনের কাজে কোনো বিচার বিশ্লেষণ বা ভাবনাচিন্তা করি না বলে গুরু মস্তিষ্কে (Cerebral

cortex) বা মস্তিষ্কের উচ্চতম কেন্দ্রের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার পরে যখন উদ্দীপকের প্রকৃতি, তীব্রতা, কোথা থেকে তা এল—এ-সব বিচার করি আর সেখান থেকে আরো সরে যাওয়ার চেষ্টা করি তখন গুরু মস্তিষ্কের সাহায্যে এই বিচার করি।

মানুষের শরীর কি তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে?

আমাদের শরীরের প্রতিটি দেহ কোষে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি লোপ পেলে, ঐ কোষটিকে আমরা মৃত বলে ঘোষণা করি। মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষের তড়িৎ শক্তির পরিমাণ অতি নগণ্য। কিন্তু তা পরিমাপ করা যায় যন্ত্রের সাহায্যে। এই তড়িৎ উৎপাদনের প্রধান উপাদান কোষ মধ্যস্থ এবং বাইরের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ধাতুসমূহ। তড়িৎ উৎপাদনে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন-এর সক্রিয় ভূমিকাই প্রধান। দেহকোষে উৎপন্ন তড়িৎ শক্তির দুটি প্রমাণ—হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক থেকে উৎপত্তি হওয়া তড়িৎ শক্তি, যা সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হওয়া তড়িতের নাম ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম (Electro Cardiogram) বা ই. সি. জি. (E. C. G.) আর মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হওয়া তড়িৎকে বলা হয় ইলেকট্রোএন্‌সেফালোগ্রাম (Electroencephalogram) বা সংক্ষেপে ই. ই. জি. (E. E. G.)।

কাঁদলে চোখের জল পড়ে কেন?

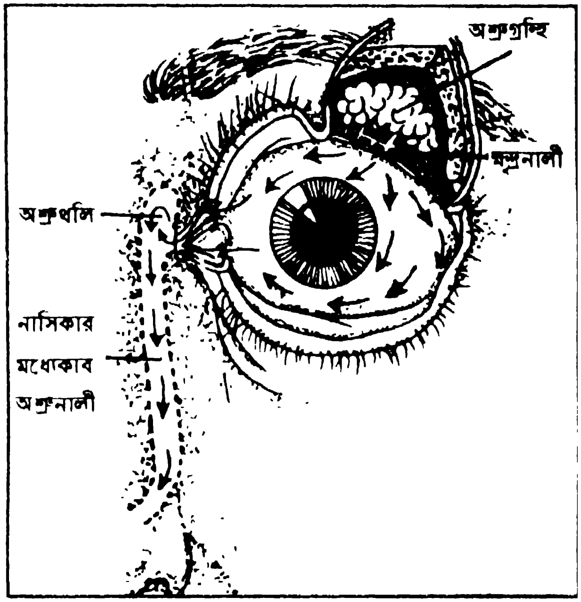
কাঁদার সময়ে আমাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। শুধু দুঃখে নয়, অনেক সময়ে রাগে বা খুব বেশি হাসলেও চোখে জল এসে যায়। ঠাণ্ডা লাগলেও চোখে জল গড়ায়। আবার ঝাঝালো জিনিস বা ধোঁয়াও আমাদের চোখের জলে নাকের জলে একাকার ক'রে দেয়।

চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন?

দুই চোখের চক্ষু বলয়ের উপরে এবং ভ্রু'র নিচে বাদামের মত দেখতে এক ধরনের গ্রন্থি আছে। এর নাম

চোখের জলে কী আছে?

অশ্রুগ্রন্থি (Lacrimal gland)। দু'চোখেরই ভেতরের কোণায় ওপর দিকে এই গ্রন্থি রয়েছে। দেখতে অনেকটা বাদামের মত। লাতিন শব্দ 'লাক্রিমা' (Lacrima)-র মানে অশ্রু বা চোখের জল। এই গ্রন্থিতে যে তরল জলীয় পদার্থ তৈরি হয়, তাকেই বলে অশ্রু। গ্রন্থিগুলি থেকে বেশ কয়েকটি নালী এসে চোখের কোণে মুক্ত হয়েছে। চোখের জলে আছে জল, লবণ আর লাইসোজাইম নামে জীবাণুনাশক প্রোটীন জাতীয় পদার্থ।



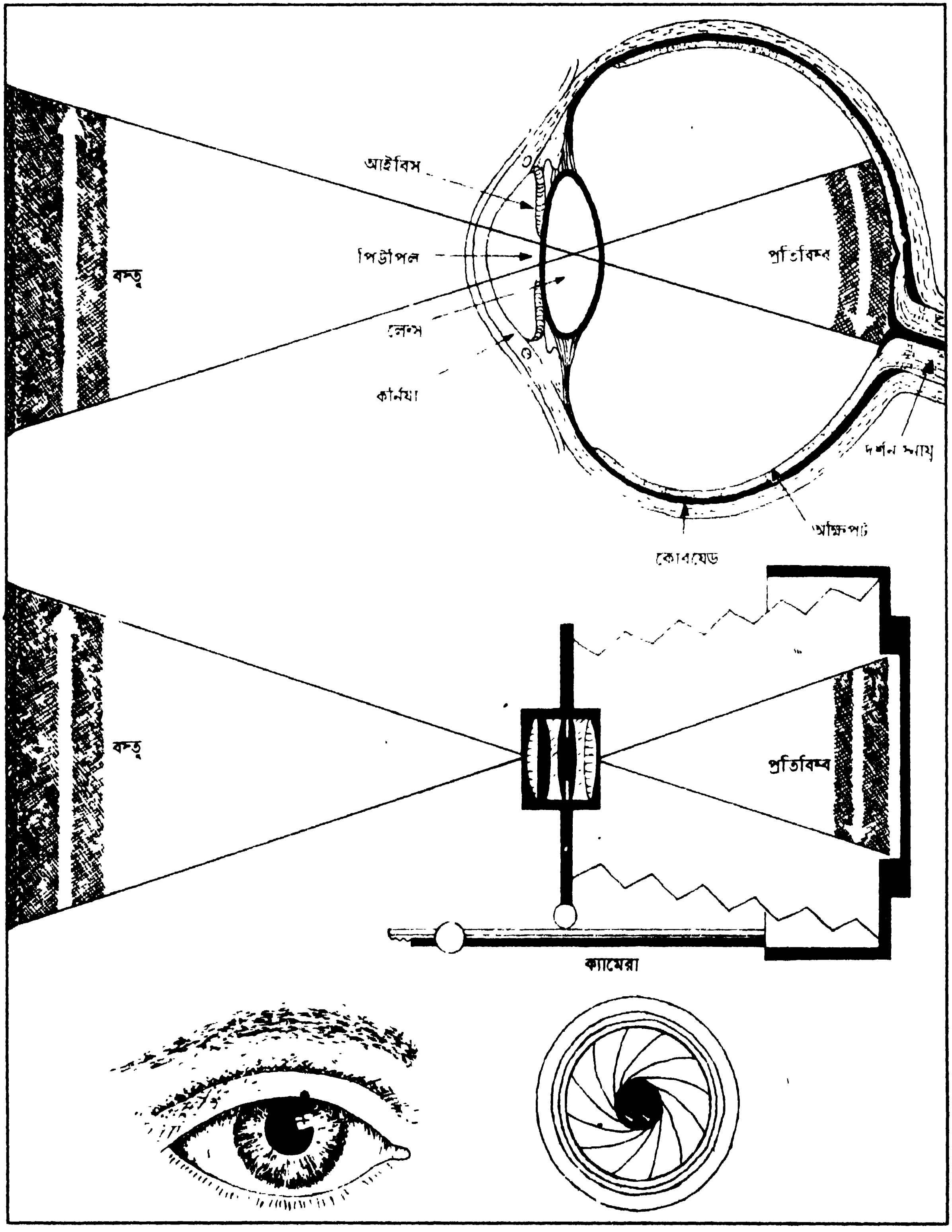
অশ্রুগ্রন্থির অবস্থান ও অশ্রুপ্রবাহের পথ

সাধারণ অবস্থায় চোখের জল চোখের ওপরের পাতা বন্ধ হওবার সময়ে চোখের বাইরের অংশে (Conjunctiva) ধুয়ে দেয়। এতে চোখের ওপরের অংশ আর্দ্র বা ভিজে ভিজে থাকে। ক্ষতিকারক বস্তুর থেকেও চোখ বেঁচে যায়। এই জল তার পরে ল্যাক্রিমাল ক্যানালিকুলি (Lacrimal canaliculi) নামে নালীপথে নাকে যায়।

রাগ, দুঃখ, ভয় এমন-কি আনন্দের সময়েও অশ্রুগ্রন্থিতে অশ্রু তৈরির হার বেড়ে যায়। মনের ওই সব ক'টি অবস্থাকে আমরা ভাবাবেগ বলি। স্নায়ুতন্ত্রের ভাবাবেগ বিষয়ে সম্পর্ক যুক্ত কেন্দ্রগুলি থেকে স্নায়ুবার্তা অশ্রুগ্রন্থির অশ্রু তৈরি অনেক বাড়িয়ে দেয়। তখন আর তার পুরোটা নাকের পথে চলে যেতে পারে না। তার আগেই উপচে চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। আমরা তাকে বলি কান্না।

আমরা দেখি কি ভাবে?

ক্যামেরা দিয়ে কি ভাবে ছবি তোলা হয় সেটা আমরা



মানুষের চোখ এবং ক্যামেরার আকৃতি ও কার্যগত সাদৃশ্য

অনেকেই জানি। আমাদের চোখের গঠন আর তার কাজ করার পদ্ধতি অনেকটাই ক্যামেরার মত।

আমাদের চোখের সামনে আছে একটা লেন্স। এই লেন্স কিছু বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি। ক্যামেরাতেও এমনি একটি কাচের লেন্স থাকে। এই লেন্সের মধ্যে দিয়ে কোনো জিনিসের ওপর থেকে প্রতিফলিত আলো ঢুকে ক্যামেরার ফিল্মে পড়ে আর তার ওপরে ওই বস্তুর একটা উলটো প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। চোখে ফিল্মের কাজ করে অক্ষিপট (Retina)।

ক্যামেরার ভেতরে চারদিকে কালো রঙ করা থাকে। অবাঞ্ছিত প্রতিফলিত আলো যাতে প্রতিবিম্বকে নষ্ট ক'রে

চোখে আলো ঢোকে কোথা দিয়ে?

না দেয় তাই এই ব্যবস্থা। অক্ষিপট যে প্রকোষ্ঠের মধ্যে থাকে তার চারপাশেও কালো রঙের একটা স্তর আছে। এই স্তরের নাম করয়েড (Choroid)।

চোখের মণির (Pupil) মধ্যে দিয়ে আলো ঢোকে। এই মণির বা তারারন্ধ্রের বাড়া-কমা নিয়ন্ত্রণ করে আইরিস (Iris)। বেশী আলোয় তারারন্ধ্র ছোট হয়ে যায়, কম আলোয় বাড়ে। ক্যামেরার বেলায় আলো ঢোকার ছিদ্রকেও (Aperture) নিয়ন্ত্রণ করা হয় আইরিসের সাহায্যে। আইরিসের মাঝেই এই ছিদ্রটা রয়েছে। বেশি আলোয় ছিদ্রটি ছোট হয়ে যায়, কম আলোয় বাড়ে।

কাছের বা দূরের জিনিস ঠিক মত দেখার জন্যে অর্থাৎ

কাছের ও দূরের জিনিস কি ভাবে দেখি?

তার প্রতিবিম্বকে সঠিক ভাবে রেটিনায় ফেলার জন্যে লেন্সের বক্রতা (Curvature) পালটে যায়। অর্থাৎ লেন্সের সামনে যে উত্তল অংশ তা কখনো বেশি উত্তল হয়, কখনো বা কিছুটা চ্যাপ্টা। ক্যামেরার বেলাতেও লেন্সকে সামনে-পিছনে সরিয়ে প্রতিবিম্বকে সঠিকভাবে ফিল্মে ফেলা যায়। অনেক আধুনিক ক্যামেরায় এই পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়।

ফিল্মের মধ্যে রাসায়নিক যৌগ থাকে। রাসায়নিক যৌগগুলি আলোর প্রভাবে ফিল্মের উপর ছবি তৈরিতে সাহায্য করে। আমাদের রেটিনায় আছে আলোর অনুভূতি



অক্ষিপটের আলোক তরঙ্গের গ্রাহক কোষ

গ্রহণের গ্রাহক কোষ (Photo receptor)। দু'ধরনের গ্রাহক কোষ থাকে—বেশি আলো এবং রঙিন আলোয় সাড়া দেয় 'কোন্' (cone) গ্রাহক-কোষ আর কম আলোয় সাড়া দেয় 'রড' (Rod) কোষ। গ্রাহক কোষ এই অনুভূতিকে পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে (Visual centre)।

আমাদের রেটিনায় যে-উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি হয় মস্তিষ্কের সাহায্যে আমরা তা সোজা ক'রে দেখি। অর্থাৎ মস্তিষ্কে গিয়ে তা আবার উলটে সোজা হয়ে যায়।

অন্ধকারে দেখতে পাই না কেন?

আবছা আলোতেও আমরা কিছু কিছু দেখতে পাই। কিন্তু যে-অন্ধকারকে আমরা ঘুটঘুটে অন্ধকার বলি, সে-অন্ধকারে চোখে কিছুই ঠাহর হয় না। অন্ধকারে দেখতে না পাওয়ার কারণ কি?

আমাদের রেটিনাতে যে গ্রাহক কোষ আছে অর্থাৎ 'রড' আর 'কোন্', তারা শুধু আলোতেই উত্তেজিত হয়। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো 'রড' বা 'কোন্'কে উত্তেজিত করলে তবেই আমরা দেখতে পাই।

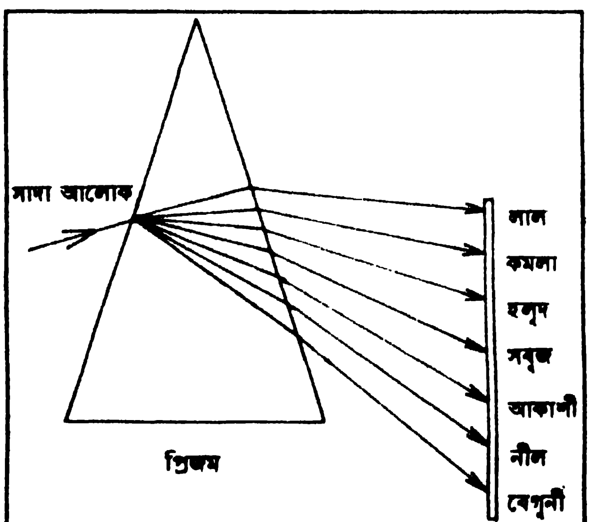
সব ধরনের আলোক-তরঙ্গ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। যারা পড়ে তাদের বলে দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ বা ভিজিব্‌ল্ লাইট ওয়েভ (Visible light wave)। এই

দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ চোখে এসে পড়লে 'রড' আর 'কোন্'-এর মধ্যে যে-রাসায়নিক পদার্থ আছে, তা আলো শোষণ ক'রে নেয়। 'রড্'-এ আছে রোডপসিন (Rhodopsin) আর 'কোন্'-এ আয়োডোপসিন (Iodopsin)। আলোর প্রভাবে এই রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়াকে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া (Photo-chemical reaction) বলে। এই বিক্রিয়ার ফলে যে-উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছোয়।

'কোন্' কোষগুলি উজ্জ্বল আলোয় উত্তেজিত হয়। এইজন্যে দিনের উজ্জ্বল আলোয় 'কোন্' কোষগুলি বেশি সক্রিয় থাকে। 'রড' কোষ আমাদের রাতে বা কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে। খুব আবছা আলোতেও 'রড' কোষ উত্তেজিত হয়। কিন্তু অন্ধকারে 'রড' কোষরাও সাড়া দেয় না। তাই আমরা কিছুই দেখতে পাই না।

আমরা রঙিন জিনিস কি ভাবে দেখি?

আমরা অনেক রকম রঙ দেখতে পাই। রঙের মধ্যে নীল, সবুজ আর লাল রঙ হল প্রাথমিক বর্ণ (Primary colour)। কারণ ওই তিনটি রঙ মিশিয়ে অন্য সব রঙ তৈরি করা যায়। আমরা যে-সাদা আলো দেখি সেটা সাতটি রঙের মিশ্রণে তৈরি। তাই সাদা আলোকে যদি একটা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে পাঠানো যায় তবে তা সাতটি রঙে ভেঙে যায়। রামধনুতে আমরা যে-সাতটি রঙ দেখি, সেই



আলোক বর্ণালী

সাতটি রঙ অর্থাৎ বেগুনী, নীল, আকাশী নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল রঙও ওই সাদা আলো ভেঙে তৈরি হয়। একে বলে বর্ণালী (Spectrum)।

আমরা যখন কোনো জিনিসকে লাল দেখি, তার মানে ওই জিনিসটি লাল রঙ ছাড়া বাকি সমস্ত রঙের আলোকে শুষে নেয় ও কেবল লাল আলোকে প্রতিফলিত করে। কোনো জিনিসের রঙ সাদা অর্থ, সে সমস্ত রঙের আলোকে প্রতিফলিত ক'রে দেয় আর কালো রঙের জিনিসের অর্থ, সে-জিনিস সব রঙের আলো শুষে নেয়। তাই সাদা বা কালো কোনো রঙ নয়!

আমরা বিভিন্ন রঙের জিনিস কী ভাবে দেখি তার পুরো ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে অনেক রকম তত্ত্ব আছে। তবে চোখের 'কোন্' গ্রাহক কোষই যে রঙ দেখতে সাহায্য করে তা প্রায় সব তত্ত্বেই স্বীকার করা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, আমাদের চোখে তিনটি মূল বা প্রাথমিক রঙের অনুভূতি গ্রহণের জন্যে তিন ধরনের 'কোন্' কোষ আছে। এই তিন ধরনের 'কোন্' কোষে তিন রকমের আলোক-রাসায়নিক (Photo-chemical) যৌগ আছে বলে মনে করা হয়। এগুলি যথাক্রমে নীল-বেগুনি, সবুজ এবং হলুদ বা কমলা রঙের আলোক তরঙ্গ। এই তিন ধরনের আলোক রশ্মি বর্ণালীর প্রাথমিক বর্ণগুলির কাছাকাছি পড়ে।

মূল বর্ণ ছাড়া অন্যান্য রঙের বেলায় বলা যায়, একের বেশি 'কোন্' কোষ একই সঙ্গে উত্তেজিত হলে এই মিশ্র উত্তেজনা নতুন কোনো রঙের অনুভূতি জাগায়। রঙের

একসঙ্গে অনেক রঙ দেখি কি ভাবে?

মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের মিশ্রণ ঘটেছে এবং তাদের মাত্রা অনুযায়ী এই উত্তেজনা বা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

রঙের অনুভূতি সম্পর্কে আরো অনেক মতবাদ আছে, তবে তাদের ব্যাখ্যা আরো জটিল। গুরু মস্তিষ্কের (Cerebral cortex) দৃষ্টি-কেন্দ্রের (Visual centre) বিশ্লেষণ ক্ষমতার ওপরেও আমাদের রঙের অনুভূতি অনেকটা নির্ভরশীল।

আমাদের মধ্যে অনেকে নীল রঙ দেখতে পায় না। আর এক দলের চোখে লাল অথবা সবুজ রঙের মধ্যে কোনো তফাত ধরা পড়ে না। এদেরকে বলা হয় বর্ণান্ধ।

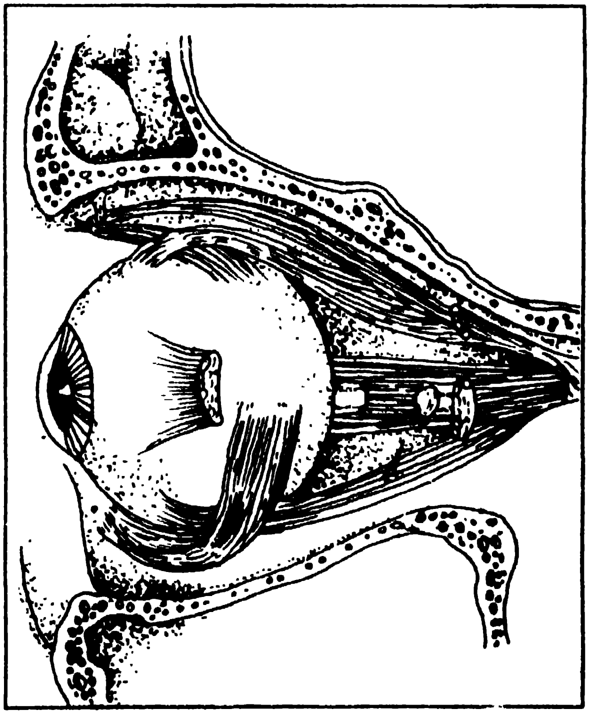
কারো কারো চোখ ট্যারা হয় কেন?

আমাদের চোখের গোলকটি (Eye ball) ছ'টি পেশীর সাহায্যে চোখের প্রকোষ্ঠের মধ্যে বসানো থাকে। এই পেশীগুলি সংকুচিত এবং শিথিল হওয়ার ফলেই আমাদের

দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে ট্যারা হবার সম্পর্ক কি?

চোখের গোলক ওপরে-নিচে বা ভেতরে-বাইরে নড়াচড়া করতে পারে। এই পেশীর নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ু।

চোখের পেশী বা স্নায়ুর দুর্বলতাই চোখ ট্যারা হওয়ার কারণ। অনেক সময়ে দৃষ্টিশক্তির ঘাটতির ফলেও চোখ



চক্ষুবলয়ের চারপাশের পেশীসমূহ

ট্যারা হয়ে যায়। কোনো কাছের জিনিস ভাল ক'রে দেখতে না পেলে সেটাকে চোখের পর্দায় ঠিক মত প্রতিফলিত করার চেষ্টায় অনেকে চোখের তারাটিকে নাকের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। বাচ্চা বয়স থেকে এ-রকম ক'রে দেখার চেষ্টা করতে করতে চোখ ট্যারা হয়ে যায়। এই অবস্থায় চোখের বাইরের দিকের পেশী ভেতরের পেশীর তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নাকের দিকের পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার দূরের জিনিস ঠিক মত দেখার চেষ্টায় চোখের তারা দু'টি দু' চোখের বাইরের দিকের কোণে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতেও চোখ ট্যারা হয়।

ঘুম পায় কেন?

সারাদিনের কাজের পরে রাতের ঘুম আমাদের বিশ্রাম। কেউ কেউ অবশ্য দিবা নিদ্রা দিতেও ভালোবাসেন। কেউ বা যখন তখন বাসে ট্রামে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু ঘুম পায় কেন?

আমরা যখন ঘুমোই, তখন আমাদের মস্তিষ্ক পরিবর্তিত জাগ্রত অবস্থা (Modified conscious state) বলা যায়। এই সময়ে বাইরের জগতের খবর সহজে গিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছোয় না। এ-ছাড়া ঘুমের সময়ে আরো কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। তখন রক্ত চাপ, হৃদস্পন্দনের হার, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যায়।

ঘুম পাওয়ার সঠিক কারণের পুরো ব্যাখ্যা এখনো অজানা, তবে ঘুম যে জেগে থাকা অবস্থার বিপরীত তা আমরা সকলেই জানি। অনেকে মনে করেন ঘুম আসে নিষ্ক্রিয় (Passive) পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন ঘুম আসে সক্রিয় (Active) পদ্ধতিতে।

মস্তিষ্কের যে অংশ আমাদের জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করে তা আমাদের মস্তিষ্ক কাণ্ড (Brain stem)-এর ওপর এক প্রকার স্নায়ুজাল বিস্তার করে রয়েছে। ঐ স্নায়ুজালের ওপর থেকে সংজ্ঞাবহ (Sensory) ও ইন্দ্রিয় অনুভূতির প্রভাব কমে আসার ফলে আমাদের ঘুম পায়। সাধারণত ঘুমন্ত অবস্থার সময় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুসন্ধি পেশী

আমরা কখন ঘুমিয়ে পড়ি?

যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সংজ্ঞাবহ গ্রাহক কোষগুলিও উত্তেজিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ুবার্তা প্রবাহের মাত্রাও কমে যায়। তখন মস্তিষ্ক কাণ্ডের স্নায়ুজাল নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

অনেকে মনে করেন মস্তিষ্কের মধ্যে কয়েকটি ঘুম কেন্দ্র

(Sleeping centre) আছে। ওই ঘুম কেন্দ্রগুলি স্নায়ুবার্তা পাঠিয়ে ক্লান্ত সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মধ্যে বার্তা প্রবাহকে কমিয়ে দেয়। তাই ঘুমকে সক্রিয় পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। ঘুমের সময় মস্তিষ্কের মধ্যে কিছু জটিল রাসায়নিক যৌগ (যেমন, সেরোটনিন) এই সক্রিয় ঘুমের পদ্ধতির তত্ত্বকে সমর্থন করে।

নাক ডাকে কেন?

সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলে আছে, 'নাক কেন ডাকে, আর পিলে কেন চমকায়?' পিলে চমকায় কিনা জানি না, কিন্তু নাক যে ডাকে, তাতে আর সন্দেহ কোথায়?

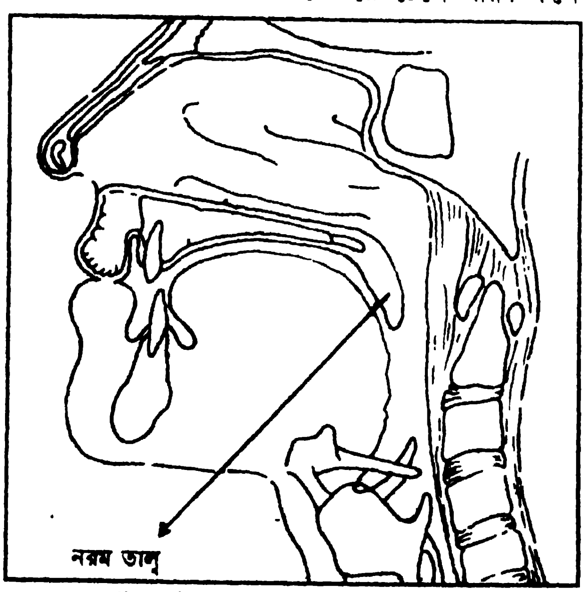
কিন্তু নাক ডাকার কারণটা কি?

যখন কারো নাক ডাকে তখন তাকে লক্ষ্য করলে দুটো জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। যার নাক ডাকছে সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

গভীর ঘুমের সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস খুব গভীর হয়। একে

পাশ ফিরে শুইয়ে দিলে নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায় কেন?

বলে গভীর শ্বাস (Deep breath)। চিৎ হয়ে থাকার সময়ে আমাদের জিভ গলবিলের ভেতরে ঠেলে যায়। ফলে



নরম তালুর কম্পনে নাক ডাকার শব্দ হয়

বাতাসের পথ সংকীর্ণ হয়ে আসে। গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার সময়ে বাতাস ওই সংকীর্ণ পথে ঢুকতে গিয়ে বাধা পায়, ফলে বাতাসের বেগ আরো বেড়ে যায়। তালুর পিছনে যে-নরম তালু (Soft palate) আছে বাতাসের চাপে তাতে কম্পন হয়। এর ফলে যে-শব্দের সৃষ্টি হয় তাকেই নাসিকা গর্জন বা নাক ডাকা বলে।

গভীরভাবে ঘুমোনোর সময়ে যদি কারো নাক ডাকে, দেখা গেছে পাশ ফিরিয়ে দিলেই তার নাসিকা গর্জন বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণ পাশ ফেরা অবস্থায় জিভ স্বাভাবিক জায়গায় চলে আসে, যার ফলে বাতাসের পথও অনেক প্রশস্ত হয়ে যায়। ঘুমের গভীরতা কমে যাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসও অগভীর আর অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তাই তখন আর নাক ডাকে না।

মানুষ কখন 'মৃত' বলে ঘোষিত হয়?

আগে মনে করা হ'তো, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বা শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে গেলে, মানুষ মৃত ঘোষণা করা যায়। কিন্তু দেখা গেছে, কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে বহু মানুষের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালু অবস্থায় রাখলে, মানুষ বেঁচে থাকে। তাই এখন মস্তিষ্কের মৃত্যু হলেই মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মস্তিষ্কের মৃত্যু হয়েছে জানবার সহজ উপায় মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন তড়িৎ শক্তির পর্যবেক্ষণ, যাকে বলা হয় ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাম বা ই. ই. জি.। ই. ই. জি. স্তব্ধ হয়ে গেলেই মানুষটি মৃত বলা হয়।

শিশু কি ভাবে শেখে?

আমরা লিখতে পড়তে শিখি। তা ছাড়াও কেউ গান শেখে, কেউ নাচ, কেউ শেখে ছবি আঁকতে, কেউ আবার খেলাধূলো। এই শেখাটা হয় কী ভাবে?

আমরা শিখি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (Reflex) সাহায্যে। শিক্ষা (Learning) আর প্রতিবর্তী ক্রিয়া যে এক, তা প্রথম দেখিয়েছিলেন বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ আইভ্যান প্যাভলভ।

আমরা ছোটবেলা থেকেই অনেক কিছু শিখি। হাঁটতে শেখে শিশু, ক্রমে ক্রমে কথা বলাও তাকে শিখতে হয়। কিছু শিক্ষা আবার জন্মগত। গরমে হাত পড়লে শিশু হাত সরিয়ে

নেয়। এই ধরনের কাজকে বলো অনাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Unconditioned reflex)। খিদে পাওয়া, পেট ভরানো, লালা বেরোনো এগুলো সবই অনাপেক্ষ প্রতিবর্ত। এগুলি আমাদের জন্মগত।

শিশুর শিক্ষা শুরু হয় এই অনাপেক্ষ প্রতিবর্তের ওপর ভিত্তি করে। যেমন, শিশুর মুখের মৃদু হাসি একটি অনাপেক্ষ প্রতিবর্ত, যা জন্মগত। হাসতে হাসতে শিশু কিছুদিন পরে বুঝতে পারে তার মুখের হাসি দেখে তার মা খুশি হচ্ছে বা আনন্দ পাচ্ছে। কিছুদিন পরে মায়ের খুশি দেখলে সেও হাসে। মায়ের মুখের প্রকাশ যে হাসি তা এখানে সাপেক্ষ উদ্দীপকের (Conditioned stimulus) কাজ করে। স্বাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রভাবে শিশুর যে নতুন শিক্ষা হয় তা হল হাসি, সুখ বা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। আর এই নতুন শিক্ষাকে বলা হয় স্বাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditioned reflex)। শি: এইভাবে নতুন নতুন স্বাপেক্ষ প্রতিবর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। একটি স্বাপেক্ষ প্রতিবর্ত (শিক্ষা) তৈরি হলে তার ওপর ভিত্তি করে অন্য স্বাপেক্ষ প্রতিবর্ত (অন্যান্য শিক্ষা) গড়ে ওঠে। এই ভাবে চলে শেখার কাজ।

শেখার সময়ে স্বাপেক্ষ উদ্দীপনার সাহায্যে স্নায়ুর মধ্যে নতুন নতুন সংযোগ গড়ে ওঠে। এর ফলে নতুন স্নায়ু-বর্তনী তৈরী হয়। এই ভাবে যে-শিক্ষা অনেক কিছুর ওপরে তা নির্ভর করে, যেমন, উদ্দীপকের প্রকৃতি, অভ্যেস, মনোযোগ, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শেখার সময়কার সুখকর বা অসুখকর অনুভূতি, ভাবাবেগ। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরাও স্বাপেক্ষ প্রতিবর্তের সাহায্যে নতুন স্নায়ু-বর্তনী গড়ে তোলার মাধ্যমে শেখে। তবে আমাদের মস্তিষ্ক অনেক উন্নত বলে আমরা অনেক জটিল জিনিস শিখতে পারি।

জন্মাবার পর থেকেই কি আমরা শিখতে শুরু করি?

আমরা মনে রাখি কি ভাবে?

মনে রাখার ক্ষমতা এক একজনের এক এক রকমের। কারো বা মনে রাখার ক্ষমতা এত বেশি যে, বিভিন্ন জনের টেলিফোন নাম্বার এক সঙ্গে মনে রাখতে পারে। কেউ নিজের টেলিফোন নাম্বার ছাড়া অন্য নাম্বারের বেলাতেই গোলমাল ক'রে ফেলে। কিন্তু আমরা মনে রাখি কি ভাবে?

নতুন কিছু শেখার পরে সেই শিক্ষা আমাদের মস্তিষ্কে নতুন নতুন স্নায়ু সংযোগ সৃষ্টি ক'রে নতুন স্নায়ু-বর্তনী তৈরি করে। অভ্যেস, মনোযোগ—এ-সবের সাহায্যে এই শিক্ষা আমাদের মস্তিষ্কে স্থায়ী ভাবে গেঁথে যায়। একেই বলে স্মৃতি। আবার ওই স্মৃতি বা মনে রাখা শিক্ষাকে প্রয়োজনের সময়ে আমরা একই বা একই ধরনের উদ্দীপনা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। একে বলে স্মৃতি উদ্ধার।

স্মৃতি কিভাবে মস্তিষ্কে আবদ্ধ থাকে তা আজও গবেষণার বিষয়। অনেকে মনে করেন, শিক্ষার সময় যে নতনু স্নায়ুতে স্নায়ুতে সংযোগ সৃষ্টি হয় তা অভ্যাসের মাধ্যমে স্নায়ু প্রান্তের বৃদ্ধির ফলে সুদৃঢ় হয়। স্নায়ু কোষ ছাড়া মস্তিষ্কের মধ্যেকার অন্য আর এক ধরনের কোষ, যাদের নাম নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia), তারাও এই সংযোগকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। তবে আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, কোনো একটি শিক্ষার সময় যে স্নায়ুতে স্নায়ুতে সংযোগের ফলে নূতন স্নায়ু-বর্তনীর (Neural circuit) সৃষ্টি হয়, সেই বর্তনীর স্নায়ুগুলির মধ্যে ওই শিক্ষা, নতুন প্রোটিন জাতীয় পদার্থ এবং রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Ribonucleic acid) বা RNA হয়ে সঞ্চিত থাকে। ওই প্রোটিন বা RNA হল স্মৃতি।

সব স্মৃতি কি চিরস্থায়ী?

কোন্ শিক্ষা কত দিন মস্তিষ্কে স্মৃতি হিসেবে থাকে তার ওপর ভিত্তি ক'রে স্মৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

এক, সংজ্ঞাবহ স্মৃতি (Sensory memory)। এই স্মৃতির সাহায্যে মস্তিষ্কে কোনো সংজ্ঞাবহ উদ্দীপকের অনুভূতি গ্রহণ করে, যেমন, স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, শ্রবণ, দর্শন।

দুই, স্বল্প কালের স্মৃতি (Short-term বা recent memory)। যে সমস্ত ঘটনা, শব্দ, সংখ্যা আমাদের স্মৃতিতে কয়েক মিনিট, বা দু'চার ঘণ্টা কিংবা মাত্র কয়েকটি দিনের জন্যে স্থায়ী থাকে; আবার অভ্যেস বা মনোযোগ বা প্রয়োজনের অভাবে ভুলে যাই। এই ধরনের স্মৃতি কখনোই চিরস্থায়ী হয় না।

তিন, স্থায়ী স্মৃতি (Long term or permanent memory)। কিছু কিছু শিক্ষা বা ঘটনা আছে, যা আমাদের মস্তিষ্কে বহুদিন, দীর্ঘ এক যুগ কিংবা এমন হ'তে পারে, তা চির জীবন থেকে যায়। দরকার মত তা উদ্দীপকের সাহায্যে উদ্ধার করা সম্ভব। এই ধরনের স্মৃতির জন্যে অভ্যেস, মনোযোগ অভিজ্ঞতা—এ-সব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই সাহায্যে শিক্ষাটি স্থায়ী স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

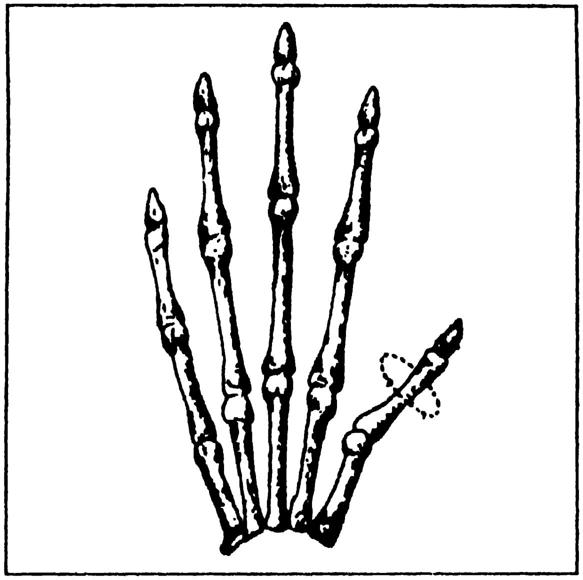
সূক্ষ্ম হাতের কাজ আমরা কী ভাবে করি?

আমরা হাত দিয়ে লেখা, ছবি আঁকা, সেলাই করা এমনি অনেক ধরনের সূক্ষ্ম কাজ করি। পায়ের আঙুল দিয়ে কিন্তু এ-সব সূক্ষ্ম কাজ করা যায় না। কেন আমরা শুধু হাতের সাহায্যে এমন সব সূক্ষ্ম কাজ ক'রে থাকি?

আমাদের হাতের তালু আর আঙুলের ব্যবহার আর তাদের সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা আমাদের অন্য প্রাণীদের থেকে শ্রেষ্ঠ করেছে। অনেক প্রাণীর আঙুল বা তালু আমদের মত না হলেও সামনের পা (Fore limb) দিয়ে তারা অনেক কাজ ক'রে থাকে। ইঁদুর তার সামনের পা দিয়ে খাবারকে মুঠিতে ধরে খায়। বানর জাতীয় প্রাণীরা তাদের হাতকে কাজে লাগায়। তবে মানুষের তালু বা আঙুলের সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা অনেক বেশি। মানুষ এক মাত্র প্রাণী যারা শুধু আঙুল ব্যবহার ক'রে শক্তিশালী এবং সূক্ষ্ম মুঠি (Power and Precision grip) গঠন করতে পারে। এর সাহায্যে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি খাটাতে পারে যা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার তুলি বা সূচ ধরার কাজও অন্য কোনো প্রাণী করতে পারে না।

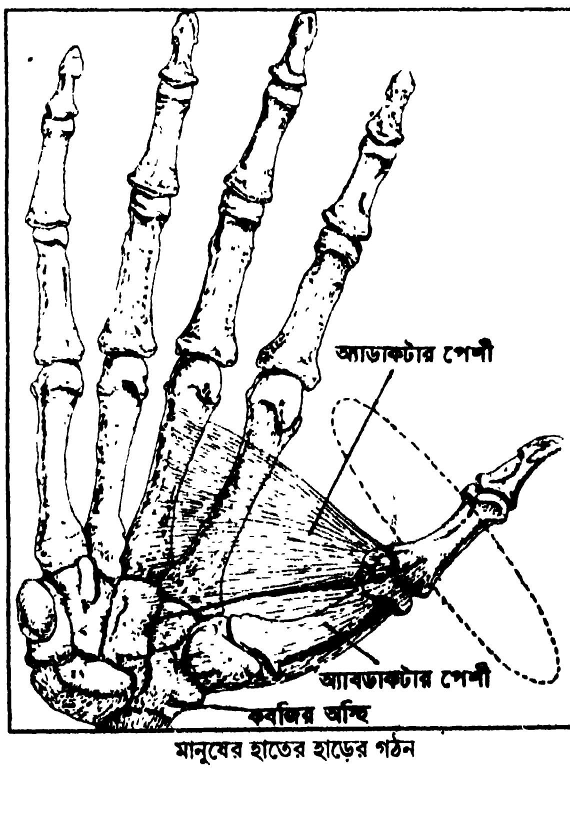
আমাদের হাত যে-সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে, এর দু'টি কারণ আছে। এক বিবর্তনের মাধ্যমে আঙুলের বৃদ্ধি আর আঙুল নাড়াচাড়া করার ক্ষমতার পরিবর্তন; দুই, স্নায়ুতন্ত্রের উন্নত মানের কাজ করার ক্ষমতা।

আমাদের হাতের আঙুল, তালু এবং কব্জির হাড়ের গঠন এবং তাদের সজ্জা বিবর্তনের মাধ্যমে এমন ভাবে পালটেছে যাতে তাদের সূক্ষ্ম ভাবে নাড়ানো যায়। বিশেষ ক'রে বুড়ো আঙুলের গঠন এবং চলনের ক্ষমতার পরিবর্তন এসেছে। আমাদের বুড়ো আঙুলের ডগা থেকে তৃতীয় গাঁট পর্যন্ত দূরত্ব, তর্জনীর ডগা থেকে তৃতীয় গাঁট



বানরের হাতের হাড়ের গঠন

পর্যন্ত দূরত্বের তুলনায় অনেক বেশি। এ ছাড়া তর্জনীর সঙ্গে বুড়ো আঙুলের কৌণিক ব্যবধানও লক্ষ্য করার মত। দু'টি শক্তিশালী পেশীর সাহায্যে বুড়ো আঙুল তালুর দিকে বা বিপরীত দিকে নাড়াচাড়া করতে পারে। এর সঙ্গে আঙুল ও তালুর মধ্যেকার অস্থি (Metacarpus) এবং কব্জির



মানুষের হাতের হাড়ের গঠন

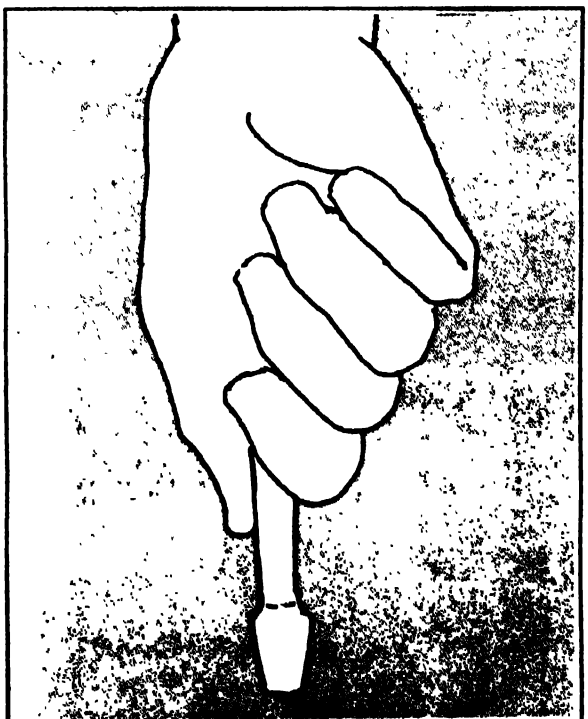
কাছের অস্থির (Carpus) গঠনের জন্য বুড়ো আঙুল তার লম্বা অক্ষের চার ধারে ৪৫ ডিগরি কোণে ঘুরে যাবার ক্ষমতা রাখে।

আমাদের বুড়ো আঙুলের আর একটা বৈশিষ্ট্য সে অন্য চারটি আঙুলের যে কোনোটার সঙ্গেই সূক্ষ্ম মুঠি গঠন করতে পারে। এর কারণ, বুড়ো আঙুল, তার গঠনের জন্যে

বুড়ো আঙুল না তর্জনী কোনটি বেশি লম্বা?

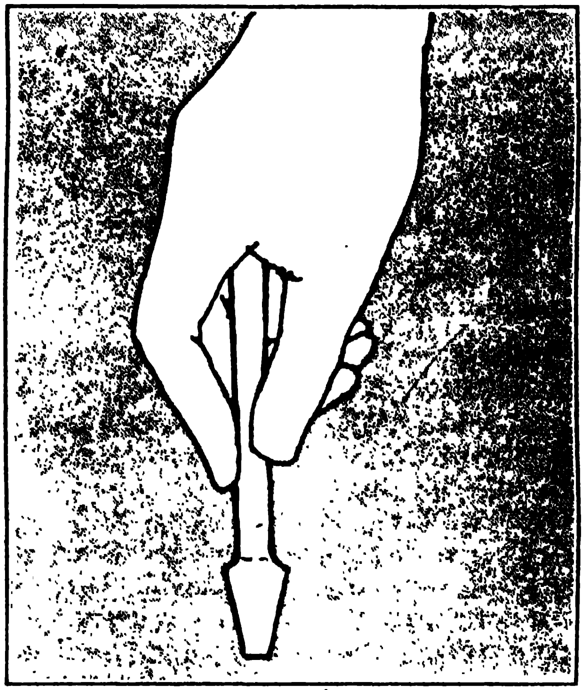
যে কোনো আঙুলের সামনে বা পিছনে যেতে পারে। সাধারণত আমরা লেখা বা আঁকার মত সূক্ষ্ম কাজের সময়ে বুড়ো আঙুল, তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে সূক্ষ্ম মুঠি গঠন করি।

লঘু মস্তিষ্ক (Cerebellum) নামে মস্তিষ্কের বিশেষ অংশই আঙুল, তালু বা হাতের পেশীর নাড়াচাড়ার মাত্রা



শক্তিশালী মুঠি

নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ক'রে থাকে। হাতের পেশী থেকে আসা স্নায়ু-বার্তা সে সরাসরিও গ্রহণ করে আবার গুরু মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কের উচ্চতম কেন্দ্রের ফেরত



সূক্ষ্ম মুঠি

পাঠানো বার্তাও সে নিয়ে থাকে। এই দু'টোই সে বিশ্লেষণ করে। গুরু মস্তিষ্ক পেশীতে যে-বার্তা পাঠায় তাকে লঘু মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

শিশুরা ঠিক ভাবে পেনসিল ধরে লিখতে পারে না। কারণ তাদের হাতের পেশীর সঙ্গে গুরু বা লঘু মস্তিষ্কের

শক্তিশালী ও সূক্ষ্ম মুঠি কি ভাবে গঠন হয়?

সঠিক সংযোগ থাকে না। অভ্যেসের মাধ্যমে এই সংযোগ তৈরি হয়, নতুন স্নায়ু-বর্তনী গড়ে ওঠে এবং তা স্থায়ী হয়। এই ভাবেই সে লিখতে শেখে।

মানুষ দু-পায়ে মাথা সোজা করে দাঁড়ায় কি ভাবে?

চলন ও গমন প্রাণীজগতের এক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দু' পায়ে মাথা সোজা করে দাঁড়ানো এবং ঐ ভঙ্গিমায় (Posture) চলন ও গমন কেবলমাত্র মানুষ্য জাতির বৈশিষ্ট্য। বানর জাতীয় প্রাণী বা মানুষের পূর্বপুরুষ প্রাইমেট শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদেরও অল্পবিস্তর ওই একই ভঙ্গিমায় হাঁটাচলা করতে দেখা যায়। মানুষের মস্তিষ্কের (brain)

কার্যাবলী এবং গঠন প্রকৃতি বর্তমান কালের অতি উন্নতমান কম্পিউটার যন্ত্রের থেকেও জটিল। মানুষের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমা পরিচালিত হয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি প্রতিবর্তী (reflexes) ক্রিয়ার সাহায্যে। দাঁড়িয়ে থাকার প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলিকে বলা হয় রাইটিং প্রতিবর্তী ক্রিয়াসমূহ (Righting reflexes)। এই ক্রিয়াগুলির গ্রাহকযন্ত্র (Receptors) ছড়িয়ে আছে কানের মধ্যেকার লেব্রাইনথাইনে (Labyrinthine—vestibular appara-tus), মাথা (Head), ঘাড় (Neck), শরীর (Body), এবং চোখে (Eye)। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অভিকর্ষ, মাথা, ঘাড়, শরীর এবং ভারসাম্যের বার্তা পৌঁছে দেয় মধ্য মস্তিষ্কের (Mid-brain) কেন্দ্রস্থলে। মধ্য মস্তিষ্ক দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমার পরিচালক হলেও চলন, গমন, ভারসাম্য রক্ষা করার দায়িত্বে গুরু মস্তিষ্ক (Cerebrum), লঘু মস্তিষ্ক (Cerebellum) ও স্পাইনাল কর্ডের উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

আমরা বুড়ো হই কেন?

বয়স বাড়ে আর সবাইকে একদিন বুড়ো হতে হয়। বুড়ো না হওয়ার জন্যে মানুষ কত রকম চেষ্টাই না করে। কিন্তু বয়সকে ধরে রাখার সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে বার্ধক্য আসে।

বয়স যত বাড়ে আমরা তত বুড়ো হই। বুড়ো হতে আমরা কেউ চাই না, কারণ বুড়ো হওয়া মানেই ক্রমশ কার্যক্ষমতা এবং সৌন্দর্য হারানো। কিন্তু সময়ের বিধানে বার্ধক্য আসবেই। বুড়ো বলতে আমরা বুঝি ৫০-৬০ বছরের বা তারও বেশী বয়সের একজন ব্যক্তিকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের শরীরে বুড়ো হবার প্রথম লক্ষণ ৩০ থেকে ৩৫ বছর বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায়। তবে 'বুড়ো' হবার সমস্ত লক্ষণ ওই বেশি বয়সেই এক সঙ্গে প্রকাশ পায়।

একজন বুড়ো ব্যক্তির কুঁচকে যাওয়া দেহত্বক (Skin), শিথিল ও অক্ষম পেশী, নরম হয়ে যাওয়া হাড় বা বেঁকে যাওয়া শরীর ইত্যাদি সহজেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আসলে বয়স যখন বাড়তে থাকে, তখন আমাদের দেহে কোলাজেন নামের এক তন্তু জাতীয় পদার্থ তৈরি করবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। কোলাজেন দেহত্বক, পেশী, হাড় বা কণ্ডরা (Tendon) প্রভৃতির মধ্যে থেকে আমাদের শরীরকে সবল বা টানটান অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে। বেশি বয়সে ওই কোলাজেন তন্তু তৈরি কেবল কমে যায় না, আগে তৈরি হওয়া কোলাজেনও বার্ধক্যে আসে, তাই নরম এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়।

দেহ কোষের 'সময়ের ঘণ্টা' আর একটি বিস্ময়কর ব্যবস্থা। এই দেহ কোষেরা কিন্তু নিজেরা বিভাজিত হয়ে অনেক সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। এদের জীবনকাল কম। তাই মৃত হয়ে যাওয়া কোষের জায়গা নতুন তৈরি হওয়া কোষ এসে ভরাট করে দেয়। কিন্তু সময়ের ঘণ্টার প্রভাবে

আমরা কখন থেকে বুড়ো হতে শুরু করি?

এদের বিভাজন হবার ক্ষমতা নির্দিষ্ট, অর্থাৎ একটি কোষ যদি পঞ্চাশবার বিভাজিত হয়, তবে তার বেশি কখনই সে আর বিভাজিত হবে না, মৃত হয়ে যাবে। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তারা নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছে যায়, তখন তারা মৃত হতে শুরু করে। অবশেষে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যেমন যকৃত, বৃক্ক ইত্যাদির ওজন, কার্যক্ষমতা কমতে শুরু করে।

চামড়ায় ভাঁজ পড়ে কেন?

সময় যেমন ক্রমশ মানুষকে বুড়ো করে, ঠিক তেমনি আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষ এবং দেহ কোষও একটি নির্দিষ্ট 'সময়ের ঘণ্টা' অনুযায়ী কর্মক্ষম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের সংখ্যাও কমতে সুরু করে। বেশি বয়সে এদের সংখ্যা এত কমে যায়, যে নতুন কোরে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে না, উপরন্তু স্মৃতি লোপ, বুদ্ধির হ্রাস, চিন্তা করার ক্ষমতা অনেক কমে যায়। আবার মস্তিষ্ক যেহেতু আমাদের শরীরের অন্যান্য তন্ত্রদের, যেমন হৃদয় ও রক্ত সংবহন তন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র প্রভৃতির কাজকর্মের পরিচালনা করে, তাই বহু স্নায়ুকোষের মৃত্যুর ফলে, ওই পরিচালনা ব্যবস্থাও অনিয়মিত হয়ে যায়। তখন নিয়ন্ত্রণ হারানো অন্যান্য তন্ত্রও তাদের কাজ-কর্মে গাফিলতি শুরু ক'রে দেয়। অর্থাৎ ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না।

বুড়ো হবার কারণ হিসেবে আরো অনেক বিষয় আছে। যেমন, অনাক্রমতা (Immunity), শক্তির হ্রাস, হর্মোনের ক্ষরণের হ্রাস, মুক্ত মৌলিক পদার্থ, বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক পদার্থের দেহে সঞ্চয় হওয়া, প্রভৃতি। তবে বর্তমান কালে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কোষের মধ্যের ক্রোমোজোম এবং জিনের মধ্যের ডি এন এ-র আকৃতিগত বিকৃতি, পরিবর্তন, কার্যক্ষমতা লোপ ইত্যাদিই বুড়ো হবার প্রধান কারণ হতে পারে।

আর্গোনমিক্স

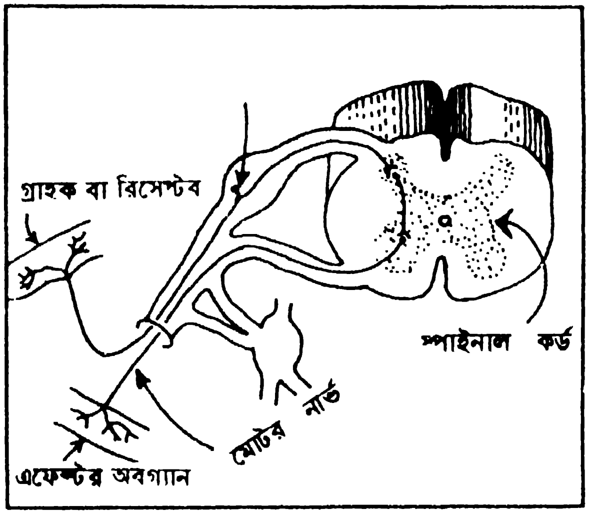


মানুষের গঠন আর অভ্যেসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যন্ত্র তৈরির কথা প্রথম মাথায় আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। সে-সব যন্ত্র তৈরি করার সময়ে যন্ত্রচালকের শরীরের গঠন, মাপ, দক্ষতা, কোন পরিবেশ বা মানসিক অবস্থার মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হবে, সে সব কিছুই হিসেবে ধরা হয়নি। ফলে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যন্ত্রের ক্ষমতার তুলনায় অনেক কম কাজ পাওয়া গিয়েছে। এই সময়ে বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদ্‌দের চেষ্টায় জন্ম নিল নতুন এক বিষয়—আর্গোনমিক্স (Ergonomics)। গ্রিক ভাষায় আর্গন (Ergon) মানে কাজ, আব নোমোস (Nomos) শব্দের অর্থ সূত্র (Law)। আর্গোনমিক্স হল মানুষের সঙ্গে তার কাজ করার পরিবেশের বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ।

দুর্ঘটনা সব সময়ে এড়ানো যায় না কেন?

গাড়ি চলছে। পথচারী হঠাৎই গাড়ির মুখোমুখি। পথচারী নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলো। গাড়িচালকও ব্রেক ক'ষে গাড়ির গতি রুদ্ধ করতে চাইল। তবু দুর্ঘটনা কখনও ঘটে, কখনও নয়। কেন?

দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের শরীরের একটা বিশেষ ধর্ম কাজ করে। কোনো একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে চোখের সামনে, সেটা সম্পর্কে কী করবো, কী সিদ্ধান্ত নেবো তা ঠিক করতে কিছুটা সময় চলে যায়। একটা ক্রিয়া আর সেই সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া। ব্যাট্‌স্‌ম্যান ব্যাট করছে, ফিল্ডার দাঁড়িয়ে আছে



রিঅ্যাকশন টাইম

উইকেটের খুব কাছাকাছি, একেবারে সিলি পয়েন্টে। ব্যাটে বলে হওয়ার পরে ক্যাচ উঠছে—এটা একটা ক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া যত তাড়াতাড়ি হবে, ফিলডারের হাতে বল জমার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার মাঝে এই যে সময়—একে বলে 'রি-অ্যাকশন টাইম' (Reaction time)। দুর্ঘটনা হবে কি হবেনা, তা অনেক সময়ে রি-অ্যাকশন টাইমের উপরে নির্ভর করে।

কিন্তু এই সময় লাগার কারণ কী? শব্দ কিংবা আলোর মত যে-সব মাধ্যম বাইরের পরিবেশের খবর আমাদের জানায়, তাদের বলে উদ্দীপক বা স্টিমুলাস (Stimulus)। চোখ, কান, ত্বক এরা এই উদ্দীপকের রিসেপটর (Receptor) বা গ্রাহকের কাজ করে। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কান দিয়ে শুনি, ত্বকের সাহায্যে অনুভব করি। এই গ্রাহক থেকে খবর সেনসরি নার্ভ (Sensory nerve) দিয়ে পৌঁছোয় কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে, অর্থাৎ মস্তিষ্কে বা সুষুম্না কাণ্ডে (Spinal cord)। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের খবর মোটর নার্ভ (Motor nerve) দিয়ে ফেরত আসে এফেকটর অরগ্যানে (Effector organ), অর্থাৎ যে-অংশে প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে সেই অংশে। এটা শরীরের একটা পেশী হতে পারে। উদ্দীপকের মাধ্যমে গ্রাহক খবর সংগ্রহ ক'রে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে পাঠালো এবং কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের নির্দেশে প্রতিক্রিয়া হল—মাঝের এই সময়কালটাই বিজ্ঞানের ভাষায় রি-অ্যাকশন টাইম।

শব্দ বা আলো—কোনটায় আমরা আগে সচকিত হই?

গাড়ি চলার সময়ে কেউ এসে পড়লে ব্রেক কষার আগে চালকের 'রি-অ্যাকশন টাইম'-এর হিসেব নেওয়া দরকার। ব্রেক কষার পরেও গাড়ি কিছুটা গড়িয়ে যায়। পথচারীরও রি-অ্যাকশন টাইম আছে। উভয়ের প্রতিক্রিয়া ঠিক সময়ে না হ'লেই দুর্ঘটনা ঘটে। কোনো উদ্দীপক আসছে আগে থেকে জানা থাকলে রি-অ্যাকশন টাইম কমে যায়। উদ্দীপকের ধরন, তা কতটা জোরালো, যাঁর প্রতিক্রিয়া হবে তাঁর বয়স, মানসিক অবস্থা, তিনি পুরুষ না মহিলা, এমন অনেক কিছুরই উপর রি-অ্যাকশন টাইম নির্ভর করে। উদ্দীপক জোরালো হওয়া ভাল। কিন্তু বেশি জোর হলে চমকে গিয়ে রি-অ্যাকশন টাইম বেড়ে যেতে পারে। দেখা গেছে, উদ্দীপক হিসেবে শব্দ, আলোর চেয়ে বেশি জোরালো, অর্থাৎ শব্দে প্রতিক্রিয়া হয় তাড়াতাড়ি।

খেলোয়াড়রা মাঠে নামার আগে ওয়ার্মিং আপ করে কেন?

খেলার মাঠে নামার আগে খেলোয়াড়রা একটু ছোটাছুটি ক'রে নেয়, খেলোয়াড়ি ভাষায় যাকে বলে ওয়ার্মিং আপ (Warming up)। এতে কী লাভ হয়? শুধু হাত-পায়ের জড়তা কাটিয়ে নেওয়ার জন্যই কি এই ছুটোছুটি? ঠিক তা নয়। ওয়ার্মিং আপ আরো অনেক কারণে দরকারী।

খেলার জন্য বাড়তি শক্তির প্রয়োজন। কোষের ভিতর

অক্সিজেনের সাহায্যে খাদ্য দহন ক'রে শক্তি তৈরি হওয়ার সময়ে প্রথমে খাবারের জটিল অণু ভেঙ্গে যায় সরল অণুতে। পরে তা অক্সিজেনের সাহায্যে দহনের ফলে শক্তি উৎপাদন করে। এই পুরো পদ্ধতিকে বলে বিপাক বা মেটাবলিজম (Metabolism)। বেশি তাপমাত্রায় বিপাকের হার বেড়ে যায়। কোষে অক্সিজেন ঢোকার হারও বাড়ে। ওয়ার্মিং আপ-এর সময়ে দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে নিলে তাই বেশি শক্তি পাওয়া যাবে। 1 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে বিপাকের হার শতকরা 13 ভাগ বেড়ে যায়। তা ছাড়া ছোটাছুটি মানেই পেশীর কাজ। পেশীকে সক্রিয় করে নার্ভ বা স্নায়ু। তাপমাত্রা বাড়লে স্নায়ু দিয়ে আবেগ (Impulse) প্রবাহ দ্রুত হারে হতে থাকে। ফলে ছোটাছুটি করতে সুবিধে হয়।

ঠিকমত ওয়ার্মিং আপ ক'রে নিলে একজন দৌড়বীর চারশো গজ দৌড়ের সময় তিন সেকেণ্ড কমাতে পারে। বড় বড় প্রতিযোগিতায় এই সময়ের দাম নেহাত কম নয়। হাল্কা ধরনের খেলাধুলোর আগে মিনিট পাঁচেক, আর খুব বেশি দমের খেলাধুলোর আগে কম ক'রে আধঘণ্টা ওয়ার্মিং আপ প্রয়োজন।

চেয়ারের ঠেস কেমন হবে?

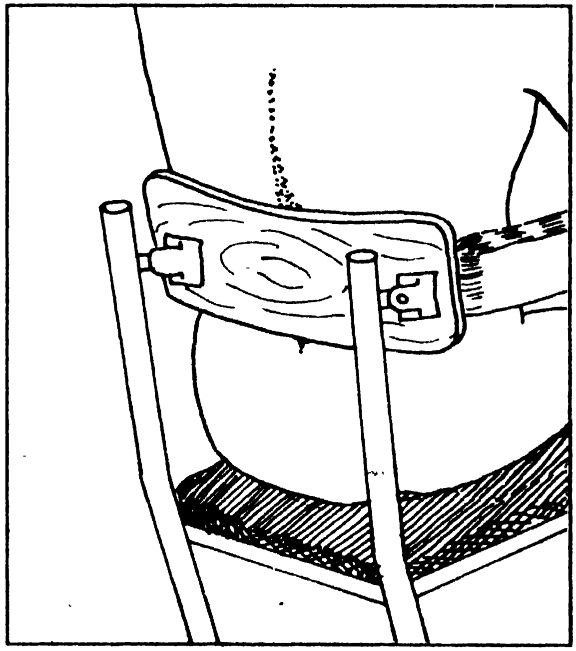
টুলে বা বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে বসার উপায় নেই। সে-দিক থেকে চেয়ার অনেক আরামের। সেখানে আমরা ঠেস দিয়ে বসার সুযোগ পাই।

এক এক চেয়ারের ঠেস এক এক রকমের। ডেকোরেটারের দোকান থেকে যে-চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়, তার ঠেসটা তেমন উঁচু নয়, তা ছাড়া একটু বাঁকানো; কাঠের চার পাঁচটা রড লম্বালম্বিভাবে পিঠের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। বাড়িতে আমরা যে-সব চেয়ার ব্যবহার করি, তার পিঠটা একটু উঁচুই হয়ে থাকে; কিন্তু অনেক সময়ে

বসার সময়ে পিঠের কোন অংশে ঠেস চাই-ই চাই?

সেটা দেখি পিজবোর্ড দেওয়া বইয়ের মলাটের মত সমান আর শক্ত। কিন্তু চেয়ারের ঠেস ঠিক কী রকমের হওয়া উচিত?

আমাদের শরীরের ভিতরে হাড়গোড়ের যে-কঙ্কালটা, সেটা অনেকটা প্রতিমার খড়ের কাঠামোর কাজ করছে। তার উপরে আছে মেদ মাংসে সাজানো শরীরটি। কঙ্কালের প্রধান অংশের মধ্যে রয়েছে মাথার খুলি আর মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডে আছে তেত্রিশটি কশেরুকা বা ভার্টিব্রা (Vertebrae)। এদের মধ্যে ঘাড়ের কাছে সাতটি সার্ভাইকাল (Cervical), বুকের কাছে বারোটি থোরাসিক (Thorasic), কোমরের কাছে পাঁচটি লাম্বার (Lumbar) ও পাঁচটি স্যাক্রাল (Sacral) ও একদম শেষে চারটি হাড় মিশে একটি ককসিজিয়াল (Coccygeal)।



অ্যাডজাস্টেবল ব্যাক রেস্ট

পিঠের কাছের কশেরুকাগুলির নুয়ে পড়ার ঝোঁক কম, কারণ তারা বুকের পাঁজরের সাপোর্ট বা ঠেস পাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হল কোমর বা লাম্বার অংশের। এই এলাকাকে উপরের সমস্ত অংশের ভার বইতে হয়। অথচ একে ঠেকনা দেওয়ার মত কিছু নেই। তাই মেরুদণ্ডের সামনে ঝুঁকে পড়ার ঝোঁককে বাধা দিতে লাম্বার এলাকাকে একটা ঠেস দিতেই হবে—অনেকটা ঝুঁকে পড়া বৃদ্ধের লাঠির ভরের মত।

এইজন্য চেয়ারের ব্যাক-রেস্ট থাকা দরকার। তা 10 থেকে 20 সেন্টিমিটারের মত হলেই চলে যায়, তবে সেটা লাম্বার এলাকায় হওয়া চাই। মেরুদণ্ডের বক্রতাকে সাপোর্ট দিতে পিঠের ঠেসটি সমতল না রেখে পিছন দিকে বাঁকানো

রাখা দরকার। নড়ে-চড়ে বসার সুবিধের জন্যে সিট আর ব্যাক রেস্টের মধ্যে 15 থেকে 20 সেন্টিমিটার ফাঁক থাকলে ভাল হয়।

এক একজন মানুষের দৈর্ঘ্য এক একরকম। তাই যে-ঠেস একজনের কোমরকে সাপোর্ট দেবে তা আর একজনের কোমরকে নাও দিতে পারে। তাই নামানো ওঠানো যায় এমন, অর্থাৎ অ্যাডজাস্টেবল ঠেসই সবচেয়ে ভাল।

তা ছাড়া আরাম ক'রে বসে গল্প করার বা অনেক দূরে যাওয়ার জন্য বাসের সিটের ঠেস আরো বেশি আরামের



হওয়া চাই। তা না হলে কোমরে যে-ব্যথা হয়, তার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে।

বোঝা কোথায় নেওয়া ভালো—হাতে, পিঠে না মাথায়?

স্কুলের ছেলেমেয়েরা নানারকমের ব্যাগে বই নেয়—কারো হাতে ঝোলানো স্যুটকেস, কারো পিঠে বাঁধা ব্যাগ, কাউকে আবার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগেও বই নিতে দেখা যায়। বইয়ের বোঝা বেশি নয়, কিন্তু হোল্ড-অল বা ভারী স্যুটকেস সঙ্গে থাকলে তা কুলির মাথায় না চাপিয়ে উপায় নেই। ভারীদের আবার দু'টো কাঁধই ভরসা। তাদের কাঁধের দু'দিকে সমান ভার ঝোলে। পাহাড়ী এলাকার লোকেরা কিন্তু পিঠে বোঝা বইতেই পছন্দ করে।

কিন্তু বোঝা কোন ভাবে বওয়া সবচেয়ে সুবিধের?

বোঝা বওয়ার পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যার ফলে আমাদের শরীরের যে-সব পেশীকে এই বোঝার ভার বইতে হচ্ছে তাদের কম কাজ করতে হয়। পদ্ধতি খারাপ হলে যতটা শক্তি হ'লে কাজ চলে যায় তার থেকে বেশি শক্তি খরচ করতে হয়। বেশি শক্তি পেতে গেলে আবার বাড়াতে

পিঠ-ব্যাগের ডিজাইন কেমন হবে?

হবে খাবারের দহন। তার জন্যে চাই বাড়তি অক্সিজেন। বাড়তি অক্সিজেনের জন্যে দ্রুত শ্বাস নেওয়া দরকার। ফলে আমরা হাঁপিয়ে পড়বো সহজেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, হাতে ঝুলিয়ে ভার নেওয়ার পদ্ধতি সবচেয়ে খারাপ। আর সবচেয়ে ভাল, বোঝা মাথায় বা পিঠে নেওয়া। কারণ তাতে ন্যূনতম শক্তি খরচ হয়। তবে মাথায় বোঝা ব্যালান্স ক'রে হাঁটা তো আর আমাদের অভ্যেস নেই। কাজেই সেটা হাত দিয়ে ধ'রে থাকতে হয়। এতে হাত অসাড় হয়ে আসে। আর তা ছাড়া মাথায় বোঝা বওয়ার দৃশ্যটাও দৃষ্টিকটু।

তাই ভাল হয় যদি বোঝা পিঠে নেওয়া যায়। তবে এর জন্যে দরকার ঠিকঠিক ডিজাইনের ব্যাগ। ব্যাগ যদি এমন হয় যে, ভারটা নীচের দিকে ঝুলে আসছে তাহলে কিন্তু কাঁধের পেশীতে ব্যথা হবে।

ঘরের দরজার ল্যাচ-কি সাধারণত ডান দিকে ঘুরিয়ে দরজা খুলি কেন?

আজকাল অনেক বাড়িতে দরজায় ল্যাচ-কি থাকে।

ছিটকিনি খুলে বা হুড়কো নামিয়ে এ-সব দরজা খুলতে হয় না। নব ঘোরালেই কাজ চলে।

এই নব ঘোরানোর সময়ে আমরা হাতের মুঠোয় নবটাকে ধ'রে সচরাচর ডান দিকে ঘোরাই। কিন্তু কেন?

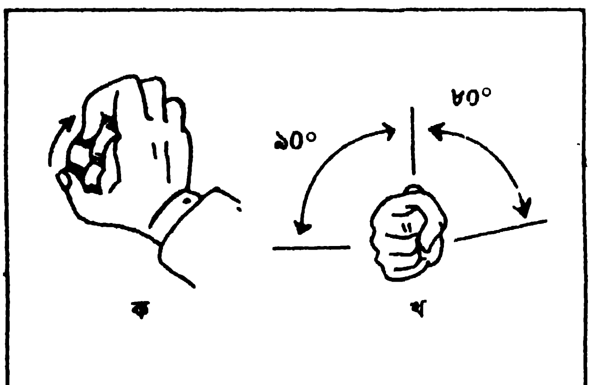
রেগুলেটারের সাহায্যে পাখার গতি বাড়াতে বা রেডিও জোর করার জন্য তার ভল্যুমের নবও আমরা ডানদিকে ঘুরিয়ে থাকি। এরও কি কোনো কারণ আছে?

আমাদের হাতের কব্জি-সন্ধি বা রিস্ট-জয়েন্ট (Wrist-joint)-এর গঠন এমন যে, ঘড়ির কাঁটা যে-দিকে ঘোরে ডান হাতটা সেই দিকে বেশি ঘোরে বাঁ-দিকের তুলনায়, আর তাতে জোরও বেশি দেওয়া যায়। নিজেদের ডান হাতের কব্জি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাই, তা ডান দিকে যতটা ঘুরছে, বাঁ দিকে তেমন ভাবে নয়। বাঁ হাতের বেলায় কিন্তু ঠিক এর উল্টো। অবশ্য বাঁ হাতে আর কতজনই বা কাজ করেন?

কোনো কিছু নকশা করার সময়ে কারিগরদের এ-কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা চাই। বিপদে এর গুরুত্ব বোঝা যায় ভালভাবে। ঘরে যদি কখনো আগুন লাগে, তাহলে

কোনো জিনিস ডিজাইনের সময়ে মানুষের পুরোনো অভ্যেস কাজে লাগাতে হয় কেন?

ভিতরের ভয় পাওয়া মানুষগুলো স্বাভাবিকভাবেই তাড়াহুড়ো করে বেরোতে চাইবেন। অথচ নব যদি উল্টো দিকে ঘোরালে খোলে, উৎকণ্ঠা আর চাঞ্চল্যে রোজ যে-দরজা দিয়ে



যাতায়াত করছি, সে-দরজাতেও এ-কথাটা তখন আর চট ক'রে মনে পড়ে না। তখন হাত ঘুরতে চায় ডান দিকেই।

যে কোনো জিনিস ডিজাইন করার সময়ে মানুষের এই প্রবণতার কথা খেয়াল রাখতে হয়। একে বলে পপুলেশন স্টিরিওটাইপ (Population Stereotype)।

বেশিক্ষণ ছোটার পরে পা ব্যথা করে কেন?

বেশিক্ষণ ছোটাছুটি করলে পায়ে ব্যথা করে। অনেক দিন পরে খেলাধুলো করলেও অনভ্যাসে গা-হাতে-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। নিয়মিত যারা খেলে বা ব্যায়াম করে তাদের কিন্তু এই ধরনের ব্যথার অভিজ্ঞতা কম। এর কারণ কী?

খেলাধুলোর সময়ে শক্তি লাগে বেশি। এইজন্যে অক্সিজেনের সাহায্যে বেশি গ্লুকোজ দহন করা দরকার।

খেলার পরেই কি বিশ্রাম নেওয়া উচিত?

বাড়তি অক্সিজেন জোগানোর জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। কিন্তু যত দেবে তত নেবে—তা-তো নয়। ফলে শরীরের অক্সিজেন নেওয়ার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। অক্সিজেনকে বয়ে নিয়ে কোষে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রক্তের শ্বাসকণিকা হিমোগ্লোবিনের। হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা কিন্তু নির্দিষ্ট। তাই একটা সময়ের পরে রক্তের আর অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা থাকে না। একজন মানুষ সব চেয়ে বেশি যতটা অক্সিজেন কাজে লাগাতে পারে তাকে বলে তার ম্যাক্সিমাল এয়্যারোবিক ক্যাপাসিটি (Maximal aerobic capacity)।

যতক্ষণ অক্সিজেনের সঙ্গে খাদ্য দহন ক'রে শক্তি তৈরির কাজ চলে ততক্ষণ এই পদ্ধতিকে বলে সবাত শ্বসন (Aerobic respiration)। শরীর যখন আর অক্সিজেন নিতে পারে না, তখন শুরু হয় অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration)।

সবাত শ্বসনের সময়ে গ্লাইকোলিসিস (Glycolysis) পদ্ধতিতে গ্লুকোজ ভেঙে পাইরুভিক অ্যাসিড হয়। অক্সিজেনের সাহায্যে এই পাইরুভিক অ্যাসিড ক্রেব-এর অম্লচক্র (Kreb's Cycle) নামে বিপাক-পদ্ধতির সাহায্যে জল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। সেই সঙ্গে

পাওয়া যায় প্রচুর শক্তি। অবাত শ্বসনে গ্লাইকোলিসিস হয়। কিন্তু অক্সিজেন না থাকায় পাইরুভিক অ্যাসিড আর ক্রেবের চক্রে ঢুকতে পারে না।

অবাত শ্বসনে শক্তি অনেক কম পাওয়া যায়। তা ছাড়া পাইরুভিক অ্যাসিড পরিণত হয় ল্যাকটিক অ্যাসিডে। এই অ্যাসিড পেশীতে জমা হলে পেশীর ব্যথা শুরু হয়।

খেলার পরেও কিছুক্ষণ কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেশি থাকে। এই সময়ে জমা ল্যাকটিক অ্যাসিড অক্সিজেনের সাহায্যে প্রথমে পাইরুভিক অ্যাসিডে, তারপরে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর জলে পরিণত হয়। তা ছাড়া শরীরের অক্সিজেন ভাণ্ডারের ঘাটতিও এ-সময়ে পূরণ হয়ে যায়। একে বলে অক্সিজেন ডেট বা অক্সিজেনের ঋণ শোধ।

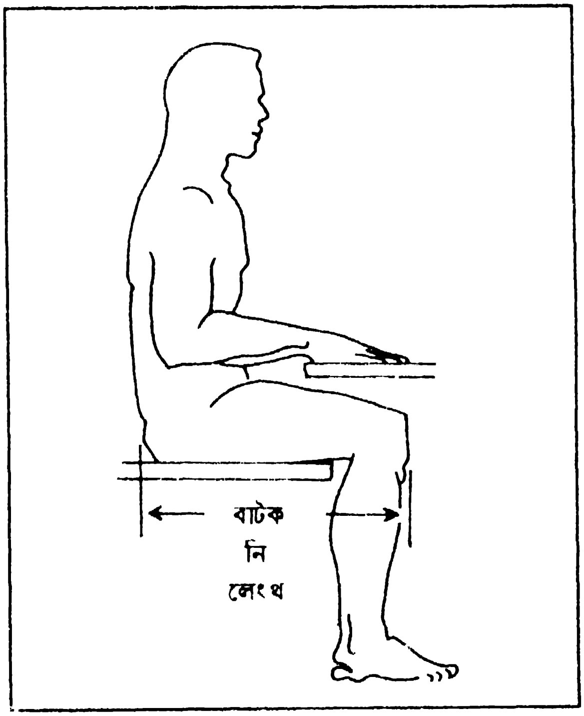
খেলার পরেই বিশ্রাম না নিয়ে অল্প অল্প মাসাজ করলে বা কাজ করলে ল্যাকটিক অ্যাসিড তাড়াতাড়ি দূর হয়, ব্যথাও তাড়াতাড়ি সারে।

যারা নিয়মিত খেলাধুলো করে তাদের ম্যাক্সিমাল এয়্যারোবিক ক্যাপাসিটি বেড়ে যায়। ফলে তাদের অবাত শ্বসনের সাহায্যে শক্তি তৈরি করতে হয় কম। তাই ল্যাকটিক অ্যাসিড কম জমা হয়, আর পেশীতে ব্যথাও বেশি হয় না।

বাসের দু'টো সিটের মাঝের দূরত্ব কতটা হবে?

বেশির ভাগ বাসে দু'টো সিটের মাঝখানে পা রাখার জায়গা থাকে খুব কম। ফলে ঝাঁকুনির চোটে হাঁটুটা সামনের সিটের পিঠে হেলান দেওয়ার জায়গার সঙ্গে ধাক্কা খায়। অনুভূতিটা বিশেষ সুখের নয়। দু'টো সিটের মাঝখানে জায়গা কম থাকলে হয়তো সিটের সংখ্যা বাড়ানো যায়। এতে বেশি লোক বসার সুযোগ পাবেন, কিন্তু বাসযাত্রাটা কি আর আরামের হবে? বাসের দু'টো সিটের মাঝের দূরত্ব কতটা হওয়া উচিত?

বসা অবস্থায় পা রাখার জায়গা বা লেগ স্পেস (Leg-space) কতটা হবে তা ঠিক করার সময়ে লম্বা মানুষদের কথা খেয়াল রাখা উচিত। অর্থাৎ মাপ নিতে হবে 95তম পার্সেন্টাইলে (Percentile)। 95তম পার্সেন্টাইল বলতে আমরা কি বুঝি? ধরা যাক কয়েকটা মাপ নেওয়া হল যেগুলো পরপর সাজালে এ-রকম দাঁড়ায়: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29। এখানে 23-এর বাঁ দিকে আর ডান দিকে সমান অর্থাৎ 4টে করে সংখ্যা আছে। এখানে 23 রয়েছে 50তম পার্সেন্টাইলে। অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সংখ্যা এর থেকে ছোট আর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বড়। এখন শতকরা 99 ভাগ সংখ্যা যে-সংখ্যার থেকে বড়, তাকে



বলবো প্রথম পার্সেন্টাইল; শতকরা 80 ভাগ যার থেকে বড় তাকে বলবো 20তম পার্সেন্টাইল; আর শতকরা মাত্র 5 ভাগ যার থেকে বড় সেটি হবে 95তম পার্সেন্টাইল।

লেগ-স্পেস ঠিক করার জন্য যে-মাপ নিতে হয় তাকে বলে সিটিং বাটক-নি লেংথ (Sitting buttock-knee)। অর্থাৎ বসা অবস্থায় পিছন দিক থেকে হাঁটুর সবচেয়ে উঁচু জায়গার দূরত্ব। দু'টো সিটের মাঝের দূরত্ব হবে এই মাপের কিছুটা বেশি। একেবারে মাপে মাপে হলে নড়ে চড়ে বসা যাবে না। একটু পরেই পা অসাড় হয়ে আসবে।

কাজের জায়গাতেও লেগ-স্পেসের বিষয়টা মাথায় রাখতে হয়। তবে সেখানে সমস্যার সমাধান করা যায় টেবিলের উচ্চতা সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে, যাতে টেবিলের নীচে পা গলিয়ে দিয়ে আরাম ক'রে বসা যায়।

শীতের পোষাক কেমন হবে?

শীতকালে সবাই গায়ে গরম জামা বা চাদর দিয়ে

ঘোরেন। গরম জামা তৈরি হয় উল দিয়ে। উল নিজে তাপের কুপরিবাহী, তাই সে শরীরের তাপকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেয় না। ফলে শরীরটা গরম থাকে। কোনো জিনিস কতটা তাপরোধক হবে তা কিছুটা নির্ভর করে তার ফাঁকে ফাঁকে বাতাস ধরে রাখার ক্ষমতার উপরে। কারণ বাতাস তাপের কুপরিবাহী। উলের ফাঁকে এ-ভাবে বাতাস জমে থাকে। আবার একটা মোটা উলের জামার থেকেও দু'টো পাতলা উলের জামা বেশি আরামের। কারণ দু'টো জামার ফাঁকে জমে থাকা বাতাসের স্তর শরীরটাকে বেশি গরম রাখে।

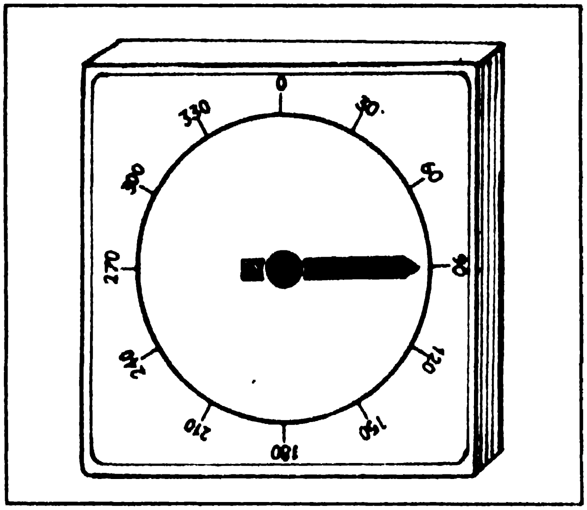
এতো গেল অল্প স্বল্প শীতের কথা। সুমেরু এলাকার ভয়ংকর ঠাণ্ডায় যে-এস্কিমোরা থাকে তারা কীভাবে বাঁচে? এস্কিমোদের জামা তৈরি হয় বলগা হরিণের চামড়া দিয়ে। এদের চামড়ার লোমগুলো বিশেষ ধরনের। লোমগুলো ফাঁপা নলের মত আর তার মধ্যে ভরা থাকে বাতাস। দু'টো লোমের মাঝে তো বটেই, এমন কি প্রত্যেকটা লোমের মধ্যেও বাতাস থাকায় এই জামা অনেক বেশি তাপরোধক হয়। এস্কিমোরাও দু' প্রস্থ জামা পরে। প্রায় 4 সেন্টিমিটার পুরু এই জামার তাপরোধক ক্ষমতা 12 ক্লো। ক্লো হল

দু'টো সোয়েটার পরা আরামের না দু'টো জামা?

তাপরোধক ক্ষমতা পরিমাপের একটা একক। ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আমরা যে জামাকাপড় পরি তার তাপরোধক ক্ষমতা 1 ক্লো ধরা হয়। প্রাচীন প্রবাদ আছে, জামার ভিতরে এস্কিমোরা গরমের দেশের আবহাওয়া তৈরি ক'রে নেয়।

সুমেরু অঞ্চলে যে-সব সেনাদের কাজ করতে হয়, তাঁদের ভালভাবে তৈরি ইউনিফর্মের তাপরোধক ক্ষমতা কিন্তু 4 ক্লোর বেশি হবে না। ফলে নিজেকে গরম রাখতে এঁদের সারাক্ষণ কাজ করার দরকার। এতে বিপাকে তৈরি হওয়া তাপ দেহটাকে গরম রাখে।

গায়ে গরম জামা দিলেও আমাদের হাত খোলা থাকে। গরম জামা পরা একজন মানুষের দেহের শতকরা 20 ভাগ তাপ তার হাত দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই খুব ঠাণ্ডায় হাতে দস্তানাও পরা চাই।



মিটারের পয়েন্টার কেমন হলে রিডিং নিতে সুবিধে হবে?

বিদ্যুৎ খরচের হিসেব করার জন্যে বাড়িতে বাড়িতে মিটার বক্স থাকে। এ ছাড়া আরো নানারকমের মিটার আছে। তাতে রিডিং নেবার জন্যে পয়েন্টার (Pointer) বা সূচক আছে। মিটারের সীমানার গা ঘেঁষে সংখ্যা বসানো থাকে—সূচক কোন সংখ্যার কাছাকাছি রয়েছে, তাই ধরে চলে হিসেব-নিকেশ। দেওয়ালে যে-ঘড়ি থাকে তাতে বা হাত ঘড়িতেও আমরা সময় দেখি একই ভাবে। ঘড়ির কাঁটাই এখানে সূচক বা পয়েন্টার।

এই যে সূচক, এর চেহারাটা কেমন হওয়া উচিত? যে কোনো সূচকেরই গোড়ার দিকটা সাধারণত মোটা আর তার মাথার দিক ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া দরকার। এর উল্টোটা হলেই বিপদ। ভোঁতা মাথার তলায় মিটারের সংখ্যাসূচক দাগ ঢাকা পড়ে যাবে। তখন সঠিক রিডিং নেওয়া যাবে না। ঘড়ির সময় দেখতে সাধারণত এক-আধ মিনিট এদিক ওদিক হলে তেমন কিছু যায় আসে না, কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম মাপজোখ আছে, যেখানে সামান্য হেরফের হ'লেই কাজে গোলমাল হয়ে যাবে।

সূচক কেমন হওয়া উচিত তার একটা হিসেব আছে। ভাল সূচকের বেলায় তার সরু ধার দু'টো মাথার কাছে মিশে যে-কোণ তৈরি করে, তা 20 ডিগরির মত হওয়া

দরকার। সূচকের দৈর্ঘ্য এমন হবে যে, তা স্কেল বা ডায়ালের দাগ পর্যন্ত পৌঁছবে, কিন্তু দাগ ঢাকা দিয়ে দেবে না। তা ছাড়া সূচকটি ডায়ালের তলের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকবে, নয়তো দৃষ্টি বিভ্রমের (Parallax) জন্যে রিডিং নিতে ভুল হবে। দৃষ্টিভ্রম এড়ানোর জন্যে অনেক সময়ে মিটারের স্কেলের ঠিক নীচে দাগের সারি বরাবর এক ফালি আয়না বসানো থাকে। সেই আয়নায় সূচকের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে। মিটারের রিডিং এমনভাবে নিতে হবে যাতে সূচক ও তার প্রতিবিম্ব একই রেখায় থাকে। দৃষ্টি

রিডিং নেওয়ার সময়ে কেমন ভাবে মিটার লক্ষ্য করবো?

উল্লম্বভাবে মিটারের ডায়ালে পড়লে তবেই এই শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব।

ঠিকমত রিডিং নেওয়ার জন্যে সূচকের রঙেরও একটা ভূমিকা আছে। ডায়ালের রঙের সঙ্গে তা মিশে গেলে চলবে না। আবার রিডিং-এর দাগের কাছাকাছি সূচকের যে-অংশ থাকবে সেখানকার রঙ গাঢ় বা চড়া হলে অসুবিধে হবে। তাই গোড়ার অংশটা ডায়ালের রঙের চেয়ে ভিন্ন রঙের ও গাঢ় হলে ভাল হয়। আর সরু অংশটার রঙ ক্রমে হালকা হলে সবচেয়ে ভাল।

খেলোয়াড়রা কি খেলার আগে খুব বেশি খেয়ে নেবেন?

খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের খাটাখাটুনি তো আর কম করতে হয় না। খাটবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা পাই খাবার থেকে। তাহলে খেলতে নামার আগে

খেলার ফাঁকে ফাঁকে কি গ্লুকোজ-দ্রবণ খাওয়া দরকার?

খেলোয়াড়রা কি পেট ভরে খাবার খেয়ে নেবেন?

না, তা কখনোই উচিত হবে না। ভর-পেট খেয়ে খেলতে নামলে শারীরিক অস্বস্তি তো হবেই, তা ছাড়া আরো কয়েকটা অসুবিধে দেখা দেবে। হজমে সাহায্য করার জন্যে খাওয়ার ঠিক পরেই খাদ্যনালীতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। আবার খেলার সময়ে পেশীকে বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে, তাই তারও বেশি অক্সিজেন দরকার। অর্থাৎ এইজন্যে পেশীরও চাই বাড়তি রক্ত। ভর-পেট খেয়ে খেলতে নামলে খাবার নালী আর পেশীর মধ্যে শুরু হবে রক্ত পাওয়ার লড়াই। তাই খাবার অন্তত আড়াই ঘণ্টা পরে কোনো খেলোয়াড়ের খেলতে নামা উচিত।

খেলতে নামার ঠিক আগেই বা খেলার সময়ে গ্লুকোজ-দ্রবণ খাওয়া দরকার বলে যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। বাড়তি চিনি মোটেই বাড়তি শক্তি জোগায় না। বরং চিনি খেলেই রক্তের ইনসুলিন (Insulin) হরমোন কাজ করতে শুরু করে। তার কাজ রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়তে না দেওয়া। রক্তের চিনি গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত থাকে। ইনসুলিন রক্তের চিনিকে গ্লাইকোজেনে (Glycogen) পরিণত করে, আর গ্লাইকোজেন গিয়ে জমা হয় কলা বা টিস্যুতে।

এখন পেশী বা যকৃতে যে-গ্লাইকোজেন জমা থাকে কাজ করা বা খেলার সময়ে তা ভেঙে গ্লুকোজ হয়। এই গ্লুকোজই জ্বালানি হিসেবে কাজ ক'রে শক্তি জোগায়। কাজেই গ্লুকোজ যদি আবার গ্লাইকোজেন হয়ে যায় তাতে যথেষ্ট অসুবিধে হবে।

খুব বড় খেলার আগের দিন বরং বেশি ক'রে শর্করা জাতীয় খাবার খেয়ে শরীরে গ্লাইকোজেনের সঞ্চয় বাড়িয়ে রাখা দরকার, যাতে পরের দিন খাবারের যোগানে ঘাটতি না পড়ে। গ্লুকোজ-দ্রবণ খেতে হলে তা খেলার এক-দেড় ঘণ্টা পরে খাওয়া উচিত, খেলার মাঝে নয়।

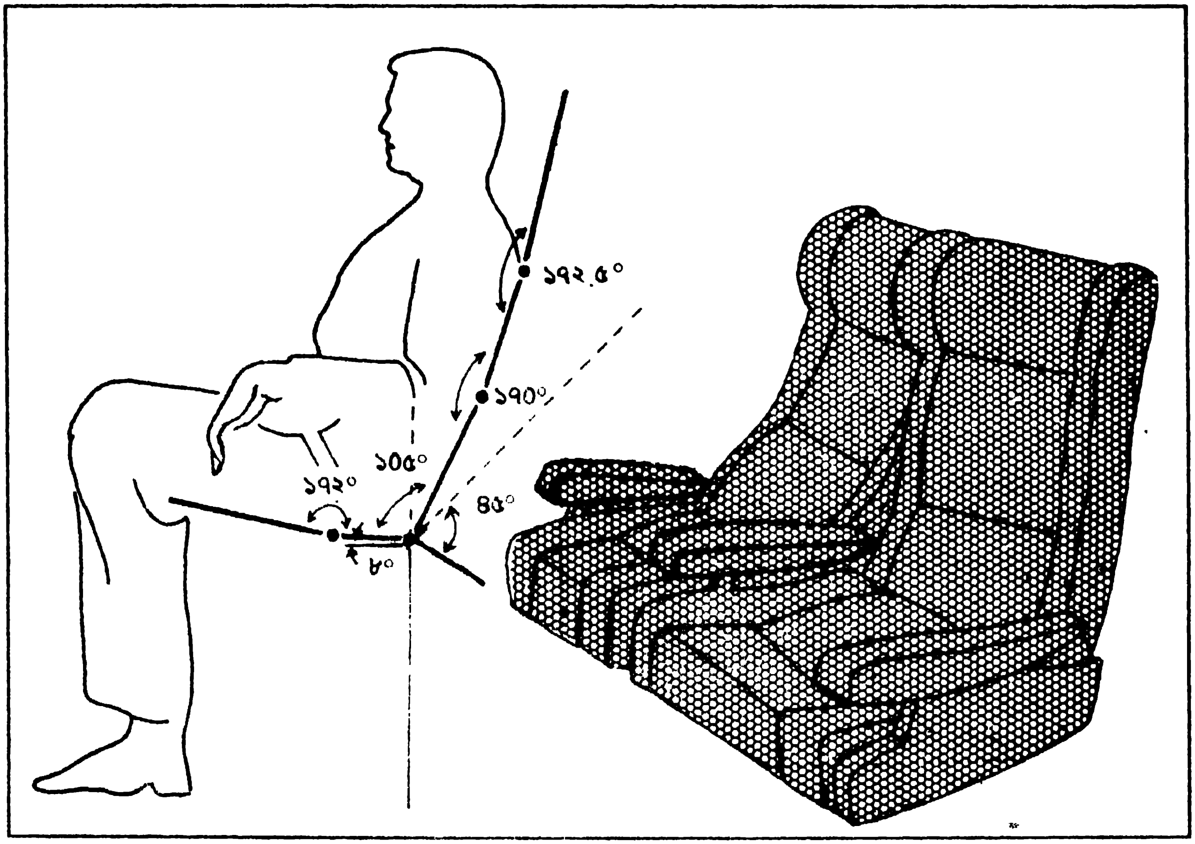
দূরপাল্লার বাসের সিট কেমন হওয়া উচিত?

দূরপাল্লার বাসে যাত্রীদের সুদীর্ঘ পথ একটানা বাসের সিটে সাঁটা হয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই বাসের সিট যদি আরামের না হয়ে যথেষ্ট ছোট হয়, পিঠের ঠেসটা হয় খাড়া

বাসের সিটের গদি রেক্সিন-মোড়া হওয়া কি ভাল?

আর সামনের দিকে হেলে পড়া, তাহলে বাসে জায়গা পেলেও যাত্রাটা খুব সুবিধের হবে না।

দূরপাল্লার বাসে কিংবা সিনেমা, থিয়েটারের মত



দূরপাল্লার বাসের জন্য আরামদায়ক সিট

অবসর বিনোদনের জায়গায় সিট হবে যতটা সম্ভব আরামের। সিট আরামদায়ক করার জন্য কী কী করা যায়?

সবচেয়ে ভাল হয় যদি তার বিভিন্ন অংশের মাপ খুশি মত বাড়ানো কমানোর ব্যবস্থা থাকে। আর এখন অনেক বাসেই স্লাইডিং সিট-ও থাকে। এ-সিট এমনই যা দরকার মত পিছনে ঠেলে দেওয়া বা সামনে টেনে নিয়ে আসা চলে। ফলে যাত্রী তাঁর সুবিধেমত সিটের দৈর্ঘ্য ঠিক ক'রে নিতে পারেন।

দূরপাল্লার বাসে পিঠের ঠেস হবে বসার জায়গা থেকে মাথা পর্যন্ত একটানা। ঠেসটিকেও দরকার মত হেলানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। ঠেসটি এমন হবে যে, তা যেমন মেরুদণ্ডকে ঠিকমত ঠেকনা দেবে, তেমনি মাথাও যাতে দরকার মত বিশ্রাম পায় তা-ও দেখবে। এ-জন্যে উপরের অংশটা সামান্য পিছনে হেলানো হবে। এ-ছাড়া ঠেসটা পিঠের বক্রতার মাপে অবতল হওয়া দরকার।

আর একটা জরুরী কথা হল, দু'টো সিটের মাঝখানে যেন পা ছড়ানোর যথেষ্ট জায়গা থাকে। তা ছাড়া দূরপাল্লার বাসের সিট গদি-মোড়া হওয়া খুবই দরকার। নয়তো শরীরের পেশীগুলো একটানা চাপ সইতে সইতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। গদি থাকলে ঝাঁকুনির হাত থেকেও কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। আর গদির উপরের ঢাকনা রেক্সিন জাতীয় জিনিসের না হওয়াই ভাল। কারণ রেক্সিন ঘাম শুষে নিতে পারে না বলে যথেষ্ট অস্বস্তি লাগে।

খুব ঠাণ্ডায় আগুনে হাত পা সেঁকা কি ভাল?

দার্জিলিং-এর মত ঠাণ্ডা জায়গায় শীতকালে বেড়াতে গেলে ফায়ার-প্লেসের আগুনে বা রুম হিটারে হাত-পা গরম করতে আরাম লাগে। পথে-ঘাটেও শীতে অনেক সময়ে নজরে আসে, খোলা জায়গায় কাঠকুটো জড়ো ক'রে একদল লোক গোল হয়ে বসে আগুনে হাত-পা সেঁকছে। এইভাবে শরীর গরম করার চেষ্টা কি ভাল?

হাত-পা গরম ক'রে গরম থাকার এই যে চেষ্টা, এটা কিন্তু ভাল নয়। এর ফলে আমাদের শরীরের ভিতরে তাপ

নিয়ন্ত্রণে রাখার যে-ব্যবস্থা রয়েছে তা ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।

আমাদের সমস্ত শরীরের তুলনায় পা বেশি ঠাণ্ডা হয়। তাই পা গরম রাখলে আরাম লাগে ঠিকই। কিন্তু পায়ে যে-সব তাপ-গ্রাহক আছে, প্রধান তাপ-নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের উপরে তাদের প্রভাব খুব বেশি। পা বেশি গরম হয়ে গেলে ওই কেন্দ্র সাড়া দেবে আর তাপ ধরে রাখার বদলে বেশি তাপ শরীর থেকে বের ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই পা গরম থাকলেও শরীরটা বেশি ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে। অনেকক্ষণ আগুনে হাত-পা সেঁকলে অনেক সময়ে শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এত ওলোট-পালোট হয়ে যায় যে, একই সময়ে কাঁপুনি লাগে আবার ঘামও বেরোতে থাকে। অথচ কাঁপুনি লাগা শরীর গরম করার একটা উপায় আর ঘাম বেরোলে শরীর ঠাণ্ডা হয়!

একই সঙ্গে কি কাঁপুনি লাগা আর ঘাম বেরনো সম্ভব?

তাই শরীরকে তার স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়ার জন্যে বেশিক্ষণ হাত-পা আগুনে না সেঁকাই ভাল। রুম হিটার দিয়ে শুধু মেঝে গরম রাখার ব্যবস্থাও একই অসুবিধের সৃষ্টি করে।

ট্র্যাফিক সিগনালে গাড়ি থামানোর জন্যে লাল আলো থাকে কেন?

ট্র্যাফিক সিগনালে যে-লাল আলো আমাদের নজরে আসে তাতে গাড়ি থেমে যায়। হাওড়ার ব্রিজের মাথায় লাগানো লাল আলো কিংবা টি ভি টাওয়ারের লাল আলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা ছাড়া অনেক উঁচু বাড়ির মাথাতে লাল আলো জ্বলজ্বল করছে দেখতে পাই। বিমানকে সাবধান করবার জন্যেই এই আলোর ব্যবহার। কিন্তু অন্য আলো না দিয়ে লাল আলো দেওয়ার কারণটা কী?

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে সবচেয়ে ভাল লাল রঙ, আর তারপরেই সবুজ। এরপরে আসছে হলুদ আর সাদা।

আলো কতটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে সেটি দেখার জন্যে আরো কয়েকটা দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তা কতটা বড় হবে তা তো দেখা দরকারই, সেই সঙ্গে তার তীব্রতার দিকটাতেও নজর রাখার প্রয়োজন আছে। মনোযোগ আকর্ষণের ব্যাপারে আরো একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তা হল, স্থির আলোর থেকে দপদপে আলো দৃষ্টিকে বেশি টানে। এই দপদপ করারও একটা হিসেব আছে। আলো যে জ্বলবে, নিভবে—এই জ্বলা-নেভার মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান থাকা দরকার। দেখা গেছে, সেকেণ্ডে 3 থেকে 10 বার জ্বললে আর নিভলে আলো সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

রাস্তার সিগনালের আলো বেশি জোরালো হওয়া কি ভাল?

সিগনালের আলোর পটভূমি আবছা আলো বা একেবারে অন্ধকার হওয়া উচিত। পটভূমির তুলনায় আলো যত চড়া হবে ততই ভাল; পঞ্চাশ-গুণ পর্যন্ত চড়া হলে তা সহজেই নজর কাড়ে। কিন্তু তা যদি একশো গুণের বেশি চড়া হয়ে যায়, তাহলে তা দেখতে অসুবিধে হবে এবং বিরক্তির উদ্রেক করবে। তা ছাড়া হকচকিয়ে দেওয়ার ফলে সাবধান হওয়া তো দূরের কথা, উলটে নতুন বিপদ ঘটতে পারে। লোড শেডিং-এর অন্ধকারে রাস্তা চলতে গাড়ির হেডলাইটের আলো কী রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, সে অভিজ্ঞতা আমাদের কম বেশি সকলেরই আছে।

বেশি পরিশ্রমের মাঝখানে বা ঠিক পরেই জল খাওয়া কি খারাপ?

অনেক সময়ে বড়রা বলেন প্রচণ্ড খেলাধুলোর পরে ঘামা অবস্থায় জল খাওয়া ঠিক নয়, তাতে শরীরের ক্ষতি হয়। এখন কিন্তু বিজ্ঞানীরা অন্য কথা বলছেন। তাঁদের মতে, শরীর থেকে জল বেরিয়ে গেলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তাই যে-হারে ঘাম হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই হারে জল খেয়ে শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করা দরকার।

বেঁচে থাকার জন্যে শরীরের কোষ রক্ত সংবহনের উপর নির্ভর ক'রে থাকে। পরিশ্রমে তৈরি হওয়া অদরকারী, ক্ষতিকর পদার্থকেও সরিয়ে নেয় রক্ত। শরীর থেকে বেশি

জল বেরিয়ে গেলে কোষ ঠিকমত কাজ করতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের উপরও বাড়তি চাপ পড়ে। শরীর থেকে জল বেরনো মানে রক্তের জলীয় অংশও বেশ কিছুটা বেরিয়ে যায়। রক্তের এই ঘাটতি পূরণ করতে হৃৎপিণ্ডকে বেশি ক'রে রক্ত পাম্প করতে হয়। তাই জলের ঘাটতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলা চাই।

ঘামলেই কি নুন-জল খেতে হবে?

আবার ঘামলেই নুনজল খাওয়া দরকার এমন একটা চলতি ধারণাও আছে। এই ধারণাটাও কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ ঘামে নুনের পরিমাণ কম থাকে। তাই ঘামার পরে রক্তে নুনের পরিমাণ এমনিতেই বেড়ে যায়। কারণ ঘামের সময়ে যে-হারে জল বেরোয়, ঠিক ততটা নুন বেরোয় না। তাই বাড়তি নুন খাওয়ার দরকার নেই। বাড়তি নুন খেলে রক্তে নুনের ঘনত্ব ঠিক রাখার জন্যে কোষ থেকে জল বেরিয়ে খাদ্যনালীতে আর রক্তে চলে যাবে। তাতে ক্র্যাম্প বা খিঁচ ধরার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

তাই খেলার বা পরিশ্রমের মধ্যে নয়, বরং তার আগে বা পরে একটু বাড়তি নুন খাওয়া যেতে পারে। তবে তার পরিমাণ যেন খুব বেশি না হয়। ঘামের হার খুব বেশি হলে তবেই এই বাড়তি নুনটুকু খেতে হবে। নয়তো শুধু জলই যথেষ্ট।

টেবিলের নীচে পা-রাখার জায়গা বা ফুট রেস্ট থাকা কতটা দরকার?

বসে থাকা অবস্থায় কোমর থেকে পা পর্যন্ত শরীরের নীচের অংশকে নিয়ে নানা ঝামেলা। কাজের সময়েই হোক বা আড্ডার সময়েই হোক, পা দু'টোকে একই ভাবে রেখে বেশিক্ষণ বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগে না। মাঝে মাঝেই বসার ভঙ্গি পালটে বসতে ইচ্ছে করে।

হাঁটু-সন্ধির (Knee joint) কাছে পায়ের উপরের অংশ নীচের অংশের সঙ্গে এক এক সময়ে এক একরকম কোণ ক'রে থাকে। শোবার সময়ে পা যখন টানটান তখন এই কোণ 180 ডিগরি, আবার হাঁটু মুড়ে, দু' পা যখন বুকের কাছাকাছি নিয়ে আসি, তখন এই কোণ প্রায় শূন্যের মত। আর খাটে পা ঝুলিয়ে যখন 'দ' হয়ে বসি, তখন কোণের পরিমাণ হয়ে যায় 90 ডিগরি। এখন কোন কোণে থাকা বেশি আরামের?

বসে থাকার সময়ে হাঁটু-সন্ধির কাছে পায়ের উপরের অংশ নীচের অংশের সঙ্গে 45 ডিগরি কোণ ক'রে থাকলে বসা সবচেয়ে আরামের হয়। কিন্তু এই কোণ মাঝে মাঝে পালটানো দরকার। টেবিলের নীচে পা রাখার জায়গা বা ফুট-রেস্ট (Foot-rest) থাকলে তার উপর ইচ্ছেমত পা তুলে বসা যায় আর হাঁটু-সন্ধির কোণও পালটানো সম্ভব।

ফুট-রেস্ট থাকলে আরো একটা সুবিধে হয়। কম উচ্চতার মানুষ অনেক সময়ে সাধারণ মাপের চেয়ারে ঠিক মত বসতে পারেন না। পা রাখার জায়গা থাকলে তাঁরা তার উপর পা-টা আরাম ক'রে রাখতে পারবেন। বেশি লম্বারা নীচু চেয়ারে বসলে চেয়ারের ধারালো অংশ তাঁদের উরুর পেশীতে চেপে বসে। ফুট-রেস্টের উপর পা তুলে দিলে এঁদেরও উরুর পেশীর উপরে চাপ কম পড়বে।

শীতে জড়সড় হয়ে থাকতে ভাল লাগে কেন?

শীতকালে জড়সড় হয়ে বসে গল্প করতে ভাল লাগে। শোবার সময়েও গুটিয়ে শুতে ইচ্ছে করে। জন্তু-জানোয়াররাও বেশি ঠাণ্ডায় গোল হয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে থাকে। গরমে অবশ্য ঠিক তার উলটো। তখন হাত-পা ছড়িয়ে বসতে বা শুতেই আরাম। এ-রকমটা হয় কেন?

আমাদের মস্তিষ্কে আছে তাপ নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র। আর চামড়ায় আছে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি বোঝার জন্যে গ্রাহক বা রিসেপটর। ঠাণ্ডার সময়ে তাপ নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র শরীরে তাপ ধরে রাখার জন্যে নানা ব্যবস্থা নেয়। এই সময়ে শরীরের বিপাক হার কিছুটা বাড়ে বলে বেশি তাপ তৈরি হয়। তা ছাড়া রক্তনালীগুলোও সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে চামড়ায় রক্ত চলাচল কম হয়। আর তাই শরীর থেকে বেশি তাপ বেরোতে পারে না।

আমাদের শরীর থেকে যে-তাপ বেরোয় তা বেরিয়ে যায় ত্বকের ভিতর দিয়ে। গুটিয়ে জড়সড় হয়ে থাকলে শরীরের সমগ্রতল বা বডি সারফেস এরিয়া (Body surface area) কমে যায়, অর্থাৎ ত্বকের কম অংশ বাতাসের সংস্পর্শে থাকে। তাই তাপ কম বেরোয়। এইজন্যেই শীতকালে

জড়সড় হয়ে থাকতে আরাম লাগে।

আবার গরমের সময়ে শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র বাড়তি তাপ বের ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন রক্তনালী প্রসারিত হওয়ায় ত্বকে রক্ত চলাচল বাড়ে। বেশি পরিমাণে তাপ এসে সেখানে পৌঁছোয়। তা ছাড়া আছে ঘাম। গরমের সময়ে ঘামগ্রন্থি বা সোয়েট গ্ল্যাণ্ড (Sweat gland) বেশি ঘাম তৈরি করে। ঘাম ত্বকের ছিদ্রপথে বাইরে যায় আর শরীর থেকে লীনতাপ নিয়ে বাষ্পীভূত হয়।

ঘামলে শরীর ঠাণ্ডা হয় কেন?

লীন তাপ কাকে বলে?

কোনো তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হওয়ার সময়ে কিছু পরিমাণ তাপের সাহায্যে বাষ্পীভূত হয়, যা থার্মোমিটারে ধরা পড়ে না। তরল যতক্ষণ বাষ্পীভূত হয় ততক্ষণ থার্মোমিটারে কোনো তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখা যায় না। ধরা যাক, একটা পাত্রে জল গরম করা হচ্ছে। ঠিক জলের ভিতর থার্মোমিটার রাখলে নজরে আসতো তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে যখন 100 ডিগরি সেলসিয়াসে পৌঁছবে তখন বেশ কিছুক্ষণ আর থার্মোমিটারে তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখা যাবে না। ওই 100 ডিগরি তাপমাত্রাতেই জল ফুটে বাষ্প হয়ে যাবে। জল ফুটে বাষ্প হয় যে-তাপের সাহায্যে, তাকে বলে লীন তাপ। 1 গ্রাম জল বাষ্পীভূত হওয়ার জন্যে লীন তাপ লাগে 537 ক্যালরি। ক্যালরি হল তাপ মাপার একক।

ঘামও বাষ্পীভূত হওয়ার সময়ে শরীর থেকে লীন তাপ নেয়। শরীরও ঠাণ্ডা হয়। তাই গরমে হাত-পা ছড়িয়ে ত্বকের বেশি অংশকে বাতাসের ছোঁয়ায় রাখতেই ভাল লাগে।

গাড়ির হর্ন কেমন হওয়া ভাল—একটানা না থেমে থেমে?

রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ে নানারকম শব্দ আমাদের কানে আসে। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চললে একটা শব্দ থেকে আর একটা শব্দ সব সময়ে আলাদা করা যায় না। রাস্তা পার হওয়ার সময়ে বা সাবধানে পথ চলার জন্যে আমাদের হুঁশিয়ার করে দেয় গাড়ির হর্ন। যে হর্ন আমাদের হুঁশিয়ার করে, সে হর্ন কী ভাবে বাজবে?

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে-গাড়ি বা বাস একটানা হর্ন বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসে তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ না-ও করতে পারে। কিন্তু হঠাৎ জোরে ভেঁপুর মত হর্ন যে-কোনো লোককেই চমকে দেবে। তখন বেহুঁশ পথচারীও ঠিক চকিত হয়ে উঠবে।

বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন, অল্প তীব্রতার একটানা শব্দ মন বা শরীরের উপর যতটা প্রভাব ফেলে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে তীব্র আর থেমে থেমে হওয়া শব্দ। ধরা যাক, আমরা মন দিয়ে কোনো কাজ করছি, তখন কানের কাছে চলছে জেনারেটর। তার একটানা ঘড় ঘড় শব্দ কিছুক্ষণের মধ্যে সয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ থেমে থেমে কানের কাছে হাতুড়ি পিটতে থাকে তাহলে খুবই বিরক্ত লাগে। প্রতি মুহূর্তে ওই শব্দ চেতনাকে ধাক্কা দেয়। হর্নের ব্যাপারটাও ঠিক একই রকমের। একটানা হর্ন বিরক্তি আনবে ঠিকই কিন্তু চমকে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা আসে না। চমকে দেওয়ার জন্যে হর্নের শব্দ তীব্র আর থেমে থেমে বা সবিরাম হওয়া দরকার।

সচকিত হওয়ার পিছনে আমাদের শরীরের একটি হরমোন কাজ করে, যার নাম অ্যাডরেনালিন (Adrenalin)। এর আর এক নাম 'জরুরী' অবস্থার হরমোন। এই হরমোন হৃৎপিণ্ডের গতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, এমন কি ঘামের হারও বাড়িয়ে দেয়। হঠাৎ শব্দ এই 'জরুরী' অবস্থার সৃষ্টি করে। তখন মনে যে-ভাব আসে, তাতে পালিয়ে বাঁচার কথাটাই আগে মনে হয়।

পাহাড়ে ওঠার সময়ে অভিযাত্রীরা গগল্‌স্‌ পরে থাকেন কেন?

পাহাড়ের উপর বরফ ঢাকা নিসর্গের ছবি যখন দেখি, তখন তা অপূর্ব লাগে। তার উপর রোদ পড়ে ঝলমল করলে তো কথাই নেই। অথচ পর্বত-অভিযাত্রীরা চোখে চারদিক চাপা পুরু গগল্‌স্‌ পরে থাকেন। এর কারণ কী?

সূর্যের অতি-বেগুনি রশ্মি (Ultra-violet ray) আমাদের চোখ বা চামড়ার পক্ষে রীতিমতো ক্ষতিকর। এই অতি-বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছনোর আগে তার

অনেকটাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শোষণ ক'রে নেয়। এইভাবে সূর্যের আলোর শতকরা 18 ভাগ পরিস্রুত (Filter) হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছোয়। কিন্তু যত উপরে ওঠা যায় ততই বায়ুমণ্ডলের চাপ কমতে থাকায় পরিস্রুত হওয়া ব্যাপারটা

পাহাড়ের মাথায় সূর্য কতগুণ বেশি উজ্জ্বল?

কমে আসে। তা ছাড়া সূর্যের ঔজ্জ্বল্য পাহাড়ের মাথায় 1.2 গুণ বেড়ে যায়।

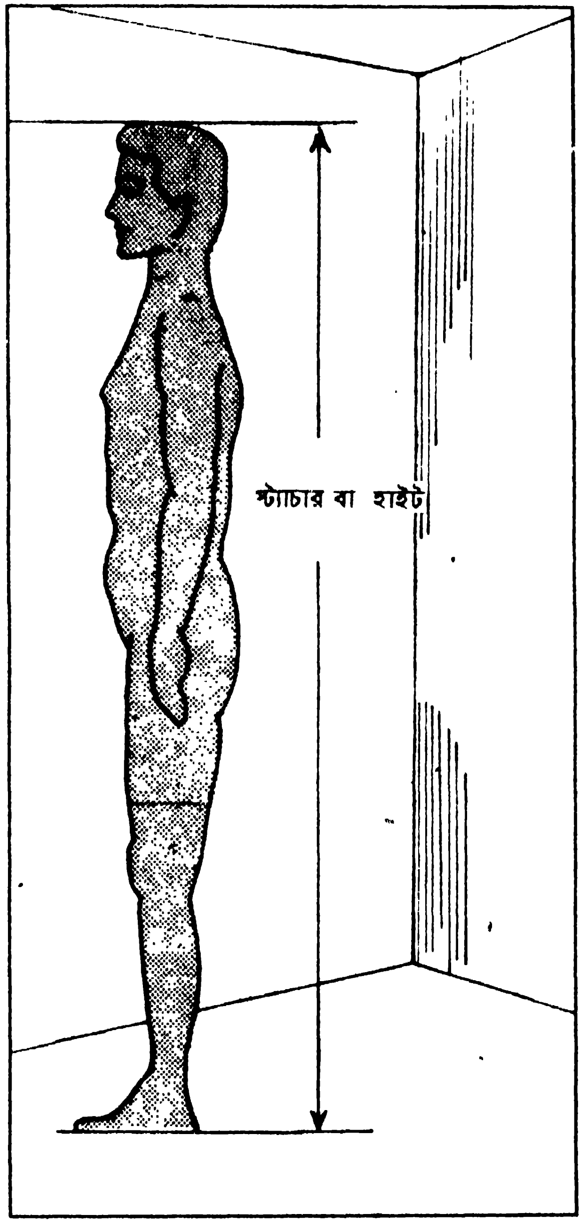
আর একটা সমস্যা হল বরফে সূর্যের আলোর প্রতিফলন। প্রতিফলিত আলো চারদিক থেকে চোখে এসে পড়ে চোখ ঝলসে দেয়। এই প্রতিফলন আর অতি-বেগুনি রশ্মির প্রভাবে চোখে সাময়িক অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে। একে বলে তুষার-অন্ধত্ব (Snow-blindness)। বেশির ভাগ সময়ে এই অন্ধত্ব সেরে গেলেও চোখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। তা ছাড়া এ সাময়িক অন্ধত্ব দুর্ঘটনারও কারণ হতে পারে। এ-জন্যই অভিযাত্রীরা চোখে পুরু গগল্‌স্ পরে থাকেন।

বাসের ছাদ কতটা উঁচু হওয়া উচিত?

মিনিবাসে অনেকক্ষণ ঘাড় নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যাঁর আছে, ব্যাপারটা যে-কতটা কষ্টের সে-কথা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এইভাবে বেশি দিন যাতায়াত করতে হলে ঘাড়ের ব্যথা নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়াবে, সন্দেহ নেই।

মেরুদণ্ডে যে-ভার্টিব্রাগুলো আছে তার দু'টোর মাঝে থাকে ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্‌ক্ (Inter vertebral disc)। এগুলো তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ (Cartilage) দিয়ে তৈরি। এই ডিস্‌ক্‌গুলো কুশন বা গদির মত মস্তিষ্ক আর সুষুম্না কাণ্ডকে ধাক্কা থেকে বাঁচায়। ঘাড় একদিকে কাত ক'রে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ঘাড়ের কাছে যে-সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা আছে তার মাঝের ডিস্‌ক্‌গুলোর একদিকটা বেশি চেপে যায়। ফলে সে-দিক দিয়ে যে-নার্ভগুলো বেরোয় তাদের উপর বেশি চাপ পড়ে এবং যন্ত্রণা হয়। অনেক সময়ে ডিস্‌ক্‌গুলো নিজেদের জায়গা থেকে সরেও যায়।

ঘাড় কাত ক'রে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে



মোটেই ভাল নয়। বাসের উচ্চতা কখনোই এমন হওয়া উচিত হবে না যাতে কাউকে ঘাড় গুঁজে দাঁড়াতে হয়। বাসের ছাদ কতটা উঁচু হবে তা ঠিক করার সময়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মানুষের উচ্চতা বা স্ট্যাচার (Stature) মাপা দরকার। এখানে লম্বাদের কথা মাথায় রেখে মাপ নিতে হবে 95তম পার্সেন্টাইলে [দ্রষ্টব্য ঃ বাসের দু'টো সিটের মাঝের দূরত্ব কতটা হবে?] বাসের ছাদ হবে এই মাপের চেয়ে অবশ্যই কিছুটা বেশি। কারণ একেবারে

মাপে মাপে হলে বাসের ছাদে মাথা ঠুকে যেতে পারে।

সবচেয়ে কত বেশি আর কত কম তাপমাত্রা আমরা সইতে পারি?

ভীষণ গরমে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে বারবার স্নান ক'রে, আইসক্রিম আর কোল্ড ড্রিঙ্ক্স্ খেয়ে, কত ভাবেই না আমরা ঠাণ্ডা থাকার চেষ্টা করি। আবার খুব শীত পড়লে গায়ে চাপাই গরম জামা, রাতে লেপ মুড়ি দিই, ঠাণ্ডার জায়গায় বেড়াতে গেলে আগুন পোহাই।

কিন্তু মরুভূমির মত ভীষণ গরম জায়গায় আর সুমেরুর মত হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার মুলুকেও তো মানুষ থাকে। ও-রকম জায়গায় সবচেয়ে কত গরম আর কত ঠাণ্ডা মানুষ সইতে পারে?

আমরা হ'লাম গরম রক্তের প্রাণী। সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীর রক্ত ঠাণ্ডা। বাইরের তাপমাত্রা খুব কমে গেলে এদের দেহের তাপমাত্রাও কমে যায়। তাই শীতকালটা এরা ঘুমিয়ে কাটায়। কিন্তু আমাদের দেহের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে এয়ার-কণ্ডিশনারের মত মানিয়ে চলে। তবে তার একটা সীমা আছে। বেশি ঠাণ্ডা বা বেশি গরমের সঙ্গে যুঝবার মত জামা-কাপড় আর অন্যান্য ব্যবস্থা থাকলে মাইনাস 50 ডিগরি সেলসিয়াস থেকে 100 ডিগরি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা মানুষ সইতে পারে। কিন্তু এ হল আবহাওয়ার তাপমাত্রার কথা। নিজেদের দেহের ভিতরকার তাপমাত্রার (Core temperature) মাত্র 4 ডিগরি হেরফের সওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।

কোনো জামা-কাপড় না পরা থাকলে 28 ডিগরি সেলসিয়াস ঘরের তাপমাত্রায় একজন মানুষের চামড়ার গড়

> **ঘরের ২৮ ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মানুষের চামড়ার গড় তাপমাত্রা কত?**

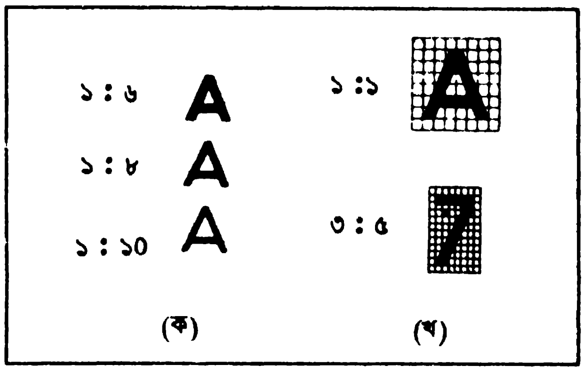
তাপমাত্রা হয় 33 ডিগরি সেলসিয়াস এবং তখন তার শরীরের ভিতরের তাপমাত্রা থাকে 37 ডিগরি সেলসিয়াস।

কোষের তাপমাত্রা কমতে কমতে মাইনাস 1 ডিগরি সেলসিয়াসে পৌঁছলে কোষের ভিতরকার জল জমে তৈরি করে বরফের কেলাস। ফলে কোষ ফেটে যায়। আবার কোষের ভিতরের তাপমাত্রা বেড়ে 41 ডিগরি সেলসিয়াসের উপরে গেলেই মুশকিল। এই তাপমাত্রা বেশিক্ষণ সইবার ক্ষমতা কোষের নেই। ডিমের কুসুম গরমে জমাট বেঁধে যায় আমরা দেখেছি। একে বলে তঞ্চন (Coagulation)। কুসুমে প্রোটিন আছে। কোষের ভিতরেও রয়েছে প্রোটিন। সুতরাং 45 ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তা জমাট বেঁধে যায়।

আজ এমন এক পরিবেশে আমরা এসে পৌঁছেছি, যখন বেশি ঠাণ্ডা সহ্য করা যায়। কারণ ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করার মত নানা সাজ-সরঞ্জাম আমাদের হাতে আছে। কিন্তু বেশি গরমের সঙ্গে লড়বার মত খুব বেশি সাজ-সরঞ্জাম এখনও তৈরি করা যায়নি।

নোটিসের লেখা কেমন হবে?

হাতের লেখার ছিরি-ছাঁদ না থাকলে তা যেমন পড়তে ইচ্ছে করে না, তেমনি নোটিসে যে লেখা থাকে পড়ার সুবিধের জন্যে সেই লেখারও একটা শ্রী থাকা দরকার।



আবার দূর থেকে লেখা যাতে ভালভাবে পড়া যায় সেইজন্যে হরফেরও একটা উপযুক্ত মাপ না থাকলে চলে না। লেখা বড় বা ধ্যাবড়া হলে পড়া হয়তো যাবে, কিন্তু ছিরি-ছাঁদহীন লেখা পড়তে কারো ইচ্ছে হবে না।

নোটিসের লেখার অক্ষর বা সংখ্যার মাপের একটা নির্দিষ্ট হিসেব আছে। ধরা যাক লিখছি A—লিখবার সময়ে দু'টো কোণাকুণি বাহু এঁকে তার পেট কাটলে তবে A-র চেহারাটা ফুটে ওঠে। এখন A-র দু'টো বাহুর যে কোনো একটার কথা ধরি—অর্থাৎ '/' চিহ্নটি। এটা সোজাভাবে নেই। আছে একটু বাঁকা হ'য়ে। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে।

সাদার উপরে কালোতে লেখা নোটিসে এই দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের অনুপাত 1:6 থেকে 1:10 পর্যন্ত হলে পড়তে সুবিধে হয়।

কালোর উপর সাদা লেখা হলে অনুপাতের একটু হেরফের হবে। এ-ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের অনুপাত হবে 1:10 থেকে 1:20। তখন অক্ষর হবে আরো সরু আর লম্বা। এখানে অনুপাত বাড়িয়ে 1:40 পর্যন্ত করা চলে।

এ-তো গেল একটা বাহু বা স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের অনুপাত। আবার A—এই পুরো অক্ষরটির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের অনুপাতটাও খেয়ালে রাখতে হবে। এই অনুপাত মোটামুটি 1:1, অর্থাৎ সমান সমান হলে ভাল হয়। তবে খুব সামান্য হেরফেরও এখানে করা চলে।

'ট'-এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের হিসেবে কি মাথার আঁকড়ি ধরতে হবে?

কিছু কিছু সংখ্যা আছে যাদের একটা আর একটার সঙ্গে প্রায়ই গুলিয়ে যায়—যেমন ইংরেজির 5 আর 6। এইজন্য সংখ্যার বিশেষ অংশ প্রয়োজন মত মোটা করতে হয়। সংখ্যার মাঝে সাদা জমি কতটা, সেটাও দেখা দরকার। সাদা জমির অংশ বাড়িয়ে দিলেও পড়তে সুবিধে হয়। 5 সংখ্যাটির মাথার সরলরেখাটা মোটা ক'রে দিলে বা 6-এর পেটে বেশি সাদা অংশ রাখলে, সন্দেহ নেই, পড়তে সুবিধে হবে।

বাংলায় ট, ই, উ-এর মত অক্ষরের বেলায় দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের হিসেব করবো কি ভাবে? তখন কি আঁকড়ির মাথা থেকে দৈর্ঘ্যের মাপ শুরু হবে? না, তা নয়। অক্ষরের দৈর্ঘ্যের মাপ ধরবো আঁকড়িকে বাদ দিয়েই।

গরমের দেশে আঁটোসাঁটো পোশাক পরা কি ঠিক?

আমাদের দেশের নিজস্ব পোশাক ধুতি এবং শাড়ি। এখন অবশ্য শার্ট, প্যান্ট অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। শাড়ির বদলে সালোয়ার-কামিজও রীতিমতো নজরে আসছে। একথা ঠিক, এ-ধরনের পোশাকে চলতে ফিরতে সুবিধে, ভিড় বাসে-ট্রামে তো কথাই নেই। কিন্তু আমাদের নিজস্ব পোশাকের কি কোনো বৈজ্ঞানিক দিক আছে?

আমাদের দেশ গরমের দেশ। এখানে গরমকালে দেহের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেড়ে যায়। তখন বাড়তি তাপ বের ক'রে দেওয়ার জন্যে শরীর নানাভাবে চেষ্টা করে। পোশাক যত কম হবে, দেহ থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে তত সুবিধে।

ধুতি-পাঞ্জাবি কি আমাদের দেশের উপযোগী পোশাক?

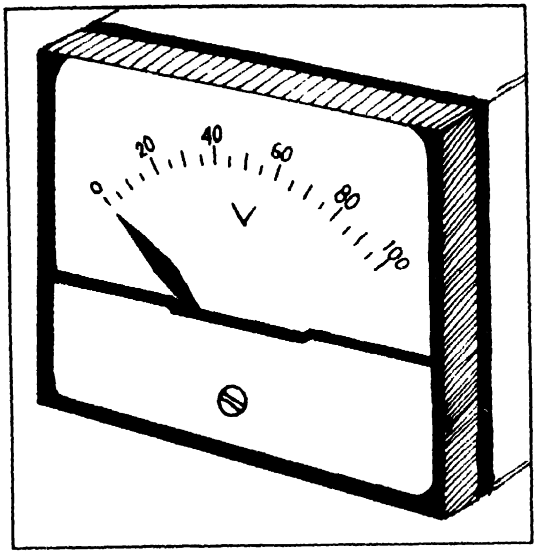
কিন্তু আশপাশের তাপমাত্রা খুব চড়া হলে বিকীর্ণ তাপ আবার আমাদের দেহে ঢুকে পড়বে। তার হাত থেকে বাঁচার মত জামা-কাপড় না হলেও আবার চলবে না।

কাপড়-জামা যত আলগা হবে, তত ত্বক আর কাপড়ের মাঝখান দিয়ে ঠিকমত বাতাস খেলবে। এতে ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। আর শরীরটাও ঠাণ্ডা হবে তাড়াতাড়ি, কারণ ঘাম বাষ্পীভূত হওয়ার সময়ে শরীর থেকে লীন তাপ [দ্রষ্টব্য ঃ শীতে জড়সড় হয়ে থাকতে ভাল লাগে কেন?] নেবে। জামা-কাপড় আঁটোসাঁটো হলে ঠিকমত হাওয়া চলাচল করবে না। তাই ঘাম হলেও তা শুকোতে অনেক সময় নেবে। এইজন্যে গরমের জায়গায় বেশি আঁটোসাঁটো জামা-কাপড় পরা কখনোই ঠিক নয়।

ঘড়ির ডায়াল কেমন হলে সময় দেখতে সুবিধে হয়?

হাতঘড়িতে সময় দেখার সময়ে আমরা দেখেছি, কখনও কখনও পাশের লোকের হাতঘড়িতে স্পষ্ট সময় দেখা যায়, অথচ নিজের হাতে বাঁধা ঘড়িতেই সময় দেখতে ভুল হয়। এমন হওয়ার কারণটা কী?

এমন যে হয়, এর কারণ ঘড়ির ডায়ালের ডিজাইন। শুধু হাতঘড়ি নয়, দেওয়াল ঘড়ি থেকে শুরু ক'রে বাড়ির ইলেকট্রিক মিটারের রিডিং নেওয়ার ডায়াল—সব ডায়ালেরই ডিজাইন ঠিকমত হলে চট ক'রে রিডিং নিতে সুবিধে হয়। এই সুবিধে-অসুবিধে অনেকগুলো বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। যেমন, ডায়ালের আকার, রিডিং নেওয়ার সংখ্যা নির্দেশক দাগ বা 'মার্ক'-এর আকার, দাগগুলোর মাঝের ফাঁকা জায়গার মাপ, দাগগুলোর রঙ ইত্যাদি। এ-ছাড়া সূচক বা পয়েন্টারের রঙ আর তার আকারও দেখতে হবে।



ডায়াল

ডায়ালের জমির রঙ সাদা হলে রিডিং-এর দাগগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রধান সেগুলো হবে কালো রঙের। ঘড়ির ক্ষেত্রে ঘন্টার দাগ প্রধান, তাই সেটা কালো হওয়া উচিত। তার মাঝের যত ছোট দাগ সেগুলো রঙিন হলে ভাল হয়। ঘড়িতে সবচেয়ে ছোট দাগ মানে সেকেণ্ডের চিহ্ন। এই প্রধান-অপ্রধান দাগের আকারেও হেরফের ঘটবে। প্রধান দাগগুলোর দৈর্ঘ্য, মাঝের ছোট দাগগুলোর দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ হবে। তা ছাড়া প্রধান দাগগুলো ছোট দাগের তুলনায় কিছুটা মোটাও হওয়া দরকার।

ডায়ালে যে লেখা হবে তা সাদা জমির উপরে কালো হওয়াই ভাল। তবে কিছু কিছু মিটার আছে যা প্রায় অন্ধকারে

ডায়ালের লেখা সাদা জমির উপরে কালো হবে না কালো জমির উপরে সাদা?

বা কম আলোতে পড়তে হয়। এগুলোর বেলায় লেখা হবে কালোর উপর সাদা। আর যদি এই মিটার কোনো প্যানেলে বসানো থাকে তাহলে সেই প্যানেলের রঙ কোনো মতেই ডায়ালের থেকে হালকা রঙের হবে না। তা হবে গাঢ়। প্যানেলে যদি চকচকে পালিশ থাকে, তাহলেও রিডিং নিতে অসুবিধে হবে।

খেলাধুলো শেষ হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে বেশি ক'রে জামা-কাপড় না পরে নিলে কি ঠাণ্ডা লেগে যাবে?

শীতের দিনে খুব ছুটোছুটি ক'রে ক্রিকেট খেলার শেষে অনেক সময়ে বড়রা উপদেশ দেন সোয়েটার পরে নিতে আর ছোটরাও তা শুনে ঘামে ভেজা শরীরের উপরই চড়িয়ে নেয় গরম জামা। কিন্তু খেলাধুলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি গরম জামা পরে নিতে হয়?

খেলার সময়ে ছুটোছুটিতে শরীরের তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে যায়। ঘাম বেরোয় শরীরটাকে ঠাণ্ডা করার জন্যেই। ঘামটা যত তাড়াতাড়ি শুকোবে, শরীর ততই তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে। এই সময়ে গায়ে বাড়তি জামা পরা মানে বাড়তি তাপটাকে বাক্সবন্দী ক'রে শরীরে ধরে রাখা। গরম জামার মধ্যে দিয়ে ঠিকমত হাওয়া খেলবে না, ঘাম শুকোতেও সময় নেবে, শরীরটাও অকারণে বেশিক্ষণ তেতে থাকবে আর তাতে ক্ষতিই হবে বেশি।

খেলার শেষে, যতক্ষণ না ঘাম শুকোয়, গরম ভাবটা একেবারে চলে গিয়ে একটু শীত শীত করে, ততক্ষণ গরম জামা পরা স্বাস্থ্যের পক্ষে একটুও ভাল নয়।

একজন ডুবুরি যদি সমুদ্রের তলা থেকে হঠাৎ উপরে উঠে আসে তার কি ক্ষতি হবে?

সিনেমার পর্দায় ডুবুরিদের অতল সমুদ্রে ডুব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর। এখন তো খেলাধুলোর জগতে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে প্রথম সারিতে চলে এসেছে স্কুবা ডাইভিং। এতে ঠিকমত শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর যন্ত্র শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়ে গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে চলে অতলের রহস্য উদ্ধার অভিযান।

কিন্তু সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে ডুবুরি যদি হঠাৎ উপরে উঠে আসে, তাহলে তার কি কোনো ক্ষতি হতে পারে? আমরা তো সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুব সাঁতার দিই জলের তলায়। চলে যাই অনেকটা। আমাদের তো কোনো ক্ষতি হয় না।

পাহাড়ের উপরে যেখানে বাতাসের চাপ কম, সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে আমাদের শরীর কিছুদিনের মধ্যেই মানিয়ে নেয়। কিন্তু সমুদ্রের তলার মত জায়গায়,

যেখানে চাপ বেশি, সেখানকার সঙ্গে মানানোর ক্ষমতা মানুষের নেই। অবশ্য এখানে সমুদ্রের তলা বলতে অনেকটা নীচে বুঝতে হবে, অন্তত 10 মিটার গভীরে।

চাপ যত বাড়ে, মানুষের শরীরের কলা বা টিস্যুতে তত বেশি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস দ্রবীভূত হয়। সমুদ্রের 10 মিটার গভীরে একজনের শরীরে স্বাভাবিক অবস্থার দু'গুণ বেশি গ্যাস দ্রবীভূত হয়।

গ্যাসের মধ্যে আবার মারাত্মক হল নাইট্রোজেন। বাইরের চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেন টিস্যুতে দ্রবীভূত হয়। চাপ কমলেই আবার তা বেরিয়ে আসে। সমুদ্রের গভীরের বেশি চাপের পরিবেশ থেকে একজন ডুবুরি যদি হঠাৎ উঠে আসে তাহলে হঠাৎ চাপ

সমুদ্রের কতটা গভীরে স্বাভাবিক অবস্থার দ্বিগুণ গ্যাস দ্রবীভূত হয়?

কমার জন্যে তার শরীরে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন তাড়াহুড়ো ক'রে বেরিয়ে আসতে চাইবে। ফলে বুদ্বুদের সৃষ্টি হবে।

নাইট্রোজেনের বুদ্বুদ ছোট ছোট রক্তনালীর মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করবে। তখন পেশী আর সন্ধিতে শুরু হবে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নাইট্রোজেনের বুদ্বুদ জমা হলে পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে। এই সব লক্ষণের ডাক্তারি নাম 'বেণ্ডস্' (Bends)। লক্ষণ কতটা তীব্র হবে, তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, ডুবুরি কতটা গভীরে ডুব দিয়েছিল, কতক্ষণ সে বেশি গভীরতায় ছিল, কত তাড়াতাড়ি সে গভীর থেকে উঠে এসেছে, এমন সব বিষয়।

তিনগুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে শরীরে নাইট্রোজেনের বিষক্রিয়া দেখা যায়, যাকে বলে, নাইট্রোজেন নারকোসিস (Nitrogen Narcosis)। এই অবস্থায় মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। আর বায়ুমণ্ডলের দশগুণ চাপে কাজ করার কোনো ক্ষমতাই থাকে না।

এই সব সমস্যা থেকে বাঁচার উপায়, সমুদ্রের গভীরে ডুব দেওয়ার পরে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসা। আর যদি ডুবুরি শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ডুব দেন তাহলে বাতাসের বদলে নাইট্রোজেন-মুক্ত হিলিয়াম-অক্সিজেন মিশ্রণ নিয়ে ডুব দিতে পারেন। তাহলে তাঁর শরীরে নাইট্রোজেন ঢোকার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।

দাঁড়িয়ে যখন আছি তখন কাজ করছি না, তবু একটানা অনেকক্ষণ দাঁড়ালে শরীর খারাপ লাগে কেন?

অনেকক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে পা অবশ, ভার হয়ে আসে, শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে। মনে হয় যেখানে হোক বসে পড়ি। দাঁড়িয়ে থাকা যে কম পরিশ্রম নয়, এ তো বোঝাই যায়। স্কুলে একটা শাস্তি—'দাঁড়িয়ে থাকো'। এমন শাস্তি হয়তো অনেকেই পেয়েছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে শরীর খারাপ লাগে কেন? পা-ই বা ব্যথা করে কী কারণে?

দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যে কারণে পা ব্যথা হয় তার সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে পা ব্যথা হওয়ার কারণের একেবারেই মিল নেই। ছুটোছুটির সময়ে পা ব্যথা হয় পেশীকে বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে বলে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পেশীর কাজ করতে হয় খুবই কম। তখন যেটা সমস্যা তা হল অভিকর্ষজ টানে বেশির ভাগ রক্ত নেমে যায় পায়ের দিকে। ফলে সাময়িকভাবে হৃৎপিণ্ডে রক্ত ফেরত যাওয়ার বা ভেনাস রিটার্ন (Venus return)-এর হার কমে যায়। হৃৎপিণ্ড যে-পরিমাণ রক্ত পাম্প করে থাকে তাকে বলে কার্ডিয়াক আউটপুট (Cardiac output)—তার পরিমাণও কম হয়। সেইজন্যে তখন হৃদ্‌স্পন্দনের হার (Heart rate) বেড়ে যায়। এ-দিকে রক্ত-চাপ কমে যায়।

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলে কেউ অজ্ঞানও হয়ে যেতে

ছুটোছুটি করলে যে কারণে পা ব্যথা হয়, দাঁড়িয়ে থাকলে কি সেই একই কারণে পা ব্যথা করে?

পারে। কারণ বেশির ভাগ রক্ত পায়ে নেমে আসায় মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ এতই কমে যাবে যে, মস্তিষ্ক স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

রঙের সঙ্গে ঠাণ্ডা-গরম লাগার সম্পর্ক আছে কি?

গরমের দিনে দুপুর রোদে টকটকে লাল রঙের জামা পরে কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটলে, তাঁকে দেখলেই যেন কেমন

গরম লাগে। কিছু কিছু রঙ, যেমন, লাল, হলুদ, কমলা, গরম রঙ বা 'ওয়ার্ম কালার' (Warm colour) বলে পরিচিত। আর নীল, সবুজ, ধূসর প্রভৃতি রঙকে বলে ঠাণ্ডা রঙ বা 'কুল কালার' (Cool colour)। ঘরের দেওয়ালের রঙ হলুদ রাখলে ঘরটা কেমন গরম মনে হয়। তেমনি যে-ঘরের দেওয়ালের রঙ হালকা নীল, তার ভিতর কেমন একটা ঠাণ্ডার আমেজের আভাস মেলে। সত্যিই কি লাল রঙের সঙ্গে গরম লাগার আর নীল রঙের সঙ্গে ঠাণ্ডা লাগার কোনো সম্পর্ক আছে?

আসলে এখনও পর্যন্ত রঙের সঙ্গে তাপমাত্রার কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি। রঙের সঙ্গে তাপমাত্রার সম্পর্ক আছে কিনা বোঝার জন্য নানা পরীক্ষাও করা হয়েছে। একটি পরীক্ষায় একটা ঘরে বেশ কয়েকজনকে একের পর এক ঢুকে কাজ করতে বলা হয়। ঘরে আলোর রঙ পালটানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রথমে দু'টো ঠাণ্ডা রঙ আর পরে দু'টো গরম রঙের আলো এক এক ক'রে ঘরে জ্বেলে দেওয়া হয়। সবাইকে বলা হল ঘরের আলোর রঙের সঙ্গে তাপমাত্রার সম্পর্ক আছে। কাজেই যখনই তাঁদের খুব বেশি গরম লাগবে আর কাজ করতে অস্বস্তি হবে, তাঁরা যেন সংকেতে তার নির্দেশ দেন।

আসলে ঘরের ভিতর গরম হাওয়া প্রবাহিত ক'রে তাপমাত্রা পালটানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেকে যখন শারীরিক অস্বস্তি হচ্ছে জানিয়ে সংকেত করেন, তখনকার তাপমাত্রা আর বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নোট ক'রে রাখা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় আলোর রঙের সঙ্গে বেশি গরম লাগার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ ওঁদের সবাইকে যখন উষ্ণতার মাত্রা অনুযায়ী আলোর রঙগুলোকে সাজাতে বলা হয়, তখন তাঁরা লাল ও হলুদকে গরম আর নীল ও সবুজকে ঠাণ্ডা বলে চিহ্নিত করেন। এই তালিকার সঙ্গে সবচেয়ে গরম লাগার সময়ের আলোর রঙে কোনো মিল পাওয়া যায়নি।

তবু মানুষের মনের ব্যাপারটাও কম গুরুত্বের নয়। তাই এখনও ঠাণ্ডার জায়গায় গাঢ়, উজ্জ্বল রঙের পোশাক আর গরমের জায়গায় হালকা রঙের পোশাক পরার চলই বেশি। কিন্তু এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তবে কালো আর সাদা রঙের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কালো রঙ আলো বা তাপ শোষণ করে বেশি, আর সাদা রঙ সূর্যের আলো প্রতিফলিত ক'রে দেয়। তাই গরমের জায়গায় সাদা রঙের পোশাক, আর ঠাণ্ডার জায়গায় কালো রঙের পোশাক পরার যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে।

শীতের দেশে গাঢ় বা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরার চল বেশি কেন?

গরমের সময়ে বেশি রোদে কেউ কেউ রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন কেন?

মে-জুন মাসের দুপুরে আগুন-ঝরা গরমের পথ চলতে চলতে হঠাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলেন---আমাদের মত গরম দেশে এমনটা মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে। চলতি কথায় আমরা বলি সর্দিগর্মিতে ভির্মি লেগেছে। কিন্তু সর্দিগর্মিতে যে-ভির্মি লাগে, তার কারণ কী?

তাপ সহ্য করার ক্ষমতা শেষ সীমায় পৌঁছলেই একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে। একে বলে হিট-স্ট্রোক (Heat-stroke)। গরমের সঙ্গে যুঝবার জন্য শরীর নানা ভাবে লড়াই করে। তার একটা রাস্তা হল ঘাম বেরনো। কিন্তু একটানা বেশিক্ষণ গরমে থাকলে ঘামার হার কমতে থাকে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে সে-হার আরো কমে যায়।

কত তাপমাত্রায় ঘাম বন্ধ হয়ে যায়?

আবার কোনো মানুষের শরীরের তাপমাত্রা 30 থেকে 40 ডিগরি সেলসিয়াস হলেই ঘামার হার খুব কমে আসে বা একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়ে। তাপ বেরনোর উপায় বন্ধ হয়ে গেলেই খুব ক্লান্ত লাগে। বুক ধড়ফড় করে, হাঁফ ধরে। একে বলে তাপজনিত শ্রান্তি (Heat exhaustion)। এই অবস্থায় কাজ থামিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় গেলেই আবার সুস্থ বোধ করা সম্ভব।

কিন্তু 40 ডিগরি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় একেবারেই ঘাম হয় না। এই অবস্থায় হিট-স্ট্রোক হতে পারে। মোটা মানুষ বা বয়স্কদের এতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারো হিট-স্ট্রোক হলে যে-ভাবেই হোক তার

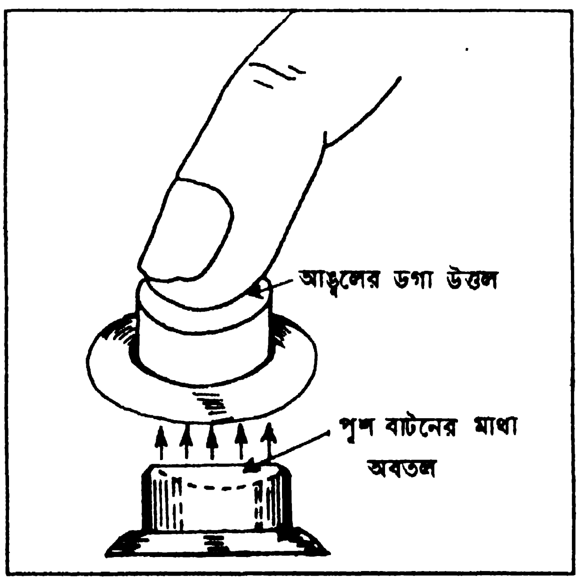
দেহের তাপমাত্রা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমাতে হবে।

আরো একটা কারণে রোদে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। একে বলে হিট সিনকোপ (Heat syncope)। রোদে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে রক্ত পায়ে নেমে আসে। ফলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কমে যায়। আর তখন মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি হলে এমনটা হতে পারে। এ-রকম হলে মানুষটিকে পা উঁচু ক'রে শুইয়ে রাখলে ভাল হয়।

পুশ বাট্‌নের চেহারা কেমন হবে?

আলো জ্বালানোর সুইচ, লোকজনকে ডাকার বেল, বিপদ সংকেত বাজানোর অ্যালার্ম—অনেক কিছুতেই পুশ বাট্‌ন ব্যবহার করা হয়। এই পুশ বাট্‌ন-এর চেহারা কেমন হবে?

উত্তেজিত হলে, রেগে গেলে, সামনে বিপদ এমন এক অবস্থায় অনেক সময়ে আমাদের হাত কাঁপে। এই সময়ে পুশ বাট্‌ন টেপার দরকার হলে হাত কাঁপার জন্যে ঠিকমত বোতাম টেপার অসুবিধে হতে পারে, সেখানে হাত পিছলে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে। বোতাম ঠিকমত টিপতে না



পারলে বিপদ সংকেত জানাতে দেরি হবে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কিছু করার নেই। এমনিতেও তাড়ার সময়ে একবারে পুশ বাট্‌নটা টেপা না গেলে যথেষ্ট বিরক্তি লাগে। এই অসুবিধে এড়ানো যায় কী ভাবে? আমাদের আঙুলের ডগার গড়ন উত্তল, অর্থাৎ তা যেন একটা উলটানো বাটি। বাইরের দিকে ফোলা—আঙুলের মাথার মাপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুশ বাট্‌নের মাথা হবে অবতল বা ভিতরে বসা। এ-রকম গঠনের পুশ বাট্‌নে আঙুল খাঁজে চেপে বসবে, পুশ করতে বা টিপতে কোনোই অসুবিধে হবে না, আর হাত পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। বোতামের মাথার ব্যাস অন্তত 0.63 সেন্টিমিটারের মত হলেই চলে। তা ছাড়া টিপলে বোতামটা 0.315 সেন্টিমিটারের বেশি বসে যাওয়া ঠিক নয়। আর অল্প চাপেই বোতামটা আলতোভাবে ভিতরে বসে যাওয়া দরকার।

কোন খাবার বেশি খাব ঃ ভাত রুটি না মাছ, মাংস?

খাওয়ার সময়ে মায়েরা বলেন বেশি ক'রে ভাত খেতে। তরকারি নষ্ট করলে ততটা রাগ করেন না, কিন্তু মাছ খাওয়াতে জোর দেন। ছোটদের দুধ না খাইয়েও ছাড়েন না। কিন্তু কী খাব না খাব ভেবে কি কোনো বিশেষ খাবার খাওয়াতে জোর দেওয়া উচিত আর কোনোটাতে কম?

আমরা খাই কেন? নিছক ভাল লাগার জন্যে নয় নিশ্চয়ই। বেঁচে থাকতে গেলে খেতে হবে। সেই খাবার বাচ্চাদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে, অসুখের সময়ে শরীরে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণ করে আর সব রকম কাজের শক্তি জোগায়।

কোন খাবার বেশি খাব ঠিক করতে হলে আগে জানতে হবে খাবার কত রকমের। রেস্তোরাঁর মালিক হয়তো

দুধ সুষম খাবার কেন?

বলবেন, অনেক রকম। কিন্তু বিজ্ঞানীরা খাবারকে ছ'টি ভাগে ভাগ করেন—শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate), স্নেহ পদার্থ বা প্রোটিন (Protein), চর্বি বা ফ্যাট (Fat), ভিটামিন (Vitamin), খনিজ লবণ (Mineral salts) আর জল।

হজম হওয়ার পরে খাবারের দরকারী অংশ গিয়ে জড়ো হয় কোষে। শ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন শরীরে ঢোকে তা

কোষে গিয়ে পৌঁছোয়। অক্সিজেনের সাহায্যে খাবারের দহনে তৈরি হয় শক্তি। এই শক্তি মাপার একক হল ক্যালরি (Calorie)।

1 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দহন ক'রে 4 ক্যালরি, 1 গ্রাম প্রোটিন দহন ক'রে 4 ক্যালরি আর 1 গ্রাম ফ্যাট দহন ক'রে 9 ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। তবে নেহাত নাচার না হলে শরীর প্রোটিন দহন ক'রে শক্তি জোগাড় করে না। প্রোটিনের কাজ হল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা। কাজ করার শক্তি জোগায় প্রধানত কার্বোহাইড্রেট আর তারপরেই ফ্যাট। একটানা অনেক দিন উপোস ক'রে থাকার ফলে যদি শরীরের কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট শেষ হয়ে যায় তবেই শরীর প্রোটিন থেকে শক্তি নেয়। আর তখনই শরীরের ভাঙন শুরু হয়।

রোজকার খাবারের মধ্যে আমরা কার্বোহাইড্রেট পাই ভাত, রুটি পাঁউরুটি, আলু জাতীয় খাবার থেকে। মাছ, মাংস, ডিম, ডাল—এরা হল প্রোটিনের জোগানদার। ফ্যাট জোগায় ঘি, তেল, মাখন। নানা শাক সবজি, টাটকা ফল, ডিম, মাছের তেল—এ-সব থেকে পাই ভিটামিন। দুধ এমন একটা খাবার যাতে এই ছ'রকম খাবারই মেলে। তাই দুধকে বলে সুষম খাবার (Balanced food)। তাই কোলের শিশুদের শুধু দুধ খেলেই চলে যায়।

বেঁচে থাকার জন্যে সবরকম খাবারই খেতে হবে। ভাত রুটি জাতীয় খাবার যেমন কাজ করার শক্তি জোগাবে, মাছ, মাংস, ডাল তেমনি সাহায্য করবে ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে।

ঝোলার স্ট্র্যাপ কেমন হলে ভার বইতে কম কষ্ট হবে?

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে বই নেওয়া যাঁদের অভ্যেস তাঁরাই জানেন ঝোলার স্ট্র্যাপ সরু হলে কাঁধে কতটা ব্যথা লাগে। সরু স্ট্র্যাপের ঝোলায় বেশি ভার বইলে কাঁধের মাংসের উপর স্ট্র্যাপটা যেন কেটে বসে। শক্ত, সরু হ্যান্ডেলওলা ব্যাগ বা স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে ভার নিলেও আঙুলে ভীষণ লাগে। এভাবে একটানা বেশিক্ষণ ভার বওয়াও যায় না। তাহলে ঝোলার স্ট্র্যাপ ঠিক কেমন হবে?

পদার্থবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী প্রযুক্ত বল যদি একই থাকে তাহলে দেখা যায়, বল যেখানে প্রযুক্ত হয়েছে সেই তলের ক্ষেত্রফলের মান যত বাড়ে চাপও তত কমে আসে। কাজেই একটা জিনিসের পুরো ওজন যদি অল্প একটু জায়গায় পড়ে তাহলে সেই জায়গার উপর চাপ পড়বে অনেক বেশি। কিন্তু ওই একই ওজন যদি অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে থাকে তাহলে চাপ অনেক কম লাগে। পায়ের চটিতে পেরেক থাকলে পেরেকের মাথার অংশটা পায়ে বিঁধলে যত না লাগবে, তার উলটো দিকের ছুঁচলো অংশটা বিঁধলে লাগবে তার অনেক বেশি।

স্ট্র্যাপ চওড়া হলে ভারটা অনেকটা জায়গা জুড়ে পড়বে। এতে কাঁধে চাপ লাগবে কম। ব্যথাও হবে না। ঝোলার পুরো স্ট্র্যাপ চওড়া করা না গেলেও অন্তত যে-অংশটা কাঁধে থাকবে সেই অংশটা চওড়া হওয়া দরকার। ঠিক একই কারণে ব্যাগ বা স্যুটকেসের হ্যান্ডেলও কিছুটা চওড়া হলে ভার বইতে সুবিধে হয়।

শীতের দেশে বেশি কাজ করলে আরাম লাগে কেন?

শীতের জায়গায় বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে বা শুয়ে থাকলে শীতটা যেন জাঁকিয়ে চেপে ধরে। একটু পরে মনে হয়, আর নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই। কিন্তু খুব ঠাণ্ডায় যত ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি বা ভারী কাজ করা যায়, তত আরাম লাগে। কেন?

আমরা যে খাবার খাই তা প্রথমে হজম হয়, অর্থাৎ খাবারের জটিল অণু ভেঙে সরল হয়ে আসে। হজম হওয়া খাবার খাদ্যনালী থেকে পৌঁছোয় রক্তে। একে বলে বিশোষণ (Absorption)। এই খাবার সেখান থেকে কোষে গিয়ে জমা হয়। কাজের সময়ে অক্সিজেনের সঙ্গে দহনে এই খাবার থেকে তৈরি হয় শক্তি। খাবার কোষে জমা হয় জটিল অণু হিসেবেই। তা প্রথমে ভেঙে যায়, পরে অক্সিজেনের সাহায্যে তার দহন হয়। খাবারের ভাঙা-গড়ার এই পদ্ধতি, আর এ-থেকে শক্তি তৈরি হওয়াকে বলে বিপাক (Metabolism)। বিপাকের কাজ যখন শরীরে চলে তখন প্রচুর তাপ তৈরি হয়। একে বলা হয় বিপাকজনিত তাপ বা মেটাবলিক হিট (Metabolic heat)।

কাজ করার সময়ে বাড়তি শক্তির জোগান দিতে বিপাকের হার প্রচুর বেড়ে যায়। তাই শরীরের তাপমাত্রাও অনেকটা বাড়ে। এইজন্যই ঠাণ্ডার জায়গায় কাজ করতে আরাম লাগে।

খাওয়া-দাওয়ার বারো ঘণ্টা পরে জেগে থেকেও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন অবস্থায় স্বাভাবিক পরিবেশে একজন মানুষের শরীরে যতটা বিপাকজনিত তাপ উৎপন্ন হয় তাকে বলে বেসাল মেটাবলিক রেট (Basal metabolic rate) বা বি এম আর (B.M.R.)। শোয়া অবস্থায় এই তাপ খুব কম। কিন্তু যতই কাজ করা যায় ততই তা বাড়তে থাকে।

কাজের পরিবেশ সুন্দর হওয়া কতটা জরুরি?

স্কুলে যেতে অনেক ছেলেমেয়েই ভালবাসে না। স্কুলে না যাওয়ার জন্যে তাদের এক একদিন এক একরকম বাহানা। অনেক বয়স্ক মানুষেরও অফিস যাওয়ার নামে গায়ে জ্বর আসে। কাজের জায়গা সম্পর্কে এই বিতৃষ্ণার কারণ কিন্তু শুধু কাজ করার ইচ্ছের অভাব নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের পরিবেশ। আমাদের স্কুল, কলেজ, অফিস এগুলোকে একটুও সুন্দর করার চেষ্টা হয় না। সবচেয়ে বিরক্তিকর চারধারের উঁচু পাঁচিল—যার জন্যে মনে হয় যেন জেলখানায় ঢুকছি। কেমন একটা দম আটকানো ভাব আসে।

স্কুল, কলেজ, কারখানার পরিবেশ একটু সুন্দর করা গেলে পড়াশুনা বা কাজও অনেক ভালভাবে করা যায়।

ঘর বড়োসড়ো দেখাতে কেমন ক'রে রঙ করবো?

চারধারের উঁচু পাঁচিল মনের উপরে কেমন একটা চাপ ফেলে। মনে হয়, কতক্ষণে এর সীমানা থেকে বেরোতে পারবো।

শহরে খোলামেলা জায়গার অভাব। তবে অন্য উপায় আছে। চারধারে পাঁচিলের বদলে ঘন, উঁচু ঝোপ (Hedge) লাগিয়ে পাঁচিলের কাজ চালানো যায়। তাতে সীমানাও রইলো, অথচ দম আটকানো ভাবও এল না।

কাজ করার পরিবেশ সুন্দর করতে ঘরের ভিতরের রঙ আর আলোর ব্যবহার ঠিকমত করতে জানা চাই। সরু লম্বা একটা ঘরের ধারের দেওয়ালগুলো হাল্কা রঙের (নীল, সবুজ) আর দু' প্রান্তের দেওয়াল চড়া রঙের (কমলা বা হলুদ) করলে ঘরটা বড়োসড়ো দেখাবে। ঘরের দেওয়ালের উপরের অংশের রঙের সঙ্গে ছাতের রঙ এক হলে নীচু ঘরও উঁচু মনে হয়। উজ্জ্বল আলোয় ছোট নীচু ঘরকে বড় লাগে। যদিও এগুলো সবই 'মনে হওয়া', তবু তার গুরুত্বও কম নয়।

পরিবেশ সংক্রান্ত এইরকম ছোটখাটো কয়েকটা বিষয়ের উপরে নজর দিলে স্কুল, কলেজ বা অফিস কামাইয়ের ইচ্ছা নিঃসন্দেহে কিছুটা কমানো যাবে।

বেশিক্ষণ ছোটাছুটি করলে আমরা হাঁফিয়ে যাই কেন?

একটানা অনেকক্ষণ দৌড়নোর পরে অনেক সময়ে মনে হয়, আর পারছি না, দম ফুরিয়ে গেছে, এবার দাঁড়িয়ে পড়ি। এই দম ফুরিয়ে আসার ভাবটা কেন হয়?

বেশি পরিশ্রম করতে গেলেই বেশি শক্তির দরকার। আর তার জন্যে চাই বেশি অক্সিজেন। কিন্তু অক্সিজেন ঢুকলেই তো আর হল না। তাকে কোষে পৌঁছে দেওয়ার ভার রক্তের শ্বাসকণা হিমোগ্লোবিনের। আর এদের সংখ্যা মোটামুটি নির্দিষ্ট। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করলে একটা সময় আসে যখন অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত হিমোগ্লোবিন কণা আর ফাঁকা থাকে না। [দ্রষ্টব্য ঃ বেশিক্ষণ ছোটার পরে পা ব্যথা করে কেন?]

যতক্ষণ কোষে অক্সিজেন পৌঁছোয় ততক্ষণ সবাত শ্বসনের সাহায্যে শক্তি উৎপাদন চলে। এ-ভাবে অনেক বেশি শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে অবাত শ্বসন শুরু হয়। এতে শক্তি পাওয়া যায় কম। আর কোষে জমা হয় বিপাকজনিত পদার্থ। সেগুলো পেশীকে তাড়াতাড়ি ক্লান্ত ক'রে ফেলে। কিন্তু যারা নিয়মিত খেলাধুলো করেন তাঁদের শরীরের অক্সিজেন পরিবহন পদ্ধতি (Oxygen transporting system) অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই তাঁরা অনেকক্ষণ সবাত শ্বসন চালাতে পারেন। আবার অবাত শ্বসনের সাহায্যে কাজ করার ক্ষমতাও তাঁদের বেশি। তাই তাঁদের দম সহজে ফুরোয় না।

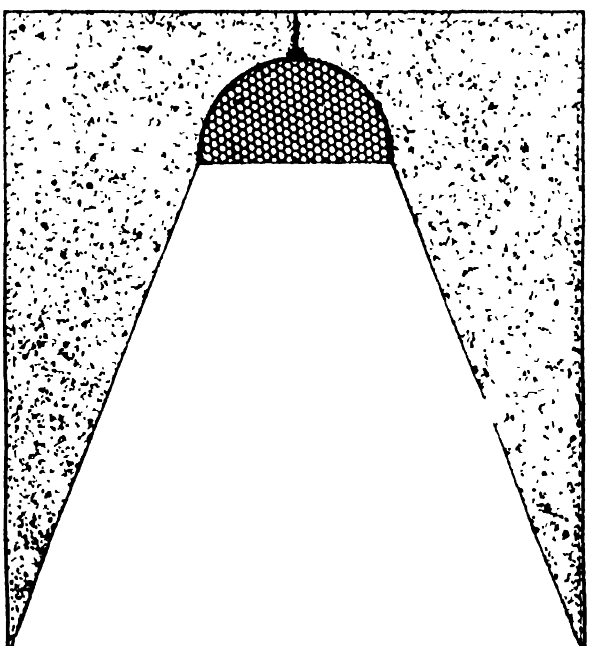
দম ফুরিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ কোষে অক্সিজেন না পৌঁছনো। কিন্তু আরো কয়েকটা কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। যেমন, বেশি ঘাম বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে অনেকটা জল আর লবণ বেরিয়ে গিয়ে ভারসাম্য নষ্ট করে। কোষের খাবারের ভাণ্ডারেও কিছুক্ষণ পরে টান পড়ে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইচ্ছে বা মোটিভেশন (Motivation)। খেলাধুলো বা পরিশ্রমে অভ্যস্ত একজন মানুষ যতক্ষণ ছোটাছুটি করতে পারে, অনভ্যস্ত একজনের তার চেয়ে অনেক কম সময়ে দম ফুরিয়ে যায়। এটা অনেক সময়ে ঘটে স্রেফ মনস্তাত্ত্বিক কারণে।

কেমন আলোয় আঁকাজোকা করবো?

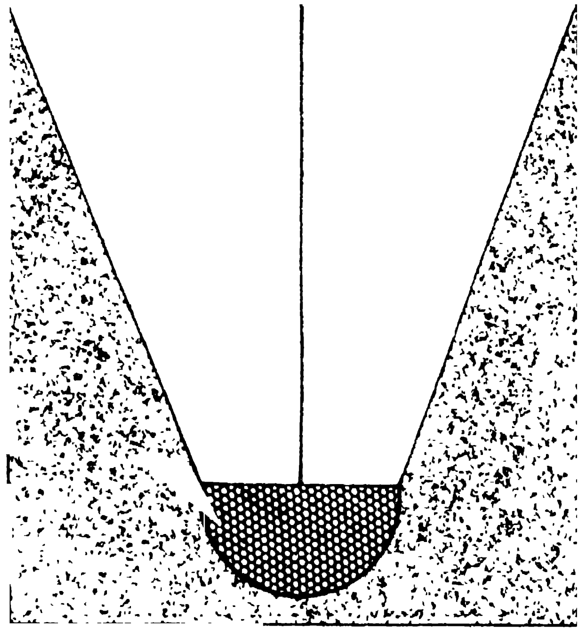
ছোটবেলা থেকেই বড়দের আমরা বলতে শুনি, লেখা বা ছবি আঁকার সময় আলোটা যেন ডান দিক থেকে না আসে কারণ তাহলে হাতের ছায়া পড়বে কাগজের উপরে, চোখের খাটুনি হবে বেশি। তবে কেমন আলোয় লেখালেখির কাজ করবো?

চোখকে কম কষ্ট দিতে হলে আর ছবি আঁকা বা লেখা সুন্দর করতে গেলে এই নিয়মটি ছাড়া আরো কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন, আলোটা যথেষ্ট জোরালো হবে কিন্তু তা যেন চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়। সমস্ত লেখার কাগজ জুড়ে জোরালো আলো পড়বে। কিন্তু যে-টেবিলের উপর রেখে আঁকছি বা লিখছি তা থেকে আলো ঠিকরিয়ে যেন চোখে না লাগে।



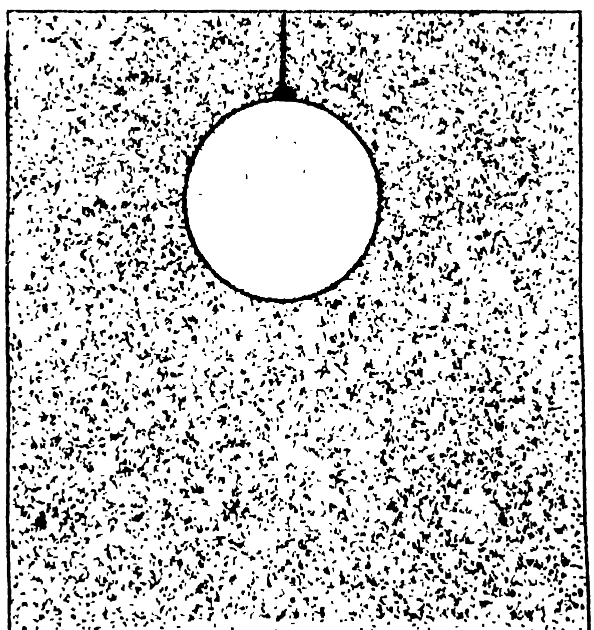
ডাইরেক্ট আলো

আলোটা থাকবে এমন জায়গায় বা এমনভাবে যাতে কাগজে সরাসরি আলো পড়বে কিন্তু কোনো মতেই চোখে



ইনডাইরেক্ট আলো (ছাদে প্রতিফলিত)

সরাসরি আলো লাগবে না। চোখে বেশি আলো পড়লে যে কোনো জিনিস ভালভাবে দেখতে অসুবিধে হয়। উপর দিক



ডিফিউজড আলো

থেকে কাগজের উপর আলো পড়লে ছায়া পড়া বা চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আলোর নীচের অংশ যদি এমনভাবে ঢেকে রাখা যায় যে, পুরো আলোটা ছাতে পড়ে প্রতিফলিত হয়ে সারা ঘরে সমানভাবে ছড়িয়ে যায়, তাহলে বেশি ভাল হয়। এ-ধরনের আলোকে বলা হয় পরোক্ষ আলো (Indirect lighting)। আরো ভাল ফ্লুরোসেন্ট জাতীয় আলো বা ডিফিউজড (Diffused) আলো কিন্তু এতেও কিছুটা ছায়া আর অদরকারী চোখ ধাঁধানো দ্যুতির (Glare) সমস্যা থাকে। এই সমস্যার সমাধান করা যায় শেড-ওলা ফ্লুরোসেন্ট আলো ব্যবহার ক'রে।

ফ্লুরোসেন্ট আলোয় আঁকা বা লেখা কি বেশি ভাল?

একটানা তিনঘণ্টা চোখের কাজ সরাসরি আলোয় করলে চোখের দেখার দক্ষতা 40 শতাংশ কমে যায়, সেখানে পরোক্ষ আলোয় কমে মাত্র 10 শতাংশ।

হৃদ্‌স্পন্দনের হার কম হওয়া কি খারাপ?

নাড়ি টিপলে আমরা দেখি নাড়ি দপদপ করে মিনিটে 70-80 বার। জ্বর হলে এই স্পন্দন বেড়ে যায়। ডাক্তাররা নাড়ি টিপে তা বুঝতে পারেন। নাড়ির এই স্পন্দন স্বাভাবিক অবস্থায় কম হওয়া কি সম্ভব?

যাঁরা নিয়মিত খেলাধুলো করেন, তাঁদের স্বাভাবিক নাড়ির স্পন্দন কম হয়। এ-স্পন্দন মিনিটে 50 বারও হতে পারে। আবার খুব ভাল খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে তা মিনিটে 30 বারও হওয়া সম্ভব। শুনলে মনে হতে পারে, এটা কি ভাল?

যে কোনো পরিশ্রমের সময়ে আমাদের হৃদ্‌স্পন্দনের হার বাড়বে। যত কাজের হার বাড়ে নাড়ির গতি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। নাড়ির গতি কিন্তু হৃদ্‌স্পন্দনের হারই নির্দেশ করে।

কাজের সময়ে অক্সিজেনের জোগান দেওয়ার জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বাড়ে। সেই অক্সিজেনকে কোষে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আর কোষে জমা ক্ষতিকর বিপাকজনিত পদার্থ দূর করার উদ্দেশ্যে রক্ত চলাচলের হার বাড়াও দরকার। তাই হৃদ্‌স্পন্দনের হার বেড়ে যায়। যাঁর স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দনের হার কম, তাঁর ক্ষেত্রে বেশি পরিশ্রমে হৃদ্‌স্পন্দন অস্বাভাবিক রকম বাড়বে না, কাজেই হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়বে কম। নিয়মিত ব্যায়াম বা খেলাধুলো করলে হৃদ্‌স্পন্দনের হার কম থাকে।

হৃদ্‌স্পন্দনের হার মিনিটে মাত্র ৩০ বার হওয়া কি সম্ভব?

বইয়ের আকার কেমন হবে?

বই পড়তে কে না ভালবাসে? ভাল বই পড়তে যতই ভাল লাগুক তার নকশা বা ডিজাইন ঠিকমত না হলে বইটা নাড়াচাড়া করতে বেশ অসুবিধে হয়। তখন অনেক সময়ে অনেক আকর্ষণীয় বই পড়ার ধৈর্যও নষ্ট হয়ে যায়।

বিশাল বড় বই নাড়াচাড়া করতে খুবই অসুবিধে হয়। আবার বইয়ের সাইজ খুব ছোট হলে তা বেশ মোটা হয়ে যাবে। এমন বই পড়তেও অসুবিধে, তা ছাড়া পাতা উলটোতে উলটোতে হাত ব্যথা। পাতার সংখ্যা কমানোর জন্যে বইয়ের ছাপার অক্ষর ছোট করা যায়। তাতে আবার চোখের খাটুনি হবে বেশি।

বইয়ের আকারেরও কতকগুলো নির্দিষ্ট মাপজোখ আছে। একেবারে ঠিকঠাক মাপের বই তৈরি করতে গেলে যদি তা 5 সেন্টিমিটার (2 ইঞ্চি) মোটা হয়, তবে তার এক একটা পাতা লম্বায় 26.7 সেন্টিমিটার ($10\frac{1}{2}$ইঞ্চি) আর চওড়ায় 18 সেন্টিমিটার ($7\frac{1}{8}$ ইঞ্চি) হওয়া উচিত। 2.5 সেন্টিমিটার (1 ইঞ্চি) মোটা বইয়ের পাতা 18.6 সেন্টিমিটার ($7\frac{5}{16}$ইঞ্চি) লম্বা আর 13.6 সেন্টিমিটার ($5\frac{3}{8}$ইঞ্চি) চওড়া হলে ভাল হয়।

বইয়ের বাঁধাই কেমন হবে?

বইয়ের বাঁধাই এমন হবে যাতে বই খুললে পাতাগুলো দু'ধারে যতটা সম্ভব সমানভাবে পেতে বা ফ্ল্যাট (Flat) হয়ে থাকবে। বইয়ের ধারে তার নাম সাধারণত লম্বালম্বি ভাবে থাকে। অথচ আমরা বেশির ভাগ সময়ে বই তাকে দাঁড় করানো অবস্থায় রাখি। ফলে লম্বালম্বি নাম পড়তে একটু

অসুবিধে হয়। নামটা যদি মাটির সঙ্গে অনুভূমিক (Horizontal) হয়, তাহলে পড়তে সুবিধে। তবে খুব বড় নাম লম্বালম্বি না রেখে উপায় থাকে না।

মেয়েরা চেহারায় ছোটখাটো হয় বলেই কি ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না?

বেশির ভাগ বড় বড় প্রতিযোগিতায় আমরা দেখি ছেলে আর মেয়েদের বিভাগ আলাদা থাকে। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমানে সমানে হবে না বলেই আলাদা ব্যবস্থা। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের শারীরিক ক্ষমতায় পেরে না ওঠার কারণ কী? মেয়েরা লম্বায়, চওড়ায় ছেলেদের তুলনায় কম বলেই কি তারা পারে না?

ঠিক তা নয়। মেয়েদের শরীরে চর্বি জমা ক'রে রাখার কলা বা অ্যাডিপোজ টিস্যু (Adipose tissue) বেশি থাকে বলেই মেয়েদের অক্সিজেনের সাহায্যে কাজ করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা (Maximal aerobic capacity) ছেলেদের তুলনায় কম হয়। কিন্তু অ্যাডিপোজ টিস্যুর হিসেব বাদ দিলে মেয়েদের শরীরের প্রতি কেজি ওজনে অক্সিজেন নেওয়ার সর্বাধিক ক্ষমতা ছেলেদের তুলনায় একটুও কম নয়। বরং তাদের আকার ছোট বলে তুলনায় কিছুটা বেশিই হবে।

মেয়েদের কি অক্সিজেনকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা কম?

মেয়েদের আর একটা অসুবিধে হল তাদের রক্তে শ্বাসকণিকা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ছেলেদের তুলনায় কম থাকে। অক্সিজেনকে বয়ে কোষে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হিমোগ্লোবিনের। কাজেই তাদের পরিমাণ কম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই একজন মেয়ের অক্সিজেনকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা কম। ছেলেদের শরীরে প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 15 গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে, সেখানে মেয়েদের প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে থাকে 14 গ্রাম হিমোগ্লোবিন।

রেডিমেড জামা-কাপড়ের দোকানিরা সবার মাপের জামা বিক্রি করে কী ভাবে?

দোকানে গিয়ে বড়, ছোট, বেঁটে, লম্বা, রোগা, মোটা—আমরা সবাই যে-যার মাপ মত জামা পেয়ে যাই। এটা সম্ভব হয় কী ভাবে? দোকানি এত রকমারি মাপের জামা কী ক'রে তৈরি করে?

যে কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে বা তার ডিজাইনের জন্যে একটা মাপের দরকার—তা সে দরজা, জানলা, আসবাব হোক, কিংবা জামা-কাপড়, জুতো যাই-ই হোক না কেন। এই মাপ কী হবে তা ঠিক করার জন্যে যিনি ডিজাইন করবেন তিনি অনেক লোকের মাপ জোগাড় করেন। সবার মাপ তো আর নেওয়া যায় না। তাই নানা ধরনের কিছু লোক থেকেই একটা হিসেবের চেষ্টা চলে। এর মধ্যে মোটামুটি স্বাস্থ্য ভাল এমন লোকও যেমন থাকে, তেমনি মাঝারি আর ছিপছিপে চেহারার মানুষও বাদ পড়েন না। এ-কথা ঠিক যে, প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা মাপ নেওয়া হয় না। তবে সত্যি কথা বলতে, কয়েকজন দৈত্যাকৃতি বা বামনাকৃতি মানুষ ছাড়া আমাদের মাপে তেমন সাংঘাতিক কিছু হেরফের দেখা যায় না।

মাপ তো নেওয়া হল। এবার এই অসংখ্য মাপ থেকে কি ভাবে জামার মাপ ঠিক হবে? এখানে কিন্তু মাপগুলোর গড় (Mean) নিলে চলবে না। দোকানিকে দেখতে হবে কোন মাপটা সবচেয়ে বেশিবার এসেছে। পরিসংখ্যানের ভাষায় একে বলে মোড (Mode)।

ধরা যাক, দোকানদারটি দর্জির দোকানে গিয়ে 25 জন খদ্দেরের ফুল প্যান্টের দৈর্ঘ্য সংগ্রহ করল। এই মাপ সাধারণত ইঞ্চিতেই প্রকাশ করা হয়। ধরা যাক, সেগুলি এইরকম ঃ 38, 35, 38, 37, 40, 36, 33, 38, 40, 36, 31, 35, 41, 30, 36, 40, 42, 38, 36, 38, 32, 39, 37, 40, 39। এখন দোকানদার যদি গড় মানটি নিয়ে সেই মাপে ফুলপ্যান্ট তৈরি করে তাহলে সে 37 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একরাশ প্যান্ট বানাবে। কিন্তু দোকানে কি শুধু 37 ইঞ্চি ঝুলের প্যান্ট রাখলে কাজ চলবে? তখন তো উপরের 25 জনের মধ্যে মাপ মত প্যান্ট পাবে মাত্র দু'জন।

এখানে দোকানদারকে নিতে হবে মোড। উপরের তালিকা ভালভাবে দেখলেই বোঝা যায়, 5 জনের প্যান্টের দৈর্ঘ্য 38 ইঞ্চি, 4 জনের 40 ইঞ্চি এবং 4 জনের 36 ইঞ্চি।

দোকানদার যদি এই 36, 38 আর 40 ইঞ্চি ঝুলের তিন সাইজের প্যান্ট বানায় তাহলে 5+4+4, অন্তত 13 জন খদ্দেরের প্যান্ট না পাবার কোনো কারণ থাকে না।

প্যান্টের মত জামা তৈরির বেলায়ও দৈর্ঘ্য, ওজন বা বুকের ছাতির মাপের পরিসংখ্যান তালিকা বানানো যায়। তা থেকে একাধিক মোড পাওয়া যায়, যার সাহায্যে দোকানিরা একাধিক মাপের রেডিমেড জামা বানিয়ে রাখে।

পাহাড়ে ওঠার সময়ে হাঁফাই কেন?

ছোটখাটো পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতাও যাদের আছে তারাই জানে, পাহাড়ে উঠতে গেলে হাঁফ ধরে, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায় ভীষণভাবে। একটু বেশি উচ্চতায় দশ পা উঠলে মনে হয়, সামান্য জিরিয়ে নিই। এমনটা হয় কেন?

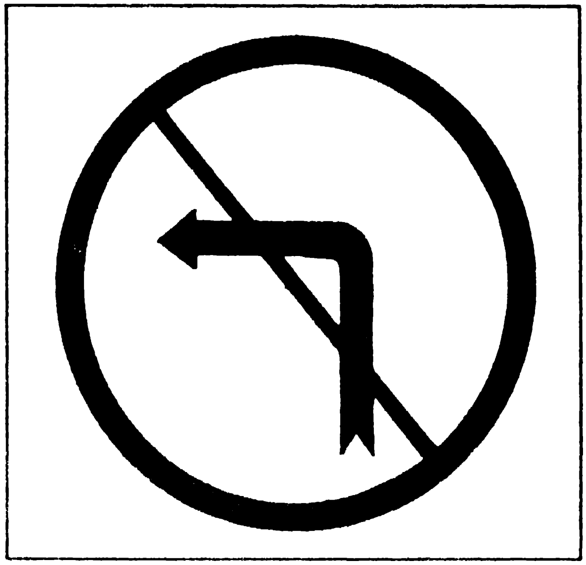
যত উঁচুতে ওঠা যায় ততই বাতাসের ঘনত্ব কমতে থাকে, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কমে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই তখন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কারণ শ্বাস নেওয়ার সময়ে শ্বাসনালীতে যে বাধার (Resistance) সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে বাতাসকে শরীরের ভিতরে পাঠাতে কিছুটা বাড়তি শক্তিক্ষয় ঘটে।

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কমার সঙ্গে অক্সিজেনেরও সম্পর্ক আছে। বাতাসে অক্সিজেনের যে আংশিক চাপ (Partial pressure) রয়েছে তা সমগ্র চাপের 21 শতাংশ। কাজেই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কমলে তার 21 শতাংশ হিসেবে অক্সিজেনের চাপও কমতে থাকবে।

বাতাসে অক্সিজেনের আংশিক চাপ কমলে ফুসফুসে গৃহীত বাতাসেও অক্সিজেন কম থাকবে। এদিকে আমাদের শরীরে কতকগুলি গ্রাহক আছে যারা অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতির ঘনত্ব কমা-বাড়া বুঝতে পারে। এদের

বেশি উঁচুতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কতটা বাড়তে পারে?

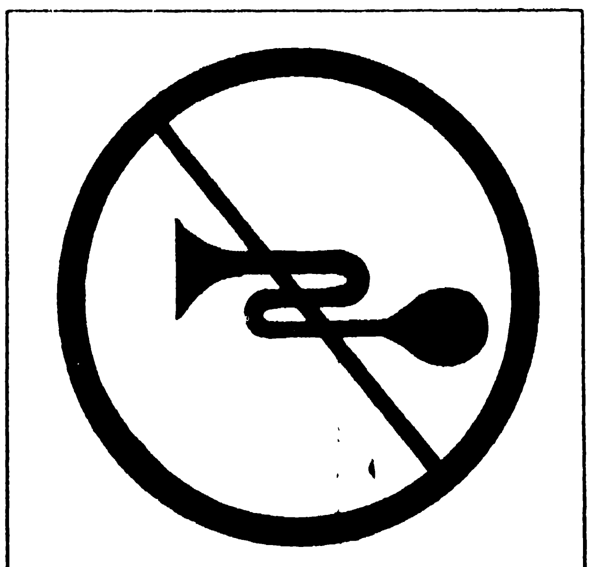
বলে 'কেমোরিসেপটর' (Chemo-receptor)। বুক এবং গলার বড় ধমনীর সঙ্গে যুক্ত এই গ্রাহকরা ধমনীর রক্তে অক্সিজেন কম হলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এবং একই সঙ্গে মস্তিষ্কের শ্বসন-কেন্দ্রকেও উত্তেজিত ক'রে তোলে। শ্বসন-কেন্দ্র সে-সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের হার বাড়িয়ে দিয়ে অক্সিজেনের ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করে। হঠাৎ বেশি উঁচুতে উঠলে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার 65 শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এই কারণেই পাহাড়ে ওঠার সময়ে হাঁফাতে হয়।



বাঁদিকে ঘোরা নিষেধ

নোটিসের নির্দেশ কি ভাষায় থাকবে না ছবিতে?

নোটিসের মাধ্যমে কোনো তথ্য জানানোর কয়েকটা



হর্ন বাজানো নিষেধ

অসুবিধে আছে। প্রথমত ভাষার ফারাক—এক জন ফরাসি চালকের কাছে গাড়ি 'বাঁ দিকে যাবে না' আর 'নো লেফ্ট্ টার্ন' দুটো বাক্যই সমান অর্থহীন। কিন্তু পৃথিবীর সব ক'টা ভাষায় তো আর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যায় না। এখানে কিন্তু বাঁ দিক নির্দেশ করছে এমন একটা তীর চিহ্ন এঁকে সেটাকে ক্রস চিহ্ন দিয়ে কেটে দিলে সবাই বুঝবে বাঁ দিকে যেতে বারণ করা হচ্ছে।

যাঁরা বর্ণান্ধ তাঁরা ট্র্যাফিক সিগনালের লাল আর সবুজ আলোর ফারাক ধরতে পারেন না। তাই আলোর উপর ছবি এঁকে অনায়াসে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, যেতে বলছে না দাঁড়াতে বলছে।

এ-কথা ঠিক, অনেকখানি লেখা পড়ে বা অনেকটা হিসেব-নিকেশ করে একটা কিছুর মানে বোঝার থেকে ছবি বা রঙের সাহায্যে আরো সহজে দ্রুত ব্যাপারটা বোঝানো যায়। যেমন, গাড়ির পেট্রোল-ট্যাঙ্কে কম পেট্রোল নিয়ে বেরোলে মাঝরাস্তায় তেল ফুরিয়ে গিয়ে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে তেলের রিডিং নিয়ে কতটা তেল আছে, যতটা আছে, তাতে কতটা পথ যাওয়া যাবে, এ-সব হিসেব করতে হয়। কিন্তু তেলের মাপ বোঝানোর মিটারে খুব বেশি ভাগ থাকে না। তা ছাড়া অল্প দূরে যাওয়ার সময়ে হিসেবের গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। এ-জন্য ওই মিটারের বাঁ দিকের অনেকটা অংশ লাল করা থাকে। ওই লাল এলাকায় সূচক থাকা মানেই এক ঝলক তাকিয়েই বুঝে যাওয়া যায়—তেল কম আছে।

বর্ণান্ধদের ট্র্যাফিক সিগনাল বোঝানো যাবে কী ভাবে?

কোনো গবেষণাগারের কর্মীকে হয়তো সারাক্ষণ একটা ট্যাঙ্কের জলের তলের দিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে। এখানেও মিটারের সাহায্যে জলের পরিমাণ বোঝা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে হিসেব করতে হবে, ট্যাঙ্কে মোট কত জল ধরে, এখন কতটা আছে, তাহলে খালি রইল কতটা। এখানে যদি একটা টিউবকে এমনভাবে ট্যাঙ্কের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় যে, ট্যাঙ্কের জল বাড়া-কমার নির্দিষ্ট অনুপাতে টিউবেও জল বাড়বে-কমবে, তাহলে টিউবটার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বোঝা যাবে, কতটা জল ট্যাঙ্কে আছে।

নার্ভাস খেলোয়াড় কি খারাপ খেলেন?

অনেক সময়ে নামী-দামী অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রাও খেলার আগে নার্ভাস হয়ে পড়েন। তাঁদের হাত-পা কাঁপে, গা গুলোয়, শরীর খারাপ লাগে, বুক ধড়ফড় করে। খেলার মাঠে নেমে কি এঁরা সব সময়ে খারাপ খেলেন?

আদৌ না। খেলার ঠিক আগে ভয় করা বা শরীর খারাপ লাগার সঙ্গে খেলোয়াড় কেমন খেলবেন তার কোনো সম্পর্কই নেই। বরং এই ভয় পাওয়া বা উদ্বেগ তাঁর খেলার মান বাড়িয়ে দিতে পারে।

কী ক'রে?

আমরা ভয় পেলে বা উদ্বিগ্ন হলে আমাদের শরীরে একটা হরমোন বেরোয় যাকে বলা হয় এমার্জেন্সি বা বিপদকালীন হরমোন। এর প্রকৃত নাম অ্যাডরেনালিন। এই হরমোন পেশীর সংকোচন ক্ষমতা বাড়ায়। নার্ভাস লাগা অবস্থাকে বলে 'প্রি-স্টার্ট ফেনোমেনন' (Pre-start phenomenon)। কারণ এই অবস্থাই অ্যাডরেনালিন হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়।

মেল প্যাটন নামে এক দৌড়বাজ দৌড়নোর আগে যখনই বমি করতেন তখনই তিনি জিততেন। কাজেই খেলতে নামার আগে নার্ভাস হয়ে পড়লেও চিন্তা নেই। সেটাই যে জীবনের সেরা খেলা হবে না, কে বলতে পারে!

একটানা দাঁড়িয়ে যাঁরা কাজ করেন অনেক সময়ে তাঁদের পায়ের শিরা দড়ি পাকানো হয় কেন?

ট্র্যাফিক কনস্টেবলদের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটানা বহুক্ষণ কাজ করতে হয়। যাঁরা একটানা দাঁড়িয়ে কাজ করেন, অনেক সময়ে দেখা যায়, বেশি বয়সে তাঁরা এক যন্ত্রণাদায়ক রোগের কবলে পড়েন। এঁদের পায়ের শিরা চোখে পড়লে চমকে উঠতে হয়; পাকানো দড়ির মত, জায়গায় জায়গায় অস্বাভাবিক ফোলা আর গাঢ় নীল। এই রোগের নাম ভেরিকোজ ভেন (Varicose vein)।

এই রোগ হয় কেন?

শিরার দেওয়াল বা প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) নষ্ট হয়ে যাওয়াই এই রোগের মূল কারণ। এর ফলে শিরার রক্তের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

দাঁড়ানো অবস্থায় অভিকর্ষজ টানে বেশির ভাগ রক্ত পায়ে নেমে আসে। চলাফেরা করলে তবু পেশীকে কাজ করতে হয়। তখন পেশীর রক্ত নালীগুলি সংকুচিত হয়ে রক্তকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত ফেরার হারও কমে আসে। এই অবস্থায় পায়ের শিরার ভিতর রক্তের চাপ বেড়ে যায়। সেই চাপ গিয়ে পড়ে শিরার দেওয়ালে।

শিরার ভিতরে রক্ত চলাচলের গতিকে একমুখী ক'রে রাখার জন্যে জায়গায় জায়গায় কপাটিকা বা ভাল্‌ভ (Valve) থাকে। এই ভাল্‌ভরাও রক্তের পুরো চাপকে দেওয়ালে পড়তে দেয় না। কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে গেলে এরাও অকেজো হয়ে পড়ে।

পায়ের শিরার এই পরিবর্তন কিন্তু প্রথম অবস্থায় ধরা শক্ত। তবে পা ভারী বোধ, পা টানতে না পারার মত ক্লান্ত লাগা, রাতে পায়ে খিঁচ ধরা, পায়ে অসহ্য ব্যথা, গোড়ালি ফোলা—এগুলো অনেক সময়ে ভেরিকোজ ভেন হওয়ার লক্ষণ। অবশ্য পা উপরে ক'রে বিশ্রাম নিলে এই রোগ বাড়াবাড়ি আকার নিতে পারে না। পা উপরে রাখা অবস্থায় বেশি রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে বা ভেনাস রিটার্ন বাড়ে। আর পায়ের শিরাও তখন বাড়তি চাপ থেকে মুক্তি পায়।

হৃদ্‌রোগীর পক্ষে কোন ধরনের পরিশ্রম ভাল—হাতের না পায়ের?

হার্টের রোগীদের ডাক্তাররা ব্যায়াম করতে বলেন। বাগানে মাটি কোপানোও তো এক ধরনের ব্যায়াম। এতে হাতের পেশী কাজ করে। এই ধরনের ব্যায়ামও কি হৃদ্‌রোগীরা করতে পারেন?

না, যে-ধরনের পরিশ্রমে পায়ের পেশীর তুলনায় হাতের পেশীকে বেশি কাজ করতে হয় সে-ধরনের কাজ করলে

হালকা ধরনের জগিং কি ভাল?

রক্তচাপ বেড়ে যায়। ফলে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে বেশি। মাটি খোঁড়া, ভারী জিনিস বওয়া—এ ধরনের কাজ হার্টের রোগীদের একেবারেই করা চলবে না।

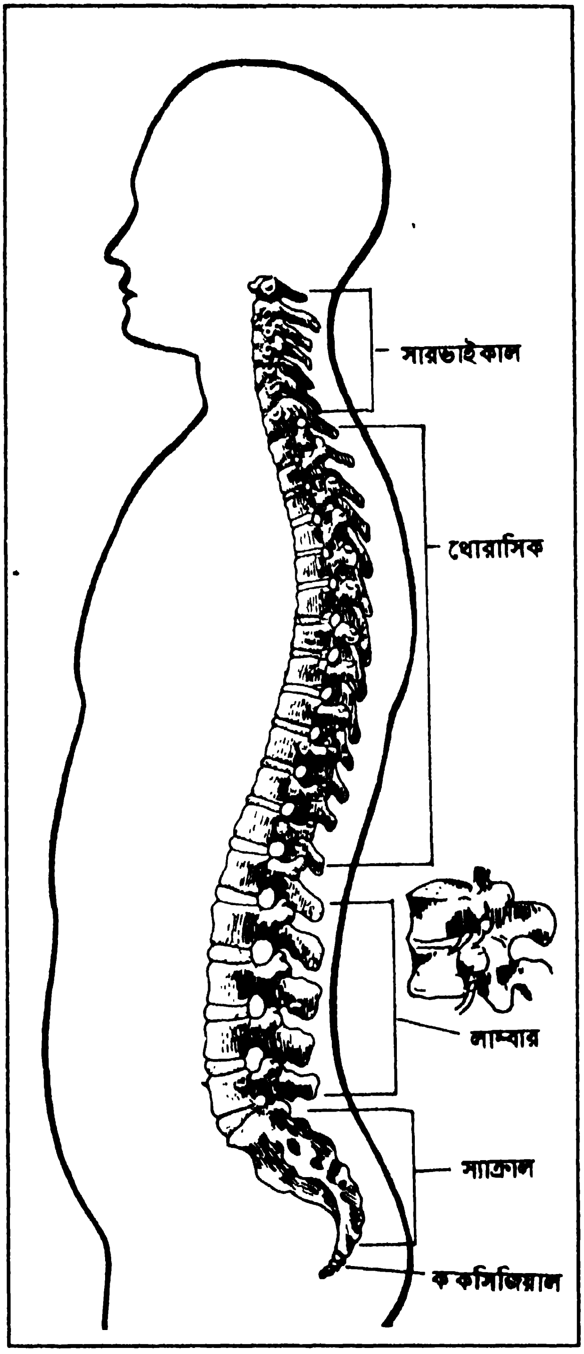
হাতের পেশীর পরিমাণ পায়ের পেশীর তুলনায় অনেক কম। শুধু হাতের পরিশ্রম করলে কাজ না ক'রে বসে থাকা পায়ের পেশীর রক্তনালীগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। তাই রক্তচাপও বেড়ে যায়। কিন্তু পায়ের পেশীকেও কাজ করালে অনেক বেশি সংখ্যক পেশীকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। আর রক্তনালীগুলো প্রসারিত হয়। ফলে রক্তচাপ বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায় এবং হার্টকেও বাড়তি কাজ করতে হয় না। এ-দিক দিয়ে হাল্কা ধরনের জগিং খুব ভাল।

ভারী জিনিস তুলতে গেলে অনেক সময়ে কোমরে ব্যথা হয় কেন?

ভারী জিনিস তোলবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে কোমরে ব্যথা লাগে। যাদের এই ধরনের কাজ বেশি করতে হয় তাদের কখনও কখনও ব্যথা সব সময়ের সঙ্গী হয়ে পড়ে। আচমকা, বেকায়দায় ভারী জিনিস তুলতে গেলে কোমরে যখন খট্‌কা লেগে যায়, তখন তার যন্ত্রণা মারাত্মক। কেন এমন হয়?

এই যন্ত্রণার কারণ দু'টো—প্রথম কারণ, ওজন তোলার সময়ে খেয়াল না ক'রে যেমন-তেমন ভাবে তোলা। আর দ্বিতীয় কারণ, ব্যায়াম না করার জন্যে পেশীগুলোর শক্তির অভাব। যাঁরা নিয়মিত খেলাধূলা করেন তাঁদের এই ধরনের ব্যথায় বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না।

আমাদের মেরুদণ্ডে যে তেত্রিশটি কশেরুকা বা ভার্টিব্রা আছে, কোমরের কাছে রয়েছে তার মধ্যে পাঁচটি—লাম্বার ভার্টিব্রা। কোনো জিনিস তোলার জন্যে আমরা যখন নীচু হই তখন আমাদের শরীরটা একটা লিভারের মত কাজ করে। লিভারের আলম্ব বা ফালক্রামের (Fulcrum) কাজ করে পঞ্চম লাম্বার ভার্টিব্রা। যে বিন্দুতে ভর দিয়ে লিভারের বাহু দু'টো ওঠা-নামা করে তাকেই বলে আলম্ব। এই আলম্বের দু'দিকে থাকে দু'টি বাহু। এর একটা বাহু বড়, অন্যটা ছোট। হাত আর শরীর মিলে তৈরি করে লিভারের বড় বাহু। যে-ভার তুলছি সেটা আর তার সঙ্গে মাথা, হাত ও শরীরের উপরের অংশের ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করে লিভারের ছোট বাহু। এখানে ছোট বাহু হল পঞ্চম লাম্বার ভার্টিব্রার কেন্দ্র থেকে মেরুদণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব। এই ছোট বাহুর সংলগ্ন পেশী সংকুচিত হয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে।



মেরুদণ্ড

এই ভারসাম্য রক্ষার সময়ে পুরো ভারটা গিয়ে যাতে মেরুদণ্ডের উপর না পড়ে তার হাত থেকে বাঁচায় শরীরের বিভিন্ন পেশী। এরা কাজ না করলে অবস্থা খুব খারাপ হত। যেমন, 77 কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষ যদি 90 কিলোগ্রাম একটি ভার তুলতে যেতেন তবে তাঁর পঞ্চম লাম্বার আর প্রথম স্যাক্রাল ভার্টিব্রা [দ্রষ্টব্য ঃ চেয়ারের ঠেস কেমন হবে?] দু'টির মাঝে যে ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্‌ক্ আছে তার উপরে চাপ পড়তো 900 কিলোগ্রামেরও বেশি। মেরুদণ্ডের পক্ষে এত ভার সওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের বুক আর পেটের ভিতরকার ফাঁকা জায়গা মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম (Diaphragm) নামের পর্দা দিয়ে আলাদা করা। পর্দার উপরে আছে বক্ষ-গহ্বর বা থোরাসিক ক্যাভিটি (Thorasic cavity) আর নীচে উদর-গহ্বর বা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি (Abdominal cavity)। ভার তোলার সময়ে শরীরের বুক এবং পেট অঞ্চলের বিভিন্ন পেশী আর মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয়। এরপরে শ্বাস নিলে বক্ষ-গহ্বরের ভিতর বাতাসের চাপ বাড়ে। তখন বক্ষ-গহ্বর আর মেরুদণ্ড মিলে মিশে একটা শক্ত থামের মত কাজ করে। তখন উদরও মোটামুটি শক্ত হয়ে মেরুদণ্ডকে ঠেকনা দেয়। ফলে মেরুদণ্ডের ভারের অনেকটাই এই শক্ত থামের উপর পড়ে। এতে মেরুদণ্ড বেশ খানিকটা রেহাই পায়।

কিন্তু উদরের পেশী শিথিল বা কমজোরি হলে তার এই ঠেকনা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তখন ভারের বেশির ভাগটাই গিয়ে পড়ে মেরুদণ্ডে এবং তার চোট পাওয়ার সম্ভাবনা যায় বেড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম ক'রে উদরের পেশীকে জোরদার রাখলে কোমরের ব্যথায় ভোগার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে।

সাঁতার কাটতে মেয়েদের দম কম লাগে কেন?

চলতি কথায় আমরা বলি হালকা জিনিস জলে ভাসে, ভারী জিনিস ডুবে যায়। ভারী বা হালকা বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে?

কোনো জিনিসের ওজন তার সমান আয়তনের জলের ওজনের তুলনায় যতটা বেশি সেটাকে বলে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব। যে-জিনিসের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম তাকে আমরা হালকা বলি। কাঠ হালকা বলে জলে ভাসে। আর এক টুকরো লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি বলে তা জলে ডুবে যায়।

লোহাকেও কিন্তু জলে ভাসানো যায়, যদি তাকে এমন আকার দেওয়া যায় যে ভাসবার সময়ে ওই লোহা যতটা জল

সরাবে তার ওজন লোহার ওজনের থেকে বেশি হয়। যেমন, লোহার তৈরি জাহাজ জলে ভাসে। জলে ডোবা অবস্থায় কোনো জিনিসের ওজন কমে যায়।

কতটা কমে?

ওই জিনিস যতটা জল সরাতে পারে সেই জলের ওজনের সমান ওজন কমবে। এই ওজন কমার ব্যাপারটা কিন্তু আসলে সত্যি নয়। কোনো জিনিস জলে ডোবা অবস্থায় জল ওই জিনিসটাকে ঊর্ধ্ব-চাপ দেয়। একে বলে প্লবতা (Buoyancy)।

আমাদের হাড়গোড়ের ওজন যথেষ্ট বেশি। বিশেষ করে মাথার ওজন তার আয়তনের তুলনায় বেশি বলে মাথাটা জলের নীচে তলিয়ে যেতে চায়। সাঁতারের সময়ে আমরা হাত-পা ছুঁড়ে বেশি জল সরাই, যাতে সরানো জলের ওজন আমাদের দেহের ওজনের থেকে বেশি হয়। তবেই আমরা ভাসতে পারি।

হাত পা ছোঁড়া মানেই পেশীকে বেশি কাজ করানো। আর পেশী বেশি কাজ করা মানেই চাই বাড়তি অক্সিজেন। এইজন্যেই সাঁতারে বেশ দম লাগে। মেয়েদের শরীরের গঠন এ-রকম যে, তাতে চর্বির পরিমাণ বেশি। চর্বির আপেক্ষিক গুরুত্ব কম। তাই আয়তনের তুলনায় মেয়েদের ওজন কম। এই জন্যেই মেয়েদের সাঁতার কাটতে বেশি সুবিধে হয়, আর দমও কম খরচ হয়।

মনোবিজ্ঞান



এখন থেকে একশো বছরের কিছু আগেও মনস্তত্ত্ব ছিল বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখা হিসেবে তখন তার যা পরিচিতি। 1879 সালে মনস্তত্ত্বের তত্ত্বগুলিকে হাতেনাতে প্রমাণ করতে জার্মানির লিপজিগ্ শহরে তৈরি হল প্রথম গবেষণাগার; মনস্তত্ত্ব সেদিনই বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গত একশো বছরে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের চিন্তা-ভাবনা-আচরণ-অনুভূতি সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্নের সদুত্তর মিলেছে; আবার যত দিন যাচ্ছে, মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, ফলে নতুন নতুন প্রশ্ন এসে ভিড় করছে মনের মধ্যে। প্রতিদিনকার জীবনে হাসি-কান্না-ভয়-বিরক্তিকে ঘিরে আমাদের মনে নিত্য কৌতূহল জাগায় এমন প্রশ্নের শেষ নেই। মনোবিজ্ঞানকে ইংরেজিতে বলে Psychology।

মানসিকতা কি জন্মগত?

আমাদের ধারণা মানসিকতা জন্মগত। কিন্তু মানসিকতাকে কি পুরোপুরি জন্মগত বলা যায়?

মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতর 23 জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোম সূক্ষ্ম সুতোর মত এক পদার্থ, থাকে জোড়ায় জোড়ায়। আবার বংশগত বৈশিষ্ট্য যে-পদার্থে ধরা থাকে, সেই জিন (Gene) থাকে এই ক্রোমোজোমের ভিতরে। প্রতি জোড়া ক্রোমোজোমের একটি আসে বাবার আর অন্যটি মার শরীর থেকে; ফলে বাবা এবং মা দু'জনেরই শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন চোখের মণির রঙ, মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদি ফুটে ওঠে তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। একই ভাবে বাবা-মার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও ছেলেমেয়েদের মধ্যে বর্তায়। উনিশ শো ষাটের দশকের গোড়ায় মুরগিদের নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল, হিংস্র এবং মারকুটে স্বভাবের মোরগ এবং মুরগির ছানাদের বাবা-মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও পরবর্তী কালে বাবা-মার সঙ্গে তাদের আচরণে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। শান্ত স্বভাবের মুরগির ছানাদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। ইঁদুর ছানাদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, জন্মের পরে আসল বাবা-মার কাছ থেকে সরিয়ে অন্য ইঁদুরদের কাছে রেখে দিলেও তাদের আচার-ব্যবহারে আসল বাবা-মার চরিত্রই ফুটে ওঠে। মানুষের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়, তবে একই চেহারার যমজ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে—চেহারার মত বুদ্ধির ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে প্রচুর মিল থাকে।

মানসিকতার পিছনে পরিবেশের কতটা ভূমিকা আছে?

মানুষের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বংশগতির কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ-বিষয়ে এক মজার পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ডি জি ফ্রিডম্যান নামে এক মনোবিজ্ঞানী। চার জাতের কুকুরের দু'টো ক'রে যমজ বাচ্চা নিয়ে তিনি তাদের দু'টো দলে ভাগ করেন; প্রত্যেকটা জাতের এক একটা বাচ্চাকে রাখা হয় এক একটা দলে। কুকুরগুলির বয়স যখন আট সপ্তাহ, ওদের এক দলকে এমন ট্রেনিং দেওয়া হল যাতে খাবার-দাবার সামনে রাখলেও বিশেষ সংকেত না দিলে তারা সে খাবার ছোঁবে না। অন্য দলকে খাওয়ার ব্যাপারে কোনোরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে রাখা হল না। কিছুদিন পরে যখন আটটা কুকুরকেই খাবারের সামনে ছেড়ে দেওয়া হল—দেখা গেল, 'শেটল্যাণ্ড' জাতের দু'টো কুকুরই তা স্পর্শ করলো না, আবার 'বেসেন্‌জি' জাতের কুকুর দু'টো খাবার দেখেই তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। 'ফক্সটেরিয়ার' আর 'বিগল' জাতের যে কুকুর দু'টি খাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছিল—দেখা গেল, খাবার সামনে পেয়েও তারা সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু তাদের ট্রেনিং না-পাওয়া যমজ ভাইয়েরা স্বাভাবিকভাবেই খাবারের দিকে এগিয়ে গেল।

এ থেকে বোঝা গেল, কোনো কোনো জাতের কুকুরদের উপর পরিবেশ, অর্থাৎ ট্রেনিংয়ের নিশ্চিত প্রভাব পড়লেও, বাকিরা খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের জন্মগত স্বভাবেরই পরিচয় রেখেছে। মানুষের ক্ষেত্রেও বংশগতি এবং পরিবেশ—এই দু'য়ের মিলিত প্রভাব তার মানসিকতার রূপটি ফুটিয়ে তোলে।

আমরা ভয় পাই কেন?

আমরা যে অনেক সময় ভয় পাই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের ভয় পাওয়ার কারণ কি?

ভয়ের জন্ম হয় বিপদের আশঙ্কা থেকে। কোনো মানুষ আমাদের বিপদে ফেলতে পারে জানলে আমরা ভয় পাই, এড়িয়ে চলি। এইজন্যই ষণ্ডামার্কা লোককে আমরা যতটা ভয় পাই, রোগা-দুব্‌লা লোককে ততটা ভয় করি না। বিপদের আশঙ্কার পিছনে এখানে মানুষটির শারীরিক গঠন এক নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করছে। আবার কোনো মানুষের অবয়ব আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত হলেও যদি আমাদের জানা থাকে যে, মানুষটি প্রকৃতিতে রাগী এবং আমাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে তবে তাকেও আমরা ভয় পাই এবং সমীহ ক'রে চলি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—সাধারণভাবে অচেনা, অজানা লোককে আমরা ভয়

পাই না, অথচ যেই মানুষটি আমাদের পরিচিত হয়ে ওঠে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা জেনে ফেলি তখনই তার প্রতি আমাদের ভয় অথবা ভালবাসা জেগে ওঠে। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায়। একটা ফণা তোলা সাপের দিকে সে হয়তো নির্ভয়ে হাতটা এগিয়ে দেবে, কারণ সাপের চরিত্র তার অজানা। কিন্তু সাপ সম্পর্কে যারা জানে তারা আধো-অন্ধকারে দড়িকেই সাপ বলে ভুল করবে।

সাপের চরিত্র জেনে ফেলার পরে সাপ সম্পর্কে আমাদের মনে যেমন ভয় বাসা বাঁধে, তেমনি কোনো কিছু

জুজুকে শিশুরা ভয় পায় কেন?

জেনে ফেলার পর যদি বিপদের আশঙ্কা কমে তবে ভয়টাও দূর হয়। ছোট ছেলে-মেয়ে খাওয়ার সময়ে বায়না করলে মা যখন বলেন—জুজুকে ডেকে দেব, তোমায় ধরে নিয়ে যাবে—তখন শিশুটি স্বভাবতই ভয় পায়। 'জুজু' নামের ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণী এসে ধরে নিয়ে যেতে পারে—এটা জানার ফলে শিশুটির মনে বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই শিশুটিই যখন বড় হয়ে জানতে পারে যে, 'জুজু' বলে কোনো কিছু নেই—তখন 'জুজু' থেকে বিপদের আশঙ্কা দূর



হয় আর সেইজন্যে ভয়টাও মিলিয়ে যায় তার মন থেকে। বিপদের আশঙ্কা করা বা ভয় পাওয়ার পিছনে অভিজ্ঞতারও একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। ঝড়-বৃষ্টিতে যার বাড়ি একবার ভেঙে পড়েছে—জোরে বৃষ্টি নামলে কিম্বা কালবৈশাখির ঝড় উঠলে সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে; অন্যদিকে শহরের বড়সড় বাড়িতে যে থাকে—প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির সময়ে সে আনন্দ ক'রে উনুনে খিচুড়ি চাপায়!

পরীক্ষার আগে অনেকের পেট ব্যথা বা গা-বমিবমি করে কেন?

পরীক্ষার আগে অনেকেরই শরীর খারাপ লাগে। কারোর পেট-ব্যথা হয়, কারোর গা-বমিবমি করে। এর কারণ কি?

স্বাভাবিকভাবে যে-বিষয়ে আমাদের ভয় থাকে তাকে আমরা সাধারণত এড়িয়ে চলি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার ভয়ে পরীক্ষার হলে যাবার ঠিক আগেই অনেকের পেট ব্যথা বা গা-বমিবমি করে; পরীক্ষা এড়ানোর উপায় হিসেবেই এই প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেয়। পরীক্ষাকে ঘিরে আতঙ্ক বা উৎকণ্ঠা শরীরের বিভিন্ন স্নায়ুকে উত্তেজিত করে এবং তার ফলেই শারীরিক উপসর্গের সৃষ্টি। উদাহরণ হিসেবে, মানসিক অস্বস্তির ফলে ফ্রেনিক নার্ভ (Phrenic nerve) যদি উত্তেজিত হয় তবে গা গুলোবে, কিংবা ভেগাস নার্ভ (Vegus nerve) উত্তেজিত হলে অম্বলের উপসর্গ দেখা দেবে; যে-সব স্নায়ুর সঙ্গে অন্ত্রের দেওয়ালের যোগাযোগ রয়েছে সেগুলি উত্তেজিত হলে বারবার বাথরুমে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়।

কিন্তু ফ্রেনিক নার্ভ কাকে বলে? ভেগাস্ নার্ভ-ই বা কোন নার্ভ?

ফ্রেনিক নার্ভের উৎপত্তি সুষুম্না কাণ্ড থেকে—ফুসফুসের মেঝে বা ডায়াফ্রামের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। এই ধরনের স্নায়ু অকেজো হলে ডায়াফ্রামটি নিশ্চল হয়ে পড়ে, ফলে ফুসফুসের কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

আর ভেগাস নার্ভ কোন স্নায়ু?

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (Central Nervous System) যেসব সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র আমাদের শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাচ্ছে তাদের বলা যায় উপান্ত স্নায়ু (Peripheral nerves)। উপান্ত স্নায়ুদের মধ্যে যেগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ভিতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছোয় তাদের নাম করোটি স্নায়ু (Cranial nerves)। কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী এই করোটি স্নায়ুগুলোর আলাদা আলাদা নামকরণ করা হয়েছে। 'ভেগাস নার্ভ' হল এমনি একটি করোটি স্নায়ু; হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদির কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ফোবিয়া কি?

ফোবিয়া কথাটা আমাদের অনেকের শোনা। কিন্তু ফোবিয়া কাকে বলে?

ফোবিয়া হল অস্বাভাবিক ভয়—যার পিছনে কারণ যাই থাক, আপাতদৃষ্টিতে তাকে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। এ এক ধরনের মনেরই অসুখ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—আরশোলা উড়তে দেখে কেউ একটু আধটু ভয় পায়, কেউ বা আতঙ্কে শিরশির ক'রে কাঁপতে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে যেটা স্বাভাবিক ভয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটাই হল 'ফোবিয়া'। বহু জিনিসেই ফোবিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন কুকুর, বেড়াল বা ইঁদুর দেখলেই কেউ আতঙ্কে অস্থির হয়, একা একটা ঘরের মধ্যে থাকতে হলে কারোর বা দমবন্ধ হয়ে আসে, কেউ বা খাল-বিল-পুকুরের জলে নামতেই ভয় পায়—তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, জলে নামলেই বুঝি তারা ডুবে যাবে অথবা হাঙর-কুমির তাদের গিলে খাবে!

আর পাঁচটা অসুখের মত 'ফোবিয়া'র পিছনেও কিছু কিছু কারণ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিপজ্জনক কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা মানুষকে তার পরবর্তী জীবনে একই ধরনের ঘটনা বা পরিস্থিতির ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তোলে। এইজন্যেই যুদ্ধে গিয়ে বহু মানুষকে গুলিগোলা খেয়ে মরতে দেখে অনেক সৈন্য যুদ্ধের নামেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আবার পাইলটদের অনেকে ঘটনাচক্রে কোনো প্লেন-দুর্ঘটনায় পড়লে পাছে আবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এই ভয়ে এরোপ্লেন চালানোই ছেড়ে দেয়।

অতিরিক্ত ভয় পেলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় কেন?

ভয় আমরা অনেক সময়েই পাই। কিন্তু দেখা গেছে, অতিরিক্ত ভয় পেলে মানুষ কখনো কখনো অজ্ঞান হয়ে যায়। এর কারণ কি?

যখন আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকি, অর্থাৎ আমাদের অনুভূতিগুলি সজাগ থাকে এবং প্রয়োজন মত আমরা প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি—তখনই আমরা সজ্ঞান বা সচেতন অবস্থায় থাকি। যদি কোনো কারণে মস্তিষ্কের কাজগুলি, বিশেষ ক'রে অনুভূতির ক্ষমতা লোপ পায়—সেটাই হল অজ্ঞান অবস্থা। ভয়ের অনুভূতি সাধারণত অপ্রীতিকর হয়ে থাকে। ভয়ের অবস্থাকে সামাল দেওয়া যায় পালিয়ে, অথবা সেই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে। যখন এ-দু'টোর কোনোটাই সহজসাধ্য হয় না, তখন ভয় আরো বেড়ে যায়। এই অবস্থায় মানুষের অবচেতন প্রবৃত্তি মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে দমন ক'রে অনুভূতিগুলিকে লুপ্ত করে। এরই ফলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এ-ও একরকম ভাবে নিজেকে ঘটনার পরিমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেওয়া। যে-মানুষের সহ্য-ক্ষমতা বেশি, অতিরিক্ত ভয় পেলেও তার স্নায়ুগুলি সজাগ থাকার চেষ্টা করে।

ভয়-আতঙ্ক এড়ানোর উপায়টা কি?

ভয়-আতঙ্ক আমরা সবাই এড়াতে চাই। কিন্তু তা এড়ানোর উপায় জানি না। ভয় বা আতঙ্ক এড়াতে গেলে কি করবো?

যে ভয়ের পিছনে বিপদের আশঙ্কাটা নেহাতই অমূলক তাকে কাটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষার একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। যে-মানুষটি কুষ্ঠ রোগী দেখলে অথবা কুষ্ঠ রোগের নাম শোনা মাত্রই ভয়ে শিউরে ওঠেন, তাঁকে যদি বোঝানো যায়—কুষ্ঠ মাত্রই ছোঁয়াচে নয়, তবে তাঁর ভয় অবশ্যই খানিকটা কমতে পারে। আবার বিপদের আশঙ্কা আছে এমন কোনো ঘটনা বারবার ঘটার দরুন—অর্থাৎ খানিকটা অভ্যেসের বশে মনের মধ্যে এক ধরনের ভয় গড়ে ওঠে, নতুন অভ্যেসের মধ্যে দিয়ে সেই ভয়ের পরিস্থিতিতেই তাকে যদি অভ্যস্ত ক'রে তোলা যায়, তবে তার ভয়টাও একেবারে কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একবার হল কি, কিছু ব্রিটিশ পাইলট কিছুতেই আর আকাশে উড়তে চাইছিলেন না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল—ওঁদের প্রত্যেকেই অতীতে এক বা একাধিকবার বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ওঁদের প্রত্যেককেই এক জায়গায় বসিয়ে এরোপ্লেন এবং আকাশে ওড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবতে বলা হয়। কেউ মনে করলেন—তিনি যেন এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে আছেন, আবার কেউ বা ভাবলেন—প্লেনের যাত্রীদের যেন খেতে দেওয়া হয়েছে। এরপরে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সেই সব পাইলটদের ভয়ঙ্কর কিছু পরিস্থিতির কথা ভাবতে

বললেন—যেমন, প্লেন চালানোর সময়ে তাঁদের প্লেনের যন্ত্রপাতি যেন ঠিকমত কাজ করছে না, কিংবা প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন তাঁরা বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করতে পারছেন না। এইভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে এক সময়ে তাঁদের সত্যিকারের বিমান দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করতে বলা হয়। ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন—এই ধরনের পদ্ধতিতে মাত্র 9 ঘণ্টা থেকে 45

কুকুর বেড়াল থেকে কি ভয় কাটানো যায়?

ঘণ্টার মধ্যে পাইলটদের সকলেই আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কুকুর, বেড়াল দেখে যারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তাদেরও ধাপে ধাপে ভয়টা কাটিয়ে ফেলা যায়। প্রথমে কুকুরের ছবি দেখিয়ে তারপর ছোটখাটো নিরীহ কুকুরের কাছাকাছি আনার পরে কুকুরের ভয় খানিকটা দূর হলে বড়সড় কুকুরের সংস্পর্শে কিছুদিন রাখলেই কুকুর সম্পর্কে অনেকের অহেতুক ভয় একেবারে দূর হয়ে যায়।

কোনো কোনো শিশু বদমেজাজি হয় কেন?

রাগ হল মানুষের একটা মৌলিক আবেগ। অল্পস্বল্প রাগ আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা দেখা দিলে মানুষ রেগে গিয়ে বাধাকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে মাত্রাহীন রাগ আমাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে। রাগের পরিমাণ বেশি হলে বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। অনেক সময় তা মানুষকে ধ্বংসাত্মক পথে ঠেলে দেয়।

শিশুর আচরণে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শৈশবের একেবারে গোড়ায়। খিদের সময় খাবার না পেলে অথবা খাওয়ার সময় বিরক্ত করলে শিশুর রাগ হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগের উপলক্ষ বেড়ে চলে। হয়তো চলার সময় চেয়ারের বাধায় এগোতে পারছে না। সেক্ষেত্রে শিশুর রাগ এসে পড়ে চেয়ারের উপর। রাগ বা বিরক্তির ঘটনা বারবার ঘটলে শিশু বদমেজাজি হয়ে উঠতে পারে। রাগ হলে শিশুরা অন্যদের বিদ্রূপ করে, গালাগালি দেয়। স্কুলের শিক্ষকের উপর রাগ হলে তাঁকে পড়ানোর সময় বিরক্ত করে, বাধা দেয়। মাস্টারমশাইকে রাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এটা করা। মাস্টারমশাই রেগে গিয়ে তাকে মারধর করলে তার রাগ তো পড়েই না, উলটে আরো বেড়ে চলে। বাবা-মাকে নিয়েও এই ঘটনা ঘটতে পারে। এতে শিশুর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা জেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। বাবা-মায়েরা সচেতন হলে শিশুর মধ্যে রাগের মনোভাব বেড়ে ওঠে না। বিশেষ প্রয়োজন না হলে শিশুর কাজে বাধা না দেওয়াই উচিত। যে সমস্ত কাজ অত্যন্ত দুরূহ এবং কষ্টসাধ্য তা শিশুদের না দেওয়াই ভাল। কোনো ত্রুটির জন্য শিশুকে যদি বকাঝকার দরকার হয় তবে পাশাপাশি ভাল আচরণ অথবা কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা দেখালে তার প্রশংসাও করা উচিত। শিশুর প্রথম পাঁচ বছরের জীবনে বাড়ির পরিবেশটাই তাকে ঘিরে থাকে। বাবা-মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যারা যদি নিজেদের আচরণ সংযত রাখেন, শিশুর বদমেজাজকে প্রশ্রয় না দেন, তার অন্যায় জেদের কাছে নতি স্বীকার না করেন তবে শিশুর বিগড়োনোর কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

শিশুদের মনে বেশি কৌতূহল থাকা কি ভাল?

শিশুর মধ্যে কৌতূহলের সূচনা জন্মমুহূর্তে হলেও তার প্রকাশটা ঘটে জন্মের মাসখানেক পর। ওই সময় ঘরের মধ্যে কোনো শব্দ হলে তার উৎসের দিকে সে মাথা ঘোরায়। পারিপার্শ্বিক জগৎকে আবিষ্কারের সূচনা হয় ওই সময় এবং কৌতূহলের মধ্যেই তার প্রকাশ ঘটে। জীবনের শুরুতে শিশুর কাছে কোনো জিনিস হাজির করলে সেটা সম্পর্কে শিশু যেসব তথ্য জানতে চায় তা হল—জিনিসটাকে খাওয়া চলে কিনা, তা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় কিনা কিংবা জিনিসটা নড়াচড়া করে কিনা। এইসব তথ্য জানতে গিয়েই শুরু হয় শিশুর এক্সপেরিমেন্ট। অর্থাৎ কোনো জিনিসকে শুধু দেখা নয়, সেটা কখন কী রকম আওয়াজ করে, তা ঠেললে এগোয় কিনা, ছুঁলে আওয়াজ করে কিনা—এইসব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা শুরু হয় শিশুর মধ্যে। যেসব বাবা-মা একেবারে ছোটবেলা থেকেই শিশুকে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাধা দেন, শিশু কোনো প্রশ্ন করলে বিরক্ত বোধ করেন—অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অজান্তেই তাঁরা শিশুর কৌতূহলী মনটাকে মেরে ফেলেন। পরবর্তী

জীবনে কোনো কিছুই আর ওইসব ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করে না এবং খানিকটা সমাজবিমুখ হয়েই তারা দিন কাটায়। কথা বলতে শেখার পর যে শিশু কখনও প্রশ্ন করে না, কোনো বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে না—তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে আশপাশের লোকের মনে সন্দেহ জাগা উচিত।

পড়া মুখস্থ করার কিছুদিন পরে তা ভুলে যাই কেন?

পড়া যতই মুখস্থ করি না কেন, তা যে বরাবর মনে থাকে, তা নয়। কিছুদিন বাদে মুখস্থ পড়া আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে। কেন?

কোনো কিছুকে আমাদের স্মৃতিভাণ্ডারে ধরে রাখতে হলে সেটাকে ভাল ক'রে শিখে বা জেনে নিতে হয়। শেখাটা যদি ঠিকমত হয় তবে তা মনেও থাকে বেশি। এই কারণেই পড়া মুখস্থ করার আগে সেটা ঠিকমত বুঝে নেওয়া দরকার। আবার শুধু বুঝলেই হবে না, সেই সঙ্গে শেখা জিনিসটা স্মৃতিভাণ্ডারে ধরে রাখার ইচ্ছেটাও থাকা চাই। যেমন, পরীক্ষার আগে অনেকে গোটা বইটা পড়লেও, বাছাই করা কয়েকটা প্রশ্নের উপর বেশি জোর দেয়। পরীক্ষার সময়ে ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর তারা যতটা ভাল দেয়—অন্য প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও ঠিকঠিক তা মনে করতে পারে না। এর কারণ, পড়ার সময় তারা ধরেই নেয়—বাছাই প্রশ্নগুলির বাইরে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে না। ফলে বাছাইয়ের বাইরের উত্তর মুখস্থ করলেও তার মধ্যে আগ্রহের অভাব থাকে বলেই মন থেকে তা হারিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি ফিকে হয়ে আসে, শেখা জিনিস আমরা ভুলতে থাকি; অদর্শনের ফলে পরিচিত মানুষের মুখ মনে করতে পারি না।

আসলে সব সময়েই আমরা কিছু শিখছি বা জানছি বা নতুন লোকের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। নতুন কিছু শেখা বা

পরীক্ষায় যে-প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা সেটা আগের রাতে পড়তে হয় কেন?

জানার অভিজ্ঞতা সবই এসে জমা হচ্ছে স্মৃতিভাণ্ডারে; নতুন স্মৃতি চাপা দিচ্ছে পুরনো স্মৃতিকে। পরীক্ষায় আসবেই এমন কোনো কিছু মনে রাখতে হলে পরীক্ষার আগের রাত্রে সেটা পড়তে হয়; কারণ ঘুমনোর সময়ে আমাদের নতুন কিছু শেখা বা জানা হয় না বলে ঘুম থেকে ওঠার পরেও তাই আগের রাতে মুখস্থ করা পড়াটা স্মৃতিভাণ্ডারে অটুট থাকে।

কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা মনে দাগ কেটে বসে যায় কেন?

সব ঘটনা নয়, কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা মনে থেকে যায়। এর কারণ কী?

কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা মনে রাখা বা ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে, সে অভিজ্ঞতার স্বরূপটি অনেকাংশে দায়ী। আমরা সাধারণত অপ্রয়োজনীয় এবং দুঃখের ঘটনাগুলি তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, সারা জীবনের সুখের স্মৃতিগুলিই আমাদের মনের মণিকোঠায় ভিড় ক'রে থাকে। ছোটবেলায় কখনও কোনো পুরস্কার পেলে তা আমরা বহু বছর পরেও দিব্যি মনে করতে পারি, অথচ সকালবেলায় রাস্তায় কেউ অপমান অথবা খারাপ ব্যবহার করলে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকেলেই তা বেমালুম ভুলে বসি। আসলে আমরা নিজেরাই ভুলতে চাই বলে দুঃখ, লজ্জা বা অপমানের ঘটনা আমাদের মন থেকে চট ক'রে মুছে যায়।

কখন স্মৃতি লোপ পায়?

মাঝে মাঝে খবর শুনি, কোনো দুর্ঘটনায় কারো স্মৃতি কখনও কখনও লোপ পেয়েছে। স্মৃতি লোপ পায় কখন?

মাথায় আঘাত লেগে শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচল এবং মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হলে অনেক সময়ে স্মৃতিভ্রংশ হয়। এ-জাতীয় অবস্থার পরে সদ্য জানা জিনিসগুলো মানুষ সাময়িকভাবে ভুলে যায়। এর কারণ, কোনো দুর্ঘটনার ফলে মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডার নাড়াচাড়া খেলে দেখা যায়, ভাঁড়ারের নীচে চাপা পড়ে থাকা পুরনো স্মৃতি আবার উপরে উঠে এসে নতুন হালফিল স্মৃতিকে চাপা দিয়ে দেয়। ফলে মাথায় আঘাত পাওয়া মানুষ সদ্য

জানা জিনিসগুলি বেমালুম ভুলে গেলেও বহু পুরনো সব ঘটনা দিব্যি মনে করতে পারে। কোনো কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলেও এই রকমটা ঘটতে পারে। স্মৃতি লোপ পাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত মানুষটি ধীরে ধীরে আবার হারানো স্মৃতিগুলিকে ফিরে পায়।

দুর্ঘটনার সময়ে মাথায় আঘাত পেলে আমাদের সাম্প্রতিক স্মৃতি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে-সম্পর্কে

সদ্য পরিচিত মানুষকে অনেক সময়ে মনে পড়ে না কেন?

শারীরবিজ্ঞানীরা গবেষণা ক'রে দেখেছেন, মাথায় চোট পেয়ে কেউ হয়তো হাসপাতালে ভর্তি হল, কিছুদিন চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে অনেক সময় সে আঘাত পাওয়ার ঘটনা কিংবা হাসপাতালে থাকার ঘটনা বেমালুম ভুলে যায়! শারীরবিজ্ঞানীদের ধারণা—হালফিলের স্মৃতিকে ধরে রাখার ব্যাপারে মস্তিষ্কের 'হিপোক্যাম্পাস' অংশের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জন্তু-জানোয়ার তো বটেই, মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে—'হিপোক্যাম্পাস'কে বৈদ্যুতিক শক নিয়ে উত্তেজিত করলে নতুন শেখা জিনিসগুলি কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। কোনো বিশেষ কারণে মস্তিষ্কের 'হিপোক্যাম্পাস' অংশটিকে অস্ত্রোপচার ক'রে বাদ দেওয়া হয়েছে—এমন রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়—সুস্থ হয়ে ওঠার পরে কোনো কিছু দেখা বা শোনার ব্যাপারে তার ইন্দ্রিয়গুলি আর পাঁচজনের মত সজাগ থাকলেও সদ্য দেখা বা শোনা কোনো কিছুই সে মনে রাখতে পারে না। বহুদিন আগে শেখা কোনো কবিতা বা গল্পের লাইনগুলি গড়গড় ক'রে মুখস্থ বলে গেলেও সদ্য পরিচিত মানুষের নাম বা ঠিকানা আলাপের পরের মুহূর্তেই সে ভুলে বসে।

'মনে রাখা'র কি বিশেষ কোনো কায়দা আছে?

কি ভাবে মনে রাখা যায়? এর জন্যে কি বিশেষ কোনো কৌশলের উপরে নির্ভর করতে হয়?

স্মৃতিশক্তির সঙ্গে বুদ্ধির একটা সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যার বুদ্ধি বেশি, তার যেমন কোনো কিছু শেখার ক্ষমতা বেশি, তেমনি শেখা জিনিস সে মনের মধ্যে ধরেও রাখতে পারে বেশি। তবে শেখার ব্যাপারে এমন কিছু কায়দা আছে যার সাহায্যে, বুদ্ধি খুব প্রখর না হলেও শেখা জিনিসকে বেশি দিন স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় এবং সময়মত সেগুলি মনে করতেও কোনো অসুবিধে হয় না। ইতিহাস মুখস্থ করার সময়ে যারা ঘটনাগুলিকে ভাল করে বুঝে নিয়ে তারপর মুখস্থ করে তাদের পড়াটা মনে থাকে বেশি। একই ভাবে অঙ্কের ফরমুলা মুখস্থ করার আগে কি ক'রে সেটার সৃষ্টি হল যদি তা বুঝে নেওয়া যায় তবে চট ক'রে সে ফরমুলা মন থেকে হারিয়ে যায় না। আবার মুখস্থ করা জিনিস মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিতে হয়, যাতে নতুন শেখা বিষয়গুলির নীচে চাপা পড়ে তা একেবারে হারিয়ে না যায়। অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কবিতা বা ছড়া মুখস্থ করাটা অনেক সোজা, কারণ ছড়া বা কবিতার বিশেষ ছন্দ তাকে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে খুঁজে বের ক'রে নিতে বাড়তি সাহায্য করে। আবার একই ধরনের বিষয় পরপর পড়ে গেলে সবগুলো মনে রাখা বেশ কঠিন। বাংলা সাহিত্যের পর ইতিহাস পড়লে বাংলা সাহিত্যের পড়াটা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেশি তেমনি বাংলা সাহিত্যের কথাগুলো মনের মধ্যে থাকে বলে ইতিহাসটা মুখস্থ করতে অনেক বেশি সময় লেগে যায়। একই ঘটনা ঘটে অঙ্কের পর বাংলা

কী ক'রে মুখস্থ করবো?

বা ইংরেজি ব্যাকরণ পড়ার সময়ে; দু'টিই যুক্তি এবং নিয়ম-নির্ভর বিষয় বলে একটা মনে রাখতে গিয়ে অন্যটা মন থেকে হারিয়ে যায়। এ-ক্ষেত্রে যদি অঙ্কের পর ইতিহাস কিংবা সাহিত্য পড়া যায় তবে দু'টোই বেশিক্ষণ স্মৃতিভাণ্ডারে ধরে রাখা সম্ভব।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমত, যে-তথ্যটা স্মৃতিতে ধ'রে রাখতে হবে সেটা কেমনভাবে শিখছি বা মুখস্থ করছি, সেটাকে স্মৃতিভাণ্ডারে চালান করার পরে তা অটুট থাকছে কিনা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তা স্মৃতিভাণ্ডার থেকে খুঁজে বের করতে পারছি কিনা। শেখা বিষয়কে মনের মণিকোঠায় ধরে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কিছুই করণীয় নেই; যেহেতু

প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু না কিছু শিখছি এবং স্মৃতিভাণ্ডারে চালান করছি, পুরনো স্মৃতি খানিকটা আবছা হতে বাধ্য। কিন্তু বাকি দু'টো ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কোনো কিছু শেখা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে তুলে আনার ব্যাপারে কিছু কিছু পদ্ধতি বেশ লাগসই। কোনো কিছু মুখস্থ করার সময় তার ভাবার্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে মুখস্থ করলে তাকে স্মৃতির কোঠায় ধরে রাখাটা সহজতর হয়। তেমনি বিষয়টি যদি পরপর এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় যে প্রথম অংশটা মনে করতে পারলে তার থেকে দ্বিতীয় অংশ মনে করা যাবে, তারপরে দ্বিতীয় অংশ থেকে তৃতীয় অংশ —এইভাবে গোটা বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়বে। মনোবিজ্ঞানীদের পরিভাষায় এর নাম 'অ্যাসোসিয়েশন পদ্ধতি'। যেমন কারোর কোনো নম্বর মনে করার সময়ে আমরা দেখি—প্রথম একটা বা দু'টো সংখ্যা মনে করলেই বাকিগুলো কেমন টপটপ মনে পড়ে যায়। ধরা যাক, কারো ফোন নম্বর 41 2072; প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রথম দু'টো সংখ্যা (টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কোড সংখ্যা) মনে না এলে দেখা যাবে, কিছুতেই আর বাকি সংখ্যাগুলো মনে আসছে না।

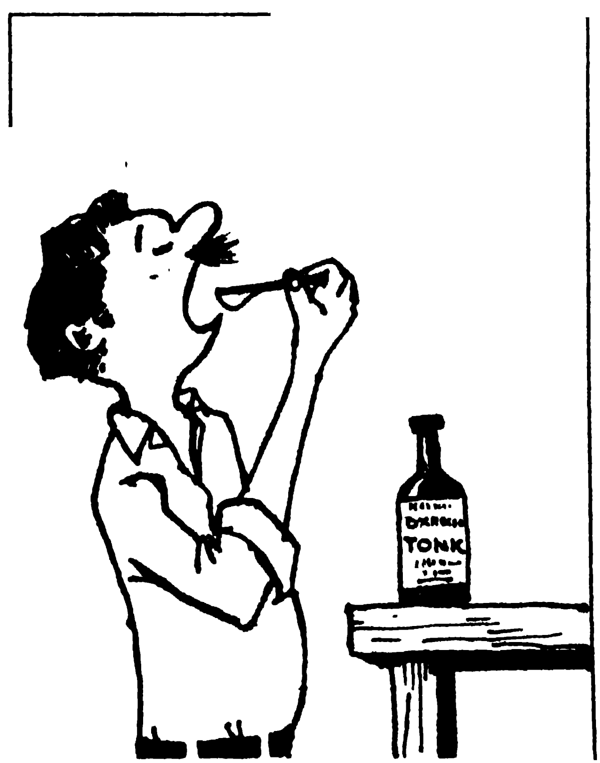
বাজার থেকে এক সঙ্গে অনেক রকম জিনিস আনতে গিয়ে সেগুলি ঠিকঠিক মনে করার ব্যাপারেও এই অ্যাসোসিয়েশন পদ্ধতি কাজে লাগানো যায়। যেমন, হয়তো আনতে হবে মাছ, তরি-তরকারি, গুঁড়ো হলুদ, সাবান আর কয়লা। বাজারে গিয়ে এগুলি ঠিকমত যদি মনে না আসে তবে রান্না ঘরটাকে কল্পনা করা যেতে পারে। রান্নার কথায় তরি-তরকারি আর মাছের কথা মনে এল; রান্নাঘরের দেওয়ালের রঙ যদি হলুদ হয়, তবে গুঁড়ো হলুদ আনার কথাটাও মনে পড়বে; রান্নাঘরের উনুন থেকে কয়লার কথাটা আর কয়লা থেকে দেওয়াল নোংরা হলে তা পরিষ্কারের জন্য সাবান আনার কথাটাও মনে না আসার কোনো কারণ নেই।

অনেক সময়ে মুখস্থ করা কবিতা বা অন্য কিছুকে দৃশ্য আকারে সাজিয়ে নিয়ে মুখস্থ করলে এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সেই দৃশ্যটিকে মনে করার চেষ্টা করলে তা সহজে মনে পড়ে। এ-প্রসঙ্গে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী জনৈক রুশ সাংবাদিকের কথা শোনা যায়। তাঁর যা কিছু মুখস্থ করার দরকার হত, তা সে কোনো সংখ্যা কিংবা বিখ্যাত কারোর উক্তি—তিনি তা বিড়বিড় ক'রে মুখস্থ করার সময়ে চোখ বুজে ভাবতেন—যেন কাগজের উপর নিজের হাতের লেখায় তা দেখতে পাচ্ছেন। আবার যখন তা স্মৃতিভাণ্ডার থেকে তুলে আনার দরকার হত—তিনি তা লিখিত আকারেই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতেন এবং তা অনায়াসে পারতেনও।

টনিকের সাহায্যে কি স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায়?

আমরা অনেকে শুনে এসেছি, টনিক খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। কিন্তু সত্যিই কি টনিকের সাহায্যে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো সম্ভব?

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর মত ওষুধ এখনও পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। 'স্মৃতিবর্ধক' বলে বাজারে যে-সব ওষুধ চালু রয়েছে তাদের মধ্যে আসলে 'অ্যামফিটামিন' জাতীয় ওষুধ মেশানো থাকে। এদের কাজ হল আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করা। এর ফলে শরীরের অবসাদ কেটে যায়, রাত জেগে পড়াশুনো চালাতে আর কষ্ট হয় না। চা-কফির মধ্যে যে-'ক্যাফিন' থাকে তারও ঘুম তাড়ানোর এই



গুণটা রয়েছে। 'অ্যামফিটামিন' জাতীয় ওষুধ খেলে পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়াশুনোর কাজটা চালানো

ব্রাহ্মীশাক কি স্মৃতিশক্তি বাড়ায়?

সহজ হলেও শেষ পর্যন্ত তা শরীরের ক্ষতিই ক'রে থাকে। এগুলি দীর্ঘদিন ধরে খেয়ে গেলে রক্তচাপ বাড়ে, ঘনঘন মাথার যন্ত্রণা হয়, পেটের গণ্ডগোল এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। তার চেয়েও বড় কথা—এই ধরনের ওষুধ বরাবর খেয়ে গেলে মারাত্মক নেশা ধরে যায়, যা কাটিয়ে ওঠা রীতিমতো কঠিন। ব্রাহ্মীশাক খেলে বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ে বলে যে ধারণাটা প্রচলিত রয়েছে তা-ও বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত নয়।

বুদ্ধি বলতে কি বোঝায়?

কোনো চালাক চতুর ছেলেকে দেখে আমরা অনেক সময়ে বলি, ছেলেটার কি বুদ্ধি! কিন্তু বুদ্ধি কাকে বলে? বুদ্ধি বলতে ঠিক কি বুঝি আমরা?

'বুদ্ধি'র বহু সংজ্ঞা রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন—বুদ্ধি হল মানুষের মনের একটা বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে নতুন অজানা পরিস্থিতিতে কি করণীয় মানুষ তা ঠিক করে। যেমন অচেনা পথে চলতে চলতে কারোর যদি হঠাৎ পা মচকায়—সে রাস্তার পাশে কোনো বাড়িতে গিয়ে সাহায্য চাইবে, নাকি মচকে যাওয়া পা নিয়ে এগিয়ে চলবে অথবা রাস্তার উপরে বসে পড়বে—তা নির্ভর করবে তার 'বুদ্ধির' উপরে। তার 'বুদ্ধি'ই ঠিক করবে—কি ভাবে ওই বিশেষ পরিস্থিতিতে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

অনেকের মতে, বুদ্ধি হল শিক্ষালাভের ক্ষমতা। আবার কেউ কেউ বলেন—অভিজ্ঞতাকে ঠিক ঠিক কাজে লাগানোর ক্ষমতারই অন্য নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির সংজ্ঞা নিয়ে মতের অমিল থাকলেও বুদ্ধি যে মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য তাতে কোনো দ্বিমত নেই। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাবা-মা'র সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির দিক থেকে যথেষ্ট মিল থাকে। যমজ ভাই-বোনদের বুদ্ধির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি মোটামুটি একই রকমের হয়। তবে বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশেরও একটা ভূমিকা থাকে। যদি কোনো বুদ্ধিমান ছেলে এমন পরিবেশে মানুষ হয় যেখানে আশপাশের লোকজন বুদ্ধিতে বেশ খাটো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো যেখানে তেমন ঢোকে না—তাহলে সে ছেলের বুদ্ধিও কেমন ভোঁতা হয়ে যায়। এটা অনেকটা অব্যবহারের ফলে লোহায় মরচে ধরার মত ব্যাপার।

বুদ্ধি'র বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায়—26 বছর বয়স অবধি মানুষের বুদ্ধি ক্রমশ বেড়ে চললেও, পনেরো-ষোলো বছর বয়সের পর বুদ্ধি বাড়ার হার খুবই সামান্য। আবার পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোনো শিশুর সাত বছর বয়সে যে পরিমাণ বুদ্ধি থাকে তা থেকে সঠিকভাবে বলে দেওয়া যায় যে বড় হলে তার বুদ্ধিটা কেমন হবে। মোটামুটি সাত বছর বয়সেই আমাদের সারাজীবনের বুদ্ধির নকশা তৈরি হয়ে যায়।

সাম্প্রতিক কালের গবেষণা প্রমাণ করেছে—26 থেকে 36 বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধি মোটামুটি একই রকম থাকলেও তারপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও একটু একটু

কত বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধি বাড়ে?

ক'রে কমতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করার ক্ষমতা কমে এই কারণেই। 'বুদ্ধি কমা'র এই ব্যাপারটা অবশ্য এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম। যে সব মানুষের স্বাস্থ্য ভাল অথবা যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় যুক্ত থাকেন তাঁদের 70 বছর বয়সেও বুদ্ধির বিশেষ হেরফের হয় না। অন্যদিকে মাঝবয়সী কোনো মানুষের বিশেষ ধরনের হৃদ্‌রোগ হলে কিংবা কোনো কারণে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল হঠাৎ কমে এলে—তাঁর বুদ্ধি অবিশ্বাস্য ভাবে হ্রাস পেতে পারে।

আই-কিউ কি?

আজকাল আই-কিউ (I.Q.) কথাটা খুব চালু হয়েছে। এটি হল ইনটেলিজেন্স কোশেন্ট (Intelligence Quotient) কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। বাংলায় একে বলে 'বুদ্ধ্যঙ্ক' অর্থাৎ বুদ্ধির পরিমাপ।

কিন্তু আই-কিউ কাকে বলে? বুদ্ধ্যঙ্কের গাণিতিক সংজ্ঞা হল ঃ

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক (আই-কিউ)} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{স্বাভাবিক বয়স}} \times 100$$

সাধারণত 12 বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যে-সব সমস্যার সমাধান ক'রে থাকে, একজন 10 বছর বয়সের ছেলে যদি তা করতে সক্ষম হয় তবে ছেলেটির স্বাভাবিক বয়স 10 হলেও তার মানসিক বয়স ধরা হবে 12, সুতরাং তার আই-কিউ হবে 12/10×100 বা 120। দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে— সাধারণ মানুষের শতকরা 46 জনের আই-কিউ 90 থেকে 110-এর মধ্যে। শতকরা 3 জনের আই-কিউ 130 বা তার বেশি; ঠিক তেমনই আবার সাধারণ মানুষের শতকরা 3 জনের আই-কিউ 70 বা তারও কম।

এই শতাব্দীতে বুদ্ধি মাপার জন্য যে অসংখ্য টেস্ট (Test) বা অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে মূলত নানা ধরনের অঙ্ক এবং ধাঁধা দেওয়া থাকে। কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতগুলি সমস্যার নির্ভুল সমাধান বের করতে পারছে তার উপরে নির্ভর ক'রে তার মানসিক বয়স এবং বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই সব আই-কিউ টেস্টগুলির সাহায্যে একজন একজন ক'রে বুদ্ধি মাপা হলেও বুদ্ধির এমনও অভীক্ষা আছে যা দিয়ে একসঙ্গে 50,100 বা 500 জনের 'বুদ্ধ্যঙ্ক' একবারেই মেপে বের করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এ জাতীয় টেস্টের সাহায্যে সৈন্যদলে যোগদানেচ্ছু সাড়ে সতেরো লক্ষ লোকের বুদ্ধি মাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় এক কোটি।

বেশির ভাগ মানুষের আই-কিউ কি রকম?

বুদ্ধি মাপা হয় কী ভাবে?

বুদ্ধি বেশি বা কম—এইভাবে আমরা সাধারণ মানুষ বুদ্ধির হিসেব করি। কিন্তু সঠিক বুদ্ধি মাপা হয় কী ভাবে?

কোনো মানুষের বুদ্ধি মাপতে হলে তার মানসিক বয়সটা নির্ণয় করতে হয়। এ-ব্যাপারে প্রথম সফল হন ফরাসি মনোবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড বিনে। 'ইনটেলিজেন্স টেস্ট' বা 'বুদ্ধির অভীক্ষা' তৈরি করতে গিয়ে বিনে প্রথমেই ঠিক করেছিলেন, এমন কতকগুলি প্রশ্ন রাখতে হবে যার সাহায্যে মানুষের যুক্তিবোধ এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা যাচাই করা যায়। বুদ্ধি পরিমাপ করার স্কেল বা অভীক্ষা প্রথম তৈরি হয় 1905 সালে—পরে তা সংশোধিত হয় 1908 ও 1911 সালে। এ-কাজে বিনের সঙ্গী ছিলেন থিয়োডর সিঁমো নামে আর একজন মনোবিজ্ঞানী। বুদ্ধির এই অভীক্ষাটির নাম তাই 'বিনে-সিঁমো স্কেল'।

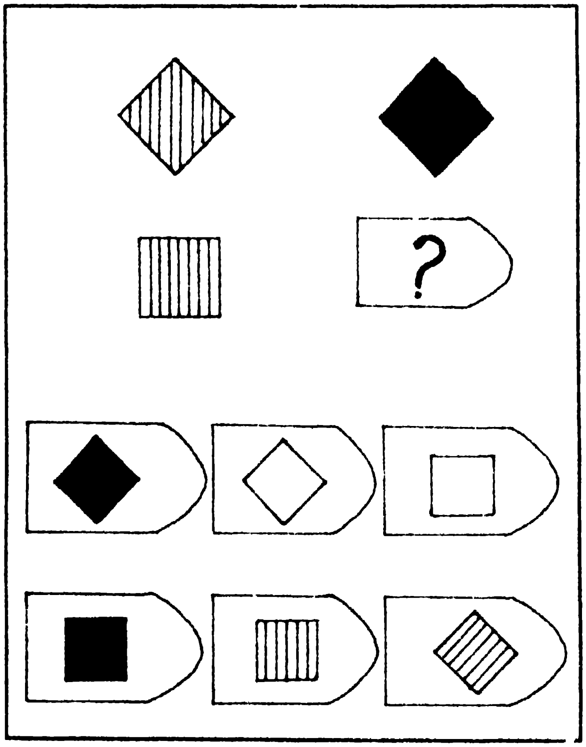
তিন-চার বছরের শিশুদের বুদ্ধি মাপার জন্যে কি রকম প্রশ্ন করা উচিত?

বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরি করার জন্য অ্যালফ্রেড বিনে তিন থেকে পনেরো এবং তারও বেশি বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের বয়স অনুযায়ী আলাদা আলাদা দলে ভাগ করেন। বিনের বেছে নেওয়া এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের সকলেই ছিল তাদের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার মতে 'একেবারে সাধারণ', অর্থাৎ এরা পরীক্ষায় ফেল করতো না, আবার এদের ফল ভালও হত না। দীর্ঘদিন ধরে এই সব ছেলেমেয়েদের জ্ঞান-বুদ্ধি যাচাই ক'রে বিনে প্রত্যেক বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এমন কতকগুলি প্রশ্ন বেছে নেন যার উত্তর ঠিক ওই বয়সের সাধারণ ছাত্রছাত্রী সঠিকভাবে দিতে পারে। যেমন একজন তিন বছরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন হল, তাকে তার নিজের পদবী বলতে বলা. তেমনি চার বছরের শিশুকে—কাগজে দু'টো সরলরেখা টেনে তার মধ্যে কোনটা বড় আর কোনটা ছোট—তা জিজ্ঞাসা করা। যদি দেখা যায়, চার বছর বয়সের একজন শিশু তার নিজের পদবী জানলেও, দু'টো সরলরেখার মধ্যে ছোট-বড়র তারতম্য করতে পারে না—সেই শিশুর স্বাভাবিক বয়স চার হলেও তার মানসিক বয়সকে তিন ধরা হবে। অর্থাৎ শিশুটির বুদ্ধি সাধারণের তুলনায় কম। আবার তিন বছর বয়সের একটি শিশু যদি চার বছর বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়, অর্থাৎ নিজের পদবী বলা ছাড়াও সে দু'টো সরলরেখার মধ্যে কোনটা ছোট আর কোনটা বড় তা দেখিয়ে দিতে পারে তবে তার স্বাভাবিক বয়স তিন হলেও মানসিক বয়সকে চার ধরা হবে। সে ক্ষেত্রে শিশুটির

বুদ্ধি সাধারণের তুলনায় বেশি।

আলফ্রেড বিনে এবং তার সহকারী তিন বছরের শিশু থেকে শুরু ক'রে পনেরো বছরের কিশোর-কিশোরী—প্রত্যেক বয়সের উপযোগী ক'রে আলাদা আলাদা প্রশ্নমালা তৈরি করেন। পনেরো বছরের চেয়ে বেশি বয়স যাদের, তাদের সকলের জন্যে তৈরি হল একটাই প্রশ্নমালা। আসলে তখন ধারণাটা ছিল—পনের বছর বয়সের পরে বুদ্ধির আর তেমন হেরফের হয় না। ধারণটায় যে বিশেষ ভুল ছিল তা অবশ্য নয়।

আলফ্রেড বিনে মারা যাবার পর 'বিনে-সিঁমো স্কেল' সংশোধিত হয় 1916 সালে; পরে 1937 সালে তা আবার



সংশোধিত হয় এবং তার প্রশ্নসংখ্যাও অনেক বাড়ে। যে দু'জন মার্কিন মনোবিজ্ঞানী এই কাজটা করেছিলেন তাঁদের নামে এর নাম দেওয়া হয় 'টারমান-মেরিল স্কেল'। এই অভীক্ষাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও বয়স্ক মানুষের বুদ্ধ্যঙ্ক বা আই-কিউ বের করার ব্যাপারে তেমন কার্যকরী হয়নি। তা ছাড়া দেখা গেল, যে-শিশু বেশি পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে সে-ই এই অভীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে। এইজন্যে ভাষাবর্জিত বেশ কিছু টেস্ট তৈরির চেষ্টা চলছিল যাতে মূলত ছবির মধ্যে দিয়ে নানা ধরনের ধাঁধা সমাধানের ব্যবস্থা রাখা যায়। ইতিমধ্যে 1933-এর দশকের শেষ দিকে এক দল বিশেষজ্ঞ নিউ ইয়র্কের বেলেভ্যু হাসপাতালের ডাঃ ডেভিড ওয়েসলারের নেতৃত্বে বয়স্ক মানুষদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য এক নতুন অভীক্ষা তৈরি করেন। এর নাম 'ওয়েসলার অ্যাডাল্ট ইনটেলিজেন্স স্কেল' বা সংক্ষেপে 'WAIS'। যাদের বয়স 16 বছরের বেশি তাদের বুদ্ধি মাপার ক্ষেত্রে এটা আজও রীতিমতো কার্যকরী।

বুদ্ধি কম থাকার কারণ কি?

স্বল্পবুদ্ধির কোনো বাচ্চা কখনও কখনও আমাদের নজরে আসে। এর কি কোনো কারণ আছে?

বুদ্ধির মাপকাঠিতে যারা শেষের সারিতে থাকে এমন সব বাচ্চাদের বলা হয় 'মঙ্গোল বাচ্চা'। এদের চোখ দু'টি ছোট ছোট, চোখের পাতা পুরু, মাথার পিছন এবং মুখের গড়ন চ্যাপ্টা; প্রায় সব সময়েই এরা চোখ পিটপিট করে। এদের যাবতীয় উপসর্গের জন্য জিন এবং ক্রোমোজোম সংক্রান্ত গণ্ডগোলকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। এই সব গণ্ডগোলের ফলে এদের শরীরের মধ্যেকার পরিপাক ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়—ফলে এদের মস্তিষ্কের গঠন সম্পূর্ণ হয় না। স্বাভাবিক মানুষের প্রতিটি কোষের মধ্যে যেখানে 23 জোড়া অর্থাৎ 46টি ক্রোমোজোম থাকে—সেখানে মঙ্গোল বাচ্চাদের থাকে 47টি ক্রোমোজোম।

জন্মানোর সময়ে শিশু মাথায় আঘাত পেলে তার থেকেও মানসিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। আবার মাতৃজঠরে থাকার সময়ে অথবা জন্মানোর অব্যবহিত পরেই রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে শিশুটির মানসিক প্রতিবন্ধীতে রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উদাহরণ হিসেবে জার্মান মিজলস বা এনকেফেলাইটিসের কথাই বলা যায়। এ ছাড়া ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিক পদার্থ গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের শরীরে ঢুকলে তা গর্ভস্থ শিশুর বুদ্ধির বিকাশে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এই সব রাসায়নিকের মধ্যে

নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা কেন বেশি স্বল্পবুদ্ধি-যুক্ত হয়?

রয়েছে কার্বন মনো-অক্সাইড এবং সিসের নানা ধরনের যৌগ। এগুলি আবার শহরের দূষিত বাতাসে যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে থাকে। মানসিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পরমাণু বিকিরণকেও অনেকে দায়ী ক'রে থাকেন।

মানসিক প্রতিবন্ধকতার পিছনে মানসিক এবং সামাজিক কারণও কিছু কিছু থাকে। যেমন দেখা গেছে, উচ্চবিত্ত লোকেদের ছেলেমেয়েদের যেখানে শতকরা মাত্র 1 থেকে 2 জন মানসিক প্রতিবন্ধী—সেখানে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা শতকরা 20 জন বা তারও বেশি। শুধুমাত্র পুষ্টির হেরফেরেই যে এমনটা ঘটে তা নয়। নিম্নবিত্ত পরিবারে বাচ্চা হওয়ার সময়ে মায়েদের দিকে কম নজর দেওয়া হয় এবং তার ফলে জন্মানোর সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত লাগার ঘটনাও বেশি ঘটে বলে এই সব শিশু স্বল্পবুদ্ধির শিকার হয়।

আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত কম, এমন পরিবারের শিশুরা সাধারণত বাড়িতে পড়াশুনোর আবহাওয়া পায় না। অনেক সময়েই এরা বই, খবরের কাগজ বা রেডিওর সঙ্গে প্রায় অপরিচিত থেকেই বড় হয়ে ওঠে। সমীক্ষায় দেখা গেছে—শহরের বস্তি অঞ্চলের মানুষের কথাবার্তা অপ্রচলিত, অর্থহীন শব্দের মধ্যে অনেক সময়ে বাঁধা পড়ে থাকে; ফলে এই পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুরাও ভাব আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গেও এদের যোগাযোগ ঘটে কম। এইসব কারণেই আর্থিক সঙ্গতিহীন পরিবারের শিশুদের কেউ কেউ মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়।

বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে কি আই-কিউ নির্ভুলভাবে বের করা যায়?

আমরা বুদ্ধির পরিমাপ করি আই-কিউয়ের সাহায্যে। কিন্তু আই-কিউ কি নির্ভুলভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারে?

মানুষের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য যে সব ইনটেলিজেন্স টেস্ট চালু রয়েছে সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা আছে। প্রথমত, কেউ যদি নিজের আই-কিউ জানার ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী না হয়, তবে সে দায়সারাভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। এতে তার সঠিক বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ে অসুবিধে দেখা দিতে পারে। তেমনি যদি কেউ আগে ওই টেস্টের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার উত্তর দেওয়ার সময়ে সে কম সময় নেবে এবং ভুল উত্তরও সংখ্যায় কম হবে। ফলে ওই অভীক্ষা বা টেস্ট প্রয়োগ ক'রে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার যে আই-কিউ বেরোবে তাও তার বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ হবে না। এইচ জে আইশেঙ্ক-এর তৈরি অভীক্ষাটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রথমবার প্রয়োগের পর যে মানুষটির আই-কিউ বেরিয়েছে 110, দ্বিতীয়বার প্রয়োগের পর তা হয়েছে 116 এবং তৃতীয়বারে 120।

এ-ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপযোগী কোনো বুদ্ধির অভীক্ষা এখনও পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি। অভীক্ষায় যে সব প্রশ্নগুলি থাকে তার কম-বেশি সব ক'টিই বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। যে-অভীক্ষাটি মার্কিন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ভাল খাটে, ভারতীয় ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক বের করার ক্ষেত্রে তা শতকরা একশো ভাগ সফল নাও হতে পারে। ধরা যাক, বিদেশী কোনো বুদ্ধির প্রশ্নে একটি বাচ্চার কাছে জানতে চাওয়া হল ঃ চার্চ আর স্কুলের মধ্যে মিলটা কোথায়? এ ক্ষেত্রে সে বলবে, 'চার্চ এবং স্কুল—দু'জায়গাতেই ঘণ্টা বাজে'—তাকে হয়তো পুরো নম্বর দেওয়া হবে। এখন এই প্রশ্নটা যদি ভারতীয় কোনো শিশুর কাছে রাখা হয় এবং যদি এমন হয় যে, সে কখনও চার্চ দেখেনি, তবে তার পক্ষে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আবার ভারতীয় ছেলেমেয়েদের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে যদি প্রশ্নটায় সামান্য রদবদল ঘটিয়ে 'চার্চ'-কে 'মন্দির' করা হয়—তবে সে-ক্ষেত্রেও ভারতীয় মুসলমানদের আই-কিউ নির্ণয়ের ব্যাপারে তা কতটা কার্যকরী হবে বলা মুশকিল। এ-জন্যেই বুদ্ধি পরিমাপের ব্যাপারে ভাববর্জিত অভীক্ষাগুলি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। আবার প্রশ্নের মধ্যে অনেকরকম বৈচিত্র্য আনতে হলে ভাষার সাহায্য না নিয়েও উপায় থাকে না। এইসব কারণেই বুদ্ধ্যঙ্ককে বিশেষ কোনো সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ না ক'রে—তা সাধারণের তুলনায় কতটা বেশি বা কম তা প্রকাশের উপরই এখন জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

চার্চ এবং স্কুলের মধ্যে মিল কোথায়?

'জড়বুদ্ধি' বলতে কাদের বোঝায়?

বুদ্ধির খানিকটা ঘাটতি দেখলেই আমরা সহজেই জড়বুদ্ধি কথাটা ব্যবহার ক'রে থাকি। কিন্তু সত্যিকারের জড়বুদ্ধি কাদের বলে?

'জড়বুদ্ধি'-র ব্যাকরণগত অর্থ—যাদের বুদ্ধি জড়বৎ। কোনো মানুষেরই বুদ্ধির ভাঁড়ার বেবাক ফাঁকা হতে পারে না। সুতরাং কারো ক্ষেত্রেই এই আপত্তিকর শব্দটা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। চলতি কথায় আমরা যাদের জড়বুদ্ধি বলি, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ মানুষের তুলনায় কম, ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় এরা অক্ষম। এরা হল এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী—যাদের 'স্বল্পবুদ্ধি'-ও বলা চলে। জন্মের সময়ে

স্কুলে যেতে পারে এমন ছেলেমেয়েদের কতজন জড়বুদ্ধি?

বা জন্মের ব'ছর দু' তিন পরেও আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশু থেকে এদের আলাদা করা মুশকিল। তবে যতই এদের বয়স বাড়ে, ততই এদের বুদ্ধির ঘাটতিটা বেশি ক'রে ধরা পড়ে।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধির তারতম্য বোঝানো হয় 'বর্ডার লাইন', 'মাইল্ড', 'মডারেট' এবং 'সিভিয়ার'—এই চার ধরনের শ্রেণীর সাহায্যে। বুদ্ধ্যঙ্কের তারতম্য অনুযায়ী মানসিক প্রতিবন্ধীদের এর যে কোনো একটি বিভাগে ফেলা হয়। সাধারণ বাচ্চাদের আই-কিউ যেখানে 90 থেকে 110, সেখানে যাদের আই-কিউ 70 থেকে 90-এর মধ্যে তারা থাকে বর্ডার লাইনে। হাব-ভাব, আচার-আচরণ দেখে এদের অনেককেই স্বাভাবিক বাচ্চাদের থেকে আলাদা করা মুশকিল। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়াশোনা করলেও এরা পরীক্ষার ফলাফলে সবার তুলনায় পিছিয়ে থাকে এবং স্কুলের উঁচু ক্লাস অবধি আর পৌঁছতে পারে না। এদের পরের দলটার আই-কিউ 50 থেকে 70-এর মধ্যে থাকে। এই ধরনের একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুদ্ধির বহর অনেকটা 8 থেকে 11 বছরের বাচ্চার সমান। আই-কিউ যাদের 36 থেকে 50-এর মধ্যে তাদের মানসিক বয়স 4 থেকে 5 বছরের বেশি আর বাড়ে না। এদের চেহারার মধ্যে সবসময়ে একটা জড়সড়, জবুথবু ভাব লক্ষ্য করা যায়। আর 35-এর চেয়েও আই-কিউ যাদের কম—স্কুলে পাঠানোর আগেই তাদের বুদ্ধির অভাবটা ধরা পড়ে যায়। অবশ্য এদের সংখ্যা কম; সমস্ত মানসিক প্রতিবন্ধীর শতকরা দশ ভাগের বেশি নয়। মোটামুটি এক হিসেবে ভারতে স্কুলে যাওয়ার মত বয়স হয়েছে এমন শিশুদের শতকরা দশজন মানসিক প্রতিবন্ধী; তবে এদের বৃহত্তর অংশটাই বর্ডার লাইনে এবং সে-দিক থেকে স্বাভাবিকতার নাগালের মধ্যে রয়েছে—এই যা ভরসা।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের কি স্বাভাবিক ক'রে তোলা যায়?

অনেকের ধারণা—চিকিৎসা করলে স্বল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এ-ধারণা কি ঠিক?

না, এমন অনুমান ঠিক নয়। জিন সংক্রান্ত গণ্ডগোলের জন্য যে-সব মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হয়, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনিতেই কম থাকে; সে-ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে বিশেষ কিছু ওষুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে এটা ধরে নেওয়াই ভাল যে, এই ধরনের শিশুরা কখনোই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হারে হলেও এইসব শিশুদের মানসিক বয়স বাড়ে। নানা ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে অল্পবিস্তর মানিয়ে নিতেও তারা শেখে। অনেক বাবা-মা এই পর্যায়টাকে শিশুর স্বাভাবিক হয়ে আসার লক্ষণ বলে ভুল করেন।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারে না বলে এদের পড়াশুনোর জন্য আলাদা স্কুল চালু হয়েছে দেশে দেশে। এইসব স্কুলে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর প্রতি যেমন আলাদা ক'রে নজর দিতে হয় তেমনি এখানে পড়ানোর পদ্ধতিও খানিকটা ভিন্ন

মানসিক প্রতিবন্ধী কতজন স্বাবলম্বী হতে পারে?

হয়ে থাকে। এক স্কুলে না পড়লেও এইসব প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় সেটা দেখা দরকার। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এমন সব হাতের কাজ শেখানো উচিত যার জন্য বুদ্ধি লাগে কম। এতে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুটি পরবর্তী জীবনে সমাজের

বোঝা না হয়ে থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক 50-এর অনেক নীচে তাদের অবশ্য স্বাবলম্বী ক'রে তোলা প্রায় অসম্ভব। তবে চেষ্টা করলে এদের দিয়ে নিজের কাজটা করিয়ে নেওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, মানসিক প্রতিবন্ধীদের শতকরা 75 জনকে পুরোপুরি এবং শতকরা 10 থেকে 15 জনকে আংশিকভাবে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা সম্ভব। পরিবারের লোকজন এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এদের প্রতি একটু বেশি যত্ন নিলে এই কাজটুকু মোটেই কষ্টকর নয়।

প্রতিভা কি?

বিশেষ সৃজনশীল মানুষ দেখলে আমরা অনেক সময়ে প্রতিভা কথাটা ব্যবহার ক'রে থাকি। কিন্তু প্রতিভা কি?

প্রতিভা হল 'নব-নব-উন্মেষশালিনী' বুদ্ধি। যে কোনো প্রতিভাবান মানুষ—তা তিনি বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর যাই হোন না কেন, তাঁর সৃজনশীলতার পিছনে এমন এক অসামান্য চিন্তাধারা থাকে যা তাঁকে ধাপে ধাপে পৌঁছে দেয় আবিষ্কার বা সৃষ্টির দরজায়। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের চিন্তাধারাকে সাধারণত চারটে পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমটাকে বলা যায় প্রস্তুতি-পর্যায়। এ-সময়টায় প্রতিভাবান মানুষটি পড়াশুনো এবং অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন, পরবর্তী কালের 'সৃষ্টি'র জন্য প্রাথমিকভাবে নিজেকে তৈরি করেন। এরপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে চিন্তায় 'তা দেবার সময়'। এই সময়ে কতকগুলি বিশেষ চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে সৃজনশীল মানুষটির মাথায়। দেখা যায়, অনেক শিল্পী হয়তো

প্রতিভাধরেরও কি প্রস্তুতি-পর্ব আছে?

একটা বিশেষ ছবির কথা ঘুরে ফিরে ভাবছেন—এর মধ্যে মাসের পর মাস কেটে যেতে পারে, সে-সময়ে অন্য অনেক ছবিও তিনি আঁকতে পারেন—তবু ওই বিশেষ ছবিটির কথা যেন মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারেন না। একই ব্যাপার লেখক বা বিজ্ঞানীদের মধ্যেও আখছার দেখা যায়। একটা বিশেষ কোনো সমস্যা হয়তো ঘুরে ফিরেই বিজ্ঞানীর মাথায় আসে যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে অনেক সময়ে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তাঁরা। এরপরে আসে প্রতিভাময় চিন্তা-ভাবনার তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়; যে সমস্যাটা বিজ্ঞানীকে অহরহ ভাবাচ্ছিল তার সমাধানটা যেন বিদ্যুতের মত মাথার মধ্যে খেলে যায় এই সময়ে, কবি-সাহিত্যিকেরা মাথায় হঠাৎ করে আনকোরা নতুন আইডিয়া পেয়ে যান। সৃজনশীল চিন্তার শেষ পর্যায়ে নতুন আইডিয়া বা মনের মধ্যে হঠাৎ করে উদয় হওয়া বিশেষ সমস্যার সমাধানকেই কাজে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলে।



অসামান্য প্রতিভাধর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

প্রতিভার সঙ্গে কি বুদ্ধির সম্পর্ক আছে?

বুদ্ধি খুব বেশি হলেই আমরা কি প্রতিভার কথা বলতে পারি?

প্রতিভার সঙ্গে বুদ্ধির যে একটা সম্পর্ক আছে সন্দেহ নেই, তবে সে সম্পর্কটা তেমন পরিষ্কার নয়। প্রতিভাবান মানুষদের বুদ্ধিটা নিশ্চয়ই সাধারণের চেয়ে খানিকটা বেশিই থাকে, তবে বুদ্ধি তুখোড় হলেই কোনো মানুষ প্রতিভাবান হবে, এমন কথা বলা যায় না। আসলে বুদ্ধি ছাড়াও প্রতিভাবান মানুষদের মানসিকতায় আরো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে—যেমন, এঁরা হন স্বাধীনচেতা; চিন্তা এবং কাজকর্মে এঁরা পরনির্ভরতা পছন্দ করেন না। 'সেন্স অফ হিউমার' বা কৌতুকবোধ এঁদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নতুন

অভিনব সব জিনিসের প্রতি এঁরা সহজেই আকৃষ্ট হন। যে-কাজ যত বেশি জটিল সে-কাজ এঁদের তত বেশি পছন্দ। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা যে কোনো সমস্যার সমাধানে তাড়াতাড়ি পৌঁছোলেও তার মধ্যে অভিনবত্ব থাকে না। যেমন, বুদ্ধিমান কোনো শিশুকে একটা পেন্সিল দেখিয়ে যদি

প্রতিভাধর মানুষের কি কৌতুকবোধ থাকে?

জিজ্ঞাসা করা হয় 'এটা দিয়ে কি হবে?' সে উত্তরে কাগজের উপর লেখা বা ছবি আঁকার কথা বলে। আবার যে-শিশু পেন্সিলকে ফ্ল্যাগ-স্ট্যাণ্ড বা পতাকা আটকানোর কাঠি হিসেবে কল্পনা করে, তার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে অভিনবত্ব আছে বলে ধরে নিতে হয়। এই দ্বিতীয় শিশুটিকে 'প্রতিভাবান' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা সাধারণত পরীক্ষায় প্রথম হতে চায়। বড় হয়ে তারা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা ভাবে। কারণ তা হতে পারলে অর্থ-যশ দুই-ই মেলে। প্রতিভাধর ছেলেমেয়েদের জীবনের লক্ষ্যগুলি বুঝে ওঠা কিন্তু বেশ কঠিন। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করাটাকেই জীবনের সেরা লক্ষ্য বলে এরা মনে করে না। এদের অধিকাংশই উত্তর জীবনে গবেষক-বিজ্ঞানী কিংবা রোমাঞ্চকর অভিযাত্রীর জীবন বেছে নেয়।

আমরা স্বপ্ন দেখি কেন?

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু স্বপ্ন দেখার কারণটা কি?

শারীরবিজ্ঞানীরা ঘুমকে দু'টো পর্যায়ে ভাগ করে থাকেন—একটা হল Rapid Eye Movement বা REM পর্যায়; ঘুমের এই অবস্থায় চোখের তারা দ্রুত নড়াচড়া করে। দ্বিতীয় পর্যায়টির নাম No Rapid Eye Movement—সংক্ষেপে NREM; ঘুমের এই অবস্থায় চোখের তারা থাকে স্থির। REM ঘুমের সময়েই আমরা সাধারণত স্বপ্ন দেখে থাকি।

মানুষের স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড বলেছিলেন—আমাদের চেতন মনের গভীরে আছে একটা অবচেতন মন। আমরা যখন জেগে থাকি তখন আমাদের ভাবনা-চিন্তা-আবেগ-অনুভূতি থাকে চেতন মনের নিয়ন্ত্রণে। যেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, অমনি আমাদের অবচেতন মনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্খা স্বপ্নের রূপ ধরে মনের চেতন স্তরে উঠে এসে পরিতৃপ্তির রাস্তা খোঁজে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক—একটি ছেলে একঘর সহপাঠীর সামনে কারো কাছে অপমানিত হল। হয়তো ছেলেটি শারীরিক বা অর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার দরুন সেই মুহূর্তে অপমানের প্রতিশোধ নিতে অক্ষম। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি তার অপমানের কথা ভুলে গেলেও তার অবচেতন মনে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্খা রয়ে যেতে পারে। রাত্রে সে হয়তো স্বপ্ন দেখবে—যে ছেলেটি তাকে অপমান করেছিল তাকে যেন সবাই মিলে মারছে কিম্বা সে ছেলেটির বিরাট কোনো ক্ষতি হয়েছে।

নিকটজন অসুস্থ হলে কি রকম স্বপ্ন দেখতে পারি?

অনেক সময়ে ছেলেটিকে সরাসরি না দেখে তার মত চেহারার কাউকেও স্বপ্নে দেখা যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রেও অবচেতন মনের আকাঙ্খা তৃপ্ত হচ্ছে আংশিকভাবে।

আর এক ধরনের স্বপ্ন লোকে প্রায়ই দেখে, যেগুলিকে বলা যায় ভয় বা উদ্বেগের স্বপ্ন। যেমন, আমাদের কারো প্রিয়জন হয়তো খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ডাক্তারও বিশেষ ভরসা দিতে পারছেন না। সে-ক্ষেত্রে আমরা হয়তো স্বপ্ন দেখবো, পাহাড়-চুড়ো অথবা উঁচু বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে যেন গড়িয়ে পড়ছি। প্রিয়জনকে ঘিরে উদ্বেগের কারণেই এ-জাতীয় স্বপ্ন আমরা দেখি।

শিশুরা দেয়ালা করে কেন?

শিশুরা দেয়ালা করে, সকলেরই নজরে আসে। কিন্তু কেন?

ঘুমের ঘোরে শিশুর মুখে আনন্দ বা ভয়ের অভিব্যক্তিকেই আমরা বলি দেয়ালা—শুদ্ধ বাংলায়

'দেবলীলা'। 'দেয়ালা' আসলে স্বপ্নের প্রকাশ; শিশুর একান্ত মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেয়ালার মধ্যে দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় ফুটে ওঠে। নবজাত শিশুর বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতা না থাকলেও কিছু কিছু সহজাত প্রবৃত্তি তার থাকেই। খিদে-তেষ্টা না মিটলে শিশু কাঁদে। আবার খিদের মুখে দুধ পেলে বা নিঃসঙ্গতা থেকে মায়ের সান্নিধ্যে এলে শিশু খুশি হয়, হাসে। হাল আমলের গবেষণা প্রমাণ করেছে, জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই শিশু তার আশপাশের মানুষের মুখে হাসি-কান্নার অভিব্যক্তিকে আলাদা ক'রে ধরতে পারে। শুধু তা নয়, বড়দের হাসিমুখ দেখার ফলে সময়বিশেষে শিশুর চোখেমুখেও হাসির ছাপ ফুটে উঠতে দেখা যায়।

জন্মের পর থেকেই নতুন সব অভিজ্ঞতা শিশুর মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডারে জমা হতে থাকে। জেগে থাকার সময়ে চারপাশে যে সব ঘটনা ঘটে যায়, সেগুলি ঘুমের মধ্যে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে উঠে এলেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াগুলির ছাপ পড়তে থাকে শিশুর চোখে মুখে। ছোট শিশুর দুনিয়ায় হাসি-কান্না আর ভয় ছাড়া অন্য কোনো প্রতিক্রিয়ার স্থান নেই বলে তাদের ঘুমের মধ্যে শুধু মাত্র হাসি আর ভয়ের অভিব্যক্তি ফোটে। জটিল সব মানসিক প্রতিক্রিয়া, যেমন, সন্দেহ, বিষন্নতা, অভিমান—এ সবের অভিব্যক্তি শিশুদের দেয়ালার মধ্যে ধরা পড়ে না।

শিশুর দেয়ালায় কোন কোন ধরনের অভিব্যক্তি দেখা যায়?

ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

আমাদের অনেকের ধারণা, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। সত্যিই কি তাই?

ভোরের স্বপ্ন কেন, কোনো স্বপ্নই যে বাস্তবে হুবহু মিলে যাবে এমন কথা কখনোই বলা যায় না। ঘুমের REM [দ্রষ্টব্য ঃ আমরা স্বপ্ন দেখি কেন?] পর্যায়ে অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে যখন চোখের মণি নড়াচড়া করে—সে-সময়টাই স্বপ্ন দেখার সময়। খুব ছোট শিশুরা তাদের ঘুমের শতকরা 50 থেকে 75 ভাগ সময় থাকে REM অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার অবস্থায়। শিশুরা যে ঘুমের মধ্যে প্রায় সব সময়ই দেয়ালা করে তার কারণ, ঘুমের প্রায় পুরো সময়টাই কাটে REM পর্যায়ে। ক্রমশ শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে ঘুমের পরিমাণ তত কমে আসে। দশ বছর বয়সের পর থেকে বাকী জীবনে REM ঘুমের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় পুরো ঘুমের কম বেশি 25 শতাংশ। সাধারণত ঘুমিয়ে পড়ার ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই REM বা স্বপ্নপর্ব শুরু হয়। 10 থেকে 25 মিনিট কাটে স্বপ্নের মধ্যে, তারপরে ঘণ্টা দেড়েকের জন্য NREM বা স্বপ্নহীন অবস্থা। এইভাবে REM আর NREM পর্ব ঘুরে ঘুরে আসে। সাধারণত ভোরের দিকের স্বপ্নপর্বের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেলে স্বপ্নটা অনেক সময় হুবহু মনে পড়ে যায়।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কি স্বপ্নে দেখা সম্ভব?

ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ পরীক্ষার দিন ভোর রাতে স্বপ্নের মধ্যে পরীক্ষার প্রশ্ন আগাম জেনে ফেলেছে বলে দাবি ক'রে থাকে। এ-ক্ষেত্রে পরীক্ষার আগের রাতে পড়া তৈরি করার সময়ে বিশেষ কয়েকটি প্রশ্ন যাতে পরীক্ষায় আসে সেটাই সে হয়তো কামনা ক'রে থাকবে। স্বপ্নে তার ইচ্ছাপূরণ হল, অর্থাৎ ভোরের স্বপ্নে সে দেখল, ওই প্রশ্নগুলোই এসেছে। পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নগুলোকে সত্যি সত্যি পেয়ে গেলে সেটা হবে নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার। ঘুমের মধ্যে অনেকে স্বপ্নাদেশ পায় ব'লে দাবি ক'রে থাকে—তাও আসলে সুপ্ত আকাঙ্খা চরিতার্থের জন্য অবচেতন মনের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তির সময়ে লোকে বেশি স্বপ্ন দেখে কেন?

যখন শরীর ভাল থাকে না এবং মনও খারাপ, তখনই আমরা বেশি স্বপ্ন দেখি। কিন্তু কেন?

ঘুমের REM পর্যায়ে অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে যখন চোখের মণি নড়াচড়া করে—সে সময়টাই স্বপ্ন দেখার সময়। আবার এই পর্যায়ে ঘুমটাও থাকে পাতলা—একটু জোরে শব্দ হলেই তা ভেঙ্গে যায়। কোনো জায়গায় জ্বালা-যন্ত্রণা বা হজমের গণ্ডগোল হলে শরীরের বিভিন্ন স্নায়ু মারফৎ

শারীরিক অস্বস্তির খবরটা পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। এ-অবস্থায় ঘুম আসতে চায় না বা ঘুম এলেও তা বারবার ভেঙে যায়। খেয়াল করলে দেখা যাবে, ঘুমনোর সময়ে চোখে আলো পড়লে বা রেডিও জোরে বাজতে থাকলে ঘুমনোর অসুবিধে হয়। এর কারণ ঘুমের জন্য মস্তিষ্ককে বাইরের

> **ঘুমের মধ্যে চোখের মণি যখন নড়াচড়া করে, তখন কি আমরা স্বপ্ন দেখি?**

উদ্দীপক (Stimulus) থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এখন শারীরিক অস্বস্তির সময়ে ঘুমটা পাতলা থাকে বলে এ সময়ে চোখের মণি নড়াচড়া করে—অর্থাৎ শারীরিক অস্বস্তির সময়ে ঘুমের প্রায় পুরোটাই থাকে REM পর্যায়ে। ফলে ঘন ঘন স্বপ্ন দেখাটাই স্বাভাবিক।

উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ বা মানসিক অবসাদের সময়েও একই ঘটনা ঘটে; এ সময়েও ঘুমটা গাঢ় হয় না এবং পাতলা ঘুমের জন্যই স্বপ্ন দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষটি।

নোংরা জিনিস দেখলে মুখে থুতু আসে অথবা পেট গুলিয়ে ওঠে কেন?

বিবর্তনবাদের প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী জন্তু-জানোয়ারদের মত আমরাও কিছু জিনিস চিবিয়ে, কিছু শুঁকে বা কিছু দেখে তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে শিখেছি। দীর্ঘ দিন ধরে বিশেষ কোনো জিনিস গ্রহণ এবং বিশেষ কিছু জিনিস বর্জনের মধ্যে দিয়ে আমাদের শরীরে কতকগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex) সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া কাকে বলে?

ধরা যাক, কেউ ঘুমিয়ে আছে, তার হাতে একটা খুব গরম বা ঠাণ্ডা জিনিসের ছোঁয়া লাগলে ঘুমের মধ্যেও সে হাত সরিয়ে নেয়। অচেতন অবস্থায় যে-সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি করা যায় এবং যার পিছনে কোনো ভাবনা-চিন্তা থাকে না, তাকে বলা যায় অবচেতন মনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় থেকে উত্তেজনা স্নায়ু মারফৎ সুষুম্না কাণ্ড দিয়ে সুষুম্না শীর্ষ পর্যন্ত গিয়ে আবার পেশীতে ফিরে আসে। এর ফলে নোংরা বর্জ্য জিনিস দেখলেই আমাদের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফ্রেনিক নার্ভ [দ্রষ্টব্য ঃ পরীক্ষার আগে অনেকের পেট ব্যথা বা গা-বমি বমি করে কেন?] উত্তেজিত হলে মুখে থুথু আসে। ফ্রেনিক নার্ভের উত্তেজনা সময়ে সময়ে বুক ও পেটের মাঝখানের ডায়াফ্রাম বা পেশীর সংকোচন ঘটায়। ফলে পেট গুলোতে থাকে। নোংরা জিনিস দেখার মত অস্বস্তিকর গন্ধ শুঁকেও আমাদের মধ্যে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সদ্যোজাত শিশুদের কি বোধবুদ্ধি থাকে?

মানুষের তো বোধবুদ্ধি আছেই। কিন্তু শিশুদের? সদ্যোজাত শিশুদের কতটা বোধবুদ্ধি আছে?

প্রাণিজগতের সেরা জীব, বিবর্তনের ধারায় যে এসেছে সবার শেষে, সেই মানুষ যখন জন্মায় তখন তার চেয়ে অসহায় বোধহয় কেউ নয়। মাতৃজঠরে যে আরামদায়ক পরিবেশে সে ছিল তার মধ্যে থেকে হঠাৎ ক'রে বাইরের আলো-হাওয়ায় এসে পড়লে শিশুটির অবস্থা রীতিমতো অস্বস্তিকর হবেই। উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার মত কতকগুলি সহজাত গুণ তার অবশ্যই থাকে। যেমন খিদে পেলে সে কাঁদে, চোখে আলো পড়লে তার চোখ বুজে আসে, আঘাত লাগলে সে চেঁচায়। সেই মুহূর্তে এবং তারপরেও বেশ কিছুদিন পৃথিবীতে সে একেবারে একা; তার শারীরিক চাহিদাগুলিই তখন তার দেহমন জুড়ে থাকে। নিজেকে বাদ দিলে, এ-সময়ে মা-ই তার সবচেয়ে কাছের জন—যিনি তার খিদে পেলে তা মেটান, শরীরের উত্তাপ দিয়ে অসহায়ত্ব দূর করেন।

এরপরে আমরা দেখি শিশুটির বয়স যত বাড়ছে, ততই তার মস্তিষ্ক পরিণত হচ্ছে, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুসংবদ্ধ হয়ে উঠছে। শারীরিক বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে শিশুর মানসিক বিকাশও হতে থাকে ধাপে ধাপে। সে সঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণ করতে শেখে। দুর্বোধ্য আওয়াজের বদলে অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করে। মা এবং নিজেকে বাদ দিয়ে আর পাঁচজনের অস্তিত্ব ধরতে পারে। তার বুদ্ধি বাড়ে, আবেগ-অনুভূতি-ইচ্ছেগুলো রূপ নিতে থাকে। শিশুটি ক্রমশ নিজেকে নানা ধরনের পরিস্থিতির

সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখে এইভাবে ধীরে ধীরে সে সামাজিক হয়ে ওঠে।

সারা জীবন ধরে যে মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের ধারা আমরা মানুষের মধ্যে দেখতে পাই তার শুরুটা হয় জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মেডিক্যাল স্কুলের এক দল

দেড় দিনের শিশুও কি কান্না হাসির মুখ আলাদা আলাদা করতে পারে?

মনোবিজ্ঞানী দেখেছেন, শিশুরা তাদের জন্মের মাত্র 36 ঘণ্টা পরেই বিষাদগ্রস্ত এবং সুখী মানুষের মুখগুলোকে আলাদা আলাদা ক'রে চিহ্নিত করতে পারে। ওঁরা দেখেছেন, হাসি-হাসি মুখে দেড়-দিনের শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যদি কেউ নিজের মুখটাকে হঠাৎ গম্ভীর কিংবা কাঁদো কাঁদো করে তোলেন, শিশুটির মুখের ভাবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায়।

শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে কেন?

ছোটরা দেখা যায় বয়স্কদের অনুকরণ করে। কিন্তু এর কারণ কী?

শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ জ্যাঁ-পিঁয়াজের ধারণা ছিল, আট থেকে বারো মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা প্রথম বাবা-মা এবং অন্যদের আচার-আচরণকে নকল করা শুরু করে। পরবর্তী কালে অ্যানড্রু মেলটফ্ এবং এম কিথ মুর নামে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ-পিঁয়াজের মতামতকে নস্যাৎ ক'রে দেন। দীর্ঘদিন ধরে নবোজাত শিশুদের আচার-আচরণ খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে ওঁদের ধারণা হয়েছে, বয়স্ক লোকের দেখাদেখি মাত্র 12 দিনের শিশু নিজের জিভ বের করতে চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, জন্মের মাত্র 42 মিনিট পরেই একটি শিশুর মধ্যে বড়দের অনুকরণ করার চেষ্টা দেখতে পেয়েছিলেন ওঁরা।

বড়দের নকল করার মধ্যে দিয়ে শিশু সামাজিকতার প্রথম পাঠ নেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে তার বাবা-মায়ের আচরণ, অঙ্গভঙ্গী এমন কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও ফুটে উঠতে থাকে। শৈশবাবস্থায় ছেলেরা সাধারণত তাদের বাবা এবং মেয়েরা তাদের মার সঙ্গে একাত্মবোধ ক'রে থাকে। মায়ের রূপের প্রশংসা হলে মেয়ের চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ে---যেন তার নিজেরই প্রশংসা হচ্ছে। আবার একটা ছোট ছেলে যখন সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে পড়ার ভান করে তখন সে আসলে মনে মনে নিজেকে বাবার জায়গায় বসিয়ে নেয়।

শৈশবের প্রথম এক-দেড়টা বছর কেটে যাওয়ার পরে শিশু যত বড় হয়, বাবা-মা'র পাশাপাশি আশেপাশের বয়স্ক মানুষ—তা সে কাকা-পিসি-দাদা-দিদিই হোন আর শিক্ষক-শিক্ষিকা হোন—তাঁদের হাবভাব, আচার-আচারণ অনুকরণ করতে থাকে সে। এর ফলে সে তার বাবা-মা কিংবা যাঁকে অনুকরণ করছে তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে, এমন একটা

জন্মের কতটুকু সময় পরেই শিশু বড়দের নকল করতে চেষ্টা করে?

সুপ্ত আকাঙ্খা শিশুটিকে অনুকরণপ্রিয় ক'রে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই শিশুরা তাদের পছন্দসই মানুষদেরই অনুকরণ করে। ওদের এই অনুকরণ-স্পৃহা ফুটে ওঠে

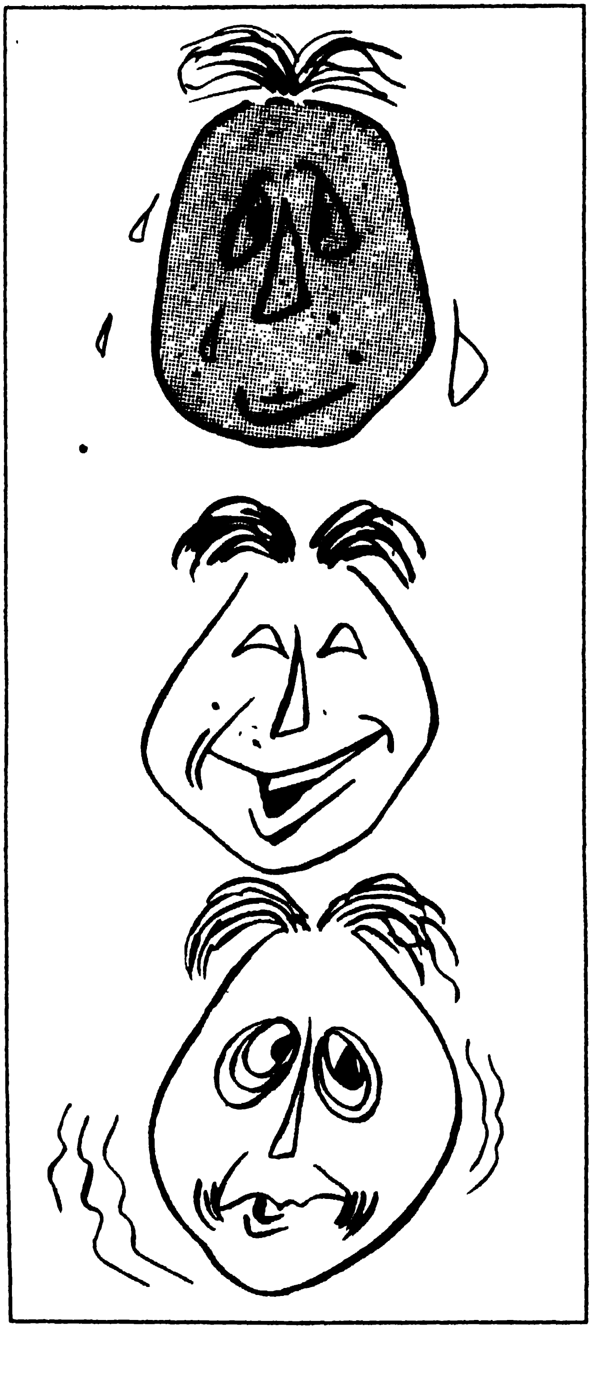


ওদের কথাবার্তা, হাঁটা-চলা এমন কি হাতের লেখার ভঙ্গিমাতেও। অন্যকে অনুকরণ করতে করতে শিশু যখন কৈশোরে এসে পৌঁছোয় তখনই তার মধ্যে নিজেকে অন্য সকলের কাছ থেকে আলাদা ক'রে নেওয়ার, নিজেকে নিজের মত ক'রে গড়ে তোলার তাগিদ প্রথম দেখা দেয়।

সামাজিক দিক থেকে বড় হয়ে ওঠার প্রথম ধাপটা তখন সে পেরিয়ে আসে।

ভাষা ছাড়াও কি মনের ভাব প্রকাশ করা যায়?

মানুষে মানুষে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের ব্যাপারে মাধ্যম হিসেবে ভাষার স্থান যে পয়লা নম্বরে তা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই, তবু ভাষাই শেষ কথা নয়। মুখের ভাষা ছাড়াও আমাদের আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, অঙ্গভঙ্গী, চোখের চাহনি প্রতিনিয়ত আমাদের মনের কথাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়।



প্রথমে ধরা যাক সাজ-পোশাকের কথা। গোটা দুনিয়ার সকল পুরুষই আজ ইউরোপীয়দের পোশাককে আপন ক'রে নিয়েছেন। তারই মধ্যে অনেকে যখন বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে নিজেদের জাতীয় পোশাক পরেন—তখন বুঝতে হয়, তাঁরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছেন।

দৃষ্টির রকমফেরে আমাদের রাগ, দুঃখ, উদ্বেগ, আনন্দ—যাবতীয় আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে পারে। একজন মানুষের চোখের চাহনি অনুসরণ ক'রে সেই মুহূর্তে তার কোন বিষয়ে আগ্রহ জন্মেছে তা যেমন আন্দাজ করা যায়, তেমনি অন্যের চোখের ভাষাকে ঠিক ঠিক পড়তে পারলে তার আশা-আকাঙ্খা-ইচ্ছার দিকগুলো জানতে মুখের কথার ভরসায় আর বসে থাকতে হয় না। আবার কেউ যখন অন্য কারোর চোখের দিকে সরাসরি তাকায় তখন সেই তাকানোর অর্থ হয়— সে অন্য মানুষটির সঙ্গে ভাব-বিনিময়ে প্রস্তুত। আজকের দুনিয়ার বড় শহরগুলিতে মানুষ

বিস্ময়ে বা আগ্রহে চোখ বড়,
রাগ বা বিরক্তিতে কি
চোখ ছোট হয়?

থাকে সব সময়েই ব্যস্ত, আশেপাশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের তাগিদ বা সময় কোনোটাই তার থাকে না। তাই বোধহয় অন্যের দিকে সরাসরি তাকানোর ব্যাপারে অধিকাংশ শহুরে মানুষের মধ্যে একটা অনীহা লক্ষ্য করা যায়।

চোখের চাহনির সঙ্গে চোখের আকার-ভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তন থেকেও অনেক কিছু টের পাওয়া যায়। যখন আমরা কোনো কিছু শুনতে বা জানতে আগ্রহী হয়ে উঠি, বা কোনো কিছুতে বিস্ময় বোধ করি, তখন আমাদের চোখগুলো বড় আকার নেয়। আবার রাগ বা বিরক্তির সময় আমাদের চোখ কুঁচকে যায়।

সামাজিক পরিবেশে মানুষ অন্যের থেকে কতটা দূরত্ব রেখে বসছে, দাঁড়াচ্ছে বা কথা বলছে তা থেকেও তার মনের ভাব টের পাওয়া সম্ভব। সাধারণত আমরা অপরিচিত মানুষের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো পছন্দ করি না। আবার দু'জন মানুষ যখন খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বা একজন আর একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কথা বলে তখন বুঝতে হয় সম্পর্কটা তাদের বেশ অন্তরঙ্গ কিংবা আলোচনাটা চলছে খুবই গোপন বিষয়ে। শুধু এ-সবই নয়, যে কোনো সামাজিক পরিবেশে একজন মানুষের হাঁটা-চলা, দাঁড়ানো বা বসার বিশেষ ভঙ্গি, মাথা নাড়ানো, কাঁধ ঝাঁকানো, এগুলোও মুখের ভাষার পরিবর্ত হিসেবে কাজ করতে পারে। অবশ্য দেশ ভেদে, সমাজ ভেদে এই সব অঙ্গভঙ্গির মধ্যেও বিস্তর ফারাক দেখতে পাওয়া যায়।

শিশুর মুখে ভাষা ফোটে কি ভাবে?

শিশুর মুখে ভাষা ফোটে, আমরা সবাই জানি। কিন্তু সে-ভাষা সঠিক ফোটে কেমন ক'রে?

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—আমরা যখন কোনো ভাষা আয়ত্ত করি, তখন সেই আয়ত্ত করার ব্যাপারটা ঘটে ধাপে ধাপে, আমাদের মানসিক বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে। জন্মাবার পরে মাস চারেক পর্যন্ত একটি মানব শিশুর ভাষা বলতে সম্বল কান্না, চিৎকার কিংবা অর্থহীন কিছু আওয়াজ। সাধারণত পাঁচ মাস বয়সে শিশু কিছু কিছু ধ্বনির পুনরাবৃত্তি করতে শেখে। যেমন, দা-দা-দা কিংবা লাল-লাল-লাল-লাল। মজার কথা, জন্মাবার পর প্রায় ছ' সাত মাস বয়স অবধি পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির শিশু প্রায় একই ধরনের আওয়াজ বা শব্দ ক'রে থাকে।

শিশু-মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, শিশুরা তাদের 4 থেকে 10 মাস বয়সের মধ্যে কিছু কিছু শব্দের মানে বুঝতে শেখে। তাদের সামনে যখন কেউ কোনো কথা বলে তখন সেই কথাগুলির মধ্যে থেকে শিশুরা তাদের পরিচিত শব্দগুলিকে আলাদা করতে পারে। ভাষা আয়ত্ত করার এটাই হল পয়লা ধাপ। এই সময়টাই শিশু যে-ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে, সেটা অন্যদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। যেমন, দুধের বোতলকে সে হয়তো প্রতিবারেই বলবে 'দা-দা'।

সাধারণত এক থেকে দু' বছর বয়সের মধ্যে শিশু সঠিক ভাবে অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে। তবে এক বা দু'য়ের বেশি শব্দ সে একবারে উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন, শিশুটিকে হয়তো বলতে বলা হল, 'আমার বাবা বাড়ি নেই'। শিশুটি বলবে, 'বাবা নেই'। দেখা গেছে, বড়দের কথাগুলি সঠিক উচ্চারণ করতে না পারলেও বছর দুয়েক বয়স থেকেই শিশু মোটামুটিভাবে ব্যাকরণ মেনে কথা বলে।

মনোবিজ্ঞানীদের একদল বলে থাকেন, পৃথিবীর সব ভাষাভাষী শিশুরাই যে একেবারে ছোটবেলাতেই ব্যাকরণ মেনে কথা বলতে শেখে, সেটা সম্ভব হয় তাদের জন্মগত বিশ্লেষণ-শক্তির জন্য। আবার ভাষা আয়ত্ত করার পিছনে দৈনন্দিন অভ্যেসের বড়সড় ভূমিকা থাকতে পারে বলে বহু বিশেষজ্ঞের ধারণা। ইংরেজিতে একেই বলে, 'অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং' (Operant Conditioning)। অর্থাৎ ছ' সাত মাস বয়সে শিশু যখন মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য আওয়াজ করে, বাবা-মা কিম্বা আশেপাশের অন্য কেউ তখন তার দিকে নজর দেন বা সেই আওয়াজকে নকল করেন। এর ফলে শিশুটির মধ্যে আওয়াজ করার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা আসে। এটাকে বলা যায় ভাষা আয়ত্ত করার প্রাক-পর্ব। এর পরের ধাপে, আরো কয়েক মাস পরে হয়তো বাবা-মা তাদের শিশুর সামনে একটা বই রেখে বললেন, 'বই'। এ-ভাবে বার কয়েক বলার পরে শিশুটিও এক সময়ে বলল, 'বই'। শিশুটি ঠিক ঠিক বলতে পেরেছে দেখে বাবা-মা হয়তো তার গাল টিপে আদর করলেন কিংবা হাসলেন। শিশুটির কাছে এটা তার সাফল্যের পুরস্কার। এই পুরস্কারটা পেল বলেই শিশু বারবার 'বই' শব্দটা বলতে থাকলো এবং 'বই' শব্দটা তার আয়ত্তে এসে গেল।

শিশু কোন বয়সে অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে?

কোন বৈশিষ্ট্যের ফলে মানুষ কথা বলতে পারে?

আমরা কথা বলি। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যের জোরে আমরা কথা বলতে পারি?

কথা বলার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়।

কিন্তু শরীরের আরো কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন কণ্ঠনালী, বুকের মাংসপেশী, মুখগহ্বর, জিভ, ঠোঁট—এ-সবের ভূমিকাও নেহাত ফেলনা নয়। খুব চড়া সুরে গান গাওয়া বা কথা বলার সময়ে আমাদের কণ্ঠনালীর মুখটা সরু হয়ে আসে। আর ফিসফিস ক'রে যখন কথা বলি তখন কণ্ঠনালীর ফাঁকটা থাকে বড়। স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠনালী ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ কিছু করার থাকে না। আবার ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠনালী থেকে বেরিয়ে আসা বাতাসকে ধাক্কা দেয় জিভ আর ঠোঁট।

কে তাড়াতাড়ি একটা ভাষা আয়ত্তে আনতে পারে? কোনো শিশু না একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ?

জিভের নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখে মস্তিষ্কের যে-বিশেষ অংশটি তার নাম 'ব্রোকা'র অঞ্চল। যে-বিজ্ঞানী প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশ আমাদের সবাক রেখেছে, তাঁরই নামে ওই বিশেষ অঞ্চলটির নাম রাখা হয়েছে। মনুষ্যেতর কোনো প্রাণীর মস্তিষ্কে এই বিশেষ অঞ্চলটির সন্ধান মেলেনি। অথচ দীর্ঘ প্রশিক্ষণের পরে একাধিক ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জীরা মানুষের ভাষা অল্পস্বল্প আয়ত্ত করতে পেরেছে। সে-জন্যেই একমাত্র 'ব্রোকা'র অঞ্চলই আমাদের কথা বলতে সাহায্য করে, এমন সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

ভাষা আয়ত্ত করার পিছনে স্মৃতি, অর্থাৎ মনে করা বা মনে রাখার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কাকাতুয়া বা ময়নার জিভ এবং কণ্ঠনালীর গড়ন-গঠন এমনই যে, তারা সময়ে সময়ে মানুষের কথাকে হুবহু নকল করতে পারে; কিন্তু তাদের স্মৃতি অত্যন্ত দুর্বল বলে ভাষা আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

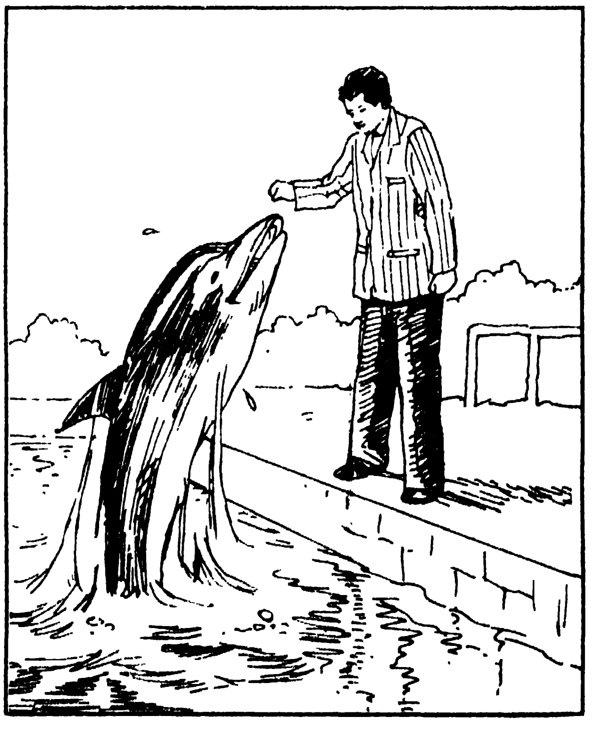
কথা বলতে পারার পিছনে স্মৃতি ছাড়াও যুক্তি-বুদ্ধি এবং চিন্তা-ভাবনারও একটা দিক আছে। এ-সবকে হিসেবে আনলে, মানুষের কথা বলতে পারার পিছনে তার মস্তিষ্কের বেশ কয়েকটি অঞ্চলের বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মস্তিষ্কের সামনের অংশ মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উন্নত বলে ভাষা আয়ত্ত করার মূল চাবিকাঠিটি রয়েছে মস্তিষ্কের এই বিশেষ অংশেই। গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এখনও অবশ্য এটা পুরোপুরি সত্যি বলে প্রমাণিত হয়নি।

বিজ্ঞানীদের একদলের মতে, ভাষা আয়ত্ত করার কৌশলটি মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া। কোন ভাষা সে কতটা আয়ত্ত করবে সেটা অবশ্য পরিবেশের উপরেও বেশ খানিকটা নির্ভর করে। যে-পরিবারে বয়স্করা নিজেদের মধ্যে কম কথাবার্তা বলেন, সেখানে শিশুরা দেরিতে কথা বলতে শেখে। আবার এটাও লক্ষ্য করার মত যে, একটা শিশু যত তাড়াতাড়ি একটা ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ তা পারে না।

জন্তু-জানোয়ারদের দিয়ে কি কথা বলানো সম্ভব?

আমাদের অনেকেরই ধারণা, জন্তু-জানোয়ারদের দিয়ে কথা বলানো যায়। কিন্তু সত্যিই কি জন্তু-জানোয়ারের পক্ষে কথা বলা সম্ভব?

চেষ্টা করলে পশু-পাখিদের দিয়েও কথা বলানো যায়, এমন একটা ধারণা আমাদের অনেকেরই আছে। ধারণাটার পিছনে সম্ভবত রয়েছে ময়না, কাকাতুয়া জাতীয় পাখিরা।



কারণ মানুষের কথাকে নকল করার ক্ষমতা এদের আছে। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রাণী শিম্পাঞ্জীকে মানুষের ভাষা শেখানোর চেষ্টা চালানো হয়েছিল। এক মার্কিন দম্পতি এই উদ্দেশ্যে নিজেদের সদ্যোজাত পুত্রের সঙ্গে 'গুয়া' নামে এক শিম্পাঞ্জি-কন্যাকে ন'মাস ধরে লালন-পালন করেছিলেন। ওঁদের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। গুয়া কথা বলতে শেখেনি, তবে অন্তত গোটা ষাটেক ইংরেজি শব্দের অর্থ বুঝতে পারতো এবং সেই সব শব্দের মাধ্যমে কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা ঠিক ঠিক পালন করতো। এর কিছুদিন পরে আর এক দম্পতি 'ভিকি' নামে এক স্ত্রী-শিম্পাঞ্জীকেনিয়ে একই ধরনের পরীক্ষা চালান। বহুদিন ধরে অনেক মেহনতের পর 'ভিকি' চারটে ইংরেজি শব্দ অস্পষ্টভাবে বলতে শিখেছিল, যদিও হঠাৎ হঠাৎ ক'রে শব্দগুলো বলতো সে—অনেকটা কাকাতুয়া বা ময়নার মতই।

মানুষের ভাষা আয়ত্ত করতে না পারলেও শিম্পাঞ্জীরা যে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে সক্ষম তার প্রমাণ অবশ্য মিলেছে। আমেরিকার এক মনোবিজ্ঞানী-দম্পতি—অ্যালেন ও বিয়াত্রিচ গার্ডনার—অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে একটা ছোট্ট শিম্পাঞ্জীকে নানা ধরনের সংকেত শেখাতে শুরু করেন—ঠিক যেমনভাবে বধির শিশুদের 'ভাষা' শেখানো হয়। বছর তিনেকের চেষ্টার পর 'ওয়াশো' নামে ওই শিম্পাঞ্জীটি ৪০টি অর্থবহ সঙ্কেতের ব্যবহার শিখেছে আর সফলভাবে সেগুলির প্রয়োগও করতে পেরেছে অন্তত শ' পাঁচেকবার।

জীবজন্তুদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান হবে কী দিয়ে? ভাষা দিয়ে না ভাব দিয়ে?

গার্ডনার দম্পতির গবেষণা প্রমাণ করেছে, অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান যদি আমাদের করতেই হয়, তবে ভাষার বদলে নানা ধরনের সঙ্কেতকেই বেছে নিতে হবে। কারণ প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটাই আপাতত শেষ কথা।

ইচ্ছের জোরে কি অসাধ্য সাধন করা যায়?

কথা বলে, ইচ্ছে থাকলে কি না হয়? কিন্তু ইচ্ছের জোরে কি যে-কোনো কাজ করা যায়?

হ্যাঁ, ইচ্ছেশক্তির জোরে আপাতদুরূহ কাজও সম্পন্ন করা যায়। তাই তো শুধুমাত্র ইচ্ছের জোরে, মনের তাগিদে, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী দিনের পর দিন বেঁচে থাকেন, পঙ্গু-অশক্ত মানুষও দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে যান। যেহেতু কোনো না কোনো চাহিদা পূরণের জন্যই 'ইচ্ছে' বা 'প্রেরণা'র জন্ম হয়, সে-জন্যই আমাদের মধ্যে 'ইচ্ছেশক্তি' কতটা জোরদার হবে, তা নির্ভর করে আমাদের চাহিদাগুলির স্বরূপ এবং পরিমাণের উপরে।

পুরস্কারের সুযোগ দিয়ে কি ভাল কাজ করানো সম্ভব?

আমাদের চাহিদাগুলির মধ্যে প্রথমেই আসে খিদে-তেষ্টা-ঘুম জাতীয় শারীরিক চাহিদাগুলির কথা। বেঁচে থাকতে হলে এই সব চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতেই হয়। খিদে-তেষ্টা-ঘুম—এ-সব প্রাথমিক চাহিদা যে প্রেরণার জন্ম দেয়, তা যদি কোনো কারণে বিরাট আকার ধারণ করে তখনই ইচ্ছেশক্তির অস্তিত্বটা টের পাওয়া যায়। যেমন, কারো হয়তো সারাদিন কোনো খাদ্য-পানীয় জোটেনি, অনেকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে পা যেন আর চলতেই চাইছে না। তারপর যেই দূর থেকে নিজের বাড়িটা নজরে এল, অমনি তার হাঁটার গতি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেল। খিদে মেটানোর তাগিদে চরম ক্লান্তির মধ্যেও সে ছুটতে পারে। এখানেই তো ইচ্ছেশক্তির প্রকাশ!

শারীরিক চাহিদাগুলির পরে আসে মানসিক আর সামাজিক চাহিদার কথা। মানসিক চাহিদা বলতে অন্যের ভালবাসা, আত্মীয়তা, স্বীকৃতি—এগুলোকেই বোঝায়। মানসিক চাহিদাগুলির অতৃপ্তি থেকেই দুঃখ, কষ্ট, ভয় আমাদের মনে বাসা বাঁধে। শরীরের উপরেও যে এর প্রভাব পড়ে না, তা নয়। সামাজিক চাহিদাগুলির মধ্যে

জোট-বাঁধা বা 'দলভুক্ত' হওয়ার চাহিদাটাই সবচেয়ে বড়। দলটা ছোট হতে পারে—যেমন, পাড়ার ক্লাব; দলটা আবার লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও হওয়া সম্ভব।

ইচ্ছে বা প্রেরণা সৃষ্টির ব্যাপারে 'ইনসেনটিভ' বা পুরস্কারের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। সব ক্ষেত্রে ভাল কাজের জন্য যদি পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে, ভাল কাজের যদি স্বীকৃতি দেওয়া যায়, তবে কর্মীদের মধ্যে কাজের তাগিদ বাড়ে। আবার চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে যদি হাজারটা বাধা এসে উপস্থিত হয়, সে-ক্ষেত্রে প্রেরণার অভাব ঘটাই স্বাভাবিক।

গুরুত্বের তারতম্য অনুযায়ী মানুষের যাবতীয় চাহিদাকে ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়ে থাকে। চাহিদার তালিকায় প্রথমেই আসে খিদে, তেষ্টা, ঘুম বা যন্ত্রণা এড়ানোর চাহিদাগুলি। এগুলির পর নিরাপত্তা, ভালবাসা, আত্মসম্মানের মত মানসিক চাহিদার স্থান। ওই তালিকার ক্রমানুসারেই চাহিদাগুলিকে তৃপ্ত করতে হয় আমাদের। সে-জন্যই খিদে-তেষ্টা না মিটলে মানুষ নিরাপত্তার কথা ভাবে না। আবার নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ হলেই সে ভালবাসার কথা বা একে অপরের সঙ্গে জোট বাঁধার তাগিদ অনুভব করে।

সব মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ কি একরকম?

এক এক মানুষের ক্ষেত্রে আবেগ-অনুভূতি কি এক এক রকমের?

আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে মানুষে মানুষে খুব একটা তফাত না থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম হয়ে থাকে। অহঙ্কারে আঘাত লাগলে, অন্যের কাছে হেয় হয়ে গেলে আমরা সাধারণত কম-বেশি রেগে যাই। তেমনি প্রিয়জন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে কার না কষ্ট হয়? অতিরিক্ত আবেগের সময়ে আমাদের প্রায় সকলেরই চেতনা কোনো বিষয়ে আবদ্ধ থাকে বলে পারিপার্শ্বিক জগতের কোনো অস্তিত্ব থাকে না আমাদের কাছে। সময়ে সময়ে আবেগ যে বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে সেটাও আমরা কে না অনুভব করি? তবে বিশেষ ধরনের আবেগ বা অনুভূতিতে সবাই একই রকম আচরণ করবে, এমন কথা নেই। শুধুমাত্র মুখের ভাবভঙ্গি দেখে কোনো মানুষের রাগ, দুঃখ না আনন্দ হয়েছে, তা বোঝাও বেশ মুশকিল। মুখের ভাবভঙ্গি দেখে কোনো মানুষের বিশেষ কোনো আবেগকে চেনা যায় কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে এখন থেকে অনেক বছর আগে এক মজার পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। কিছু মানুষকে গান শুনিয়ে,

সবাই কি একই রকম ভাবে রাগ দেখায়?

অ্যামোনিয়া শুঁকিয়ে, হাতের উপর ব্যাঙ ছেড়ে দিয়ে, বৈদ্যুতিক শক দিয়ে এবং আরো নানা উপায়ে আনন্দ, বিরক্তি, ভয় ইত্যাদি নানা ধরনের আবেগ সৃষ্টি করা হয়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেকটি মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশে কতকগুলি কালো দাগ দেওয়া হয়েছিল এবং আবেগের মুহূর্তগুলিতে তাদের মুখের ফটো তোলা হল। পরে ওই সব ফটো বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, একই ধরনের আবেগে বিভিন্ন মানুষের মুখের পেশীগুলি বিভিন্ন ভাবে কুঁচকেছে। ফলে প্রত্যেকটি মানুষের মুখের উপরে যে কালো দাগগুলো দেওয়া হয়েছিল তাদের পারস্পরিক দূরত্ব এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম দাঁড়িয়েছে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীদের নিয়েও একই ধরনের পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। তাতেও দেখা গেছে, মানুষের মত শিম্পাঞ্জীদের আবেগের বহিঃপ্রকাশও এক এক জনের ক্ষেত্রে এক একরকম।

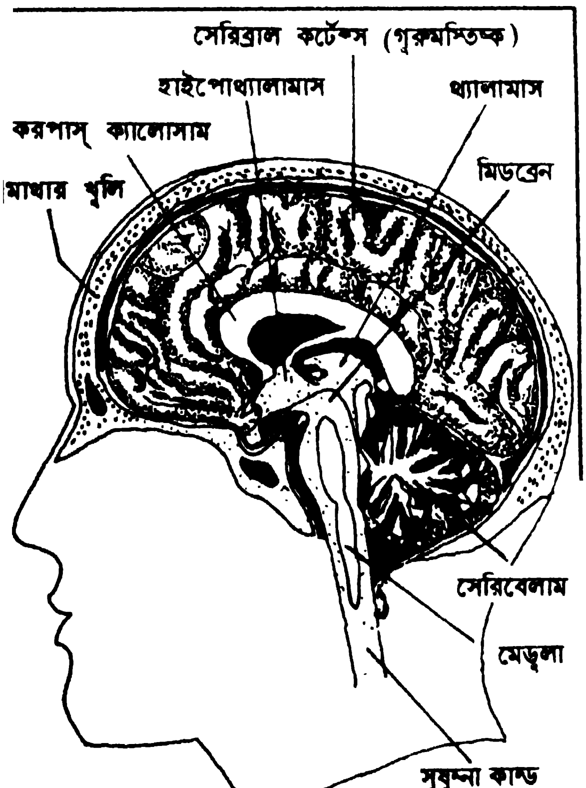
শুধু কি মুখের ভাবভঙ্গি! রাগের সময়ে কারোর কথা আটকে যায়, কারো বা মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়, কারোর চোখের রঙ হয়ে ওঠে টকটকে লাল। আবার কোনো লোকের মুখের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝাই যায় না, সে হাসছে না কাঁদছে। সেই কারণেই মানুষের অঙ্গভঙ্গি, আচার-আচরণ দেখে আবেগের স্বরূপটিকে চিনে নেওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয়।

আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে কে?

অতিরিক্ত ভয় পেলে বা রাগ হলে শরীরের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তন নজরে আসে। অনেকের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। রক্তচাপের হেরফের হয়, আবার

বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণের হারও যায় বেড়ে।

এই বহিঃপ্রকাশের কারণ কি? আমাদের মধ্যে যখনই কোনো আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে, তখনই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই ব্যাপারটারই সূত্র টেনে, 1844 সালে উইলিয়াম জেম্স নামে এক মনোবিজ্ঞানী এবং 1885 সালে কার্ল ল্যাঙ নামে এক শারীরবিজ্ঞানী এক নতুন তত্ত্ব হাজির করেন। ওঁদের বক্তব্য ঃ আবেগের জন্য শারীরিক পরিবর্তন হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা ভুল। আসলে, শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন ঘটলে মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের আবেগ সৃষ্টি হয়। সে-দিক থেকে, ভয় পেলেই আমরা দৌড়োই—তা ভুল। বরং দৌড় লাগাই বলেই ভয় পাই। ওঁদের কথার মধ্যে যে একেবারেই যুক্তি ছিল না তা নয়। দেখা যায়, আবেগ মাত্রই তার কোনো না কোনো দৈহিক প্রকাশ থাকবে। আবার অন্ধকারে কারো সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা লাগলেই যে বুক কেঁপে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, সে তো আমরা সবাই দেখি। এ-ক্ষেত্রে ভয়ের কোনো ধারণা গড়ে ওঠার আগেই তো শরীরের মধ্যেকার পরিবর্তনগুলি ঘটে যায়।



শারীরবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশই কিন্তু জেম্স-ল্যাঙ তত্ত্ব মেনে নেননি। শেরিংটন নামে জনৈক বিশেষজ্ঞ এক কুকুরের শরীরের সংবেদনশীল স্নায়ুগুলোকে কেটে দেন। তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ

ভয় পেলে দৌড়োই না
দৌড়োলে ভয় পাই?

বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়ার পরেও তিনি দেখলেন, কুকুরটির মধ্যে রাগ, বিরক্তি, ভয় ইত্যাদি অনুভূতিগুলির দিব্যি অস্তিত্ব রয়েছে। পরবর্তীকালে আর একজন গবেষক মানুষের শরীরের 'অ্যাডরেনালিন' ইনজেকশনের সাহায্যে রক্তের চাপ, নাড়ির গতি বাড়ালেন। এ-ছাড়া রাগের সময়ে অন্যান্য যে-সব শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলিও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টির বন্দোবস্ত হল। অথচ যে-সব মানুষের উপরে এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তাঁরা এক বাক্যে বলেছিলেন, শারীরিক পরিবর্তনগুলি তাঁদের মনের মধ্যে আদৌ কোনো রাগের অনুভূতি নিয়ে আসেনি।

গত কয়েক দশকের গবেষণার ফলাফল থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশটিই খুব সম্ভবত প্রাণীদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। ইঁদুরের উপরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, অ্যানটেরিয়ার কমিশিওর (Anterior commısure) নামে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুচ্ছকে উত্তেজিত করলে ওদের মধ্যে এক ধরনের সুখের অনুভূতি হয়। মানুষের ক্ষেত্রে আবেগের সঙ্গে মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেম (Limbic system)-এর যোগসাজস আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখার কাজ চলছে।

মানসিক কারণে কি শারীরিক অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়?

শারীরিক কারণে তো অসুখ-বিসুখ হ'য়েই থাকে। কিন্তু মানসিক কারণেও কি শারীরিক অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়?

মানুষের শরীর এবং মনের মধ্যে যে-নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, অসুখ-বিসুখের ক্ষেত্রে তার হাজারো প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। বহুদিন ধরে অসুখ-বিসুখে ভুগলে লোকে যে খিটখিটে হয়ে যায় সে তো আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা।

অসুখ হলে কেউ কেউ আবার রীতিমতো মনমরা হয়ে পড়েন। অন্যদিকে সামান্য জ্বরে বা পেটের গণ্ডগোলেও অনেকে বেশ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অবশ্য এর উল্টোটাই ঘটে বেশি। অর্থাৎ যাঁদের মধ্যে আবেগ-উৎকণ্ঠা বেশি, শারীরিক অসুখ-বিসুখে তাঁরাই বেশি ভুগে থাকেন।

দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, মানসিক অস্থিরতা বা উত্তেজনার জন্য যে-সব অসুখের প্রকোপ নিশ্চিতভাবে বেড়ে যায় তাদের অন্যতম হল অ্যালার্জিজনিত অসুখ হাঁপানি। শুধু শ্বাসকষ্টই নয়, মানসিক অস্থিরতা বেশি হলে আমাদের শরীরে জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কাও যে বেড়ে যায়, এ-তথ্য হালে মিলেছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মানসিক টানাপোড়েন অথবা আতঙ্ক-উত্তেজনার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে অনেকেরই নাক সুড়সুড় করে, নাক দিয়ে জল ঝরে। জীবাণু-সংক্রমণের জন্যেই এমনটা হয়ে থাকে। টেলিভিসনে কিংবা সিনেমার পর্দায় খুনের দৃশ্য দেখে আচমকা হাঁপানি শুরু হয়েছে, এমন ঘটনা নেহাত বিরল নয়।

এরপরে আসে পেপটিক আলসারের কথা। জন্তু জানোয়ার তো বটেই, মানুষের উপরেও পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, অন্ত্রের দেওয়ালে যে ঝিল্লি-জাতীয় জিনিস থাকে মানসিক অস্থিরতার মুহূর্তে তার রঙ হয় টকটকে লাল। তা ছাড়া এই সময়ে পাচকরসের নিঃসরণও হঠাৎ ক'রে অনেকটা বেড়ে যায়। ক্রমাগত এটা হতে থাকলে পেটের ভিতর ঘা দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া আমাদের

আতঙ্ক-উত্তেজনায় বেশিক্ষণ কাটালে কি নাক সুড়সুড় করতে পারে?

শরীরের ভিতরে যে নানা ধরনের হরমোন নিঃসরণ হয়, তার বাড়া-কমাটাও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মাত্রাতিরিক্ত আবেগ বা উত্তেজনা থেকে নানা ধরনের চর্মরোগ, বাতজনিত উপসর্গ, গাঁটে ব্যথা, মাথা-যন্ত্রণা এমন কি বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

ক্যানসারের পিছনে কি মানসিক কারণ থাকতে পারে?

ক্যানসার কেন হয়, তার কারণ আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। কিন্তু ক্যানসারের পিছনে কি মানসিক কোনো কারণ থাকা সম্ভব?

হাল আমলের গবেষকদের মতে—ক্যানসার রোগের সূত্রপাত খুব সম্ভবত স্ফূর্তির অভাব থেকে। ক্যানসারের সঙ্গে আমাদের মনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সে-বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল 1946 সালে। ক্যারোলিন বেডেল নামে এক মার্কিন গবেষক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিলেন, যে-সব মেয়েরা ক্যানসারে ভোগেন তাঁদের গড়ন-গঠন অনেকটা আত্মহত্যাপ্রবণ রোগিনীদের মতই।

স্ফূর্তিতে থাকলে কি ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম?

গত দশকের গোড়ায়, সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে জনৈক মনোবিজ্ঞানী দেখলেন, যাঁরা সব সময়েই ধূমপান করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রচুর ধূমপান সত্ত্বেও ক্যানসারকে এড়িয়ে জীবনটা দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছেন। অথচ এমন অনেক ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান মিলছে যাঁরা খুব অল্পই ধূমপান ক'রে থাকেন। দেখা গেল, যাঁরা সব সময়েই মনমরা হয়ে থাকেন, কোনো ব্যাপারেই যাঁরা তেমন উৎসাহ পান না, তাঁরাই বেশি ক'রে ক্যানসারে আক্রান্ত হন।

এই কাজের সূত্র ধরে পরবর্তী কালের গবেষণায় দেখা গেল, যাঁরা অল্প ধূমপান ক'রেই ক্যানসারের কবলে পড়ছেন তাঁদের রক্তে অ্যারাইল হাইড্রোকার্বন হাইড্রক্সিলেজ-এর পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। এই এনজাইমের কাজ হল, সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে যে-হাইড্রোকার্বন ফুসফুসে যায়, সেই যৌগকে পরিবর্তিত ক'রে ক্যানসার সৃষ্টিকারী এক নতুন যৌগের জন্ম দেওয়া। এই এনজাইমটির তারতম্য বংশগতির ধারার উপরে যত না নির্ভর করে তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত হরমোনের উপরে। দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় 'মস্তিষ্ক' থেকে বেরিয়ে আসা ওই সব হরমোনের পরিমাণের হেরফের ঘটে। ফলে রক্তের এই বিশেষ এনজাইমটির পরিমাণও কম-বেশি হয়। যাঁরা হতাশাজনিত রোগে ভোগেন, তাঁদের রক্তে ওই এনজাইমের

পরিমাণও বেশি।

শুধু ফুসফুসের ক্যানসারই নয়, 'হজকিন্ ডিজিজ' বলে আর এক ধরনের ক্যানসার নিয়ে গবেষণা চলছে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস—শরীরে যে-বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে তার প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হল হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamas)। আবার মানসিক নানা ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গেও হাইপোথ্যালামাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জনৈক চিকিৎসকের ভাষায় ঃ দীর্ঘদিন ধরে মনমরা হয়ে থাকলে তার সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমজোরি হয়ে পড়ে। সেই ফাঁকে শরীরে ঢুকে পড়ে ক্যানসারের এজেন্টরা।

কোনো কোনো মানুষ আত্মহত্যা করে কেন?

মানসিক টানাপোড়েন আর যন্ত্রণাই আত্মহত্যার জন্য দায়ী। কোনো মানুষ একা থাকা অবস্থায় প্রচণ্ড মানসিক চাপের শিকার হলে এবং তা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজে না পেলে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ভালবাসার জনকে হারালে কিংবা কোনো বিষয়ে অকৃতকার্য হলে, তা সে পরীক্ষাতেই হোক বা চাকরি পাবার ব্যাপারেই হোক, লোকে মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। নিজের সম্বন্ধে হীন-মনোবৃত্তি বা কোনো ব্যাপারে সকলের কাছে ছোট হয়ে যাবার আশংকাও মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। কোনো বিষয়ে ক্রমাগত হতাশাও জীবন-ধারণকে কোনো কোনো মানুষের কাছে অর্থহীন করে তুলতে পারে। সারা জীবনে পরিত্রাণের আশা নেই এমন অসুখ, যেমন বিশেষ ধরনের ক্যানসার ইত্যাদি হলে রোগীর মনে আত্মহত্যার ইচ্ছে জাগাটা অস্বাভাবিক নয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মহত্যা ঘটে দুর্ঘটনার মতই আকস্মিকভাবে। ধরা যাক, কেউ তার নিজস্ব কোনো সমস্যায় আশপাশের পাঁচজনের সহানুভূতি চাইছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে এবং তার কথায় যে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না তাও বুঝতে পারছে। এর ফলে লোকটির মধ্যে হয়তো অন্যের প্রতি প্রচণ্ড রাগ তৈরি হল, সময়ে সময়ে তা প্রকাশের রাস্তা না পেয়ে নিজের দিকেই ছুটে আসতে পারে এবং সেই মুহূর্তে চরম হতাশায় নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলার ইচ্ছে জাগতে পারে লোকটির মনে। এর ফলে দুর্ঘটনার মতই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মানসিকভাবে সুস্থ লোকেদের ক্ষেত্রে অবশ্য এমনটা ঘটা সম্ভব নয়।

কে আত্মহত্যা করবে তা কি আগে থেকে বোঝা যায়?

বিশেষ কোনো শারীরিক এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ কিছু মানসিক অসুস্থতার মধ্যে মানুষ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা সে আশপাশের পাঁচজনকে সরাসরি বা হাবেভাবে জানাতেও চেষ্টা করে। কেউ হয়তো মদ জাতীয় নেশার জিনিস খাওয়ার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেন। কেউ হয়তো আত্মহত্যা সম্পর্কে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন অথবা রোজনামচার খাতায় লেখালেখি করেন। সবচেয়ে বড় কথা, এঁরা প্রায় সকলেই কোনো না কোনো অবসাদে ভোগেন। এসবই হল আত্মহত্যার পূর্বলক্ষণ। দুঃখের ব্যাপার, এদের আচার আচরণের পরিবর্তনটা প্রায়শই কারো চোখে পড়ে না। সরাসরি হোক বা হাবভাবেই হোক, আত্মহত্যার ইচ্ছের ব্যাপারটা জানানোর উদ্দেশ্য শুধু নিজের জীবন সম্বন্ধে অনীহাই নয়, সেই সঙ্গে বিশেষ কারোর সাহায্য প্রার্থনা করা। সেই প্রার্থনা যখন ব্যর্থ হয় তখনই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় অবসাদগ্রস্থ মানুষটি।

ভিড়-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি আচার-আচরণ বদলায়?

ভিড় কম হলে আচরণ যে-রকম হয়, ভিড় বাড়লে কি আচরণ একই থাকে, না বদলে যায়?

মনুষ্যেতর প্রাণীদের বেলায় দেখা গেছে, একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সংখ্যাধিক্য ঘটলে ওদের নানা ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ শুরু হয়। এ-ব্যাপারে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পাহাড়ী ইঁদুর 'লেমিং'-এর খ্যাতি জগৎজোড়া। প্রতি তিন চার বছর পর পর এই প্রাণী পাহাড় থেকে কাতারে কাতারে নেমে এসে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরে। গবেষণাগারে প্রাণীটির শরীরে ছুরি-কাঁচি চালিয়ে দেখা গেছে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে ওদের মস্তিষ্ক এবং অ্যাডরেনাল গ্রন্থির সক্রিয়তায় হেরফের ঘটে। ওদের মধ্যে আত্মহত্যার ইচ্ছে জেগে ওঠার সেটাই হয়তো মূল কারণ।

অদৃশ্য গণ্ডি টেনে বনে-জঙ্গলে নিজের নিজের এলাকা ভাগ ক'রে নেওয়ার ব্যাপারটা বানর, শিম্পাঞ্জী এবং বেবুনের মত প্রাণীদের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। ঘটনাচক্রে এক দলের এলাকায় অন্যদল ঢুকে পড়লে এরা রীতিমতো অশান্ত হয়ে ওঠে। পাখিদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—সংখ্যাধিক্যের দরুন ঘোরাফেরার জায়গা কমে এলে এরা আপনা থেকেই ডিম পাড়া কমিয়ে দেয়।

প্রায় দু'দশক ধরে গবেষণাগারে চার দেওয়ালের মধ্যে ইঁদুরদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে জন ক্যালহন দেখেছেন, বদ্ধ খাঁচায় ইঁদুরের সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে অদ্ভুত সব আচার-আচরণ করতে থাকে ওরা। পুরুষ ইঁদুরদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা খাঁচার সবচেয়ে খোলামেলা জায়গার প্রায় সবটাই দখল করে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইঁদুররা অল্প জায়গায় গাদাগাদি ক'রে চুপচাপ মনমরা হয়ে প'ড়ে থাকে। শারীরিক পরীক্ষায় এই সব ইঁদুরের কিডনি, লিভার এবং অ্যাডরেনাল গ্রন্থিতে নানা ধরনের বিকৃতি নজরে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এক জায়গায় অনেক ইঁদুর জড়ো হওয়ার ফলে এরা যে স্নায়ুর চাপে ভোগে ওই-সব অস্বাভাবিকত্বই তার প্রমাণ। তেমনি ভিড়ের চাপে যে আমাদের আবেগ-অনুভূতি-আচার-ব্যবহারে হেরফের ঘটে, এ-যাবৎ কালের গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। এক দল গবেষকদের মতে ভিড় যত বাড়ে মানুষ ততই বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। ভিড়ের মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষ অল্পেতেই রেগে ওঠে, সামাজিক বাধা-নিষেধের তোয়াক্কা করে না। আবার অন্যদিকে একাকীত্বের দরুন সে সব সময়েই হতাশা আর দুশ্চিন্তায় ভুগে থাকে। ভিড় মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধকে ধাক্কা দেয়, ফলে তার মনের উপর চাপ পড়ে। এই মানসিক চাপই সময়ে সময়ে নানা বিষয়ে বে-বনিবনা আর ক্লান্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

ঘিঞ্জি পরিবেশে কি অপরাধমূলক ঘটনা বেশি ঘটে ?

আমাদের একটা ধারণা আছে, ঘিঞ্জি পরিবেশে অপরাধমূলক ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

ভিড়ের শহরগুলির বৈশিষ্ট্য হল, সেখানকার মানুষ একে অপরের ব্যাপারে বড় বেশি নিস্পৃহ। উঁচু তলার বাড়িগুলোর পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বছরের পর বছর বাস করা সত্ত্বেও একে অপরের নাম জানেন না, এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর সব শহরেই বেড়ে চলেছে। শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় সঙ্কীর্ণ ঘরে গাদাগাদি হয়ে থাকার ফলে বাসিন্দাদের মানসিক স্বাস্থ্য যে রীতিমতো বিপন্ন হয়, এমন কথাও বলে থাকেন বিশেষজ্ঞরা।

জনসংখ্যার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতার একটা সুপ্ত সম্পর্কও লক্ষ্য করেছেন মনোবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ। জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়লে অপরাধের ঘটনাও বাড়বে, এ-তত্ত্ব অনেকে অবশ্য স্বীকার করেন না। এঁদের মতে, কোনো শহরে কী পরিমাণে অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটবে তা অনেকটা নির্ভর করে সে অঞ্চলের সামাজিক রীতিনীতির উপরে। ওঁরা দেখিয়েছেন, ইউরোপ-আমেরিকার অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল শহরগুলির তুলনায় টোকিও ব্যাঙ্ককের মত জনবহুল শহরে অপরাধের ঘটনা ঘটে অনেক কম। হংকং-এর ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায়—যেখানে একটা মাত্র ঘরে এক বা একাধিক পরিবারকে বসবাস করতে হয়—এমন চার হাজার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখা গেছে, মুখে স্থানাভাব এবং নির্জনতার অনুপস্থিতির ব্যাপারে অনুযোগ প্রকাশ করলেও এরা কোনোরকম মানসিক চাপে ভোগেন না।

জনসংখ্যার সঙ্গে অপরাধ প্রবণতা কিংবা মানসিক অসুস্থতার সম্পর্ক নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব যে কমে আসে, তা বহু সমীক্ষাতেই ধরা পড়েছে। ডরমিটরি বা মেসবাড়ি জাতীয় জায়গায়, যেখানে বহু অনাত্মীয় মানুষকে এক সঙ্গে থাকতে হয়, সেখানে লোকজন সাধারণত খানিকটা ঘরকুনো স্বভাবের হয়ে থাকেন। আশেপাশের মানুষজন সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ প্রায় থাকে না বললেই চলে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, হস্টেলের ছেলেমেয়েদের তুলনায় নিজস্ব বাড়িতে খোলামেলা পরিবেশে থাকতে যারা অভ্যস্ত তাদের মধ্যে অন্যকে সাহায্য করার ইচ্ছেটা থাকে অনেক বেশি।

মানুষের মনে কি চাঁদ-সূর্যের প্রভাব পড়ে ?

আমাদের মনে কি চাঁদ-সূর্য প্রভাব ফেলে?

পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে অনেকেরই মানসিক ভারসাম্যের অভাব ঘটে সে বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। 1956 থেকে 1970, এই পনেরো বছরে আমেরিকার ফ্লোরিডার এক বিশেষ অঞ্চলে খুন-জখমের ঘটনার অধিকাংশই ঘটেছিল পূর্ণিমার রাতে। খুন-জখমের কথা বাদ দিলেও, বেশ কিছু মানসিক রোগের ক্ষেত্রে যে চাঁদের একটা বড়সড় ভূমিকা থাকে, এমন একটা ধারণাকেও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। মানসিক রোগীদের 'লুনাটিক' বা 'চন্দ্রাহত' বলার রেওয়াজ এখনও রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাল্‌ফ্ মরিস দেখেছেন, পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের রক্তচাপ ও হৃদ্‌স্পন্দনের গতি বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। পূর্ণিমার রাত্রে শরীরের মেটাবলিজম্ বা বিপাক ক্রিয়ার হার যেমন বাড়ে তেমনি রক্তক্ষরণ এবং এপিলেপটিক-ফিট-এর ঘটনাও বেশি ক'রে ঘটতে দেখা যায়। হাল আমলের গবেষণায় জানা গেছে, আমাদের বিপাক ক্রিয়া নাকি চান্দ্র-মাসিক চক্রে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ পূর্ণিমার সময়ে যে বিপাক ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি জোরদার, অমাবস্যার সময়ে তা কমতে কমতে দুর্বলতম অবস্থায় এসে ঠেকে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, প্রাণীদের বিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের হয়তো একটা সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটলে তার প্রভাব পড়ে আমাদের শরীর-মনে। আবার ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন যেমন চাঁদের কলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, তেমনি সৌরকলঙ্কের তারতম্যও পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের হেরফের ঘটায়। যে-বছর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়, অর্থাৎ যে-বছর সূর্য অন্য বছরের তুলনায় বেশি মাত্রায় সক্রিয় থাকে, সে বছর নাকি মানুষের হৃদ্‌স্পন্দনের হার বাড়ে, ফলে হৃৎপিণ্ড খানিকটা কমজোরি হ'য়ে পড়ে। আবার ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটলে তার ছাপ পড়ে কিছু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু জায়গায়। এতে আমাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের হেরফের ঘটে। সম্ভবত স্মৃতিশক্তিও ঠিকমত কাজ করে না। এর ফলে মনের মধ্যে উদ্ভট-অবাস্তব সব চিন্তা-ভাবনা আর মানসিক অস্থিরতা দেখা দেওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়।

অতিরিক্ত কল্পনা কি মানসিক বিপত্তি ঘটায়?

কেউ খুব বাস্তববাদী। কেউ আবার কিছুটা কল্পনাপ্রবণ। কেউ আবার লাগাম ছাড়া কল্পনায় উড়ে যেতে ভালবাসে। অতিরিক্ত কল্পনা কি মনের কোনো বিপত্তি ঘটাতে পারে?

অলীক কল্পনা বা দিবাস্বপ্ন অবশ্যই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। এগুলি নিষ্ক্রিয় বলে যাঁরা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা ক্রমেই যে বাস্তব-বিমুখ হয়ে পড়বেন তাতে আর সন্দেহ কি! শিশুদের কল্পনাবিলাস বা ফ্যান্টাসির কথাও এ-প্রসঙ্গে এসে পড়ে। ছোট ছেলেমেয়েরা বারান্দার রেলিঙগুলোকে মানুষ কল্পনা ক'রে ঝগড়া করে, লাঠির বাড়ি মারে। ছোট মেয়েরা পুতুলকে নিজের ছেলেমেয়ে ভেবে জামা-কাপড় পরায়, খাওয়ায়, শোওয়ায়। এ-সবই নিষ্ক্রিয় কল্পনা, বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা যত বাড়ে আমাদের কল্পনা ততই তার নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে অভিজ্ঞতা-নির্ভর হয়ে ওঠে। যা কখনো দেখিনি বা শুনিনি তা আর আমাদের কল্পনায় আসে না। কল্পনার সঙ্গে স্মৃতির একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। যাদের স্মৃতি দুর্বল, তাদের কল্পনাতেও নানা অসঙ্গতি থেকে যায়। ধরা যাক, পক্ষিরাজের বর্ণনা শোনার পর কেউ যদি তা ঠিক ঠিক মনে করতে না পারে তবে পক্ষিরাজের কল্পনায় সে ঘোড়ার বদলে একটা বড়সড় পাখির কথাই হয়তো ভেবে বসবে।

অনেক সময় আমরা বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানা ধরনের কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকি। যেমন কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে আমরা কখনও কখনও কল্পনার আশ্রয় নিই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাপারটা বুঝতে গিয়ে আমরা কল্পনা করি, গাছ থেকে একটা ফল যেন টুপ ক'রে মাটিতে পড়ছে। আবার কবি বা শিল্পীরা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং সেগুলি বুঝতে গিয়ে আমাদের সময়ে সময়ে কল্পনার পাখা মেলতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদরা কোনো যন্ত্র বা ওষুধ-পত্রের মত নতুন কিছু উদ্ভাবনের সময়ে কী করেন? তাঁরা মনে

বিজ্ঞানীরাও কি কল্পনা করেন?

মনে তার একটা ছক ঠিক ক'রে নেন। এটাও তো কল্পনা। তবে হ্যাঁ, এ কল্পনা হঠাৎ ক'রে মাথায় আসে না, এর পিছনে থাকে কতকগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানসিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানা ধরনের কার্যকরী কল্পনার আশ্রয় নেওয়াটা অবশ্যই দরকারী। কিন্তু অবাস্তব কল্পনা মানুষের জীবনের উন্নতির পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়।

মানুষের চোখে-মুখে কি চিন্তার ছাপ পড়ে?

মানুষের চোখ-মুখ কি মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি?

অনেক সময়েই মানুষের চোখ দেখে বলে দেওয়া যায়, সে নিবিষ্ট মনে কোনো কিছু চিন্তা করছে কিনা। কিছুদিন আগে এ-ব্যাপারে কিছু লোকের উপর একটা পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। যাদের উপর পরীক্ষা চলে, তাদের প্রত্যেককে একটা ঘরে বসিয়ে কতকগুলি আলোকচিত্র দেখানো হয়। প্রোজেকটারের সাহায্যে দেওয়ালের পর্দায় যখন একটার পর একটা ছবি ফেলা হচ্ছিল, তখন মুভি ক্যামেরার সাহায্যে দর্শকদের অজান্তেই তাদের চোখের মণির নড়াচড়ার ছবি অন্ধকারের মধ্যেই তুলে নেওয়া হয়েছিল। অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য ইনফ্রা রেড রে বা অবলোহিত রশ্মির সাহায্য নেওয়া হয়। পরে দেখা গেল, বিশেষ বিশেষ ছবি পর্দায় দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের তারারন্ধ্রের আকার-আকৃতিও পালটেছে। আর বাচ্চাদের ছবি দেখানোর সময়ে মহিলা দর্শকদের চোখের মণি আকারে সবচেয়ে বড় হয়েছে।

দ্বিতীয় আর একটি পরীক্ষায় কিছু লোককে কয়েকটি বুদ্ধির অঙ্কের সমাধান করতে বলা হয়। নজরে এল, অঙ্কটা যেই দেওয়া হচ্ছে, লোকদের চোখের মণিও অমনি বড় হতে শুরু করছে। আর যতই তারা অঙ্ক নিয়ে চিন্তা করছে, তার সমাধানের পথে এগোচ্ছে, তাদের চোখের মণির আকার ততই বেড়ে চলেছে। মনের কথাটা চোখের মধ্যে দিয়ে সব সময়ে টের পাওয়া না গেলেও কোনো পড়ুয়ার মন টেবিলের উপর খোলা বইয়ের পাতায়, নাকি অন্য কোথাও—সেটা তার চোখের মণির আকার-আকৃতি আর নড়াচড়ার ধরন দেখে বলে দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

গভীরভাবে চিন্তার সময়ে অনেকে হাঁটু বা পা দোলায় কেন?

যখন আমরা গভীরভাবে কোনো চিন্তা করি, বিশেষ ক'রে কম সময়ের মধ্যে অনেকগুলি কাজ করার চিন্তা যদি মাথায় থাকে, তবে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আমরা নিজেদের অজান্তেই হাঁটু বা পা দোলাচ্ছি।

এর কারণ কি? এটাকে তাড়াতাড়ি কিছু করার বা এগিয়ে চলার প্রতীক হিসেবে ধরা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে—ছোটবেলার ছটফটে ভাবটাই, যেমন বেঞ্চির উপর বসে পা দোলানো কিংবা নকল ঘোড়ায় চড়ার অভ্যেসটা আবার গভীর চিন্তার সময়ে আমাদের আচরণে ফিরে আসে।

শারীরবিজ্ঞানীদের মতে—চিন্তার সময়ে হাঁটু বা পা দোলানো এক ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া—এটার সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদের বিনা কারণে পা বা হাঁটু দোলানোর তুলনা চলে। বয়স্ক মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় এমনটা করেন না, কারণ আমাদের গুরু মস্তিষ্ক এতে বাধা দেয়।

গুরু মস্তিষ্ক কাকে বলে?

মস্তিষ্কের অনেকগুলি ভাগ আছে। গুরু মস্তিষ্ক (Cerebral cortex) মস্তিষ্কের উচ্চতম কেন্দ্র। শরীরের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতম কেন্দ্র গুরু মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের এবং সারা শরীরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। গভীরভাবে চিন্তার সময়ে গুরু মস্তিষ্ক ব্যস্ত থাকে বলে হাঁটু বা পা দোলানোর ব্যাপারটায় তার কোনো বাধা থাকে না। গুরু মস্তিষ্কের অজান্তেই যেন ব্যাপারটা ঘটে যায়।

মানসিক রোগ বলতে কি বোঝায়?

মানসিক রোগ কথাটা কখনও কখনও শুনি এবং বলেও থাকি। কিন্তু মানসিক রোগ কাকে বলে?

মানসিক রোগ বলতে সেই সব অসুখ-বিসুখকেই বোঝায় যার ফলে রোগীর চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণে অসঙ্গতি দেখা দেয়। স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় মানসিক রোগীদের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশও হয় ভিন্নতর। মানসিক রোগকে

সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এক ভাগে পড়ে সেই সব খুঁটিনাটি অসুখ-বিসুখ যার স্থায়িত্ব সাময়িক—যেমন বেশি মাত্রায় উৎকণ্ঠা, ক্রমাগত হাত ধোওয়া বা জামা-কাপড় কাচার বাতিক কিংবা কোনো কিছুতে অহেতুক ভয়। ইংরেজিতে এ-সবকে বলে নিউরোসিস (Neurosis)। মানসিক রোগের দ্বিতীয় ধরন সাইকোসিস (Psychosis)। এই ধরনের অসুখ-বিসুখ রোগীর ব্যক্তিসত্তার মূল ধরে টান দেয়। এমনই একটা অসুখ হল 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া'—ভয় বা বৈচিত্র্যের দিক থেকে এর জুড়ি মেলা ভার। ইউরোপ-আমেরিকায় প্রতি হাজার জনের মধ্যে এক থেকে তিনজন আজ এ-রোগে ভুগছেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে এ-রোগের প্রকোপ অনেক বেশি। বস্তুত মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্যে যাঁরা হাসপাতালে আসেন তাঁদের অধিকাংশই এ-রোগের শিকার। বিশেষ কিছু উপসর্গ থেকে এই মারাত্মক মানসিক রোগটিকে চিনে নেওয়া যায়। প্রথমত স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগীদের কাছে আশপাশের কোনো কিছুই ভাল লাগে না। রোগী ক্রমশ বাস্তব পরিবেশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং আশেপাশের সব কিছু থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ-রোগটার দ্বিতীয় উপসর্গ হল, চিন্তার ক্ষেত্রে অসঙ্গতি বা এলোমেলোভাব। যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এই ধরনের রোগীরা চিন্তা করতে পারে না। স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় রোগীদের আবেগ-অনুভূতিগুলিও ভোঁতা হয়ে যায়। নিজের বাড়িতে কিংবা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কারোর বড়সড় দুর্ঘটনার খবর এদের মনে দুঃখের অনুভূতি জাগায় না। ফলে দুঃখের সময়ে এরা হয়তো হাসতে পারে, কিংবা উল্টোটাও হয়।

বসে থাকা, দাঁড়ানো, চলা-ফেরার ভঙ্গি থেকেও স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগীদের চিনে নেওয়া যায়। যে কোনো ব্যাপারেই এদের মধ্যে উদ্যমের একটা প্রচণ্ড অভাব থাকে। সময়ে সময়ে এরা একই কথা অর্থহীনভাবে বারবার বলে, একই কাজ বারবার ক'রে যায়। স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগাক্রান্ত মানুষদের অধিকাংশই কোনো না কোনো ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে পড়ে। দেখা বা শোনার ভুলও এদের হামেশাই হয়। তবে তার চেয়েও বড় কথা বাস্তবে অস্তিত্ব নেই এমন সব অলীক দৃশ্য বা গল্প এদের মন জুড়ে থাকে। স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগাক্রান্তরা অনেক সময়ে ভাবে, তাকে নিয়ে অন্যেরা বুঝি আলোচনা করছে, তার মনের কথা যেন অন্য লোকে টের পাচ্ছে, তার শত্রুরা তাকে দিয়ে খারাপ কাজ করাচ্ছে। অথবা সে যেন একটা কোনো বিরাট কাজ ক'রে ফেলছে।

মানসিক রোগ কি বংশগত?

মানসিক সব রোগই কি এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে যায়?

মানসিক রোগ জন্মগত, নাকি এর জন্য রোগীর পরিবেশই দায়ী তা নিয়ে মতবিরোধ আছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। সত্তরের দশকের গোড়ায় আমেরিকায় এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, স্বামী বা স্ত্রী—এদের যে কোনো একজন স্কিৎসোফ্রেনিয়া জাতীয় মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে শতকরা 45টি ক্ষেত্রে তাঁদের শিশুরাও কোনো না কোনো সময়ে এ-রোগের শিকার হয়। এ ছাড়া এই ধরনের

বিশেষ পারিবারিক আবহাওয়া কি বংশ পরম্পরায় মানসিক রোগ নিয়ে আসতে পারে?

রোগীদের ভাই-বোন, বিশেষ ক'রে যমজ ভাই-বোনদের মধ্যেও, এ-অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। এ-সবের ফলে অনেকেরই বিশ্বাস, এ-ধরনের মানসিক রোগ বংশগত। তবে সবাই এ-মতটা মানেন না। তাঁদের বক্তব্য, 'বেরিবেরি' রোগ যা ভিটামিনের অভাবের জন্য হয়ে থাকে, তা বিশেষ বিশেষ পরিবারে বংশ পরম্পরায় চলে এলেও এটা যে জিন-ঘটিত রোগ নয়, তার নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে। আসলে, বিশেষ কোনো পরিবেশ বা বিশেষ কিছু খাওয়া না খাওয়ার অভ্যেসটা চলে আসে বংশ পরম্পরায়। সে-ক্ষেত্রে কয়েক পুরুষ ধরে কোনো পরিবারের মানুষদের মধ্যে ভিটামিনের অভাব থেকে যেতেই পারে। স্কিৎসোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রেও বংশগতির বদলে বিশেষ ধরনের পারিবারিক আবহাওয়াই যে এ-রোগ ডেকে আনে না তাই বা কে বলতে পারে? তা ছাড়া গত তিন-চার দশকের হিসেবে দেখা গেছে, যে কোনো দেশের জনসংখ্যার সাপেক্ষে সেখানকার

স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগীর সংখ্যা মোটামুটি স্থির—গড়ে প্রতি হাজার জনে একজন। অসুখটা পুরোপুরি বংশগত হলে এটা কখনোই সম্ভব হত না। ঠিক তেমনই আমাদের শরীরের মধ্যে বিশেষ ধরনের জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন কিংবা বিশেষ কিছু গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণের হার বাড়া-কমার ফলে এ-রোগ হয় কিনা সে ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি।

'নিউরোসিস' বলে চিহ্নিত মানসিক রোগ—যেমন, অহেতুক ভয় বা ফোবিয়া, মানসিক উৎকণ্ঠা, বিশেষ কোনো জিনিস বারবার করার বাতিক, পরিভাষায় যার নাম 'অবসেসিভ কম্‌পালসিভ নিউরোসিস'—এ-সবের ক্ষেত্রে বংশগতির কোনো ভূমিকাই অবশ্য নেই। এ-সব রোগের জন্যে রোগীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং আশৈশব শিক্ষা ও নানা ধরনের অভ্যেসই দায়ী।

ছোটবেলার পরিবেশই কি মানসিক রোগের জন্য দায়ী?

ছোটবেলাকার পরিবেশ মানসিক রোগের কতটা কারণ হয়ে দাঁড়ায়?

মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা—প্রায় যাবতীয় মানসিক রোগের পিছনেই রোগীর ছোটবেলাকার পারিবারিক পরিবেশ এবং নানা বিষয়ে বিরূপ অভিজ্ঞতার একটা বড়সড় ভূমিকা থাকে। 1956 সালে জনৈক মনোবিজ্ঞানী 568 জন মানসিক রোগীর বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছিলেন, এদের মধ্যে শতকরা 41 জনই পনেরো বছর বয়স হবার আগেই বাবা অথবা মা-কে হারিয়েছিলেন—তা সে যে কোনো কারণেই হোক।

ছোটবেলায় বাবা-মা-ঠাকুমা বা পরিবারের অন্য কারো কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত আদর পাওয়ার ফলে পরবর্তীকালে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ ছোটবেলায় আদরের প্রাচুর্য অথবা স্নেহের অভাব, এ-দু'টোই শিশুকে বাস্তববিমুখ ক'রে তোলে এবং এই বাস্তববিমুখতা যে শিশুটির মানসিক দিক থেকে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরা একমত। আবার একই বিষয়ে বাবা-মার আচরণ যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে তাও শিশুর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াই শিশুটির পরবর্তী জীবনে মানসিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন, বাবা হয়তো তার শিশুসন্তানকে কোনো কাজ করতে বললেন, কিন্তু মা বললেন তার ঠিক উল্টোটা—এতে শিশুটি স্বভাবতই মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়বে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই পরবর্তী জীবনে মানসিক অস্থিরতার বীজ লুকিয়ে থাকে।

মনে মনে শিশু হয়ে যাওয়াটাও কি মানসিক রোগ?

মানসিক রোগের পিছনে হতাশারও একটা দিক আছে। ধরা যাক, কোনো মানুষের ছোটবেলাটা কেটেছে প্রচুর আদর-যত্ন ভালবাসার মধ্যে, সবাই শিশুটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুতরাং শিশুটির স্থির বিশ্বাস, সে সত্যিই খুব ভাল। এইভাবে এক সময়ে সে কৈশোর-যৌবনে পৌঁছোয়, বৃহত্তর জগতের লোকজনের সঙ্গে তাকে মিশতে হয় এবং ঘটনাচক্রে তাদের কাছ থেকে আর তেমন কোনো স্বীকৃতি তো পায়ই না, উল্টে হয়তো বড় রকমের আঘাতই আসে। ঘটনাটা ক্রমাগত ঘটতে থাকলে এমন একটা সময় দেখা দিতে পারে যখন সেই কিশোর বা যুবকটি বাস্তব জগতের আর পাঁচজনের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ছোটবেলার সুখকর স্মৃতিগুলির মধ্যে আশ্রয় নিতে চাইবে। মনে মনে আবার শিশু বনে যাওয়া এবং শৈশবের দিনগুলোর মধ্যে ডুবে থাকা—ইংরেজিতে যাকে বলে 'রিগ্রেসান'—এটাও মানসিক রোগের উপসর্গ।

হিস্টিরিয়ার রোগীরা হাত-পা ছুঁড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় কেন?

হিস্টিরিয়া রোগীরা যখন অজ্ঞান হয়, তখন দেখা যায়, তারা অনেক সময় হাত-পা ছোঁড়ে। কেন?

হিস্টিরিয়া এক ধরনের মানসিক ব্যাধি, যাকে অনেক সময়েই আমরা 'ভূতে ধরা' বা 'দেবতার ভর হওয়া' বলে ভুল ক'রে থাকি। হিস্টিরিয়া অসুখের চারটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, এতে যে সব রোগ-লক্ষণ দেখা যায় তার কোনো শারীরিক ভিত্তি থাকে না। ফলে এ-রোগের লক্ষণ হিসেবে পক্ষাঘাত থেকে শুরু ক'রে হার্টের অসুখ, ফিট বা তড়্কা

যাই হোক না কেন, সেটা পুরোটাই নকল—তাকে একরকম অভিনয়-ই বলা চলে। তার মানে এই নয় যে, এতে রোগীর কোনো শারীরিক কষ্ট নেই, আসলে রোগী যে কষ্ট পায় তার সবটাই প্রায় তার মনগড়া।

হিস্টিরিয়ার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, উপসর্গগুলি নিয়ে রোগীর দিক থেকে বাড়াবাড়ি। হয়তো সামান্য মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, অন্যের সহানুভূতির আশায় শারীরিক কষ্টটাকে বহুগুণ বড় ক'রে প্রচার শুরু হল রোগীর তরফে। হয়তো কোনো অসুখ করেছিল, ওষুধ খেয়ে তা সেরে যাওয়ার পরেও রোগী বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তাঁর অসুখ আদৌ সারেনি। এর মধ্যেও সেই অন্যের কাছ থেকে সহানুভূতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

এ-রোগের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শারীরিক বৈকল্যের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময়ে সত্যি সত্যিই তার শিকার হওয়া। যেমন কেউ ভাবতে লাগল তার একটা হাত অকেজো হয়ে গেছে। হাতটাকে দীর্ঘদিন ধরে নিশ্চল ক'রে রাখার ফলে এর পরে সত্যি সত্যিই হাতের জোর কমতে পারে, হাত দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। হিস্টিরিয়ার আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, এতে সময়ে সময়ে সাংঘাতিক সব মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন কেউ যেন সত্যি সত্যি ভগবানের কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন এবং 'ভরে'র সময়ে তা লোকদের জানিয়ে দিচ্ছেন।

হিস্টিরিয়া ও মৃগী কি একই ধরনের রোগ?

হিস্টিরিয়ার রোগীরা যে অনেক সময়ে হাত-পা ছুঁড়ে ফিট বা অজ্ঞান হয়ে যান, সেটা প্রায়শই অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করাই এ-ধরনের অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য, সেজন্যেই রোগীরা অজ্ঞান হবার আগে হাত-পা ছুঁড়ে থাকে। তা ছাড়া অন্যের সহানুভূতিটাও বেশি ক'রে পাওয়া যায়। মৃগী রোগীদের অসুখটা স্নায়বিক। সেই কারণেই মৃগী রোগীরা অজ্ঞান হওয়ার আগে মোটেই হাত-পা ছোঁড়ে না। বরং অনেক সময়ে তারা সকলের অলক্ষ্যেই রান্নাঘরে বা বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আশেপাশে মানুষজনের উপস্থিতি ছাড়া হিস্টিরিয়ার রোগীরা কখনোই অজ্ঞান হয়ে পড়ে না।

অতিরিক্ত শোকে কি লোকে মানসিক ভারসাম্য হারায়?

নিকটজন মারা গেছে শুনে কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে কিংবা প্রকৃতির রোষে নিরাশ্রয় হয়ে মানুষ উন্মত্তের মত আচরণ করতে শুরু করেছে, এমন ঘটনার কথা আমরা কে না শুনেছি? যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বংসলীলা দেখে কত তরুণ জওয়ান নিশ্চল পাথরের মত হয়ে যায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনার পরেও তারা বহু দিন হতাশা আর আতঙ্কে দিন কাটায়। তবে আশার কথা, পরিস্থিতি-জনিত কারণে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হলেও তা একান্ত সাময়িক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভারসাম্য আবার ফিরে আসে। কারোর ক্ষেত্রে এটা ঘটে তাড়াতাড়ি, কারোর ক্ষেত্রে বা একটু দেরিতে।

সাধারণত শোকের ঘটনাটি ঘটার পরে সেই ঘটনার কথা শুনে আমাদের ব্যক্তিসত্তায় যে ধাক্কা লাগে তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। এই অবস্থাকে অনেক সময় বলা হয়, 'শোকে পাথর হয়ে যাওয়া।' শোকস্তব্ধতা যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, শোকার্ত মানুষটির স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে ততই বেশি সময় লাগে। স্তব্ধতার পরেই আসে হতাশার পর্ব। শোকগ্রস্ত মানুষটি এই পর্বেই নিজের ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক ধারণাটা করতে পারে এবং ক্ষতির কারণগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করে। পাশাপাশি নৈরাশ্য আর ক্ষতির উপলব্ধি মানুষটিকে নতুন করে উদ্যমী হতে বাধা দেয়। এটাই হল যথার্থ শোকের পর্ব। এরপর তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে মানুষ শোক কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টায় নামে। এই সময়টায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে মানসিক সমর্থন তার একান্ত প্রয়োজন। যারা শোকে মানসিক ভারসাম্য হারায়, তারা আসলে বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায়। এদের মধ্যে আবার আশার আলো জাগিয়ে তুলতে পারলে এরা মানসিক ভারসাম্য ফিরে পায়।

শোকে মানসিক ভারসাম্য হারানো কি বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে?

মানসিক রোগ কি সারে?

মানসিক রোগ সারে কি সারে না, এ-নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে একটা সংশয় আছে। কিন্তু মানসিক রোগের সূত্রপাত কোথা থেকে তা জানতে পারলে মানসিক রোগ সারানো মোটেই কষ্টকর নয়। যেমন, মানসিক রোগী যদি নিজেকে বিরাট কেউকেটা বলে মনে করে এবং তার সঙ্গে কথা বলে কোনো মনোবিজ্ঞানী যদি বোঝেন যে, রোগী তার অতীত জীবনের ব্যর্থটাকে ঢাকতেই এমনটা করছে, সে-ক্ষেত্রে তার ভুল শুধরে দেওয়ার কাজটা বর্তায় মনোবিজ্ঞানীর উপরে। উদাহরণ হিসেবে এক রোগীর কথা বলা যায়। সেই রোগী মনে করে, সে বিরাট বিদ্বান, পৃথিবীর সব বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সর্বোচ্চ ডিগরি দিয়েছে। এ-ক্ষেত্রে রোগী, তার পরিবারের লোকজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলে হয়তো জানা গেল, রোগীর এক সময়ে খুব আশা ছিল, সে বিরাট পণ্ডিত হবে, অনেক অর্থ উপার্জন করবে। ঘটনাচক্রে ছেলেটি হয়তো কলেজের গণ্ডীও ডিঙোতে পারেনি এবং নিজের ব্যর্থতার হতাশা থেকে মুক্তি পেতেই উদ্ভট সব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে। এ-ক্ষেত্রে তাকে ঠিকমত বুঝিয়ে বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে তার উপসর্গগুলির নিরাময় হতে পারে।

**'সর্পগন্ধা' কি মানসিক রোগ নিরাময়
ওষুধ তৈরির গাছ?**

মনোবিজ্ঞানীদের একদল অবশ্য মানসিক রোগের সূত্র খুঁজে বের করার বদলে মানসিক রোগীদের মধ্যে স্বাভাবিক আচার-আচরণের অভ্যেস গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ওঁদের মতে, ভুল অভ্যেসের ফলে মানুষের মধ্যে যে বাতিক বা আতঙ্ক বাসা বাঁধে তাকে সঠিক অভ্যেসের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারলেই তার আর কোনো উপসর্গ থাকে না। যে লোকটার হাত ধোওয়ার বাতিক আছে, কল খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থায় তার হাতে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে বার বার হাত ধোওয়ার প্রবণতা থেকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন মনোবিজ্ঞানীদের ওই বিশেষ দল।

ওষুধের সাহায্যে মানসিক রোগের চিকিৎসাও বহুদিন থেকে প্রচলিত। মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশেরই 'সর্পগন্ধা' গাছ থেকে 'রেসারপিন' নামে ওষুধ তৈরি হয়েছিল এখন থেকে প্রায় চার দশক আগে। স্কিৎসোফ্রেনিয়ার মত মারাত্মক রোগেও বেশ সুফল মিলেছিল এতে। পরবর্তী কালে 'ক্লোরপ্রোমাজাইন' এবং অন্যান্য সব ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে যা মানসিক রোগের উপশমে অনেক বেশি কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ-কারণেই মানসিক রোগীদের এখন আর দিনের পর দিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয় না।

শারীরবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন, মানসিক রোগ নাকি আসলে শরীরের জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যই হয়ে থাকে। দেখা গেছে, 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া' রোগে ব্যবহৃত 'ক্লোরপ্রোমাজাইন' জাতীয় ওষুধের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যার দরুন তারা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যেকার 'ডোপামাইন' নামে একটা বিশেষ রাসায়নিকের কাজকে বাধা দিতে পারে। এ থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যখনই কোনো মানুষের মস্তিষ্কে 'ডোপামাইন' বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনই মানুষটি স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। পরে দেখা গেছে, 'ডোপামাইন' বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের মধ্যে 'প্রোলাকটিন' নামে এক ধরনের হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। এ থেকে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে বাইরে থেকে শরীরে হরমোন প্রয়োগ ক'রে মানসিক রোগীদের অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ ক'রে তোলাটা হয়তো সম্ভব হবে।

বিচিত্র প্রশ্নমালা



বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজ বহির্বিশ্বে সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্দর মহলের হেঁসেল খানার ভিতরেও যে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সে কথা সব সময়ে আমাদের মনে থাকে না। আজ বহির্জগতের মত আমাদের ঘরোয়া জীবনের পরিমণ্ডলে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ নিত্য নজরে আসে, তা আমাদের ভাবাতে শুরু করেছে। ছোট-বড় সকলের জীবনেই এমন প্রশ্ন অনেক সময়েই উঁকি দেয় এবং দৈনন্দিন জীবনে এইদিকেই এখন আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল বেশি। স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞানের সমস্ত পরিমণ্ডলেই এমন প্রশ্ন ছড়িয়ে আছে। সেই সব প্রশ্ন থেকে সংগ্রহ করা কিছু প্রশ্ন নিয়েই এই 'বিচিত্র প্রশ্নমালা' বিভাগটি।



লুচি ফোলে কেন?

ফুলকো লুচি কথাটা খুবই চালু। লুচির লেচি ভাল ক'রে বেলে গরম ঘিয়ে ঠিকমত ছাড়লে তা ফুলে যায় কেন?

লুচি ফুলে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?

লুচি গরম ঘিয়ে ছাড়া হলে কী হয়?

যেই লুচি গরম ঘিয়ে ছাড়া হয়, অমনি লুচির দু'টো পিঠ আগে গরম ঘিয়ের ছোঁয়া পায়। কিন্তু ভিতরটা নয়। বাইরের দু'টো তলে যে-জল থাকে তা জলীয় বাষ্প হয়ে উবে যায়। ফলে দু'টো তল তখন জলশূন্য। আর তেলে দু'টো পিঠ ঢাকা। তাই দু'টো বাইরের তলের অতি সূক্ষ্ম যে ছিদ্রপথে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারতো, তাও বন্ধ।

এখন লুচির ভিতরে যে-জল থাকে, তার কী হবে?

কড়ায় লুচি ছাড়ার কিছু পরে সেই জল গরম হয়ে বাষ্প হয়। এখন জল থেকে যে বাষ্প হয়, জলের থেকে তার আয়তন অনেক বেশি। ফলে তা লুচির দু'টো তলকে চাপ দেয়। সেইজন্যে লুচি ফুলে ওঠে। কিন্তু তা এত বেশি নয় যে, লুচির খোলকে ফুটো ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তাই ফুলকো লুচি আমরা খেতে পাই। লুচি খেতে বসে আঙুল দিয়ে সেই লুচি ভাঙবার সময়ে বেশ বোঝা যায়, ভিতরে গরম বাতাস অর্থাৎ বাষ্প রয়ে গেছে।

মরা মাছ কেন জলে ভেসে ওঠে?

এমনিতে মাছ জলের তলায় থাকে। তখন তাকে দেখা যায় না। কিন্তু মরা মাছ কেন জলে ভেসে ওঠে?

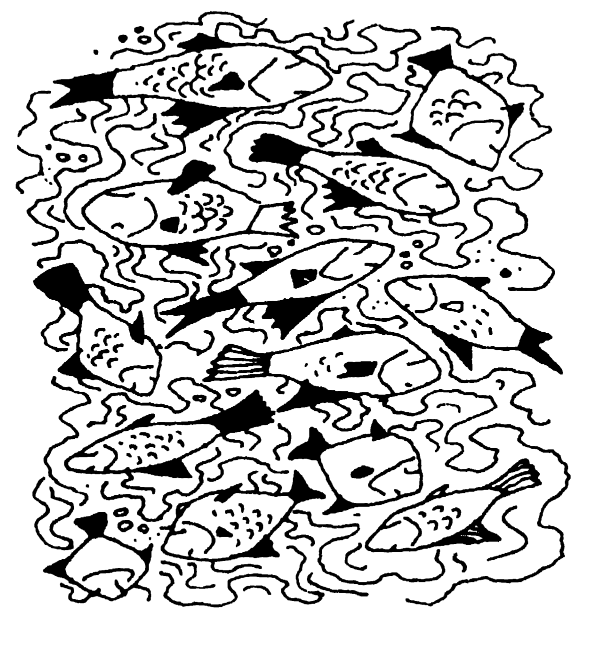
সাধারণভাবে মাছের শরীরে হাড় ও মাথার ঘিলু জলের থেকে ভারী। বাকি অংশ জলের থেকে হালকা। মাথা যার ভারী, তার তো জলে ডুবে যাওয়ার কথা। তাহলে সাধারণ অবস্থায় একটা জ্যান্ত মাছের জলের নীচেই থাকা উচিত।

দেখা গেছে, বিশেষ কয়েকটা মাছ ছাড়া প্রত্যেকটা মাছের শরীরে একটা বড় বায়ু-থলি বা পটকা থাকে। এই পটকাই তাকে ভাসতে সাহায্য করে। জলে যদি একটা বাতাস-ভর্তি ব্লাডারের মুখ বন্ধ ক'রে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, তাহলে ব্লাডারটা কি জলে ডুবে যাবে না ভাসতে থাকবে?

নিশ্চয়ই সে জলে ভাসবে।

ব্লাডারের বেলাতেও যে-রকম, মাছের বেলাতেও অনেকটা সেই রকম। পটকায় বাতাসের পরিমাণ যখন কম থাকে, তখনই মাছটি ডুবতে পারে। আর ভাসবার জন্যে বায়ু-থলিতে তারা খানিকটা বাতাস ভর্তি ক'রে নেয়। পটকার ভিতরে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে মাছ তার দরকার মত ভাসা-ডোবা ঠিক ক'রে নেয়।

মরবার সময়ে মাছের বায়ু-থলি বা পটকা যদি বাতাস



ভর্তি ব্লাডারের অবস্থায় থাকে, তাহলে মরা মাছ জলে ভাসবেই। কিন্তু বায়ু-থলিতে বাতাস যদি না থাকে? তখন মাছ থাকবে জলের তলায়। এ সময়ে মাছ যদি মরে যায় তো কী হবে? সে কি জলের তলাতেই থেকে যাবে?

মাছের শরীরের বিভিন্ন জীবাণু বিক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করে। এই গ্যাসের জন্যে মাছ হালকা হয়ে যায়। সেইজন্যে মরা মাছও শেষ পর্যন্ত জলের তলা থেকে জলের উপরে ভেসে ওঠে।

সুচ কেন সহজে ফুটো করে?

একটা সুচ দিয়ে যত সহজে ফুটো করা যায়, একটা ভোঁতা পেরেক দিয়ে কি তত সহজে ফুটো করা সম্ভব? ভোঁতা পেরেক তো দূরের কথা, একটা আলপিনের মুখ ভোঁতা হলে তা দিয়ে সামান্য ক'টা কাগজ গেঁথে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে।

কেন এ রকম হয়?

আলপিন বা পেরেকের ভোঁতা মুখ দিয়ে যেখানে ছিদ্র করা কঠিন, সেখানে সুচ কেন সহজে ফুটো করে?

সরু সুচ এবং ভোঁতা পেরেক বা আলপিন—দু'টো ক্ষেত্রেই সমান জোর বা বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু বল সমান হলে কী হবে, চাপ যেটা পড়ছে, সেটা সমান নয়। অথচ এই চাপের উপরে ছিদ্র করা সহজ কি কঠিন, তা নির্ভর করে।



যখন আমরা চাপের কথা বলি, তখন বল ছাড়াও যে ক্ষেত্র জুড়ে সেই বল ক্রিয়া করছে, তাকেও হিসেবের মধ্যে ধরতে হয়।

ধারালো ছুরি ভাল কাটে কেন?

যদি বলা হয়, দু'জন কাজের লোককে একশো টাকা ক'রেই দেওয়া হল, কিন্তু একজনকে এক মাসে, আর একজনকে দু-মাসে তাহলে তাদের মাইনে যেমন সমান হয় না, তেমনি বল প্রয়োগ সমান হলেও ক্ষেত্র বড় ছোট হলে চাপ আলাদা হবে। বলের সঙ্গে চাপের এমন একটা সম্পর্ক যে, ক্ষেত্র যত ছোট হবে চাপ তত বাড়বে। আসলে বল কেন্দ্রীভূত হয়ে অল্প জায়গায় চাপকে বাড়িয়ে তোলে। আর একই বল প্রয়োগ ক'রে ক্ষেত্র বড় হলে চাপ কমে।

সেইজন্যে সরু সুচে চাপ বেশি পড়ে বলে ছিদ্র হবে সহজে।

ধারালো ছুরিতে যে ভাল কাটে তা এই একই কারণে। যত ধারালো হবে, ছুরির উপরে প্রয়োগ করা বল কাজ করার জন্যে তত কম জায়গা পাবে। ফলে প্রযুক্ত বল ছুরির ফলার ছোট ক্ষেত্রের মধ্যেই থাকবে। চাপ বাড়বে। সুচ যেমন সহজে ছিদ্র করে, ধারালো ছুরি তেমনি ভাল কাটে।

পাইপে টানলে পানীয় উঠে আসে কেন?

শরবতের গেলাসে বা কোল্‌ড ড্রিঙ্কসের বোতলে পাইপ ডুবিয়ে যেই না টানা, অমনি পানীয় মুখে উঠে আসে। না টানলে নয়, বা পাইপের সঙ্গে পানীয়ের যোগাযোগ না থাকলেও অসম্ভব।

এই টানার সঙ্গে পানীয়ের মুখে উঠে আসার যে একটা সম্পর্ক আছে এর কারণ কি?

তরলের মধ্যে পাইপ ডুবিয়ে টানার মুহূর্তটিতে কী হয়? পাইপের দু'টো প্রান্ত। তরলের মধ্যে পাইপের একটা প্রান্ত, অন্য প্রান্ত মুখে। টান দেওয়ার সময় পাইপের মধ্যে



বাতাসের চাপ বাইরের বাতাসের চাপের চেয়ে কমে যায়। ফলে বাতাসের চাপের একটা অসম অবস্থা তৈরি হয়। পাইপের বাইরে তরলের উপরে বাতাসের চাপ বেশি, পাইপের ভিতরে কম। ফলে বাইরের বেশি চাপের জন্যে পানীয় উঠে আসে পাইপ বেয়ে। আর তা পৌঁছে যায় মুখে।

ফলে তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি।



রুপোর বাসন কালো হয়ে যায় কেন?

রুপোর বাসন, রুপোর গয়না চিরকাল আর রুপোর মতন থাকে না। সোনা যেমন সোনার মতন থাকে রুপো কিন্তু বরাবর রুপোর মতন নয়।

এর কারণ কী?

রুপোর সঙ্গে সালফার বা গন্ধকের বিভিন্ন যৌগ অত্যন্ত সহজভাবে খুব তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া করে। বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড এবং সালফারের বিভিন্ন যৌগ আছে। শিল্পপ্রধান অঞ্চলে কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল পোড়ানোর জন্যে এই যৌগের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। তা ছাড়া বাড়ির কয়লার উনুনের ধোঁয়াতেও সামান্য পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড থাকতে পারে। ফলে এই অক্সাইড যৌগের সঙ্গে রুপোর বিক্রিয়া হয় তাড়াতাড়ি।

রুপোর সঙ্গে বাতাসের সালফার যৌগের যে বিক্রিয়া হয়, তাতে রুপোর উপরে সিলভার সালফাইডের কালো রঙের একটা পাতলা আস্তরণ পড়ে। আর এইজন্যেই রুপো কালো দেখায়।

তেল আর জলে মিশ খায় না কেন?

মনের মিল হলে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। যতই সে মিল বেশি হবে, ততই দু'জন অভিন্ন হয়ে উঠবে—তখন তাদের বলা হয় হরিহর আত্মা।

দুটো তরলের বেলায় সে-রকম বন্ধুত্ব হয়, বলা চলতে পারে। একটা তরলকে আর একটা তরলের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে। এদের একটা দ্রাবক আর একটা দ্রাব।

দ্রাবক হল সেই তরলটি, যাতে অন্য তরল মেশানো হয়, অন্য তরলটি দ্রাব। তেলে যদি কয়েক ফোঁটা জল দেওয়া হয়, তাহলে তেলটা দ্রাবক, জল দ্রাব।

দ্রাবক আর দ্রাবের বন্ধুত্ব হবে কিনা অর্থাৎ মিশ খাবে কিনা তা বোঝবার সময়ে লক্ষ্য করতে হবে, তাদের আণবিক গঠন। দু'টি ছেলের বা দু'টি মেয়ের বেলায় যেমন তাদের মনের মিলের হিসেব নেওয়া হয়, দ্রাবক আর দ্রাবের বেলায় তেমনি তাদের আণবিক গঠনের।

এদের আণবিক গঠনের যখন মিল থাকে, তখন তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ফলে দ্রাবকের মধ্যে দ্রাব দ্রবীভূত হয়।

আর আণবিক গঠনে মিল না থাকলে এরা মিশে যায় না।

তেল আর জলের আণবিক গঠনের কোনো মিল নেই। তেলের অণু আকারে জলের অণুর চেয়ে অনেক বড়। তা



ছাড়া প্রতিটি তেলের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা প্রতিটি জলের অণুতে পরমাণুর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। সেইজন্যে তেল আর জল মেশে না। অথচ অ্যালকোহল (ইথাইল) আর জলের আণবিক গঠনের মিল থাকায় জল মিশে যায় অ্যালকোহলের সঙ্গে। দুধ আর জলও যে মেশে, তার কারণ তাদের আণবিক গঠন একই ধরনের।

মানুষ কেমন ক'রে সাঁতার কাটে ?

সাঁতার কাটার আগে, কোনো কিছু ডোবে বা ভাসে কেন, সেই কথাটা বলা যাক। যদি কোনো জিনিসের ওজন সমান আয়তন জলের ওজনের চেয়ে কম হয়, তাহলে সেই জিনিসটা জলে ভাসে। যদি আবার উল্টোটা হয় অর্থাৎ সমান আয়তন জলের ওজন জিনিসটার ওজনের চেয়ে কম থাকে তা হলে সেই জিনিস জলে না ভেসে ডুবে যাবে।

এখন সমস্ত মানুষটার ব্যাপারে মানুষের দেহটাকে আলাদা ধরি আর মাথাটাকে আলাদা। যদি শুধু দেহের সমান আয়তনের জল নিয়ে ওজন করা যায়, তাহলে দেহের চেয়ে জলের ওজন ভারী। কিন্তু কেবল মাথার ওজনের



বেলায় উল্টো। সেখানে সমান আয়তন জলের ওজন হালকা। তাই দেহটা যেখানে ভাসতে থাকে, মাথা সেখানে ডুবে যায়। আমরা যে সাঁতার শিখি, তা মাথাটাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে।

কিন্তু জন্তু-জানোয়ারেরা জলে এমনিই ভাসে, তাদের তো সাঁতার শিখতে হয় না। কেন?

এর কারণ জন্তু-জানোয়ারের মাথার ওজন সমান আয়তন জলের থেকে হালকা।

মশা কেন রাতে কামড়ায় ?

মশাকে তো দিনে তেমনভাবে দেখা যায় না। কিন্তু যেই দিনের আলো নিবু নিবু হয়ে আসে, অমনি পোঁ পোঁ ঘুরে বেড়ানোর শব্দ শোনা যায়; মশা কামড়াতে শুরু করে।

মশা কেন রাতে কামড়ায়? রাতের অন্ধকারে মশা দেখে কেমন ক'রে?

মৌচাক যেমন, মশার চোখও সে রকম, তাকে বলে পুঞ্জাক্ষি। অর্থাৎ অনেক চোখ আছে সেখানে। এর এক-একটাকে বলা হয় ওমাটিডিয়াম। আমাদের চোখের মতন এদের প্রত্যেকটার ভিতরে থাকে অক্ষিপট, বাইরে লেন্স। আলো আসে এক-একটা ওমাটিডিয়ামের ভিতর দিয়ে আর তা প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করতে পারে।

এই যে ওমাটিডিয়ামগুলি—এর একটা অপরটা থেকে রঞ্জক পদার্থ দিয়ে আলাদা করা থাকে। তাই এক একটা অক্ষিপটে আলো পড়ে এক একটা মাত্র লেন্স থেকে। তা অন্যটায় যেতে পারে না। এইভাবে কোনো জিনিসের ছোট ছোট প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়।

তা ছাড়া এক একটা ওমাটিডিয়ামের মুখ থাকে এক এক দিকে। সেইজন্যে মশা মারার জন্যে কেউ চড় তুললে মশা

ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারে।

কিন্তু আলো যখন কম থাকে তখন মশা দেখে কী ক'রে? আলো কম হলে রঙ্গক পদার্থ আগের জায়গায় থাকে না। অক্ষিপটের তুলনায় উপরে উঠে আসে। তখন বিভিন্ন ওমাটিডিয়ামের লেন্স থেকে আলো এসে পড়ে অক্ষিপটে একটার উপরে আর একটা। আর তা বস্তুর ছবি তৈরি করে। একের উপরে আর এক আলো এসে পড়ার জন্যে এখন একই জায়গায় এসে পড়েছে বেশি আলো। ফলে অল্প আলোতেও জিনিস বোঝা যায়। কিন্তু যে প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়, সেটা তেমন পরিষ্কার নয়।

কিন্তু মশার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা রাতেই বেশি কেন?

কারণ রাতেই মানুষ বিশ্রাম নেয়। ফলে দিনের বেলায় মশার বিপদ যতটা, রাতে ততটা নয়। আর রাতে যখন মশা দেখতে পায়, তখন নিরাপদ সময় দেখেই তো সে বের হবে।





বেলুন ফাটলে শব্দ হয় কেন?

একটা বেলুনকে ফোলাতে ফোলাতে অনেক সময়ে সে এমন একটা অবস্থায় আসে যখন আর-একটা ফুঁতেই সে ফেটে যায়। কিন্তু বেলুন ফেটে গেলে শব্দ হয় কেন? এমন তো হতে পারতো, ফোলাতে ফোলাতে বেলুন শেষ পর্যন্ত ফেটে গেল, কিন্তু কোনো শব্দ কানে এসে পৌঁছোল না।

ফেটে গেলেই যে শব্দ হয়, এর কারণ কী?

শব্দ মানেই বাতাসে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি। পুকুরে ইট ছুঁড়লে জলে যেমন ঢেউ ওঠে, তেমনি বেলুন যখন ফাটে তখনও ধাক্কা লাগে, ঢেউ ওঠে। এমনিতে ফোলানো বেলুন ভিতরের বাতাসকে বাইরের বাতাস থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে। ফোলা বেলুনের ভিতরের চাপ বাইরের থেকে বেশি। চাপ অতিরিক্ত বেশি হওয়ার জন্যে বেলুন যখন ফাটে তখন হঠাৎ বাইরের বাতাসের উপর বেলুনের ভিতরকার বাতাসের অতিরিক্ত চাপ এসে পড়ে। তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই যে তরঙ্গ হল, তা বাতাসের ভিতর দিয়ে কানের পর্দায় এসে ধাক্কা দিয়ে শব্দের অনুভূতি জাগায়।

বোমা ফাটার সময়ে কেন শব্দ শোনা যায়?

বোম যখন ফাটে তখন চারপাশের বাতাসের উপরে অতিরিক্ত একটা চাপ এসে পড়ে। ফলে আগের মতই কানে শব্দের অনুভূতি জাগে।

ফ্যান চালালে আরাম লাগে কেন?

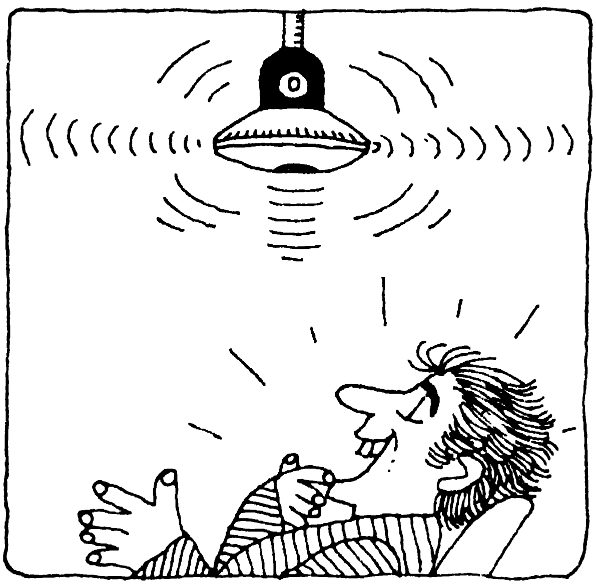
গরমের দিনে লোডশেডিংয়ের সময়ে ফ্যান ঘোরা যখন

বন্ধ হয়ে যায়, তখন যে কষ্ট হয় তার হিসেব কে করে? কিন্তু সবাই তখন ঘেমে-নেয়ে একাকার। যেই কারেন্ট আসে, পাখা ঘুরতে আরম্ভ করে, পাখার হাওয়ায় যে কী আরাম, তা বোঝা যায়। হাত পাখাতেও আরাম লাগে, সে আরামটুকু একেবারে হাত ঘুরোনোর ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে।

তাহলে একটা কথা ঠিক যে পাখা যে-রকমই হোক না কেন, পাখা ঘুরলেই আরাম লাগে। তখন আর ঘামতে হয় না।

কিন্তু কেন?

পাখা না ঘুরলেই গরমে কষ্ট, অথচ পাখা ঘুরলেই আরাম, স্বস্তি, গরম যেন আর তেমনভাবে বোধ হয় না।



পাখার হাওয়ায় এমন কী জাদু আছে, যাতে শরীর জুড়িয়ে যায়?

যাঁরা টাকা গোনেন, তাঁরা স্পঞ্জে জল দিয়ে মাঝে মাঝে আঙুল ভিজিয়ে নেন। কারণটা এই যে, স্পঞ্জ জল ধরে রাখে। স্পঞ্জ যেমন জল ধরে, তেমনি বাতাসও একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় হিসেব মত জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে। কিন্তু এই জল আসবে কোথা থেকে? স্পঞ্জে জল ঢালতে হয়, বাতাসে তো আর জল ঢালা যায় না ও-রকম ক'রে, সেখানে জল আসবে ভেজা জিনিসপত্র বা জলের আধার থেকে।

জল থেকে বাষ্প, শুনে মনে হয় ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, অবস্থাটা বদলে যাচ্ছে। তরল হয়ে যাচ্ছে গ্যাস। আগে যা ছিল জল, এখন তা বাষ্প।

কেটলির জল গরম করার সময়ে কী হয়? প্রথমে জল গরম হতে আরম্ভ করে। ঠান্ডা জল আর ঠান্ডা থাকে না। উষ্ণতা বাড়ে, বাড়তেই থাকে। তারপর এক সময়ে জল ফোটে। মা গল্পের ঝোঁকে আঁচ থেকে কেটলি সরিয়ে নিতে ভুলে গেলে জল ফুটে-ফুটে বাষ্পই হয়ে যাবে। কেটলিতে আর কাপে ঢালার মত কিচ্ছু থাকবে না।

তাহলে এই যে জল থেকে বাষ্প হয়ে অবস্থাটা বদলে যাওয়া, এর জন্যে উত্তাপ দরকার।

কেটলির জল গরম করার সময়ে যে-রকম, পাখা চালিয়ে শরীর শীতল করার বেলাতেও সে-রকম।

পাখা যখন ঘোরে তখন কী হয়?

তখন আমাদের শরীরের ঘাম যাচ্ছে উবে। আর একটু ভেঙে বলা যায়, ঘাম তরল, হয়ে যাচ্ছে গ্যাসীয়। অবস্থার বদল—এই বদল হওয়ার জন্যে তাপ দরকার। এই তাপ কোথায় পাওয়া যাবে? সে-তাপের জোগান দিচ্ছে আমাদের শরীর। শরীর তখন রয়েছে উত্তপ্ত হয়ে। ফলে ঘাম যাচ্ছে বাষ্প হয়ে উবে আর তাপ যাচ্ছে বেরিয়ে। পাখার জোরালো হাওয়া সেই বাষ্পকে দ্রুত উড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলে ঘামের বাষ্প হওয়ার হারও যায় বেড়ে। এই হার যত বাড়বে, ততই আমাদের শরীর শীতল হবে। সেইজন্যে পাখার হাওয়া ভাল তো লাগবেই।

চায়ের কাপ সাদা কেন?

চায়ের কাপ সচরাচর সাদা করা হয়। তাই না? কিন্তু কেন? পছন্দমতো যে কোনো রঙের চায়ের কাপ হলে ক্ষতি কি?

চায়ের কাপ সাদা করা হয়, তার কারণ সাদা জিনিস তাপ নেয় সামান্য, সে ছাড়েও কম তাপ। তার ফলে চা বেশিক্ষণ গরম থাকে। আর চা কে ঠান্ডা ক'রে খেতে চায়? চা গরম রাখার জন্যে চায়ের কাপ সাদা করা হয়।

কালো পাথরবাটিতে দুধ কি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়?

কিন্তু চায়ের বদলে যদি গরম দুধ নিই, আর সে দুধ যদি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করতে চাই, তাহলে কী করবো?



তখন কালো পাথরবাটি খুব ভাল। সাদা জিনিসের বিকিরণ ক্ষমতা যেমন কম, তেমনি কালো জিনিসের বিকিরণ ক্ষমতা আবার বেশি। সেইজন্যে কালো পাথরবাটিতে গরম দুধ শিগগির ঠান্ডা হয়ে যায়।

ভেন্টিলেটার উপরে কেন?

সব রকমের ঘরেই ভেন্টিলেটার বা ঘুলঘুলি থাকে ছাদের কাছে। কেন ভেন্টিলেটার ঘরের ছাদ বা আলসের কাছে থাকে? তা ঘরের নীচের দিকে থাকলে অসুবিধে কী?

অসুবিধে আছে।

একটা ঘরের ভিতরের কথা ধরা যাক। স্বাভাবিক কারণে সেই ঘরে বাতাস আছে সর্বত্র।

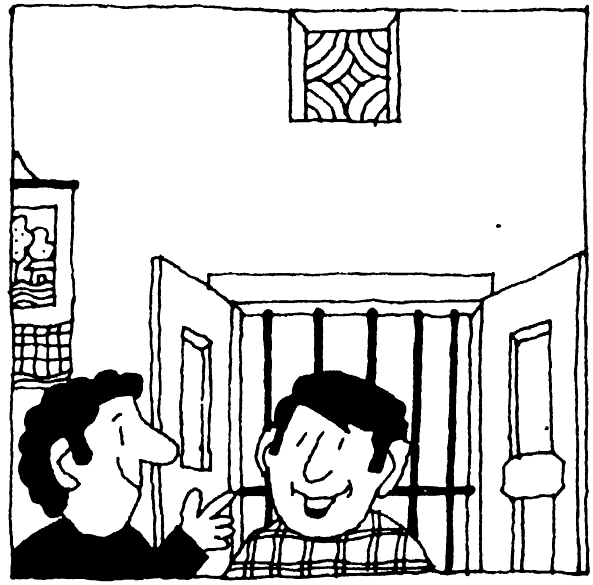
লোকজনের উপস্থিতিতে ঘরের মেঝের কাছাকাছি বাতাসের উত্তপ্ত আর দূষিত হওয়ার আশঙ্কা যতটা, ছাদের কাছাকাছি বাতাসের কখনোই ততটা নয়।

বাতাস গরম হলে কী হবে? তখন সে তুলনায় হালকা। প্রকৃতির ধর্ম এই যে, হালকা বাতাস উপরে উঠে যাবে। আর তা ঘরের বাইরে চলে যাবে ঘরের কাছের ঘুলঘুলি দিয়ে।

নীচের দিকের শূন্যস্থানও অপূর্ণ থাকবে না। নীচের বাতাস গরম আর হালকা হয়ে যেই উপরে উঠবে অমনি বাইরের মুক্ত বাতাস ছুটে এসে সেই জায়গা ভরাবে।

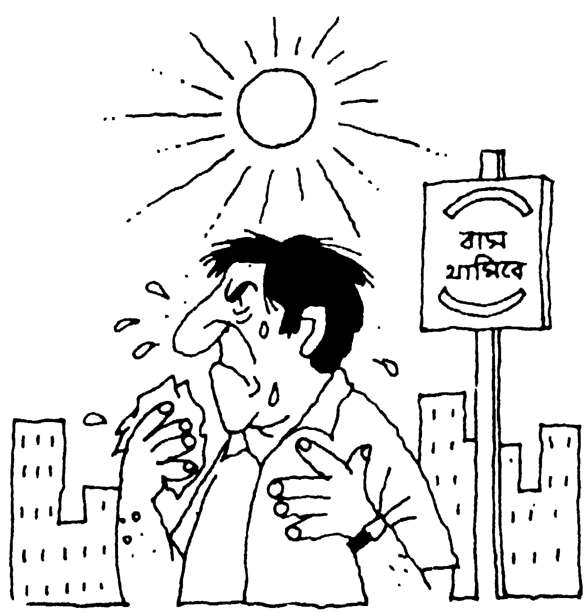
এইভাবে ঘরের বাতাস উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে প্রতিনিয়ত মুক্ত বাতাস এসে পরিবেশকে অনুত্তপ্ত রাখার চেষ্ট করে।

ভেন্টিলেটার যদি উপরে না থাকতো তাহলে যে মুক্ত বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে; তার আর বেরোনোর পথ থাকতো না।



সকাল-বিকেলের চেয়ে দুপুরে গরম বেশি কেন?

শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, দিনের মধ্যে দুপুরবেলাতেই



বেশি গরম লাগে। সকালে নয়, বেলা পড়ে এলেও নয়, এই যে দুপুরবেলায় দিনের অন্য সময়ের তুলনায় বেশি গরম লাগে, এর কারণ কী?

আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে একটা বায়ুমন্ডল আছে। কিন্তু এর ঘনত্ব বরাবর সমান নয়। ভূ-পৃষ্ঠের কাছে এই বায়ুমন্ডল যতটা ঘন, ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে উপর দিকে তার চেয়ে কম। ফলে ভোরে দিগন্ত ছাড়িয়ে ওঠার সময়ে বা গোধূলিতে দিগন্তের আড়ালে নামার বেলায় সূর্যকে বাতাসের যতটা ঘন স্তর পার হয়ে আসতে হয়, তেমন আর অন্য কোনো সময়ে হয় না। দুপুরবেলাতেও নয়। দুপুরে সে মাথার উপরে ওঠে বটে, কিন্তু তখন যে বাতাসের স্তর পার হয়ে সে পৃথিবীতে আসে, সকাল-সন্ধের মত তা সব জায়গায় অতটা ঘন হয় না।

তাপ যখন ঘন বস্তু পার হয়ে আসে, তখন সেই ঘন বস্তুর মধ্যে তাপের অনেকটা শোষণ হয়ে যায়। সেইজন্যে তাপ হ্রাস পায় কিন্তু যেখানে বস্তু তেমন ঘন নয়, সেখানে তাপের শোষণ কম। ফলে তাপের তেমন হ্রাস লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই সকাল-বিকেলের চেয়ে দুপুরে গরম বেশি লাগে।

দুপুরে গরম বেশি হওয়ার আরো একটা কারণ আছে।

দুপুরবেলায় সূর্য মাথার উপরে থাকে বলে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে সরাসরি। কিন্তু সকালে ও বিকেলে পড়ে তেরছাভাবে।

সূর্যরশ্মি তেরছাভাবে পড়লে কী হয়?

সরাসরি এলে যতগুলো রশ্মি যতটা জায়গায় পড়ে, তেরছাভাবে পড়লে ততগুলো রশ্মিই তার চেয়ে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাপ বাড়েনি, কিন্তু জায়গা অনেকটা ছড়িয়ে গেল। তাতেও গরম কম লাগে।

তিনপেয়ে টেবিল পড়ে যায় না কেন?

চারপেয়ে যত ফার্নিচার, টেবিল, চেয়ার, টুল, সবই মেঝের উপরে ভালভাবে বসবে—এই আমাদের ধারণা। কিন্তু তিনপেয়ে কোনো কোনো ফার্নিচারও তো পাওয়া যায়। তিনপেয়ে টেবিল দেখি। এই তিনপেয়ে টেবিল মেঝেতে পড়ে যায় না কেন?

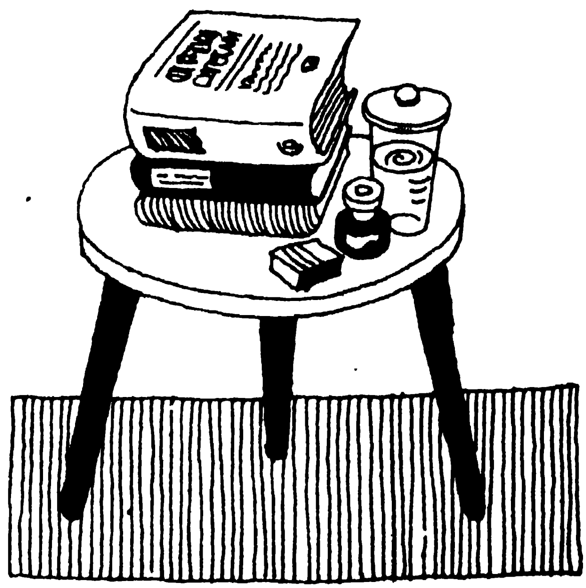
টেবিল, চেয়ার বা আর যাই হোক—এরা সব কিছুই তো আছে ঘরের মধ্যে মেঝের উপরে। মেঝে মানেই তো একটা সমতল। এই যে সমতল, এই সমতলকে নির্দিষ্ট করার জন্যে চাই তিনটে বিন্দু, যেমন দু'টো বিন্দুতে নির্দিষ্ট করা যায় একটা সরলরেখা, ঠিক সে-রকম।

টেবিলের তিনটে পায়া মেঝেতে এসে মিলেছে। মেঝের উপরে এরা তিনটে বিন্দু যেন। আর এই তিনটে বিন্দুতে তৈরি তলের সঙ্গে মেঝের তল মিশে যাচ্ছে। সেইজন্যে তিনপেয়ে টেবিল মেঝেতে ভালভাবে বসে, ঢেঁকির মত এদিক ওদিক ক'রে না।

তার মানে এই নয় যে, একটা চারপেয়ে টেবিলের একটা

চারপেয়ে টেবিল কি তিনপেয়ে টেবিলের চেয়ে মেঝেতে ভাল বসে?

পায়া ভেঙে দিলে তা সুন্দরভাবে বসবে মেঝের উপরে।



পায়া তিনটে এমনভাবে থাকবে যাতে টেবিলের ভর সামলাবার ক্ষমতা থাকে। তাহলে কি চারপেয়ে টেবিল মেঝের উপরে ভালভাবে বসে না?

বসে যে, তা তো দেখাই যায়। কিন্তু সব সময়ে বসাটা ভালভাবে হয় না। দেখতে তো পাই, ঠিক মত বসানোর জন্যে ভাঁজে ভাঁজে কাগজ গুঁজে দিতে হয় কখনো কখনো পায়ার নীচে।



সোনা লোহার চেয়ে দামী কেন?

খোলা জল-হাওয়ায় লোহার উপরে মরচে ধরে। এ এমন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এর জন্যে গবেষণাগারের মধ্যে যেতে হয় না। উত্তাপের দরকার পড়ে না। অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থও আনতে হয় না। সাধারণ অবস্থায় সাধারণ পরিবেশে খোলা হাওয়াতেই কাজ হয়। বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে বলে মরচে সেই সময়ে ধরে তাড়াতাড়ি।

এখানে বলে রাখা ভাল, ধাতু হিসেবে লোহার বিক্রিয়া ক্ষমতা বেশি। শুধু লোহা নয়, আরো অনেক ধাতু আছে, সাধারণ বিক্রিয়াতেই যাদের অংশ নিতে দেখা যায়। কিন্তু সোনা এমন একটা ধাতু সাধারণ বিক্রিয়ায় যার কোনো ভূমিকা নেই। প্ল্যাটিনামও ওইরকম। সাধারণ বিক্রিয়ায় সোনা সোনার মতই উজ্জ্বল থাকে, প্ল্যাটিনামও বদলায় না।

যে-সব ধাতু সাধারণ বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না, পরিবেশে প্রভাবিত হয় না, তারা তো মূল্যবান হবেই। সোনা তাই মূল্যবান, প্ল্যাটিনামও।

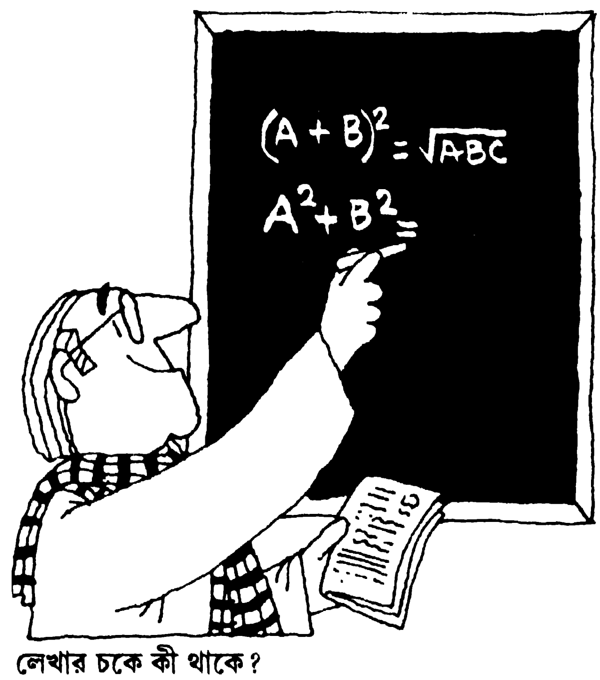
সোনায় কেন মরচে ধরে না?

সোনার পাথরবাটি কি সম্ভব? পাথরবাটি যেমন সোনার হতে পারে না, তেমনি সোনায় মরচে ধরা অসম্ভব একটা ব্যাপার।

মরচে কী, মরচে বলতে আমরা যা বুঝি তা হল লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের একটা বিক্রিয়া। এই অক্সিজেন বাতাসেই পাওয়া যাচ্ছে। ফলে খোলা বাতাসে লোহা ফেলে রাখলেই লোহার এক রকমের অক্সাইড তৈরি হয়, যাকে আমরা বলি মরচে। এই অক্সাইডটি জলযুক্ত বা সোদক। এটা দেখা যায় কেবল লোহার পৃষ্ঠদেশে।

এখন লোহা একটা ধাতু। লোহার মত সোনা আর একটা ধাতু। ফলে সোনার যদি কোনো অক্সাইড হয়, তা তো আর লোহার অক্সাইড হতে পারে না। কিন্তু খোলা বাতাসে লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় যেমন লোহার অক্সাইড হয়, সোনার বেলায় সে রকম কোনো বিক্রিয়া হয় না। এক তাল সোনা পড়ে থাকে—বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেন তার কিচ্ছু করতে পারে না।

তা ছাড়া বাতাসে তো শুধু অক্সিজেন নেই। আরো কত রাসায়নিক পদার্থ আছে আমাদের আবহমণ্ডলে। রসায়নাগারের নানা উপায় ছাড়া খোলা বাতাসে কোনো রাসায়নিক পদার্থেরই সোনার সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া হয় না, অক্সিজেনের সঙ্গে তো দূরের কথা! ফলে সোনা থেকে যায় সোনাই, তাতে কখনো মরচে ধরে না।



লেখার চকে কী থাকে?

চকও বলা যায়, আবার খড়িমাটিও বলতে পারি—যে

চকে ছোটরা শ্লেট ভরায়, মাস্টারমশাইরা বোর্ডে লেখেন। এই চক জিনিসটা আসলে কী?

রাসায়নিক দিক দিয়ে এটা হল ক্যালসিয়াম সালফেট। সাদা রঙের, জলে যে গুলে যায় না, তা তো দেখাই যায়।

এই যে চক যাতে লেখাপড়ার কাজ চলে তা কিন্তু প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না।

মারবেল, চুনাপাথরকেও চক বলা হয়। কিন্তু লেখার জন্যে যে চক, এরা সে-জাতের চক নয়। এরা হল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

ডাব কাটলে জল ছিটকে যায় কেন?

ডাবে যখন শাঁস থাকে না, তখন ডাবে একেবারে ভর্তি জল। সে জল থাকে একটা চাপের মধ্যে। তার চারদিকেই ডাবের খোলার পুরু আচ্ছাদন। তাই সে-জল বেরোতে পারে না। কিন্তু যেই ডাব কাটা হয়, অমনি বেরোবার প্রথম



সুযোগেই জল ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিছুতেই সব জলটা ভিতরে ধরে রাখা যায় না কেন?

খোলের ভিতরে জলের চাপ বাইরে যে বাতাসের চাপ—তার থেকে বেশি। জল বেশি চাপের থেকে কম চাপের দিকে যাবে, প্রকৃতির নিয়মই এই। তাই জল ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

কাঁসা কী?

কাচের গ্লাস, কাচের প্লেটের মত কাঁসার থালা, বাসন, গ্লাস আছে।

যে কাঁসায় এই থালা, বাসন, গ্লাস তৈরি সেই কাঁসাটা কী? এটা কি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়? নাকি এই কাঁসাকে আলাদাভাবে তৈরি করতে হয়?

কাঁসাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বেল মেটাল। এটি প্রকৃতিতে এমনি পাওয়া যায় না। এটি তৈরি করতে হয় এবং তার জন্যে দরকার তামা আর টিন। এই দু'টি ধাতুকে ওজনের একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে তবে কাঁসা পাওয়া যায়।

কাঁসায় তামার ভাগ শতকরা 60 থেকে ৪5 পর্যন্ত থাকতে পারে। অর্থাৎ ওজনের হিসেবে 100 ভাগ যদি নিই কাঁসা, তাহলে তামার ভাগ 60। বাকিটা টিন।

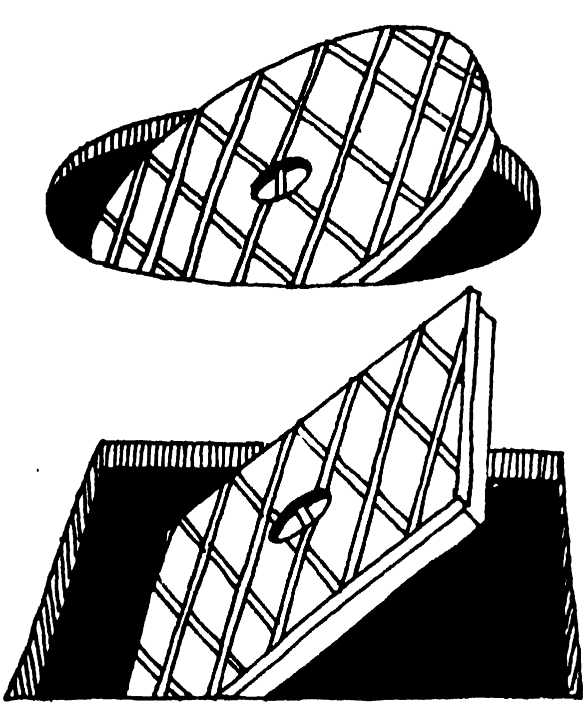
এই মিশ্র ধাতুতে সামান্য আঘাত করলেই, খুব বেশি স্পন্দন হয়ে উচ্চ গ্রামের শব্দ তৈরি হয়। তাই এই কাঁসা দিয়ে ঘন্টা তৈরি হয়।

শুনলে অবাক হওয়ার কথা, আমাদের দেশে কাঁসার ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এখন অবশ্য স্টেনলেস স্টিলের বাসন এত বেশি চলছে যে, কাঁসার বাসন তেমন আর ব্যবহার করা হচ্ছে না।

ড্রেনের ঢাকনা গোল কেন?

পথ-চলতি রাস্তায় ড্রেনের উপরে যে ঢাকনা দেখা যায়, তা গোল। গোল মুখের উপরে গোল ঢাকনা চমৎকার ভাবে বসে যায়, ঢাকনা যেমন-তেমন ভাবে রাখি না কেন! কিন্তু ঢাকনা তো চৌকোও হতে পারতো। গোল মুখে ঠিকমত গোল ঢাকনা বসলে চৌকো ঢাকনা চৌকো মুখেও ভালভাবে বসবে আশা করা যায়। কিন্তু ড্রেনের মুখ বা ড্রেনের ঢাকনা চৌকো হয় না কেন?

ড্রেনের ঢাকনা যদি চৌকো হত, তাহলে দেখা যেত, একেবারে খাঁজে-খাঁজে না এনে ঢাকনাটিকে দাঁড় করিয়ে চৌকো মুখের উলটো দুই কোণের মধ্যে রাখলে তার গলে



যাবার একটা আশঙ্কা থাকতো। চৌকো মুখে এই বিপদ হওয়া সম্ভব। কিন্তু গোল মুখে গোল ঢাকনা কখনও গলে যেতে পারে না।

টিউবওয়েলের জল শীতে গরম আর গ্রীষ্মে ঠান্ডা কেন?

শীতকালে টিউবওয়েল পাম্প করলে যে জল উঠে আসে সে জল গরম লাগে কেন? অথচ গ্রীষ্মের দিনেপরিবেশ যখন উষ্ণ তখন টিউবওয়েলের জল ঠান্ডা মনে হয়। এর কারণ কী?

টিউবওয়েল থেকে যে-জল তোলা হয় তা থাকে মাটির বেশ কিছুটা নীচে। লোহা যেমন আগুনের তাপে চট ক'রে তেতে যায়, মাটি সে-রকম নয়। মাটি পারিপার্শ্বিক থেকে ততটা তাপ নেয় না। এইজন্যে মাটিকে বলা হয়, মাটি তাপের কুপরিবাহী। ফলে বাইরের বাতাসে যখন আগুনের হলকা বয়, তখন মাটির মধ্যে ততটা গরম থাকে না। কিংবা বাতাসে যখন কনকনেভাব দেখা দেয়, তখনও ভিতরের মাটি ততটা ঠান্ডা হয়ে ওঠে না।

তাই শীতকালে বাইরের বাতাসের তাপমাত্রার তুলনায় টিউবওয়েলের ভিতরের জলের উষ্ণতা বেশি। ফলে তখন টিউবওয়েল থেকে জল তুললে সে জল তো গরম বলে মনে হবেই। আর গরমের দিনে অবস্থাটা উলটো। তখন বাইরের বাতাসের উষ্ণতার চেয়ে মাটির নীচের উষ্ণতা কম থাকে। আর তাই সেই সময়ে টিউবওয়েলের জল ঠান্ডা লাগে।

আসলে টিউবওয়েলের জল মাটির গভীরে যেখানে থাকে, মাটি তেমন তাপ টানে না বলে, শীত-গ্রীষ্মের কোনো সময়েই সেই উষ্ণতার তেমন একটা পরিবর্তন হয় না। সেইজন্যে শীতে টিউবওয়েলের জল গরম, গ্রীষ্মে ঠান্ডা।



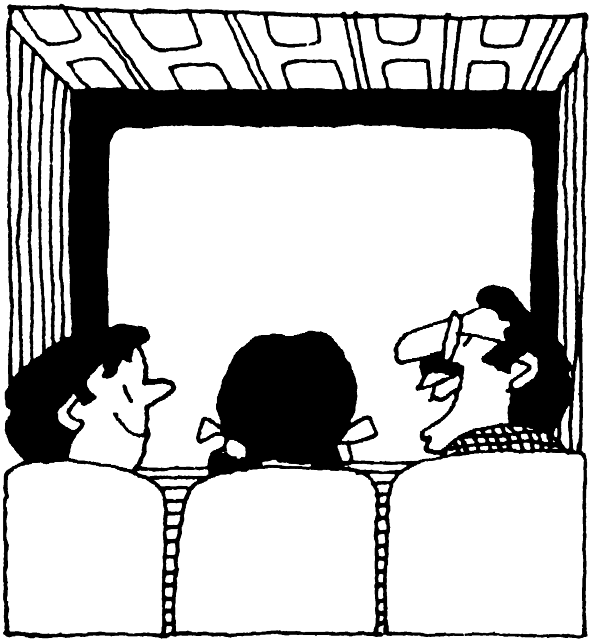
সিনেমার পর্দা অমসৃণ আর সাদা কেন?

সিনেমার পর্দা সব সময়ে সাদা আর অমসৃণ কেন?

সিনেমার পর্দা যদি মসৃণ হত, তাহলে যে-রশ্মি গিয়ে পড়তো তার উপরে তা কেবল একটা নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত হত বা ফিরে আসতো। সবদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তো না।

প্রতিফলিত রশ্মি সব যদি যায় একদিকে, তাহলে সিনেমা হলের কেবল এক দিকের দর্শকরাই পর্দার প্রতিবিম্ব দেখতে পারে। সব দিকের দর্শকরা নয়। অথচ সিনেমা যারা দেখতে এসেছে তারা সবাই তো ছবিটা দেখতে চাইবে।

কিন্তু পর্দা অমসৃণ হলে অবস্থাটা একেবারে উলটো রকমের হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিফলিত রশ্মি তখন আর একটা



দিকে না গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। একে বলে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন। অ'ব তাই হলের সব অংশ থেকে পর্দায় ছবি দেখা যাবে।

কিন্তু সিনেমায় পর্দা সাদা হয় কেন?

সাদা বস্তু কোনো রঙকেই শুষে নেয় না। সবাইকে সে ফিরিয়ে দেয়। সেইজন্যে সাদা পর্দার উপরে যত রঙের রশ্মি এসে পড়ে, তারা সব প্রতিফলিত হয়। আর সব রশ্মিই যদি প্রতিফলিত হয়, তাহলে ছবি তো উজ্জ্বল দেখাবেই।

মাছের মুড়ো কি বেশি উপকারী?

ছোটবেলায় মা-মাসির মুখে শুনেছি মাছের মুড়ো খেলে বুদ্ধি বাড়ে। মুড়োতেই যেন মাছের আসল খাদ্যগুণ। সতিই কি মাছের মুড়ো, পেটি, গাদা বা লেজের চেয়ে বেশি উপকারী?

মাছের মুড়ো মাছেরই অংশ, মাছ থেকে আলাদা নয়। মাছের মুড়ো দেহের অন্যান্য অংশের মত একই রকম পেশী দিয়ে তৈরি। তবে এই সব পেশী খুব বেশি নড়াচড়া করে না। ফলে এই অংশে চর্বির ভাগ বেশি হয়ে যায়। মাছের মাথায় প্রধানত ঘিলু অংশে পাওয়া যায় ফসফোলিপিড্‌স। এতে আছে ফসফরাস, যা শরীরে ফসফরাসের একটা বড় যোগানদার। শৈশবে আর যৌবনে মস্তিষ্ক পরিণত হওয়ার সময়ে এর প্রয়োজন খুব।

সেদিক দিয়ে ল্যাজার পেশী অনবরত সঞ্চালনের ফলে সেখানে ফ্যাট বা চর্বির পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু প্রোটিন পাওয়া যায় তুলনায় বেশি।



মাছের মুড়োয় ফসফোলিপিড্‌স-এর জন্যে মাছের মুড়ো খেতেও ভাল লাগে।

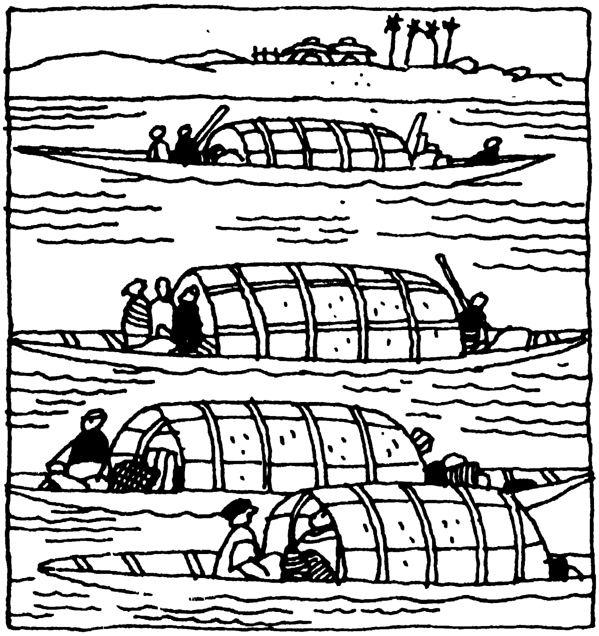
নৌকো জলে ভাসে কেন?

একটা কাঠের নৌকো তো খুব হালকা নয়। তাতে কত লোক ওঠে, কত মাল যায়। তবু নৌকো তার স্বাভাবিক অবস্থায় জলে না ডুবে ভাসে কেমন ক'রে?

জলে কোনো কিছুর ভাসা বা ডোবা, শুধু সে কতটা ভারী বা তার ওজন কত, তার উপরে নির্ভর করে না।

আমাকে যদি কেউ সামনের দিক থেকে ধাক্কা দেয় পিছন দিকে, আর সেই সঙ্গে কেউ যদি পিছন থেকে ঠেলা দেয় সামনে, তাহলে আমি কোন দিকে যাব? দুটো উল্টোমুখো ধাক্কা একই সঙ্গে কাজ করছে। যার জোর বেশি, জেতার কথা তারই।

জলে নৌকো ভাসা-ডোবার বেলাতেও এ-রকম দু'টো ধাক্কা কাজ করছে। একটা ধাক্কা বলা যায় লোকজন সমেত



নৌকোর নিজের ওজন, যেটা তাকে নীচের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এটা একটা বল। এই বলটাই নৌকো ডোবানোর কারণ।

আর একটা ধাক্কা নৌকোটাকে উপর দিকে ঠেলে তুলে রাখতে চায়। এটাও একটা বল। নৌকোকে ভাসিয়ে রাখায় এই বলটার দরকার সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু উপর দিকে ঠেলে তুলে রাখার জোরটা আসছে কোথা থেকে?

জলের উপরে ভাসমান নৌকো অনেকটা জল সরাচ্ছে। এই সরানো জলের একটা ওজন আছে। সেই ওজনই নৌকোটাকে উপর দিকে ঠেলে তুলে রাখার চেষ্টা করছে। একে বলে প্লবতা।

কাঠের নৌকো—তার এমন গড়ন যে সবশুদ্ধ তার যা ওজন, সরানো জলের ওজন বা প্লবতাজনিত বল তার চেয়ে বেশি। আর যার জোর বেশি, সে তো জিতবেই।

আয়নায় আলো পড়লে চকচক করে কেন?

সূর্যের আলো আয়নায় পড়লে কী রকম চকচক করে! ছেলেবেলায় ছোট আয়না সূর্যের আলোর মুখোমুখি রেখে তাকে ঘুরিয়ে ফেলতাম পথ-চলা মানুষের চোখে-মুখে। অন্যায়, কিন্তু মজা লাগতো।

কিন্তু আয়নায় আলো পড়লে চকচক করে কেন? কত সময়ে দেওয়ালেও তো আলো পড়ে। কই সে আলো তো চকচক করে না।

আয়নায় যে প্রতিফলন হয়, দেওয়ালের প্রতিফলনের সঙ্গে তার তফাত আছে। আয়না মসৃণ, তাতে যে রশ্মিগুচ্ছ এসে পড়ে, তা একটা নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত হয়। ফলে এ-রকম প্রতিফলনের অধিকাংশ আলোকরশ্মি একটা নির্দিষ্ট দিকে এসে আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু আয়নার বদলে যদি দেওয়ালের কথা ভাবি, তা হলে দেওয়ালে পড়েও আলোকরশ্মি ফিরে আসছে। কিন্তু দেওয়াল তো আয়নার মত মসৃণ নয়, বরং তা কিছুটা এবড়ো-খেবড়ো। আতসকাচের তলায় খুঁটিয়ে দেখলে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট চোখে পড়বে। সেইজন্যে আলোকরশ্মি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসার পরে কোনো নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত না হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এ-রকম প্রতিফলনে আলোর খুব সামান্য অংশই চোখে এসে পড়ে। আর তাই আয়নায় আলো পড়লে চকচক করে, কিন্তু দেওয়ালে আলো পড়লে তা হয় না।

দেশলাইয়ের আগুনের মুখ উপরে কেন?

দেশলাই কী ভাবে জ্বালানো হয়—কে না জানে? ঘষি



কাঠি বাক্সের গায়ে আর জ্বললো দেশলাই সঙ্গে সঙ্গে। এই যে কাঠিতে আগুন, এর মুখ থাকে বরাবর উপরের দিকে। কেন?

দেশলাই যখন জ্বলে তখন কাঠির গায়ের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পুড়তে থাকে। নানা গ্যাস তৈরি হয়। উত্তাপে এই সব গ্যাস এত গরম হয়ে ওঠে যে, তা থেকে আলো বেরিয়ে আসে। আগুনের শিখাটি উত্তপ্ত গ্যাসের একটা অঞ্চল।

আগুনের শিখায় এই সব গ্যাস আশেপাশের কম উত্তপ্ত বাতাসের চেয়ে হালকা। প্রকৃতির নিয়মই এই, ভারী জিনিস নীচে থাকে আর হালকা জিনিস উপরে। সেইজন্যে আগুনের হালকা গ্যাস উপরে ওঠে। যে-ভাবে ইচ্ছে জ্বলন্ত কাঠি ধরা যাক না কেন, হালকা গ্যাস উপরে উঠবেই আর তাই আগুনের শিখার মুখ থাকে উপরে।



আমরা ডান হাতে লিখি কেন?

কেউ-কেউ যে বাঁ হাতে কলম ধরে না, তা নয়, কিন্তু আমরা বেশির ভাগ লোকেই ডান হাতে লেখালিখির কাজ করি। কেন? আমাদের ডান হাতে লেখার কারণটা কী?

আমাদের মস্তিষ্ক দু'টো অংশে ভাগ করা। এই দু'টো অংশই আকৃতিগত ভাবে সমান। কিন্তু দেখা যায়, একটা দিক আর একটা দিকের তুলনায় বেশি কাজের। মস্তিষ্কের বাঁ আর ডান দিকের মধ্যে বাঁ দিকটাই বেশি কর্মক্ষম। মস্তিষ্কের যে দু'টো অংশ, তার এক একটা অংশ দায়িত্ব নেয় শরীরের এক একটা দিকের। বাঁ দিকের উপরে শরীরের ডান দিকের দায়িত্ব আর ডান দিকটা ভার নিয়েছে শরীরের বাঁ দিকের।

আমাদের মস্তিষ্কের বাঁ দিকটা ডান দিকের তুলনায় বেশি কাজের বলে আমাদের ডান হাতই চলে ভাল। বাঁ হাত নয়। লিখিও তাই ডান হাতে।

কিন্তু কেউ কেউ যে বাঁ হাতে লেখে তার কারণটা কী?

তাদের বেলায় মস্তিষ্কের ডান দিকটাই বেশি কাজের কিন্তু কেন যে এমন হয়, সে-কথা আজও জানা যায়নি।

সাবানে চোখ জ্বালা করে কেন?

স্নান করার সময় চোখে একটু সাবান লাগলেই চোখ জ্বালা ক'রে ওঠে। কিন্তু গায়ে সাবান ভাল ক'রে মাখলেও তো কোনো অস্বস্তি হয় না। কেন? সাবান লাগলে চোখ জ্বালা করার কারণটা কী?

আমাদের দেহের ত্বক আমাদের বাঁচায় বাইরের সমস্ত প্রতিক্রিয়া থেকে। এই দেহের ত্বক ততটা স্পর্শকাতর নয়। কিন্তু আমাদের চোখ অল্প উত্তেজনাতেই অস্থির। সে ভয়ানক স্পর্শকাতর। একটুতেই তার কষ্ট হয়, সে বেদনা অনুভব করে।

চোখের কর্নিয়ায় (সাদা অংশে) স্নায়ুকোষের প্রান্ত আছে। এই স্নায়ুকোষের প্রান্তগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই প্রান্তীয় অংশ ক্ষার, অম্ল, লবণের মত জিনিসের ছোঁয়ায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সাবান ক্ষারধর্মী একটা পদার্থ। ফলে সাবান চোখে লাগলেও চোখে উত্তেজনা হয়। আর তা স্নায়ুতন্তু দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছোলেই আমরা জ্বালা বা ব্যথা অনুভব করি।

কোট ঝাঁকালে ধুলো ওড়ে কেন?

শীতকালে পশমের কোট-প্যান্ট থেকে জমা ধুলো-ময়লা সরানোর জন্যে আমরা সেগুলো ধরে ঝাঁকুনি দিই। তাতে ধুলো-ময়লা বেরিয়ে যায়। পশমের কোট-প্যান্ট তো রোজ



কাচা যায় না। এইভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে ধুলো-ময়লা আমরা সরিয়ে ফেলি।

কিন্তু ঝাঁকুনি দিলে ধুলো-ময়লা ঝরে পড়ে কেন? হ্যাঙ্গারে একটা কোট ঝুলছে ধরা যাক। সেটা তার নিজের জায়গায় আছে। যেই ঝাঁকুনি দেওয়া হয় বা কোনো কিছু দিয়ে কোটটাকে আঘাত করা হয় অমনি কোটটা তার আগের জায়গা থেকে সরে যায়। সেটা দুলতে থাকে। কিন্তু ধুলোবালি সব কোটের উপরে ছিল। কোট তার আগের জায়গা থেকে সরে গেলে কী হবে, ধুলোবালিগুলো যেখানে ছিল সেখানেই তাদের থেকে যাওয়ার একটা ঝোঁক থাকে। কিন্তু শূন্যে তো তারা থাকতে পারে না, ফলে খসে পড়ে মেঝেতে। কোট থেকে ধুলো বেরিয়ে যায়।

ঝালাই মানে কী?

বালতি, হাঁড়ি, কড়া ফুটো হয়ে গেলে অনেক সময়ে রাংঝাল দিতে হয়। রাংঝালে সেই ফুটোর মুখ জুড়ে যায়। তখন আর সেই মুখ দিয়ে পাত্রে রাখা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে না।

গরম ক'রে এই যে রাংঝাল দেওয়া, এই রাংঝালে কী থাকে?

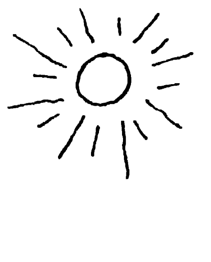
সাধারণত রাংঝালে থাকে সিসে আর টিন। দুই-ই মেশানো হয় সমান সমান ভাগে। কিন্তু বিভিন্ন রকম কাজে ভাগের অদল-বদল করা হয়। দু'টো ধাতু মিশিয়ে যা তৈরি করা হয়, তাকে বলে সংকর ধাতু।

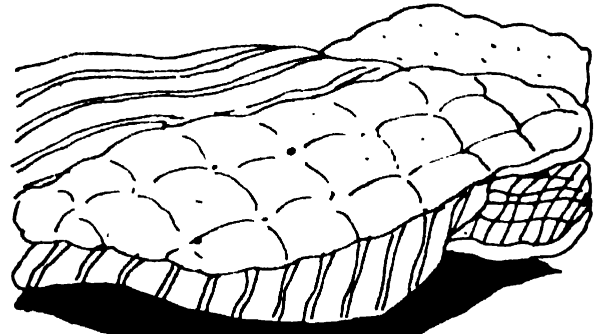
যে সিসে আর টিন মিশিয়ে রাংঝাল তৈরি, সেই সিসে আর টিন অন্যান্য ধাতুর তুলনায় অনেক অল্প উত্তাপে গলে যায়। সিসে গলে যায় 327.4 ডিগরি সেলসিয়াসে। টিন আরো কমে, সে গলে 231.85 ডিগরি সেলসিয়াসে। এ দুটোকে মিশিয়ে ঝাল দেওয়ার জন্যে যে ধাতুটা তৈরি করা হয়, তা আবার গলে সিসের চেয়ে কম উত্তাপে (200-300 ডিগরি সেলসিয়াস)।

ভাঙা, ফুটো জোড়া দেওয়ার সময়ে উত্তাপে কঠিন ঝাল নরম হয়ে গলে, কিন্তু যেখানে ঝাল পড়ে তা একই রকম থাকে। আর যেই উত্তাপ কমে ঠাণ্ডা হয়, অমনি সেই ঝাল জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে আসে। ফলে ফুটো বোজে আর ভাঙা জোড়ে।

লেপ-তোশক রোদে দিই কেন?

বর্ষার শেষে বা শীত পড়ার মুখে লেপ-তোশকে রোদ খাওয়ানোর একটা রীতি চালু আছে। কিন্তু কেন? লেপ-তোশকে যে-সব তুলোর তন্তু আছে, সেগুলি সেলুলোজের।





সেলুলোজ হল বহু গ্লুকোজ অণুর সুবিন্যাস করা একটা রাসায়নিক সমষ্টি। এই অণু জল টানে আর অতি সহজেই তা জলে গুলে যায়।

বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি। লেপ-তোশকের তন্তু জল টেনে নিয়ে ভেজা ভেজা থাকে। ফলে তাতে নানা ধরনের ছত্রাক জন্মাতে পারে আর সেলুলোজেরও নষ্ট হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায়। এও এক ধরনের পচন। এই পচন ঠেকানোর জন্যে বর্ষার শেষে লেপ-তোশকে রোদ খাওয়ানো হয়ে থাকে।

বর্ষায় যে আর্দ্রতা চলে আসে লেপ-তোশকে, রোদের গরমে তা বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যায়। তখন তন্তুপুঞ্জ ফাঁক-ফাঁক হয়ে ফেঁপে ওঠে। ফলে লেপ বালিশে কিছুটা ফুলো-ফুলো ভাব। এই সময়ে ঝাড়াঝাড়ি করলে বা লাঠি দিয়ে পেটালে ধূলিকণা, এমন কি যদি কোনো সূক্ষ্ম ছত্রাক জন্মে থাকে লেপ-তোশকের তুলোর তন্তুতে, সেগুলিও ঝরে পড়ে।

ফুটন্ত দুধ উথলে ওঠে কেন?

ফুটন্ত দুধ অনেক সময় উথলে ওঠে কড়া থেকে। দুধ উথলে পড়ার কারণটা কী? কই, জল ফুটলে তো উথলে পড়ে না!

জল যে-রকম দুধ সে-রকম নয়। দুধে অনেক পদার্থই থাকে ভাসমান অবস্থায়। তার মধ্যে প্রোটিন, শর্করা আর স্নেহ জাতীয় কিছু কিছু জিনিস আছে।

দুধ যখন আস্তে আস্তে গরম করা হয়, তখন স্নেহজাতীয় পদার্থ আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে এটা উঠে আসে উপরে। দুধের চেয়ে হাল্কা বলেই এ-রকমটা হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থ সবচেয়ে উপরের স্তরে থাকে বলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে দুধের উপরে সরও পড়ে তাড়াতাড়ি।

জল ফুটলে উথলে ওঠে না কেন?

দুধ যখন গরম করা হয়, তখন দুধে কিছুটা জল উবে যায়, তার মানে ওটা হয়ে যায় জলীয় বাষ্প। কিন্তু দুধের উপরে সর পড়লে বাষ্প বের হতে পারে না, তাতে চাপা পড়ে যায়। আরো গরম করলে জলীয় বাষ্প আরো বাড়ে। সে চাপ এসে পড়ে সরের তলায়, আর তাই লুচির মত ফুলে ওঠে। কিন্তু বেশি ফুললে সরের আর জলীয় বাষ্পকে ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে না। সেটা তখন ফেটে যায়, আর দুধ উথলে পড়ে কড়ার বাইরে। অবশ্য কড়ায় একটা হাতা ডুবিয়ে দিলে জলীয় বাষ্প হাতার ওই হাতল ধরে বেরিয়ে আসে। তাই আর দুধ তখন তাড়াতাড়ি উথলে পড়ে না।

আলোয় ভাল ঘুম হয় না কেন?

ঘরে আলো জ্বালা থাকলে ভাল ঘুম হতে চায় না। আলো নিভিয়ে দিলে ঘুম আসে সহজে।

চোখে আলো পড়লে ঘুম আসতে চায় না কেন?

আলো চোখে পড়লে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কোনো কোনো অংশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমাদের জাগিয়ে রাখে স্নায়ুতন্ত্রের যে-সব অংশ, সেগুলো যদি সক্রিয় থাকে তাহলেই ঘুমের ব্যাঘাত, তখন আর ঘুম আসতে চায় না। আর সেই সব স্নায়ুতন্ত্র যদি কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তাহলে সহজে ঘুম নেমে আসে আমাদের চোখের পাতায়। আমরা ঘুমের মধ্যে ডুবে যাই।

বেশি জ্বরে জলপটি দেওয়া হয় কেন?

কারও খুব বেশি জ্বর হলে ডাক্তারবাবু কপালে জলপটি



দিতে বলেন। মা কপালে জলের পটি লাগান আর আস্তে আস্তে পাখার বাতাস করেন।

জলপটি লাগালে কী হয়?

জ্বরের সময়ে শরীরে তাপমাত্রা বেশি। পাখাব বাতাসে জলপটির জল যাচ্ছে উবে। জল থেকে বাষ্প—অবস্থার বদল—এই বদলের জন্যে যে তাপের দরকার তা জোগাচ্ছে শরীরের উত্তাপ। ফলে শরীরে উষ্ণতা বা জ্বর কমে আসার কথা।

ভিজে জামা-কাপড় শরীরে বেশিক্ষণ রাখলে ঠাণ্ডা লেগে যায় একই কারণে। শুকনো পরিবেশে হাওয়া দিলে জল দ্রুত বাষ্প হবে। আর বাষ্প হওয়ার জন্যে যে তাপ লাগবে, সে-তাপ জোগাবে শরীর। শরীরের তাপ বেরিয়ে গেলে ঠাণ্ডা তো লাগবেই।

মাথা ধরে কেন?

মাথা ধরে অনেক সময়ে। কিন্তু কেন?

মাথা ধরা এক রকমের আরোপিত যন্ত্রণা। একটা কথা আছে না, 'অল রোড্‌স লিড টু রোম'। সেই রকম শরীরের নানা জায়গায় অনেক অস্বাভাবিকতার শেষ ফল শেষ পর্যন্ত মাথা ধরা। মাথা ধরাকে তাই বলা হয় আরোপিত যন্ত্রণা,



অর্থাৎ যা আরোপ করা হয়েছে। এর বেশির ভাগ করোটির অন্তর্দেশ থেকে আর কিছুটা করোটির বাইরের কোনো উৎস থেকে মস্তকের উপরিতলে আরোপিত হয়।

মাথা ধরার অনেক কারণ আছে। প্রধান প্রধান কারণগুলি হল, মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ বা ক্ষত, মস্তিষ্ক মেরুরসের চাপ হ্রাস, রক্তচাপ বৃদ্ধি, চোখের গোলযোগ, নাক বা ওই অঞ্চলের প্রদাহ আর আবেগ উদ্বেগ প্রভৃতির জন্যে মস্তক ও গ্রীবা পেশীর আক্ষেপ।

খেয়ে উঠলেই ঘুম পায় কেন?

ভরা পেটে খেয়ে ওঠার পরে দেখা যায়, বড্ড বেশি ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে আসে, ঘুম-ঘুম ভাব, মনে হয় একটু যেন গড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হয়।



দিনের বেলায় যেদিন স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারি থাকে, সেদিন আর দিনে ঘুম হয় না। কিন্তু ছুটির দিনে বা রোজ রাত্তিরে খাওয়ার পরে এটা ভালভাবে টের পাওয়া যায়। তা ছাড়া রাতের খাওয়াটা হয় দিনের খাওয়ার চেয়ে আরো ভালভাবে। তখন তো আর ব্যস্ততার কারণ থাকে না। ফলে খেয়ে উঠলেই যে ঘুম পায় রাতের বেলায়, সেটা টের পাওয়া যায় আরো পরিষ্কার। অথচ খেয়ে ওঠার পরে

কিছুটা সময় গল্প-গুজব ক'রে কাটিয়ে দিতে পারলে দেখা যায়, ঘুমটা কেটে গেল। ইচ্ছে করলে যে কেউ তখন বই নিয়ে বসতে পারে।

কিন্তু খেয়ে উঠলেই ঘুম পায় কেন? খাওয়ার সঙ্গে কি ঘুমের কোনো সম্পর্ক আছে?

হ্যাঁ, আছে। খাওয়ার পরে শরীরের মোট রক্তের একটা বড় অংশ অন্ত্রে চলে আসে। এটা আসে হজমে সাহায্য করবার জন্যে। আবার এই রক্তের ভিতর দিয়েই অক্সিজেন বয়ে চলে। তাহলে রক্তের অনেকটা অংশ অন্ত্রে চলে এলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব ঘটে যায় আর মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাবের ফলে অবসন্নতা এবং ঘুমের ভাব। একে বলা হয় temporal cerebral anoxia।

এই অভাবটা অবশ্য সাময়িক। সেই কারণে খানিকক্ষণ বাদে ঘুম-ঘুম ভাব কেটে গিয়ে শরীর আবার সতেজ আর চাঙ্গা হয়ে ওঠে।



জ্বর হলে শীত করে কেন?

জ্বরের কথা থাক, এমনিতে শীত করে কেন? পরিবেশের উষ্ণতা যখন শরীরের উষ্ণতা থেকে কমে যায়, তখন আমাদের শীত করে। শীতকালে তাই আমাদের শীত লাগে।

কিন্তু যখন জ্বর হয়, তখন কী দেখি? দেহের উষ্ণতা বেড়ে গেছে আর পরিবেশের যা উষ্ণতা তার থেকে তা বেশি। অর্থাৎ পরিবেশের উষ্ণতা দেহের উষ্ণতার চেয়ে কম। তাই আমাদের শীত লাগে।

মাটির কলসির জল ঠাণ্ডা কেন?

গরমের দিনগুলিতে মাটির কলসিতে জল রাখলে জল রীতিমতো ঠাণ্ডা হয়। বিশেষ ক'রে রাস্তায় হেঁকে যাওয়া নতুন মাটির কলসি বা কুঁজো কিনে তাতে যদি মা জল ভরেন, তাতে জল ঠাণ্ডা হবে আরো বেশি। গরমের দিনে সে জলে তৃষ্ণা মিটবে।

কিন্তু মাটির কলসিতে জল ঠাণ্ডা হয় কেন?

মাটির কলসি বা কুঁজো তৈরি করার সময় তাতে বালি মেশানো হয়। ফলে তার গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। জলকে ঠাণ্ডা করায় ওই ছিদ্রগুলির কাজ সবচেয়ে বেশি। মাটির আধারের ওই সব ছিদ্র দিয়ে জল চুঁইয়ে বাইরে আসে আর উবে যায়। কিন্তু বাষ্প হতে গেলে তাপ দরকার। ওই তাপ সে নেয় জল থেকে। ফলে জল ঠাণ্ডা। গরমের দিনগুলিতে এই উবে যাওয়ার ব্যাপারটা সমানে চলতে থাকে। তাই ছিদ্রপথে জল বেরিয়ে আসছে আর উবে যাচ্ছে। এই উবে যাওয়ার জন্যে জল ঠাণ্ডা। পুরোনো কলসিতে জল কিন্তু নতুন কলসির মত ঠাণ্ডা হয় না। এর কারণ কী?

কারণ মাটির পাত্র পুরনো হলে ছিদ্রের মুখ ধুলো পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নতুন পাত্রে যতটা জল উবে যায়

পুরনো মাটির কলসি না নতুন মাটির কলসি—কোন কলসির জল বেশি ঠাণ্ডা?

বা যতটা তাপ টানে পুরনো পাত্রে ততটা নয়। সেই কারণে পাত্র পুরনো হলে ঠাণ্ডা হয় কম।

বর্ষাকালে কিন্তু মাটির পাত্রের জল বেশি ঠাণ্ডা হয় না। কারণ সে সময়ে বাতাস বেশি আর্দ্র অর্থাৎ বাতাসেই জল থাকে বেশি, ফলে বাতাস কম জল টানে।



হাই ওঠে কেন?

শুধু ঘুম পেলে যে হাই ওঠে তা নয়, একঘেয়ে কাজ বা একটানা কিছুক্ষণ পড়াশুনো করলেও হাই ওঠে। তাই না?

হাই ওঠে কেন?

ক্লান্তিতে বা একঘেয়ে কাজ করতে করতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে আসে। স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে ১৮ বারের মতন আমরা প্রশ্বাস নিই আর নিঃশ্বাস ছাড়ি। যখন হার কমে আসে, তখন কী হয়?

শরীর থেকে আমরা কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়ি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে এলে শরীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসার পরিমাণ কমে যায়। সেইজন্যে রক্তে আর দেহকোষে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিমাণে বেড়ে ওঠে।

এই বেড়ে যাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্যে আমরা হাই তুলি। হাই তুলে আমরা বেশি বাতাস টানি। ছাড়িও বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড। ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে আসে। আর এইভাবে স্থিতাবস্থা বা স্বাভাবিক অবস্থাটা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।

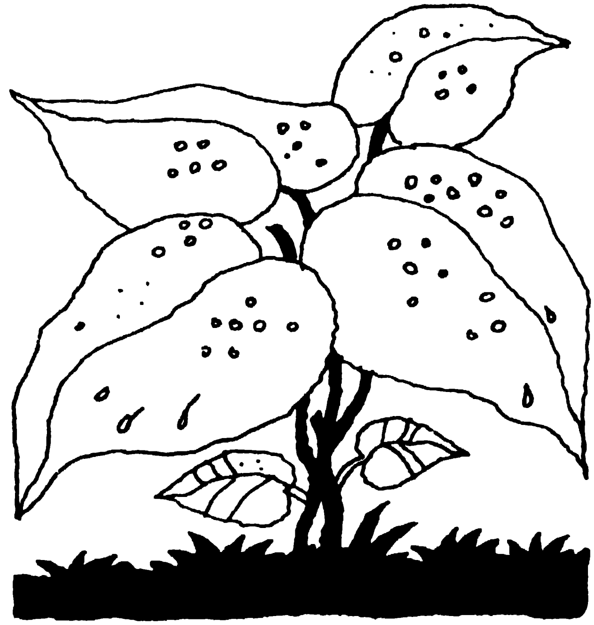
শিশির কেন পড়ে?

সকালবেলায় অনেক সময়ে দেখি মাঠ, ঘাস, সব শিশিরে ভেজা। মাঠের উপর দিয়ে হাঁটলে পায়ে জল লাগে, পা ভিজে যায়।

এই যে শিশির, এ-শিশির পড়ে কেমন ক'রে?

আমাদের পুকুর, নদী, হ্রদ, সমুদ্র থেকে অনবরত জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হয়। এই জলীয় বাষ্প যায় কোথায়? তা উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু তার মিশবারও তো একটা সীমা আছে। বাতাসে কতটা জলীয় বাষ্প ধরবে, তা নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার উপরে।

ধরা যাক, বাতাস একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় আছে। এই উষ্ণতাতে বাতাস সবচেয়ে বেশি যে-পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধরতে পারে, তার থেকে বেশি জলীয় বাষ্প ধরতে পারে



উষ্ণতা বেড়ে গেলে। কিন্তু উষ্ণতা যদি কমে যায়? তখন জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা নিশ্চয় কমে আসবে।

দিনের বেলায় সূর্যের তাপে মাটি হয়ে থাকে গরম। মাটির কাছে যা আছে তা-ও। কিন্তু রাত্রি হলে মাটি আর মাটির উপরের সব কিছু তাপ বিকিরণ ক'রে চলে। ফলে ধীরে-ধীরে তারা ঠাণ্ডা হতে থাকে। চারপাশের বাতাসও শীতল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাতাসের উষ্ণতা এত কমে

যায় যে, বেশি উষ্ণতায় যতটা জলীয় বাষ্প সে ধরে রাখতে পারতো, কম উষ্ণতায় আর তা পারে না। যে জলীয় বাষ্প আর ধরে রাখা যায় না, তার হয় কী?

এই অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প তখন ঘাস, গাছের পাতার মত শীতল পদার্থের উপর ঘন হয়ে জলবিন্দুরূপে জমে।

এই জমা জলবিন্দুকেই শিশির বলে।

আকাশ পরিষ্কার আর বাতাস স্থির থাকলে শিশির পড়ে ভাল।

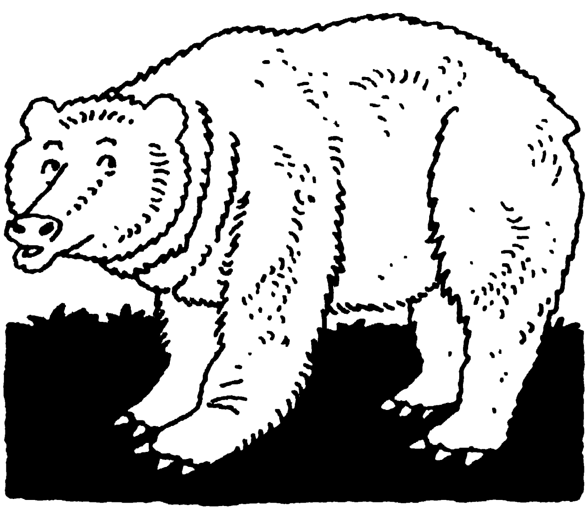
জীবজন্তুর গায়ে রোম বেশি কেন?

স্তন্যপায়ী সকল প্রাণীর দেহেই কম-বেশি রোম থাকে। কেন? স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে বেশি রোম থাকার কারণ কি?

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা উষ্ণশোণিত। এদের রক্ত গরম। তাই এদের দেহের তাপমাত্র চারপাশের পরিবেশ থেকে বেশি। এইজন্যে সব সময়েই দেহ থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু দেহে রোম বেশি থাকায় এই তাপ বেরিয়ে যাওয়ার পথে বাধা পড়ে।

কেমন ক'রে?

দেহের রোম তাপের কুপরিবাহী। ফলে তাপ বেরোতে



বাধা দেয়। তা ছাড়া দেহে রোমের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস আটকে থাকে। বাতাসও তাপের কুপরিবাহী। ফলে কুপরিবাহিতা আরো বেড়ে যায়।

তাই গায়ে বেশি রোম স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার একটা কৌশল যেন। এতে তাপক্ষয় হ্রাস পায়। আর দেহ থেকে এই তাপের ক্ষয় কমানোর জন্যেই জীবজন্তুর শরীরে বেশি রোম থাকে।

দুধে সর পড়ে কেন?

গরম দুধ ঠাণ্ডা হলে তাতে সর পড়ে যায়। কড়ার উপরে মস্ত সর কিংবা কাপে, গেলাসে খাওয়ার জন্যে দেওয়া দুধের উপরে পুরু সর। দুধে সর পড়ে কেন?

দুধে মাখন জাতীয় স্নেহপদার্থ থাকে। এই স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে দুধের সঙ্গে মিশে। যেই তাপ দেওয়া হয় বা দুধ ফোটানো হয়, অমনি খানিকটা মাখন আলাদা হয়ে যায়।

এই মাখনটা থাকবে কোথায়? দুধের উপরে না ভিতরে?

মাখন দুধের থেকে হালকা আর যা হালকা তা থাকবে উপরে। তাই স্নেহজাতীয় পদার্থ মাখন ভাসে দুধে। আর যেই দুধ ঠাণ্ডা হয়, অমনি স্নেহজাতীয় মাখন সরের চেহারা নেয়। আমরা দেখি, দুধের উপরে সর পড়েছে।

চলন্ত বাস থেকে নামার সময়ে সামনে তাকিয়ে নামতে হয় কেন?

চলন্ত বাস থামলো। ঠিক জায়গা এসে গেছে। যে-কোনো ভাবে নামলেই তো হয়—কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে শরীর ঈষৎ পিছন দিকে ঝুলিয়ে নামতে হয় কেন?

আগে একটা বইয়ের কথা ধরা যাক। বইটা স্থির, আছে টেবিলের উপরে। কেউ না সরালে সেটা টেবিলের উপরেই থাকবে, যেমন আছে। স্থির বস্তুর ধর্মই তাই। সে চিরকাল স্থির থাকবে। সেইরকম যে বস্তু সচল তার সচল থাকার কথা বরাবর। কিন্তু তার চারপাশে অনেক বাধা। যদি কোনো বাধা না থাকতো তাহলে যে গতিতে তার চলা শুরু, সেই গতিতেই সরলরেখায় সে চলতো।

চলন্ত বাসের বেলায় কী হয়?

বাস সামনে এগোচ্ছে। তার ভিতরে যাত্রীরা। বাসের গতি যাত্রীদের গতি। ফলে বাস থামলেও শরীর থামতে চায় না। সামনে এগনোর ঝোঁকে সে এগিয়ে যেতে চায় সামনে। এটাই তখন বিজ্ঞানের চাহিদা। সেইজন্যে শরীর ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে।

অবস্থাটাকে সামাল দিতে বাস থেকে নামবার সময়ে সামনের দিকে তাকিয়ে একটু পিছনে হেলে নামলে উল্টে পড়ার ভয় থাকে না।

কিন্তু পিছন দিকে মুখ ক'রে নামলে কী হবে? তখন সামনের দিকে ঝোঁকের জন্যে উল্টে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

জ্বলন্ত হ্যারিকেনের কাচ জল লাগলে ফাটে কেন?

হ্যারিকেন জ্বলছে। গ্রামে যেখানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে তো জ্বলেই, শহরেও লোডশেডিংয়ে হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়। কিন্তু জ্বলন্ত হ্যারিকেনের কাচে জল লাগলে অনেক সময়ে কাচ ফেটে যায়। কিন্তু এই কাচ ফেটে যাওয়ার কারণ কি?

লোহা, পিতল যে-রকম, কাচ সে-রকম নয়। লোহা পিতল তাপের সুপরিবাহী। কিন্তু কাচ তাপ কুপরিবাহী। তাপ কুপরিবাহী হওয়ার জন্যে এক পিঠের উষ্ণতা যেমন আর এক পিঠে তাড়াতাড়ি যায় না, তেমনি এক পিঠ ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও আর এক পিঠ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে পারে না।

জ্বলন্ত হ্যারিকেনের কাচের বাইরের পিঠে জল লাগলে কি হয়?

বাইরের পিঠের তাপ কমে যায়। যেখানে জল লাগে, তাপ কমার ফলে সেখানে সঙ্কোচন হয়। কিন্তু ভিতরের দিকে তাপ কমার কথা নয়। সেখানে জল লাগেনি। সেইজন্যে সেইদিকে সঙ্কোচন হয় না। একদিকে সঙ্কোচন, অন্যদিকে নয়। এই অসম ব্যাপারটার জন্যেই কাচের মধ্যে চাপ তৈরি হয়, তাই কাচ ফাটে।

খসখসে কাগজে লিখতে অসুবিধে হয় কেন?

খসখসে কাগজে লিখতে অসুবিধে হয়, তাতে ভাল লেখা পড়ে না। তাই না? কেন?

কাগজের উপরে লিখবার সময়ে যখন পেন চলে, তখন কাগজের উপরে পেন তো ঘষতে হয়। এই যে ঘষে নিয়ে যাওয়া, এই ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি ঘর্ষণের সৃষ্টি হওয়া।

ঘর্ষণ আছে বলেই মাটিতে মারবেল গড়িয়ে দিলে তা বরাবর চলতে থাকে না। কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়। ঘর্ষণ বেশি হলে মারবেল সরবে আরো অল্প। খসখসে কাগজে ঘর্ষণ বেশি। তার উপরে কলম সরতে চায় না।

লেখার জন্যে ঘর্ষণও কিন্তু দরকার। বেশি চকচকে কাগজেও আবার লেখার অসুবিধে। তেল-মাখা কাগজে লেখা ফুটবেই না। ব্ল্যাকবোর্ডে যে লেখা ফোটে তা চক আর ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যে ঘর্ষণের জন্যে। আর ব্ল্যাকবোর্ড বেশি মসৃণ হলে সেখানে চক পিছলে যেতে থাকে, তখন কোনো লেখা ফোটানোই যায় না।

ওল খেলে গলা ধরে কেন?

ওল খেতে অনেকেরই ভাল লাগে। কিন্তু যদি গলা চুলকোয়! এ-রকম একটা ভয় থাকে মনে মনে। ওল খেলে গলা চুলকোয় কেন?

ওলের কোষে একরকমের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এর নাম ক্যালসিয়াম অক্সালেট। চিনির দানার যেমন একটা নির্দিষ্ট আকার আছে, তেমনি ওলের কোষের এই ক্যালসিয়াম অক্সালেটেরও আকারটা নির্দিষ্ট। এটা ছুঁচলো ধরনের। ফলে গলার শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে আটকে যায়। আর সেইজন্যেই গলা ধরে।

শীতকালে ঠোঁট ফেটে যায় কেন?

শীতকালে ঠোঁট ফাটে, অথচ গরমে নয়। কেন?

আমাদের চামড়ায় এক রকমের গ্রন্থি আছে, এর নাম সেবেসিয়াস গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে তেল জাতীয় এক ধরনের পদার্থ বেরিয়ে আসে। যখন অবস্থাটা স্বাভাবিক, তখন এই তেল জাতীয় পদার্থটা ঘামের সঙ্গে মিশে চামড়ার উপরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে চামড়াটা তেলতেলে আর নরম থাকে। কিন্তু শীতকালে অবস্থাটা অন্যরকমের। তখন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়, পরিবেশের উষ্ণতাও কম থাকে। তাই তেমন ঘাম বের হয় না। সেইজন্যে সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসা তেলতেলে পদার্থটা চামড়ার উপরে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় ঠোঁটটাই বেশি ফাটতে দেখা যায় কেন?

আসলে ঠোঁটের চামড়া পাতলা। তা ছাড়া তা নাকের

কাছাকাছি থাকার জন্যে ঠোঁটের চারপাশে বায়ু চলাচল বেশি হয়। তাই ওই জায়গাটা আরো শুষ্ক হয়ে পড়ে। শীতকালে শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় ঠোঁট ফাটার কথাটাই যেন বেশি ক'রে মনে হয়।

ভয়ে কেন মুখ ফ্যাকাসে হয়?

ভয় পাই বা বিপদে পড়ি, যাই হোক না কেন, শরীরের প্রথম কাজই হল নিজেকে বাঁচানো। যেই ভয় পাই অমনি [redacted] আত্মরক্ষার জন্যে দেহের ভিতরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বেশি সক্রিয় হওয়ার জন্যে অতিরিক্ত রক্তের দরকার। এই অতিরিক্ত রক্ত ছুটে আসে শরীরের প্রান্তভাগ থেকে। মুখ থেকেও রক্ত চলে আসে। তাই ফ্যাকাসে দেখায় মুখ। গা, হাত, পা-ও ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

এ-ছাড়া আরো একটা কথা বলা দরকার। আমাদের শরীরে অ্যাড্রেনালিন নামে এক ধরনের হরমোন আছে। এই হরমোন অ্যাড্রেনাল নামে গ্রন্থির মজ্জা অংশ থেকে বেরিয়ে আসে। ভয় পাওয়ার সময় অ্যাড্রেনালিন হরমোনের প্রভাবে শরীরের প্রান্তভাগের রক্তবাহী নালী সরু হয়ে আসে। সরু হলে নিশ্চয়ই ওইসব অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ কমে যাবে। মুখ সমেত শরীরের প্রান্তভাগগুলো সাদা দেখানোর এটাও একটা কারণ।

টিউবলাইটে ছায়া পড়ে না কেন?

একটা মোমবাতির সামনে দাঁড়াই। পিছনে ছায়া পড়ে। আমার ভিতর দিয়ে আলো যাচ্ছে না, আমি অস্বচ্ছ। সেইজন্যেই ছায়া। শুধু মোমবাতির সামনে কেন, গোল বাল্বের আলোতেও ছায়া। কিন্তু টিউবলাইটের বেলায় সে ছায়া বোঝা যায় না কেন?

টিউবলাইট গোল নয়। সে লম্বা আর দৈর্ঘ্যে তা দু'ফুট বা চার ফুট। এই টিউবলাইট যখন জ্বলে, তখন তাকে কি আলোর একটা বিন্দু-উৎস হিসেবে কল্পনা করা যায়? না, টিউবলাইট একটা রেখা বরাবর যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র আলোর বিন্দু-উৎসের সমষ্টি?

এর যে-কোনো একটা বিন্দু-উৎসের কথা ধরা যাক। সেখান থেকে আলো এসে কোনো বস্তুতে বাধা পেয়ে ছায়ার সৃষ্টি করে। সেই ছায়া আমাদের চোখে খুব ভালভাবে ধরা পড়তো, যদি সেখানে আর কোনো উৎস আলো না দিত। কিন্তু টিউবলাইটের দীর্ঘ টিউব তো আলোর অসংখ্য বিন্দু-উৎসের সমষ্টি। সেখানে একটা বিন্দু-উৎসের জন্যে ছায়া অন্য বিন্দু-উৎসের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। ফলে ছায়া ফুটে ওঠার তেমন কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

আমরা ঘামি কেন?

আমাদের দেহে সব সময়েই তাপ তৈরি হয়। এই তাপের কিছুটা পরিবেশে ছড়িয়ে দিয়ে আমরা দেহের উষ্ণতা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখি। তাপমোচনের স্বাভাবিক তিনটি পদ্ধতি আছে—এরা হল পরিবহণ, পরিচলন আর বিকিরণ। দেহের উষ্ণতা যখন পরিবেশ থেকে বেশি থাকে, এই তিনটি পদ্ধতিতে তাপমোচন তখনই হয়।

কিন্তু পরিবেশের উষ্ণতা যখন বেড়ে যায়, তখন কী হয়?

আমরা চামড়ায় অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থির সাহায্য নিই। ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘাম আমাদের চামড়ার অসংখ্য ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই ঘামে যে জলের ভাগ তা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

বাষ্প হওয়ার জন্যে তাপের দরকার। সে তাপ আসছে কোথা থেকে? শরীর তার যোগান দেয়। ফলে দেহের তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

আমাদের শরীর থেকে ঘাম প্রায় সব সময়েই বেরিয়ে আসে। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেড়ে গেলে, ঘামে যে জলীয় উপাদান আছে, তার বাষ্পীভবন হয় কম। ফলে আমাদের চোখে ঘামটা ধরা পড়ে।